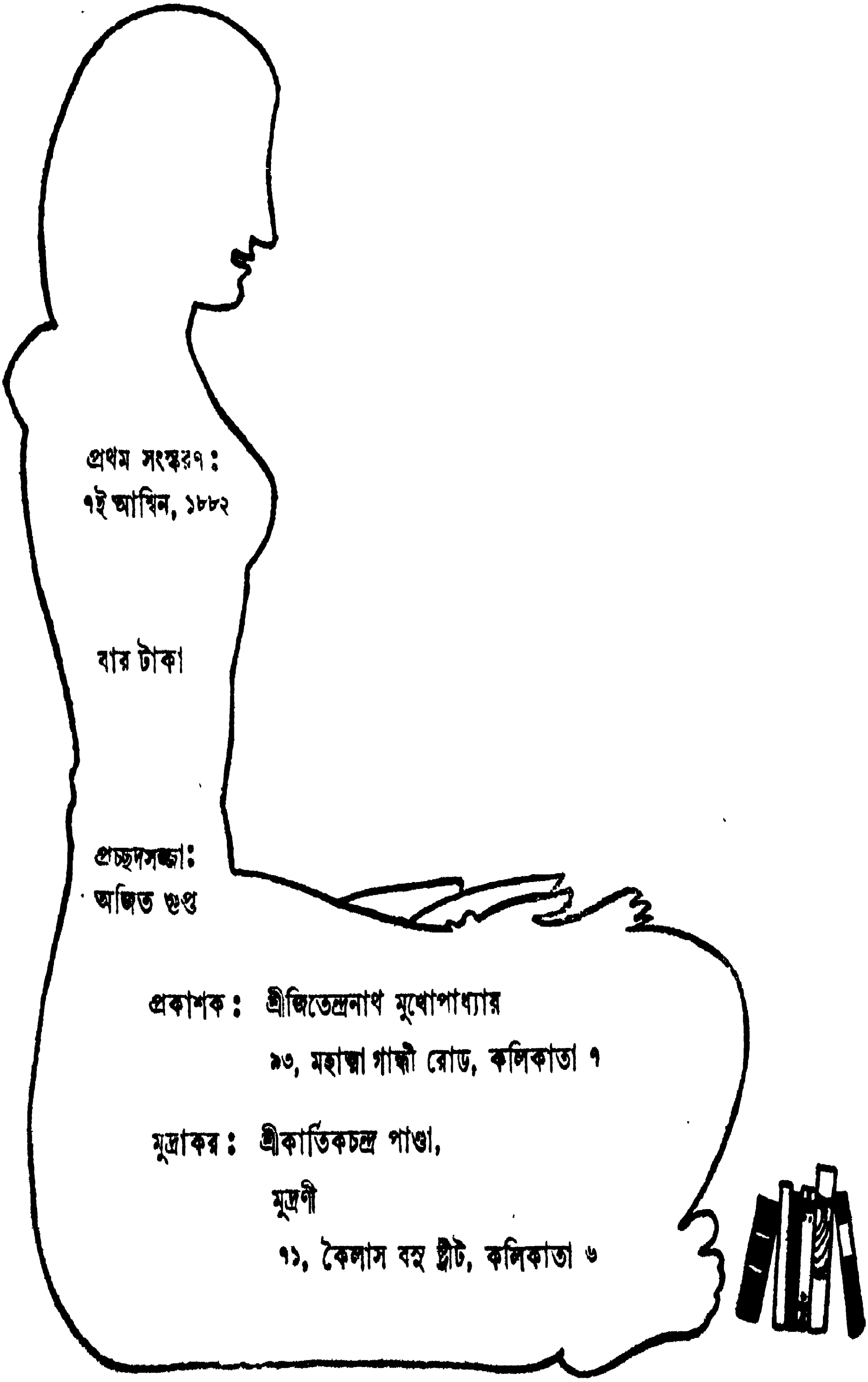
স্মৃতিচারণ

স্মৃতিচারণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সুরসুধাকর

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭



প্রথম সংস্করণ :
৭ই আশ্বিন, ১৮৮২

বার টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা,
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

১ম পর্ব

শৈশব-বাল্য-স্মৃতি



দিলীপকুমার—সুরধামে

(দশ বৎসর বয়স)

উপক্রমণিকা

সুভদ্রেষু

আপনি চেয়েছেন আমার "অঘটন আজো ঘটে" উপন্যাসটিতে আমি যে-ধরনের গল্প লিখেছি সেই ধরনের কোন ব্যক্তিগত কাহিনী লিখি আপনাদের পত্রিকায়। তথাস্তু। তবে বলে রাখি, এত সহজে রাজি হ'তাম না যদি না হঠাৎ—ষাটের কোঠা পেরিয়ে—মনের মধ্যে স্মৃতিচারণের একটা জোর তাগিদ না অনুভব করতাম।

প্রথমে কিন্তু একটু উপক্রমণিকা ফাঁদতে হ'বে। আমার ছেলেবেলাকার মতিগতি যখন চিত্রণীয় তখন যে-পরিবেশে আমার তনু মন প্রাণের শৈশব গ'ড়ে উঠেছিল তার কিছু কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিলে অনেক কিছুই হয়ত ঝাপসা থেকে যাবে। তাই বলা রইল—এ-ভূমিকাটিকে আমার উত্তর-জীবনের পরিণতির প্রাক্‌কথন রূপেই নেবেন।

দুপুরুষ পিছিয়ে যেতে হ'বে।

আমার ঠাকুরদাদা দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় ছিলেন উনবিংশ শতকের নদীয়ায় একজন কীর্তিমান্ মনস্বী। যেমন সুপণ্ডিত, তেম্‌নি সুপুরুষ, তেমনি সুগায়ক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ি, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ মহাপ্রাণ মানুষও তাঁর সংস্পর্শ কাম্য মনে করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবন-চরিতে লিখেছিলেন: "দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় সাধুতাতে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধর্মভীরু, কর্তব্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী লোক আমরা অল্পই দেখিয়াছি।" এঁরা সবাই ভালোবাসতেন তাঁর গান শুনতে। পিতৃদেব প্রায়ই গৌরব ক'রে বলতেন: "ওরে! আমার বাবা ছিলেন একজন ডাকসাইটে ওস্তাদ, বুঝলি? সাক্ষাৎ হচ্ছ খাঁর কাছে নাড়া বেঁধে খেয়াল শেখেন—" ব'লেই দীনবন্ধু মিত্রের সুরধুনী কাব্যের চারটি লাইন আওড়াতেন:

"কার্তিকেয় চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান,
সুন্দর সুশীল শান্ত বদান্য বিদ্বান্,
সুমধুর স্বরে গীত কিবা গান তিনি!
ইচ্ছা করে শুনি হ'য়ে উজান-বাহিনী!"

পিতৃগৌরবে তিনি উজিয়ে উঠতেন যখন তখন, বলতেন: "আমার গলা তোরা মিষ্টি বলিস তো? কিন্তু তোর ঠাকুরদাদার গলা যদি একবার শুনতিস রে, তাহ'লে আমার গলা শুনে বলতিস—'এ!'"। শুনে আমি খুব হাসতাম—প্রায় প্রতি কথাকেই তিনি এই ভাবে মোড় ফিরিয়ে কোথায় যে নিয়ে যেতেন যে সবাই চম্‌কে উঠত।

এর পরে ঠাকুরদাদার "আত্মজীবন চরিত" প'ড়ে আরো জানতে পারি তাঁর মিষ্ট কণ্ঠ শুনে কত মেয়েরা তাঁর প্রেমে পড়ত। তখন আমার বয়স বার কি তের, কাজেই "প্রেমে পড়া" কথাটা পিতৃদেবের আসরে শুনলেও, পিতৃদেবের "তারেই বলে প্রেম—যখন থাকে না ফিউচারের চিন্তা থাকে না কো শেম" জাতীয় হাসির গান শুনতে শুনতে বিজ্ঞভাবে স্থির করি যে পিতৃদেবের কথা নিশ্চয়ই সত্যি:

"প্রেমটা ভারি মজার ব্যাপার প্রেমিক মজার জিনিষ।"

কিন্তু যেই আবার তাঁরই গানে পড়তাম: "যে পড়ে প্রেমেরি ফাঁদে একদিন সেজন কাঁদেই কাঁদে—" মনে হ'ত—এ কী কাণ্ড! মজার জিনিস পেলে কান্না! কিন্তু তবু বেশ মনে আছে যখন ঠাকুরদাদার জীবনীতে পড়ি যে এক কিশোরী সুন্দরী বাইজি তাঁর গান শুনে শুধু যে "অন্যের সাক্ষাতে বলিত যে দেওয়ানজির মত মিষ্ট স্বর আর কাহারো নাই" তাই নয়, একদিন তাঁর চরণ ধ'রে "কাতর স্বরে" বলেছিল: "আপনার ম'ত মধুর গীত আর কাহারো শুনিতে পাই নাই···আপনি বলুন আমাকে ভালোবাসেন কি না"—তখন তার কান্নার কারণটা ঠিক না বুঝেই মন আর্দ্র হয়েছিল। তবে ভাবতাম: "ছেলেমানুষ মেয়ে—বয়স মাত্র চোদ্দ পনর—কাজেই কাঁদত ঠাকুরদাদার সুমধুর কণ্ঠের গান ইচ্ছা ম'ত শুনতে পেত না ব'লে। তাছাড়া কলকণ্ঠকে না ভালোবাসবে কে?"···এই ধরনের কত বিজ্ঞ কথাই যে মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াত—সব কি মনে আছে?

কিন্তু তার পরেই যখন ঠাকুরদাদার আত্মজীবনীতে পড়লাম যে তাঁর হিন্দি ওস্তাদি গানে বাঙালি শ্রোতারা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠত ব'লেই তাঁকে বাংলা গান বেঁধে খেয়ালের সুরে বসাতে হ'ত তখন খুব রাগ হ'ত—শ্রোতাদের অসমজদার হওয়ার জন্যে তাদের 'পরে জাগত একটা বিপুল অবজ্ঞা, কারণ আমি ঐ বয়সেই হিন্দুস্থানি গানের দারুণ ভক্ত হ'য়ে উঠেছিলাম। এ-সম্পর্কে মনে পড়ছে একটা মজার ঘটনা—অপ্রাসঙ্গিক নয়, তাই বলি।

হিন্দুস্থানি গানে আমার প্রথম অনুরাগ হয় যাঁর অপরূপ খেয়াল শুনে তিনি—

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—ছিলেন পিতৃদেবের বিশেষ বন্ধু। পিতৃদেব তাঁকে অসামান্য "জীনিয়স" বলতেন। যেমন রসিক তেমনি গায়ক। "সাহিত্য" পত্রিকায় তাঁর নানা হাসির গল্প প'ড়ে কী যে হাসতাম আমরা। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ ছিল তাঁর কণ্ঠলাবণ্য। অমন মিষ্ট কণ্ঠ আমি আর শুনি নি ওস্তাদদের মধ্যে। এহেন সুরেনমামা যখন তাঁর ভাগলপুরের বাড়িতে আমাদের তাঁর প্রাণকাড়া সুরে খেয়ালের পর খেয়াল শোনাতেন আর আমরা মুগ্ধ হ'য়ে শুনতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তখন এক-দিন হঠাৎ সুরেনমামিমার অভ্যুদয়! সুরেনমামা থতমত খেয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই মামিমা বললেন: "তুমি একটু থামবে? বাছা মণ্টু এসেছে কতদূর থেকে—কোথায় তার মিষ্টি গলায় দুটো বাংলা শ্যামাসঙ্গীত শুনে প্রাণ জুড়োব—না তোমার গান চলেছে তো চলেইছে—তা না না না-র ঝকমারি—" ব'লেই আমার দিকে চেয়ে: "বাবা মণ্টু, এ-মাথামুণ্ডু-নেই আঁ আঁ আঁ তানের কুস্তিতে কি তোমরা সত্যিই আনন্দ পাও—না ওঁকে খুশি করতেই চুপটি ক'রে ভালোমানুষ সেজে ব'সে থাকো?"

আমি এ-ঘটনার কথা পিতৃদেবকে বলতে তিনি হো হো ক'রে হেসে বললেন: "সুরেনের স্ত্রী তোকে অকারণ ভণ্ড ভাবেনি রে—বাঙালি ছেলেমেয়ে সবাই গান শুনতে সুরের সঙ্গে চায় কথার রস, অর্থাৎ ভাবের সঙ্গে সুরের মিলন।

রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিকেই বলেছিলেন অন্যভাবে তাঁর "সুর ও সঙ্গতি"তে: "বাংলাদেশে সঙ্গীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধ-নারীশ্বর রূপ।" তাই—লিখেছিলেন তিনি—"আমাদের গানে হিন্দুস্থানি যতই বাঙালি হ'য়ে উঠবে ততই মঙ্গল, অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে।"

কিন্তু এ-ধরনের কথা আমি সেসময়ে স্বীকার করতাম না, অবোধের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্যের ফেরে প'ড়ে পিতৃদেবের সঙ্গে সমানে তর্ক করতাম। পিতৃদেব একদিন হেসে বলেছিলেন আমাকে: "তোর সুরেনমামার গানও দুচারজন ওস্তাদদের জন্যে। তিনি একদিন আমাকে কী বলেছিলেন জানিস? বলেছিলেন: 'দ্বিজুবাবু! আপনার বাংলা গান কয়েকটা আমাকে শিখিয়ে না দিলে ধনেপ্রাণে মারা গেলাম—গৃহলক্ষ্মী বুঝি গৃহত্যাগ করেন বা।' আমি বললাম: 'সে কি সুরেন? তোমার গান শুনতে এতশত ভক্ত আসে—' সুরেন হেসে বলল: 'আসে, কেবল লুচি পাঁঠার আয়োজন থাকলে তবে'।"

আমি (রুখে উঠে): তারা ছাই বোঝে সুরের খেলা!

পিতৃদেব : বোঝে—কেবল ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি থাকলে তবে। এইই বাঙালির ধর্ম। তোর ঠাকুরদাদা ছিলেন তো নাম করা ওস্তাদ। তিনিও পরে ঠেকে শিখে "গীতমঞ্জরী" নাম দিয়ে এক বাংলা গানের বই ছাপান। বাঙালি শ্রোতার কাছে সেই গানগুলিই গাইতেন বেশি।

বলেছি আমি সে-সময়ে বিষম ওস্তাদিপন্থী ছিলাম। তাই এ-ধরনের যুক্তি শুনে সত্যিই কান্না পেত—কবে বাঙালি কথার বেসাতি ছেড়ে সুরের সমজদার হবে? কিন্তু বোধশক্তির বিকাশের অনুপাতে পরে বুঝেছিলাম—যে-কথা রবীন্দ্রনাথও আমাকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করতেন—যে বাঙালির স্বধর্ম সুরের সঙ্গে কাব্যের সমন্বয় ক'রে কাব্যসঙ্গীত সৃষ্টি করা—সে স্বভাবে ভাবুক—বলতেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ শুধু যে ভুল বলেন নি তাই নয়, বলেছিলেন গীতার কথাই—পরধর্মো ভয়াবহঃ। ঠাকুরদাদা প্রথম জীবনে খেয়ালের গোঁড়া হওয়া সত্ত্বেও শেষ জীবনে এই স্বধর্মের প্রাণের কথাটি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই খেয়ালের সুর চালু করবার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি বাঙলা গান বেঁধে "গীতিমঞ্জরী"নাম দিয়ে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পিতৃদেব এ-গানগুলির মধ্যে কয়েকটি সুললিত গান গেয়ে শোনাতেন সময়ে সময়ে আর বলতেন :

"বাবাই প্রথম আমাকে গানের দুটি দীক্ষা দেন, বুঝলি? এক, হিন্দুস্থানি সুর শেখার—দুই, সে-সুরে বাংলা গান বাঁধার।"

রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন নানা ভাবেই বহু উপমা দিয়ে—আমাকেও বারবারই বলতেন হিন্দুস্থানি সুরসম্পদে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করতে। আমাকে একবার লিখেছিলেন : "তুমি ভারতবর্ষের সঙ্গীতলোকে বিচরণ করতে বেরিয়েছ; নিজে সুধা পান ক'রে আসবে আর আমাদের জন্যেও সুধাপাত্র পূর্ণ ক'রে আনতে পারবে।" তাঁর "সুর ও সঙ্গতি"তে আরো জোর দিয়ে লিখেছিলেন : "আমাদের গানেও হিন্দুস্থানি যতই বাঙালি হ'য়ে উঠবে ততই মঙ্গল, অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে। হিন্দুস্থানি সঙ্গীত আমরা শিখব পাওয়ার জন্যে, ওস্তাদি করার জন্যে নয়।"

দুঃখের বিষয় ঠাকুরদাদার "গীতমঞ্জরী" আমি হারিয়ে ফেলি পিতৃদেবের মৃত্যুর পরে, নৈলে হয়ত তাঁর গানের কিছু আভাষ দিতে পারতাম আজকের শ্রোতাকে। গানগুলি সম্বন্ধে শুধু এইটুকু মনে আছে যে কবিত্বে বা ছন্দে উঁচুদরের না হ'লেও ঠাকুরদাদার বাক্যবিন্যাস সুললিত ছিল। সুর ও কবিতার এই আবহে মানুষ হ'য়ে পিতৃদেব শৈশবেই বাঁধেন তাঁর প্রথম গান : "গগনভূষণ তুমি জনগণ-

মনোহারী।" ঠাকুরদাদা এ-গানটি শুনে চম্‌কে গিয়েছিলেন ও তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন: "তুই গানে যশস্বী হবি"—যেকথা অন্যত্র বলেছি।

কিন্তু তাঁর এ-আশীর্বাদে সে-যুগে কেউই কান দেয়নি। কারণ সে-সময়ে গান গেয়ে কেউ দেশের ও দশের একজন হ'তে পারত না। ঠাকুরদা নিজেও কুলের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন নদীয়ারাজের দেওয়ান হ'য়েই বলব। রাজ্যপাট যখন দেনার দায়ে ডুবুডুবু তখন ঠাকুরদাই কাণ্ডারী হ'য়ে এসে শুধু যে রাজসরকারের সমস্ত ঋণ শোধ করেন তাই নয়—কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজতহবিলে কয়েক লক্ষ টাকা জমা করেন। মহারাজ সতীশচন্দ্র এজন্যে তাঁকে অনেক নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করতে চাইলেও তিনি কর্তব্যসাধনের জন্যে কিছুতেই পুরস্কার নিতে রাজি হন নি। চারদিকে ধন্য ধন্য প'ড়ে যায়—আরো এইজন্যে যে ঠাকুরদাদা দেওয়ান হ'য়েই ঘুষ নেওয়ার ব্যাপক প্রবৃত্তির সামনে একা এসে দাঁড়ান ও নানা দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও সংকট উত্তীর্ণ হন বহু ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে। তাঁর আশ্চর্য কৃতিত্বের জয়ধ্বনিতে আকৃষ্ট হ'য়ে লাল-গোলার মহারাজ তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন ডবল মাইনের লোভ দেখিয়ে। কিন্তু এই নির্লোভ বিবেকী মানুষটি টাকার লোভে অন্নদাতাকে ছেড়ে যেতে অসম্মত হন। এসব গল্প করতে করতে পিতৃদেব প্রায়ই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতেন, বলতেন: "এইজন্যেই আমি লিখেছি রে যে, সব আগে চাই মানুষ হওয়া।" উত্তরকালে তাঁর মেবারপতনে তিনি এই বাণীকেই মুক্তির চরম বাণী ব'লে প্রচার করেন: "কিসের শোক করিস ভাই? আবার তোরা মানুষ হ।"

ঠাকুরদাদা তাঁর বিচিত্র জীবনের নানা ওঠাপড়ার কাহিনী প্রকাশ করেন তাঁর "আত্মজীবনী"তে। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ এ-পরম সুখপাঠ্য বইটির নবসংস্করণ প্রকাশ করেছেন। যদি বইটি পড়েন তবে শুধু যে তাঁর উদারতা ও সততার পরিচয় পেয়ে আনন্দ পাবেন তাই নয়—একটু চম্‌কেও উঠবেন সে-যুগের একটি শ্রেষ্ঠ সুধীর অপূর্ব সরলতার পাশে তাঁর আশপাশের বাঙালির নানা জটিল কুটিলতার মর্মান্তিক প্রাচুর্যে।

পিতৃদেব আমাকে প্রায়ই ঠাকুরদাদার নানা গুণবৈশিষ্ট্যের গল্প করতেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি বলতেন তাঁর সরলতা ও গীতিপ্রতিভার কথা। বলতেন: গানের দীক্ষা প্রথম তিনি তাঁর কাছেই পান ও ক্রমাগত হিন্দুস্থানি ধ্রুপদ খেয়াল শুনতে শুনতে বাল্যকালেই হিন্দুস্থানি সুরের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। কিন্তু এসব কথা মেনে নিলেও একটি কথা বলতেই হবে: যে, তিনি যে-কবিত্বশক্তি ও সুরকারুপ্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ

করেন সে তাঁর কারুর কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার নয়—অন্য ভাষায়, প্রতিভার কুষ্ঠি করা যায় না, সে চিরদিনই স্বয়ম্ভু। আর প্রতিভার মধ্যে এই অপরূপতা থাকে ব'লেই তাকে দেখবামাত্র মন গান গেয়ে ওঠে : "বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে!" তাঁর গান ও সুরকারুর সম্বন্ধে পরে একথা ফলিয়ে বলবার চেষ্টা করব।

ঠাকুরদাদার সাতটি কৃতী পুত্র ও একটি কন্যা। এঁদের মধ্যে তাঁর ষষ্ঠ পুত্র হরেন্দ্রলাল—আমার রাঙাজ্যেঠামহাশয়—পিতৃদেবের সবচেয়ে প্রিয় সহোদর ছিলেন। মালতী পিসিমাকেও তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন—তাঁর রূপলাবণ্য ও সরল স্বভাবের টানে। সরলতাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করত—উত্তরজীবনেও।

এবার তাঁর শিক্ষার কথা বলবার সময় এল—বলব যথাসম্ভব সংক্ষেপেই।

ছাত্র হিসাবে পিতৃদেব অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিশেষ ক'রে ইংরাজিতে ছিল তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি। ফলে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রে সরকারী বৃত্তি পেয়ে বিলেত যান। তাঁর দুজন সহপাঠী পরে স্বনামধন্য আইনজীবী হন—শ্রীআশুতোষ চৌধুরী ও ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। এঁরা দুজনেই পিতৃদেবের গীতিপ্রতিভার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

ইংলণ্ডে সিসেস্টার (Cirencester) কলেজে তিনি কৃষিবিদ্যায় যথাক্রমে F. R. A. S., M. R. A. C. তথা M. R. S. A. E. এই তিনটি খেতাব পান। অন্যদিকে লণ্ডনে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে Lyrics of Ind কাব্যগ্রন্থ ছাপিয়ে স্বয়ং এডুইন আর্নল্ডের ভূয়সী প্রশংসা পান।

কিন্তু "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?"—বলতেন তিনি প্রায়ই সকরুণ হেসে—"নৈলে কি কাব্যের সভ্যসভা ছেড়ে আমাকে দেশে ফিরে ডেপুটি-ডিপোর গব্যগৃহে মাথা মুড়ুতে হয়রে—ছন্দ মিল ভাব ছেড়ে পড়তে হয় খাজনা খেত খামার নিয়ে?"

সে-সময়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের হাকিমি পদবির বিষম খাতির ছিল, ম্যাজিস্ট্রেটের তো কথাই নেই। তিনি যথাকালে নিশ্চয়ই ম্যাজিস্ট্রেটও হ'তেন তেম্‌নি সহজে যেমন সহজে শুঁয়োপোকা হয় প্রজাপতি—আরো এইজন্যে যে কর্মদক্ষতা ও সততার জন্যে সাহেবমহলেও তাঁর সুনাম রটেছিল দুদিনেই। কিন্তু হ'লে হবে কি, তাঁর স্বভাবই দাঁড়ালো তাঁর পথ আগলে—কেন ও কী ভাবে বলছি একটু পরেই।

জীবিকার জন্যে তাঁকে বিদেশী রাজতন্ত্রের আমলা হ'তে হ'ল এ-দুঃখ চিরদিন তাঁর মনে কাঁটা হ'য়ে বিঁধে ছিল। এরও আদি হেতু—তাঁর তেজস্বী স্বভাব। নৈলে

তিনি অন্তত: গণ্যমান্য হাকিম হবার দরুনও কিছুটা সান্ত্বনা পেতেন। কিন্তু সান্ত্বনা পাওয়া দূরে থাকুক, তিনি যে চাকরিতে ইস্তফা দিতে পেরে উঠছেন না এ-জন্যে তাঁর আত্মগ্লানির অবধি ছিল না। মনে আছে একবার আমাকে মফঃস্বল থেকে লিখে-ছিলেন: "মনিবরা আমাকে ফের বদলি করলেন—দেবই এবার চাকরি ছেড়ে। আমি কি একটা ফুটবল না কি যে ওরা যখন যেখানে খুশি 'শূট' করে পাঠাবেন?" এই ফুটবল উপমাটি যতবারই ভাবতাম কী যে হাসি পেত!

ডেপুটি-জীবনের গ্লানির কথা প্রথম লেখেন দীনবন্ধু মিত্র তাঁর বিখ্যাত নাটক "সধবার একাদশী"তে "ঘটিরাম ডেপুটি" কেনারামের মাধ্যমে। পিতৃদেব এ-নাটকটির ব্যঙ্গ-চিত্র থেকেই বোধহয় খানিকটা প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত "ডেপুটি কাহিনী"র। এ-নক্সাটি যখন তাঁর আরো কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্রের সঙ্গে "আষাঢ়ে"-তে প্রকাশিত হয়, তখন বিদগ্ধ বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই চমকে উঠেছিলেন—যাঁদের পুরোধা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি আষাঢ়ের উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি ক'রে একটি নিবন্ধ লেখেন—যেটি পরে তাঁর "আধুনিক সাহিত্যে" গ্রথিত হয়। এতে এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন:

"এরূপ প্রকৃতির রহস্যকবিতা বাংলাসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এবং 'আষাঢ়ে'-র কবি অপূর্ব প্রতিভাবলে ইহার ভাষা বিষয় সমস্তই নিজে উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছেন।··· প্রতিভার প্রথম উদ্দাম চেষ্টা আরম্ভেই একটা নূতন পথের দিকে ধাবিত হয়··· 'আষাঢ়ে'র গ্রন্থকর্তাও যে-কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছেন সকলেরি মধ্যে তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়ত্ব প্রকাশ পাইতেছে।···তাঁহার হাস্যসৃষ্টির নীহারিকা ক্রমে ছন্দোবন্ধে ঘনীভূত হইয়া হাস্যালোকের ধ্রুব নক্ষত্রপুঞ্জ রচনা করিবে।···তাঁহার বাঙালি-মহিমা, ইংরাজস্তোত্র, ডিপুটিকাহিনী ও কর্ণবিমর্দন সর্বত্র উদ্ধৃত ও পঠিত ও ব্যবহৃত হইবার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছে।" তাই তাঁর "ডিপুটিকাহিনী" থেকে একটু উদ্ধৃত করি—তাঁর আত্মকশাঘাতের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে:

তড়বড় খেয়ে ভাত দড়বড় ছুটি'
আপিসেতে চ'লে যান নবীন ডিপুটি—
অতি এক লক্ষ্মীছাড়া ছক্কড় করিয়া ভাড়া
তাতে দুটি পক্ষিরাজ বাঁধা—
একটি লোহিতবর্ণ, অপরটি শাদা।

ক্রমে পুন্নরক হ'তে ডিপুটির ত্রাণ,
বদলি হইয়া পরে চট্টগ্রামে যান।
প্লীহা ছুটি দরখাস্ত (উপরে তা বরখাস্ত)
সেখানে যাপন চারি বর্ষ
কাজেই ডিপুটি হন ক্রমশঃ বিমর্ষ।

তথা তাঁর "বাঙালি মহিমা"-র একটু নমুনা:

খোলো ইতিহাস: সতের তুরস্ক প্রবেশিল যবে গৌড়েতে,
লক্ষ্মণসেন তো দিলেন চম্পট কচুবনে এত দৌড়েতে !
সে অপূর্ব, সুমধুর, আধ্যাত্মিক দীর্ঘপলায়ন কাহিনী
যোগ্য ছন্দোবন্ধে বোধহয় আজো ভালো করে কেহ গাহেনি।
পরে আফগান, মোগল পাঠান দলে দলে দেশ জুড়িয়া
করিল রাজত্ব—তাহাও বীরত্বে সহিল বাঙালি, উড়িয়া।
আসিল ইংরাজ। বাঙালি—লেখে তো সব ইতিহাস বহিতে—
দিল দীর্ঘ লম্ফ ইংরাজের কোলে পাঠানের কোল হইতে
করেছে সংগ্রাম মারহাট্টা, শিখ, মূর্খ যত সব মেড়ুয়া,
তুমি সূক্ষ্মবুদ্ধি সন্ন্যাসীর ম'ত—যদিও পরো নি গেরুয়া—
নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত উদাসীন হাস্যে বুঝে নিলে সব পলকে:
"ভবিতব্য-লিপি কে খণ্ডাতে পারে? কাটাকাটি ক'রে ফল কী?"

বিদেশী রাজতন্ত্রে আমলা হ'য়ে জীবিকা-উপার্জন করার দুঃখ সময়ে সময়ে তাঁর কাছে কিরকম দুর্বিষহ হ'য়ে উঠত দেখাতে আর একটি উদ্ধৃতি দেব—এবার তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ "মন্দ্র" থেকে—যার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"মন্দ্র কাব্যখানি বাংলা কাব্যসাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। ইহা নূতনতায় ঝলমল করিতেছে এবং এই কাব্যে যে-ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিচরণ করিতেছে। সে-সাহস কী শব্দনির্বাচনে, কী ছন্দোরচনায়, কী ভাববিন্যাসে, সর্বত্র অক্ষুণ্ণ। সে-সাহস আমাদের বারংবার চকিত করিয়া তুলিয়াছে, আমাদের মনকে শেষ পর্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছে।···দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলাভাষার একটি নূতন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের সেই কাজ। ভাষাবিশেষের

মধ্যে যে কতটা ক্ষমতা আছে তাহা তাঁহারাই দেখাইয়া দেন—পূর্বে যাহার অস্তিত্ব কেহ সন্দেহ করে নাই, তাহাই তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দেন। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলা কাব্যভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুতবেগে, কেমন অনায়াসে তরল হইতে গভীর ভাষায়, ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে, ইহার গতি যে কেবলমাত্র মৃদুমন্থর আবেশ-ভারাক্রান্ত নহে তাহা কবি দেখাইয়াছেন।"

এ-প্রশস্তির প্রমাণ স্বরূপ মন্দ্রের একটি কবিতা থেকে কিছু নমুনা দিই—কবিতাটির নাম "সুখমৃত্যু" :

"আমি যবে মরিব আমার নিজ খাটে গো, আয়েসে মরিতে যেন পারি,
চাকরির জন্য যেন আমার নিকটে গো, কেহ নাহি করে উমেদারি।
পাঠক ব্রাহ্মণ যেন ঝংকার না করে গো, উচ্চকণ্ঠে হুহুংকার রোলে,
শুনিতে না হয় যেন—কলহ করিয়া গো, মান ভরে ঝি গিয়েছে চ'লে।
অসহ্য উত্তাপ যদি, বাতাস করিও গো, বরফ-শীতল দিও বারি,
মশা যদি হয়—তবে খাটাইয়া দিও গো, শ্যামবর্ণ নেটের মশারি।
লেপি' চারু মাথাঘষা কবরী-কুন্তলে গো, কাছে এসে বসে যেন প্রিয়া,
একটি পেয়ালা পাই সুবর্ণ-সুরভি গো, চা খাইতে দুগ্ধ চিনি দিয়া।
রূপসী শ্যালিকা পড়ে একটি কবিতা গো, যার শীঘ্র অর্থ হয় বোধ,
গাহিতে হাসির গান যেন সে সময়ে গো, কেহ নাহি করে অনুরোধ।"

কোনো এক ডেপুটির উক্তবৎ ইচ্ছা শুনি' প্রিয়া তার কহে হেসে উঠি' :
"এত সুখ এক সঙ্গে যাহার কপালে—ওগো, সে কি কভু হইত ডেপুটি ?
এত সুখ এক সঙ্গে ! মরণ আর কি ! মরি ! কপালেতে ঝাঁটা, মুখে ছাই !
সহজ ভাষায় বলো আসল কথাটি যাহা : মরিতে তোমার ইচ্ছা নাই।"

কোনো কাব্যরসিক যদি এ-নানা-ছন্দে রচিত সুদীর্ঘ কবিতাটি একটানা প'ড়ে যান তাহ'লে তিনি স্বীকার করবেনই করবেন—যেকথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কবির অবাধ আত্মশক্তি সম্বন্ধে : "ইহা যে কেমন অনায়াসে তরল হইতে গভীর ভাষায় ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে···তাহা কবি দেখাইয়াছেন।" স্থানাভাবে কবিতাটি আদ্যন্ত উদ্ধৃত করা সম্ভব হ'ল না।

কিন্তু যা বলছিলাম—পিতৃদেবের নিরন্তর মনঃকষ্টের কথা যে তিনি জীবিকার জন্যে দাসত্ব-বন্ধন স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর একটি হাসির গানে আছে: "দাস্যের চেয়ে অনেক ভালো গলে রজ্জুবন্ধন।" মন্দ্রে আর একটি কবিতায়:

বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে
চৌদ্দ শত বর্ষ আছি পরের জুতো খেয়ে।

পরাধীনতার জ্বালা তাঁর তেজস্বী মনে কোনো দিনই নেভেনি! তাঁর হাসির গানে, প্রবন্ধে, নাটকে, কবিতায় বারবারই ফুটে উঠেছে বিদ্রোহের সঙ্গে চিত্তগ্লানি। এ-গ্লানির খবর খুব কম লোকেই রাখেন। তাই আর একটিমাত্র উদাহরণ দেব দেখাতে দেশকে তিনি কী গভীর ভালোবেসেছিলেন।

একবার তিনি কয়েকটি অগ্নিবর্ষী স্বদেশী গান বেঁধে বন্ধুদের অনুরোধে পুড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন, কেন না সেগুলি প্রকাশ হলে তাঁকে রাজদ্রোহের অপরাধে আন্দামানে দ্বীপান্তরেই শেষ জীবন কাটাতে হ'ত। তাঁহার জীবনীকার শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী লিখছেন: "কবি যখন একে একে স্বহস্তে সেই সব অনুপম গানগুলি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিতেছিলেন···তখন কহিলেন: 'দেখছ? কেমন জ্ব'লে যাচ্ছে—দেখছ? এ আগুন বাইরে যতটা জ্বলছে তার কি দশগুণও অন্তত: (বুকে হাত দিয়া) এইখানে জ্বলছে না?" (দ্বিজেন্দ্রলাল—৪০৩ পৃঃ)

আজকের যুগে অনেকে দেশভক্তিকে হীন শ্রেণীর মনোবৃত্তি ব'লে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। সুভাষ প্রায়ই হেসে বলত: "কিন্তু আন্তর্জাতিকতা শ্রেষ্ঠ আদর্শ হ'লেও আগে জাতি হ'তে হবে তো!" তাই সে প্রায়ই আমাকে বলত: "সর্বত্র তোমার বাবার স্বদেশী গান গেয়ে আমরা যে পরাধীন এ-চেতনা জাগিয়ে দাও, ছড়িয়ে দাও, দিলীপ!"

শুধু তাই নয়—সংসারে কোনো মহৎ কিছুই পাওয়া যায় না যতদিন না তার তৃষ্ণা জেগে ওঠে—যতদিন না মনে হয় তৃষ্ণার জল বিনা জীবন অবহ। পিতৃদেবের বুকে দেশের পরাধীনতার জ্বালা সত্যিই আগুনের মতন জ্বলত ব'লেই তাঁর নাটকের ও স্বদেশী গানের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতার তৃষ্ণা ও উন্মাদনা দেশবাসীর মনে চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

কিন্তু নিয়তির কী পরিহাস ভাবুন—স্বধর্মে যিনি কবি, স্বভাবে যিনি স্বাধীন, স্বরূপে যিনি উদাসী—তাঁকেও কিনা বার বার চাকরি ছাড়বার পণ নেওয়া সত্ত্বেও চিরটাকাল ঐ চাকরিতেই কায়েমি থাকতে হ'ল! মাঝে মাঝে তিনি আমাকে

বলতেন বটে যে, কলকাতা ছেড়ে কৃষ্ণনগরে তাঁর ছোট কুটিরে আশ্রয় নেবেন। কিন্তু ঐ বালক-বয়সেও আমি জানতাম—এ তিনি কোনদিনই পেরে উঠবেন না। তাঁর ছিল বহু বন্ধু, বহু গলগ্রহ, বহু দায়িত্ব—বিশেষ ক'রে আমার শিক্ষার সংস্থান করা। "চাকরি হ'ল কুরুক্ষেত্রের ব্যূহ রে মণ্টু!" বলতেন তিনি প্রায়ই করুণ হেসে—"ঢোকা সহজ, কিন্তু বেরিয়ে আসতে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ!" তাছাড়া, তাঁর যে-নিয়তি তাঁকে একদিকে বেঁধেছিল চাকরিতে, সে-ই তাঁকে ক্ষতিপূরণ এনে দেয়নি কি—সাহিত্যে, সামাজিকতায়, সর্বোপরি "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" নীতির অঙ্গীকারের আনন্দে?

নিয়তি আর একদিক দিয়েও তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন: তিনি বিবাহে পরম সুখী হয়েছিলেন—মনের মতন সহধর্মিণী পেয়ে। আমার মাতৃদেবীর নাম ছিল সুরবালা। পিতৃদেব তাঁকে প্রায়ই সপরিহাসে বলতেন: "এ তো নাম নয়—উপাধি, আহা রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী যাকে বলে। ক্ষণজন্মা।" পরে পিতৃদেব এই ক্ষণজন্মা ব'লে ঠাট্টা করার জন্যে আক্ষেপ করতেন প্রায়ই—যখন মাত্র সাতাশ বৎসর বয়সে মার হঠাৎ মৃত্যু হয়। কিন্তু সে যাক, তাঁর বিবাহের কথা একটু বলি।

মা-কে দেখে পিতৃদেব বিবাহের প্রস্তাব করেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে, কেবল বলেন যে কন্যাকে একটি টাকাও যৌতুক দিলে তিনি বিবাহ করবেন না। আমার মাতামহ নিযুতপতি হওয়া সত্ত্বেও এ কথা শুনে যে বিষণ্ণ হননি—আশা করি বলতে হবে না?

মা-র প্রথম সন্তান আমি জন্মাই ২২শে জানুয়ারী, ১৮৯৭—ওরফে ১০ই মাঘ, ১৩০৩ সালে। বছর দুই পরে আসে আমার বোন মায়া। কী ফুটফুটে মেয়ে! সবাই বলত মেমসাহেব! আমাকে কালো দেখাত ব'লে পারৎপক্ষে আমি তার পাশে দাঁড়াতাম না। পিতৃদেব খুব একগাল হাসতেন আমার অভিমান দেখে।

আমার বয়স যখন ছয় তখন মার হঠাৎ মৃত্যু হয়। তখন আমি অবশ্যই বুঝতে পারিনি—কী হারিয়েছিলাম, কিন্তু একটু বড় হ'য়ে যখন বুঝতে শিখি তখন বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠত যখন পিতৃদেবের "আলেখ্যে" পড়তাম তাঁর "মাতৃহারা" কবিতাটি:

বুঝিস না তুই নিজের দুঃখ ওরে সুখী বালক,
তাই তো আছিস সুখে।

বিজ্ঞ আমি বুঝি সূক্ষ্ম, বুঝি বেশি, তাই এ-দুঃখ
বেশি বাজে বুকে।
তুইও বুঝবি বড় হ'লে—মনে পড়বে যখন
ছেলেবেলার কথা,
মায়ের যত্ন, মায়ের সেবা—সর্বদা, সর্বথা।
নিজের মাকে আদর ক'রে ডাকবে যখন কেহ,
তখন রে তোর মনে পড়বে—বিশ্বজগৎ হ'তে
লুপ্ত মাতৃস্নেহ।
তখন পড়বে মনে
তুইও একদিন "মা মা" ব'লে ডাকতিস্ কোনো জনে।
হা রে শিশু, এই কথাটি বড়ই বাজে প্রাণে—
যে, তোর কাছে এমন এই যে মধুর মা শব্দটি
শুদ্ধ অভিধানে!

আরও যখন বড় হই তখন কল্পনায় খানিকটা বুঝতে শিখি—তাঁকে কী দুঃখ পেতে হয়েছিল আমার মাতৃদেবীর বিয়োগে, পড়তে চোখে জল আসত (আলেখ্য—বিপত্নীক):

শ্রান্তদেহে সন্ধ্যাকালে ফিরে এসে যখন
আপন ঘরে যাব,
কাহার কাছে বসব এসে তখন আমি? কাহার
মুখের পানে চাব?
ক্ষুদ্র দুঃখ-সুখের কথা কইব আমি এখন
কাহার কাছে এসে?
যাহার কাছে কইতাম নিত্য—গৃহ আঁধার ক'রে
চ'লে গিয়েছে সে।...
তবু তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে জানি
ভ'রে তোমার বুক,
হেথায় অনেক স্বামীর ভাগ্যে ঘটে না সর্বদা
যে-সৌভাগ্যটুক।

পরে তিনি আরো কয়েকটি মর্মস্পর্শী কবিতা লিখেছিলেন মাতৃদেবীর উদ্দেশে (ত্রিবেণী, সোনার স্বপ্ন) :

সেযে গেছে আমার মর্মপটে ছায়ার মত ভেসে,
সেযে গেছে আমার হৃদয়তটে ঢেউয়ের মত এসে !
তারে নয়ন ভ'রে দেখেছিলাম প্রাণের ভিতর রেখেছিলাম
রক্ত দিয়ে ঘিরে :
ঘুমের সিংহাসনে বসিয়েছিলাম সোনার স্বপ্নটিরে।

যখন মগ্ন আছি সুখের নীড়ে স্বপ্ন গেল টুটে,
হঠাৎ বীণার তারটি ছিঁড়ে গেল আর্তনাদে উঠে।
এখন রহি সন্ধ্যার গভীর গানে বীণার স্বরে, কবির তানে
চেয়ে নিরবধি :
সেই স্বপ্ন আমার যুগের ঘুমে একবার আসে যদি !

পিতৃদেব দুঃখ পেয়ে হাসি ছেড়ে মোড় নিলেন কাব্য, নাটক, গানের দিকে। তাঁর বিকাশের ইতিহাস এ-স্মৃতিচারণের উপজীব্য না হ'লেও তাঁর বিকাশ আমার বিকাশের কীভাবে সহায় হয়েছিল বোঝাতে তাঁর জীবনী নিয়ে স্থানে স্থানে আলোচনা করতেই হবে। তবে এ-বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে লিখেছি আমার "উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল" গ্রন্থে—যদিও তাতে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার সব কথা বলা হয়নি। হয়ত পরে লিখব কোনোদিন—কে জানে ? যদি লিখি তবে সব আগে লিখব তাঁর কবিত্বের কথা। কারণ আমার মনে একটা খেদ এখনো আছে যে, তিনি আজো বাঙালির কাছে তাঁর আশ্চর্য কবি-প্রতিভার যোগ্য মর্যাদা পাননি। তবে সুখের বিষয় এখন হাওয়া একটু ফিরেছে, তাই শ্রীসজনীকান্ত দাস সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত "দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলীর" ভূমিকায় লিখেছেন : "আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার রচনা পঠিত হইলেই তিনি যথার্থ মর্যাদা লাভ করিবেন, ইহার জন্য গুরুগম্ভীর বিতর্কমূলক আলোচনা বা মুখবন্ধের কোনোই প্রয়োজন নাই। তাঁর বিপুল সাহিত্যকীর্তির এই নিদর্শনগুলিই তাঁহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিবে।" তাই ফিরে আসি স্মৃতিচারণে।

মাতৃদেবীর অকালমৃত্যুর পরে তিনি আমাদের যে কী সদাসজাগ স্নেহে

লালন করেছিলেন তার বর্ণনা অসম্ভব। তাই এ-বিষয়ে শুধু আমার একটি কীর্তনের কতিপয় চরণ উদ্ধৃত ক'রেই ক্ষান্ত হব :

এমনি স্মরণে জাগালে পরাণ !—
ভুলালে—যা কিছু ছিল স্মরণে।
কী পেয়েছি তার কী গাহিব গান !
কী দিয়েছ হায় কহি কেমনে ?
না চাহিতে যে গো সকলি মিলিল—
অহেতুক প্রেম দিলে গহনে।

অবশ্য সব প্রেমই আসলে অহেতুক—কিন্তু তবু যখন তাকে চিনি তার অহৈতুকী মহিমায় তখন মন গান গেয়ে ওঠেই ওঠে :

"ছিল না যাহার কোনো দাবিদাওয়া
তারে দিলে তব চিরন্তনে !"

আমার শৈশব বাল্য ও কৈশোরের কথা যখন ভাবি তখন সব আগে তাঁর কথাই মনে পড়ে: শুধু স্নেহময় পিতা বলে নয়, বন্ধু, সাথী, উপদেষ্টা, দিশারি—কী নয় ? আর কী ভাবে তিনি শিক্ষা দিতেন—আজ যতই পর্যালোচনা করি ততই আশ্চর্য হই। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন—সত্যিকার গুরুর কাজ শিক্ষা দেওয়া নয়, জাগিয়ে দেওয়া (not to instruct but to awaken): পিতৃদেব এ-হিসেবে ছিলেন একজন যথার্থ গুরুই বলব। তাই তিনি আমাকে দেখতে শেখাতেন উপদেশ দিয়ে তত নয় যত নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে। যেখানে সাহায্য না করলে নয়—এগিয়ে আসতেন বৈকি, কিন্তু তাঁর একটি প্রায়োক্তি আমি কোনোদিনই ভুলব না : "নিজের পায়ে যে দাঁড়াতে শেখে তারই নাম মানুষ রে মণ্টু !"

তাই তো তিনি পারৎপক্ষে আমার পড়াশোনা সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ দিতেন না। বইয়ের জগতে আমি ছিলাম স্বভাবে সর্বভুক্—ভালোবাসতাম পুরাণ মহাভারত নাটক নভেল জীবনী ডিটেকটিভ উপন্যাস—কী নয় ? পিতৃদেবের সব আলমারিই খোলা থাকত—যে-কোনো বই-ই আমি পড়তে চাই না কেন, তিনি বাধা দিতেন না। ইংরাজি না প'ড়ে পড়তাম অনুবাদ মিলিয়ে সংস্কৃত—তিনি বলতেন খুশি হ'য়ে : "বহুৎ আচ্ছা, ইংরাজি পরে শিখে নিবি তুই দুদিনে—ভাবনা কী ?" স্কুলপাঠ্য বই না প'ড়ে পড়তাম কবিতা, তাতেও তাঁর সায় ছিল পুরোপুরিই। বলতেন বন্ধুদের : "ওর রুচি যখন ঠিক দিকেই চলেছে—তখন বাধা দেব কেন ?

অনেক পড়তে পড়তে ও নিজেই বেছে নেবে যা যা ওর মনকে গ'ড়ে তোলার সহায়—বাকি সব ঝ'রে প'ড়ে যাবে।"

তাঁর এ আশ্চর্য উদার—লিবারল—শিক্ষার ফল আমার মনে কীভাবে সক্রিয় হয়েছিল সে-সম্বন্ধে আমার অনেক কিছুই লিখবার ইচ্ছা আছে, যদিও ঠিক যে কীভাবে লিখব ভেবেচিন্তে ঠিক করতে পারি নি এখনো। কলম তো ধরেছি, দেখিই না কেন সে কোথায় নিয়ে যায়!

কিন্তু তাঁর একটি শিক্ষা ছিল এতই জোরালো যে তাকে দীক্ষা বলাই ভালো। সেটি হ'ল সত্যনিষ্ঠা। উত্তরকালে বুঝতে পারি—কেন তিনি আমার বালকমনের মাটিকে কর্ষণ করতেন এই তীক্ষ্ণ উপদেশের লাঙল দিয়ে: "আর যাই করিস বাবা, দুটি কাজ করিস নি: মিথ্যাচার আর খোশামোদ।" সেই সঙ্গে বলতেন প্রায়ই: "আর একটি কথা সর্বদাই মনে রাখিস—যে, ঠিকে-ভুল হ'লে ভয় নেই যদি সত্যনিষ্ঠা থাকে, কিন্তু সত্যে যদি আঁট না থাকে তবে শেষে দেউলে হ'তেই হবে। কারণ জীবনের বনিয়াদই সত্য—তাকে ছাড়লে দাঁড়াবি কোথায়?" ব'লে প্রায়ই আওড়াতেন মহাভারতের একটি শ্লোক:

"ন চ সত্যাৎ পরো ধর্মো নানৃতাৎ পাতকং মহৎ।
ধর্মস্য হি স্থিতিঃ সত্যং তস্মাৎ সত্যং ন লোপয়েৎ॥

অর্থাৎ

নাই সত্যের সমান ধর্ম, মিথ্যার ম'ত পাতক নাই
ধর্মের স্থিতি সত্য, কোরো না সত্যের অপমান হে তাই।

তাঁকে যাঁরা কাছ থেকে জানতেন তাঁদের সকলেরি দৃষ্টি পড়ত সর্বপ্রথম তাঁর এই সত্যনিষ্ঠার 'পরে। কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন—"এ আর এমন নতুন কি? সত্য কারই বা উপাস্য নয়?" কিন্তু যাঁরা যথার্থ সত্যনিষ্ঠ তাঁরা বলবেন না একথা, কেন না তাঁরা জানেন হাড়ে হাড়ে সত্যকে মনে-প্রাণে উপাস্য করে কত কম মানুষ।

পিতৃদেব ছিলেন এই সংখ্যালঘিষ্ঠদের অন্যতম। এর জন্যে তাঁকে বহু দুঃখ পেতে হয়েছে। যা তিনি উচিত মনে করতেন ব'লে ফেলতেন ব'লে অনেক বন্ধুই তাঁর শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন সেই প্রকৃতির মানুষ যে নিজের হাজারো সুবিধার জন্যেও কারুর মন-রাখা কথা বলতে পারে না। তিনি বলতেন

প্রায়ই: "সত্যকে শুধু স্বীকার করা নয়—চাই অঙ্গীকার করা—নৈলে আর যাই হওয়া যাক না কেন সত্যনিষ্ঠ হওয়া যায় না।"

তাঁর মুখে শৈশবেই এই সত্য-স্তুতি শুনতে শুনতে আমার মনে সত্য সম্বন্ধে এক ধরনের শুচিবাই জন্মে গিয়েছিল। তাই আমি ব্রাহ্মদের মতন কোনো কিছুই "করব" বলতাম না, "করতে চেষ্টা করব" ব'লে চাইতাম পার পেতে—"কথা দিইনি তো" এই সাফাই গেয়ে।

পরের জীবনে এ-ধরনের কৌশল অবলম্বন করি নি বটে, কিন্তু এ-বিশ্বাস আমার মনে সেই যে শৈশবেই শিকড় গেঁথেছিল সে-মূল বিশ্বাস কোনোদিনই শিথিল হয় নি। তাই যখন প্রথম হরিদ্বারে যাই তখন গঙ্গার ঘাটে বড় বড় হরফে লেখা এই শ্লোকটি দেখে খুশি হই যে "ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ" অর্থাৎ ধর্মকে রাখলে সে রাখে। আমি শুধু এটির পাঠান্তর উদ্ধৃত করতাম: "সত্যং রক্ষতি রক্ষিতম্।"

কিন্তু সত্য বা ধর্ম সব সময়েই রক্ষা করে কি না এ-সংশয় মানুষের মনে নানা সময়েই উদয় হয় বৈকি। পিতৃদেব যখন তাঁর সত্যনিষ্ঠার জন্যে ভুগতেন তখন তিনিও এ-সংশয়ের ফেরে পড়তেন। চাকরিতে ঢুকে তাঁকে সত্য কথা বলার জন্যে যখনই বেগ পেতে হ'ত তখনই তিনি চাকরি ছেড়ে দেব দেব করতেন আর ভাবতেন—চাকরি ছেড়ে দিলে বায়ুভুক হ'য়ে এ-যুগের সত্য-তপস্বীরা বাঁচে কি না। কথাটা অত্যুক্তি নয়। শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরীর "দ্বিজেন্দ্রলাল" গ্রন্থে দেখতে পাবেন (২৪১ পৃষ্ঠায়) যে, তদানীন্তন লেফটেনাণ্ট গভর্নর সার চার্লস ইলিয়টের সঙ্গে জমির জরিপ সংক্রান্ত আইন নিয়ে পিতৃদেবের দারুণ বিতণ্ডা হয়। পিতৃদেব সত্যনিষ্ঠ হ'য়ে তাঁর মুখের উপর সাফ ব'লে দেন যে, ছোট-লাটসাহেব বাংলা দেশের জরিপের আইনজ্ঞ নন ব'লেই পিতৃদেবের রায়কে নাকচ করতে চাইছেন। সে-যুগে এক সামান্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষাৎ ছোটলাটকে আইন-অনভিজ্ঞ বলায় তিনি রেগে আগুন হ'য়ে তাঁর প্রমোশন বন্ধ ক'রে দেন। ফলে দ্বিজেন্দ্রলাল এক প্রকাশ্য সভায় ব্যঙ্গ-ভাষণ দেন যে, Honesty is not the best policy. স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চ'টে-ম'টে তাঁকে তলব করেন। পিতৃদেব অচল অটল—কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের ধৈর্য ট'লে গেল। অথ কর্তারা স্থির করলেন তাঁকে পদচ্যুত না করলে আর মান থাকে না। তবে এই সময়ে ব্যাপারটা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়—ও জজসাহেব পিতৃদেবের স্বপক্ষেই রায় দেন। সার চার্লস তখন ক্ষেপে গিয়ে তাঁর নামে শ্রমবিমুখতার অভিযোগ

আনেন। কিন্তু এযাত্রা ধর্মের কল বাতাসে নড়েছিল—যদিও একটু দেরিতে। একদিকে কলিয়ার সাহেব সার চার্লসকে বলেন: "I think Mr. Roy is right," অন্যদিকে পিতৃদেবের উপরিতন আর এক সাহেব রিপোর্ট দেন: "Mr. Roy is a monument of industry and ability." দেখুন মজা ইংরেজের: সে-সময়েও কোনো কোনো আই-সি-এস উপরওয়ালা fair play-তে বিশ্বাস করতেন বৈকি—নৈলে পিতৃদেবকে রাতারাতি ডিশমিশ করা হ'তই হ'ত। কিন্তু তবু তিনি অনাহত ছিলেন বলা যায় না—কেননা তাঁর প্রমোশন রদ হ'যে গেল তো! আর কেন রদ হ'ল? না, তিনি যে-সত্য নিয়ে লড়েছিলেন সে সত্য ছিল ছোটলাট সাহেবের কাছে অপ্রিয় সত্য। পিতৃদেব এই নিয়ে নানা সময়েই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেন, বলতেন: "মনু মুনি ছিলেন শেয়ানা রে মন্টু! তাই বিধান দিয়েছিলেন: মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।"

তিনি চাকরিতে দুঃখ পেয়েছিলেন অজস্র, কিন্তু ভগবান্ একহাতে মারেন অন্য হাতে রাখেন, তাই ক্ষতিপূরণ পেলেন—তাঁর সাহিত্যে, প্রহসনে, নাটক-নাটিকায়, সর্বোপরি গানে।

এবার তাঁর গানের কথা কিছু বলি—বলবার সময় এসেছে ব'লেও বটে—বিশেষ ক'রে তাঁর সুরকারুর স্বকীয় প্রতিভার কথা।

পিতৃদেব সুগায়ক ছিলেন একথা বলা চলে শুধু এই হিসেবে যে, তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল দরাজ ও মধুর। কিন্তু গানে তাঁর গলা অল্প স্বল্প খেললেও তিনি "গাইয়ে" বলতে যা বোঝায়—অর্থাৎ সুরের হাওয়ায় উড়ে চলা যার স্বধর্ম—তা তিনি ছিলেন না যেমন ছিলেন ধরুন সুরেনমামা। সুরেনমামার সুরবিহারের পদ্ধতি ও খেয়ালের চাল থেকে তিনি অনেক কিছু আত্মসাৎ করেছিলেন তাঁর খেয়াল-ভঙ্গিম বাংলা গানে সুর দেওয়ার সময়ে: যথা, "চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্য গগনে" (ইমন), "সকলব্যথার ব্যথী আমি হই" (বাগেশ্রী), "তোমারেই ভালোবেসেছি" (কানাড়া) ইত্যাদি। সুরেনমামা এ-গানগুলি শুনে খুব বাহবা দিতেন—পিতৃদেবের সুরযোজনা-প্রতিভার তিনি সত্যিই একজন বিশিষ্ট সমজদার ছিলেন। কিন্তু তিনিও কোনোদিন আবছাভাবে ছাড়া বুঝতে পারেন নি যে পিতৃদেব স্বধর্মে ছিলেন সুরকার—এবং প্রথম শ্রেণীর সুরকার।

কিন্তু সে সময়ে সুরকার শব্দটি চালুই হয় নি—তা পিতৃদেব "সুরকার" উপাধি পাবেন কোত্থেকে? এ শব্দটি আমিই প্রথম ব্যবহার করি আমার "সাঙ্গীতিকী"তে—রবীন্দ্রনাথের সমর্থন নিয়ে—Composer অর্থে (Improvisation অর্থে সুরবিহার

শব্দটিও আমিই প্রথম ব্যবহার করি—যদিও এ-শব্দটি বাংলাভাষায় এখনো পুরোপুরি গৃহীত হয়েছে ব'লে মনে হয় না। না হোক, একদিন হবেই হবে—যখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ-দুটি শব্দই গ্রহণীয় ব'লে অঙ্গীকার করেছিলেন)।

কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর আগে যখন পিতৃদেব তাঁর রকমারি গানকে রকমারি সুরে বসিয়ে গাওয়া সুরু করেন তখন তাঁর গানে বিদগ্ধ বাঙালি বিশেষ আকৃষ্ট হ'লেও এ-চেতনা তাঁদের মধ্যে ব্যাপকভাবে জেগে ওঠে নি যে এরি নাম Composition, এবং পিতৃদেবের অন্যতম উপাধি—Composer, পরে শুনতে শুনতে তাঁর সুরবৈশিষ্ট্যের মর্মজ্ঞ হওয়ার অনুপাতে তাঁরা তাঁর সুরকার-প্রতিভার গুণগ্রাহী হ'তে আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু মনে আছে—আমার যৌবনেও লোকে তাঁকে নাট্যকার তথা হাস্যরসিক ব'লেই মানত, তাঁকে সুরকার উপাধি দেওয়ার কথা কারুর মনেই উদয় হয় নি, কারণ—ঐ যে বললাম—সুরকার বলতে ঠিক যে কী বোঝায় সে-চেতনা তখন সবেমাত্র আমাদের জাতীয় মনে জাগতে সুরু করছে—পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। কেন করে নি—সে সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা আজ বলব।

আমাদের বাংলাদেশে তিন শ্রেণীর গায়ক বহুদিন থেকেই সমাদৃত : কীর্তনী, বাউল ও বৈঠকী গায়ক ওরফে ওস্তাদ বা কালোয়াৎ। পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগে কীর্তন বাউল সচরাচর অবজ্ঞাত হ'ত, সম্মান পেতেন ওস্তাদ কালোয়াৎ—ধ্রুপদী ও সঙ্গীতজ্ঞ মহলে খেয়ালী। হিন্দি টপ্পা ঠুংরির তখনো প্রবর্তন হয় নি বাংলাদেশে। স্পষ্ট মনে আছে মৈজুদ্দিন খাঁর বিখ্যাত দেশ ঠুংরি "পিয়া বিন নাহি আওত চৈন" গ্রামোফোনে শুনে আমরা খুশি হতাম নতুন ধরণের গান ব'লে। এরি নাম যে ঠুংরি—জানি অনেক-পরে এবং বাংলাদেশে ঠুংরির প্রচার করি সবপ্রথম আমি-ই অতুলপ্রসাদের নানা ঠুংরি বাংলা গান সর্বত্র গেয়ে। অতুলদা সকৃতজ্ঞেই একথা স্বীকার করতেন, প্রায়ই বলতেন : "দিলীপ বাংলা গানে ঠুংরি সুর বসাই হয়ত আমিই সবপ্রথম, কিন্তু তুমি গান গেয়ে সেগুলি বাংলাদেশে ছড়িয়ে না দিলে কেউ চিনতই না এ-সব ঠুংরি গানের মাধুর্য।" এ সম্পর্কে পরে আরো বলব অতুলপ্রসাদের স্মৃতিতর্পণে।

কিন্তু পরে যখন বাংলায় হিন্দি-ঠুংরি গান অল্প স্বল্প চালু হয় তখন প্রথম দিকে আমি ভেবেছিলাম যে এরি নাম নব সুরসৃষ্টি। সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথই আমার এ-ভ্রম সংশোধন করেন, বুঝিয়ে বলেন—কেন হিন্দি ঠুংরি গায়ককে সুরকার উপাধি দেওয়া যায় না। তিনিই আমাকে নানা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে, গানে সুরকার হ'তে হ'লে সে-গানের মধ্যে সব আগে থাকা চাই একটি বিশিষ্ট সুরস্বাতন্ত্র্য। আমি

প্রথম প্রথম এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করলেও সত্যনিষ্ঠ ছিলাম ব'লে পরে ভুল স্বীকার করি এ-কথা মেনে যে এমনকি আমাদের এ-যুগের কীর্তনীয়ারাও সুরকার পদবী পেতে পারেন না—বাউলরা তো নয়ই—যেহেতু তারা প'ড়ে-পাওয়া সুর শিখেই গেয়ে বেড়াত গ্রামে গ্রামে। পাঁচালি কথকতা জাতীয় গানের বেলায়ও ঐ কথা: নব সুরসৃষ্টির কোনো স্বাতন্ত্র্যই সেসব গানে ফুটে উঠত না। ওদিকে তানসেন বৈজুবাওরা গোপাল নায়ক প্রমুখ হিন্দি সুরকারদের ধ্রুপদ, সদারঙ্গ আধারঙ্গের খেয়াল, শোরির টপ্পা তথা কদর পিয়ার ঠুংরি রসে গায়কেরা নানা তানবিস্তার সৃষ্টি করলেও নতুন এমন কোনো "বন্দেশ"-এর আমদানি করেন নি যার গৌরবে তাঁরা "সুরকার" শিরোপা দাবি করতে পারতেন। রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালি, সারি প্রভৃতি গ্রাম্য গানের সুরও নিজের নিজের চলতি খাতেই ব'য়ে চলত—গানের জাতিধর্মকেই ফুটিয়ে তুলে—সুরবৈশিষ্ট্যকে নয়।

সুরকার বলতে কী বোঝায় এবং তাঁর কৃতিত্ব ঠিক কোন্‌খানে প্রথম বুঝতে শিখি আমরা দুজন প্রতিভাধরের সুরকারুর স্বাদে: রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল। (অতুলপ্রসাদ তখন সবে উদীয়মান—উদিত তারকা নন।) রবীন্দ্রনাথ নানা সভায় তাঁর নানা স্বদেশী তথা প্রেমের গান গেয়ে গীতিরসিকদের মন মাতানো সুরু করেন। দ্বিজেন্দ্রলালও ঐ সময়েই তাঁর সুর রচনা করে বহু সুরজ্ঞকে মুগ্ধ করতে আরম্ভ করেন, বিশেষ করে তাঁর আর্যগাথায় প্রকাশিত কয়েকটি শ্রুতিমধুর গানের সুরের জৌলুষে, যথা—গগন ভূষণ তুমি, হৃদয়ের আলো তুইরে সতত, চাহি অতৃপ্ত নয়নে, কী দিয়ে সাজাব মধুর মূরতি···ইত্যাদি। এর পরে তিনি তাঁর প্রবল প্রাণশক্তির প্রেরণায় সুর দিয়ে গাইতে আরম্ভ করেন তাঁর বিখ্যাত যুগপ্রবর্তক "হাসির গান"।

হাসির গানেই প্রথম তাঁর নাম হয় বললে ভুল হবে না। কিন্তু তাঁর হাসির গানের পদাবলীতে সে-যুগের সাহিত্যিকেরা মুগ্ধ হ'লেও গায়কেরা তখনো বুঝতে পারেন নি হাসির গান সুরের দিক দিয়েও কী ভাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রথম দিকে তিনি নানা ইংরাজি ও আইরিশ গানের তর্জমা ক'রে গাইতেন, যেমন, কেউ কেউ করে হায় (Some folks), যখন নীলিমা জলধি হৃদয়ে (Rule Britannia), কেউ কিনবি না মোর ফুলগুলিরে (Won't you buy my pretty flowers), প্রাসাদে বিলাসে ভাই যেথাই বেড়াই (Home, sweet home) ইত্যাদি।

কিন্তু এসব গান ছিল চলনে বলনে টলমলে শিশুর হাঁটা বা আধ আধ ভাষের মতন। তাঁর সুররচনার প্রতিভা তার স্বমহিমায় দ্যুতিমান্ হ'য়ে ওঠে প্রথমে তাঁর

হাসির গানে—যখন হাসির গানে তিনি বিদেশী স্থরভঙ্গির চাল আমদানি করে স্বদেশী স্থরের এক নব ভঙ্গির প্রবর্তন করলেন। তার পরে যথাক্রমে তাঁর স্বদেশী গানে, প্রেমের গানে ও ভক্তির গানে তিনি নিজের স্থরকারুকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে স্বনামধন্য হ'য়ে ওঠেন দেখতে দেখতে।

এ-সব গানেই যে-অভিনব আর্ট সে-যুগেও গীতিরসিকদের চমকে দিয়েছিল—সে হ'ল এদের মধ্যে বাঙালি হৃদয়ের সহজ মাধুর্যের সঙ্গে বিলিতি গানের প্রবল প্রাণশক্তির সমন্বয়। হাসির গানেই এ-প্রাণশক্তির প্রথম স্ফুরণ হয় ব'লে তাঁর নন্দলাল, পাঁচশো বছর, গীতার আবিষ্কার, বিলাতি দেশটা মাটির প্রভৃতি বহু গানেই স্থরের আশ্চর্য বলিষ্ণুতা সকলেরই মনকে সচকিত ক'রে তুলত। ১৯৪২ সালে কাশীতে প্রবাসী বাঙালি সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে আমি পিতৃদেবের "নন্দলাল" ও "যদি জানতে চাও আমরা কে" গান দুটি গেয়ে দুর্দান্ত নাম করি। কিন্তু উহুঁঃ, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সে-সভায়, বললেন: "গাইলে চমৎকার বটে দিলীপ, কিন্তু তোমার বাবার মতন মাতিয়ে দিতে পারলে না—হাসতে হাসতে সবাইযের বুকে পিঠে খিল ধ'রে গেল কই?"···ইত্যাদি।

এই বুকে-পিঠে খিল ধ'রে যাওয়ার অভিজ্ঞতাই শ্রোতাদের হ'ত যখন তিনি দাঁড়িয়ে উঠে গাইতেন: "হো, বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নবরত্ন নভাই," কি "এবার হয়েছি হিন্দু করুণাসিন্ধু গোবিন্দজিকে ভজি হে", কি "হোলো কী এ হোলো কী এ তো ভারি আশ্চয্যি!" আমি ও মায়া তাঁর কোনো কোনো হাসির গানে দোয়ার দিতাম আর শ্রোতারা হাসতে হাসতে সত্যি সত্যি গড়িয়ে পড়ত।

কিন্তু তখনো কেউ আঁচ পায় নি যে তিনি গান-বাঁধা ও স্থর-দেওয়ার সহজাত ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছিলেন খানিকটা পৌরাণিক কবচকুণ্ডলের ম'ত। অর্থাৎ হাসির গানে তিনি ব্যঙ্গকবি (satirist) উপাধি পেলেও "স্থরকার" উপাধি পান নি।

বলতে গেলে, তিনি যে একজন অসামান্য স্থরকার এ-সত্যটি বাঙালির মনে ঝল্‌কে ওঠে সব প্রথম তাঁর "বঙ্গ আমার জননী আমার" গানে। তাই এ-গানটি সম্বন্ধে কয়েকটি ঐতিহাসিক কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পিতৃদেবের জীবনীকার শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী যখন গয়াতে আমাদের এখানে এসে পিতৃদেবের অতিথি হ'য়ে কিছুদিন ছিলেন সেই সময়েই পিতৃদেব "বঙ্গ আমার" গানটি বাঁধেন। দেবকুমারবাবুর ভাষায়ই একটু উদ্ধৃত করি তাঁর "দ্বিজেন্দ্রলাল" থেকে (৪৭৭—৪৭৯ পৃঃ):

"একদিন—বোধ হয় অষ্টমী পূজার দিন—দুপুর বেলায় আহারান্তে বসিয়া আছি, কবিবর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন : 'দেখ, আমার মাথার মধ্যে কয়েকটা লাইন ভারি জ্বালাতন করছে। তুমি একটু বোসো ভাই—আমি সেগুলি গেঁথে নিয়ে আসি।' একটু পরে তিনি এসে আমাকে একটা ধাক্কা দিয়া কহিলেন : 'উঃ! কী চমৎকার গানই বেঁধেছি, শোনো—' এই বলিয়া গাইয়া উঠিলেন : "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার আমার দেশ"···হাততালি দিতে দিতে ঘরময় নাচিয়া নাচিয়া আবার গাইতে লাগিলেন :

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ।
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন : 'আমার দেশ!'

"পরদিবস প্রাতে জেলা-জজ সুকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয় সহসা আসিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের অতিথি হইলেন। সেদিনও সন্ধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের অনুরোধে সে-গানটি গাহিয়া শুনাইলেন। গান শেষ হইয়া গেল···সহসা শ্রীলোকেন্দ্রনাথ পালিত কবির করদ্বয় পীড়ন করিতে করিতে কহিলেন :

"Oh! how wonderful—how magnificent! Let me confess, my dear Diju, it's undoubtedly the very very very best and noblest national song I' ve ever heard or read in my life."

আমার বয়স তখন নয় কি দশ, কঠিন সুরও গাইতে পারতাম বেশ সহজেই, "বঙ্গ আমার"-এর সুর তো জলের মতন সহজ। মায়া ও আমি উভয়েই তাঁর সঙ্গে গানটি গাইতাম—যেমন গাইতাম তাঁর আরো অনেক গান। পিতৃদেব এ-গানটির শেষ চরণে লিখেছিলেন, "আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা হৃদয়রক্ত করিয়া শেষ।" কিন্তু দেবকুমার কাকা, লোকেন কাকা ও বরদাবাবু তিনজনেই বললেন যে সে-ঘোর বোমা-বিপ্লব ধরপাকড়ের যুগে এ-লাইনটি ছাপলে রাজদ্রোহের অপরাধে তিনি ডিশমিশ তো হবেনই, হয়ত দ্বীপান্তরও হ'তে পারেন। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিতৃদেব এ-চরণটির শেষার্ধ বদ্‌লে "মানুষ আমরা নহি ত মেষ" লেখেন। এজন্যে তাঁর মনে চিরদিন খেদ ছিল।

এই সময়ে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র গয়ায় এসে পিতৃদেবের গান শুনে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পরে দেবকুমারবাবুকে লিখেছিলেন (দ্বিজেন্দ্রলাল —৪৭৫ পৃঃ।)

"কয়েক বৎসর পূর্বে একবার গয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে

দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে তাঁর কয়েকটি গান শুনাইয়াছিলেন। সেদিনের কথা কখনও ভুলিব না। নিপুণ শিল্পীর হস্তে আমাদের মাতৃভাষার কী যে অসীম ক্ষমতা সেদিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।·· ধরণী এখন দুর্বলের ভার বহনে প্রপীড়িতা।···বর্তমান যুগে বীর্য অপেক্ষা ভারতের উচ্চ ধর্ম নাই। কে মরণ-সিন্ধু মন্থন করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে? ধর্মযুদ্ধের এই আহ্বান দ্বিজেন্দ্রলাল বজ্রধ্বনিতে ঘোষণা করিতেছেন।"

বহু বৎসর পরে—বোধহয় ১৯২০ কি ২১ সাল—তাঁর সঙ্গে আবার দেখা লণ্ডনে—তখন তিনি সানন্দে আমাকে বলেছিলেন "গাও হে গাও তোমার বাবার বঙ্গ আমার, ভারত আমার। আহা কী গানই তিনি লিখে গেছেন! অমর—অমর!" ···ইত্যাদি।

আচার্য বসু অত্যুক্তি করেন নি। পিতৃদেবের স্বদেশী গান কিছুদিনের মধ্যেই বাংলার গ্রামে গ্রামে সপ্ত কোটি কণ্ঠে না হোক, হাজার হাজার কণ্ঠে বিধ্বনিত হ'য়ে উঠেছিল।

বহু বৎসর পরে স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দুটি স্বদেশী গান—"ভারত আমার ভারত আমার" ও "যেদিন সুনীল জলধি হইতে"—ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। এ-গান দুটি আমি ১৯৫৩ সালে আমার বিশ্বভ্রমণের সময় সর্বত্রই গেয়েছিলাম ও পেয়েছিলাম শ্রোতাদের উচ্ছ্বাসের সাড়া। কিন্তু সেকথা যথাস্থানে, আপাতত বলি তাঁর কাছে কী ভাবে প্রথমে গানের দীক্ষা হয়েছিল।

প্রথম দিকে তাঁর প্রিয় গানের মধ্যে পঞ্চাশ ষাটটি গান আমি গাইতাম। নানা শ্রোতা এলে পিতৃদেব পুত্রগর্বে উৎফুল্ল হ'য়ে বলতেন: "শোনো হে, কী অদ্ভুত গায় আমার শিবরাত্রির সলতেটি। গা তো!"

আমাকে আর পায় কে: "কী গাইব?"

"আঃ যা ইচ্ছে গা না—শুনিয়ে দে তোর তান।"

সে-সময়ে আমার তানবাজির গুমরে আমি ধরাকে সরা জ্ঞান করতাম বললেই হয়। বহু বৎসর পরে কবিবর অতুলপ্রসাদ সেনের মুখে এই প্রসঙ্গে পিতৃদেবের একটি মন্তব্য শুনি, বললামই বা।

অতুলদা বললেন: "জানো দিলীপ, সে-সময়ে আমি তোমার বাবার সঙ্গে তাঁর হাসির গানে দোয়ার দিতাম। কী অপূর্ব যে লাগত তাঁর মুখে তাঁর স্বরচিত গান শুনতে!

"একদিন কী হ'ল শুনবে? তুমি তখন খুব ছোট, বোধহয় চার কি পাঁচ

বছরের শিশু। তোমার বাবা আমাকে বললেন, 'দেখবে, অতুল! দেখ মজা!' ব'লেই একটি সহজ গান ধ'রে দিলেন। অম্‌নি তুমি ব'সে ব'সে দুলতে আরম্ভ করলে। তারপরে—সে কী কাণ্ড, সত্যি বলছি এ বাড়ানো নয়, যেই তিনি আস্থায়ীটি দুতিনবার তোমার কাছে গেয়েছেন অম্‌নি তুমি আ—আ ক'রে দোয়ার দেওয়া সুরু করলে—মোটমাট সুরটা বজায় রেখেই বলব। তোমার বাবা হেসে সগর্বে বললেন: 'কী বলো অতুল! আমার স্বর্গের সূত্রটি গাইয়ে হবে ব'লেই ভয় দেখাচ্ছে যেন, না'?"

পাদটীকা: পিতৃদেব তাঁর মন্দ্র কাব্যে "জীবন পথের নবীন পান্থ" কবিতায় শিশুপুত্রকে উদ্দেশ ক'রে লিখেছিলেন:

আমি স্বপ্রকোষ্ঠে বসি' একা, দূরে করি শুষ্ক কার্য নিবিষ্টচিত্তে,
তুই এসে সব দিস ভেঙেচুরে ও-মনোমোহন মধুর নৃত্যে,
ফেলি উলটিয়া মসীপাত্র, সুখে লেখনীটি ভাঙি' ধরিয়া দন্তে,
হাতে মসী মাখি', মসী মাখি' মুখে, পড়িয়া ছিঁড়িয়া কাগজ গ্রন্থে,
উলটি' পালটি' সাপটিয়া রোষে ফেলিস ছুঁড়িয়া তুই নৃশংস!
নাদিরের ম'ত, পরম সন্তোষে চাহিয়া দেখিস স্বকৃত ধ্বংস!
ব্যস্ত হ'য়ে ডাকি জননীরে তোর: "দেখ এসে, মোর স্বর্গের সূত্র
পুত্ররত্ন করে অত্যাচার ঘোর, নিয়ে যাও এসে তোমার পুত্র!"...
গান গেয়ে গেয়ে পাপিয়ার ম'ত নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নিরবরুদ্ধ
নীলাম্বরে, উর্ধ্ব হ'তে উর্ধ্বে, রত, নিমগ্ন, বিমুগ্ধ, বিভোর, শুদ্ধ।

এ-কয়টি চরণ উদ্ধৃত করলাম আরো তাঁর পুত্রবৎসলতার একটু পরিচয় দিতে। তিনি শুধু একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ও সুরকার ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন যাকে সাহেবি ভাষায় বলে "first class lover", তাঁর দিকে এত লোকে আকৃষ্ট হ'ত প্রধানত তাঁর অসামান্য স্নেহশক্তির জন্যেই! লোকেন কাকা পিতৃদেবের দেহান্তের পরে একদিন আমাকে বলেছিলেন: "মণ্টু, তোমার বাবাকে আমরা ভালোবেসেছিলাম শুধু তাঁর গান কি কবিতা কি হাসির জন্যে নয়। আমরা তাঁকে ভুলতে পারি না তাঁর অসামান্য স্নেহ করবার শক্তির জন্যে। তাঁকে দেখে আমি যেন নতুন ক'রে বুঝতে শিখি love is creative কথাটির মানে। It is true, my boy!"

লোকেন কাকার অনেক কথাই স্মরণীয় ছিল তবে ভুলে গেছি তাঁর কত উক্তিই যে। থেকে থেকে কেবল এই উক্তিটি আজো মনে পড়ে যে love is creative : তিনি প্রায়ই বাংলা বলতে বলতে ইংরাজি ছত্রে শেষ করতেন। কিন্তু পিতৃদেবের গানের প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

বলেছি, আমি গানের ও বিশেষ ক'রে আমার তানবাজির প্রতিভার জন্যে বহুলোকের কাছে স্তুতি পেয়ে বেশ একটু অহংকারী হ'য়ে উঠি। পিতৃদেবের কাছে অনেকেই এ নিয়ে অনুযোগ করতেন কিন্তু তিনি তাঁদের কথায় কান দিতেন না, কেবল আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন : "অহংকার যদি করতে চাস মণ্টু, তবে সব আগে এই অহংকার জপ করবি যে বড় হ'তে হবে—আরো বড়, আরো বড়। তারপরে, যখন সত্যি বড় হবি—তখন দেখতে পাবি যে তোর চেয়েও বড় কত লোক আছে—তখনই আসবে সত্যিকার বিনয়। আমি অতি অধম, মহাপাপী, নরকের কীট—এর নাম বিনয় নয় বাবা!"

চলতি সামাজিক মতামতের হুকুমবরদার যারা তাদের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই এম্নি তর্ক বাধত—কিন্তু সে অন্য-কথা।

যাহোক অহংকারের কুফল সময়ে সময়ে হাতে হাতে পাওয়া যায়। তানবাজির দরুন আমার মাথা গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গানে তানের বেশি অবকাশ না পেয়ে আমি ঝুঁকলাম হিন্দুস্থানি গানের দিকে। পরে সুরধামে এসে যখন পিতৃদেব আমাকে একটি গ্রামোফোন ও ১০০০ রেকর্ড দিলেন (গ্রামোফোন কোম্পানি তাঁর ছটি হাসির গান নেওয়ার পরিবর্তে এই উপহার দেন—তিনি গান গেয়ে টাকা নিতে রাজি হন নি ব'লে) তখন আমার বালক মন ওস্তাদির মোহে প'ড়ে গেল দেখতে দেখতে। আমি কিভাবে রেকর্ড থেকে নানা ওস্তাদের তান গলায় তুলতে লাগলাম সে-বর্ণনা অন্যত্র করেছি ব'লে সে সবের পুনরুক্তি বাহুল্য হবে। এখানে বলি শুধু একটি কথা : যে, হিন্দুস্থানি গানে আমার ভক্তি যতই বাড়তে লাগল ততই বাংলা গানে এসে গেল অবজ্ঞা। পিতৃদেব এসম্বন্ধে আমার রকমারি বিজ্ঞ মতামত শুনে হেসে বলতেন একটি কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে : যে, বাঙালি হিন্দুস্থানি গান থেকে সুর শিখবে—বাংলা গানকেই বড় করতে, হিন্দুস্থানি ওস্তাদ বনতে নয়। "কারণ"—বলতেন তিনি যখন আমি ওস্তাদির স্বপক্ষে লড়তে উজিয়ে উঠতাম—"বাঙালি হ'ল স্বভাবে কবি, স্রষ্টা, ভাবপ্রবণ—ওস্তাদিপ্রবণ নয় রে! তাই আমাদের কাছে নিছক ওস্তাদি পরধর্ম।" আমি তার্কিক ভঙ্গিতে বলতাম : "কেন বাবা? সুরেন মামা?"

পিতৃদেব (হেসে): তিনি যত বড় গাইয়েই হোন না কেন রে, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই তাঁকে লোকে ভুলে যাবে;

আমি (মরীয়া হ'য়ে): সে তো সবাইকেই যাবে।

পিতৃদেব: না রে না, আমাকে কি রবিবাবুকে ভুলে যাবে না। আর কেন জানিস? এই জন্যে যে, আমরা রেখে যাব যা বাঙালির প্রাণের জিনিস—সুরে বাঁধা গান। আমি যে কী সব গান বেঁধে গেলাম—সেদিন তুইও বুঝবিই বুঝবি।

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। বয়সের অনুপাতে আমার অন্তঃশ্রুতির বিকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে শিখি তিনি কত বড় সুরকার ছিলেন। তাই সুরকার হিসেবে তাঁর যে-বৈশিষ্ট্য কয়টি আমাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছিল সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা আজ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রথম কথা এই যে, তাঁর গানের সুরে ছিল এক নতুন প্রাণের সাড়া। এক প্রতিভাই জাগাতে পারে এই প্রাণশক্তিকে। তাই তাঁর সুরকার-প্রতিভার মাধ্যমে বাংলা গানে নেমেছিল এক নবদীপ্তি—কীর্তন বাউল খেয়াল টপ্পা ধ্রুপদের সহজ সমন্বয়ে। বলেছি, হিন্দুস্থানি গান তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। না ভালোবেসে তাঁর উপায় ছিল না—ঠাকুরদাদা মস্ত ওস্তাদ ছিলেন ব'লে হিন্দুস্থানি সুরে তাঁর হাতেখড়ি হয় যে বাল্যকালেই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ঠাকুরদাদার প্রভেদ ছিল এইখানে যে, ঠাকুরদাদা ছিলেন স্বধর্মে কালোয়াৎ, পিতৃদেব—সুরকার। সুরকার যেন স্থপতি (architect), গায়ক বা কলাবৎ যেন নির্মাতা (contractor বা executant) তাই না তিনি বারো বৎসর বয়সেই চাঁদের উপর শুধু গান বাঁধা নয়, তাকে চমৎকার সুরে বসাতে পেরেছিলেন। এ সুরটি আমি পরে গ্রামোফোনে দিই—এত সুন্দর নতুন ধরনের খাম্বাজের বাঁধুনি খুব কম বাংলা গানেই মেলে। গানটির প্রথম পদের আমি একাধিবার উল্লেখ করেছি: "গগন তুমি জনগণ-মনোহারী"—আর্যগাথা প্রথম ভাগে এটি বেরোয় ১৮৮২ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র আঠার বৎসর। এ গানটি এখনো আমি গাই। তাঁর এমনি আর একটি গান—"আযরে আমার সুধার কণা"—আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগে বেরোয়, কিন্তু, তিনি এটি বেঁধেছিলেন মা-র জন্যে—মা এ-গানটি গেযে আমাকে ঘুম পাড়াতেন। এ গানটির সুর এত অপূর্ব ওরিজিনাল তথা সুন্দর যে, এ-সুরটি আমি আমার অনেক গানেই বসিয়েছি—শুধু বাংলা গানে নয়, ইন্দিরার নানা হিন্দি ভজনে তথা আমার স্বরচিত নানা ইংরাজি গানেও।

প্রসঙ্গটা এসে গেল—ভালোই হ'ল। কারণ তাঁর গানের আর একটি আশ্চর্য কৃতির এই যে, বাংলার বৈশিষ্ট্য রেখেও তিনি সুরভঙ্গির মধ্যে এনেছিলেন বৈদেশিক প্রাণদীপ্তি। তাই তাঁর অনেক গান দেখেছি ইংরেজ আমেরিকানরাও গাইতে পারেন। "দেখেছি" বলছি এইজন্যে যে, ১৯৫৩ সালে সানফ্রান্সিস্কোয় বিখ্যাত আকাডেমি অফ এশিয়ান স্টাডিস-এ আমি কয়েকমাস সঙ্গীত অধ্যাপনা করবার সময়ে পিতৃদেবের কয়েকটি গানের ইংরাজি অনুবাদ ক'রে মূল বাংলা সুরে বসিয়ে সেখানকার মার্কিন ছাত্রছাত্রীদের শিখিয়েছি। এ-সম্বন্ধে বিশদ ক'রে লিখেছি আমার "দেশে দেশে চলি উড়ে" গ্রন্থে। তবু এ একথার পুনরুল্লেখ করলাম—তাঁর গানের এ-বৈশিষ্ট্যটির দিকে গীতরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। তাঁর "যেদিন সুনীল জলধি হইতে" আমি রেডিওতে গেয়েছি ইংরাজি ও জর্মন তর্জমায় ঐ একই মূল বাংলা সুরে তাঁর ধনধান্য পুষ্পভরা, বঙ্গ আমার প্রভৃতি আরো নানা গান ইংরাজি তর্জমায় চমৎকার শোনায়—নানা সভায়ই আমি গেয়েছি ও সাড়া পেয়েছি প্রতিবারেই।

এ থেকে একটি সত্য আমি যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করি: যে, পিতৃদেব স্বধর্মে অসামান্য সুরকার ছিলেন ব'লেই নানা বিদেশী গানের শুধু প্রাণশক্তিই নয়, সুরভঙ্গি ও মেজাজকেও আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন। আর এদেশের সঙ্গে ওদেশের সুরভঙ্গি তিনি মিলিয়েছিলেন এতই সহজে যে তাঁর সুরগুলি শুনলে কারুরই মনে হ'ত না যে কোথাও বৈদেশিক কিছু আছে। একথা নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রতিপন্ন করতে যাওয়ার এখন আর দরকার নেই, কেননা এ-সত্য ইতিমধ্যে অনেক সুরজ্ঞদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কিন্তু শুধু যে এইখানেই তাঁর সুরকারুর স্বকীয়তা নয়: তাঁর নানা বাংলা গানেই হিন্দুস্থানি রাগকে বসিয়েছিলেন তিনি এক সম্পূর্ণ নতুন ছাঁচে—নব প্রাণশক্তিতে দীপ্যমান্ ক'রে। যেমন ধরুন, সেথা গিয়াছেন তিনি—ইমন ঠাটে, ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে—কল্যাণ ঠাটে, প্রতিমা দিয়ে কী পূজিব তোমারে—জয়জয়ন্তী ঠাটে, পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে—ভৈরবী ঠাটে, যেদিন সুনীল জলধি হইতে—ভূপকল্যাণ ঠাটে, ধনধান্য পুষ্পভরা—কেদারা ঠাটে, নীল আকাশের অসীম ছেয়ে—দেশ ঠাটে, ঘনতমসাবৃত অম্বর ধরণী—ভূপালি ঠাটে—ইত্যাদি।

তাঁর গানের আর একটি ঐশ্বর্য আমার কাছে অতি আদরণীয় মনে হয়: তাঁর ওজঃশক্তি। এখানে বাংলা সুরকারদের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ খুঁজে পাওয়া ভার।

তিনি যে ছিলেন স্বভাব-বলিষ্ঠ এ-সত্যের পরিচয় মেলে শুধু যে তাঁর স্বদেশী গানে তাই নয়—মেলে তাঁর আরো অনেক গানের বলিষ্ঠ বন্দেশে।

কিন্তু আমার সবচেয়ে অবাক লাগত ভাবতে যে তিনি স্বভাবে সাধক কি ভক্ত না হ'য়েও কেমন ক'রে বাঁধলেন অপূর্ব সাধনার গান, ভক্তির গান—যার মধ্যে অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে আছে আনন্দ, শরণাগতি, উচ্ছলতা ও প্রেমোচ্ছ্বাস! যথা, চরণ ধ'রে আছি প'ড়ে, আর কেন মা ডাকছ আমায়, এবার তোরে চিনেছি মা, মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ঐ ভেসে আসে, প্রতিমা দিয়ে কী পূজিব তোমারে, তুমি যে হে প্রাণের বঁধু···কত বলব?

যৌবনের উপান্তে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে গিয়ে প্রথম গুরুদেবের মুখে শুনি এর ব্যাখ্যা—যখন তিনি আমাকে বলেন যে, উচ্চবিকশিত মানুষ মাত্রেরই মধ্যে একাধিক ব্যক্তিত্ব—পার্সনালিটি—অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে বাসা বাঁধে। প্রসঙ্গটি আমি পরে তুলব তাই এখানে সংক্ষেপে শুধু এইটুকু ভাষ্য ক'রেই থামি যে, উচ্চবিকশিত মানুষের মধ্যে এমন অনেক সম্ভাবনাই সুপ্ত থাকে যাদের পূর্ণ জাগরণ হ'তে অনেক সময়ে দেরি হয়। তাছাড়া এমন অনেক সম্ভাবনাও থাকে যাদের বিকাশ হয় না অন্তরের সজাগ সমর্থন বিনা। পিতৃদেবের মধ্যে ভক্তির ধারা সচরাচর প্রণালী না পেয়ে ভিতরে ভিতরে রুদ্ধ হ'য়ে থাকত বা গহন মনে অন্তঃশীলা ছন্দে বইত—তাঁর প্রবল যুক্তিবাদী মন এ-প্রবণতাকে দাবিয়ে রাখত ব'লে। শেষ জীবনে যে তাঁর মন ভক্তির দিকে এত সহজে মোড় নিতে পেরেছিল তার কারণ খুঁজতে হবে এইখানেই। কিন্তু একথা পরে বলব আরো বিশদ ক'রে।

বিখ্যাত দার্শনিক ক্রোচে বলেছেন যে, সংসারে অনেক কিছু সম্ভব হ'তে পারে, কেবল একটি জিনিষ একান্ত অসম্ভব: মহাপ্রতিভাকে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করা। তাই আজ বাঙালি প্রাণ জেগে উঠে সকৃতজ্ঞে স্বীকার করতে আরম্ভ করেছে যে আমাদের দেশে এ যুগে গীতিকার-সুরকার দ্বিজেন্দ্রলালের গান তথা সুরের মধ্যে দিয়ে নেমে এসেছে এক নবদ্যুতির আকাশগঙ্গা—যে কথা রবীন্দ্রনাথও একবার উল্লেখ করেছিলেন তাঁর একটি প্রবন্ধে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আগে। কিন্তু সে-প্রবন্ধটি তাঁর কোন বইয়ে ছাপা হয়েছিল মনে পড়ছে না।

এক

মাতৃদেবীর অভাব প্রথম দিকে আমি তেমন বোধ করি নি। আমার বড় মামিমা—৺ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদারের স্ত্রী—এক হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে অন্যহাতে মাতৃহারা শিশু দুটিকে দুধ খাওয়াতেন। সে সময়ে বড়মামার সবে বিবাহ হয়েছে—বড়মামিমার বয়স তের কি চোদ্দ; কিন্তু তবু ঐ বয়সেই তিনি আমাদের মা হ'য়ে উঠেছিলেন। পিতৃদেব তখন মফঃস্বলে চাকরির কাজে নিরন্তর ঘূর্ণ্যমান, কাজেই আমি ও মায়া থাকতাম বেশির ভাগ সময়ে ২০৩।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে আমার দাদামহাশয় দিদিমা ও বড় মামিমার তত্ত্বাবধানে। রাতে দিদিমার কাছে শুতাম, দিনে বড়মামিমা আমাদের দেখাশুনা করতেন। আমার ছোটমামা—এখন ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ মজুমদার—ও আমার ছোট মাসিমা সুষমা ছিল আমাদের খেলার সাথী।

তার পরে পিতৃদেবের সঙ্গে খুলনায় ও গয়ায় গিয়ে কিছুদিন থাকি। গয়াতেই পিতৃদেবের বিলেতের বন্ধু মহামনস্বী শ্রীলোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে দেখা—যিনি চিরজীবন আমাকে স্নেহ ক'রে এসেছেন। তাঁর কথা যথাস্থানে বলব।

অতঃপর পিতৃদেব বদলি হ'য়ে কলকাতায় ৫নং সুকিয়া স্ট্রীটে এসে কায়েম হবার পরে আমাকে ও মায়াকে নিয়ে কাছে রাখেন—না, আমাকে নিয়ে বলাই ভালো কারণ মায়া মাঝে মাঝে এলেও বেশির ভাগ সময় থাকত কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে মাতুলালয়ে—খুব কাছেই তো, এখানে ওখানে করত খুশখেয়ালে। সুকিয়া স্ট্রীটে একদিন আমার ও মায়ার ঝগড়ার কাহিনী পিতৃদেব কবিতায় পেশ করেন পুত্র-কন্যার কলহ নাম দিয়ে। পরে "আলেখ্য"তে সে-কবিতাটি ছাপা হয়।

এর পরে "সুরধাম" নির্মিত হয় নন্দকুমার চৌধুরীর লেনে—এখন এ-লেনটির নামকরণ হয়েছে ডি. এল. রায় রোড। সুরধামের সাম্‌নে ছোট একটু জমি ছিল, পরে আমরা সেখানে ফুটবল ও টেনিস খেলতাম। সুরধামের নামকরণ হয়েছিল মাতৃদেবীর নামে। বলতে গেলে এখানেই আমার ধর্মজীবনের পত্তন হয়। তাই সুরধাম থেকেই সুরু করি। পিতৃদেব সুরধামে গৃহপ্রবেশ করেন নববর্ষে ১৩১৫ সালে। আমি তখন সবে বারো পেরিয়ে তেরয় পা দিয়েছি।

আমার "উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল"-এ আমি লিখেছি যে পিতৃদেব ছিলেন একটি

বিচিত্র চরিত্র। বাইরে—তার্কিক, কবি, রসিক, গায়ক, সুরকার, সন্তানবৎসল পিতা, বন্ধুবৎসল মিত্র, মজলিশি মানুষ—কিন্তু ভিতরে ছিলেন সত্যিই উদাসী। বিশেষ মাতৃদেবীর মৃত্যুর পর থেকে তাঁর উদাসী প্রকৃতি আরো চোখে পড়ত সকলের।

তার্কিক মানেই অবশ্য সংশয়ী। পিতৃদেব এ-সময়ে (১৯০৮-১১) নিজেকে প্রায়ই নাস্তিক ব'লে পরিচয় দিতেন ও আমাকে বলতেন—তর্ক করা ভালো—সাঁচ্চাকে ক'ষে নেওয়া চাই-ই চাই। ফলে ক্রমশঃ আমি কথায় কথায় রুখে উঠে তর্ক করতাম শুধু কমবয়সীদের সঙ্গেই না—গুরুজনের সঙ্গেও বটে। তাঁরা অনেক সময়েই বিরক্ত হ'তেন ও করতেন এমন সব মন্তব্য যা আমার কাছে একটুও শ্রুতিমধুর মনে হ'ত না।

কিন্তু তর্কপ্রবৃত্তির ফলে অনেক সময়ে বন্ধুদের বিরাগ তথা শত্রুদের আক্রোশবৃদ্ধি হ'লেও ওর একটা ভালো দিকও আছে। আমাদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই দুটো প্রবৃত্তি থাকে—মেনে নেওয়ার আর ক'ষে দেখবার। পিতৃদেব প্রায়ই বলতেন: 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর' এ-নীতি মেনে চ'লে আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, ভুল বিশ্বাসে ভেজাল কৃষ্ণকেও আসল কৃষ্ণ মনে হয় অনেক সময়েই। তাই তিনি আমায় পই পই ক'রে বলতেন: "সবকিছুই যাচিয়ে নিবি বাজিয়ে নিবি রে মণ্টু, ধাঁ করে মেনে নিস নি কোনো কিছুকে অকাট্য সত্য ব'লে, বুঝলি? তর্ক বিচার প্রবৃত্তি আমাদের খানিকটা দেখতে শেখায় বৈ কি কোনটা টেঁকসই, কোনটা অপল্‌কা।"

ওদিকে পড়তাম বারো তের বৎসর বয়সে—পরমহংসদেবের অনুপম 'কথামৃত' —যার তুল্য বই সংস্কৃত ছাড়া আর কোনো ভাষায় চোখে পড়েনি—আর উজিয়ে উঠতাম: 'আন্তরিক যে ভগবানকে ডাকবে সেই পাবে তাঁকে।' গাইতাম: 'ডাক্‌ দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে?' এ-রঙে যতক্ষণ মনটা রঙিয়ে থাকে ততক্ষণ বিচারীর অবিশ্বাসের কথা মনে হ'লে হাসি পায়—মনে হয় বিশ্বাসের এজাহারই বাস্তব, সংশয় ছায়াময়।

ফলে সুরু হ'ত দোলা—যে-দোলার একবার এদিক একবার ওদিক গতির কথা আমার উপন্যাস 'দোলায়' খানিকটা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি—পরে যৌবন-পর্বে আরো বলব। এ-দোদুল্যমান অবস্থা ঘটে—এদিকে বিশ্বাসী মন মেনে নিতে চায়, ওদিকে তার্কিক মন প্রমাণ চায় ব'লে। বটেই তো।

তা যেন হ'ল। কিন্তু তা হ'লে "বল্‌ মা তারা দাঁড়াই কোথা" অবস্থায় পড়া

কি ভালো? মনকে নিয়ে দুটো শক্তি যেন টানাটানি করছে, এ বলে এদিকে এসো, ও বলে—ও-দিকে। পরে যতই ভাবি ততই নাজেহাল অবস্থা। কী? বিশ্বাসের ভুল হয়? তথাস্তু। কিন্তু তর্কেরি বা চরম নিষ্পত্তি কোথায়? বিশ্বাসকে যদি ভুল দিশারি ব'লে নাকচ করি তবে দিশা চাইব কার কাছে? বুদ্ধির—যুক্তির? বিশ্বাসীদের মধ্যে মতভেদ আছে বিশ্বাস নিয়ে? কিন্তু যুক্তিবাদীদের মধ্যেও কি মতানৈক্য কম? ঔষধ খাওয়া ভালো না মন্দ? সাবধানের মার আছে না নেই? মানুষের ভাগ্যের নিয়ন্তা নিয়তি না পুরুষকার?—কোন্ প্রশ্নটির উত্তরে সব বুদ্ধিযুক্তিবাদী একমত! গান্ধিজি এমন কথাও বলেছেন যে রেলগাড়ি হাঁসপাতালও খারাপ। টলস্টয় আর্টের অসারতা দেখালেন চমকপ্রদ যুক্তি দিয়ে, বললেন শ্রেষ্ঠ জীবন হ'ল চাষার জীবন—ভাবুক বা শিল্পীর জীবন খতিয়ে ব্যর্থ ও অসার। তবে? কঃ পন্থাঃ?

এমন সময়ে এলেন সত্যব্রত সামশ্রমী—বিখ্যাত সামবেদী পণ্ডিত। তখন আমি পুরাণ, মহাভারত, সংহিতাদি পড়তাম দিনরাত, এমন কি রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদও পড়েছি—(বিশেষ কিছু না বুঝেই অবশ্য—বারো তের বছরের বালক বেদের মর্মগ্রহণ করবে কী ক'রে?)—সামশ্রমী মহাশয়ের সামবেদ যোগাড় করবারও চেষ্টায় আছি—এমন সময়ে স্বয়ং গ্রন্থকার মহাশয়কে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। কী সৌম্য উজ্জ্বল কান্তি! শ্বেতশ্মশ্রু! আমি তাঁর সামবেদ যোগাড় করতে চেষ্টা করেছি শুনে তিনি কী যে খুশি! এইটুকু ছেলে—সামবেদ পড়তে চায়—তা আবার তাঁর সামবেদের অনুবাদ—খুশি না হয়ে পারেন? যাহোক তিনি আসতেই পিতৃদেবের সঙ্গে ঐ চিরন্তন তর্ক বাধল: বিশ্বাস না যুক্তি—প্রামাণ্য কিনি? সামাধ্যায়ী মহাশয় পিতৃদেবের সঙ্গে খানিক তর্ক ক'রে প্রায় হার মেনে বললেন: "দ্বিজেন্দ্রবাবু, সত্যকে পাবার পথ যুক্তিতর্ক নয়—কারণ আপনার ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে আপনি আমার নয়কে হয় করতে পারেন বটে। কিন্তু যে-ধীমানের আপনার চেয়েও তীক্ষ্ণতর বুদ্ধি—তিনি আবার আপনার হয়কে কেটে নয় দাঁড় করাতে পারেন। কাজেই বুঝছেন—বুদ্ধি যুক্তি তর্ক কোনো অপ্রতিবাদ্য সত্যেই পৌঁছে দিতে পারে না।"

(সামশ্রমী মহাশয়ের উক্তিটি বহুবৎসর পরে পড়ি শ্রীরূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে একটি শ্লোকে:

যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপদ্যতে।

অর্থাৎ একজন তর্ককুশল মনীষী নিপুণ ঢঙে যে-সিদ্ধান্তকে প্রতিপন্ন করেন তাঁর চেয়ে

বড় মনীষী তাঁর নিপুণতর যুক্তি দিয়ে সে-সিদ্ধান্তকে ফের নামঞ্জুর করতে পারেন। অর্থাৎ কি না, যুক্তিকে সারথি করার বিপদ আছে।)

কথাটি বাল্যকালেই আমার মনে লেগেছিল। কিন্তু ঐ যে বললাম মনের গতি বিচিত্র—তাই দোলা থামে না। এক একবার ফিচেল বুদ্ধিমন্তদের দেখে মনে হ'ত: যুক্তি আর না—সরল বিশ্বাসই ভালো। যেই দেখতাম কোনো সরল বিশ্বাসী ভক্তের স্নিগ্ধ শান্তিময় মুখ—অমনি মন বলত: বুদ্ধির আত্মপ্রসাদকে কাজ নেই আস্কারা দিয়ে—যিনি পৌঁছে দেন শুধু অনৈশ্চিত্যে। তার পর আবার যেই দেখতাম কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ার বিশ্বাস—বিষ্যুৎবারের বারবেলায় বেরুনো ভালো নয়, কি ছোট জাতের ছায়া মাড়ালেও গঙ্গাস্নান ক'রে পবিত্র হ'তে হবে, অমনি মনে হ'ত—মাথায় থাকুক আমার সরল বিশ্বাস, পিতৃদেবের কথাই শ্রদ্ধেয়: যুক্তি যাকে গ্রহণীয় মনে না করে সে বরণীয় নয় নয় নয়।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে পিতৃদেব ছিলেন একদিকে যেমন তার্কিক অন্যদিকে কি ঠিক তেমনি আন্তরিক (sincere) মানুষ! তাই তর্কে জিতলেও ঐ তর্ক দিয়েই দেখাতেন যে বুদ্ধি থাকলে অস্পৃশ্যকেও কেমন ক'রে পাংক্তেয় করা যায়। বললেন:

"শোন্ গল্প। এক অন্যমনস্ক উকিল তাঁর মক্কেলের হ'য়ে ওকালতি করতে গিয়ে ভুলে জজের কাছে গড় গড় ক'রে ব'লে যেতে লাগলেন কি কি কারণে তাঁর মক্কেলের ফাঁসি হওয়াই উচিত, তাঁর জুনিয়র উকিল তো থ! তাঁকে টুকলেন জনান্তিকে: 'করছেন কি সার? যাকে ঝুলোতে কোমর বেঁধেছেন—আপনি যে তাঁরি তরফের উকিল! উকিলপ্রবর একটুও বিচলিত না হ'য়ে উল্টো সুর ধরলেন—জজকে সম্বোধন ক'রে: 'সার, এতক্ষণ আমি আপনার কাছে পেশ করলাম আমার প্রতিপক্ষ ফরিয়াদি উকিল আমার আসামী মক্কেলের বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ আনতে পারেন। এখন আমি দেখাব, শুনুন, তাঁর অভিযোগ বাতিল কোন্ যুক্তিতে।' ব'লে ঠিক উল্টো গাইলেন, দেখালেন কেন আসামীর বিরুদ্ধে প্রতি সাক্ষীই মিথ্যুক—হাঃ হাঃ হাঃ!"

এই রকম প্রাণখোলা মানুষ ছিলেন তিনি।—গানে, হাসিতে, তর্কে। ভারত-বর্ষের স্বত্বাধিকারী ৺হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একদিন আমার সামনে হেসে বলেছিলেন শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে: "দ্বিজদা যে কী অদ্ভুত তার্কিক ছিলেন শরৎদা, জানেন না! কতবার তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি কত কি প্রসঙ্গে—সময়ে সময়ে এমনও হ'ত—ধরুন, বাল্যবিবাহ ভালো না মন্দ? দ্বিজদা হয়ত হ'লেন বাল্যবিবাহের

বিপক্ষে। চোখা চোখা যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন করলেন। তারপর বললেনঃ 'এবার এসো তর্ক করি—তুমি দাঁড়াও বাল্যবিবাহের তরফে, আমি প্রতিপক্ষ।' ফের বিতণ্ডা সুরু হ'ল ও তর্কে আমাকে হারিয়ে প্রমাণ ক'রে দিলেন কেন বাল্যবিবাহ বরণীয়।"

এ শুধু তাঁর মুখের কথা ছিল না যে, তর্কে আনন্দ মিললেও দিশা মেলে না—মিলতে পারে না। একটা উদাহরণ দেই। তাঁর আলেখ্য কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতা আছে, নাম "মদ্যপ"। তাতে এক তীক্ষ্ণবুদ্ধি মাতাল বন্ধুর কাছে প্রমাণ করছেন যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে কেন তিনি মদ খাওয়াকে অন্যায় মনে করেন না। কবিতাটি আমার বালকমনকে চম্‌কে দিত—যদিও মদ খাওয়া ভালো নয় এ-বিশ্বাস আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল সেই বয়সেই—নানা মাতালের মাতলামি দেখে। কিন্তু তবু মদ খাওয়ার স্বপক্ষে পিতৃদেবের উদ্ধৃত মাতালের যুক্তি কেন অসিদ্ধ ভেবে পেতাম না—দশ বছরের বালক তো! পরে তর্কশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হ'য়ে একথা আরো বুঝি যে তর্কের কুযুক্তি কেন "অসিদ্ধ" (fallacy) ঠাহর করা অনেক সময়েই দুঃসাধ্য—বড় বড় দিক্‌পালও কুযুক্তির মোহে প'ড়ে অজান্তে fallacy-কেই মেনে বসেন চরম ও পরম ব'লে।

কিন্তু পিতৃদেব তর্কের খাতিরে তর্ক করলেও অসামান্য সত্যনিষ্ঠ ছিলেন ব'লে অকুণ্ঠেই স্বীকার করতেন বুদ্ধির সারথি যুক্তির বিমানে দিশাহারাকে কোনোদিনই নৈশ্চিত্যের কৈবল্যলোকে পৌঁছে দিতে পারবে না—যেহেতু এমন কোনো যুক্তিই নেই, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যার কাটান খুঁজে বার করতে না পারে। তাই 'মদ্যপের' শেষে তিনি লিখলেন তাঁর অনুপম রসাল ভঙ্গিতে :

বারো বছর পরে দেখা বন্ধুর সঙ্গে কলকাতায়
একটি ক্ষুদ্র ভগ্ন গৃহে, বৌবাজারের মোড়ের মাথায়।
"এ কী বন্ধু? এ অবস্থা?—হেন স্থানে?—হেন বেশে?
ওহে বন্ধু! বলেছিলাম হবে ইহাই পরিশেষে।
সেদিন তর্ক ক'রে ইহাই বুঝিয়ে তোমায় দিতেছিলাম।"
বললেন বন্ধু করুণ হেসে: "তর্কে কিন্তু জিতেছিলাম।"

এ-শেষ লাইনটি সে-যুগে রসিকমহলে বিশেষ আদৃত হয়েছিল। ৺যতীন্দ্রমোহন বাগচি আমাকে প্রায়ই বলতেন অট্টহাস্যে: "উঃ! কী লাইনই লিখেছিলেন দ্বিজদা!"

কিন্তু দেখে শুনে আমার সন্ধানী বালকমনে লাগল বিষম ধাক্কা। যুক্তি বরেণ্য অথচ প্রামাণ্য নয় এ কেমন কথা? তবে কেন মিথ্যে মিথ্যে এত শত যুক্তিবিচারের বিড়ম্বনা? দেখতে দেখতে পড়লাম আমি অকূল পাথারে।

ঠিক এই সময়েই নির্মলদার (শ্রীনির্মলেন্দু লাহিড়ী) মাধ্যমে আলো আসে অন্ধকারে: তিনি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেন: "ওরে! পড়্ কথামৃত।" শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রথম পড়ি—বোধ হয় ১৯১০ সালে! আর যেমনি পড়লাম তাঁর প্রার্থনা: "মা বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও···অষ্টসিদ্ধি নয় মা, শতসিদ্ধি নয় মা, দাও শুদ্ধা ভক্তি সরল বিশ্বাস—" অমনি আমার সরল বালকমন ভক্তিতে উজিয়ে উঠল: "এই এই—এইই তো আমি চাইছিলাম!"

দুই

নির্মলদার কথা গত রাত্রে উল্লেখ করেছি। আমার জীবনের একটি পরম আনন্দময় ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই যে, অসাধারণ মানুষের দেখা পেয়েছি আমি পদে পদে। তাই তো যখন আধুনিক বাস্তববাদীদের মুখে শুনি: "এ-যুগে আদর্শ বাতিল, অসাধারণদের ছেড়ে গড়পড়তাদের নিয়েই শিল্পীদের ঘর করতে হবে—যেহেতু অসাধারণরা অবাস্তব—unreal"—তখন আমি ভেবে পাইনে এ-যুক্তির কী নাম দেব! কারণ আমার মনের ফলকে যে পদে পদে অসামান্যরাই দাগ কেটে গেছেন তাঁদের ব্যক্তিরূপের জ্বলন্ত শলাকায়। উদাহরণতঃ, আমার পিতৃদেব, রাঙা জ্যেঠামহাশয়, গিরিশ মেসোমহাশয়, কি আরো কাছের মানুষ নির্মলদার কথাই নিন না। তাঁর বয়স তখন মাত্র ষোলো কি সতের—অথচ কী আশ্চর্য ছিল তাঁর অটল বিশ্বাস, সাধুসন্তে শ্রদ্ধা, স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তি, ঋজু দৃষ্টি! কোন্ যুক্তিবলে তাঁকে বাকি সব গড়পড়তাদের চেয়ে কম বাস্তব বলে বরখাস্ত ক'রে দেব বলুন তো? তাঁর কথা একটু ফলিয়েই বলব, কারণ বাল্য-জীবনে তিনি এসেছিলেন আমার অবিস্মরণীয় আপনজন হ'য়ে। কিন্তু তার আগে একটু পেছিয়ে যেতে হবে—বলতে হবে আমার তদানীন্তন মনের অবস্থার কথা, আজকালকার সাংবাদিক ভাষায় যার নাম—পরিস্থিতি।

প্রথমেই একটু "কিন্তু" গেয়ে রাখি। কথাটা এই যে, বাল্যস্মৃতি লেখা একটি সহজ কৃতি নয়। কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে আমাদের মতিগতি ও দৃষ্টিভঙ্গি বদ্‌লে যায় তাই নয়, হাজিরি দেয় প্রবীণ কল্পনা। সে করে কি—আমাদের অতীত

আমিকে তার নিজের রঙে রঙিয়ে তুলে বর্তমান আমির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চায়—স্রেফ ভুলিয়ে দিয়ে যে অন্তগত আমিকে দেখা হচ্ছে আমাদের নবোদিত আমির নবনেত্রের দূরবীনে। এ-দেখার এজাহার পল্‌কা এমন কথা বলছি না অবশ্য (বললে কেনই বা বাল্যস্মৃতির রোমন্থনের এ-বিড়ম্বনা বলুন ?)—কিন্তু এটুকু তো মানতেই হবে যে বয়স্ক দিলীপকুমার যখন বালক দিলীপের ছবি আঁকতে কলম ধরেন তাঁর পরিণত বিবেক বিচার-বুদ্ধি কল্পনা সব কিছুরি ছোপ কিছু না কিছু বালক দিলীপের স্বরূপের গায়ে লাগবেই। তাই বলা রইল—বালক দিলীপের যে চিত্র আমি আজ আঁকতে যাচ্ছি সে-ছবির চিত্রী যে প্রবীণ দিলীপকুমারের মন বুদ্ধি কল্পনা এটুকু ভুলবেন না।

আমার কিন্তু একটা ভরসা আছে যে, আমি বালক দিলীপকুমারের অনেক কিছুই দেখতে পেয়েছি স্পষ্ট ক'রে। ভরসার কারণ—আমার স্মৃতিশক্তি। যে-স্মৃতি-শক্তির দৌলতে এ-ছবি আঁকা সম্ভব হচ্ছে তার কথা যদি একটু ফলিয়ে বলি তাহ'লে সেটা বোধহয় অশোভন হবে না—যেহেতু এর সত্যি প্রয়োজন আছে। আমার বেশ মনে আছে—ছেলেবেলায় আমি নিজেকে "বুদ্ধিমান্" উপাধি দিলেও কোনো-দিনই দম্ভভরেও "পিতৃদেবের যোগ্যপুত্র" ব'লে মনে করিনি—অর্থাৎ এমন কুলতিলক যাকে দেখে পাঁচজনে গেয়ে ওঠে: "বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে!" গান গাওয়ায় অবশ্য আমার অল্পবয়সেই নামডাক হয়েছিল অত্যধিক—যার ফলে আমার মাথা বেশ একটু গরম হ'য়ে উঠেছিল বৈ কি। কিন্তু সে-যুগে আবার গানবাজনায় কৃতিত্বকে অনেকেই পছন্দ করতেন না। গানবাজনা—ও তো ওস্তাদ, কালোয়াৎ, নর্তকী, বাইজির পেশা—ভদ্রবংশের ছেলেমেয়ে গান করলে অভিভাবকবর্গ শঙ্কিতই হ'য়ে উঠতেন বেশি—পাছে ছেলে ব'কে যায়। সে-সময়ে আমার আত্মীয়-আত্মীয়াদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা আমার মুখে অজস্র গান তথা সহস্র তান শুনে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠতেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। আমার বেশির ভাগ শুভার্থী শুভার্থিনীরাই চাইতেন—আমি পড়াশুনো ক'রে ভালো ছেলে হই, জয়ধ্বনি করতেন: "লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।" কাজেই যাঁরা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এমন দুচারজন ছাড়া বড় কেউ আমাকে অসামান্য মেধাবী শিরোপা দেন নি, যদিও আমি যে বেশ একটু এঁচড়ে-পাকা ছেলে সে বিষয়ে বিচক্ষণ ও গড়পড়তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল না। কেন—যথাকালে প্রাঞ্জল হবে—সবুর করুন।

কিন্তু এক বিষয়ে আমার কৃতিত্ব দেখে সত্যিই বিস্মিত হতেন অনেকেই : সে আমার স্মৃতিশক্তি। এ-শক্তিতে আমি খানিকটা 'প্রডিজি' নাম কিনেছিলাম যদি বলি—তবে বোধ হয় খুব অত্যুক্তি হবে না। আমার পরিচিত সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই ক্লাসে পড়াশুনায় আমার চেয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন—বিশেষ ক'রে ইংরাজিতে (কারণ আমি তের বৎসর বয়সের আগে স্কুলে যাইনি ব'লে আবাল্য খুশখেয়ালে বাংলা ও সংস্কৃতের পুলকোর্মিতেই গা ভাসিয়ে চলেছিলাম) কিন্তু কেউই আমাকে হারাতে পারত না স্মৃতিশক্তির প্রতিযোগিতায়। মনে আছে ছেলেবেলায় আমি রাঙা জ্যেঠামহাশয় ও গিরিশ মেসোমহাশয়ের কাছে—যাঁদের কথা পরে বলছি—পরীক্ষা দিতাম অকুতোভয়ে : দ্রৌপদীর কয় ছেলে ও কী কী নাম? ব্রহ্মার মানসপুত্র কয়টি? মনু ক'জন? ভীমসেন কবার যুদ্ধে হেরেছিলেন—কার কার কাছে? বভ্রুবাহনের হাতে অর্জুনের কেন পরাজয় হ'ল? গিরিশ মেসোমহাশয়ের কাছে আর একটি স্মৃতিচর্চার দীক্ষা পেয়েছিলাম : মহাভারত রামায়ণ হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ ঢুঁড়ে সূর্যবংশ চন্দ্রবংশ ইক্ষাকুবংশ দক্ষকন্যা চন্দ্রের স্ত্রীদের নাম ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের নাম—সব লম্বা লম্বা বালির কাগজে লিখতাম—কখনো খুঁটিনাটিতে মেসোমহাশয় আমার ভুল ধ'রে দিতেন, কখনো বা আমি তাঁর। অর্থাৎ যাকে বলে—আদা জল খেয়ে উঠে প'ড়ে গবেষণা! সবাই জানে স্মৃতিশক্তিও অন্য অনেক শক্তিদের মতনই অনুশীলনে বেশি তেজালো হয়। কাজেই আমার স্মৃতিশক্তির স্ফূর্তি হয়েছিল অল্পবয়সেই—গান কবিতা ছড়া যে কত নির্ভুল আবৃত্তি করতে পারতাম শুনে শুনে—একটা উদাহরণ দিলামই বা।

পিতৃদেবের এক বন্ধু ছিলেন—রসময় লাহা। গোল আলুর মতন বর্তুলানন—বড় বড় চোখ—সদাই হাসিখুসি। পিতৃদেবের হাসির গান ও কবিতার তিনি বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি কয়েকটি হাসির কবিতা লিখে "আরাম" নাম দিয়ে ছাপান। বইটি কবে হারিয়ে গেছে—এখন নিশ্চয় কিনতে পাওয়াও যায় না। এ বইটির অনেক কবিতাই রসময়বাবু আবৃত্তি করতেন সুরধামে। শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। একদিন তাঁর বেধে যায় একটি কবিতা আবৃত্তি করতে—আমি টুক্ ক'রে ফিসফিস ক'রে পাদপূরাণ ক'রে দিই। কবিতাটি এই—এই দেখুন এখনো আমার মনে আছে পঞ্চাশ বৎসর পরেও :

বড় গুরুতর বেজেছে হৃদয়ে, হায় কী করিনু পাপ!
প্রভু, সান্ত্বনা কিছুতে পাই না—যত করি অনুতাপ।

কেবলি হে প্রভু, যাতনার ভরে বহিছে দীর্ঘশ্বাস !
সারারাত ধ'রে ঘুম নাই চোখে—করি শুধু হা-হুতাশ।

অভাবের তরে নহে প্রভু নহে—সচ্ছল জমিদারি।
সখারাও মোরে বড় স্নেহ করে—হয়েছি উপাধিধারী।
পরিজন যত সদা অনুগত—সুখী অতি মোর সুখে :
কিন্তু আজি হায়, প্রভু জ্ব'লে যায় উঃ ! কী যন্ত্রণা বুকে !
প্রেমিকার তরে নহে এ বিরহ, নহে তার অভিমান :
শত উপাসক ছেড়ে সে আমারে করেছে হৃদয় দান—

রসময়বাবু দাঁড়িয়ে উঠে পিতৃদেবের পূর্ণিমামিলনের একটি আসরে এ কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন আর সবাই ভাবছিল এ কী রকম হাসির কবিতা ! (পিতৃদেব বলতেন হেসে—ইংরাজি "sting is in the tail"-এর তর্জমা ক'রে : এর হুল হ'ল এর ল্যাজের দিকে !) এম্‌নি সময়ে তিনি হঠাৎ পাঠ ভুলে গেলেন। বিব্রত হ'য়ে আমার দিকে তাকাতেই—আমি তাঁর পাশেই ব'সে মুচকে হাসছি—আমি ফিসফিসিয়ে খেই ধরিয়ে দিলাম নিচু স্বরে :

শত্রু আমার কেহ নাই প্রভু—

রসময় বাবুর মুখ চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল বড় বড় চোখ আরো ডাগর হ'য়ে উঠল—আমার পিঠে দিলাশা দিয়ে ধরলেন :

শত্রু আমার কেহ নাই প্রভু, তোমারি করুণাবলে।
অপরের সুখে করি না ঈর্ষা, তথাপি বুক যে জ্বলে।
কেন পাইতেছি আজি এ-যাতনা প্রভু কী বলিব আহা !
খেয়েছিনু কাল আস্ত কাঁঠাল, হজম হয় নি তাহা।

সভাশুদ্ধ হেসে গড়িয়ে পড়ে। তুমুল করতালি। রসময়বাবু আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন : "বেঁচে থাকো বাবা ! বাপকা বেটা বটে !"

শুধু গান ছড়া, কবিতাই বা বলি কেন—মজার গল্পই কি কম জানতাম—যাদেরকে পিতৃদেবের সান্ধ্য আসরে শুনবামাত্র আমার গ্রহিষ্ণু মস্তিষ্কে ছ'কে নিতাম—আর ভুলতাম না। শুনুনই না এম্‌নি একটি মজার গল্প—পিতৃদেব প্রায়ই এই ধরনের রকমারি গল্প ক'রে তাঁর হাসির প্রতিধ্বনি শুনতে চাইতেন আমার সঘনে হাততালি

দিয়ে হেসে ওঠার কলোল্লোলে। সময়ে সময়ে তাঁর হাসির গল্পে হাসতে হাসতে সত্যিই আমার বুকে পিঠে খিল ধ'রে যেত। মরুক গে, অবহিত হোন।

পিতৃদেব: শোনো হে সবাই এক মাতালের কীর্তি। একদা কোনো এক সভ্যভব্য মাতাল বন্ধুদের সঙ্গে গিয়েছেন হ্যামলেট অভিনয় দেখতে যার অভিনেতারা খাস সাহেব, বুঝলে? মাতাল মহাশয় বসতে না বসতে নেতিয়ে পড়লেন ঘুমে। যখন ঘণ্টাখানেক বাদে তাঁর ঘুম ভাঙল শুনলেন অভিনতা বলছেন: "To be or not to be that is the question···ইত্যাদি।" তিনি অম্‌নি মহোৎসাহে দু'হাত তুলে তার-স্বরে বললেন: "লন্‌-ডন্‌—যা বাবা, ইংরেজির জন্মস্থানের কথা ব'লে দিয়েছি, এখন তোরা—তোরা কে কত ইংরাজি বলবি বল্‌।" ব'লে তাঁর সে কী হাসি—হাঃ হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

পিতৃদেবের এই প্রাণখোলা অট্টহাসির রেশ আজো আমার কানে বাজে, তাঁর প্রতিভাদীপ্ত আবেগপ্রবণ গৌরানন আজো আমার চোখে ভেসে ওঠে, আজো স্বপ্ন দেখি তাঁর নানান হাসির গানে আমাদের দুই শিশু-ভাইবোনের দোয়ার দেওয়া, আর সকলের হেসে গড়িয়ে পড়া! তাঁর কাছে প্রথম দীক্ষা পাই দুটি মন্ত্রে: হাসির ও গানের। গানে তাঁর কাছ থেকে কী পেয়েছি সে খবর সবাই না হ'লেও কেউ কেউ রাখেন যাঁরা আমার গান ভালোবাসেন। কিন্তু তাঁর হাসি থেকে আমি জীবনে কী ভাবে পাথেয় সঞ্চয় করেছি একটু বলব আজ, আরো এই জন্যে যে, এই পাওয়ার হিসেব সব বাল্যস্মৃতিরই প্রধান উপজীব্য।

হাসিকে কোনো কোনো গম্ভীরাত্মা ধার্মিক মনে ক'রে থাকেন ছ্যাপলামির না হোক চপলতার সহোদর। অবশ্য এরকম ছ্যাপলা বাজে হাসি যে আমাদের কান-মনকে পথে-ঘাটে প্রায়ই পীড়া দেয় এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাই ব'লে বলা চলে না যে সব হাসিই এই জাতের। অন্য সব-কিছুর মতন হাসিরও থাক আছে। খেলো হাসি বলি তাকে যে মনের কোনো খোরাকই যোগায় না—খানিকটা কাতুকুতুর হাসির মতন। সেরা হাসি বলি তাকে যে আমাদের দুঃখভার লঘু করে ও মানুষের নানা দোষত্রুটিকে করুণার চোখে দেখতে শিখিয়ে তার নানা অপরাধ হাল্কা ক'রে দেয়, দম্‌কা হাওয়ার মতন গুমট কেটে, আবর্জনা সাফ ক'রে অন্তরে আনে ঔদার্যের আশ্বাস, স্বাস্থ্যের মাভৈঃ। রসিকের দান তাই জীবনে অমূল্যই বলব। কারণ রসিক শুধু যে অপরকে হাসিয়ে আনন্দ দেন তাই নয়, মন যখন কোনো দুশ্চিন্তায় অসাড় হ'য়ে আসে তখন তাঁর হাসির আলোহাওয়ায় ক্লিষ্ট মানুষ খানিকটা টাল সামলে

নিতে শেখে বৈকি। এর একটা কারণ এই যে হাসি আমাদের মনকে খানিকটা ছাড়া দেয় পরিবেশের হাজারো বাঁধন থেকে। রাঙা জ্যেঠামহাশয় ছিলেন এমার্সনের দারুণ ভক্ত, প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন তাঁর একটি গভীরোক্তি : "The perpetual game of humour is to look with considerate good nature at every object in existence aloof···The perception of the comic is a tie of sympathy with other men, a pledge of sanity···A rogue alive to the ludicrous is still convertible. If that sense is lost, his fellowmen can do little for him." আমাকে রাঙা জ্যেঠামহাশয়—তাঁর কথা এল ব'লে—জোর করে এমার্সন পড়াতেন চোদ্দ পনর বৎসর বয়সে—বুঝিয়ে বুঝিয়ে। এর আমি ভাবানুবাদ করি বছর দশেক বাদে :

যা-ই কিছু না ঘটুক—তাদের স্নিগ্ধ চোখে দূর থেকে
দেখলে তবেই হাসির আসর জমে।
হাসি যখন—হই দরদী, পাঁচজনাকে নিই ডেকে,
রটিয়ে—"পড়ি নি গো মতিভ্রমে।"
পাষণ্ডীও তরতে পারে—হাসির কিছু দেখেই বেশ
মন খুলে সে হাসতে যদি পারে।
কেবল—যে না হাসতে শেখে, হায়, জেনো তার সঙিন কেস ;
বাঁচাতে কেউ পারবে না আর তারে।

এ পত্রে একাধিকবার রাঙা জ্যেঠামহাশয়ের নাম উল্লেখ করেছি। এই মহৎ উদার সরল ও স্নেহসুন্দর পিতৃব্যটির কাছেও আমি কম পাইনি, এবং নানা দিক দিয়ে ইনিও ছিলেন একজন অসামান্য মানুষ—সত্যিকার বোদ্ধা, পণ্ডিত তথা বিদ্বান্। তাই তাঁর কথা একটু বলাই চাই।

পিতৃদেবের সঙ্গে জ্যেঠামহাশয়ের তফাৎ ছিল এইখানে যে একজন ছিলেন বিদ্বান ও শিল্পী, অন্যজন—নির্ভেজাল বিদ্বান্ ও পণ্ডিত। বিদ্বান্ বলি—বিদ্যা যাকে ভাবুক ও রসাল করেছে, পণ্ডিত সেই—বিদ্যা যাকে ভারিক্কি ও গম্ভীর করেছে। জ্যেঠামহাশয় নানা গ্রন্থের ভাবধারায় নিত্যস্নান ক'রে এসে জলদগম্ভীর সুরে আমাকে বলতেন অমুক অমুক অবগাহনে কী পেলেন। পিতৃদেব তাঁকে ঠাট্টা ক'রে প্রায়ই বলতেন : "রাঙাদাদার উপাধি bookworm—গ্রন্থকীট।" তিনি অমনি গাম্ভীর্য

ভুলে হেসে জবাব দিতেন: "আর দ্বিজু আমাদের philistine—মূর্খোত্তম।" ব'লে দুই ভায়ের সে কী কোরাসে অট্টহাস্য! জ্যেঠামহাশয় বলতেন মাঝে মাঝে হাসতে হাসতে: "দ্বিজুর সঙ্গে এঁটে উঠবে কে? কালপেঁচাও ফিক ক'রে হেসে ফেলে। আমি তো মাত্র রাশভারি।"

দুভায়ের মধ্যে গভীর মনের মিল ছিল—কেন না উভয়েই স্বভাবে ছিলেন বুদ্ধিবাদী তথা মনস্বী। কিন্তু শুধু 'মনস্বী' সংজ্ঞা দিলে জ্যেঠামহাশয়ের প্রতি একটু অবিচার করা হবে যেহেতু তিনি তার উপরে ছিলেন সত্যিই রসজ্ঞ ও সাহিত্যবোদ্ধা। তাই তো পিতৃদেবের নাটক ও কাব্য তাঁর এত প্রিয় ছিল। তবে তাঁর মস্ত এক খেদ ছিল: 'দ্বিজুর নাটক থেকে দেশ পেল অনেক কিছুই—মানি। কিন্তু নাটক লিখতে গিয়ে যে সে কবিতা লেখা ছেড়ে দিল রে মণ্টু; এ দুঃখ রাখবার আমি জায়গা পাই নে। কারণ সত্যি বলছি তোকে, ও যদি কবিতা লেখার সাধনা না ছেড়ে দিত তবে ওকেও দেশ 'আগে কবি পরে নাট্যকার' ব'লে মেনে নিত।" একথা তিনি বলতেন অবশ্য এই জন্যেই যে সব জাতের সাহিত্যিকদের মধ্যে পুরোধা যে কবি এ-বিষয়ে তাঁর মনে সংশয় ছিল না।

মনে আছে সে-যুগে এ-ধরনের কথা আর কারুর মুখে শুনি নি ব'লেই আমি আরো চমকে উঠেছিলাম। কারণ মনে রাখবেন সে-যুগে পিতৃদেবের নাটক প্রতিষ্ঠায় ছিল প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী—গ্রামে গ্রামে তাঁর নাটকের গান গাইত যুবক চারণের দল! তাই হয়ত তাঁকে আগে কবি পরে নাট্যকার এমন কথা বলবার কথা কারুর মনেও হ'ত না। তাঁকে তাঁর সমসাময়িক বিদগ্ধ সমাজ মানতেন মস্ত হাস্যরসিক, নাট্যকার ও স্বদেশীগানের রচয়িতা ব'লে। কিন্তু জ্যেঠামহাশয় ঠিকই ধরেছিলেন পিতৃদেব সর্বাগ্রে ছিলেন কবি ও গীতিকার, তার পরে নাট্যকার ও হাস্যরসিক।

কিন্তু তাই ব'লে মনে করবেন না—তিনি পিতৃদেবের নাটককে ছোট ক'রে দেখতেন। কত বারই থিয়েটারে পিতৃদেবের স্বষ্ট কোনো মহৎ বাণীতে তাঁকে চোখ মুছতে দেখেছি। তাঁর বাইরেটা একটু গম্ভীর হ'লেও ভিতরটা ছিল যেমন রসজ্ঞ তেম্‌নি কোমল। তাছাড়া পিতৃদেবের মতন তিনিও ছিলেন নীতিবাদী, রাস্কিনের মহাভক্ত, প্রায়ই বলতেন আমাকে: "ঠুনকো ভাব নিয়ে শ্রেষ্ঠ কবিতা হয় না রে মণ্টু, রেখে দে হাল আমলের ঐ যত বিদ্‌ঘুটে আর্ট ফর আর্টস্‌ সেক থিওরি। মহৎ কাব্য হবে মহৎ ভাবের পসারী। যে-কাব্য প'ড়ে মন উন্নত না হ'ল তাকে নিয়ে করব কী শুনি? না রে না, আর্টসম্বল কবিতাকে বড়জোর মিষ্টি ছড়া বলা চলতে

পারে, কাব্য নয়। জানিস রাস্কিন কী বলেন?"—ব'লেই রাস্কিনের Modern Painters বইটি শেল্‌ফ থেকে টেনে—"এই শোন্—" আমি বিপন্ন কণ্ঠে বললাম: "একটু কাজ আছে—আমার এক বন্ধু—" "আর রাস্কিন-চর্চা বুঝি অকাজ? দেখ্, তুই এই বাজে ছেলেদের সঙ্গ ছাড়। তোর ধার আছে, কিন্তু নিষ্ঠা নেই রে—আর নিষ্ঠা নইলে কখনো মানুষ বড় হয় না—"

এ যে কড়া থেকে প'ড়ে গেলাম গনগনে আগুনে! ত্রস্ত সুরে বললাম: "যা বলেছেন। কিন্তু রাস্কিন কী বলেছেন—বলেছিলেন না?"

তিনি তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হয়ে একগাল হেসে বললেন: "এই তো চাই। হ্যাঁ শোন্ রাস্কিন—রাস্কিন—দাঁড়া, বার করি পাতাটা—এই যে, টুকে নে তোর খাতায়—না না, খাতা আনি নাম করে তুই চম্পট দিবি—এই নে কাগজ,—আর পরে তোর খাতায় টুকে মুখস্থ করবি বুঝলি?"

কী করি? টুকে নিলাম রাস্কিনের উক্তি:

"What is poetry? The suggestion, by the imagination, of noble grounds for the noble emotions."

রাঙা জ্যেঠামহাশয় ধমকে উঠলেন: "অমন মনমরা হ'য়ে কপি করে মহাবাণী? Enthusiasm—উৎসাহ চাইরে মন্টু—নিষ্ঠা আর উৎসাহ হ'ল দুই সহোদর ভাই। জানিস্ এমার্সন কি বলেছেন, টুকে নে ফের—ঐ কাগজেই—আর মুখস্থ করতে হবে মনে রাখিস।"

অগত্যা ঢোঁক গিলে যতটা পারি উৎসাহ দেখিয়ে টুকে নিলাম এমার্সনের বাণী: "Nothing great was ever achieved without enthusiasm."

এবার তাঁর কথা একটু বলি:

এমন সরল স্নেহশীল বদান্য পরোপকারী মানুষ আমি কমই দেখেছি। তিনি উকিল ছিলেন ভাগলপুরে, আইনজ্ঞ ব'লে খুব নাম কিনেছিলেন। স্বোপার্জিত অর্থে গঙ্গাতীরে এক মস্ত বাড়ি তৈরি ক'রে নাম দিয়েছিলেন "জাহ্নবীনিবাস" যেখানে আমি মাঝে মাঝেই গিয়ে থাকতাম মহানন্দে—পিতৃদেবের দেহান্তের পরেও।

কিন্তু নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে—পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি কানে কম শুনতে আরম্ভ করতে না করতে তাঁর প্র্যাক্টিস রাতারাতি ধ্ব'সে পড়ল। চোখে তিনি অন্ধকার দেখলেন, কারণ তাঁর ছিল যত্র আয় তত্র ব্যয়—প্রায়ই বলতেন বড় গলা করে: "পরোপকারায় সতাং হি জীবনম্—বলেছেন মুনি, বুঝলি রে মন্টু!"

আমার পতিব্রতা জ্যেঠাইমাও ছিলেন স্বামীর মতনই উদার, পরদুঃখদরদী—কিছুই সঞ্চয় করতে পারেন নি। ফলে তাঁরা পড়লেন অর্থকষ্টে। পিতৃদেব একথা শোনবামাত্র জ্যেঠামহাশয় ও জ্যেঠাইমাকে তাঁদের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে সুরধামে এসে থাকতে নিমন্ত্রণ করলেন। জ্যেঠামহাশয় কলকাতায় এসে পিতৃদেবের সাহায্যে ও নিজের আইনজ্ঞতার জোরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ল কলেজে এক অধ্যাপকের চাকরি পেলেন—মাইনে পেতেন দুশো টাকা। তাতে তাঁর নিজের ও পরিবারের হাতখরচ চ'লে যেত। তাঁর তিন ছেলের স্কুলের খরচ পিতৃদেবই দিতেন—গ্রাসাচ্ছাদনের তো বটেই। Paying guest কাকে বলে কেউ জানত না সে-যুগে।

এমন সময়ে ঘটল এক—অঘটনই বলব। বলি শুনুন।

পিতৃদেবের পুত্রগর্ব ছিল কম নয়। রাঙা জ্যেঠামহাশয়ও আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উজ্জ্বল আশাই পোষণ করতেন—নৈলে কি আর অত চেষ্টা করতেন আমাকে এমার্সন রাস্কিন পড়াতে?

কিন্তু এক পরিবারে অনেকগুলি মানুষকে পাশাপাশি থাকতে হ'লে তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঠোকাঠুকি হবেই। সংঘর্ষ হ'ল এবার আমাতে ও মেঘেনদাতে। সংক্ষেপে বলি। একটা দুর্ঘটনা ঘটে আমাদের খেলার মাঠে—ফলে তদন্ত হয় দোষ কার। রাঙা জ্যেঠামহাশয়ের বড় ছেলে মেঘেনদা একরকম এজাহার দিল নিজেকে বাঁচিয়ে। সবাই জানত মেঘেনদার মিথ্যাবলার দুর্বলতা। আমাকেও তলব করা হ'ল, আমি বললাম অকুণ্ঠে নির্জলা সত্য—যদিও আমারো একটু দোষ ছিল। (এ গর্ব আমি করতে পারি যে আবাল্য আমি সত্যাশ্রয়ীই বটে—মিথ্যা বলিনি কখনো এমন মিথ্যা কথা বলব কেমন ক'রে? তবে একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে, মিথ্যা আমি বেশি বলি নি জীবনে—কারণ দেখেছি যে, মিথ্যা ব'লে সাময়িক সুবিধা কিছু হ'লেও চিত্তগ্লানিতে যে-দুঃখ জ'মে ওঠে সে অসুবিধার অস্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে অনেক বেশি।) পিতৃদেব আমার দোষের জন্যে আমাকে একটু ধমকেই মেঘেনদাকে ধমকালেন কারণ মেঘেনদার দোষ ছিল সাড়ে পনর আনাই। ওদিকে রাঙা জ্যেঠামহাশয় ছিলেন পিতৃদেবের মতনই রাগী তথা পুত্রবৎসল মানুষ, বললেন: "মেঘেন মিথ্যা বলতেই পারে না।" উত্তরে পিতৃদেব বললেন তপ্ত ইংরেজিতেই—আজো পরিষ্কার মনে আছে: "I believe my son against the whole world." বলতেই রাঙা জ্যেঠামহাশয় অগ্নিশর্মা হ'য়ে আরো সুর চড়িয়ে বললেন: "And I believe my son—even against you!"

দুইজনেই যুগপৎ স্নেহশীল, ক্রোধন ও দুর্জয় অভিমানী। ফলে মনান্তর ও কথাবন্ধ।

আমার মনের অবস্থা কল্পনীয়ঃ একদিকে পিতৃদেব আমার বাল্য-জীবনের প্রধান হিরো—অন্যদিকে স্নেহময় জ্যেঠামহাশয়—যাঁর কাছে পেয়েছি কত আদর, শিক্ষা ও উৎসাহ। কিন্তু রাজায় রাজায় যুদ্ধ হ'লে উলুখড় কবে নিষ্কৃতি পায়?

মনঃকষ্টে রাঙা জ্যেঠামহাশয়ের হ'ল জ্বর—আরো এই জন্যে যে, পিতৃদেবই তাঁকে সাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর তিন ছেলে ও দুই মেয়ের গুরুভার বহন ক'রে। ওদিকে সামনে কোন নতুন চাকরির আশা নেই—ল কলেজের লেকচারারের কতই বা মাইনে! অথচ এ-অবস্থায় অন্যত্র যানই বা কোথায়?

আমার মনে ভারি কষ্ট হ'ল—বললাম গিয়ে পিতৃদেবকে। পিতৃদেবের মুখ অন্ধকার হ'য়ে গেলঃ "জ্বর!—চল্ দেখি।"

আমার হাত ধরে তিনি রাঙা জ্যেঠামহাশয়ের বিছানার শিয়রে এসে দাঁড়ালেন। রাঙা জ্যেঠাইমা তাঁর পদসেবা করছিলেন। পিতৃদেব বিছানার পাশে কোনোমতে ব'সেঃ "রাঙাদা! শুনলাম তোমার জ্বর?" ব'লে তাঁর কপালে হাত রাখতেই জ্যেঠামহাশয় "জ্বর নয় রে—বর! তাই না আমি হারানিধি ফিরে পেলাম।" বলতে না বলতে তিনি পিতৃদেবকে বুকে টেনে নিলেন—আর সঙ্গে সঙ্গে সে কী কোরাসে কান্নাঃ ইনি থামেন তো উনি কাঁদেন, উনি থামেন তো ইনি! আমি তো কোকিয়ে কান্না সুরু ক'রে দিলাম জ্যেঠাইমার সঙ্গে। তবু বলব—অঘটনের যুগ গত?

আজ ষাটের কোঠায় পৌঁছে যখন পিছন দিকে তাকাই তখন এই ধরনের কত যে স্বতোবিরোধী ছবি স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে—মনের কত উল্টোপাল্টামি, অভাবনীয় আচরণ! কে ভাবতে পারত যে জ্যেঠামহাশয়ের মতন গম্ভীর মানুষ এভাবে শিশুর মতন কাঁদতে পারেন পঞ্চাশ পেরিয়ে? এ-সম্পর্কে আজকাল আমার একটা কথা প্রায়ই মনে হয় যে আমাদের মনটা আসলে বহুরূপীঃ তার একটা কাটাছাঁটা স্বরূপ নির্ণয় করতে গেলে পুরো মানুষটার খবর পাওয়া অসম্ভব। নভেল নাটকে এ-বিচিত্র স্বভাব-বহুরূপীর একটা সভ্যভব্য সুসঙ্গত মূর্তি আমরা খাড়া করতে চাই, নৈলে কোনো কিছু ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব ব'লে—তাই আর্টে এ-সুসঙ্গতি না খুঁজে হয়ত উপায়ও নেই। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই বলা চলে না কি যে, আর্টে জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি দেখতে চাওয়া ভুল? বড় শিল্পীরা একথা জানেন ব'লে

তাঁদের কাব্যে-নাটকে-নভেলে জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি আঁকতে চান না। বাস্তব-বাদীরা এ-রীতিকে সেকেলে আদর্শবাদ ব'লে নাকচ করলেও বলব—আমাদের মন আর্টে আদর্শবাদ না পেলে পায় না জীবনের কুরূপ অসঙ্গতির খানিকটা অন্ততঃ ক্ষতিপূরণ। তাই সেই সব শিল্পীরাই আর্টে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন যাঁরা তাঁদের শিল্পে ফুটিয়ে তুলতে পারেন—জীবন যা হ'তে পারত অথচ হাজারো দোটানা তেটানার উপদ্রবে হতে পারেনি তারই রূপময় বর্ণময় রসময় গন্ধময় আলেখ্য। আর এ-ছবি শিল্পী ফোটাতে পারেন তখনই যখন জীবনকে তিনি নিরীক্ষণ করতে শিখেছেন তাঁর তীক্ষ্নদৃষ্টির অণুবীন তথা বুকের দরদের স্পন্দন দিয়ে। কেননা কেবল তখনই তাঁর দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে যা উপর উপর দেখায় ধরা পড়ে না।

এ-সূত্রে আমি বলতে চাই একটা কথা। সেটা এই যে, আমি যখন পিছন দিকে চেয়ে দেখি আমার বাল্যরূপকে তখন আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটা সত্য: যে আমি স্বভাবে মূলতঃ জিজ্ঞাসুই বটে। গীতায় বলেছে ভগবানকে মানুষ ডাকে চারটি ছন্দে: আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। আমি এদের মধ্যে তৃতীয় থাকের—অর্থাৎ জিজ্ঞাসু। এখানে জিজ্ঞাসু বলতে আমি বুঝছি সেই সন্ধানীকে যে জীবনকে দুর্বোধ্য বা রহস্যময় ব'লে হাল ছেড়ে দেয় না—যা হাতে পায় তাকে ভোগ ক'রেই নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করে না—হাল্কা সুখ বা সস্তা উত্তেজনার নেশায় মেতে পথ চলতে রাজি হয় না—এক কথায়, যে সংসারে জন্ম নিয়েও গতানুগতিকতার পথে সফল হ'তে চায় না। না—চায় না বলা ভুল, পারে না—আর পারে না শুধু এই জন্যেই যে এ তার স্বধর্ম নয়। আরো পরিষ্কার ক'রে বলি: জিজ্ঞাসু বলতে আমি বুঝি সেই সন্ধানীকে যে সব আগে চায় কয়েকটি আদিম প্রশ্নের উত্তর। সবাইকার জীবনের আদিম প্রশ্ন এক এমন কথা বলব না, কিন্তু পথ চলতে জীবনের কোনো না কোনো আদিম প্রশ্ন নিয়ে যে আদৌ মাথা ঘামায় না সে আর যাই হোক জিজ্ঞাসু নয় একথা বলতেই হবে। যতদূর মনে পড়ে, আমার মনে জেগেছিল মূলতঃ চারটি প্রশ্ন: আমি জন্মেছি কেন? ভগবান আছেন না নেই? যদি থাকেন তবে কোন্ পথে গেলে তাঁর দেখা মেলে। তাঁকে পেলে আমার জীবন সার্থক হবে তো? এই শেষের প্রশ্নটির একটু ভাষ্য করতে হবে কারণ পরের জীবনে সার্থকতা বলতে আমি যা বুঝেছি বাল্যকালে অবশ্যই সার্থকতার সে-রূপ আমার চোখে পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠেনি।

তিন

সুন্দর কার নাম? প্রেমের স্বরূপ কি? কর্তব্য বলি কাকে? অহিংসার নিহিতার্থ কী? নীতির কোন সার্বভৌমিকতা আছে কি? জ্ঞান আহরণ ক'রে কি মানুষের সুখ বাড়ে না দুঃখ? সত্য শাশ্বত, না বহুরূপীর মতন যুগে যুগে ভোল বদলায়? জীবনের সত্য ও শিল্পের সত্যের মধ্যে মিল বেশি, না অমিল? এই ধরনের কত প্রশ্নই না ভিড় ক'রে ধাক্কা দেয় জিজ্ঞাসু মনের দ্বারে, আর ভাবতে ভাবতে মন পড়ে অথই জলে। কিন্তু সবচেয়ে কঠিন বোধ হয় সার্থকতা বলতে কী বোঝায় এই প্রশ্নটির উত্তর জোগানো, কেন না সুন্দর, প্রেম, কর্তব্য, নীতি, জ্ঞান, শিল্প সবই রয়েছে ওর মধ্যে অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে। তাই সার্থকতা ওরফে fulfilment-এর কোনো সর্বগ্রাহ্য সংজ্ঞানির্ণয় করার অপচেষ্টা না ক'রে সোজাসুজি বলব এ-সম্বন্ধে আমার নিজের গবেষণা বা উপলব্ধি—যাই বলুন।

সার্থকতা বলতে আজ আমার মন নেয় গীতার সংজ্ঞা :

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে॥

অর্থাৎ

এমন সে মহালাভ যার পরে অন্য কোনো লাভ
মন আর লাভ নাহি গণে,
লভিলে যে-বর যোগী যতই সহুক দুঃখ তাপ—
বিচলিত হয় না জীবনে।

বলাই বেশি যে, বাল্যে কি কৈশোরে এ-শ্লোকটির নিহিতার্থ ধরবার শক্তি আমার ছিল না—যদিও গীতা একাধিকবার প'ড়ে ফেলেছিলাম, বিশ্বাস করবেন। না বুঝেও পড়েছিলাম কোন্ তাগিদে আজ তার নিদান দেওয়া মুস্কিল, তবে মনে হয় আমার মধ্যে যে-অশান্ত চিরকৌতূহলী আমাকে নানা পথের নানা বাঁকে ডাকে পাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে সেই আমাকে পড়িয়েছিল শুধু গীতাই না—পুরাণ, সংহিতা, দেবীভাগবত এমন কি রমেশ দত্তর নীরস ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ পর্যন্ত। ঋগ্বেদ আমার মনকে স্পর্শ করেনি একটুও, ভাবতাম কেনই বা এ-বইয়ের এত নামডাক? কিন্তু গীতা প'ড়ে তা মনে হয়নি—বরং ভাবতে মন আর্দ্র হ'য়ে উঠত যে, আমার

যদি কোনো ইষ্টদেব থাকতেন তবে তাঁর কাছে আমি এই ধরনের সখ্যই চাইতাম, যে-সখ্য অর্জুনের মতন প্রশ্নের পর প্রশ্নবাণ সইবে পরম অনুকম্পাভরে। গীতার আঠারো অধ্যায় পাঠের পরে—স্পষ্ট মনে আছে—কেবল একটি অর্ধ-শ্লোক আমার বালকমনের তারে নিরন্তরই রণিয়ে উঠত: "অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।" একথা বলছি না যে, এ-শ্লোকটির প্রথম চরণে "সর্বধর্ম পরিত্যাগ ক'রে তাঁর শরণ নেওয়ার" মানে সে-বয়সে আমি বুঝতাম। বহু বৎসর পরে সাধনার পথে আত্মাভিমানের সঙ্গে দিনের পর দিন লডতে লড়তে নাকের-জলে-চোখের-জলে হ'য়ে তবে একটু বুঝেছি একান্ত শরণাগতির, অসহায ব্যাকুলতার মর্ম। কিন্তু পাপ বা মন্দ কাজ কাকে বলে তা তো জানতাম। কাজেই কেমন যেন একটা আশ্বাস পেতাম গীতার ঠাকুরের এই মধুর প্রতিশ্রুতির মধ্যে যে তাঁকে ডাকলে সব পাপের বেড়াজাল থেকে রাতারাতি মুক্তি পাওয়া যাবে। আরো উল্লসিত হ'য়ে গাইতাম বিখ্যাত রামপ্রসাদী গান—"মন তুমি কৃষিকাজ জানো না"-রটি দুচরণ:

কালী নামে দাও রে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে,
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া তার কাছে তো যম ঘেঁষে না।

বেশ মনে আছে গানের আবেগে মন ছেয়ে যেত—ভরসা জেগে উঠত ভাবতে যে এমন শক্তিময়ী মুক্তকেশী জগন্মাতা একজন আছেন যাঁকে যমও ডরায। ভাবানুষঙ্গের প্রসাদে আরো যেন উচ্ছ্বাস উঠত উজিয়ে—মাতৃহারা বালকের স্মৃতিনেত্রে ভেসে উঠত তার শৈশবে-হারানো শ্রীমন্তিনী মা-র স্নানের পরে মেঘের মতন এলোকেশ রোদে শুকোনো—যাঁর কান্তি দেখে "জানিস্ লাটসাহেব বলেছে—কে এ মেয়ে গা—এ কি ঠাকুর বাডির মেয়ে?"—বলতেন দিদিমা জাঁকালো সুরে যখন তখন।

কিন্তু এ-ধরনের কল্পনায় মন সাড়া দিলেও, একথা বলাই বেশি যে গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ স্থিতধী নিরাশী যোগযুক্ত সমদর্শন—এসব গালভরা বিশেষণের কোনোটারি আমি মর্মজ্ঞ হ'তে পারিনি। তাই দু'তিনবার গীতা প'ড়ে হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবতাম আথাল-পাতাল কত কী—তা কি আর মনে আছে? কেবল এইটুকু মনে আছে—যেজন্যে আমি নিজের 'জিজ্ঞাসু' নামকরণ করেছি—যে কে যেন আমাকে নিরন্তরই বলত—আমাকে এমন কোনো পরশরতন খুঁজে বার করতেই হবে যা আমার না পেলেই নয়। কিন্তু কী যে সে পরম লাভ যার পরশমণির ছোঁওয়ায় আমার জীবন সোনা হ'য়ে যাবে—হাজার ভেবেও কূলকিনারা পেতাম না। কেবল

থেকে থেকে একটি দুরাশা ধীরে ধীরে আমার মনের মধ্যে নিরন্তরই উঁকি মারত যে, আমাকে পেতেই হবে এমন অবস্থা যে-অবস্থায় সুখের উল্টো পিঠে দুঃখ নেই। অবশ্য এ-রোখও যে কিছু একদিনে জেগেছিল তা নয়—বহু পোড় খেয়ে তবেই আমাকে পেয়ে বসেছিল। কথাটা আরো একটু পরিষ্কার ক'রে বলবার চেষ্টা করি।

বলেছি, বাল্যকালেই পিতৃদেবের প্রশ্রয়ে আমি মুখফোঁড় ও বেপরোয়া মতন হ'য়ে উঠেছিলাম। তিনি আদর দিয়ে আমার পরকালটি ঝরঝরে ক'রে দিচ্ছেন এ-অভিযোগ শুনতাম চারদিকেই। কিন্তু ছিলাম তো পর্বতের আড়ালে, তাই বলতাম বড় গলা ক'রেই: "কে কী বলে না বলে কী যায় আসে?" কিন্তু মুখে বললে হবে কী, হবে, গুরুজন কেউ আমাকে একটু ধম্‌কালেও আমি সারাদিন মুখভার ক'রে থাকতাম। এককথায়, দারুণ অভিমানী যাকে বলে। জীবনে স্থূল ও রূঢ় আঘাত যারা বেশি পায় নি তারা অল্প ঘা খেলেই মুহ্যমান্ হ'য়ে পড়ে—কে না জানে? জ্যেঠামহাশয় জ্যেঠাইমার হাতে মেঘেনদাকে যতবারই মার খেতে দেখেছি শিউরে উঠেছি ভাবতে—"যদি আমি মেঘেনদা হতাম। উঃ!" সগৌরবে বলতাম একে ওকে তাকে: "আমার বাবা আমাকে একটি কড়া কথা পর্যন্ত বলেন না—ধম্‌কানো বা গায়ে হাত তোলা তো দূরের কথা।" আত্মীয়স্বজনরা বলতেন দুঃখ ক'রে যে এই অত্যধিক প্রশ্রয়েই আমি হয়ে উঠেছি এমন স্পর্শকাতর, দুরভিমানী—যে ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায় পদে পদে।

কিন্তু আজ বুঝেছি যে, আমার স্পর্শকাতরতার আরো গভীর কারণ ছিল। সেটা এই যে, আমার অনুভবশক্তি ছিল গড়পড়তা শিশুর চেয়ে অনেক বেশি। তাই পরে আমি নিজের সাফাই গাইতে চেয়ে হাহুতুশে সুরে বলতাম: "এইজন্যেই আমি ঘুরতে ফিরতে এত দুঃখ পেয়েছি।" অবশ্য পাবার সময়ে ভুলে গেছি বারবারই যে সুখও কম পাইনি দিনে দিনে। যাক্।

কিন্তু শুধু দুরভিমানী বা স্পর্শকাতর ব'লেই যে আমি এত বেশি দুঃখ পেয়েছিলাম তাও নয়। আমার দুঃখ পাবার আরো একটি কারণ ছিল এই যে, আমি বাল্যকালে মাতৃহারা হওয়ায় দরুন খানিকটা নিঃসঙ্গ হ'য়ে ক্রমাগত বই-মুখ ক'রে থেকে অজ্ঞাতে বেশ একটু ভাববিলাসী হ'য়ে পড়েছিলাম—মানে, নিজেকে নিয়েই অহরহ ব্যস্ত থাকতাম—যাকে বলে আত্মকেন্দ্র বা introvert: তাই কেবলই নিজেকে প্রদক্ষিণ করতাম আর ভাবতাম: কী ক'রে আরো ভালো হব, আরো সুন্দর, আরো মহৎ, আরো পবিত্র, আরো উদার বিদ্বান্? মনে হ'ত সময়ে সময়ে:

"আহা রে! যদি আরব্যোপন্যাসের আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ কোনো উপায়ে হাত করা যেত তাহ'লে কত কীই যে চাইতাম: ফুটবলে নিবারণ আমাকে কেবল হারায়—তাকে হারিয়ে দমিয়ে দিতে, ক্লাসে ক্ষিতীশ প্রতি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে আমাকে সেকেণ্ড বয় দাঁড় করায়—তাকে সেকেণ্ড বয় ক'রে শোধ তুলতে—উড়ে যেতাম রোজ গঙ্গাস্নান করতে—যে-বই চাই হুকুম দিতাম আর হুকুমবরদার দৈত্য সরবরাহ ক'রে হুকুম তামিল করত,"—এই সব ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠতাম আনন্দে—আর সব ছাপিয়ে মনে হ'ত—যে-কোনো প্রিয়সঙ্গ চাইবামাত্র পেতাম কাছে। পরে একদিন পিতৃদেবের কাছে গল্প শুনি এক চাষার, যে রাণী রাসমণিকে দেখে ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে সোচ্ছ্বাসে গল্প করেছিল: "কী রাণীই দেখে এলাম রে—সে আর বলব কী তোকে? রাণী এদিকে ফিরছেন, চিনি খাচ্ছেন—ওদিকে ফিরছেন চিনি খাচ্ছেন!" ব'লে পিতৃদেব অট্ট হেসে বলেছিলেন: "তা ব'লে ভাবিস নে যে আমরা রাজা হ'লে এদিকে ওদিকে ফিরতে যা চাইতাম তার তৃপ্তি ঐ চাষার অফুরন্ত চিনি খাওয়ার তৃপ্তির চেয়ে খুব বেশি উঁচু দরের।

"কেন বাবা?"—বলেছিলাম আমি ভাবিত হ'য়ে—"আমরা তো সে-চাষার মতম বোকা নই?"

"চাষা কি নিজেকে বোকা বলে জানে রে? ঠিক তেমনি আমরাও টের পাইনে কতখানি বোকা আমরা। নৈলে কি মানুষ নিত্য ভুল ক'রে চাইত এত আজে বাজে জিনিস!"

পিতৃদেব আমাকে বেশ-একটু দমিয়ে দিয়েছিলেন বই কি। কারণ মনে আছে, ভাবতাম কেবলই: "বাজে জিনিস চাই আমরা! দূর। অন্ততঃ আমি রাজা হ'লে চাইতাম ময়ূর-সিংহাসন—চিনির পাহাড় নয়।"

পরে বারবার ঠেকে শিখে, একটু একটু ক'রে বুঝবার কিনারায় আসি যে, সত্যিই আমরা "যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই"—রবীন্দ্রনাথের এ-লাইনটি আমার দৃষ্টি খানিকটা খুলে দিয়েছিল বৈকি—যদিও ঠিক বাল্যকালে নয়—পরে, যৌবনে। তখন মনে পড়ত পিতৃদেবের গানের আসরে একদিন তাঁর পরম ভক্ত রজনীকান্ত সেন গেয়েছিলেন ভক্তির আবেগে: "ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়!" যৌবন পেরিয়ে প্রথম এ-গানটির মর্ম আরো উপলব্ধি করি—যখন পিছন দিকে তাকিয়ে দেখতাম অজ্ঞানে কত কী অসার বর চেয়েছি কত দুর্বল অসতর্ক মুহূর্তে! কিন্তু মনে আছে বাল্যকালে যখন কান্তকবির মুখে এ-গানটি শুনি তখন সত্যিই ভেবে পাই নি কী

ঠিক তিনি বলতে চাইছেন। পরে রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতা—বিরহিণী নারী—প'ড়ে খানিকটা হদিশ পাই এই সত্যের যে, যে-বর পেলে সব দুঃখ ঘোচে সে যে কী বস্তু ভেবে বার করা খুব সহজ নয়। কবিতাটিতে কবি বড় সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তুলেছিলেন বিরহিণীর এ ও তা চাওয়া ও পাওয়ার পরেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া—নিজের পরম ক্ষুধার স্বরূপটি ঠাহর করতে না পাওয়ার দরুন। স্থানাভাবে সমস্ত কবিতাটি উদ্ধৃত করতে পারলাম না, শুধু শেষ স্তবকটি দিচ্ছি :

আমি কহিলাম : "কারে তুমি চাও, ওগো বিরহিণী নারী ?"
সে কহিল : "আমি যারে চাই তারনাম না কহিতে পারি।"
রমণীরে কেবা জানে ?
মন তার কোন্‌খানে !
সে কহিল : "আমি যারে চাই তারে
পলকে যদি গো পাই দেখিবারে
পুলকে তখনি লব তারে চিনি' চাহি তার মুখপানে।"

ব'লে কবি অবশেষে খুলে বললেন—কী চায় আমাদের প্রতি অন্তরের অতৃপ্তা বিরহিণী—

দিন চ'লে যায়, সে কেবল হায় ফেলে নয়নের বারি—
"অজানারে কবে আপন করিব—" কহে বিরহিণী নারী।

আজো মনে পড়ে—যৌবনে যখন আমার মনে প্রথম বৈরাগ্য প্রবল হয় তখন এ-অপূর্ব কবিতাটি পড়তে না পড়তে চোখের জলে আখরগুলি ঝাপসা হয়ে আসত।

বলেছি ছেলেবেলায় খুব বেশি পড়তাম রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ, সংহিতা। বিশেষ ভালো লাগত বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের কাহিনী যে চেয়েছিল ঠাকুরকে। কিন্তু ঠাকুর ঠিক কী বস্তু ? না, যিনি ভক্তকে রক্ষা করেন নানা আঘাত থেকে—যেমন প্রহ্লাদকে! ধ্রুবের কাহিনী প'ড়ে আরো ধাঁধা লাগল। এ কী ব্যাপার ? ধ্রুব রাজা হ'তে বনে গেল কিন্তু নারায়ণ এলে পরে কি না বলল : 'তোমাকে পাওয়ার পরে আর কী চাইবার থাকতে পারে ?' শুনতে খাসা—কিন্তু খট্‌কা লাগত : "ঠাকুরকে 'পাওয়া' মানে কী! ঠাকুর তো চোখের দেখা দিয়ে দিব্বি ফিরে গেলেন তাঁর আস্তানায়, বৈকুণ্ঠে ? আমরাই রয়ে গেলাম যে-তিমিরে সেই তিমিরে ? অভাব তো অভাবই রয়ে গেল।" তখন কি ভাবতে পারতাম যে ঠাকুর যার কাছে ধরা দেন তার কোনো অভাবই থাকে না ?

কিন্তু সে-সময়ে আমাকে এ-সমস্যার সমাধান ব'লে দেবে কে? আমাদের চারদিকে তর্কাতর্কি হ'ত যে-সব সমস্যা নিয়ে তার মধ্যে ভগবান্ কালেভদ্রে উড়ে এলেও জুড়ে বসতে পারতেন না তো। বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলির মধ্যে তিনি তাঁর আসন পাতবেন কোথায়? পিতৃদেবের সান্ধ্য মজলিশে আসতেন গুণী, জ্ঞানী, সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী—এককথায়, যাঁদের নাম বুদ্ধিবাদী। এঁদের মধ্যমণি ছিলেন পিতৃদেব যিনি কথায় কথায় শুধু যে নিজেকে নাস্তিক বলতেন তাই নয়—বিদ্রোহের লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে গান বাঁধতেন, কবিতা লিখতেন। মনে আছে এই সময়ে তিনি মাঝে মাঝেই তাঁর একটি দৃপ্ত গান গাইতেন যে-গানটি আমার গ্রহিষ্ণু মনে গভীর দাগ ফেলেছিল:

কোথা তুমি কোথা তুমি বিশ্বপতি! বৃথা বিশ্বময় খুঁজে বেড়াই।
তারা বলে সব দেখেছে তোমারে, আমি কই নাহি দেখিতে পাই!
সিংহশিশু করে মেষরক্ত পান,
বলী বলহীনে করে অপমান,
তুমি সর্বশক্তি তুমি ন্যায়বান্ দূরে কি বসিয়া দেখিছ তাই।
ধনীর আস্পর্ধা, কপটের জয়,
ধর্মের পতন তবে কেন হয়?
তুমি যদি প্রভু দেব দয়াময়, এ-নিয়ম তরে তবে কে দায়ী?

এ-গানটি গাইতে গাইতে তাঁর গৌরবর্ণ মুখ উদ্দীপনায় টকটকে রাঙা হ'য়ে উঠত। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে জল ভ'রে আসত—সময়ে সময়ে পালিয়ে যেতাম কান্না চাপতে। আর রীতিমতন দ'মে গিয়ে ভাবতাম: 'তাই তো! যে-জগতে এত দুঃখ কষ্ট নিষ্ঠুরতা অত্যাচার সে-জগতের হাল ধ'রে আছেন এক করুণাময় ন্যায়বান্ ভগবান্ এ কেমন কথা? বহুদিন বাদে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের একটি উক্তি পড়ি তাঁর জীবনীতে (Passionate Sceptic) তাতে জীবনীকারকে রাসেল বলছেন: "But the world *is* horrible"—বটেই তো। তখন চকিতে মনে প'ড়ে গিয়েছিল পিতৃদেবের এই অবিস্মরণীয় গানটি—নাস্তিবাদী রসোত্তীর্ণ গানের মধ্যে শক্তিমত্তায় যার জুড়ি আমার অন্তত চোখে পড়ে নি। জগৎ নিদারুণ—নয় তো কী? কাজেই এ-অকরুণ জগতের নিয়ন্তা করুণাময়—একথা কেমন ক'রে সিদ্ধ হয়?

শক্তি মানুষকে অভিভূত করে বৈ কি। তাই তো এ-গানটি আমার জীবন-

জিজ্ঞাসার এ-টলমান অধ্যায়ে আমার মনের উপর এত গভীর ছাপ ফেলেছিল যার ফলে আমি রুখে উঠে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অর্জুন, বিদুর জাতীয় ভক্ত বিশ্বাসীদের কথা ভুলে দোয়ার দিতাম পিতৃদেবের সঙ্গে :

তার চেয়ে বলি শোক-দুঃখ-জরা-
পীড়ন-পেষণ-অবিচার-ভরা
আপনি চলেছে অরাজক ধরা, এ-রাজ্যের রাজা কেহ তো নাই।

কিন্তু—এইখানেই আসে মনের সেই চিরকেলে অসঙ্গতি—কোথায় যেন ব্যথা বাজত ভাবতে যে অরাজক ধরা চলেছে হালভাঙা নৌকার মতন দিশাহারা অকূল পাথারে। কেন বাজত জানি না, কেন না তখন ভগবানের কীই বা বুঝি ? শুনি গুরুজনদের মুখে যে ভগবান্ আছেন—খানিকটা মেনেই নিই অজান্তে, ডাকি সময়ে সময়ে আকাশের দিকে চেয়ে, বলি মনে মনে—তিনি যখন ডাকলে শোনেন আর সব কিছুরই সুরাহা ক'রে দেন তখন নিশ্চয় আমাকেও জানিয়ে দেবেন যে, তিনি আছেন —যদি থাকেন অবশ্য : আর যদি নাই থাকেন তবে পিতৃদেবের একটি কবিতা মনে পড়ত :

যদি নাই পরলোক তবে কে করিবে শোক
মৃত্যুর অপর পারে আমি নাই যদি ?

এসব কথা আমি বাড়িয়ে বলছি না। সত্যিই আমি ভগবান্ আছেন কি না এ-প্রশ্ন নিয়ে বার-তের বৎসর বয়সেই বিপর্যয় মাথা ঘামাতাম ; তাই তো নিজেকে "জিজ্ঞাসু" ব'লে চিনেছি—আরো এই জন্যে আমার বন্ধু সহপাঠীদের মধ্যে তখন একজনকেও দেখি নি যাকে আমার দোটানার দুরবস্থার কথা বললে সে ব্যথা দিয়ে ব্যথা বুঝত। কারুর কারুর কাছে ভয়ে ভয়ে এ-প্রসঙ্গ তুললে তারা হেসে উঠত— "যত সব বুড়োটে ফাজলামি !—পড়াশুনা খেলাধুলা কর্—ওসব ভেবে কী হবে—শুধু সময় নষ্ট বৈ তো নয়।"

এই ভাবে নানা ওঠা-পড়ার পরে মন একটু থিতিয়ে এলে পণ নিলাম যেহেতু নাস্তিক হবার মধ্যে কেমন যেন একটা বীরত্বের পুলক আছে, সেহেতু বীর হওয়াই পন্থা। আর ভগবান্‌কে না-মানার মধ্যে বীরত্ব আছে মনে হ'ত প্রধানত আমার জীবনের দু'জন হিরোকে দেখে : পিতৃদেব ও গিরিশ মেসোমহাশয়। মেসোমহাশয়ের কথা "উদাসী দ্বিজেন্দ্রলালে" বড় ক'রে লিখলেও এখানে ফের আরো কিছু বলতে হবে—পুনরাবৃত্তির

আশঙ্কা সত্ত্বেও—নৈলে আমার বাল্যজীবনের পরের অধ্যায়ের কথা ফলাও করা যাবে না।

আমার মেজমাসিমা শ্রীমতি সুশোভিনী দেবী ছিলেন আমার মা-র মতনই গৌরী ও পরমা সুন্দরী। তাঁর বিবাহ হয় শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্মার সঙ্গে রেজিস্ট্রি ক'রে। কারণ স্বামী-স্ত্রী যে সগোত্র—কাজেই হিন্দুমতে বিবাহ হ'লে শেষে যদি সে-বিবাহ বাতিল হয় আইনের চোখে? ফলে গোঁড়া হিন্দুসমাজে তাঁরা একঘরে মতনই হয়েছিলেন যদিও কলিকাতায় কে কাকে করে একঘরে?

মাসিমা স্বামীকে ভালোবেসেছিলেন আদর্শ হিন্দু পতিব্রতার মতনই বটে, কিন্তু আদর্শ পতিব্রতারো থেকে থেকে পতির সঙ্গে বেবনতি হয়ই তো এ-ও-তা নিয়ে। মাসিমার বাধত মেসোমহাশয়ের ধর্মমত ও পিতৃগৃহ নিয়ে। শেষের প্রসঙ্গটা পরে তুলছি। প্রথমটার বেলা মতানৈক্যের ব্যাপারটা এক কথায়ই বলা যায়—মাসিমা ছিলেন ভগবানে ভক্তিমতী, মেসোমহাশয় নাস্তিক তথা রসিক। একটু আধটু গাইতেও পারতেন বেহালা বাজিয়ে। মাসিমাকে উস্কে দিতে চেয়ে গুন গুন ক'রে তিনি প্রায়ই গাইতেন পিতৃদেবের বিবাহ সম্পর্কে নানা হাসির গান, বলতেন মাসিমাকে "ওগো, দ্বিজদা নিশ্চয় তোমাকে আমাকে দেখেই এগানটি বেঁধেছিলেন, না?

'বুড়োবুড়ি দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত, বুড়ি ছিল পরম বৈষ্ণব, বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত। হ'ত যখন ঝগড়াঝাঁটি, হ'ত প্রায়ই লাঠালাঠি, ব্যাপার দেখে ছুটোছুটি, পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকত' "...

তিনি ছিলেন নির্জলা বুদ্ধিবাদী: বুদ্ধির কাছে যা গ্রহণীয় নয় তাকে স্রেফ ধুলো পায়ে বিদায়। কাজেই ভগবানকে মঞ্জুর করবেন কোত্থেকে? মাসিমা সভয়ে আপত্তি করতেন: "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" মেসোমহাশয় অকুতোভয়ে পাদপূরণ করতেন: "আর, বুদ্ধিতে মিলয়ে মুক্তি অতি সুমধুর।" মাসিমা রাগ ক'রে বলতেন: "আহা মরি মরি! বুদ্ধি, না অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি!" মেসো বলতেন: "হুম্। তাই সই, কিন্তু নিজের বুদ্ধিতে ফকির হওয়াও ভালো পরের বুদ্ধিতে রাজা—থুড়ি—রানী সুশোভিনী হওয়াও কিছু নয়।"

তাই নজির দেওয়া, শ্লোক আওড়ানো তিনি ভালোবাসতেন না। কেউ তর্কস্থলে শাস্ত্রের মতামত তুলতে না তুলতে বলতেন: "ও তো হ'ল অপরের বুলি। আমি চাই আমার নিজের বুদ্ধির বিধান।" আমাকে তাই প্রায়ই বলতেন: "দ্বিজদাকে আমি এত ভক্তি করি কেন জানো মণ্টু? তিনি মস্ত প্রতিভা ব'লে নয়—তিনি পরের

মুখে ঝাল খেতে নারাজ ব'লে—বুদ্ধি ও বিচার এই দুই পায়ে ভর ক'রে দাঁড়াতে ভয় পান না ব'লে—এমন কি ভূমিকম্পের সময়েও।"

বুদ্ধির গর্ব তিনি করতে পারতেন, তর্কে যাঁকে এঁটে ওঠা ভার। মাসিমা শোভনা হ'লেও অবলা তো—পেরে উঠবেন কোত্থেকে? তাই প্রতি বিতণ্ডায় বা কলহে শেষে প্রায়ই তাঁকে কেঁদে জিততে হ'ত। কিন্তু এবার মাসিমার কথা রেখে মেসোমহাশয়ের কথায় ফিরে আসি।

শুধু বুদ্ধিমান্ নন, শক্তিমান্ ও গুণবান্ পুরুষ ছিলেন তিনি। সচ্চরিত্রতায়, সত্যনিষ্ঠায়, স্বাস্থ্যে, ব্যক্তিত্বে, গল্পালাপে, রসিকতায়, বেপরোয়া চালচলনে, অসুস্থের সেবায়, পরোপকারে, সর্বোপরি বসুধৈব কুটুম্বকম বন্ধুবৎসলতায়—সব জড়িয়ে তিনি ছিলেন একটি আশ্চর্য মানুষ। পিতৃদেব তাঁকে গভীর স্নেহ করতেন—গিরিশ বলতে অজ্ঞান। তিনিও পিতৃদেবকে ভক্তি করতেন মনেপ্রাণে। এত ভক্তি যে—অমন রোখালো কালাপাহাড় তো, তবু প্রায়ই ভোরবেলায় এসে পিতৃদেবের পা টিপতেন—যখন পিতৃদেব বারান্দায় শুয়ে ঘুমন্ত। আমাকে প্রায়ই বলতেন: "মণ্টু, তোমাকে মাতৃহারা ব'লে আর যেই আহা উহু করুক না কেন, আমি কী করি বলব?"

"কী?"

"ধন্য ধন্য—যে, তুমি এমন বাপ পেয়েছ। একসঙ্গে মা ও বাপ পায় হাজারো শিশু, কিন্তু একাধারে মা ও বাপ পায় কোটিতে গোটিক। আর মনে রেখো—তুমি যে ছেলেবেলাই এমন সাবালক হ'য়ে পড়েছ এর মূলেও আছে দ্বিজদার বুদ্ধি প্রতিভা ও শিক্ষা। পরে বুঝবে কত কী পেয়েছ তুমি তাঁর কাছ থেকে।"

এহেন দরদী মেসোমহাশয়ের খেলার ও তর্কের সাথী ছিলাম আমি। হবে না গর্ব? বলতে ভুলেছি, তিনি কতরকম খেলাই যে খেলতে পারতেন—ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, দাবা, পিং-পং, হা-ডুডু—কতরকম খেলাই যে উদ্ভাবন করতেন! দুর্ধর্ষও ছিলেন কি কম নাকি? সাইকেলে চ'ড়ে একবার কলকাতা থেকে কাশী না দিল্লি যান। দাবাখেলায় আমি তাঁকে প্রায়ই হারিয়ে দিতাম—আমি আর কোনো খেলায়ই পটু ছিলাম না, কিন্তু দাবাতে আমার মাথা খুলে গিয়েছিল সাত আট বৎসর বয়সেই—তাঁর সঙ্গে খেলতে খেলতে।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে খেলাধুলোর মধ্যে দিয়েই নিকট-পরিচয় হ'লেও অন্তরঙ্গতা হয় তর্কাতর্কির মধ্যে দিয়েই বটে। কারণ তিনি আমায় শুধু গভীর স্নেহ নয়, আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। পই পই ক'রে মানা করতেন কারুর নজিরে কিছু মেনে নিতে।

"স্বাধীন চিন্তা" ছিল তাঁর একটি প্রিয় বুলি। অথচ, একদিকে পিতৃদেব অন্যদিকে মেসোমহাশয়—দুয়ের প্রভাবে প'ড়ে আমি যে তার্কিক হ'য়ে উঠব এতে বিস্ময়ের কী আছে? আমার আত্মীয়-স্বজন তথা পিতৃবন্ধু অনেকেই এ চড়ে-পাকা ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ভেবে হাহুতুশে হ'য়ে উঠতেন। কেবল মেসোমহাশয় একা উৎফুল্ল হ'যে মাসিমাকে বলতেন: "দেখ দেখ গো, একরত্তি ছেলে কেমন চমৎকার তর্ক ক'রে!" উত্তরে মাসিমা বলতেন মুখ ভার করে: "হ্যাঁ, এই সব ব'লে ব'লে চিবিয়ে খাও একরত্তি ছেলের মাথাটি—তোমার আর কি—পরে ঝক্কি তো তোমাকে পোহাতে হবে না।" মেসোমহাশয় প্রত্যুত্তর দিতেন: "আর লক্ষ্মী ছেলে হ'লেই বুঝি সে পক্ষিরাজ হয়? না মণ্টু, তুমি মাসির কথা শুনো না বাবা, মেসোর কথাই শুনো—আর যত পারো তর্ক করো—না বুঝে কোনো কিছুই মেনে নিও না—মনে রেখো দ্বিজদারও এই মত, আর তাঁর মতন জ্ঞানী গুণী বিদ্বান্ দিনদুনিয়ায় ক'টা মেলে?"

আমাদের স্বভাব যা চায় তাতে যারা সায় দেয় তারা অতি সহজেই আমাদের প্রিয়জন হ'য়ে ওঠে—না, তারও বেশি—পরিজন। কাজেই মেসোমশাই হ'য়ে উঠলেন আমার পরিজন—আমার বালখিল্য অভিমানকে মহাকায় ক'রে তুলে: আমি হ'য়ে উঠলাম ঠিক উদ্ধত না হ'লেও উগ্র আত্মবিশ্বাসী ও তার্কিক। বিতণ্ডায় উঠতাম উজিয়ে—কেউ শাসন করতে এলে তুলতাম শিরপা আর সর্বোপরি মেসোমশায়ের কথাম'ত—পারি বা না পারি—ভাববার চেষ্টা করতাম খানিকটা স্বাধীনভাবেই বলব। এর একটি ভালো দিক থাকলেও অমনি একটা মন্দ দিকও যে নেই তা নয়: অর্থাৎ আমি হয়ে উঠলাম সব বিষয়েই অহঙ্কারী তথা একগুঁয়ে।

প্রথম দিকে অহঙ্কার আমাদের অনেক কিছু দেয়—আমাদের ব্যক্তিরূপটি গ'ড়ে ওঠার মুখে। কারণ তখন আত্মাভিমান কচ্ছপের আবরণের মতনই খানিকটা আমাদের স্পর্শকাতর আত্মপ্রণয়কে আশ্রয় দেয়—বাইরে-থেকে-আসা আঘাতকে প্রত্যাখান ক'রে। অহঙ্কারে যে দৃষ্টিবিভ্রম হয় একথা শেখে মানুষ পরে—অনেক ঠেকে তবে। কিন্তু তখন আমার চোখ ফুটবারই পালা, দেখতে শেখারই যুগ—চিনতে শেখার পরম লগ্ন তখনো অনাগত। কাজেই আমার শৈশবের এই দুই হিরোর প্রশ্রয় পেয়ে আমি একটু একটু ক'রে রুখে উঠে শেষকালে মরীয়া হ'য়ে বলা সুরু করলাম: "ভগবান্ ফগবান নেই—যতসব কুসংস্কার—প্রমাণ করো যে তিনি আছেন! কেউ কি দেখেছে তাঁকে? সবই পরের মুখে ঝাল খাওয়া—ভূত দেখার মতন······" ইত্যাদি।

অথচ, কেন জানি না, যতই নাস্তিকতার হাওয়ায় উজিয়ে উঠতাম ততই এক

দিকে অহঙ্কার গজ গজ ক'রে উঠলেও বুকের মধ্যে কোথায় যেন খচ খচ করত ভাবতে যে ভগবান্ নেই। ভগবান্ বলতে তখন ঠিক কী বুঝতাম যদি কেউ জিজ্ঞাসা করতেন বলতে পারব না—শুধু এইটুকু ছাড়া যে এমন কোন নিয়ন্তা যিনি যা কিছু দেখছি সৃষ্টি ক'রে সারথির ম'ত চালাচ্ছেন বিশ্বরথকে। মেসোমশায়ের কাছে শুনতাম: "ভগবান্ যদি থাকেন তো তাঁর কাজ কী শুনি? জগৎজোড়া কান্না শুনেও যিনি আকাশের ঘোমটা প'রে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকেন তাঁকে নিয়ে আমার কী হবেই বা? কাজেই এহেন ঠুঁটো জগন্নাথ আমাদের কাছে থাকলেও না থাকারই সামিল বলব।"

এসব উপমায় আমার মন ভারি উৎফুল্ল হ'য়ে উঠত—কিন্তু যতই কেন না নিজেকে বলি—"বা রে আমি!"—ভগবান নেই ভাবতে বুকের মধ্যে কোথায় যেন খালি খালি লাগত। আরো দুঃখ পেতাম যখন মাতৃকল্পা মেজমাসিমা স্নেহের সুরে কাকুতিমিনতি করতেন: "ওঁর কথা কানে তুলিস নে বাবা। ভগবান্ যদি না থাকেন তবে তাঁকে ডেকে কি আমি এত শান্তি পেতাম রে?"

চমকে উঠতাম। তাই তো। নাস্তির ভ্রান্তি-দরবারে আবেদন জানিয়ে কেউ কি এমন সত্যিকার শান্তি পেতে পারে?

চার

নির্মলদা আমার জীবনের যে-অধ্যায়ে দেখা দিয়েছিলেন তার নামকরণ করা যেতে পারে নাস্তিক পর্ব। পরে নাস্তিক্যের আঁধার রাজ্যে কীভাবে "উষার সোনার বিন্দু"-র মতনই শুভ আস্তিক লগ্ন রঙিয়ে উঠল প্রাঞ্জল ক'রে বলতে হ'লে আরো একটু তোড়জোড় বাঁধতে হবে—যাকে নাটকীয় পরিভাষায় বলে mise en scene নৈলে নির্মলদার নাটকীয় প্রবেশের রসগ্রহণ করা কঠিন হবে।

আমার বালকমন কী-ভাবে বিশ্বাস ও সংশয়ের দোলায় দুলতে দুলতে ক্রমশঃ নাস্তিক্যের দিকে মোড় নিল সে-ইতিহাস ফলিয়েই বলেছি। পিতৃদেব ভগবানের সম্বন্ধে খানিকটা "নিউট্রাল" ভঙ্গি করলেও আমার পরিণতির দিকে সজাগ ছিলেন সর্বদাই। তাই আমার নাস্তিক মতামতকে তাঁর বন্ধুরা ছেলেমানুষি ব'লে সহাস্য অবজ্ঞার চোখে দেখলেও তিনি তাঁদের প্রায়ই বলতেন: "মন্টুকে তোমরা শিশু ভেবো না। There are boys and boys: ওর মনের বয়স ওর দেহের চেয়ে

অনেক বেশি এটা ভুলো না।" তাঁরা শুনে মুখে অমায়িক স্বরে "না না" করলেও মনে মনে নিশ্চয়ই বিজ্ঞ ঢঙে হাসতেন "the old old story" ব'লে—স্নেহমুগ্ধ পিতা-মাতার চোখে কানা ছেলেকেই পদ্মলোচন মনে হওয়ার উপমা স্মরণ ক'রে। এ-বিষয়ে পিতৃদেবের দরদী ছিলেন মাত্র একজন—মেসোমশায়। তাই আমার শিক্ষা নিয়ে পিতৃদেব তাঁর সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি আলোচনা করতেন—আমাকে বলতেন হেসে: "ওরে মণ্টু, কেবল শালুকই চেনে গোপাল-ঠাকুরকে—তাই শুধু গিরিশই তোকে চিনেছে রে!" আমি একেবারে গ'লে গিয়ে বলতাম: "মেসোমশায় সত্যি ভারি ভালো লোক, না বাবা?" পিতৃদেব হেসে বলতেন: শুধু ভালো নয় রে—আশ্চর্য—আর বিচিত্র মানুষ। ওকে বুঝতে সময় লাগে।"

"সময় লাগে! মানে?"

"বুঝবি বড় হ'লে। ও বড় সহজ মনিষ্যি নয় রে মণ্টু—যাকে সংসারের তাপ নরমই করেছে—বিমিয়ে তুলতে পারে নি। ওর কথা ভাবলে আমার প্রায়ই মনে হয় পদ্মপাতার উপমা—পাঁকে থাকে কিন্তু পাঁক গায়ে মাখে না। তা ছাড়া যেমন কঠিন তেমনি কোমল। তুই তো ভবভূতি পড়েছিস—মনে নেই তাঁর উপমা—বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি?" ইত্যাদি

পিতৃদেব ঠিকই বলেছিলেন: এ-বিচিত্র মানুষটির অপরূপ মহিমা আমি সত্যি উপলব্ধি করি অনেক পরে—পরিণত বয়সে।

তখন আমি বার্লিনে ১৯২১ কি ১৯২২ সাল। মহোৎসাহে তালিম নিচ্ছি জর্মন ও ইতালিয়ান গানে এমন সময়ে হঠাৎ এক চিঠি পেলাম নির্মলদার যে মেসোমশায়ের খুব অসুখ। মাসিমার মৃত্যুর পরেই মেসোমশায় ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়েন কিন্তু সেকথা জানত মাত্র দুচার জন অন্তরঙ্গ। নির্মলদা লিখেছিলেন: কী আশ্চর্য মানুষ! —যক্ষ্মা রুগী অথচ কাশতে কাশতেও চলেছেন হাসতে হাসতে। কেউ এসে যদি বলে "কেমন আছেন?" —অমনি তিনি হেসে বলেন: "Going strong—দেখো না, পাঞ্জা লড়ো।"……ইত্যাদি।

যক্ষ্মা শুনে আমার তো প্রাণ উড়ে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ মেসোমহাশয়কে একটি মস্ত চিঠি লিখি। উত্তরে তিনি লেখেন: "আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে মণ্টু, তোমার সঙ্গে হয়ত আর দেখা না হ'তে পারে। তাই একটি কথা আজ লিখি যা মুখে তোমাকে কোনোদিন বলিনি। তুমি জানো তোমাকে আমি আমার নিজের সন্তানের চেয়ে কম স্নেহ করিনি, তোমার মাসিমার

মুখেও অশুস্তিবার শুনেছ যে দিদিমণি—(আমার মাকে সবাই দিদিমণি বলত)—আমাদের ছেলেটি মাস খানেক বাদেই মারা যেতে তোমার মাসিমার কোলে তোমাকে বসিয়ে দিয়ে বলেন : 'কাঁদিস নে সুশী, তোর ছেলে তো যায় নি, এই নে তোর ছেলে।' তোমার মাসিমা প্রায়ই তোমাকে বলতেন মনে আছে তো—'কী উদার মন ছিল দিদিমণির—আমাকে শান্ত করতে নিজের কোলের ছেলেকে আমার কোলে ফেলে দিয়ে গেলেন! —আমি কয়েক মাস ধ'রে তোকে বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ ক'রে তবে শোক ভুলি রে! তাই তুই তো আমার বোনপো নোস বাবা, আমার নিজের ছেলেই বটে।' তোমার মাসিমা মিথ্যা বলেন নি—তুমি আমাদের বড় ছেলেই বটে, আমার মেয়েরা তো তোমার পরে এসেছিল। কিন্তু এ তো গেল স্নেহের দিকের কথা। তোমাকে স্নেহ না করবে কে, বাবা? কেবল এরও পরে আছে—সে শ্রদ্ধা। তোমাকে আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করেছিলাম—যেমন শ্রদ্ধা আমার মনে হয় তোমাকে আর কেউ করেনি দ্বিজদা ছাড়া। আর কেন করেছিলাম শুনবে? তোমার রূপ গুণ বুদ্ধি প্রতিভার জন্যে নয়: তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করেছিলাম—তোমার সত্যনিষ্ঠার জন্যে। ভগবান্ আছেন কি না জানি না বাবা, তবে তুমি ভগবানে বিশ্বাস করতে পেরেছ ব'লে মনে হয় হয়ত তিনি থাকতেও পারেন—নৈলে তাঁর নামে তোমার চোখে জল আসে কেন? একথার পরে বোধ হয় আমার শ্রদ্ধার আর প্রমাণ দেবার দরকার নেই—কী বলো?"

পড়তে পড়তে সুদূর বিভুঁয়ে বিদেশে বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠেছিল। কলকাতায় ফিরে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি; শুনলাম তাঁর বড় মেয়ে শান্তির কাছে কী রকম অক্লিষ্ট মুখে তিনি সংসার থেকে বিদায় নিয়েছিলেন—মৃত্যুর দুদিন আগেও —যখন শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছে—হাসিমুখেই সম্ভাষণ করেছেন সবাইকে। বলতে বলতে শান্তি ঝরঝর ক'রে কেঁদে বলেছিল: "বাবা মানুষ ছিলেন না দাদা, বুঝতে যদি থাকতে সে সময়ে। দেহের গভীর যন্ত্রণায়ও কি মানুষ হাসতে পারে?"

য়ুরোপ থেকে যখন ১৯২২ সালের শেষে দেশে ফিরি তখন সবচেয়ে অভাব বোধ করি এই "আশ্চর্য মানুষ"টির—যে সংসারে থেকেও চিরদিন ছিল নির্লিপ্ত, দুঃখের মধ্যেও আনন্দময়, দারিদ্র্যের মধ্যেও অপ্রতিগ্রাহী, মৃত্যুর সান্ধ্যছায়ায়ও অকুতোভয়। রবীন্দ্রনাথের "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন" উপাধি তাঁকে সাজত। কিন্তু ঐ যাঃ!—বলার ঝোঁকে শেষের কথা আগে ব'লে ফেললাম। এখন ফিরে যাই—সে-সময়কার প্রসঙ্গে।

সর্বপ্রিয়, সর্ববন্ধু, সর্বসাক্ষী এ "আশ্চর্য মানুষ"-টির গৃহদ্বার অবারিত থাকত সবারি জন্যে। তাঁকে অনেকেই ডাকত "বসুধৈবকুটুম্বক" নামে। তাঁর ওখানে কতরকমের মানুষই যে আসত—বালক-বালিকা, স্কুলের ছাত্র, কলেজের অজাতশ্মশ্রু কিশোর, প্রবীণ, বৃদ্ধ, নাস্তিক, ভক্ত, তান্ত্রিক, মুসলমান মৌলবী, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, ব্রাহ্ম নরনারী, আরো কত রকম মানুষ যারা নিরুপাধি—যারা শুধু মানুষ। তিনি সবাইকেই করতেন আদর—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁকে বলা চলত: "আদর করিতে জানো অনাদৃত জনে।" আর এই আদর ছিল সত্য, কারণ এর মূলে ছিল তাঁর গুণগ্রাহী শ্রদ্ধা: কাউকেই তিনি অবজ্ঞা করতেন না—সবারই কথা শুনতেন মন দিয়ে—মতে না মিললেও।

তাঁর সংস্থান ছিল সামান্যই। হ্যারিসন রোডে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে তিনি থাকতেন। দোতলায় দুটি মাত্র ঘর, একটি ঘুরে-যাওয়া বারান্দা শেষ হয়েছে আধখোলা মতন চাতালে—সেখানেই রান্নাবাড়া হ'ত। নিচের তলায় তাঁর পিতার তৈরি হিমসাগর তেল ও ওষুধের দোকান—জীবিকানির্বাহ হ'ত এই ওষুধ-বিক্রি ক'রে—টায়ে টায়ে। মেজমাসিমা এ-হেন সরাইখানা মতন গৃহস্থালিতে তিন তিনটি অনূঢ়া কন্যাকে নিয়ে সময়ে সময়ে দারুণ অস্বস্তি বোধ করলেও নিজেকে অনটনের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন খাঁটি পতিব্রতারই মতন যার দুটি উপাধি—সহধর্মিণী ও সহকর্মিণী। কারণ সময়ে সময়ে ওষুধ বিক্রি মন্দা হ'লে সত্যিই মাসিমাকে সংসার চালানোর জন্যে ভাবতে হ'ত। কিন্তু মেসোমহাশয় তাল ঠুকে বলতেন: "কুছ পরোয়া নেই, আমি রাঁধব তুমি বাসন মাজবে"—ব'লেই পিতৃদেবের "বুড়ো-বুড়ি দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত" গানে আঁখর দিতেন···"বুড়ি যখন বাসন মাজত বুড়ো তখন কইগাছ ভাজত—" কিম্বা "বুড়ি যখন কুটনো কুটত, বুড়ো তখন বাটনা বাটত···হোঃ হোঃ হোঃ !···"

বলেছি, আমার মাতামহ ছিলেন নিযুতপতি, কাজেই মাসিমা ছিলেন ধনিকন্যা যাকে বলে। তাই এ-ধরনের অনটন অব্যবস্থায় মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলেও সব সইতেন হাসিমুখে মেসোমহাশয়ের মুখ চেয়ে। মনে আছে তাঁর একটি প্রায়োক্তি: "ওরে, লোকে বলে আমি বড়মানুষের মেয়ে—জলে পড়েছি গরিব স্বামীর ঘরে। কিন্তু তারা দেখে শুধু বাইরেটা—রাখে না তো অন্দরমহলের খবর। জীবনে সব চেয়ে বড় সুখ টাকায় মেলে না বাবা—মেলে শুধু ভালোবাসায়, বুঝলি?" ব'লেই চোখের জলের মধ্যে দিয়ে হেসে: "তোর যখন একটি টুকটুকে

বৌ আসবে, তখন বুঝবি একথার মানে। আর আশীর্বাদ করি বাবা, তাকে যেন তুই সেই শিক্ষাই দিতে পারিস যা উনি দিয়ে এসেছেন আমাকে—যেমন হাতে ক'রে আমাকে গ'ড়ে নিয়েছেন তুইও যেন বৌকে তেমনি মনের মতনটি করে গ'ড়ে নিতে পারিস বাবা।"

আমি লজ্জায় রাঙা হয়ে বলতাম: "কী যে বলো মাসিমা! আমি বিয়েই করব না—দেখো—"

মাসিমা বলতেন হেসে: "সুর বদ্‌লে যাবে বাবা—যেই দেখা পাবি তার যে আসবে তোর ঘর আলো ক'রে। বিয়ে করবি না? ঈ-শ্‌! জানিস তোর মেসোও বলত ওকথা। দেখে শেখ্‌ বাবা, নইলে ঠেকে শিখতে হবে, বুঝলি?"

মাসিমা আমাকে মাঝে মাঝেই এম্‌নি ঠাট্টা করতেন বৌ নিয়ে। বারো তেরো বৎসর বয়সে মুখ নিচু ক'রে থাকতাম, কিন্তু পরে একটু একটু ক'রে লজ্জা ভাঙলে শোধ তুলতে চেয়ে বলতাম: "বলো না মাসিমা, কেমন ক'রে ঘটালে এ-অঘটন?"

মাসিমা মৃদু হেসে বলতেন: "সে কি বোঝানো যায় রে? বুঝবি নিজেই—যখন টুকটুকে মেয়ের একটি চাউনিতে সব ধনুকধারী পণ ভেস্তে যাবে। আর তখন বুঝবি বাবা—যে কোত্থেকে-ভেসে-আসা একটি পরের মেয়ে কত আপন হয়—যে তোকে দেবে যা আর কারুর কাছেই পাবি না—যার কথা লিখেছেন দ্বিজদা! আহা দ্বিজদা কী লেখাই লেখেন রে—" ব'লে পিতৃদেবের "মন্দ্র" থেকে "নববধূ" কবিতাটি আবৃত্তি করতেন (এ-কবিতাটি মেসোমহাশয়েরও অত্যন্ত প্রিয় ছিল—বার বার শুনতে শুনতে এর অনেক লাইনই আমার মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিল—যদিও প্রথম প্রথম শেষের দিকটার মর্ম আমি ভালো বুঝতে পারতাম না—যেটুকু উদ্ধৃত করছি):

ক্রমশ দিন চলিয়া গেল সন্দেহে ও ভয়ে,
কাটিয়া গেল ভাবনাভীতি নিকট-পরিচয়ে।
বুঝিলাম যে আমার পতি—আমার সখা তিনি,
ভুবন 'পরে এমন আর কারেও নাহি চিনি।
পেয়েছি বটে মাতার প্রেম—পিতার এত স্নেহ,
বুঝেছি আমি—এমন আর আপন নহে কেহ।

পুরাজনমে তাঁহারি ধ্যান করেছি ব'লে জানি,
পর জনমে তাঁরেই মোর দেবতা ব'লে মানি।
এ-দেহ-মন দিযাছি আমি তাঁহারি পায়ে সঁপি',
জীবনে যেন মরণে যেন তাঁহারি নাম জপি!

আজো স্পষ্ট মনে আছে—পড়তে পড়তে মাসিমার মুখ কেমন কোমল হ'য়ে আসত, কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে প্রায় যেন থেমে যেত। অম্‌নি মেসোমশায় তাঁর দিকে চেয়ে চোখ মিটমিট ক'রে বলতেন হেসে:

"থাক থাক—আর লজ্জা দিও না গো!"

আমরা হেসে উঠতাম—কোরাসে। মাসিমার মুখেও হাসির ইন্দ্রধনু ফুটে উঠত চোখের জলের মেঘে।

আজও মনে পড়ে কী গভীর ভালোবাসার সম্বন্ধই সুখে দুঃখে ত্রিশ বৎসরে ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ-আলাদা-পরিবেশে গড়ে-ওঠা এ-দুটি মানুষের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে দাম্পত্য কলহ হ'ত বৈকি মাঝে মাঝে, কিন্তু মেসোমহাশয় প্রায়ই হেসে পিতৃদেবের হাসির গান গেয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করতেন (বিরহ-র জায়গায় কলহ বসিয়ে)

"এক স্ত্রী নিয়ে হ'লে কারবার,
ঝালিয়ে নিতে হয় দুচারবার,
কলহ-আহুতি ভিন্ন
প্রেমের আগুন জ্বলে না।
মাঝে মাঝে নতুন নতুন—
নৈলে কারোর চলে না।"

মাসিমার শেষ অসুখে প্রেমের এই নিতাপ, নির্ধূম আগুনকে যে-ভাবে কাঁচা সোনার রঙে দীপ্যমান্ হ'য়ে উঠতে দেখেছিলাম—সে-কাহিনী বলবার মতন।

মাসিমার পায়ে একটা দুষ্টক্ষত হয়। প্রথম দিকে তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতেন কোনোমতে, কিন্তু ক্রমশ ক্ষত শোথে কুপরিণতি নেওয়াতে তিনি শয্যা নিলেন। তাঁর এই শেষ শয়নে মেসোমহাশয় দিনের পর দিন বৎসরাধিক কাল ধ'রে তাঁর সেবা করেছিলেন অম্লানবদনে—মাসিমার দেহান্ত পর্যন্ত। ক্ষত থেকে সময়ে সময়ে যা দুর্গন্ধ বেরুত কী বলব! কিন্তু মেসোমহাশয় নির্বিকার—একাধারে ডাক্তার, ধাত্রী,

অত্যাগসহনো বন্ধুঃ। এমন অক্লান্ত সেবা যে পুরুষমানুষে করতে পারে তা ভাবতে পারতাম না স্বচক্ষে না দেখলে।

এ-সম্বন্ধে একটি কথা আজ প্রায়ই মনে হয় যদিও সে-সময়ে তাঁদের ভালো-বাসাকে এদিক দিয়ে ভেবে দেখি নি একবারও। কথাটা এই যে, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে কবিরা আবহমানকাল রোমান্সেরই জয়জয়কার রটিয়ে এসেছেন—নাটকে, নভেলে, কাব্যে, কথিকায়। কিন্তু রোমান্স অনবদ্য হ'লেও খতিয়ে অপল্‌কাই বলব—ফুলের মতনই ফুটে ওঠে বটে আহা মরি হ'য়ে, কিন্তু দেখতে না দেখতে ঝ'রে যায়—আর তখন সে-ঝরা ফুল দেখলে মনে করা কঠিন হয় যে সে একদিন তাজা ছিল। পরে যৌবনে যখন রোমান্সের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়েছিল তখন বারবারই মনে পড়ত আমার চাক্ষুষ-করা এই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতাটিকে, আর মনে হ'ত যে, রোমান্সের শিহরণ চমক-রঙিন হলেও খাঁটি ভালোবাসা যে-গৌরবলোকে পৌঁছিয়ে দেয় সে-গৌরব রোমান্সের নাগালের বাইরে—কেননা তার অন্তঃপুরে যে-প্রণয়রস গ'ড়ে ওঠে তার রসদ জোগায় অন্তরের অমৃত—বহিরিন্দ্রিয়ের মাদকতা নয়। প্রেমের নানামুখী গতি, পরিণতি ও সার্থকতা নিয়ে যৌবনে আমি কম মাথা ঘামাই নি—চার-পাঁচটি উপন্যাসের মাধ্যমে আমার নানা বক্তব্যই পেশ করেছি। এখানে সে-সব কথার পুনরুক্তি করা অবান্তরও বটে, অনাবশ্যকও বটে। তবু একথার উল্লেখ করলাম শুধু এই জন্যে যে এ-যুগে—বিশেষ ক'রে সাহিত্যে—প্রেমের নিষ্কাম মহিমাকে অস্বীকার করার একটা ঝাঁঝালো রোখ অনেক অত্যাধুনিককেই পেয়ে বসেছে। শ্রীঅরবিন্দের কাছে দৃষ্টিদীক্ষার পরে দেখতে পাই আরো একটি গভীর সত্য যে সব মানবিক ভালোবাসার মধ্যেই দুইটি উপাদান আছে: একটি প্রাণিক বা জৈবিক—vital; অন্যটি আত্মিক বা পারমার্থিক psychic.

এ নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম প্রথম বড় কম তর্ক করি নি, কিন্তু যতই ভাগবত অনুভবের গভীরে ডুব দিয়েছি ততই আমার চোখের সামনে ঝল্‌কে উঠেছে আমাদের বৈষ্ণব ধর্মের একটি সনাতন মুক্তিবাণী যে, 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি' কাম যতদিন না 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি' প্রেমে রূপান্তরিত হবে ততদিন মানুষ কিছুতেই প্রেমের রাজ্যে পূর্ণ সার্থকতার দিশা পাবে না। কিন্তু শাস্ত্র-সংহিতার গুরুগম্ভীর নজির উদ্ধৃত ক'রে এ-স্মৃতিকথা ভারাক্রান্ত করা অনুচিত হবে—আরো এই জন্যে যে, প্রেম কামের পরিধি থেকে মুক্ত হ'লে যে কী রূপ ধরে সে-কথা শুধু প্রেমিকই জানে, কামুক নয়, এবং একথা যে জানে সেই মানে—যে জানে না তর্ক ক'রে তাকে মানানো

যায় না। তাই মেসোমহাশয়ের সঙ্গে মাসিমার সম্বন্ধ শেষদিকে নিষ্কাম হ'য়ে উঠেছিল ব'লেই যে তাঁদের দাম্পত্য সম্বন্ধ ছবিটি হ'য়ে ফুটে উঠেছিল একথা আমি প্রমাণ করবার চেষ্টাও করব না। কেবল এইটুকু বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে, যাঁরাই সে-প্রেমের অপরূপ বিকাশটি লক্ষ্য করেছিলেন তাঁরাই চমকে উঠেছিলেন দেখে যে, এ-ধূলিমলিন জগতে রোগ-শোক-দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষও প্রেমের স্পর্শমণির স্পর্শে সোনা হ'তে পারে, দৈনন্দিন হাজারো তাপগ্লানি কাটিয়ে উত্তীর্ণ হ'তে পারে এক অতি-শীতল মলয়ানিলের শান্তিলোকে যে-রাজ্যে ভালোবাসা নিজেকে জানান দেয়—দিতেই, নিতে নয়। "It is more blessed to give than to receive"—খৃষ্টের এ-বাণী পরে প্রায়ই মনে পড়ত তাঁদের কথা স্মরণ ক'রে।

বলা বাহুল্য, সে-সময়ে আমি এতশত বুঝি নি, কেন না তখন দাম্পত্য-সম্বন্ধে প্রেম বলতে আমি ততটুকুই জানতাম যতটুকু নাটক, নভেল, কাব্য পড়ে জানা যায়। তবে বেশি কিছু না বুঝেও মেসোমহাশয়ের অক্লান্ত সেবা দেখে কেমন যেন এটুকু বুঝবার কিনারায় এসেছিলাম যে, প্রেম আমাদের মুগ্ধ করে তখনই যখন দেওয়াটাই হ'য়ে ওঠে মুখ্য, নেওয়াটা হ'য়ে দাঁড়ায়—অবান্তর না হলেও গৌণই বলব।

তাই শেষের দিকে রোগমলিনা রূপহীনা স্ত্রীর কাছে দিনের পর দিন দৈহিক বা মানসিক কোনো খোরাক না পাওয়া সত্ত্বেও মেসোমহাশয় ভুলেও অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকান নি—যদিও ইচ্ছা করলে তা পারতেন, কারণ বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মসমাজের অনেক নব্যাই তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করত। পিতৃদেব প্রায়ই হেসে বলতেন : গিরিশ হ'ল lady's man : বালিকা, কিশোরী, তরুণী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা—সব বয়সের মেয়েরাই তাঁর কাছে আসত, চাইত তাঁর পরামর্শ। সে-যুগে মেয়েদের সঙ্গে কোনো পুরুষকেই এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে দেখিনি—কেননা, মনে রাখবেন, তখনো বাংলা-দেশে মেয়েরা ছিল পর্দানশীনই বটে। কিন্তু মেসোমশায়ের সামনে কত হিন্দু গৃহিণীই যে অকুণ্ঠে ঘোমটা খুলে আত্মীয়ার মতনই ব্যবহার করতেন সে কী বলব! কেউ তাঁকে এ নিয়ে ঠাট্টা করলে তিনি মাসিমার দিকে চেয়ে হেসে বলতেন : "কিন্তু আমার ভয় নেই গো, তোমার রক্ষাকবচ বেঁচে থাকুক।" শুনে মাসিমা স্নেহে যেন গ'লে যেতেন। বাস্তবিক, স্বামীর পরিচিতাদের সম্পর্কে কোনো রকম ঈর্ষালেশও পোষণ করা তাঁর পক্ষে অকল্পনীয় ছিল। কথায় কথায় বলতেন আমাকে : "ওরে, উনি নানা বিষয়ে মানুষ নন রে, মানুষ নন।" এখন হয়ত খানিকটা টের পেয়েছি রক্ষাকবচ বলতে মেসোমহাশয় কী বুঝতেন, আর তিনি মানুষ নন বলতে মাসিমা

কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে-ইতিহাস এ-বাল্যস্মৃতির পরিধির মধ্যে পড়ে না—যেটুকু পড়ে বলি আর একটু।

পাঁচ

ওঁদের ঘরোয়া প্রেমের এ-অপরূপ পরিণতি হয়েছিল—মেসোমহাশয় আমার মেজ মাসিমাকে খানিকটা "গ'ড়ে নিয়েছিলেন" বলেই বটে—মাসিমা মিথ্যা বলেন নি। গ'ড়ে নেওয়া বলতে কী বলছি দু'একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই।

মাসিমা স্বধর্মে পতিব্রতা ছিলেন—বলেছি। মনে আছে তিনি কী ভালোই বাসতেন জ্ঞানদাসের একটি গান: "তোমারি গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমারি রূপে।" কিন্তু তা হ'লেও তাঁর মধ্যে প্রথম প্রথম একটা অভিমান মতন ছিল বৈকি যে তিনি ধনী পিতার সুন্দরী দুলালী। কাজেই মেসোমহাশয় যখন বিবাহের পরেই তাঁকে সাফ ব'লে দিলেন যে বাপের কাছে মেয়ে একটি পয়সাও চাইতে পারবে না তখন মাসিমা তো আকাশ থেকে পড়লেন। এ কেমন কথা? মেয়ে—সাক্ষাৎ আত্মজা— বাপের কাছে চাইবে না তো চাইবে কার কাছে শুনি? মাসিমা আমাকে কতবারই যে খেদ করেছেন চোখের জলে: "অন্য মেয়েরা কত যৌতুক, টাকাকড়ি পেল বাবা, কিন্তু উনি কী যে একগুঁয়ে—এক পয়সাও নিতে রাজি হলেন না—বললেন: 'আমি স্ত্রী চাই—শ্বশুরের টাকা নয়'।" সত্যই মাসিমা এতে একটুও অন্যায় দেখতেন না—মেয়ে কেন হাত পাতবে না বাপের কাছে—যিনি তার জন্মদাতা? কিন্তু মেসোমহাশয় অচল, অটল: "তোমার হাত পাতা মানে আমারই হাত পাতা। তাছাড়া তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে গরিবকে যখন বিয়ে করেছ তখন গরিবিয়ানা চালেই তোমাকে থাকতে হবে—তুমি যে-মুহূর্তে দরিদ্রের ঘরণী হয়েছ সে-মুহূর্তে খুইয়ে বসেছ রাজকন্যার পদবী।"

কিম্বা ধরুন মেয়েদের শিক্ষা। মাসিমার বিয়ে হয়েছিল তের বৎসর বয়সে—কাজেই লেখাপড়া বিশেষ শেখেন নি। এরূপ ক্ষেত্রে অভিমানিনীরা যে-পথ নেয় তিনিও সেই পথ নিলেন···নানা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন যে, উচ্চশিক্ষিতা নবকুলকামিনীরা গায়ে-ঢ'লে-পড়া মেয়ে, গুমরে, বিলাসিনী। (ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স বলে না?) তাঁর এ-কঠোর রায়ে দিদিমাও ছিলেন তাঁর দিকে, বলতেন: "মেয়েদের আবার ডিগ্রী কী? তারা কি হাকিম হবে না কি—না কেরানি?

মেয়েরা হবে মা, সতী আর গিন্নি। ব্যস্।” কাজেই মাসিমা বেশ একটু জোর পেতেন বৈ কি।

এ-সেকেলিয়ানা সে-সময়ে শুধু যে মেয়েমহলেই আবদ্ধ ছিল তাহা নয়। শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন ব্রাহ্ম মহিলাদের প্রতি রীতিমত বিমুখ। বেশ মনে আছে, পিতৃদেবের প্রাত্যহিক সান্ধ্য তর্কালাপের আসরে প্রায়ই ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের স্বাধীনতা ও ধরনধারণ নিয়ে তর্ক উঠত। কে কী যুক্তি পেশ করতেন কোন্ তরফে একটুও মনে নেই, কেবল এইটুকু মনে আছে যে বেশির ভাগ তার্কিকই ছিলেন “ব্রাহ্মিয়ানা”, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিপক্ষে। এও মনে আছে যে, আমার দাদামহাশয় দিদিমাকে রাজি করাতে বেশ একটু বেগ পেয়েছিলেন যখন তিনি আমার সেজমাসিমা স্নেহলতা দেবীকে কলেজে পড়াতে উদ্যত হন। পরে যখন সেজমাসিমা বি-এ-তে গণিত অনর্সে পাশ করেন—মেয়েদের মধ্যে সেই প্রথম গণিতে অনর্স—তখন সবচেয়ে উল্লসিত হ'য়ে ওঠেন আমার পিতৃদেব, মেসোমহাশয় ও দাদামহাশয়—দিদিমা মেয়ে “ভারি পাশ দিয়েছে” ব'লে প্রকাশ্যে গৌরব করলেও তাঁর আর কোনো মেয়েকেই কলেজে পড়াতে চান নি, যদিও পরে আমার আরো দুজন মাসিমা কলেজে পড়েছিলেন সেজমাসিমার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে। কিন্তু যা বলছিলাম।

মাসিমা মেসোমহাশয়ের সামনে মেয়েদের শিক্ষা উচিত না অনুচিত এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে মেসোমহাশয় কী বলতেন কোনোদিন ভুলব না, কেন না তাঁর মত শুনে পরে একদিন পিতৃদেব তাঁর নাটকীয় ভঙ্গিতে তাঁকে কোল দিয়েছিলেন। সে-কথা যথা-স্থানে, আগে বলি এ-সম্বন্ধে তাঁর মতামত। তিনি প্রায়ই বলতেন: “মেয়েদের শিক্ষা দেব কিনা ভাববার আগে ঠিক করতে হবে মেয়েরা আগে মানুষ, না আগে মেয়ে। যদি মানি যে তারা আগে মানুষ, তবে তার পরে আর এ-প্রশ্ন ওঠেই না যে তাদের শিক্ষা দেওয়া ভালো না মন্দ? মানুষ বড় হয় না শিক্ষা বিনা। মেয়েরাও মানুষ। সুতরাং তাদের শিক্ষা দিতেই হবে যদি তাদের ছোট ক'রে রাখতে না চাই—অকাট্য লজিক।”

এবার বলি নাটকীয় ঘটনাটির কথা—যে-ধরনের অঘটন প্রায়ই ঘটত মেসো-মহাশয়ের সঙ্গে পিতৃদেবের লেনদেনে।

বলেছি—পিতৃদেবের সান্ধ্য আসরে বহু কবি গুণী জ্ঞানী মনীষীর বাদবিতণ্ডা কেঁপে উঠত দিনের পর দিন। আমার কী যে ভালো লাগত সে সব শুনতে—

মাসিমার ভাষায় "গিলতে!" আমাকে আমার কোনো পিতৃবন্ধু "যাও বাবা, খেলা করো গে" বললেই পিতৃদেব আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বাহুবন্ধনে আটক ক'রে বলতেন: "না, ও তর্কাতর্কি শুনতে শুধু যে ভালোবাসে তা নয়—তা থেকে সত্যিই খোরাক পায় ওর মনের। বোস রে মণ্টু, যত পারিস শুনে নে—আমরা যতটুকু হজম করতে পারি তার চেয়ে বেশি গ্রহণ করা মন্দ কেবল খাওয়ার বেলাযই, পড়ার কি শোনার বেলায় নয়।" অথ, আমিও এই প্রশ্রয়ে উঠলাম উজিয়ে। মাসিমা হেসে বলতেন: "পেখম মেলে!—ছেলে তো নয়—মানের ময়ূর!"

এ-তর্কের আসরে অনেক সময়েই মেসোমহাশয়ও থাকতেন একজন গণ্য সভাসদ—মাসিমার ভাষায "ধনুর্ধর।" কতরকম আলোচনাই যে হ'ত—জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ যাকে বলে—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে: বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, ভূদেবচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, হুতোম, সঞ্জীবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়র, ওয়র্ডসওয়র্থ, মিলটন, শেলি, কীট্স্, রাস্কিন, এমার্সন থেকে আরম্ভ ক'রে কবির লড়াই, পাঁচালি, রাজনৈতিক দলাদলি, সামাজিক আচারবিচার, ধর্মের জালজালিয়াতি কিছুই পিতৃদেবের তর্কসভায় অপাংক্তেয় ছিল না। কাজেই স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্নও থেকে থেকে উঠত বৈ কি। আমার পিতৃবন্ধুদের হাজারো যুক্তির একটিও মনে নেই, কেবল পিতৃদেবের একটি পরিহাস মনে আছে: "বাড়ির-মধ্যে-রা নামেই অবলা কিন্তু ঘোমটার মধ্যে থেকে যখন তাঁরা কুরুক্ষেত্র বাধান—কজন সবল আছেন বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি—যাঁদের বুকের মধ্যে ধুকধুক না করে?—হাঃ হাঃ হাঃ!"

একদা মেসোমহাশয় ছিলেন উপস্থিত। তর্ক উঠতেই তিনি যথাবিধি তাঁর মত পেশ করলেন—যে, মেয়েরা আগে মানুষ না আগে মেয়ে এই কথাটিই সর্বাগ্রে চিন্তনীয়। ব'লে বললেন: "মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া উচিত না অনুচিত এ-প্রশ্নই উঠতে পারে না যেহেতু ছেলেদের বেলায এ-তর্ক আমরা তুলি না।" শুনে পিতৃদেব চম্‌কে উঠে বলেছিলেন: "বড় কথাই বলেছ হে গিরিশ—সবাইকে দিলে কানা ক'রে—এসো ভায়া, বক্ষে এসো!" ব'লেই বক্ষাবক্ষি হ'য়ে উভয়ের সে কী অট্টহাস্য! সে-আনন্দ কি ভুলবার? আজকের দিনে কোথায় সে-খোলা হাসির দম্‌কা হাওয়া? সে-সহজ আনন্দসৃষ্টি করার ক্ষমতা? সাহিত্যের বা জীবনের ক্ষেত্রে তেমন বড় ব্যক্তিরূপই বা কোথায়! বহু বৎসর বাদে পড়ি অলডাস হাক্সলির একটি গভীর খেদ: যে, যান্ত্রিকতার যুগে মানুষ প্রবর্ধমান বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের

ভূরিভোজ পাচ্ছে বটে, কিন্তু হারাচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও রসসৃষ্টির ক্ষমতা। তাই—লিখছেন তিনি—মানুষ আজ দিনান্তে ক্লান্ত হ'য়ে ঘরে ফিরেই ছোটে টিকিট ক'রে আমোদ কিনতে। না ছুটে উপায় কি? আমোদ আহ্লাদ না হ'লে মানুষ বাঁচে না, অথচ তার আনন্দ উদ্ভাবন করবার ক্ষমতায় মরচে ধ'রে এল—অব্যবহারে। অগত্যা বাঁচবার জন্যে সে হাত পাতে "creation-saving amusement"-এর কাছে: সিনেমায়, মিউসিক হলে, কাবারেতে।

কিন্তু পিতৃদেবের সংস্পর্শে শুধু যে রসবোধ ও সৃষ্টিশীল আনন্দদীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছিলাম তাই নয়, পেয়েছিলাম আর একটি পরম পাথেয়: স্বাবলম্বনের শক্তি, মনের বল। পিতৃদেব ছিলেন নিজে অমিতবল, পৌরুষদৃপ্ত প্রতিভাধর—কথায় কথায় উদ্ধৃত করতেন মহাভারতের "সর্বং বলবতাং পথ্যং সর্ব বলবতাং শুচিঃ"—অর্থাৎ বলবান্ কোন্ পথ্যে না পুষ্ট হয়, এমন কী আছে যা পারে তাকে অশুচি করতে? "এফেমিনেট" বিশেষণটি উচ্চারণ করতে তাঁর ওষ্ঠাধর অবজ্ঞায় বাঁকা হয়ে উঠত। এখন বুঝি—আমার মনকে আশৈশব বলদীক্ষায় দীক্ষিত করতে চেয়েই সর্ববিধ আলোচনায় তিনি আমাকে ডাক দিতেন। উত্তর-জীবনে নানা দুর্বল মুহূর্তে যে-সব চিন্তা বা স্মৃতি আমাকে জোর দিয়েছে তাদের মধ্যে তাঁর উদার মহৎ বলিষ্ঠ প্রাণখোলা অভীঃ ছিল অন্যতম একথা একটুও অত্যুক্তি নয়।

মেসোমহাশয় পিতৃদেবের তেজস্বিতাকে শুধু যে গভীর শ্রদ্ধা করতেন তাই নয়, নিজে বলীয়ান্ হওয়ার দরুন আরো বুঝতেন তাঁর বলিষ্ঠতার ও স্বাধীন চিন্তার মহিমা। এযুগে ইস্‌ম্-এরই জয়জয়কার। ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন চিন্তাকে বুর্জোয়া মনোভাব ব'লে অবজ্ঞা করেন প্রগতিবাদী অনেকেই। তাঁদের মতামত সবাই জানেন—নিরন্নকে অন্ন দিতে হ'লে সর্বতোভাবে রাষ্ট্রনায়ককেই করতে হবে শরণ্য, চিন্তাশীলদের নগণ্য—আর যারা সর্বাধিনায়কের—ডিকটেটরের—মতাবলম্বী নয় তারা জঘন্য, অতএব তাদের রাতারাতি গুঁড়িয়ে গলিয়ে লিকুইডেট করাই পন্থা। আমার বাল্যকাল কেটেছে সম্পূর্ণ অন্য আবহে, তাই হয়ত এ-যুগের প্রগতিবাদীদের জীবনদর্শন বুঝতে এত বেগ পাই—তাঁরা যতই গণমনকে একটি মাত্র ইস্‌ম্-এর ছাঁচে ঢালাই করার গুণগান করেন ততই আমার মন বসে বেঁকে। হয়ত প্রতি যুগের সন্তানই পরবর্তী যুগের সন্তানদের বুঝতে এমনি বেগ পেয়ে এসেছে। কারণ ফ্যাশন তথা নীতি যে পরিবর্তনশীল একথা অপ্রতিবাদ্য। কিন্তু তবু মনে হয় যে, এ-নৈশ্চিত্য আমাদের অন্তরাত্মারই বাণী যে, যে-সমাজব্যবস্থায়

মানুষ তার স্বাধীন চিন্তার শক্তিকে অনাদর করতে শেখায় সে-ব্যবস্থায় মানুষের মুক্তি নৈব নৈব চ। তাই পিতৃদেব তথা মেসোমহাশয়ের প্রভাবে প'ড়ে আমি চিন্তাকে স্বাধীন রাখার যে-মহৎ প্রেরণা ছেলেবেলায় পেয়েছিলাম তার জন্যে এ দুই বলীয়ান ভাবুকের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ না ক'রেই পারি না।

কিন্তু চিন্তাকে স্বাধীন রাখব মুখে বলা সহজ হ'লেও কাজে করা একটু কঠিন। কারণ আমাদের মধ্যে দুটি প্রবৃত্তিই স্বাভাবিক তথা প্রকৃতিসম্মত: বিদ্রোহ ও নিয়মানুবর্তিতা। স্বভাব-বলিষ্ঠের স্বাধীন চিন্তা প্রায়ই নিয়মকে মানে না যেজন্যে মহাভারতে বলেছে: "বলবন্তো হ্যনিয়মা নিয়মা দুর্বলীয়সাম্"—অর্থাৎ বলীয়ানেরা নিয়ম ভাঙে, দুর্বলেরা নিযম মানে। সংসারে বলীয়ান্ বিরল—দুর্বল অগুন্তি কাজেই গতানুগতিকতাই বেশির ভাগ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, স্বাধীন চিন্তার আদর মুষ্টিমেয়ের মধ্যেই আবদ্ধ।

পিতৃদেব এ-সমস্যা বুঝতেন। এও তিনি মানতেন যে, যেমন বিশ্বাস কৃতার্থ হয় অঙ্গীকারে, ইতিবাদে, তেমনি যুক্তি চরিতার্থ হয় অস্বীকারে, নেতিবাদে। আপ্তবাক্য তথা গুরুবাককে বিশ্বাস মেনে নেয় মেনে-নেওয়ার সহজ শুভ্র আনন্দে। যুক্তি চায় প্রমাণ। এ-সম্পর্কে পিতৃদেব প্রায়ই বাইব্‌ল্ থেকে উদ্ধৃত করতেন খৃস্টদেবের একটি বাণী। আমাকে যে-ভাবে বলেছিলেন সেই ভাবেই বলি।

আমি বাইব্‌ল্ তখনো পড়ি নি, তাই যখন পিতৃদেব বললেন যে বাইব্লে আছে, খৃস্টদেব তাঁর দেহান্তের পরেও কয়েকবার তাঁর শিষ্যদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন—তখন আমি চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করি: "ভূত হ'য়ে নাকি, বাবা?"

পিতৃদেব (হেসে): "আমার তো তাই মনে হয—কিন্তু ধার্মিক খৃস্টানরা চোখের জলে বলেন, না গো না—সাক্ষাৎ খৃস্ট—খোদ কর্তার বালগোপাল।"

আমি: তার মানে? তিনি সত্যিই এসেছিলেন মরার পরেও?

পিতৃদেব (ভুরু তুলে): কী করে জানব বল্?—আমি তো সে সময়ে ছিলাম না যে সাক্ষ্য দেব। তবে বাইব্লে তিনি একটি কথা বলেছেন ভাববার কথা বৈ কি। ব্যাপারটা এই। তাঁকে ক্রুসে বিঁধে মারার কয়েকদিন পরে তিনি দেখা দেন তাঁর কয়েকটি শিষ্যকে। শুনে টমাস ব'লে তাঁর এক শিষ্য ব'লে উঠলেন: "দূর! কখনো হয়?" আমি স্বচক্ষে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করছি নি।" কয়েক দিন পরে একদিন ওরা সবাই ব'সে আছে এমন সময়ে খৃস্টদেব এসে হাজির!

আমি (শিউরে উঠে): বলেন কি!

পিতৃদেব (হেসে): আর বলি কি? একেবারে জলজ্যান্ত যিশুখৃস্ট—যাঁকে শুধু দেখা নয় ছোঁওয়া যায়! টমাস অভিভূত হ'য়ে চিৎকার ক'রে উঠল: "প্রভু! প্রভু! ভগবান্!" অগত্যা টমাস বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন—seeing is believing—বলে না? তখন খৃস্টদেব বললেন: "টমাস! তুমি বিশ্বাস করলে স্বচক্ষে দেখে তবে। কিন্তু ধন্য বলি তাদের যারা না দেখেও বিশ্বাস করতে পারে।"

আমি (অথই জলে): আর আপনি?

পিতৃদেব: আমার কথা তো বলেছি কতবারই রে—আমি সেই ধন্যদের দলে ভরতি হ'তে চাই না যারা না দেখেই বিশ্বাস করে। আমি বিশ্বাস করতে রাজি আছি তবে দেখার পরে, আগে নয়। তাই আমার আশা নেই রে বাবা,—আমি অধন্যই থেকে যাব হায় হায় করতে করতে—স্বভাব না যায় ম'লে—উপায় কি বল্?

অবিকল এই কথাগুলিই যে তিনি বলেছিলেন তা নয়—তবে এই-ই ছিল তাঁর মনের ভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি যাই বলুন এবং নিরন্তর এই ধরনের ব্যঙ্গবাণেই তিনি অবিশ্বাস ও অতিভক্তিকে বিঁধতেন তাঁর আলাপ আলোচনায়।

এ বড় কঠিন প্রশ্ন: সত্যনির্ণয়ে কে বড় দিশারি—যুক্তি না বিশ্বাস? সভ্যতার অরুণোদয় থেকে মানুষ এ-বিষয়ে আথাল পাথাল ভেবেও মনস্থির করতে পারেনি—আজো সে তেম্‌নিই দোদুল্যমান: কখনো চলে যুক্তি বুদ্ধির দিকে, কখনো বা যুক্তি-নিরপেক্ষ হৃদয়ের সানন্দ স্বীকৃতির দিকে। পিতৃদেব নিশ্চয়ই মনে মনে বুঝতেন মানুষের মনের এ-চিরন্তন দোটানার কথা। না বুঝবেন কেন? তাঁর নিজের মধ্যেই যে ছিল এ-স্বতোবিরোধ? না থাকলে কি যুক্তির মানা না মেনে তিনি অমন ভক্তির গান লিখতে পারতেন:

আয় মা এখন তারারূপে স্মিতমুখে, শুভ্রবাসে:
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে।

মনে আছে একদিন এক ভক্ত বৈষ্ণব এসে পিতৃদেবের মুখে তাঁর বিখ্যাত "ওকে গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়" শুনে ভাবসমাধিতে বিহ্বল হ'য়ে পড়েন। পরে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে তাঁকে বলেন: "রায়মহাশয়, আপনি মিথ্যেই যুক্তিতর্কের মুখোশ পরেন। আসলে আপনি ভক্ত—নৈলে কি গৌরাঙ্গদেবের সম্পর্কে এ-গান লিখতে

পারতেন? আহা—কী অপূর্ব—একটি চরণে গৌরাঙ্গদেবের অবতারীরূপের বর্ণনা :

"দেবতা ভিখারি মানব দুয়ারে,
দেখে যা রে তোরা দেখে যা…"

আমিও পরে মাঝে মাঝে তাঁকে এই নিয়ে জেরা করতে ছাড়িনি। কিন্তু সেকথা যথাস্থানে।

আমাদের সুরধামে যখন আমরা বসবাস সুরু করি সে-সময়ে আমার বয়স বারো কি তের। নির্মলদার অভ্যুদয়ের একটু আগেই। সে-সময়ে পিতৃদেব ছিলেন দোমনাই বলব। মানে, ভক্তির প্রেরণার মুহূর্তে ভাবাবেগে অনুপম ভক্তির গান বাঁধতেন বটে, কিন্তু তার পরেই তাঁর অন্য মূর্তি—সেই চিরকেলে তার্কিক সংশয়ী বিচারপরায়ণ মানুষ। বলতেন তখন : "এই-ই হ'ল আমার নিজমূর্তি বাবা! আমি আর গিরিশ যে স্বভাবে দারুণ নাস্তিক রে!" সাংখ্যের সূত্র—ঈশ্বরাসিদ্ধঃ প্রমাণাভাবাৎ"—প্রথম শুনি তাঁর মনের এই সংশয়ী অবস্থার তর্কাসরে—কার মুখে ঠিক মনে পড়ছে না, তবে সম্ভবতঃ তাঁর পণ্ডিত ভাবুক বন্ধু বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মুখে।

ছয়

বহুমুখী প্রতিভা সব দেশেই নানা লোককে টানে নানা ভাবে—আর প্রত্যেকেই তার গ্রহিষ্ণুতার অনুপাতে তার রকমারি রস থেকে পায় রসদ। আমাদের সুরধামে কেউ আসত পিতৃদেবের হাসির আকর্ষণে, কেউ কাব্যের, কেউ নাটকের, কেউ বিদ্যারত্তার, কেউ বা আকৃষ্ট হ'ত তাঁর দিলদরিয়া প্রাণের চুম্বকে। পণ্ডিত কবি শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁকে বরণ করেন তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ হ'য়ে। কিন্তু তিনি নিজে কবি ছিলেন ব'লে সবচেয়ে ভালোবাসতেন তাঁর কাব্যপ্রতিভা! রাঙাজ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গে এবিষয়ে তাঁর মতভেদ ছিল না যে, নাটক নভেল খুব বড় সৃষ্টি হ'লেও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বর দিতে পারে এক কবিতা ও গান। এ-জাতীয় প্রবুদ্ধ গ্রহীতা পিতৃদেবের আসরে বড় বেশি দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। কিন্তু এঁদের পূর্বসূরীদের মধ্যে যাঁর কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে—যাঁকে একবার দেখলে আর ভোলা যেত না—তাঁর প্রসঙ্গ পাড়তে হ'লে দু'তিন বছর পিছিয়ে যেতে হবে।

তখন সুরধামের জন্যে জমি কেনা হয়েছে কিন্তু বাড়ি তৈরি হয় নি। আমার

বয়স তখন নয় কি দশ। পিতৃদেব সে-সময়ে গয়ায় মনমরা হ'য়ে ডেপুটিগিরি করেন—এমন সময় শ্রীলোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে তাঁর দেখা। উভয়েই যেন পরস্পরের জন্যে তৃষিত ছিলেন। কাজেই লোকেনকাকা আসতে না আসতে দুই বন্ধু উঠলেন উজিয়ে—সাহিত্য নিয়ে। তাঁদের মধ্যে যে কী অশ্রান্ত তর্কালোচনা হ'ত দিনের পর দিন! সে-সব তর্কালাপের বিবরণ খুঁটিয়ে দিতে পারব না, কিন্তু কোনোদিনই ভুলব না লোকেনকাকার পিতৃদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাপ্রীতি, তাঁর স্নিগ্ধ হাসি, দীপ্ত ব্যক্তিরূপ ও বহুভাষী বিদ্যাবত্তা। এ-ধরনের বহুভাষাবিৎ আমি আগে দেখি নি। এ-সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা বলি—যার উল্লেখ পিতৃদেব প্রায়ই করতেন পরে স্নেহধামে।

গয়ার স্টেশনে একদিন আমরা গিয়েছি কী একটা কাজে মনে নেই। ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছি—এমন সময়ে দুটি বিদেশী এসে হাজির। মায়া সে-সময়ে সাত বছরের ফুটফুটে মেয়ে। তাঁরা তাকে আদর ক'রে চকলেট দিয়ে পিতৃদেবের দিকে তাকিয়ে কী যেন বললেন। পিতৃদেব ঘাড় নেড়ে বললেন: "I can't speak French!" সঙ্গে সঙ্গে লোকেনকাকা তাঁর সঙ্গে জুড়ে দিলেন আলাপ ফরাসি-ভাষায়। খানিক পরে অন্য বিদেশীটি সঙ্গী বন্ধুকে কি যেন বললেন—সঙ্গে সঙ্গে লোকেনকাকা সুরু ক'রে দিলেন আলাপ—পরে শুনলাম—জর্মনভাষা। পিতৃদেব পরে প্রায়ই উল্লেখ করতেন এই ঘটনাটির আর গৌরব করতেন লোকেনকাকার নানা ভাষায় আশ্চর্য দখল নিয়ে। এ-ঘটনাটির, বিশেষ ক'রে উল্লেখ করলাম এই জন্যে যে সেই প্রথম আমার মনে এই উচ্চাশা স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে যে, নানা ভাষা শিখে একদিন পিতৃদেবকে আমিও তাক লাগিয়ে দেব। ছেলেমানুষ আর কার নাম! যাক্ লোকেনকাকার কথা কিছু বলি—যতটা মনে করতে পারি।

তাঁদের মধ্যে তর্কালাপ হ'ত প্রধানতঃ সাহিত্য নিয়ে। লোকেনকাকা নানা-দেশের সাহিত্যিকের নাম করতেন মনে আছে, কিন্তু যে-কয়টি কবির নাম প্রায়ই উল্লেখ করতেন তাঁদের ছাড়া আর কারুর নামই আমার মনে নেই: শেক্সপীয়র, মিলটন, শেলি, ওয়র্ডসওয়র্থ ও টেনিসন। এঁদের সম্বন্ধে দুই বন্ধুর মধ্যে কী ধরণের আলোচনা হ'ত একটুও স্মরণ নেই, কেবল কয়েকটি টুকরো স্মৃতি মনে গেঁথে আছে। পিতৃদেব ভক্ত ছিলেন শেলির, লোকেনকাকা বলতেন ওয়র্ডসওয়র্থ আরো বড়। শেক্সপীয়র ও মিলটন সম্বন্ধে উভয়েই মহা উচ্ছ্বাসী ছিলেন এইটুকু মাত্র মনে আছে, কিন্তু তার বেশি বলতে গেলে কল্পনার আমদানি হওয়ার আশঙ্কা আছে। হ্যাঁ, আর

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লোকেনকাকা বলতেন—তিনি একাধারে শেলি আর ওয়র্ডসওয়র্থ—এটুকু মনে আছে।

তাঁদের আলাপ আলোচনা প্রায় সবই ভুলে যাওয়া সত্ত্বেও একটি কথা ভোলা অসম্ভব: লোকেনকাকার সম্বন্ধে পিতৃদেবের উচ্ছ্বাস। "এমন বিদ্বান্ আমাদের দেশে দুচারটের বেশি নেই রে মণ্টু!"—বলতেন তিনি প্রায়ই বন্ধুগর্বে। বহুদিন পরে রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনি ফের লোকেনকাকার কথা। কবি আমাকে বলেছিলেন যে লোকেনকাকার মতন চিত্তবান্ লোক তিনি বেশি দেখেন নি। আমি তাঁকে বলেছিলাম—পিতৃদেবও ঠিক এই কথাই বলতেন। "শুধু তাই নয়"—বলেছিলাম আমি—"লোকেনকাকা গয়াতে প্রায়ই আপনার কবিতা পিতৃদেবকে প'ড়ে প'ড়ে শোনাতেন, বিশেষ করে আপনার 'পুরাতন ভৃত্য', 'যেতে নাহি দিব' আর 'দে দোল দোল'।" কবি শুনে বলেছিলেন: "লোকেন শুধু যে রসিক ছিল তাই নয়, সে যে-রসে নিজেকে রসিয়েছে অপরকেও তার সরিক করতে পারত।"

কবি আরো অনেক কথাই বলেছিলেন লোকেনকাকার সম্বন্ধে—মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে যে তিনি বলতেন প্রায়ই যে লোকেনকাকা ছিলেন একটি আশ্চর্য মানুষ। তাঁর "জীবনস্মৃতি"-তে তিনি একটি অধ্যায়ে তাঁর তর্পণ করেছেন উচ্ছ্বসিত ভাষায়ই বলব। শুধু তাই নয়, লোকেনকাকার কাছে তাঁর ঋণও স্বীকার করেছেন অকুণ্ঠে। একটু উদ্ধৃত করি:

"সাহিত্যে লোকেনের প্রবল আনন্দ আমার রচনার বেগকে পালের হাওয়ার মতো অগ্রসর করিয়াছে। আমার পূর্ণ যৌবনের দিনে অবিশ্রাম গতিতে যখন গদ্য পদ্যর জুড়ি হাঁকাইয়া চলিয়াছি তখন লোকেনের অজস্র উৎসাহ আমার উদ্যমকে একটুও ক্লান্ত হইতে দেয় নাই।"

এহেন মনীষীর সঙ্গে পিতৃদেবের আদানপ্রদানের যে-দুচারটি স্মৃতি আজও চিত্তপটে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে তাদের কথা আজ বলব একটু ফলিয়েই।

লোকেনকাকা মেম বিয়ে করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী মেবেল পালিত সাত আট বৎসর পরে, ১৯২০ সালে, লণ্ডনে আমাকে ও সুভাষকে নিমন্ত্রণ করেন তাঁর গোলডার্স গ্রীনের সুন্দর দুতলা বাড়িতে থাকতে—যেখানে তিনি আমাদের মাঝে মাঝেই ভারতীয় "ক্যরি" রেঁধে খাওয়াতেন। গয়াতেই তাঁকে আমি কাকিমা বলতাম সগৌরবে—সাক্ষাৎ মেম কাকিমা—গৌরব ঠেকায় কে? পরে স্কুলে সহপাঠীদের কাছে এই নিয়ে হাসিমুখে গর্ব করতাম: "আমার মেম কাকিমা আছে—

হাস্যরসিক চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর ভাষায় "Do you know I am who?" আর কি।

গয়ায় থাকতে আমার এই মেম কাকিমার মনঃকষ্টের কথা আজো স্পষ্ট মনে আছে। হ'ত কি, লোকেনকাকা পিতৃদেবের ব্যক্তিরূপ ও প্রতিভায় এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে কাছারির পরেই সোজা তাঁর ক্রহামে ক'রে আসতেন আমাদের বাড়িতে ও রাত দশটা এগারটা অবধি কাটিয়ে তবে বাড়ি ফিরতেন। কাকিমাও কখনো কখনো আমাকে ও মায়াকে চকলেট দিতেন দুহাত ভ'রে। কিন্তু মেমসাহেব হ'লেও দুই প্রচণ্ড বিদ্বানের নির্ভেজাল সাহিত্যচর্চা কতক্ষণ সয়? ফলে বাড়ি ফিরে যেতেন "একাকিনী শোকাকুলা"—যাকে বলে। শেষে একদিন তিনি পিতৃদেবের কাছে ধর্না দিয়ে কেঁদেকেটে বলেছিলেন—লোকেন কাকাকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিতে, নৈলে তিনি স্বামিসঙ্গ থেকে প্রায় বঞ্চিতই থেকে যান চব্বিশ ঘণ্টা। তাঁর চোখের-জল-ফেলা মনে আছে আরো এইজন্যে যে তাঁকে বড় সুন্দর দেখিয়েছিল যখন চোখের জলের মধ্যে দিয়ে তাঁর হাসি ফুটল পিতৃদেব তাঁকে আশ্বাস দিতে। সেদিন রাতে পিতৃদেব আমার সামনেই লোকেনকাকাকে বলেন কাকিমাকে একটু সঙ্গ দিতে ও স্থানীয় সাহেবি ক্লাবে মাঝে মাঝে ঢুঁ মেরে আসতে—নৈলে কাকিমা দুঃখ পান। তাতে লোকেনকাকা বলেছিলেন হেসে: "তুমি ডেপুটি হ'যে বড় বেঁচে গেছ দ্বিজু, সাহেবি ক্লাবে গিযে যত রাজ্যের বাজে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাক্কা-সাহেবদের অখাদ্য বুলি বুকনি পরিপাক করতে হয় না তোমাকে। আমার দুঃখ এই যে আই-সি-এস জজ হওয়ার দরুন নানা হুজুগ-উৎসবে ক্লাবে আমাকে যেতেই হয়, হায় হায়!"

শুনে পিতৃদেবের সে কী হাসি! লোকেনকাকা এ-ও বলেছিলেন:

"ভাই দ্বিজু, তুমি গয়ায় বদ্‌লি হ'য়ে আসতে একজন অভাজন অন্ততঃ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল—মহাজনের সঙ্গ পেয়ে। না না—উটি হচ্ছে না—ও-ক্লাবে আমি যেতে পারব না। কেন? আমার বদলে আমি আমার সাক্ষাৎ মনোরমা মেম স্ত্রীকে পেশ করে দিই নি কি? মেবেল ক্লাবকে চায়, কিন্তু ক্লাব আমাকে চায় না দ্বিজু! মেবেল সব জানে, তবু আমাকে ক্লাবে যেতে বলে শুধু ঠাট বজায় রাখতে, বুঝলে না?…" ইত্যাদি।

এ ঘটনাটা কেন মনে গেঁথে গেছে জানি না—নেটিভ কাকিমার দুঃখের চেয়ে মেম কাকিমার দুঃখ মনের পটে বেশি গভীর ছাপ ফেলে ব'লেই হবে।

লোকেনকাকাকে পিতৃদেব শুধু যে ভালবেসেছিলেন তাই নয়, গভীর শ্রদ্ধা

করতেন। প্রায়ই আমাকে বলতেন: "লোকে জানে শুধু ওর বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভার কথা। কিন্তু খুব কম লোকই জানে ওর দিলদরিয়া প্রাণটার কথা। ও হ'ল খোলা হাওয়া।" দিলদরিয়া ব'লে দিলদরিয়া—কেন, বলি।

গয়া থেকে পিতৃদেব বদলি হ'য়ে কলকাতায় আসার পর কাগজে কাগজে মহা হৈ চৈ—স্বনামধন্য ব্যারিস্টার শ্রীতারকনাথ পালিত তাঁর সমস্ত অর্থ তাঁর বিরাট বসত-বাড়িটি সমেত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছেন। অতঃপর একদিন লোকেনকাকা এসে হাজির। বললেন: "জানো দ্বিজু, কী কাণ্ড? বাবা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বললেন: তাঁর সর্বস্ব তিনি দানপত্র ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখে দিয়েছেন, এখন কেবল আমার সম্মতির অপেক্ষা। আমি তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে বললাম কী জানো? বললাম: Father, I am proud to be your son!" পিতৃদেবও সঙ্গে সঙ্গে লোকেন কাকাকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন: "And I, Loken, am proud to be your friend?"

(কিছুদিন পরে তারকনাথের উইল নিয়ে হাইকোর্টে মামলা রুজু হয়। আমার ব্যারিস্টার মেজমামার কাছে শুনতাম—শ্রীতারক পালিতের ছোট ছেলে জিতেন পালিত চাইছেন উইল নাকচ করতে। আর উইল যে বে-আইনি নয় প্রমাণ করতে তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন বড ছেলে লোকেন পালিত!—কী কাণ্ড! Drama in real life, বলে না?)

পিতৃদেব কতবারই যে এ-গল্পটি ক'রেছেন সুরধামে তাঁর বন্ধুদের কাছে—আর প্রতিবারই বলতে বলতে তাঁর চোখ চিকচিক ক'রে উঠেছে—আজও মনে পড়ে। খাঁটি মহত্ত্ব দেখলে তিনি এমনিই উজিয়ে উঠতেন। আজও মনে পড়ে সান্ধ্যসভায় "আলেখ্য" থেকে তাঁর একটি কবিতা পড়া—যেটি তিনি লেখেন দাতাকর্ণ তারকনাথের তর্পণে, তাতে এক জায়গায় লিখেছিলেন:

নির্জনে, নীরবে, নিভৃতে, একান্ত গাঁওয়ারি জাপানি ধরণে
আজন্ম-অর্জিত ধনরাশি তোমার দিয়েছ জননি চরণে!

ব'লে শেষে তিনি অকপটে লিখেছেন নিজেকে তিনি কি চোখে দেখতেন:

ব্যঙ্গ কবি আমি? ব্যঙ্গ করি শুধু? নিন্দা করি শুধু সকলে?
কভু না। আসলে ভক্তি করি আমি, ঘৃণা করি শুধু নকলে।
যেথা আবর্জনা ধরি সম্মার্জনী, তা ব'লে তো আমি অন্ধ না।
যেখানে দেবতা, ভক্তিপুষ্প দিয়ে স্তুতিছন্দে করি বন্দনা।

যাও ছন্দ তবে—পড় মহত্ত্বের ঐ চরণারবিন্দে জড়ায়ে।
পরে ঊর্ধ্বে—আরো ঊর্ধ্বে উঠে পড়ো সমগ্র এ-বঙ্গে ছড়ায়ে।

গয়ার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। পিতৃদেবের কাছে কাকিমার আর্জির কথা বলেছি। পিতৃদেব তাঁর মান রেখেছিলেন—লোকেনকাকাকে রাত সাড়ে নটার মধ্যে—এক রকম জোর করেই—বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন তুতিয়ে পাতিয়ে! কিন্তু কপালের লিখন—কে করে খণ্ডন: হ'ল কি, কিছু দিন পরে কাকিমাকে ছয় মাসের জন্যে ইংলণ্ডে যেতে হ'ল। তখন লোকেন কাকাকে আর ঠেকায় কে? গৃহিণীহীন অগৃহের ডিনার ডিশমিশ ক'রে প্রোষিতপত্নীক তর্কবাগীশ আমাদের এখানেই প্রত্যহ সান্ধ্যভোজ সমাপন ক'রে দুর্দান্ত তর্ক চালাতেন দুপুর রাত অবধি। বেশ মনে আছে এক একদিন গভীর রাতেও হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে কানে ভেসে আসতে তাঁদের বে-পরোয়া বিতণ্ডা ও প্রাণখোলা অট্টহাসির রেশ।

সাহিত্য সম্বন্ধে লোকেন কাকা ছিলেন উদারনৈতিক—তাই এমন কি গোয়েন্দা-কাহিনীকেও রসের সভায় অপাংক্তেয় মনে করতেন না। একদিন কি কথায় কথায় পিতৃদেবকে তিনি রীতিমত ধমক দেন: "শার্লক হোমস্ পড়োনি দ্বিজু? শার্লক হোমস্ যে পড়েনি তার এডুকেশন কমপ্লীটই হয় নি।" এই ব'লে পিতৃদেবকে তিনি Adventures of Sherlock Holmes বইটি দেন। স্পষ্ট মনে আছে বইটি সচিত্র ছিল। কিন্তু তখন ইংরাজি আমি সামান্যই শিখেছি তাই শার্লক হোমসের ছবি দেখেই তৃপ্ত থাকতে হ'ত। পরে কলকাতায় সুকিয়া স্ট্রীটে এসে দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নামধারী আমার এক প্রাইভেট টিউটরের সাহায্যে বইটি পড়তে পড়তে শিউরে উঠতাম—বিশেষ ক'রে Speckled Band গল্পটির ভয়াবহ রসে।

এই মাস্টার মহাশয়টি দেখতে যেমন তৎপর ছিলেন কাজে ছিলেন তেমনি অবিবেকী। আমাকে পড়াবেন কি? আমার কাছেই গান শেখা সুরু ক'রে দিলেন। দিনের পর দিন শরৎচন্দ্রের "বড় দিদির" মাস্টার মহাশয়ের মতনই তিনি আমাকে ঘণ্টাখানেক কোনোমতে একটু পড়িয়ে রে গা সা রে, সা মা গা, রে গা মা, মা ধা পা বাজিয়ে গাইতেন বিখ্যাত কতকা-আ-ল পরে-এ বল ভা-আ র ত রে এ—ইত্যাদি। পিতৃদেব হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যখন তাঁর বিবাহ হ'তে তিনি চিরকালের জন্য অসার খলু সংসারে শ্বশুর-মন্দিরকেই সার জ্ঞান ক'রে তত্র মহাপ্রয়াণ করলেন।

আর একটা কথা খুব স্পষ্ট মনে আছে, কেননা এই নিয়ে ওঁদের দুজনার মধ্যে প্রথম প্রথম তুমুল তর্ক হ'ত। লোকেনকাকা বলতেন: পিতৃদেবের রাণাপ্রতাপ

বা দুর্গাদাস বড় বেশি একরোখা সরল, মহৎ—একেবারে নিখাদ সোনা! নাটকের মধ্যে চাই জটিলতা, দ্বন্দ্ব। পিতৃদেব প্রথমে তাঁর কথা না নিলেও পরে গ্রহণ করেছিলেন ও আমাদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাসায় প্রায়ই সকৃতজ্ঞে স্বীকার করতেন তাঁর ঋণ, বলতেন: "লোকেন না বললে আমি আমার নাটকে এমন সব চরিত্রের সৃষ্টি করবার প্রেরণা পেতাম না—যারা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে বিকাশ পেয়েছে। ও বলেছিল ব'লেই রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাসের মতন আদর্শ চরিত্র ছেড়ে আমি প্রথমে ঝুঁকি জটিল চরিত্র আঁকতে—নুরজাহান, অমরসিংহ, সাজাহান, চাণক্য।"

এখানে কিন্তু আমার কিছু বলবার আছে—যাকে অবান্তর বললে ভুল হবে, যেহেতু আমি আঁকতে চাইছি পিতৃদেবকে যেভাবে দেখেছি বা বুঝেছি। গীতার একটা কথা আমার মনে কৈশোরেই ছাপ ফেলেছিল যে: "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ. পরধর্মো ভয়াবহঃ।" আমার মনে হয় পিতৃদেবের স্বভাব ছিল সরল ও স্বধর্ম ছিল আদর্শবাদ। তাই চাণক্য, সাজাহান, অমরসিংহ আমার মন টানলেও (নুরজাহান আমার তেমন ভালো লাগেনি—লোকেনকাকা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠা সত্ত্বেও) রাণাপ্রতাপ ও দুর্গাদাসের মহত্ত্বকে তিনি না এঁকেই পারতেন না। কিন্তু হ'লে হবে কি, এ-যুগ তো নয় সরল শ্রদ্ধা কি ঐকান্তিক আদর্শবাদের যুগ, কাজেই তাঁর মহৎ চরিত্রগুলিকে অত্যাধুনিক বাস্তববাদীরা সরাসর "অবাস্তব" ব'লে নাকচ ক'রে দিয়ে থাকেন—যেমন তাঁরা করেন বঙ্কিমচন্দ্রেরো নানা আদর্শবাদী চরিত্রকে।

কিন্তু মহৎ চরিত্রকে বাতিল করে যে-বুদ্ধি তাকেই যদি বলি অবাস্তব—unreal—তাহ'লে? কোন্ যুক্তিবলে আমরা মানবজীবনের এই সার্বকালিক অভিজ্ঞতাটিকে বাতিল করব বলুন, যে দেশে দেশে যুগে যুগে মানবসমাজকে রক্ষা ও ধারণ ক'রে এসেছেন মহাজনেরাই—অভাজনেরা নয়? অভাজনরা—ওরফে the injured and the insultedরা—নগণ্য বলছি না, (প্রতি মানুষেই যখন ভগবান মূর্ত তখন অবজ্ঞেয় বলব কাকে?) কিন্তু একথা কী ক'রে মেনে নেব যে নগণ্যদের অঙ্কনই বাস্তব, বরেণ্য-দের ছবি অবাস্তব? গড়পড়তারা সংখ্যায় সমৃদ্ধ মানি, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠরা যে গড়পড়তা ব'লেই মনের মধ্যে কোনো জোরালো তাগিদ পায় না স্বার্থ ছেড়ে পরার্থ বরণ করতে, ক্ষুদ্র লাভ ক্ষুদ্র সুখ ছেড়ে মহৎ লাভ মহৎ আদর্শের অভিযানে চলতে—একথা কোন্ সত্যদর্শী অস্বীকার করতে সাহসী হবেন? গড়পড়তাদের জয়গান করা সহজ, কিন্তু কঠিন হচ্ছে তাদের স্বভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো। তারা আন্তর বিকাশে বেশি দূর ওঠে নি ব'লেই তাদের দৃষ্টির পরিধি সংকীর্ণ হ'তে বাধ্য। তাই সর্বদেশে সর্বকালেই

মহাজনরাই অভাজনদের দীক্ষা দিয়ে এসেছেন "আগে চল্ আগে চল্ ভাই মন্ত্রে।" বেশি দূর যাবার দরকার কি? এই সেদিনো জর্মনিতে মাত্র কয়েক হাজার মানুষ দাঁড়ান নি কি—লক্ষ লক্ষ হিটলারী মতিভ্রান্তের বিরুদ্ধে—যাঁদের মধ্যে আইনস্টাইন ছিলেন একজন প্রধান অগ্রণী? যে-জর্মনি জগতের গৌরব তার প্রতিনিধি কারা? তার সংখ্যাগরিষ্ঠ নাজিদানবেরা, না তার মুষ্টিমেয় আন্তর্জাতিক আদর্শবাদীরা? আমাদের দেশেও কাদের বলব ভারতের আত্মার প্রতিনিধি—যে লক্ষ লক্ষ হুজুগে ভোট দেয় তারা—না যে-মুষ্টিমেয় মানুষ বড় আদর্শের জন্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়েন, দেশের জন্যে প্রাণ দেন, ভগবানের জন্যে ঘরছাড়া হন—এক কথায় অনল্পের পরমানন্দের জন্যে অল্পের ক্ষণসুখকে বিসর্জন দেন—তাঁরা? তবু অত্যাধুনিক বাস্তববাদীরা এই সব বরেণ্য-দের ছেড়ে অধন্য জঘন্যদের আঁকতেই ব্রতী হন কেন? বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্র-লাল, শরৎচন্দ্রের পরে কজন আধুনিক ঔপন্যাসিক এমন মহৎ চরিত্র এঁকেছেন যা পড়লে মানুষের লীয়মান মনুষ্যত্বে বিশ্বাস ফিরে আসে—বুক দশ হাত হ'য়ে ওঠে?

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি জঘন্য চরিত্র আঁকারও বিপক্ষে নই, কিন্তু আর্টস্ ফর আর্ট সেক-মন্ত্রবাদীদের এই বুকনিটি আমি কিছুতেই মানতে পারি না যে আঁকা নিখুঁত হ'লে খৃস্টের Last Supper-এর ছবির শিল্পমূল্য ও রেমব্রান্টের বৃদ্ধা বেশ্যার শিল্পমূল্য সমান। শিল্পের মধ্য দিয়ে যদি শুধু নগণ্য অভাজনদের জঘন্য বৃত্তিই নিখুঁৎ হ'য়ে ফুটে ওঠে, যদি পাশাপাশি বরেণ্য মহাজনদের ঊর্ধ্ব অভীপ্সা, মহৎ স্বপ্ন, বড়র জন্যে ছোট সুখকে ছাড়ার ছবিই না পাই তবে কী করব এ নগণ্য ব্যাঙের ছাতার ধন্য হ'য়ে ফুটে ওঠা নিয়ে? পদে-পদে-নিয়তি-নিষ্পিষ্ট দুঃখদাবদগ্ধ এ-জগতে অহৈতুকী প্রেম ও স্বার্থত্যাগী মহত্ত্ব ছাড়া আর কী আছে যা আমাদের দুঃখের গ্লানি থেকে মুক্তি দিয়ে আদিগন্ত অনন্তের আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করতে পারে? উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন অল্পাশীর কপালে সুখ নেই, সুখের অধিকারী শুধু সেই দুরাশী যে অপার ভূমার জন্যে পারের নোঙর কাটে। আর শুধু মহামুক্তির অকূলেই নয়, জীবনের প্রতি অনুভবরাজ্যের শিখরেই কি তাঁর মহিমার স্বাক্ষর দীপ্যমান্ নয়—যার নাম বিভূতি? গীতার একথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে অসামান্যকে অবাস্তব ব'লে বর্জন ক'রে শুধু সামান্যকে দেবত্বপদবী দেওয়ার দূরদর্শিতা নাম দেওয়া যায় কি? অবশ্য এমন ছেলেমানুষি কথা কেউই বলেন না যে উল্টো অত্যুক্তিটাই জ্ঞানের বাণী যে, কাব্য উপন্যাস শুধু অসামান্য বরেণ্যদেরকে নিয়েই ঘর করবে। নাটক উপন্যাসের প্রতি চরিত্রই যদি হয় গোপাল-বড়-সুবোধ-বালক-এর রকমফের তাহ'লে রুচির অগ্নিমান্দ্য হবেই—যেমন

ভূরিভোজ মিষ্টান্নভোজে পর্যবসিত হ'লে হ'য়ে দাঁড়ায়। সামান্যের মধ্যেও যে অসামান্য লুকিয়ে থাকে, মন্দের মধ্যেও ভালো, দীনতমের মধ্যেও মহৎ এ-ও আদর্শবাদীরই একটি দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু যদি সামান্য শুধু সামান্য ব'লেই স্তুত হয়, ক্লেদ গ্লানি বীভৎস ব'লেই প্রণামী পায়, জঘন্যতা জুগুপ্সার উদ্রেক করে ব'লেই বরণীয় হয়—তাহ'লে মানুষের ক্রমবিকাশ হ'য়ে দাঁড়াবে ক্রমবিনাশ—যেমন হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় প্রাণীদের বেলায়। আমি সেদিনও পড়ছিলাম পিতৃদেবের দুর্গাদাস, রাণা প্রতাপ—সর্বোপরি পাষাণীতে গৌতমের চরিত্র। এ-তিনটি চরিত্রের অঙ্কন এমন অপূর্ব যে পড়তে পড়তে মনে হয় তারা জীবন্ত, কথা কইছে। তাই তো বহুলোকে চোখের জল ফেলেছেন এ-জাতীয় চরিত্রের মর্মস্পর্শী মহত্ত্বে। লোকেনকাকা বলতেন: বাস্তববাদীরা বলবেন জীবনে মানুষ এত মহৎ হয় না। একথা আমি মানি না, কেননা আমরা এ-দুরন্ত হিংসা দ্বেষ লোভ নীচতার যুগেও দেখেছি দেবকল্প মানুষের পরের জন্যে অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ, ভক্তের শ্রদ্ধার্হের জন্য অপার দুঃখবরণ, জ্ঞানের মুক্তির জন্যে দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধন, শিষ্যের আরাধ্য গুরুর চরণে সর্বস্বদান। তবে একথা মানি যে এহেন মহৎ দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু বিরল ব'লেই তারা বাতিল—এর নাম কি যুক্তি? সব বড় উপলব্ধি, বড় দান, বড় ত্যাগ, বড় প্রতিভাই বিরল। বস্তুত সৃষ্টি দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় না কি যে, প্রতি পথেই মন্দের পরিমাণ যে শুধু ভালোর চেয়ে বেশি তাই নয়, মন্দের প্রাধান্য বেশি ব'লেই ভালো এত মহার্ঘ! পিতৃদেব সৃষ্টিতত্ত্বের এ-অনস্বীকার্য সূত্রটির স্বপক্ষে সার সার সাক্ষী সাজিয়েছেন তাঁর একটি হাসির গানে:

অস্তির চাইতে নাস্তি বেশি, সৃষ্টির চাইতে শূন্য।
বস্তা বস্তা পাপের মধ্যে কতটুকু পুণ্য!
সত্যের চাইতে মিথ্যা বেশি, ধর্মের চাইতে তন্ত্র।
ভক্তির চাইতে কীর্তন বেশি, পূজার চাইতে মন্ত্র।
আলোর চাইতে আঁধার বেশি, স্থলের চাইতে সিন্ধু।
মহামৃত্যুর মধ্যে জন্ম কতটুকু বিন্দু?

তাই লোকেনকাকার মতামতের মধ্যে খানিকটা সত্য আছে মেনে নিয়েও মানতে পারি না যে পিতৃদেবের গৌতম, প্রতাপসিংহ, বা দুর্গাদাসের চরিত্রের চিত্রমহিমা সাজাহান, চাণক্য কি নুরজাহানের চরিত্রের চেয়ে কম।

তবে একথা মানি যে, শিল্পে চরিত্র শুধু মহৎ হ'লেই হবে না, তাকে হ'তে হবে জীবন্ত—স্বয়ংসিদ্ধ। আর এইখানেই শিল্পীর কলাকারুর মহিমার কথা আসে, ছায়াও

ধরে কায়া, কল্পনার রঙ হ'য়ে ওঠে বাস্তবের চেয়েও দীপ্যমান্। শুধু তাই নয়, এও মানি যে, যেহেতু শিল্প জীবনকে অবলম্বন ক'রে তবেই জীবনাতীত সত্যের নির্দেশ দেয় যেহেতু যুগধর্মকে অস্বীকার করা চলে না কেন না যুগধর্ম গ'ড়ে ওঠে জীবনের বিকাশের তালে তালে। তাই একথাও স্বীকার্য যে কালাতিপাতে জীবন উত্তরোত্তর জটিল হ'য়ে উঠছে ব'লে শিল্পকলায়ও জটিলতাকে অঙ্গীকার করতে হবে, শুধু একমুখী সরলতাকেই নয়। লোকেনকাকা ছিলেন এ-যুগের মহামনস্বী সন্তান, তাই তাঁর নির্দেশ সর্বৈব ভুল ছিল না : পিতৃদেব তাঁর শেষ জীবনে অমরসিংহ, সাজাহান, ঔরংজীব, চাণক্য প্রভৃতি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব এঁকে যে-কীর্তির শিরোপা পেয়েছেন সে তাঁর প্রাপ্য। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে তাই ব'লে একথা সত্য নয় যে এ-যুগে মহত্ত্বের বাজারদর ক'মে গেছে কিম্বা এ-যুগের অভাজনরা মাথাগুনতিতে বেশি ব'লেই কাব্যে উপন্যাসে তাঁরা মহাজনদের চেয়ে বেশি জীবন্ত। এককথায়, সংখ্যার অনুপাতে সত্যের পরিমাপ শুধু যে অযৌক্তিক তাই নয়, এ-জাতীয় বাস্তববাদে মানবসভ্যতার অধোগতি না হ'য়েই পারে না।

সাত

গত পত্রে লোকেনকাকার মহত্ত্বের কথা আরো কিছু বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু ভেবেচিন্তে মনে হ'ল কাজ নেই, হয়ত আমার বাস্তববাদী বন্ধুরা রৈ রৈ ক'রে উঠবেন : "এর নাম কি বাল্যস্মৃতি না নীতিপাঠ?" কিন্তু নীতিবাদী হবার আশঙ্কা আমার নেই, কেন না বহু ঘাটের জল খেয়ে যাকে পারে আসতে হয়েছে সে কাউকে হাবুডুবু খেতে দেখলে আর যাই পারুক না কেন ভ্রূকুটি করতে পারে না। ভালোই হ'ল, এ-পত্রে লিখব বিজয়চন্দ্রের কথা যিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক হ'লেও পদে পদে হাসাহাসি করতেন সর্ববিধ শুচিবাই ও গোঁড়ামি নিয়ে। তিনি প্রায়ই বলতেন : "বাবা মণ্টু, আমি কে জানো? না হিন্দু, না ব্রাহ্ম, না খৃস্টান, না বৌদ্ধ। আমি গোল আলু—ঝোলে ঝালে অম্বলে সব তাতেই আছি। তাই তো আমি যা তা নিয়ে হাসতেও ভয় পাই না। মনে নেই আমার পিলুবারোয়াঁয় ভেকপ্রশস্তি—হি হি হি!"

অথ ভাষ্য : একদিন বিজয়কাকাকে পিতৃদেব বলেন কথায় কথায় : "তোমাকে আমি এত ভালোবেসে ফেলেছি কেন জানো বিজয়? এই জন্যে যে পণ্ডিত হ'য়েও তুমি গম্ভীর নও—নৈলে কি ব্যাং নিয়ে গান বাঁধতে পারতে?"

বিজয়কাকা উজিয়ে উঠে বললেন: "আর আমি তোমাকে এত ভালোবেসে ফেলেছি কেন জানো, দ্বিজু! এই জন্যে যে হাসির মধ্যে যে কান্না লুকিয়ে থাকতে পারে একথা আমি তোমার হাসির গানের মধ্যে দিয়ে যেন নতুন ক'রে চেখেছি। সত্যি পাঁচকড়িবাবু ঠিকই বলেছেন: তোমার 'পাঁচশো বছর' কিম্বা 'আমি যদি পিঠে তোর ঐ লাথি একটা মারি রাগে' জাতীয় গানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে কান্নাই বটে।"

মহামনস্বী শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যিই একদিন চোখের জল ফেলেছিলেন পিতৃদেব যখন গাইছিলেন লর্ড কর্জনের বেঙ্গল পার্টিশনকে নিশানা ক'রে লেখা:

পাঁচশো বছর এম্‌নি ক'রে আসছি স'য়ে সমুদায়!
এইটে কি আর সইবে নাকো—দু'ঘা বেশি জুতোর ঘায়!
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা, দিবি দুঘা—দে না বাবা!
দু ঘা বেশি দু ঘা কমে এমনই কী আসে যায়!

সে-সভায় সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতিও উপস্থিত ছিলেন এবং পিতৃদেবের এ-নামটি শুনে বিচলিত হয়েছিলেন। কিন্তু হ'লে হবে কি, সুরেশবাবু সর্ববিধ কোমল আবেগকে প্রাণপণে দাবিয়ে রেখে নিজের ব্যঙ্গ প্রবৃত্তিকেই বেশি জাহির করতে চাইতেন। কিন্তু সেদিন তিনি মহারসিক পাঁচকড়িবাবুকে চোখের জল মুছতে দেখে এতই স্পৃষ্ট হন যে উঠে পিতৃদেবকে প্রণাম ক'রে বলেন: "দ্বিজুবাবু, পাঁচকড়িবাবু ঠিকই বলেছেন—এ হাসির গান নয়। পরাধীনতার বেদনা এর ছত্রে ছত্রে। আর স্বজাতির দুঃখ দৈন্যে যিনি এমন গভীর বেদনা বোধ করতে পারেন তিনি প্রণম্যই বটেন।"

পাঁচকড়িবাবুর মতন সুরেশবাবুও ছিলেন পিতৃদেবের বিশেষ অনুরাগী বন্ধু। এ দুই মনস্বীর কথা পরে বলছি, উপস্থিত বিজয়কাকার কথাটা সেরে নিই—আরো এই জন্যে যে, তাঁর সঙ্গে পিতৃদেবের হৃদ্যতা ছিল বেশি গভীর।

বিজয়কাকা ছিলেন ব্রাহ্ম—এ-কথার উল্লেখ করেছি। থাকতেন উৎকল দেশের সম্বলপুরে। উড়িয়া ভাষায় পণ্ডিত। পিতৃদেবকে শিখিয়ে ছিলেন একটি উড়িয়া গান, গানটি আমি এখনো শোনাতে পারি মূল সুরে:

তু লাগী গোপদণ্ড মনারে কালিয়া সোনা!
দধি দুধ সর খাও রে কালিয়া, দধি দুধ সর খাও।

(আর) কৌড়ি মাগিলে অমনি কালিয়া, মুরলী বজাও
রে কালিয়া সোনা!

পিতৃদেব কী যে হাসতেন এগানটি গাইতে গাইতে! বলতেন: "কালিয়া সোনা জানতেম বটে ঠিক কোন্ সময়ে বাঁশি বাজাতে হয়!"

বিজয়কাকার ভেক-প্রশস্তির কথা সারা না ক'রেই তাঁর উড়িয়া গানের প্রসঙ্গ সুরু ক'রেছি। অথ উদ্ধৃত করি—বিজয়কাকার ভেক-স্তুতি—যার সঙ্গে পিতৃদেবের দোয়ার দিতেন:

বলি, ও কোলা ব্যাং!
ডাকে কত অনুরাগে: "ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাং।"
পেটটি তোমার অতি ডাগর, ওহে কচু বনের নাগর।
চারপেয়ে বীর ওগো! দেখাও হাতিকেও ঠ্যাং!

হাতিকে ব্যুত্থিত-চরণ-প্রদর্শনের ভাষ্য আছে।

বিজয়কাকা অত্যন্ত ভালোবাসতেন ত্রৈলোক্যনাথের "কংকাবতী"। আমাকে এ-বইটি প্রথম তিনিই উপহার দেন ও বলেন: "এ রকম বই জগতে আর একটি মাত্র আছে বাবা মণ্টু—Alice in Wonderland."

এ-হেন কংকাবতীর এক জায়গায় আছে এক পরম উপভোগ্য ব্যাং সাহেবের কথা। পড়তে পড়তে আমি হেসে আর বাঁচি না। মনে হয় কংকাবতীতে ব্যাং সাহেবের গভীর আত্মসম্মানের দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হ'য়েই বিজয়কাকা বাঁধেন ঐ গানটি। তাই এখানে কংকাবতীর ব্যাং সাহেবের গুণপনার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলে সেটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ত্রৈলোক্যনাথ লিখছেন:

"ব্যাং বলিলেন: দেখ কঙ্কাবতী! একদিন এই বনের ভিতর বসিয়াছিলাম। ···এক দুষ্ট হাতী পাশ দিয়া না গিয়া আমাকে ডিঙাইয়া গেল। রাগে আমার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। রাগিলে আমার আর জ্ঞান থাকে না। আমি হাতীকে বলিলাম: উটকপালী, চিরুণদাঁতী! বড় যে ডিঙুলি মোরে? হাতীটা উত্তর করিল: থাক্ থাক্ থাক্ থ্যাবড়া নাকী! ধর্মে রেখেছে তোরে। হ্যাঁ কঙ্কাবতী! আমার কি থ্যাবড়া নাক?"

কংকাবতী থেকে উদ্ধৃতিটি দিলাম আরো এই কথাটি জানাতে আমার সঙ্গে বিজয়কাকা কত সহজে মিশতেন। আমাকে তিনি কত সময়ে কত বইয়ের কত

গল্পই যে করতেন! বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্যের ও বৌদ্ধ জাতকের কথা। তিনি পালি ভাষায়ও ছিলেন পণ্ডিত—ধর্মপদের একটি বাংলা অনুবাদ করেছিলেন—তার এক জায়গায় ছিল অক্রোধ দিয়ে ক্রোধ জয় করতে হবে। মূল শ্লোকটির শুধু প্রথমার্ধটুকু মনে আছে: "অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।" বুদ্ধদেবের উপর ভক্তি ছিল তাঁর অগাধ। তাঁকে ভালোবেসে তাঁর ছোঁয়াচেই আমার বালক মনে সর্বপ্রথম বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে—যদিও বৌদ্ধধর্ম কোনো দিনই আমার মন টানে নি। এ-জীবনে দুঃখ আছে অঢেল—কে না মানবে? কিন্তু তা ব'লে সুখও যে নেই এমন কথাও তো বলা চলে না। বৌদ্ধধর্ম—শুধু বৌদ্ধধর্ম কেন, খৃস্টান ধর্মও—পদে পদে জীবনের সবরকম সুখ আরাম হর্ষ পুলককে ক্ষণস্থায়ী ব'লে নাকচ করেছে। কিন্তু ফুল ফুটে ঝ'রে যায় ব'লে ফোটাটা মায়া হ'ল কোন্ যুক্তিতে আমি আজ পর্যন্ত ভালো করে বুঝবার কিনারায় আসি নি—কাজেই ছেলেবেলায় বুঝব কেমন ক'রে। বিজয় কাকা প্রায়ই একটি উপনিষদের শ্লোক উদ্ধৃত করতেন যেটি উত্তরজীবনে পড়তাম সানন্দে: "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"—অর্থাৎ কে এজগতে বাঁচতে চাইত যদি আকাশে বাতাসে আনন্দ না ওতপ্রোতঃ হ'যে থাকত? এই আনন্দকেই রবীন্দ্রনাথ হাঁ-র দিক্ বলেছেন—সদর্থক; দুঃখবেদনা হ'ল না-র দিক—নঙর্থক। এই রসের বাণী, আনন্দের দর্শনই আমার মন টানত, দুঃখ ও পাপের বিভীষিকায় আমার মনে আতঙ্ক জাগত না। বিজয় কাকা কিন্তু বুদ্ধের ওকালতি করতে বলতেন: "একথা ঠিক যে বৌদ্ধধার্মিকেরা খৃস্টান ধার্মিকদের মতনই বাড়াবাড়ি ক'রে হ'যে উঠেছে কঠিন নীরস, কিন্তু ভুলো না বাবা—বুদ্ধ নিজে ছিলেন বেজায় সরস ও কোমল পাকা আমটির মতন—রূপেও কম যান না।"

বুদ্ধদেবকে পাকা আমের সঙ্গে তুলনা করা—এ কি ভুলবার?

কিন্তু বুদ্ধভক্তি তাঁর চরিত্রের মাত্র একটা দিক। তাঁর স্বভাব-জিজ্ঞাসু মন নিরন্তর জ্ঞানের দিশা খুঁজত কত দিকেই যে—ফলে তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছিল বিনয়—সত্যিকারের বিনয়—যে জানে ব'লেই সজাগ যে সে বেশি কিছু জানে না। সক্রেটিসের গল্প আমি তাঁর কাছেই প্রথম শুনি:

ডেলফি-র দৈববাণী বলল—গ্রীসে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী সক্রেটিস। সক্রেটিস তো শুনে অবাক্! কিছুদিন তিনি একে ওকে তাকে নানা প্রশ্ন ক'রে তবে বুঝলেন অরেক্ল-এর রায়ের মর্ম। বললেন: দেবতা ঠিকই বলেছেন,—আর সবাই জানেও

না যে তারা অজ্ঞান। আমি জানি। কাজেই আমি তাদের সবার চেয়ে বেশি জানি —বটেই তো।'

বিজয় কাকা শুধু যে একটি বিশিষ্ট মনস্বী ব্যক্তিরূপ ছিলেন তাই নয়—কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, হাসি, শ্রদ্ধা ও ঝাঁজহীন স্বাধীনচিন্তার সমন্বয়ে তিনি ফুটে উঠেছিলেন এমন একটি উজ্জ্বল তাপহীন ব্যক্তিরূপে যে, যেই তাঁকে দেখত তারই চোখ জুড়িয়ে যেত। মনে আছে তাঁর সম্বন্ধে মেসোমহাশায়ের একটি কথা যখন তিনি ছানি কাটিয়ে অন্ধ হয়ে যান পিতৃদেবের লোকান্তরের কয়েক বৎসর পরে। মেসোমহাশয় বলেছিলেন: "মণ্টু, বিজয়বাবুকে এই মাত্র দেখে এলাম। তিনি কী বললেন জানো? বললেন: 'কে? গিরিশ? ভালোই হ'ল তোমার কান্তিই এত দিন উপভোগ ক'রে এসেছি, এবার সুযোগ মিলল তোমার কণ্ঠ ও স্পর্শ চেখে চেখে উপভোগ করবার। ভগবান এক হাতে কেড়ে নেন—অন্য হাতে দিতে—এ কথাটি এতদিন বইয়েই প'ড়েএসেছি—এখন হাতে কলমে উপলব্ধি করব, কী বলো'?"

শুনে আমি শুধু যে চোখের জল রাখতে পারিনি তাই নয় আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠেছিল। কিছুদিন আগে কোথায় যেন পড়েছিলাম—বোধ হয় আনাতোল ফ্রাঁসেরি লেখা—যে, পঙ্গু ভিক্ষুককে দেখলে আমরা ভিক্ষা দিই প্রায়ই এই প্রচ্ছন্ন ভয়ে: "যদি আমি ভিক্ষুক হ'তাম আর কেউই আমাকে ভিক্ষা না দিত!" ঠিক তেমনি কেউ অন্ধ শুনলেই আমার ভীরু বালকমন এই ভয়াবহ কল্পনাকে ঠেকাতে পারত না: "যদি আমি অম্নি অন্ধ হই কোনোদিন!" তাই আমার বাল্যজীবনের অন্যতম শিক্ষক ও উপদেষ্টা স্নেহময় বিজয়কাকা অন্ধ হ'য়ে গেছেন শুনে যে আমি বিচলিত হব এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু পরে আশ্চর্য হয়েছিলাম আমি নিজেই যখন বিজয়কাকার কয়েকটি কথায়ই আমার মনে শান্তি এল ফিরে। আমি মেসোমহাশয়ের সঙ্গে তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে ফেলতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলেছিলেন: "কেঁদো না বাবা! তুমি তো অন্তত ভগবানকে করুণাময় ব'লে চিনতে পেরেছ, তাই তোমাকে যদি বলি—তিনি কেড়ে নেওয়ার পথেও দেন তাহ'লে আর যেই অবিশ্বাস করুক না কেন, তুমি অবিশ্বাস করবে কেমন করে?"

পরম ভক্ত বা ভাগবত বলতে যা বোঝায় তিনি তা ছিলেন না, তবু তাঁর কথা শুনে আমি প্রথম উপলব্ধি করি আত্মসমর্পণের নিহিতার্থ, মনে প'ড়ে যায় পরমহংস-দেবের একটি প্রিয় গান:

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী
আমি রথ তুমি রথী যেমন চালাও তেমনি চলি।

তার পরে বহু দুঃখ বেদনার আঁধার-দুর্লগ্নেই মনে পড়েছে বিজয়কাকার হাসিমুখে চিরান্ধতাকেও বরণ করে নেওয়া। মনে পড়েছে দৃষ্টি হারানোর পরেও তাঁর নিজের হাতে-গড়া-মেয়ে সুনীতিদির সাহায্যে মিল্টনের মতনই প্রসন্নচিত্তে লেখাপড়া করা। তিনি হেসে বলেছিলেন একদিন যখন আমি তাঁর সঙ্গে সংস্কৃত ছন্দ নিয়ে আলোচনা করছিলাম—"জানো বাবা মণ্টু, আগে আগে ছন্দকে সময়ে সময়ে চোখ দিয়ে অক্ষর গুনতে গিয়ে ভুল করতাম কিন্তু আজকাল সে-ভুল আর হয় না—কেননা ছন্দের বিচারে চোখ ভুল করলেও কান ভুল করে না। এইখানে ফের দেখ ক্ষতির পথ দিয়ে লাভ এসে হাজিরি দেয় কেমন ক'রে।"

অন্ধ হবার পরে এমনি ক'রে নানা ছলে তিনি অপরকে তাঁর নিজের দুরদৃষ্টের দরুণ ব্যথা-পাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিতেন। এ-মনোবৃত্তি যে সুলভ নয় একথা আপনি নিশ্চয়ই মানবেন। কারণ আমরা মুখে যতই বড়াই করি না কেন, নানা অছিলায়ই চাই অপরের দরদ—আহা উহু। কিন্তু বিজয়কাকা যে সত্যিই চাইতেন না তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এমন কি তাঁর কথাও নয়—তাঁর অন্ধ মুখের অনাহত প্রশান্তি। প্রশান্ত অবশ্য তিনি চিরদিনই ছিলেন, কিন্তু অন্ধ হবার পরে তাঁর মধ্যে এমন একটা সমাহিত সর্বস্বীকারের (resignation) ভাব এসেছিল যে তাঁকে দেখলে আমার প্রায়ই মনে প'ড়ে যেত রবীন্দ্রনাথের একটি চিরস্মরণীয় গান :

এই করেছ ভালো, নিঠুর, এই করেছ ভালো।
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দাহন জ্বালো।
আমার এ-ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ-দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।

কিন্তু এ অনেক পরের ঘটনা—যখন আমি কলেজে পড়ি—পিতৃদেবের দেহান্তের পরে। তাই ফের পিছিয়ে যাই—সুরধামের যুগে।

পিতৃদেব বিজয়কাকাকে এত ভালোবাসতেন যে মাঝে মাঝে সম্বলপুরে গিয়ে দু চার দিন কাটিয়ে চাঙ্গা হয়ে ফিরে আসতেন। বিজয়কাকাও মাঝে মাঝেই সুরধামে এসে থাকতেন বন্ধুবৎসল পিতৃদেবের স্নেহসঙ্গ পেতে। এই সময়ে তাঁর সংস্পর্শে এসে আমার একটি মস্ত লাভ হয় এই যে সংস্কৃত ছন্দে আমার কান তৈরি হ'য়ে গেল। পিতৃদেব সংস্কৃত ওরফে লঘুগুরু ছন্দে অনেকগুলি অনবদ্য গান বেঁধেছেন—যেকথা বলেছি আমার "ছান্দসিকী" গ্রন্থে। আবাল্য তাঁর ও বিজয়কাকার নিখুঁৎ সংস্কৃত

উচ্চারণ শুনতে শুনতে আমার সংস্কৃত ছন্দে এতখানি কর্তৃত্ব হয়েছিল যে ষোলো বৎসর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় আমি ইংরাজি থেকে সংস্কৃত অনুবাদ করেছিলাম গদ্যে তথা পদ্যে—অনুষ্টুপ ও উপজাতি ছন্দে। আমার পরীক্ষক বিস্মিত হ'য়ে বলেছিলেন যে এ-পর্যন্ত সংস্কৃতে কোনো ছাত্রই এ-ধরনের কৃতিত্ব দেখায় নি—পরীক্ষার খাতায় বিকল্পে গদ্যে পদ্যে ইংরাজি থেকে সংস্কৃত অনুবাদ ক'রে। আমি বাংলার চেয়েও বেশি নম্বর পেয়েছিলাম সংস্কৃতে। বলতে কি, ম্যাট্রিকে আমি সংস্কৃতে দুটো প্রশ্নপত্রেই খুব বেশি নম্বর না পেলে প্রথম বিভাগে পাশ করতে পারতাম বটে, কিন্তু জলপানি যে পেতাম না এ নিশ্চয়—কারণ ইংরেজিতে আমি মাত্র শতকরা ৬৫ নম্বর পেয়েছিলাম।

কিন্তু এতটাই যখন বললাম তখন আর একটু বলি। সংস্কৃতের চর্চায় আমি এত আনন্দ পেতাম যে মেট্রোপলিটানের এক মহা বৈয়াকরণিক পণ্ডিতকে প্রাইভেট টিউটর রেখেছিলাম ম্যাট্রিকের আগে। তাঁর কাছে নানান্ সংস্কৃত বই পড়তাম। আমার ছন্দে উৎসাহ দেখে তিনিই খুশি হ'য়ে আমাকে বলেন পরীক্ষায় ইংরাজি থেকে সংস্কৃত অনুবাদ করতে গদ্যে ও পদ্যে। বলেছিলেন হেসে: "মন্দ কি? বাপকা বেটা হও—'নতুন কিছু করো।' "

একদা তিনি সংস্কৃতে অনুপ্রাসের একটি চরম দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন—পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের কীর্তির জয়গান করতে। শ্লোকটি এই:

ললল্লীলো ললল্লীলো লোলো লোলো ললল্ললঃ।
লীলালালোলিলীলালীং লীলালী লোললাঃ ললঃ॥

সংক্ষেপে, চৈতন্যদেবের নীলাচল ছেড়ে বৃন্দাবনলীলার আকাঙ্ক্ষা ও তাঁর ভক্তবৃন্দের তাঁর সে-লীলার সহচর হওয়া—এই হ'ল এর বিষয়বস্তু। কিন্তু আমার বালকমন একেবারে উল্লসিত হ'য়ে উঠল—কী চমৎকার! অমনি বিজয়কাকার কাছে গিয়ে হাজির। তিনি তো হেসে কুটিকুটি। বললেন: "চমৎকার বটে বাবা, কিন্তু এ-পথে সত্যিকার কবিতা লেখা যায় না মনে রেখো। এ কেমন জানো? যেমন ওস্তাদদের তানবাজি ক'রে গানের শ্রাদ্ধ করা।"

এ-বিষয়ে আর বেশি বলতে গেলে রসভঙ্গ হবে। তবে এ-সূত্রে আমি কী বলতে চাইছি সেটুকু মনে রাখলে হয়ত সংস্কৃত নিয়ে বাল্যাবধি আমার এত মাথাব্যথার মর্ম গ্রহণ করা সহজ হবে। পিতৃদেব বারবারই বলতেন: "ইংরাজিতে তুই একটু কাঁচা রয়ে গেলি—হোক গে। ইংরাজি পরে শিখে নিবি সহজেই—বাপকা বেটা তো। ও জন্যে আমি ভাবি না। কিন্তু সংস্কৃতে যদি ছেলেবেলায় রস না পাস

পরে আর শিখতে মন চাইবে না। তাই সংস্কৃতে যে তুই এই বয়সেই রসিয়ে উঠেছিস এতে আমি খুশি। কারণ আমাদের কালচারের ভিৎ যে সংস্কৃত—বিজয়ের একথা একটুও অত্যুক্তি নয়।"

ভগবানেন কৃপায় শ্রীঅরবিন্দের চরণচ্ছায়ায় ব'সে এ-যথার্থোক্তির মর্ম আরো গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছি—বাইশ বৎসর ধ'রে।

বিজয়কাকার সম্বন্ধে আর একটু ব'লেই ইতি করব। তিনি আমাকে সংস্কৃতের ঠিক দীক্ষা দেন নি বটে, কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে আমার অন্তঃশ্রুতি উন্মেষিত হয়েছিল তাঁরই স্নেহোৎসাহে। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর ছিল যেমন পাণ্ডিত্য, সংস্কৃত ছন্দের কানও ছিল তাঁর তেমনি অনুশীলিত। শুধু তাই নয়, তিনি স্বভাব-কবি না হ'লেও কবিতা লেখায় তাঁর নৈপুণ্য ছিল নিতান্ত কম নয়। তাঁর গীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদ কবিতার বিচারে পুরোপুরি রসোত্তীর্ণ না হ'লেও জয়দেবীয় পদলালিত্যের কিছু আভাস তা থেকে পাওয়া যায়। শুধু একটি শ্লোকের অনুবাদের নমুনা দিই: জয়দেবের বিখ্যাত

অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্
হরিবিরহদহনবহনেব বহুদূষণম্—

বিজয়কাকাই এর অনুবাদ করেন:

এ কী অসহ! হরিবিরহতাপে যে দেহ জরিছে!
মণিখচিত বলয়াদি তো অধিকতর কহিছে!

বহুবৎসর পরে আমার "অনামী" কাব্যগ্রন্থে আমার কয়েকটি লঘুগুরু ছন্দে রচিত কবিতা প'ড়ে তিনি আমাকে আশীর্বাদ ক'রে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। সেটি অনামীতে প্রকাশ করেছি। তবু তাঁর রসজ্ঞতা তথা চিন্তাশীলতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে তা থেকে একটু এখানে উদ্ধৃত করি:

"প্রাচীন ছন্দ সম্বন্ধে একটি কথা বলি। প্রাচীনের চিন্তাধারা যে-অবস্থার ফলে, যে-ভাবে ছুটিতে গিয়া যে-সব ছন্দের কাঠামো গড়িয়াছে, সে-কালের, সেই ভাবের অনুভূতি জন্মিলে সে-ছন্দ একালেও মনোহর হইতে পারে। আমাদের শিক্ষায়, পরিবর্তনে ও বিবর্তনে যে নূতনত্ব পাইয়াছি তাহাকে আমরা মুছিয়া ফেলিতে পারি না, তবুও প্রাচীনতার সৌন্দর্যে ডুবিতে পারি ও প্রাচীন ছন্দের গতিতে নূতন ভাব বহাইতে পারি।···একালে যাঁহাদের রচনা 'লোকপ্রিয়' হইয়াছে বা হইতেছে আমি তাঁহাদের কাহারো লেখার সহিতই পরিচিত নই। কাজেই বলিতে পারিব না তোমার কবিতা লোকপ্রিয় হইবে কি না। নাইই যদি হয় তবুও তোমাকে তোমার ম'ত করিয়াই

লিখিতে হইবে ও অল্প লোকের রসগ্রহণেই তুষ্ট থাকিতে হইবে। তাছাড়া কবিতা লোকপ্রিয়—পপুলার হোক—ইহা যে কোনো একটা আদর্শই নহে ইহা তুমি নিজেও খুব ভালো করিয়াই জানো।

ইতি আশীর্বাদক—

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার"

আট

এবার পিতৃদেবের আরো দুএকটি বন্ধুর কথা বলি—যাঁদের কাছ থেকে আমার বালক-মন দিনের পর দিন শুধু যে আনন্দের পাথেয় আহরণ করত তাই নয়, এমন অনেক নির্দেশ পেত যার ফলে পরজীবনে আমি লাভবান্ হই।

এঁদের মধ্যে সব আগে মনে পড়ে খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের কথা। সুরধামে তিনি মাঝে মাঝেই এসে পিতৃদেবের হাসির গানে দোয়ার দিতেন তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে। এঁদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলেই মনে পড়ত "অত্যাগসহনো বন্ধুঃ" পদটির কথা। বন্ধু তো নয়, যেন দোসর —নিত্যসাথী: উভয়েই শালীনতায় নিখুঁত, বেশভূষায় অনবদ্য, কথালাপে প্রিয়ম্বদ, রসবোধে জনপ্রিয়। পিতৃদেবের বিখ্যাত হাসির গানের দোয়ার ছিলেন এঁরা দুজনেই। খগেনকাকা কীর্তনও গাইতেন সুন্দর। যতদূর মনে হয় সে-সময়ে তিনি কীর্তন রীতিম'ত শেখেন নি, শিখেছিলেন পরে—৺নবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছে, যিনি আমাকেও কীর্তনে দীক্ষা দেন! খগেনকার সঙ্গে সে-সময়ে আমি তর্ক করতাম বালসুলভ অজ্ঞানতাবশেই যে, সাহিত্যের দিক দিয়ে কীর্তন পদাবলীর মূল্য থাকলেও সঙ্গীতের দিক দিয়ে হিন্দুস্থানি ওস্তাদি তানালাপের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। খগেনকাকা আমাকে স্নেহ করতেন ও আমার কণ্ঠস্বরের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন—তাঁর একটি রচনায় সোচ্ছ্বাসেই লিখেছিলেন: "এরকম কণ্ঠ আমি বেশি শুনি নি।" তাই আমার ঔদ্ধত্যে দুঃখ পেলেও বোঝাতেন ধীর যুক্তি দিয়ে—কেন কীর্তন সঙ্গীতের দিক দিয়েও মহনীয়। তিনি বলতেন প্রায়ই: "মন্টু, যারা কীর্তন শেখে তারা প্রায়ই কণ্ঠ না সেধে কীর্তন গায় ব'লেই কীর্তনের সাঙ্গীতিক প্রতিষ্ঠার হানি হয়েছে। কিন্তু মার্জিতকণ্ঠ কীর্তনী কীর্তনের মধ্যে দিয়ে শুধু ভাবের নয়—সুরের ইন্দ্রজালও সৃষ্টি

করতে পারেন। তাই আমি চাই তোমার কণ্ঠ নিয়ে তুমি মন দিয়ে কীর্তন শেখো ও কীর্তনকে সুরের দিক দিয়েও সমৃদ্ধ করে তোলো। তুমিও পারবে যদি শ্রদ্ধা নিয়ে কীর্তন শেখো······" ইত্যাদি।

কিন্তু সে-সময়ে উচ্চাঙ্গ কীর্তন আমি শুনিনি, কাজেই খগেনকাকার এ-কথায় কান দিই নি। পিতৃদেবের দেহান্তের পরে বি. এস. সি. পাস ক'রে গণেশ দাস ও রেবতীমোহন সেনের অপূর্ব কীর্তন শুনে অভিভূত হ'য়ে যখন উচ্চাঙ্গ কীর্তনে তালিম নেব ঠিক করি, তখন খগেনকাকাই আমাকে পেশ করেন তাঁর গুরু নবদ্বীপ ব্রজবাসী মহাশয়ের কাছে। ব্রজবাসী মহাশয় সুকণ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু উচ্চাঙ্গ কীর্তনের অন্ধিসন্ধি তাঁর জানা ছিল—তালে সুরে আঁখরে। তিনি খোল বাজাতেনও অদ্ভুত। তাঁর কাছে উচ্চাঙ্গ কীর্তন শিখতে না শিখতে আমি বুঝতে পারি কীর্তনের মহিমা। বস্তুতঃ, চলতি চুটকি কীর্তন শুনে কীর্তনের বিচার খানিকটা কোনো প্রতিভাধরের শৈশব মতিগতি দেখে তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিচারের সামিল। কারণ চুটকি কীর্তন চুটকি ব'লেই ক্ষণভঙ্গুর, অগভীর, অবিকশিত! বিকশিত কীর্তনের গুণ অগুন্তি : পদাবলীর লালিত্য, ভাবের সঙ্গে সুরের পরিণয়, মানবজীবনের নানামুখী প্রবৃত্তির চিত্রণ, হৃদয়ের সঙ্গে কণ্ঠের মিতালি, সুরের জাদুতে স্বতোবিরোধী ভাবাবেগের সমন্বয়, সর্বোপরি, নাট্যসঙ্গীতের স্থাপত্য-পরিকল্পনা—কত বলব? আমার "সাঙ্গীতিকী" গ্রন্থে আমি কীর্তনের আশ্চর্য মহিমা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছি—সেসব কথার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তাই আজ শুধু একটু আভাষ দিতে চেষ্টা করব—আমার উত্তরযোগজীবনে কীর্তনের ভাব সুর রস কী ভাবে আপনা থেকে এসে কাঁধ মেলায় ওস্তাদি সঙ্গীতের নিরঙ্কুশ সুরবিহারের সঙ্গে—যার ফলে আমি একটু একটু ক'রে আমার নানা বাংলা গানে কীর্তনের পদ্ধতিতে আঁখর দেওয়া সুরু করি। প্রথম যখন আঁখর দেওয়া সুরু করি তখন কাব্যসঙ্গীতের বোদ্ধারা বলেছিলেন ও-সেকেলিয়ানা চলবে না আর—যেহেতু আধুনিক কাব্যসঙ্গীত যেখানে পৌঁছেছে সেখানে প্রতি শব্দটি অপরিবর্তনীয়। কাজেই আঁখর তখনি-তখনি রচিত ব'লে আধুনিক বাংলা গানে খাপ খাবে না। কিন্তু পরে আমার নানা বাংলা গানে ছন্দে মিলে আঁখর দেওয়া শুনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ হ'য়ে স্থির করেন তিনিও তাঁর আধুনিক গানে আঁখরের পুনঃপ্রবর্তন করবেন। এ-সম্বন্ধে তাঁর নানান চমৎকার কল্পনাও ছিল, সেসবের অবতারণা এখানে অবান্তর হবে। কেবল বলি : আমার বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম প্রমুখ কয়েকটি কীর্তনভঙ্গিম গান আমার ৺গীতিশিষ্যা উমা বসুর মুখে শুনে কবি এতই

খুশি হন যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আমাকে দুটি চিঠি লেখেন। যেদুটি তীর্থংকরে ছাপা হয়েছে। তাই এখানে শুধু এইটুকু উদ্ধৃত করব যে তিনি একটা জিনিষ ঠিকই ধরেছিলেন তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির আলোয়: যে, আমার বাংলা গানে ওস্তাদি সঙ্গীত, কীর্তন ও বাউল এই ত্রিধারার সমাবেশ হয়েছে। (কবি লিখেছিলেন: "তোমার সুকণ্ঠে হিন্দি, গৌড়ীয় এবং কীর্তন বাউল ধারার ত্রিবেণীসঙ্গম হয়েছে—এর প্রভাবের চিন্তা ক'রে আমার মন আনন্দিত।") আমার নিজের সঙ্গীত সম্বন্ধে এর বেশি কিছু বলতে চাই না। এটুকু যে বলতে বাধ্য হলাম তার কারণ এই যে, আমার অন্তর্জীবনের বিকাশে সঙ্গীতের মধ্যে হিন্দি ভজন ও বাংলা কীর্তনের প্রভাব লক্ষ্য ক'রে যাঁদের মন আনন্দিত তাঁরা এ-জাতীয় বিশ্লেষণকে রসের বিচারে অবান্তর ব'লে সরাসর ডিশমিশ ক'রে দিতে পারবেন না। তাই এ-প্রসঙ্গে দুএকটি আরো ব্যক্তিগত কথা বলা হয়ত অশোভন হবে না।

প্রথম কথা এই যে, বাংলা কীর্তনের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবান্ হওয়ার আদি কারণ পিতৃদেবের কীর্তনানুরাগ হ'লেও আমি ছেলেবেলায় ওস্তাদি সঙ্গীতের এম্নি গোঁড়া হ'য়ে উঠেছিলাম যে তাঁর মতামত আমার কাছে প্রামাণ্য হওয়া সত্বেও আমার কীর্তনে এত শীঘ্র রুচি হ'ত না যদি সে-সময়ে খগেনকাকার মিষ্ট কণ্ঠে মধুর কীর্তন না শুনতাম। শুধু তাঁর মিষ্ট কীর্তন শুনে আমার মন ভিজে উঠেছিল ব'লেই নয়, তিনি আমাকে আন্তরিক স্নেহ করতেন ব'লেও আরো তাঁর কীর্তনপ্রীতি আমাকে একটু একটু ক'রে কীর্তনের দিকে টেনেছিল আমার অজান্তে। (কে না জানে—যাকে যে-অনুপাতে ভালোবাসা যায় তার মতামত আমাদের মনকে সেই অনুপাতেই প্রভাবিত করে?) কিন্তু শুধু এখানেই নিদানের শেষ নয়—আরো কারণ ছিল। মানুষের মন নানাভাবে নানা কারণে নানা দিকে মোড় নেয়। খগেনকার মতন বোদ্ধা আমার কণ্ঠের অনুরাগী ছিলেন—এতে আমার কিশোর আত্মাভিমান বেশ একটু নধরকান্তি হয়ে উঠেছিল বৈকি। তাই বেশ খুশি হ'য়েই ঝুঁকেছিলাম উচ্চাঙ্গ কীর্তন শিখতে। দেখাই যাক না—কীর্তনে কিছু সুরের পাথেয় মেলে কি না!

দ্বিতীয় কথা, আমি যখন ওস্তাদি সঙ্গীতের মোহে প'ড়ে ভেসে যাব যাব করছি সে-সময়ে খগেনকাকা একদিন বলেছিলেন আমার মাসিমাকে: "আহা, এমন কণ্ঠ নিয়ে মণ্টু যদি মন দিয়ে কীর্তন শিখত তবে সারা বাংলার প্রাণ জুড়িয়ে যেত। কিন্তু ওস্তাদি সঙ্গীতে দুচারটি শৌখিন সমজদার হাজার জয়ধ্বনি করলেও ওতে ভাবপ্রবণ বাঙালির মন ভিজবে না। আশ্চর্য, ঠিক ওই কথাই রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলেন দশ

বৎসর পরে। কিন্তু সে অন্য কথা। বলি এখন—ওস্তাদি সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিভঙ্গি কী ভাবে ধীরে ধীরে বদ্‌লে যায়।

১৯২৮ সালে আমি সাংসারিক জীবন ছেড়ে যোগজীবন বরণ করি,(কী ভাবে—হয়ত পরে বলব কোনোদিন যদি ঠাকুর দিন দেন—এখন বক্তব্যটা কীর্তনের পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ থাক।) তারপর লক্ষ্য করি যে, ওস্তাদি সঙ্গীতের অজস্র তান কর্তব ও কণ্ঠের কসরতে আর আমার মন তেমন ভিজে উঠছে না। এমন সময়ে একদিন আবদুল করিম এলেন পণ্ডিচেরি। তিনচার দিন গাইলেন তিনি, কিন্তু আমি মাত্র একদিন তাঁর গান শুনতে গিয়েছিলাম। এ কী ব্যাপার? প্রশ্ন করল আমার প্রবীণ মন। তখন আমার বয়স তেত্রিশ চৌত্রিশ। প্রশ্ন উঠল এইজন্যে যে আবদুল করিমের কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য কালোয়াতি আমার মনের বিস্ময় জাগালেও এমন কোনো রসাবেশ যোগাতে পারেনি যাতে হৃদয় সাড়া দিতে পারে। হ'ল কি, শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগে দীক্ষা নেওয়ার পরেই আমার জীবনের মূল চাহিদাগুলির মধ্যে একটা বিপ্লব ঘ'টে যায়—যার ফলে "আর্ট আর্টের জন্যে" এই বিখ্যাত বুক্‌নিটির প্রতি আমার মন বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠে। এ-অন্তর্বিপ্লবের জন্যে অবশ্য সব আগে দায়িক আমার ইষ্ট—যাঁর গুণকীর্তনে আমি ক্রমশঃ গভীর আনন্দ পাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখি যে, তার সঙ্গে ওস্তাদি সঙ্গীতের আনন্দের তুলনাই হয় না। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বুঝিয়ে দেন তাঁর গভীর ভাষায়—কেন ভক্তিসঙ্গীতের রস বেশি গভীর। তাঁর ব্যাখ্যার চুম্বক এই যে, ভক্তিসঙ্গীতের প্রেরণাদাতা হ'ল আমাদের অন্তর্লীন চৈত্যপুরুষ—psychic being—যেখানে মাধুরীসর্বস্ব সঙ্গীতের প্রেরণা দেয় আমাদের প্রাণপুরুষ—vital, aesthetic being: আর যেহেতু চৈত্যপুরুষ আমাদের অন্তরাত্মার অন্তরঙ্গ—প্রাণপুরুষ বহিরঙ্গ মাত্র—সেহেতু ভক্তিসঙ্গীতের আনন্দ মাধুরীসর্বস্ব সঙ্গীতের আনন্দের চেয়ে যুগপৎ উর্ধ্বতর, শুদ্ধতর গভীরতর। কিন্তু এ-উপলব্ধির আভাষ মেলে তখনই যখন আমরা বহিরঙ্গ আনন্দের মধ্যে আর তেমন তৃপ্তি পাই না। তখনই আসে বৈরাগ্য যে গুরুর মতনই আমাদের আন্তর চক্ষু ও শ্রুতি উন্মীলিত ক'রে দেখিয়ে দেয়—আমাদের অন্তরাত্মার উপজীব্য কী, তার অভীপ্সা কোন্ পথে সার্থক হয়। যতদিন এ-অন্তর্দৃষ্টি, অন্তঃশ্রুতি না খোলে ততদিন আমাদের মর্মগহনে বেজে ওঠে না পরম ভাগবতের ঝংকৃত উপলব্ধি:

অক্ষ্ণোঃ ফলং তাদৃশদর্শনং হি, তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং তাদৃশকীর্তনং হি, সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে।

অর্থাৎ

আঁখির লক্ষ্য—তোমার পরম দরশন,
তনুর স্বপ্ন—তোমার অঙ্গ-পরশন,
রসনা সে চায় গাহিতে তোমারি কীর্তন :
দুর্লভ ভবে—হেন ভাগবত মহাজন।

এই সময়েই আমি রচনা করি "বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবি"—অন্তরে তাঁর বাঁশি শুনে, প্রাণে মনে তাঁর স্পর্শ পেয়ে। সে-কাহিনী কোনো একদিন বলব—সময় হ'লে। এখন শুধু আমার বক্তব্য এই যে, এই সময়ে আমি পেলাম আমার একটি মূল জিজ্ঞাসার উত্তর : যে, সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে গায়ক কৃতার্থ হ'যে ওঠেন তখনই যখন সে-সঙ্গীত আমাদের প্রাণ-মন-অন্তরকে ভাসিয়ে নিযে যায় তাঁর পানে। প্রাণের ও গানের এই পরম প্রিয়তম প্রথম দিকে আমাদের সৌন্দর্যবোধের মধ্যে দিয়েই আত্মপ্রকাশ করলেও এ-বোধের গভীরায়মান লগ্নে আমাদের কণ্ঠকে গাওবান : "দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে!"

এ আমার অন্তর্জগতের একটি মহা আনন্দময় আবিষ্কার—যার দিশা পাই গুরুর প্রসাদে, নৈশ্চিত্য আসে ইষ্টের আশিসে। সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজগতের অনেক ভ্রান্তি-বিলাসও খ'সে পড়ে, আমি দেখতে পাই যে, ওস্তাদি সঙ্গীতের সুরবিলাস আমাদের অন্তরে খানিকটা আবেশ জাগালেও সে-আবেশ স্থায়ী হ'তে পারে না এইজন্যে যে সে কিছুতেই ভুলতে পারে না যে সমজদার শ্রোতার সাড়া তার চাইই চাই। কিন্তু ভজনকীর্তনের বেলায় গুণী রূপান্তরিত হন পরম ভাগবতে। একথাটি পরিষ্কার করতে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হব।

তখন আমি বি. এস-সি পাশ ক'রে খেয়াল শিখছি বেহালার বিখ্যাত গায়ক ৺বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, আর টপ্পা শিখছি চন্দননগরের ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে। এমন সময়ে একদিন প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য "কোকিলকণ্ঠ" রেবতীমোহন সেনের পালাগান শুনি পদ্মপুকুরে শ্রীহেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের দিকে অচঞ্চল নেত্রে তাকিয়ে এ-অপূর্ব গুণী দুঘণ্টা ধ'রে গেয়ে চললেন কৃষ্ণকীর্তন নিজেই খোল বাজিয়ে। গাইতে গাইতে তাঁর চোখে ধারা নামে মাঝে মাঝে, কিন্তু তিনি না থেমে গেয়েই চলেন আত্মহারা আবেশে—বিগ্রহ ছাড়া আর কোনো কিছুর দিকেই দৃষ্টিক্ষেপ না ক'রে। গান যখন সমাপ্ত হ'ল তখন শুধু যে আমার বুকের মধ্যে অশ্রুসাগর দুলে উঠেছে তাই নয়—

শুনতে পাচ্ছি চিকের আড়ালে মেয়েদের কোরাসে চাপা কান্না। ইংরাজিতে একে বলে apocalyptic—বিপ্লবসাধিনী—অভিজ্ঞতা। সেদিন আমি প্রথম বুঝবার কিনারায় আসি আমার বাল্যকালে-শোনা একটি কাহিনীর নিহিতার্থ: আকবর বনের মধ্যে গিয়ে বিখ্যাত সাধক গায়ক হরিদাস স্বামীর অপরূপ তন্ময় আত্মনিবেদনের গান শুনে এসে সভাগায়ক মহাগুণী তানসেনকে জিজ্ঞাসা করেন: ভারতের গুণীদের মুকুটমণি হ'য়েও কেন তিনি তাঁর গুরুর মতন প্রাণোন্মাদী গান গাইতে পারেন না। তানসেন উত্তর দেন: "কারণ জনাব, আমি গান শোনাই ভারতের শাহানশাহকে —যেখানে আমার গুরু গান শোনান দিনদুনিয়ার শাহানশাহকে।" অন্য ভাষায়, সেদিন আমি আভাষ পাই একটি গভীর অধ্যাত্মসত্যের: যে, যে-মুহূর্তে গুণী প্রেমতন্ময় হ'যে তাঁর গানকে ভোগের মতন ভগবানকে নিবেদন করেন, সে-মুহূর্তে ভগবানও তাঁর প্রেমের ডাকে সাড়া দিয়ে সে-ভোগ গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সে-ভোগ হ'য়ে ওঠে প্রসাদ—যার মধ্যে ভগবৎস্পর্শে বেজে ওঠে এক অবর্ণনীয় দিব্য স্পন্দন। পক্ষান্তরে, যে-গানের লক্ষ্য শ্রোতার চিত্তরঞ্জন বা যে-গানকে সাধা হয় গুণীর নিজের শ্রবণমনের আত্মতৃপ্তির জন্যে তার মধ্যে হাজার বিস্ময়কর কারুকলা ফুটে উঠলেও সে থাকে মানবিক বিলাসবস্তু, প্রাণমনের সেব্য—অন্তরাত্মার উপজীব্য হয়ে উঠতে পারে না।

এ-সম্পর্কে আর একটি কথা বলি। রেবতীবাবুর সঙ্গে এর পরে দেখা হয় কাশীতে। কিরণচাঁদ দরবেশ ও তিনি এসেছিলেন কোনো আসরে আমার গান শুনতে। গানের পরে তাঁরা উভয়েই আমাকে আশীর্বাদ ক'রে বলেন: "এমন গলা বাবা, কী হিন্দুস্তানি তান বাজিতে মজে আছ? অদ্বৈত বংশে তোমার জন্ম—কীর্তনে যে তোমার স্বাধিকার, বাবা!" (আমার পিতামহীর পূর্বপুরুষ ছিলেন শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামী—পিতৃদেব এ কথা প্রায়ই বলতেন যখন আমাকে ধমকাতেন: "ওরে, কীর্তন কী বস্তু বুঝবি বড় হ'লে। জানিস্ তোর ঠাকুরদাদা—অত বড় খেয়ালি তো?—বলেছিলেন শেষবয়সে এক মস্ত কীর্তনীর গান শুনে: 'আহা, গোঁসাইজি, বৃথাই খেয়াল শিখে ডুবলাম—যদি কীর্তন শিখতাম'!")

আমি ক্ষুণ্ণ হ'য়ে রেবতীবাবুকে ধরলাম: তবে শেখান আমাকে কীর্তন।" তিনি সুরু করলেন। কিন্তু তখনো মন তো থিতিয়ে আসেনি—দুদিন বাদ লক্ষ্ণৌয়ে অচ্ছন বাইয়ের গান শুনে মুগ্ধ হ'য়ে শিখতে আরম্ভ করলাম তাঁর কাছে—ঠুংরি। সে-কথা পরে বলব—যথাস্থানে।

কিছুদিন বাদে রেবতীবাবুর সঙ্গে দেখা। ধরলাম: "আমাদের থিয়েটার রোডের প্রকাণ্ড হলে আমাদের গান শোনাতে—যেখানে কত ডাকসাইটে ওস্তাদ ও বাইজিরা গান ক'রে গেছেন। রেবতীবাবু হেসে বললেন: "বাবা! আমি তো কোথাও যাই না কাউকেই গান শোনাতে। আমি শুধু শোনাই আমার ঠাকুরকে।"

আমি (তর্কের স্বরে): কিন্তু কত লোক যে শোনে—

রেবতীবাবু বললেন: তারা তো প্রসাদ পায় বাবা!

আমি (আশ্চর্য হ'য়ে): প্রসাদ?

রেবতীমোহন (হেসে): প্রসাদ কাকে বলে তাও জানো না? যাই ঠাকুরকে নিবেদন করো ভোগ হিসাবে, তিনি গ্রহণ করবামাত্র হয়ে দাঁড়ায় প্রসাদ। আমার গান আমি কেবল তাঁকেই নিবেদন করি। তারপর যে কেউ সে-প্রসাদ গ্রহণ করতে পারে ইচ্ছে হ'লে। প্রসাদ যারা পায় তারা ঠাকুরের কাছ থেকেই পায়—আমি তো এখানে উপলক্ষ মাত্র, বাবা!

চম্‌কে উঠলাম। গানও যে প্রসাদ হয় একথা এর আগে কোনো দিনই শুনি নি। মনে কেমন যেন একটা আবেশ জেগে উঠল। ফের মনের সেই দোলা হ'ল স্বরু: "তবে ওস্তাদি গান শেখা কি ছেড়ে দেব?"

কিন্তু তাও তো পারি নে। শেষে ঠিক করলাম—উপস্থিত সময়কে ভাগাভাগি ক'রে শ্যাম কুল দুইই রাখি—কীর্তনও শিখি, ওস্তাদি গানও শিখি। তার পরে দেখা যাবে।

এই সময়েই খগেন কাকার সঙ্গে ফের দেখা। তাঁকে বললাম না অবশ্য কী ভাবে আমি রেবতীবাবুর কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলাম। বললাম শুধু—আমার কীর্তন না শিখলেই নয়। তিনি একগাল হেসে বললেন: "এই তো চাই, মণ্টু! তুমি কীর্তন না শিখবে তো শিখবে কে? এ যে কীর্তনেরি গলা তোমার, যেমন দরাজ তেম্‌নি ভাবে-ভরা!"

ফল যা হবার: তিনি আমাকে পেশ করলেন নবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছে। এর পর একদিন তাঁতে আমাতে ব্রজবাসীর কাছে শেখা "নন্দ নন্দন চন্দ্র চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ" গাইলাম খগেন কাকারই বাড়িতে। গানে তেওরা তালে সপ্তমাত্রিক তান দিতে স্বরু করলাম। খগেন কাকার মুখ উঠল আলো হ'য়ে: "এইই তো চাইছিলাম, মণ্টু! বলি নি—কীর্তন শুধু ভাবের গানই নয়—স্বরের অলঙ্কারও পরতে পারে সগৌরবে—স্বধর্মভ্রষ্ট না হ'য়ে।"

খগেনকাকাকে এত কথা খুলে বলার কোনোদিন সময় বা সুযোগ হয়নি। তাই তিনি আজো জানেন না—অজান্তে তিনি আমার কতখানি কল্যাণ-সাধন করেছিলেন আমাকে কীর্তনের দিকে টেনে এনে। আমি বলছি না অবশ্য যে, তিনি আমাকে কীর্তনের দিকে না টানলে আমি আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের দিকে ঝুঁকতাম না। বলব কেমন ক'রে? না ঝুঁকে কি আমার উপায় ছিল? যার পরম কামনা—সর্বস্ব ইষ্টকে নিবেদন ক'রে ধন্য হওয়া, তার পক্ষে ভজন কীর্তনের আত্মহারা ভক্তির সুরকে আত্মার আত্মীয় ব'লে না মনে হয়েই পারে না, কেন না কীর্তনের লক্ষ্য হ'ল হৃদয়ের সুন্দরতম নিবিড়তম সুরের অর্ঘ তাঁর চরণে পৌঁছে দেওয়া। এই উপলব্ধিটির সুরু হয়—যেদিন প্রথম রেবতীমোহনের অবর্ণনীয় কীর্তন শুনে আমি অভিভূত হই এবং এ-উপলব্ধির পূর্ণিমা-লগ্ন বেজে ওঠে প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে—যে শুভলগ্নে আমি আমার অন্তরের এ-উন্মাদনার একটু আভাষ দিতে চেষ্টা করি একটি গানে। পুরো গানটি অনামীতে দিয়েছি—তা থেকে মাত্র চারটি চরণ উদ্ধৃত করি:

ওরা গানে চায় রাগিণীবিলাস, আমি চাই তব চরণতীর:
যে-বৃন্দাবনে তোমার আভাষ—তোমার মুরলী করে অধীর।
থেমে যাক আজ শিল্পচাতুরী, নেমে এসো তুমি আমার গানে,
কণ্ঠে জাগাও শুধু সে-মাধুরী—যে তোমারি প্রেমকাঁপন আনে।

এ-ধরণের কথা শুনলে অবশ্য সবাই সাড়া দিতে পারে না, কেন না যে-অনুভূতি থেকে এ-ধরণের ভাব আসে সে-অনুভূতির লেশও যার চেতনায় নামে নি তার কাছে এ-জাতীয় বাণী বিশ্ববিমুখ বৈরাগ্যের সমার্থক মনে হবেই হবে।

খগেনকাকার সঙ্গে আলাপ ক'রে তৃপ্তি পেতাম কেন না এ-ধরণের অনুভবের তিনি খবর রাখতেন। তাই পণ্ডিচেরি ছেড়ে যখন পুনায় আসি তখন তিনি সাগ্রহে জানতে চাইতেন আমাদের—ও বিশেষ ক'রে ইন্দিরার—নানা আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা, কৃষ্ণপ্রেমের কথা, বৈরাগ্যের কথা, গুরুভক্তির কথা। ১৯৫৭ সালে যখন কলকাতা যাই তখন তাঁর বাড়িতে গিয়ে একদিন ভজন করি। সেদিন গেয়েছিলাম ইন্দিরার একটি মর্মস্পর্শী মীরাভজন ও তার বাংলা অনুবাদ:

শোন্ সখী, আজ বলি তোরে—আমি কেমনে লভিনু মোহনে:
যোগী ঋষি যার পিয়াসী—তাহারে তুষিল অবলা কেমনে।

জানিতাম শুধু একটি তন্ত্র, একটি মন্ত্র সাধনার :
গুণী জ্ঞানী যারে কহে ভগবান্—আমি জানিতাম আপনার :
এলো সে আমার ঘরে তাই—যারে খোঁজে মুনি গিরি কাননে।
বেদবেদান্ত পড়িনি, আমার ছিল না তপের মতি লো !
মঙ্গলময় মানি' তারে তার চাহিনু শরণাগতি লো :
অন্ত পায় না জ্ঞানী যার—এলো আমার এ-মনোগহনে।

হরির লীলার কী বা জানি আমি ? সে আকাশ, পাখি আমি যে,
পড়িতে চরণে দিল ঠাঁই—গণি' আপন আমার স্বামী সে :
শিশুস্বরে কেঁদে ডাকিলে—অমনি আসে সে ত্বরিত চরণে।

গান শুনে তাঁর চোখে ধারা বয়েছিল। এ-হেন ভক্ত তথা গুণী সমজদার কমই মেলে, তাই তাঁর ওখানে গান করতে করতে উজিয়ে উঠেছিলাম ভাবোচ্ছ্বাসে। এ-সম্বন্ধে পুনায় ফিরে তাঁর যে-চিঠি পেয়েছিলাম সেটি উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

"তোমার দেবদুর্লভ কণ্ঠে দেবতার গান শুনে যে কী আনন্দ পেয়েছিলাম বলতে পারি না। আরো আনন্দ হ'য়েছিল ইন্দিরা দেবীর হরিনাম হ'তে না হ'তে ভাব-সমাধি দেখে। তবে মীরা যাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়ে দিনের পর দিন গানের পর গান শোনান তাঁর ভাবসমাধি হবে না তো হবে কার ? ঐ গানটিও কী সুন্দর : 'শোন্ সখী, আজ বলি তোরে আমি কেমনে লভিনু মোহনে !'—শুধু ভালোবেসে, শরণ চেয়ে। এই পথেই হাজার হাজার সাধক-সাধিকা পেয়েছেন ঠাকুরকে—ইন্দিরা দেবীকে তাই পুণ্য পথের ধন্য পান্থই বলব। কিন্তু শুধু চলাই তো নয়, কোথায় পৌঁছেছেন তিনি এর মধ্যে ? কোন্ ভাবে থাকেন নিরন্তর—সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'-এর সাম্‌নে নেচে গেয়ে ! কী দুর্লভ অবস্থা ! সাধে কি অসামান্য যোগবিভূতি অর্জন করেছেন তিনি ! এই সঙ্গে তোমাকেও ধন্য বলি—এমন শিষ্যা যে পেয়েছে তার ভাবনা কি ? তবে তুমিও যে ঠাকুরকে চেয়েছ আশৈশব—তাই ঠাকুর কৃপা করেছেন তোমার কাছে এমন শিষ্যাকে পাঠিয়ে দিয়ে যার সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছেন গীতায় :

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ

"যে অনন্যচিত্ত হয়ে অনুদিন ঠাকুরের স্মরণ মনন করে ঠাকুর তার কাছে

সহজেই ধরা দেন—এ যে স্বয়ং ঠাকুরেরই প্রতিশ্রুতি, কাটবার জো কি? আমার আনন্দে রোমাঞ্চ হয় ভাবতে যে তোমরা দুজনে পরম পথের তীর্থযাত্রী হয়েছ প্রাণোন্মাদী ভজনকে পাথেয় ক'রে। আর এ তো আজকের কথা নয়—আজ পর্যন্ত কতশত তীর্থপান্থেরই বস্তু লাভ হয়েছে এই ভজনের মাধ্যমে—না জানে কে? সুফি, সহজিয়া, শাক্ত, শৈব—আরো কত পথের পথিক। এইই তো সেই চিরন্তন সাধনা—যা যুগে যুগে মূর্ত হয়েছে পরম ভাগবতদের জীবনে: মহাপ্রভু গান গেয়ে গেয়ে হরিনাম বিলিযে গেছেন, পরমহংসদেব জগন্মাতার নামে মাতোয়ারা হ'য়ে উদ্দণ্ড নৃত্যে মাতিয়ে গেছেন আবালবৃদ্ধবনিতাকে। এ-হেন পরমানন্দের মাধ্যমে যে শাশ্বত আনন্দলোকের দিশা পাওয়া যায় সে পরমধন কি মিলতে পারে ম্লান বুদ্ধি যুক্তির রাজ্যে? ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি—তোমারা যেন দিনে দিনে সবাইকে তাঁর করুণা বিলিয়ে কৃতকৃত্য হ'তে পারো—সার্থকতম জীবনের দৃষ্টান্ত হ'য়ে।

"আমার কেবল শেষ একটি প্রার্থনা আছে: তোমাদের সাধনা সম্বন্ধে আমাকে একটু জানিও যা জানাতে পারো। আমাকে বলতে আশা করি তোমার কুণ্ঠা হবে না—কেন না আমি 'সংশয়াত্মা' নই—ভাগবতী কথাকে শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি চিরদিনই।

ইতি—তোমাদের নিত্য শুভানুধ্যায়ী খগেনকাকা"।

যতীন্দ্রনাথ খগেন্দ্রনাথের চেয়েও আমুদে ছিলেন, আমাকে দেখলেই বলতেন: "তারপর মণ্টুবাবু! বলি, আছেন কেমন?" রহস্যচ্ছলেও তিনি আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করলে আমার মন ভিজে উঠত, যেন মনে হ'ত: "আহা, কেবা শুনাইল শ্যামনাম রে!" আমার পিতৃবন্ধুদের মধ্যে অধিকাংশই আমাকে শিশু ব'লে অবজ্ঞা করার দরুন আমার অভিমানী মন ঠোঁট ফোলাত ব'লেই হয়ত যতীনকাকার "আপনি" সম্বোধনে আমি বাবু হয়েও কাবু না হ'য়ে হাসতাম।

যতীনকাকা ছিলেন যেমন সুপুরুষ তেমনি সুগায়ক। গরানহাটি মনোহরসাহী বর্গীয় উচ্চাঙ্গ কীর্তনে তিনি তালিম নেন নি, কিন্তু রেনেটি মন্দারিনী গোত্রীয় সুললিত কীর্তন যখন গাইতেন তখন তাঁর প্রবল তথা মধুর কণ্ঠস্বরে আমার গায়ে কাঁটা দিত। গান্ধর্ব মুখলাবণ্যের চেয়েও আমি চিরদিনই বেশি ভালোবেসে এসেছি কিন্নর কণ্ঠমাধুর্য।

তিনি সবচেয়ে ভালো গাইতেন বাউল ভাটিয়ালি। এ-জাতীয় লোকসঙ্গীতে

আমার প্রথম হাতেখড়ি হয় তাঁর কাছেই। তাঁর কাছে শিখে প্রায়ই গাইতাম একটি গান :

ঘাটে ডিঙা লাগায়ে তুমি পান খাইয়ে যাও।
পান খাইয়ে যাও বন্ধু, পান খাইয়ে যাও।
কোন গেরামের লাও তোমার, কোন গেরামে যাও?
একখান কথা কও বা না কও পান খাইয়ে যাও।
আমার গাছের পান সুপারি, তোমার কড়ির ভাও,
কড়ির কথা শ্যাষে হবে পান খাইয়ে যাও।

পিতৃদেব হো হো করে হাসতেন শেষের দুটি লাইন শুনে। বলতেন : "বন্ধুত্ব বটে! ডাকাডাকি শুনলে প্রথমটায় মন গলে যায়—কে এ-দরদী এমন আকুল সুরে সাধে পান খেযে যেতে? এমন নিঃস্বার্থ পানউলি এ-জগতে যতদিন আছে ততদিন তাকে ডোবায় কে? কিন্তু ওমা! শেষ চরণেই চক্ষুস্থির—পান খাওয়াবেন বটে কিন্তু দরদস্তুর হবে শেষে! যাকে বলে ভবী ভোলবার নয় রে মণ্টু—হাঃ হাঃ হাঃ।"

তাঁর কাছে আর একটি বিখ্যাত গান শিখেছিলাম ভাটিয়ালি সুরে :

মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে!
আমি আর বাইতে পার্লাম না।
ওরে, সারা জনম বাইলাম বৈঠা রে,
তবু তোর মনের নাগাল পালাম না·· ইত্যাদি

কিন্তু অবিস্মরণীয়তম অভিজ্ঞতা ছিল খগেনকাকার সঙ্গে যতীনকাকার ডুয়েট গাওয়া আর আমাদের হেসে লুটিয়ে পড়া :

রাবণ আইল যুদ্ধে প'রে বুট জুতো।
হনুমান মারে তারে লাথি চড় গুঁতো॥
(জানা যাবে রাম—ও নামের মহিমে)
গুঁতো খেয়ে রাবণ রাজা যায় গড়াগড়ি।
হনুমান বলে : "তোরে মেরেছি চাপড়ি।
(জানা যাবে রাম—ও নামের মহিমে)

"চাপড় মারি নি তোরে—মেরেছি চাপড়ি।।
চাপড় খাইলে তুই যেতিস যমের বাড়ি।"
(জানা যাবে রাম—ও নামের মহিমে)

যতীন কাকার ছিল আরো অনেক ক্ষমতা : কথকতা ক'রে হাসিয়ে হাসিয়ে আমাদের মারতেন। কী অদ্ভুত যে তাঁর গলা ছিল ইচ্ছে করলে মিহি সুরে গাইতেন, আবার তক্ষুনি মর্দানা সুরে। শুনলে মনে হ'ত তিনি বিলিতি কণ্ঠব্যায়ামীর কাছে এসব কসরৎ শিখেছিলেন। তোৎলাদের নকল করতেনও চমৎকার। একবার বললেন পিতৃদেবের সভায় এক তোৎলা মহাপ্রভুর কাহিনী :

"তারপরে এলেন মহাপ্রভু—অধিকারীর কাছে—রাবণের পার্ট করবেন। অধিকারী মেঘনাদবধ খুলে ধরলেন : আবৃত্তি করুন তো। তোৎলা ঠাকুর সুরু করলেন অকুতোভয়ে :

নি—নিশার স্ব-স্ব—দুত্তোর—পন সম
তো—ত্তোর এব্—এব্—এব্—দুত্তোর—আরতারে
দুদ্—দুদ্—দুত—অম্—অন্—অম্—অর বৃন্দ
যায্—যায্—যার ভুজবলে কাতর—সেধ্—সেধ্—
সেধ্—দুত্তোর—ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী বধ্—বধ্—
বধ্—দুত্তোর—ইলা সম্মুখ রণে !..."

যাত্রার অধিকারীর তো চক্ষু স্থির। বললেন : 'আবৃত্তি অপূর্ব বটে, কিন্তু আপনি যে তোৎলা মশাই !' তোৎলা নটরাজ অম্লান বদনে বললেন : "তা রাব্—রাব্ রাব্—আবন যে তোৎ—তোৎ—তোৎ—দুত্তোর লা ছিল না কেব্—কেব্—কেব্—অল্ল্ ?"

আমি এ-নক্সাগুলি শিখেছিলাম তাঁর কাছে ও নানা সময়ই পুনরাবৃত্তি করতাম। আমার নাম হয় সব চেয়ে "আলু তিন প্রকার"—আবৃত্তিতে : যতীনকাকার কাছেই হাতে খড়ি এতেও। বলিই না

গয়াতে একবার পিতৃদেবের "বিরহ" অভিনয় হয়। পিতৃদেব বিরহে গোবিন্দ সেজে সবাইকে মুগ্ধ করেন। বিরতির সময় স্টেজে উঠে আমি আবৃত্তি করি : আলু তিন প্রকার। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই :

এক নটযশঃপ্রার্থী কোনো থিয়েটারের অধ্যক্ষের কাছে এসে ধরেন—তাঁকে চাকরি দিতেই হবে। অধ্যক্ষ তাঁকে শুধালেন : "রস ক রকম জানেন ?"

উমেদার : আমের, কাঁটালের, তেঁতুলের, চিনির, গুড়ের—

অধ্যক্ষ : ননসেন্স ! শিল্পের রস—ন রকম : হাস্য, করুণ, বীর, বীভৎস, রৌদ্র, ভয়ংকর···ইত্যাদি। এদের মধ্যে বীর করুণ ও হাস্য রসই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব —মানে, সবার সেরা।

উমেদার : একটু যদি দেখিয়ে দেন—

অধ্যক্ষ : দেখিয়ে ? আচ্ছা—ধরো—(এদিক ওদিক তাকিয়ে)—এই যে একটা বই রয়েছে—এতেই হবে (বইটা কৃষির বই) এই যে—শোনো বীর রস :

আলু তিন প্রকার, গোল আলু—(গর্জন ক'রে) রাঙা আলু (তর্জন ক'রে) এবং শাঁকালু। তন্মধ্যে (বাড়ি ফাটিয়ে হেঁকে টেবিলে ঘুঁষি মেরে) গোল আলুই সর্বপ্রধান।

উমেদার : অপূর্ব।

অধ্যক্ষ : দাঁড়াও এবার করুণ রস : আলু (ফিঁচ্ ফিঁচ্ ফিঁচ্) তিন প্রকার। গোল আলু (বাবা গো মাগো কোথায় আছ ?) রাঙা আলু এবং শাঁকালু। তন্মধ্যে (আর পারি না—মরণও হয় না ?) গোল আলুই সর্ব প্রধান। তেম্‌নি (হাসতে হাসতে) আলু—(হুঃ হুঃ হুঃ) তিন প্রকার। গো—(হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ) ল আলু রাঙা (হাঃ হাঃ হাঃ) আলু এবং শাঁকালু। তন্মধ্যে (হেঃ হেঃ হেঃ) গোল আলুই সর্ব প্রধান। (খিল খিল খিল)

(আমার মুখে আলু তিন প্রকার শুনে আমার এক জ্যেঠতুত বোন, উষাদি স্থির করেছিলেন "এ ছেলের আর কিছু হবে না—পরকাল ঝর্ঝরে—" ইত্যাদি)

এই রকম নির্বারিত আনন্দের পরিবেশে আমার বাল্যজীবন কেটেছিল—কথায় কথায় হাসি, চলতে ফিরতে গান, বসতে খেতে তান—এ যেন আনন্দের জাদুদণ্ডের ছোঁওয়ায় বয়স্কদের ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তরিত হওয়া শিশুতে—putting the clock back—বলে না ?

তাইতো আমার সময়ে সময়ে হাসি পায় যখন যোগ বা ধর্মকর্মকে নীতিবাদীরা নাকচ করেন escapism বা পলাতক বৃত্তি বলে। আমরা কি জীবনে পদে পদে আশপাশের দুঃসহ কাষ্ঠবন্ধন থেকে না পালিয়ে বাঁচতে পারি ? রোমহর্ষক গল্প-উপন্যাসের জগৎজোড়া প্রতিষ্ঠার মূল কারণ কি ? শুধু কল্পিত উত্তেজনার আনন্দে বাস্তব জীবনের জগদ্দলন চাপ থেকে খানিকক্ষণের জন্যে নিষ্কৃতি পাওয়া নয় ? যখন

কোনো শোকে মানুষ ব্যথায় মুয়ে পড়ে তখন সেকি জাগ্রত প্রত্যক্ষ থেকে নিষ্কৃতি চায় না স্বপ্নলোকে? পিতৃদেবের একটি গানে আছে:

আসল প্রেমের চেয়ে ভালো কাব্যে প্রেমের চিত্র।

এর কারণ কি এই-ই নয় যে "আসল প্রেম" তার প্রতিশ্রুতি পদে পদে ভাঙে ব'লেই আমরা প্রেমের কাব্যময় স্বপ্নলোকে ছাড়া পেতে চাই? এমন কি ভগবান্ যে ভগবান্—তাঁকেও সবচেয়ে আকুল হয়ে চাই কখন? না, যখন যা পাচ্ছি তাতে মন ভরছে না, বা নিয়তির, দুর্দৈবের, আশাভঙ্গের চাপে মনে হয় ভেঙে পড়লাম বুঝি। আমাদের আসরে যতীন্দ্রনাথ গাইতেন রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গান—শুনে আমার মন কী যে আর্দ্র হ'য়ে উঠত কেমন ক'রে বোঝাবো? এ-গানটি আমি পরে দুঃখের লগ্নে কত সময়েই না গেয়ে ভুলেছি আশু দুঃখ, আশাভঙ্গ, চিত্তগ্লানি:

জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী শুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো।

বাস্তব জীবনে আনন্দ কতটুকু? তাই কল্পনার রাজ্যে মানুষ চিরদিন ছাড়া পেতে চেয়েছে। প্রবীণতাও সময়ে সময়ে দুঃসহ হয়ে ওঠে: তাই মানুষ শিশু হ'তে চায় ক্ষণে ক্ষণে। যা চাই তা পাই না, তাই যা পাই তাকে নিয়েই গড়ে তুলি ক্ষণিক আনন্দের মুক্তিলোক। যাঁরা কোনোমতেই নিজেদের বয়স্কতার ধূসর অতৃপ্তি থেকে পালাবার কৌশলটি শেখেন নি তাঁরা জীবনে একটি রঙিন উল্লাস থেকে বঞ্চিত হয়েছেন যে-উল্লাস স্বভাব-সরল ব'লেই কলকাতার ভূগোল নিয়েও হাসতে পারে—যেমন হাসতেন খগেনকাকা ও যতীনকাকা আর আমরা দিতাম দোয়ার:

জোড়াসাঁকো ফৌজদারি বালাখানা চিৎপুর।
মেছোবাজার কালিতলা জানবাজার বাগবাজার টালা
বৌবাজার আহিরিটোলা সিমলা তালতলা
বাঁশতলা নিমতলা খিদিরপুর।

"নিমতলা" গাইতে না গাইতে তাঁরা কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন আর আমরা হেসে গড়িয়ে পড়তাম।

সাহেব পুরাণে বলে: "It is easier to have a friend than to keep him." প্রবচনটির মধ্যে নিহিত আছে মানুষের এই প্রাচীন দুঃখাবহ অভিজ্ঞতা যে সবই কালাধীন, ক্ষণায়ু—বিত্ত চিত্ত বিশ্বভুবন: "চলৎ চিত্তং চলৎ বিত্তম্…চলাচলমিদং সর্বম্।" এই জন্যেই জগতে দীর্ঘজীবী বন্ধুত্বের দাম এত বেশি ধরা হয়েছে, বলা হয়েছে:

"উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে
রাজদ্বারে শ্মশানে চ য তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।"

পিতৃদেবের ভাগ্যেও এরকম কয়েকটি বন্ধু জুটেছিল—যাঁরা তাঁকে ভালোবেসে তাঁর কাছে কাছে ছিলেন শেষ পর্যন্ত! এঁদের মধ্যে দুজনের কথা বলব—না বললে তাঁর বন্ধুমণ্ডলীর তর্পণ সুসম্পূর্ণ হবে না।

এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চৌধুরী—যিনি গত ৮ই জুন (১৯৫৯) মহাপ্রয়াণ করেছেন। প্রবোধকাকা ছিলেন পিতৃদেবের একটি অকৃত্রিম বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ কবি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উদ্দেশ্য ক'রে লিখেছিলেন বন্ধুর তর্পণে:

"বন্ধুমিলনের দিনে বারম্বার
উৎসব রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে।"

পিতৃদেব অবিকল এই অঙ্গীকার করতে পারতেন প্রবোধকাকার সম্পর্কে। তাঁর কোনো গীতসভা কি জন্মোৎসবই কখনো প্রবোধকাকার সহযোগে বঞ্চিত হয়নি। বৎসর দুই আগে যখন আমি কলকাতা যাই তখন তিনি যে শুধু আমার জন্মোৎসবে যোগ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছিলেন তাই নয়, আশি বৎসর বয়সেও আমার প্রাত্যহিক ভজনে যোগ দিতে আসতেন সমান আগ্রহে। আমাকে তিনি স্নেহ ক'রে এসেছেন বরাবরই—যদিও এই শান্ত সৌম্য প্রিয়দর্শন মানুষটির স্নেহ প্রকাশের ধারাটি চিরদিনই ছিল অন্তঃশীলা। উচ্ছ্বাসী বা উচ্ছল বলতে যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন না। তাই পিতৃদেবকে তিনি গভীর ভাবে ভালোবাসলেও কোনোদিনই তাঁর খুব কাছ ঘেঁষে বসতে চাইতেন না—পিতৃদেব তাঁকে ডাক দিতে না দিতে তিনি সাগ্রহে

হাজিরি দিলেও তাঁর রসসভায় "অন্তরঙ্গ সভাসদ" নাম কিনতে চাইতেন না। তাই পিতৃদেবের জীবদ্দশায় তিনি মনে মনে তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগী হ'লেও অন্য অনেকের মতন এগিয়ে এসে শোরগোল করতেন না—আনুকূল্য করতেন, কিন্তু পিছনে থেকে—খানিকটা প্রচ্ছন্ন ভাবেই বলব। কারণ স্বভাবে তিনি গায়ে-পড়া প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না, ছিলেন অন্তর্মুখী—যদিও একথা বুঝতে আমার সময় লেগেছিল। বলতে কি, তাঁকে যেন আমি নতুন ক'রে চিনি যখন পঁচিশ বৎসর পণ্ডিচেরির যোগাশ্রমে কাটিয়ে প্রথম পুনায় আমাদের হরিকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করি। চিনি—কারণ এ-মন্দির-নির্মাণে তিনি একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এগিয়ে এসেই অর্থানুকূল্য করেছিলেন, বাঙালি আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে শুধু তিনিই। তাই আজ তাঁর মহাপ্রয়াণের পরে তাঁর পুণ্য আত্মার তর্পণে তাঁর কাছে প্রকাশ্যভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রে ঋণস্বীকার করছি ঠাকুরের মন্দিরে তিনি যেচে এসে (তাঁরই ভাষায়) "ভোগ" দিয়েছিলেন ব'লে। এ-জন্যে ঠাকুর তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন—ইন্দিরার মাধ্যমে যার আশীর্বাদ তিনি চেয়েছিলেন তাঁর একাধিক পত্রে।

আজ কেবলই পিতৃদেবের একটি কথা মনে পড়ছে: "জানিস মণ্টু, প্রবোধ এক আশ্চর্য মানুষ—গড ও ম্যামন কাউকেই ফেলে নি।" তখন আমার বয়স পনর ষোলো, বাইবেল পড়েছিলাম অল্পস্বল্প—যদিও বাইবেলের কথা শুনতামই বেশি পিতৃদেবের ও বিজয়কাকার মুখে। তাই জানতাম শুধু এইটুকু যে, আমরা যার নাম দিই ধনপতি, সাহেবরা তারই নামকরণ করেছেন ম্যামন। পিতৃদেব বলতেন যে বাইবেলে আছে: "Ye cannot serve both God and Mammon." পরমহংসদেব বলতেন—যে-কথা কথামৃতে শৈশবেই পড়েছিলাম—যে, কামিনী কাঞ্চনের 'প্রসাদার্থী হ'লে ভগবানের প্রসাদ মেলে না। তাই প্রবোধকাকা ধনকে পেয়েও ধর্মকে ছাড়েননি ভাবতে সে-সময়ে একটু আশ্চর্য লাগত বৈ কি।

উত্তরকালে গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দের শ্রীমুখে শুনি যে, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে আড়াল আনে তার নাম ধনাসক্তি—ধনার্জন নয়। তাই তখন যেন নতুন ক'রে বুঝতে শিখি যে একের কাছে যা প্রতিবন্ধক অপরের কাছে তা-ই সহায় হ'য়ে দাঁড়াতে পারে—আধার-ভেদে। মনে আছে একথা যখন প্রথম শুনি তখন মনে প্রথমেই জেগে উঠেছিল প্রবোধকাকার শান্ত সৌম্য মূর্তি—যিনি ধনধামে বাস ক'রেও অন্তরে অন্তরে চিরদিনই ধর্মার্থী ছিলেন। পরে তিনি লিখেছিলেন তাঁর ধর্মচর্চার ফল একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে: "উপনিষদ কথা।" এ-বইটি সম্প্রতি পড়তে পড়তে আমি

বিস্মিত হয়েছিলাম তাঁর বেদজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে। শুধু বেদই বা বলি কেন, ভারতের মন্দিরগুলির সম্বন্ধেও তিনি একটি বিবরণ লেখেন—ভ্রমণবৃত্তান্ত। এ-বইটি থেকে ভারতের নানা মন্দির সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত তথ্যের খবর পেয়েও আমি লাভবান্ হয়েছিলাম। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মর্মজ্ঞ আলোচনা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি। এ তো শুধু পাণ্ডিত্যে মেলে না, সাধনা বিনা! তখন প্রথম বুঝি যে প্রবোধকাকা ছিলেন খানিকটা গুপ্ত যোগীই বলব। তাই এই শেষ কয় বৎসরে তাঁর দিকে আমি আকৃষ্ট হ'য়ে উঠি ও তখন ক্রমাগত মনে পড়ত পিতৃদেবের একটি প্রায়োক্তি যে, প্রবোধকাকা অসাধ্যসাধনে-ব্রতী—তাই তো প্রাসাদে বাস ক'রেও প্রণামী পৌঁছিয়ে দিয়ে যান তাঁকে যাঁর আশিস বিনা বিলাস হ'য়ে দাঁড়ায় বিড়ম্বনা। কিন্তু ফিরে আসি স্মৃতিচারণে।

বলেছি—পিতৃদেবের আশে পাশে যাঁরা সদাসর্বদা থাকতেন তাঁদের মধ্যে প্রবোধকাকাকে খুব বেশি দেখা যেত না। কিন্তু তা ব'লে যে তিনি পিতৃদেবের সান্নিধ্য কখনই পেতেন না তা নয়। পিতৃদেব জানতেন তো তিনি তাঁকে কতটা ভালোবাসতেন, তাই চাইতেন মাঝে মাঝেই তাঁর স্বল্পভাষী স্নেহস্পর্শ। একবার মফঃস্বল থেকে ফিরতিমুখে তিনি প্রবোধকাকাকে লেখেন: "প্রবোধ—এসো এসো এসো এসো এসো এসো এসো—দ্বিজদা।" ব্যস—শুধু এইটুকু। প্রবোধকাকা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ হাসি হেসে বছর দুই আগে যখন আমার কাছে এ-গল্পটি করেন তখন বলেছিলেন: "কী ভালোবাসতেই না পারতেন দ্বিজদা!" গতবৎসর হাঁপানিতে যখন শেষশয্যা নেন তখন কম্পিত হস্তে আমাকে লিখেছিলেন: "তোমাকে স্নেহ ক'রে এসেছি বহুদিন—যদিও প্রকাশ করবার সুযোগ পাইনি এর আগে। তোমাকে দেখে এবার কত কথাই যে মনে প'ড়ে গেল—অতীতের কত মধুর স্মৃতি! আজকাল মন আমার প্রায়ই অতীতকে নিয়েই রোমন্থন করতে চায়—অতীতই যেন বেশি জীবন্ত হ'য়ে উঠছে, বর্তমান—ঝাপসা।" তাঁর এ-চিঠিটি পড়বার সময়ে পিতৃদেবের একটি মর্মস্পর্শী গান মনে প'ড়ে গিয়েছিল—মাতৃদেবীর উদ্দেশ্যে লেখা:

আজ আমার কাছে বর্তমান ভেঙে ও ভেসে যায়!
আজ আমার কাছে অতীত হয় নূতন পুনরায়!

স্মৃতিচারণ করতে করতে একথা আমার বহুবার মনে হয়েছে ব'লেই প্রবোধকাকার এ-চিঠিটি উদ্ধৃত করলাম। অর্থাৎ, মনের একটা বিশেষ মেজাজে ঠিক এম্‌নিই হয়—যখন দৃষ্টি সুদূরলগ্ন হওয়ার দরুনই যেন কাছের জিনিস ঝাপসা দেখায়—সুদূর

অতীতের স্মৃতি হ'য়ে ওঠে জীবন্ত—ফোকাস বদলে যায়। তাই সম্প্রতি দেখা হ'লেই প্রবোধকাকা আমার কাছে তুলতেন পিতৃদেবের নানা প্রসঙ্গ। একবার বলেছিলেন হেসে: "জানো, একবার তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম মনোরম ঘাটশীলায় বেড়াতে। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার বিষম কষ্ট, দ্বিজদা কিছুই না পেয়ে ঘাটশীলার প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হ'য়ে হাসতে হাসতে মুখে মুখে রচনা করেছিলেন আমি টুকে নিয়েছিলাম:

'হে ঘাটশীলা!
তমালতালী বনরাজি নীলা!
যদিও অত্র হায় মেলে না কো কিচ্ছু,
পথে ঘাটে দেখি শুধু সাপ আর বিচ্ছু,
তথাপি কান্তা তব শ্যামলীলা!

বলেছি প্রবোধকাকার সঙ্গে যেন নতুন ক'রেই পরিচয় হয় আমার উত্তরজীবনে—যখন আমি পুরোপুরি সাধনায় মন দিয়েছি। তাই তাঁর সঙ্গে আমার মিল হয় গভীরতর আনন্দের সহযোগিতায়—ভক্তির ভজনের এলাকায়। কলকাতায় একদিন আমার মুখে মীরাবাইয়ের "চাকর রাখো জি" গানটি শুনে তিনি চোখ মুছে খানিক চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন: "কী আর বলব মণ্টু! শুধু বলি বাবা, যে তোমার সাধনার সিদ্ধি হবেই হবে এই ভজনের মধ্যে দিয়েই।" পুনায় যখন ফিরে আসি তখন তিনি দ্বিতীয়বার "ভোগ" পাঠান। আমাদের মন্দির গড়ার কাজে তাঁর এ-অযাচিত দানের জন্যে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যখন একটি পত্র লিখি তখন উত্তরে তিনি আমাকে লেখেন অসুস্থতা সত্ত্বেও: "তুমি ওকথা কেন লিখলে বাবা, যে আমি দান করেছি? দান করবার কর্তা এ-সংসারে কে—তিনি ছাড়া? তাঁর ভোগ তিনিই জুটিয়ে নেন বাবা, যা কিছু করার তিনিই করেন, আমরা শুধু উপলক্ষ্য নিমিত্ত মাত্র বৈ তো নয়।···তোমাদের ঠাকুরের বিগ্রহের যে ছবিটি পাঠিয়েছ পেয়ে মন আমার ভ'রে উঠেছে। সত্যিই অতি সুন্দর বিগ্রহ। আর শুধু সুন্দরই নয়—দেখলেই যেন মনে হয় বড় আপনার। তাঁর মত স্বজন কে? তোমার মীরা ভজনেই তুমি সেদিন গাইছিলে না: 'তুম বিন কৌন স্বজন?' এইই হল লাখ কথার এক কথা বাবা! তাই আমিই তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে ঠাকুরের স্পর্শ তোমরা এনে দিলে। তুমি লিখেছ ইন্দিরামা-র প্রেমের আরাধনায়ই প্রেমের ঠাকুর এসেছেন বিগ্রহ আলো ক'রে। এ আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি জেনো। ভক্ত ও ভক্তিমতীর

প্রেমেই তো বিগ্রহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় বাবা! ইন্দিরা-মা ধন্য যাঁর প্রেমের শেকলে ঠাকুর বাঁধা পড়েছেন। আর পালাবেন কোথায়? মা-কে বলবে এ-বুড়ো ছেলেটার কথা যেন না ভোলেন।……ইতি তোমার প্রবোধ কাকা।"

তাঁর পুণ্য আত্মা ঠাকুরের চরণে পরম শান্তিতে লীন হোক। ওঁ শান্তি:

* * * *

পিতৃদেবের অন্য বন্ধুটির নাম সবাই জানেন—স্বনামধন্য ৺শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস লাইব্রেরির অধ্যক্ষ, তথা "ভারতবর্ষ" পত্রিকার স্বত্বাধিকারী।

হরিদাসবাবুর পিতৃদেব গুরুদাসবাবুর কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে—তাঁর অন্ধ হ'য়েও চাকরের হাত ধ'রে ছমাস অন্তর বাড়ি ব'য়ে এসে পিতৃদেবকে তাঁর বই বিক্রির পাওনা টাকা দিয়ে যাওয়া। তিনি জীবনে কোনোদিন কাউকে একটি ক্রান্তিও ফাঁকি দেন নি, কি কোনো পাওনাদারকে কখনো তাঁকে মনে করিয়ে দিতে হয় নি তার পাওনার কথা। হরিদাসবাবু পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন শুধু বাহ্য সম্পর্কেই নয়—সততার আন্তর সম্পদেও বটে। এবার একটু পেছিয়ে গিয়ে বলি কী ভাবে পিতৃদেব ও পরে শরৎদার সঙ্গে তাঁর স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে।

তখন হরিদাসবাবু তরুণ—প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের আগেকার কথা বলছি—যেমন সুপুরুষ, তেম্‌নি সদানন্দ। পিতৃদেব যখন ৪৯ বৎসর বয়সে রক্তের চাপ বাড়ার দরুন অকালে পেনশন নিতে বাধ্য হন তখন হরিদাসবাবু তাঁকে এসে বলেন: "আপনার তো পোষ্য কম নয় দ্বিজদা, তাই বলি কি—আসুন একটি আশ্চর্য মাসিক পত্রিকা খাড়া করা যাক—আপনি হবেন সর্বাধ্যক্ষ—আমি বাহন।"

পিতৃদেব স্বভাব-উচ্ছ্বাসী তো, উজিয়ে উঠলেন, বললেন: "ঠিক ঠিক—অদ্ভুতকর্মা হ'য়ে বার করব এমন এক পত্রিকা—দেখই না হে, কী কাণ্ড করি আমি—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ যাকে বলে: কবিতা, গান, গল্প, নক্সা, সমালোচনা, ব্যঙ্গচিত্র—" বলেই গান ধ'রে দিলেন তারস্বরে:

"নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির,
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির।"

হা হা হা—কেবল এবার নন্দ হ'ল দ্বিজেন্দ্র, বুঝলে?" ব'লেই হরিদাসবাবুকে

জড়িয়ে ধরলেন : "আর তুমি যার বাহন—দাস—সে কি হরি না হ'য়ে পারে ?—না না ব্লাস্‌ফেমি না, অত্র হরি মানে সিংহ। হা হা হা।"

দুঃখের বিষয়, অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে তাঁর লোকান্তর হয় ব'লে তাঁর অনেক রচনাই হারিয়ে যায়। ভাগ্যক্রমে "ভারত আমার ভারত আমার" ও "যেদিন সুনীল জলধি হইতে" গান দুটি হারায় নি। শরৎচন্দ্র পরে আমাকে প্রায়ই বলতেন : "ভারতবর্ষ কী হ'তে পারত মণ্টু, তোমার বাবা আজ বেঁচে থাকলে!"

বলা বাহুল্য পিতৃদেবের শোক হরিদাসবাবুকে খুব বেশিই বেজেছিল শুধু "ভারতবর্ষ" পত্রিকার কাণ্ডারীহীন অবস্থার জন্য নয়—ব্যক্তিগত বেদনার জন্যেও বটে। হরিদাসবাবু বাইরে থেকে দেখতে খুব প্র্যাকটিকাল গোছের মানুষ হ'লেও অন্তরে ছিলেন ঠিক সেন্টিমেণ্টাল না হ'লেও কোমলই বলব। পিতৃদেবের দেহ যখন নিমতলার ঘাটে চিতায় রাখা হয় তখন তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলেছিলেন : "পিতৃহারা শুধু তুমিই হও নি মণ্টু!" তাঁকে যারা তাঁর বাইরের রূপ দেখে বিচার করত তারা অনেক সময়েই তাঁর এই নরম মনটির খবর পেত না—যে-দরদী ব্যথা চেপে রাখলেও ভুলতে পারত না। পিতৃদেবকে তিনি তাঁর তরুণ হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়েই বরণ করেছিলেন। পিতৃদেবের নাটক কবিতা প্রহসন হাসির গানের প্রকাশক ছিলেন তিনি—এ তাঁর বাহ্য পরিচয়। পিতৃদেবের বিশ্বস্ত অনুরাগী ও রসসভার একজন প্রধান সভাসদ ছিলেন ব'লেই তাঁকে আমি ভালবেসেছিলাম।

রসসভার সভাসদ—নামকরণটি জুৎসৈ হযেছে বৈকি। পরজীবনে তিনি স্টার থিয়েটার সংসদের একজন নামজাদা রসদদার হ'য়ে দাঁড়ান শুধু পিতৃদেবের-কাছ-থেকে-পাওয়া নাট্যপ্রেরণার জোরালো তাগিদে। মনে আছে পিতৃদেবের চন্দ্রগুপ্ত নাটক যখন "সঙ্গীত সমাজে" প্রথম অভিনীত হয তখন তিনি সাজেন চাণক্য, হরিদাস বাবু চন্দ্রগুপ্ত। পাশাপাশি এই দুই সুপুরুষ প্রবীণ ও নবীনকে কী অপরূপই যে দেখিয়েছিল সেদিন—সত্যিই মনে হয়েছিল যেন পিতা পুত্র!

বয়সে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও পিতৃদেবের অন্তরঙ্গ সভাসদদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম একথা বললে বেশি বলা হবে না। সে-সময়ে অবশ্য পিতৃদেবের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগকে আমি ঠিক চোখে দেখতে পারি নি, ভাবতাম—না হবে কেন? পিতৃদেবের গ্রন্থাবলী প্রকাশক তো—সহায় না হওয়াই আশ্চর্য। কিন্তু আমার উত্তর জীবনে লক্ষ্য করেছি তাঁর একনিষ্ঠ লয়ালটি যখন পিতৃদেবের একাধিক তথাকথিত বন্ধু তাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে নানাভাবে নাকচ করতে চাইতেন তাঁকে শুধু হাসির

গানের কবি ও লোকপ্রিয় নাট্যকার উপাধি দিয়ে। হরিদাসবাবু এ-জাতীয় ডিসলয়াল বন্ধুদের উদ্দেশ্যে হেসে বলতেন: "ওরা সুখের পায়রা মণ্টু, দ্বিজদা আজ বেঁচে থাকলে দেখতে ওরা ধরত অন্য বুলি—তাঁর নেকনজরের লোভে।" বাংলা ভাষায় লয়ালটির প্রতিশব্দ নেই বোধহয় এই জন্যেই যে লয়াল হওয়াকে বাঙালি জাত দুর্বলতা মনে করে।" যাঁরাই তাঁকে জানতেন তাঁরাই সাক্ষ্য দেবেন যে অন্তরে কোমল হ'লেও কথায় ছিলেন তিনি বেপরোয়া। যা উচিত মনে করতেন সোজাসুজিই বলতেন। এ-বিষয়ে তিনি পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গর্বই বোধ করতেন। তাই—অর্থাৎ স্পষ্টবক্তা হওয়ার জন্যে—তাঁর অনেক ক্রিটিকই তাঁকে ভুল বুঝতেন।

কিন্তু এবার কিছু বলাই চাই তাঁর রসিকতার সম্বন্ধে—পিতৃদেবের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে যার আরো স্ফুরণ হয়েছিল। একদিনের কথা মনে পড়ে স্পষ্ট। পিতৃদেব অন্যমনস্কতার নানা হাস্যকর দৃষ্টান্ত দিতে দিতে বললেন: "আর এক রকম অন্য-মনস্কতা আছে যার উদ্ভব হয় উৎসাহ থেকে। শোনো একটি গল্প। এক যে ছিল তাসাড়ু—তাস খেলছে তো খেলছেই। আর কী উৎসাহ! একদিন হ'ল কি গ্রাবু খেলতে খেলতে শেষ তাস রঙের টেক্কা ফেলে ছক্কা ধরবে—এমন সময়ে কাশি। উঠে গিয়ে বাইরে ফেলল টেক্কা, ঘরে ফিরে তিনখানা খেলা-তাসের পরে থুতু ফেলে বলল: বোম্।"

হরিদাসবাবু পিঠ পিঠ বললেন: "তবে আমিও এক গল্প বলি দ্বিজদা। এক ডাকসাইটে কথক একবার আমাদের বাড়ি কথকতা করতে এসেছিলেন। তিনি সুবক্তা, কিন্তু থেকে থেকে অনমনস্ক হ'য়ে পড়তেন। সেদিন প্রমথ (ভট্টাচার্য) ছিল সভায়। রসিক তো, তুলল বাঁদরের বাঁদরামির প্রসঙ্গ। কথক ঠাকুর তো উজিয়ে উঠলেন, বললেন: 'বাঁদরের কথাই যদি তুললে ভট্চায, তবে বলি। কিবে বাঁদরই বা দেখেছ, আর কিবে বাঁদরই বা শুনেছ! বলি, আমাদের দ্যাশে গেছ কি কখনো—শান্তিপুর?' প্রমথ মাথা চুলকে বলল: 'আজ্ঞে না। সেখানে—' কথক ঠাকুর চোখ বড় বড় ক'রে বললেন: 'কিষ্কিন্ধ্যা কোথায় লাগে! শোনো তবে।' ব'লে শুরু করলেন বাঁদরের ব্যাখ্যান। কিন্তু বাঁদরের কথা বলতে না বলতে এসে গেল শিবের কথা—অমনি ব'লে চললেন শিবের নানান্ কীর্তিকলাপ—শুধু কি শিব?—দুর্গা কালী কার্তিক গণেশ নন্দী ভৃঙ্গী কিছুই বাকি রইল না। শেষটায় প্রমথ অতিষ্ঠ হ'য়ে বলল: 'তাতো হ'ল কথক ঠাকুর, কিন্তু বাঁদর?' কথক ঠাকুর ব'লে উঠলেন। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—বটে বটে। তা সেখানে অনেক বাঁদর অনেক বাঁদর'।"

পিতৃদেবের সে-অট্টহাসি আজো কানে বাজে।

আর একদিন হচ্ছিল কৃপণের গল্প। পিতৃদেব বলছিলেন এক ধনী কৃপণের কাহিনী—জমিদার।

"দেশে তিনি আটহাত কাপড় প'রে ঘুরে বেড়াতেন—হাঁটুর উপর কাপড় উঠত বৈ কি—কিন্তু জমিদার বেপরোয়া। স্ত্রী শেষে একদিন আর থাকতে না পেরে বলল: 'ওগো! তুমি দেশের জমিদার—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—ভালো একটা ধুতি—' কর্তা বললেন: 'আহা বোঝো না কেন? চেনা বামুনের কি পৈতের দরকার হয়? এখানে আমাকে সবাই চেনে—কাজেই কে হেনস্থা করবে গরিব ব'লে!' আচ্ছা। কিছুদিন বাদে স্ত্রী ধরলেন গয়া কাশী পুরী দেখবেন। অগত্যা কর্তা বেরুলেন তীর্থ-ভ্রমণে। কিন্তু গয়াতেও সেই আটহাতি ধুতিই কায়েম হ'য়ে রইল। স্ত্রী বললেন: 'কিন্তু এখানেও আট হাতি?' কর্তা বললেন: 'আহা, বোঝো না কেন! এখানে আমাকে চেনে কে যে বদনাম করলে গায়ে লাগবে'?"

মিলিত কলহাসি থামলে হরিদাসবাবু বললেন: "তবে আমিও এক ধনী কৃপণের গল্প বলি শুনুন, দ্বিজদা। একবার তিনি আমাকে বিজয়া দশমীর দিন বলেছিলেন প্রতিমা-বিসর্জনের পর: 'হরিদাস! ফি বছরই পুজোর সময়ে ভাবি—তোমাদের সব্বাইকে ডেকে খাওয়াব—এবার তাও হ'ল না'!"

এইভাবে ফোড়ন কাটতে তিনি কী যে ভালবাসতেন! শরৎদা (শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) হরিদাসবাবুকে যে-সব চিঠি লেখেন সেসব আমাকে তিনি দেখাতেন। তাথেকেই জানতে পারি যে শরৎদার দুঃসময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অর্থসাহায্য করতে সব আগে তিনিই এগিয়ে আসেন। শুধু তাই নয়, শরৎদার কলকাতা আসার জন্যে পাথেয় ৩০০৲ও তিনিই তাঁকে পাঠান। আরো অনেক দুঃস্থ সাহিত্যিককেই তিনি এইভাবে গোপনে সাহায্য করতেন একথা শুধু আমি ও তাঁর আর কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধু জানত। শরৎদা হরিদাসবাবুর বদান্যতার কথা বলতে বলতে প্রায়ই উজিয়ে উঠতেন, বলতেন: "অসময়ের বন্ধুই সবচেয়ে রসময়, মণ্টু।"

শরৎদা রেঙ্গুন ছেড়ে কলকাতা আসেন প্রধানত হরিদাসবাবুর আনুকূল্যের 'পরেই নির্ভর ক'রে। তার পরে অবশ্য তাঁর বই বিক্রয়ের আয় দেখতে দেখতে ফুলে উঠেছিল বানের জলের মতন, কিন্তু উপন্যাস লিখে যে তিনি সত্যই ধনী হবেন একথা শরৎদাও ভাবেন নি, হরিদাসবাবুও না। এখনও মনে পড়ে এ-নিয়ে শরৎদার সঙ্গে

তাঁর নানা আলোচনা। কিন্তু সে যাক—তাঁর রসিকতার আরো দু-একটা নমুনা দিই। গুরুদাস লাইব্রেরিতে উৎসুক হয়ে আমি ছুটে যেতাম কলেজ সেরেই। শরৎদা বলতেন: "এই যে—"হরিদাসবাবু বলতেন: "এসো এসো মণ্টু! তুমি না থাকলে কি আড্ডা জমে?"

আমি: সেকি? যেখানে স্বয়ং আপনি আছেন—

হরিদাসবাবু (হেসে): এক ধরনের লোক আছে মণ্টু, যারা ফোড়ন কাটতে পোক্ত, কিন্তু কথা বলাতে পারে না। তুমি পারো স্বধর্মে।

সত্যিই শরৎদা খুব খুশি হতেন আমি এলে—মুখ খুলে যেত তাঁর আমি "তারপরে?"—বলবামাত্র। রবীন্দ্রনাথ পরে একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন যে আমি তাঁকে দিয়ে যত কথা বলিয়ে নিতে পেরেছি তেমন খুব অল্প লোকেই পেরেছে। এর কারণ আমার কোনো বিশেষ যোগ্যতা নয়, শুধু এই যে আমি সত্যিই শুনতে চাইতাম মহাজনের কথা, আর কে না জানে শোনার আগ্রহ দেখে বলিয়েরা খুশি না হয়েই পারেন না, কেন না বক্তার বলার মেজাজকে সবচেয়ে বেশি উস্কে দেয় শ্রোতার শোনার ঔৎসুক্য। হরিদাসবাবুর সম্বন্ধেও একথা সমান প্রযোজ্য—বটেই তো। তাই দু একটা নমুনা দেই কী ধরণের রসালোচনা হ'ত আমাদের তিনজনের মধ্যে।

একদিন কথা ওঠে পাণ্ডাপুরুতদের কীর্তিকলাপ নিয়ে। হরিদাসবাবু হেসে বললেন: "শরৎদা, তবে শুনুন একজন পুরুতের কীর্তি—যে একদিন মা কালীর কাছে মানত করেছিল: 'মা, আমাকে যদি লাখ টাকা পাইয়ে দাও, তবে কথা দিচ্ছি পঞ্চাশ হাজার চাকৃতি দেবই দেব তোমার কালিঘাটের মন্দিরে। তবে যদি আমার কথায় তোমার বিশ্বেস না হয় তবে ঐ পঞ্চাশ হাজার কেটে নিয়ে বাকি পঞ্চাশ হাজার আমাকে পাইয়ে দাও—আমি কথাটি কইব না'।"

আর একবার বলেছিলেন এক গৃহকর্তার গল্প। শরৎদা তখন কলকাতায় তাঁর অশ্বিনী দত্তের রোডের বাড়িতে। একদিন আমরা সদলবলে গিয়েছি। খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে শরৎদা গল্পের পর গল্প ব'লে চলেছেন আর আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনছি। হঠাৎ হরিদাস বাবু বলে উঠলেন: "রাত দুপুর হ'ল মণ্টু, মানে মানে চলো প্রস্থান করি—নৈলে শরৎদা তাঁর চাকরকে ডাকবেন উইলের জন্য।"

শরৎদা (হেসে): উইল?

হরিদাস বাবু (সহাস্যে): এক যে ছিল সদাশয় ব্রাহ্মণ—আপনারই মতন। অনেককে ডেকেছেন সরস্বতী পুজোর দিন। খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ হলে অভ্যাগতদের

আর উঠবার নাম নেই—চলেছে তো চলেইছে পান সরবৎ গুড়ুক গুড়ুক—আর গাল-গল্প। হঠাৎ এক বিরাট হাই তুলে গৃহকর্তা ডাক দিলেন চাকরকে: 'ওরে বিশে, এই চাবিটা নিয়ে যা তো—লোহার সিন্দুক খুলে বাবার উইলটা নিয়ে আয়।' অভ্যাগতরা তো অবাক! উইল!! কর্তা সেই সুরেই বললেনঃ 'দেখি, বাবা উইলে বাড়িটা কাকে দিয়ে গেছেন—এঁদের সবাইকে, না আমাকে?' হা হা হা!"

সে-প্রাণখোলা হাসির রেশ আজো কানে রয়ে গেছে।

হরিদাসবাবুর সদাস্নিগ্ধ স্বাগতের কথাও অবিস্মরণীয়। মুখে তিনি কোনো দিনই উচ্ছ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু স্নেহ তাঁর ছিল স্বভাবসিদ্ধ, আর যাকে একবার স্নেহ করতেন তাকে কোনোদিন ভুলতেন না। তাই শুধু যে তিনি পিতৃদেবকে ভোলেন নি তাই নয়, যৌবনে আমার থিয়েটার রোডের গীতমুখর বিলাসপ্রাসাদ পর্ব থেকে প্রৌঢ় বয়সের সীমান্তে নিঃস্ব আশ্রমবাসিক পর্ব পর্যন্ত আমাকে সমানে স্নেহ ক'রে এসেছেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বৎসর আগে তাঁকে পণ্ডিচেরি থেকে বিজয়া দশমীর প্রণাম দিয়ে চিঠি লিখতে তিনি উত্তর দেন—মাত্র দুছত্র কিন্তু কী সুন্দর আত্মপ্রকাশ! লিখে-ছিলেনঃ "স্নেহের মণ্টু, তোমার প্রণাম পেলাম। দেহ অপটু হয়ে এসেছে—তাকে দোষ দেওয়াও যায় না। তোমার সঙ্গে ফের দেখা হবে কিনা কে জানে? তাই আরো মন ভ'রে উঠল তোমার ৺বিজয়ার চিঠি পেয়ে। এই চিঠিটির জন্যে সম্বৎসর অপেক্ষা ক'রে থাকি। আমার প্রাণভরা স্নেহাশীর্বাদ নিও। ইতি।"

তিনি সংসারী মানুষ ছিলেন তাই যেমন কাউকে কখনো ঠকান নি তেমনি নিজেও ঠকতে চাইতেন না। আমি যখন বিলেত যাই তখন তিনি যেন নতুন ক'রে পরিচয় দেন প্রথম মনোবৃত্তিটির। বললেন: "বিলেতে যদি হঠাৎ কিছু টাকাকড়ির দরকার হয় আমাকে অসঙ্কোচে জানাবে তো?" আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলি: "যখন আমি অকূল পাথারে পড়ি তখন আপনি আর মেজমামা এই দুজনেই তো এগিয়ে এসেছিলেন পারে পৌঁছিয়ে দিতে। আপনাদের জানাবো না তো জানাবো কাকে?"

হরিদাসবাবু বলেন: "তোমার মেজমামার সঙ্গে আমার নাম কোরো না। তিনি তোমার জন্যে যা করেছেন তা দ্বিজদাও করতে পারেন কিনা সন্দেহ। আমি তো জানি দ্বিজদা কী রেখে গিয়েছিলেন। তাকে শুধু যখের ধনের মতন বুক দিয়ে আগলে রাখাই নয়—তোমার জন্যে নতুন একটি তিনতলা বাড়ি তুলে দেওয়া

ঠিকাদারকে টাকা না দিয়ে—এ-রাম মনুষ্য নয় মণ্টু! তোমার বহু ভাগ্যে এমন মামা পেয়েছিলে।" ব'লে চোখ মুছে: "আর আমি? তুমি কী জানবে দ্বিজদাকে আমি কোথায় বসিয়েছিলাম? যাক বলা রইল—মনে রেখো, কেমন?" ব্যস। কম কথার মানুষ ছিলেন তিনি, কিন্তু যা বলতেন তার মধ্যে মেকি কিছু থাকত না। বলতে কি, বিলেতে আমার আর্থিক সচ্ছলতার মূলে ছিলেন মেজমামা আর হরিদাস বাবু।—তাই তো বহু টাকা খরচ করে ডিগ্রী না নিয়ে ফিরে এলেও আমাকে পরের চাকরি করতে হয়নি—হরিদাসবাবু বইয়ের হিসেব রাখতেন, আর আমার পিতৃকল্প বিচক্ষণ মেজমামা ভাণ্ডারী হয়ে আমার সঞ্চিত অর্থ খাটিয়ে বাড়াতেন। আমি বৈষয়িকতার ক-খ না জেনেও সারা ভারতে নিরবচ্ছিন্ন হেসে খেলে গান গেয়ে চলতে পেরেছিলাম শুধু এই দুটি মানুষ আমার বৈষয়িক তল্পি ধ'রে ছিলেন ব'লেই।

কিন্তু স্বভাবে স্নেহশীল হলেও হরিদাসবাবু কারুর মনরাখা কথা বলতেন না। বিবেকী ছিলেন তিনি অস্থিমজ্জায়। কী ভাবে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি—আরো এইজন্যে যে ব্যাপারটা বলবার ম'ত।

যখন ১৯২৮ সালে আমি সংসার ছেড়ে পণ্ডিচেরি চ'লে যাই তখন হরিদাসবাবু আমাকে লেখেন একটি দীর্ঘ পত্র সাত আট বৎসর অদর্শনের পরে। লেখেন: "অনেকদিন দেখি নি, গান শুনি নি। একবার এসো এবার। কী সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়! ওখানে এতদিন থাকে—যেখানে তুমি নিজেই লিখেছ কেউ হাসে না? কিন্তু শোনো, একটি কথা তোমাকে আজ লিখবই লিখব—কিছু মনে কোরো না। তুমি শুনলাম তোমার তিনখানা বাড়িই বেচে দিচ্ছ আশ্রমের জন্যে? তোমার গুরুদেব কি তাই চান?" (গুরুদেব চান নি, কিন্তু আমিই জোর ক'রে বাড়ি বিক্রি করি এই ব'লে যে সাধকের পক্ষে জমিদার হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, নিঃস্ব হওয়াই ভালো)। "গুরুবাদ আমি বুঝি না ভাই, তবে এটুকু বুঝি যে তোমার শিবতুল্য মাতুলের মনে কষ্ট দিলে তোমার খুব অন্যায় হবে। তিনি আজো তোমার কথা বলতে চোখের জল ফেলেন। প্রায়ই বলেন: 'আমার দুই মেয়ে কে বলল? সব আগে মণ্টু—আমার মেয়েরা তার পরে।' এহেন মাতুলের মনে দুঃখ দেবে তুমি ভিটে মাটি বেচে? তোমার শরৎদাও দুঃখ করেন এই নিয়ে। সত্যি বলছি মণ্টু, তুমি নিঃস্ব হলে সবচেয়ে বেশি বাজবে তোমার স্নেহময় মেজমামাকে—এই কথাটি ভুলো না। আর আমাদেরও মনে আঘাত লাগবে যদি দ্বিজদার সুরধাম তুমি বেচে দাও। শেষে আর একটি কথা বলব? ব'লেই ফেলি: কথাটা এই যে তোমার

গুরুদেব মহৎ হতে পারেন কিন্তু তাঁর দেহরক্ষার পরে আমার মনে হয় না তোমার গুরুভাইদের সঙ্গে তোমার বনিবনাও হবে···মণ্টু, এই দলাদলি ক'রেই আমাদের দেশে ধর্ম ডুবেছে—বলতেন দ্বিজদা—তুমি কি ভুলে গেলে ?" আরো যা লিখেছিলেন উদ্ধৃত করলে অন্যায় হবে ব'লে কিছু বাদ দিয়ে এখানেই এ প্রসঙ্গের ইতি করি। এটুকুও উধৃত করতাম না, করলাম শুধু দেখাতে—তিনি স্নেহশীল হওয়া সত্ত্বেও দরকার বুঝলে কী ভাবে স্পষ্টবক্তা হতে পারতেন।

তবু তাঁর কথা না শুনে আমি যখন নিঃস্ব হই তখনো তিনি সমান আগ্রহেই আমার বই ছাপতেন জেনে শুনে আমার ধর্মাত্মক বই বাজারে বেশি কাটবে না। তবু এ-কথার উল্লেখ ক'রে আমার মনে দুঃখ না দিয়ে তাঁর সরসভঙ্গিতে লেখেন: "আমি বেঁচে থাকতে তোমার বই আর কোনো প্রকাশককে দেবে কোন্ প্রাণে মণ্টু?—আমার নাগর যাবে পর ঘর আমার আঙিনা দিয়া ?"

আমার বই ছাপিয়ে তাঁর বিশেষ লাভ হয়নি। এ-বিষয়ে যে আমি বাপকা বেটা নই তা তিনি বহুবার ঠেকে শিখেছিলেন। পিতৃদেবের নাটক সে-যুগে কাটত হু হু ক'রে—সংস্করণের পর সংস্করণ ছাপা হ'ত ছমাস অন্তর—যেখানে আমার দোলা, মনের পরশ, দুধারা এক সংস্করণ নিঃশেষ হতেই সাত আট বৎসর। কোনো প্রকাশকই অখ্যাত লেখকের একাধিক বই স্টক ক'রে রাখতে রাজি হন না এতদিন ধ'রে। কিন্তু তিনি ব্যথা দিয়ে ব্যথা বুঝতেন—জানতেন আমি খ্যাতিমান হই বা না হই, কিছুতেই টাকার জন্যে পপুলার বই লিখতে রাজি হব না, হাজার অর্থকষ্টে পড়লেও আদর্শকে জলাঞ্জলি দেব না। তাই হরিদাস বাবু এসেছিলেন সে-যুগে আমার অচলপ্রতিষ্ঠ লজ্জানিবারণ হ'য়ে। তিনি না থাকলে আমার বই যে সে- সময়ে এক আধটির বেশি ছাপা হ'ত না এ নিশ্চয়। যারা তাঁকে শুধু ব্যবসাদার রূপেই চিনেছিল তারা দেখতে পেয়েছিল শুধু তাঁর ব্যবসায়ী ঐকান্তিকতা ও নির্মোহ দৃষ্টি যে কোদালকে কোদালই দেখত, অসার লেখককে অসার ব'লে সনাক্ত করত এক আঁচড়েই। কিন্তু যেখানে সত্য গুণপনা আছে সেখানে তিনি যে তাঁর ব্যবসাবুদ্ধিকেই প্রথম স্থান দিতেন না একথা জানত কেবল তারা যারা তাঁকে একটু কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিল।

শুধু তাই নয়—মানুষের মহত্ত্ব তিনি সত্যিই বুঝতেন, তাই পণ্ডিচেরি আশ্রমে যাওয়ার পরে যখন আমি সাময়িক মতিভ্রমের দরুন মেজমামার বিবেকিতাকে তার স্বরূপে চিনতে পারি নি, তখন তিনি আমাকে তিরস্কার ক'রে লেখেন এক চারপাতা

চিঠি ঃ "তুমি যে দ্বিজদার ছেলে একথা তুমি ভুলতে পারো মণ্টু, কিন্তু আমরা তো পারি না—আর সবচেয়ে কম পারেন তোমার মেজমামা যাঁর মতন মামা এ যুগে কালেভদ্রে দেখা যায়। মণ্টু, তুমি চিরদিন পর্বতের আড়ালে কাটিয়েছ, প্রথমে দ্বিজদার, পরে তোমার পিতার অধিক মাতুলের—যিনি তোমার জন্যে বালিগঞ্জে নতুন বাড়ি করবার সময় একটি প্রকাণ্ড হল ঘর করেন শুধু তোমার গানের আসরের জন্যে। এ-সব ভুলে গিয়ে কী ক'রে তুমি তাঁকে অমনি কঠোর চিঠি লিখলে? কেন তিনি তোমার সর্বস্ব এখনি প্রাণ ধ'রে পণ্ডিচেরিতে পাঠিয়ে দিতে পারছেন না এটুকু কল্পনাও কি তোমার নেই? না, তুমি জানো না যে, পণ্ডিচেরির প্রতি তিনি প্রসন্ন নন, বিশেষ ক'রে সেখানকার গোঁড়া সাধকদের জন্যে যারা শুধু বুলি কপ্‌চে জয় গুরু জয় গুরু ক'রেই ভাবে—সাত চিতে গোলোকধামে পৌঁছবে? (উপমাটি তাঁর, আমার নয়।) আরো, তিনি মনে করেন তুমি যে-অভিমানী, নিঃস্ব হবার পরে অর্থকষ্ট পাবে—তোমার গুরুদেবের মৃত্যুর পরেও আশ্রমের সাধকদের তুমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবে না। এ-ধারণা তাঁর ভ্রান্ত এ হ'তেও পারে—যদিও আমি বা শরৎদা মনে করি না ভ্রান্ত—কিন্তু যদি একথা মেনেও নিই তবু এ-বিষয়ে কি তোমার নিজেরো এতটুকু সন্দেহ থাকতে পারে যে, তোমার মামা তোমার ফকির হবার বিরোধী তোমার কথাই ভেবে—তাঁর নিজের কথা নয়? এই সেদিনও তিনি তোমার কথা বলতে বলতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন শরৎদার সামনে। বললেন কি জানো? বললেন: 'শরৎবাবু! আমার দুঃখ এ নয় যে মণ্টু নিঃস্ব হ'তে চলেছে—কারণ আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন সে অনাথ হবেনা নিশ্চয়। আমার দুঃখ এই যে সে ঝোঁকের মাথায় এমন আশ্রমে টাকা দিতে যাচ্ছে যে-আশ্রমের কার্যকলাপ আমরা কিছুই জানি না, শুধু এইটুকু ছাড়া যে তারা সেখানে বেশ গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায় ও বলে: আমাদের মতন সাধক এ-যুগে আর জন্মায় নি। আপনাকে বলছি শরৎবাবু—হরিদাসবাবু সাক্ষী—যে মণ্টু ফিরে আসুক—আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলুক ওর বিষয় ও হাতে চায়—আমি এক্ষুনি দিয়ে দেব। কিন্তু আমি জানি ওর মন যেমন আর কেউ জানে না, জানতে পারে না। ও যেমন উদার তেমনি সরল—মানুষ চেনে না। সবাইকেই বিশ্বাস করে! তাই ভেবে বসেছে যে আশ্রমের সাধকরা সবাই ওর মতন আদর্শবাদী। দুচারজন ভালো লোক হয়ত সেখানেও আছে—কিন্তু মানুষকে চিনতে চিনতে আমার হাড় পেকে গেল শরৎবাবু, তাই বলছি আপনাকে—লিখে রাখুন আপনি—মণ্টু কিছুতেই অমন গুরুগম্ভীর বুলিবাজ আশ্রমে টিঁকতে

পারবে না। ও দ্বিজদার মতনই মন নিয়ে জন্মেছে—সংকীর্ণ গোঁড়া হ'য়ে জয় গুরু জয় গুরু বলতে বলতে অধমাধম বনতে পারবে না কিছুতেই।' এইরকম আরো কত কথাই যে বললেন তিনি—শুনতে শুনতে আমি যে আমি মণ্টু—প্রায় কেঁদে ফেলি আর কি! তাই বলি ভাই, ঝোঁকের মাথায় এখুনি তোমার যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমার শিবতুল্য মাতুলের মনে শেল হেনো না। মনে রেখো—একদিক দিয়ে তাঁর ভালোবাসা দ্বিজদার অপত্যস্নেহের চেয়েও বড়। কেন না তুমি দ্বিজদার বংশধর, তাই তোমার জন্যে ভাবা তাঁর কর্তব্য ছিল। কিন্তু তোমার মেজমামার সম্বন্ধে তো একথা খাটে না। তোমার ভরণপোষণের কোনো দায়িত্বই তাঁর নেই। তবু যে তিনি তোমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন ব'লে শুধু তোমার মঙ্গলের কথা ভেবেই তোমাকে ঝোঁকের মাথায় সর্বস্বান্ত হ'তে বারণ করছেন এ-সাদা সত্যটি আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি, শুধু তুমিই পেলে না? এরকম তো তুমি ছিলে না মণ্টু! তোমাকে আমরা সবাই জানি স্বভাবে উদার, সরল, সুবুদ্ধি, স্নেহশীল ব'লে—সে তোমারও যদি ঐ দারুণ সাধনায় দুদিনে এ-হেন মতিভ্রান্ত অবস্থা হয়, তাহ'লে আমরাই বা যোগসাধনার জয়গান করি কোন্ ভরসায়, আর তোমার মেজমামার মুখেই বা আজ অন্নজল রোচে কেমন ক'রে বলো দেখি?"

হয়ত এতটা উদ্ধৃত করা ঠিক হ'ল না। কিন্তু এ আমি করলাম শুধু আমার অনুতাপ জানাতে যে এ-হেন মেজমামার মনে আমি দুঃখ দিয়েছিলাম "মতিভ্রান্ত" হওয়ার ফলেই বটে।

কিন্তু আরো একটা কারণে আমি হরিদাসবাবুর এ-চিঠির প্রথমার্ধ উদ্ধৃত করলাম—দেখাতে যে তাঁর দৃষ্টি ছিল যেমন নির্মোহ, হৃদয় ছিল ঠিক তেমনি স্নেহশীল, ভাষণ তেমনি সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক! মেজমামার সঙ্গে পুনর্মিলন হয় আমার যথাকালে—অনুতপ্ত হ'য়ে আমি তাঁর ক্ষমা চাই। কিন্তু সে-সময়ে এ-দৃষ্টিদান করেছিলেন আমাকে প্রধানতঃ দুজন: শরৎদা ও হরিদাসবাবু।

ভেবেছিলাম, মেজমামার কথা পরে লিখব। কিন্তু কলমের মুখে যখন এসে গেছে তখন ছবিটাকে সম্পূর্ণ করা মন্দ কি?

মেজমামার পুরো নাম—খগেন্দ্রনাথ মজুমদার, ডাক নাম—তকু। বড়মামা জিতেন্দ্রনাথও আমাকে স্নেহ করতেন, কিন্তু সে যেমন গড়পড়তা মাতুলরা ক'রে থাকেন। মেজমামা ছিলেন অন্য ধাতু দিয়ে গড়া—বাইরে অনুচ্ছ্বাসী, কিন্তু অন্তরটি স্নেহের নির্যাস দিয়ে গড়া—ফুলেরই ম'তই কোমল। শুধু আমাকে নয়, সবাইকেই

তিনি স্নেহ করতেন তেম্‌নি সহজে যেমন সহজে পাখি গান গায়, শিশু হাসে, মেয়েরা পুতুলখেলা করে। প্রবৃত্তিতে তিনি ক্রোধন ছিলেন ব'লে সবাই তাঁকে একটু ভয় করলেও ভালোও বাসত কম নয়। সে যাই হোক্‌, আমার প্রতি তিনি একদিনের জন্যেও রাগ করেন নি। পিতৃদেবের যেদিন সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু হয় আমি কেঁদে উঠতেই তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলেন: "এই যে বাবা, আমি আছি, ভয় কি বাবা!" ঠিক এই কয়টি কথা। আমার বুকের মধ্যে স্নিগ্ধ আশ্বাস জেগে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। আমার দিদিমাও ছিলেন স্নেহময়ী, কিন্তু অতি সজাগ। তাই চোখের জল ফেলা রেখে মেজমামাকে বললেন: "তকু, বাড়িভরা লোক—দ্বিজুর লোহার সিন্ধুকের চাবিটা আগে দেখ্‌ বাবা!" আমি সে-সময়ে দিদিমার এ-বৈষয়িকতায় অত্যন্ত ঘা খেলেও পরে যখন একটু খোলা চোখে দেখতে শিখি—মানুষ কী ভাবে দেখতে দেখতে রূপচাঁদের রূপমোহে প'ড়ে অমানুষ হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন বুঝি যে, দিদিমা সাবধানী হ'য়ে ভুল করেন নি, কেন না পরে জানা গেল—সত্যিই সে-গোলমালের সময়ে আরো দুচারজন লোহার সিন্ধুকের চাবির খোঁজ করেছিলেন। তাই এই সময়ে যে পিতৃদেবের লোহার সিন্ধুকের চাবি মেজ-মামার মতন স্নেহময় বিবেকীর হাতে পড়েছিল একে আমার পরম ভাগ্য ব'লেই মেনে নিয়েছিলাম বৈকি—আরো হরিদাসবাবুর নির্দেশ পাওয়ার পরে।

পিতৃদেবের মৃত্যুর পরে আমি থিয়েটার রোডে দাদামহাশয়ের প্রাসাদে থেকেই প্রেসিডেন্সি কলেজে আই-এস-সি পড়া সুরু করি—মেজমামার অভিভাবকতায়। তিনি এগিয়ে এসে হন আমার অছিও বটে। সুরধাম ভাড়া দেওয়া, পাওনা টাকা আদায় করা, পিতৃদেবের সঞ্চিত ধনসম্পত্তির তদারক করা—সব ভারই তিনি নিলেন হাসিমুখে। আমাকে এমন কি নিজের টাকা থেকেও প্রথম প্রথম কিছুই খরচ করতে দিতেন না, বলতেন: "আহা জমুক না রে!" এইভাবে সঞ্চিত টাকা খাটিয়ে প্রায় চতুর্গুণ ক'রে তুলেছিলেন তিনি সাত আট বৎসরের মধ্যেই—আর একটি তিনতলা বাড়িও তুললেন—সুরধামের পাশেই। ফলে আমার মাসিক আয় মেজমামা ও হরিদাস বাবুর ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে গেল দেড় হাজারের কাছাকাছি। সে-সময়ে দেড় হাজার টাকা আজকের দিনে চার হাজারের সামিল। মেজমামা তখন বললেন একগাল হেসে: "আর ভয় নেই বাবা, দ্বিজদা উপর থেকে আশীর্বাদ করছেন—তুই যদি চাকরি কোনোদিন নাও করিস—ভাবতে হবে না আর।"

কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থার এ-দ্রুত ও আশ্চর্য উন্নতির জন্যে দায়ী ছিলেন

একা তিনিই বলব—কেন না পিতৃদেবের বই বিক্রি ক'রে হরিদাসবাবুকে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয় নি—যদিও অন্য অনেক প্রকাশকদের মতন তিনি আমাকে ঠকাতে চাইলে ঠকাতে পারতেন। তবু আশ্চর্য এই যে আমি হরিদাসবাবুর কাছে বরাবরই কৃতজ্ঞ বোধ করলেও মেজমামার কাছে আমার গভীর ঋণ সম্বন্ধে সচেতন হ'তে আমার সময় লেগেছিল। একেই বোধহয় চলতি প্রবচনে বলে: গেঁয়ো যুগী ভিখ পায় না, বা প্রদীপের নিচেই সবচেয়ে অন্ধকার। তাই আমি গান গেয়ে সারা ভারত চ'ষে বেড়াতে বেড়াতে ভুলেই গিয়েছিলাম এই সাদা সত্যটি যে আমার চোখে রামধনুর রং ফলতে পেরেছিল পায়ের নিচের মাটি মেজমামাই জুগিয়েছিলেন ব'লে। তিনি যে নাবালকের সম্পত্তি রাখা ও খাটানোর হাজারো ঝক্কি ব'য়েছিলেন অবিমিশ্র স্নেহের তাগিদেই, অন্য কোনো লাভের আশায় নয়—এই সত্যটিই আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন শরৎদা আর হরিদাসবাবু। কিন্তু মেজমামার প্রসঙ্গটা শেষ করি।

মেজমামার স্নেহ ও ঔদার্যের সম্বন্ধে বলবার আছে অঢেল, কিন্তু সেসব অতি ব্যক্তিগত কথা, বেশি ফেনিয়ে বললে হয়ত পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি হ'তে পারে। স্মৃতিচারণে ব্যক্তিগত কথার স্থান থাকলেও বাছাই করার সুবুদ্ধি বিনা তার আসল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হ'য়ে যায়—অর্থাৎ ব্যক্তিগত তথ্যের মধ্যে দিয়ে রসতত্ত্বের নির্দেশ দেওয়া—যাতে কারুরই অরুচি হ'তে পারে না।

তাই মেজমামার পারিবারিক জীবনের স্নেহের কথা বেশি বলব না শুধু এইটুকু ছাড়া যে তাঁর মহত্ত্ব যখন চিনতে শিখি তখনই প্রথম আমার চোখের ঠুলি খ'সে পড়ে, আমি দেখতে পাই যে স্নেহ যে-অনুপাতে নিঃস্বার্থ হ'য়ে ওঠে সেই অনুপাতেই তাতে মহত্ত্বের ছোপ লাগে কেননা সত্যি নিঃস্বার্থ হ'তে পারে কেবল খাঁটি মহত্ত্ব।

শরৎদা ও হরিদাসবাবুর তিরস্কারে আমার যখন চৈতন্য হয় তখন আমি—১৯৩৭ সালে—একরকম জোর ক'রেই কলকাতায় ফিরে আসি আট বৎসর পণ্ডিচেরির যোগাশ্রমে অজ্ঞাতবাস ক'রে গুরুভাইদের নীরস আচরণে শুকিয়ে আসার পর। তখন মেজমামার সে কী আনন্দ! সবাইকেই ব'লে বেড়াতেন মহোৎসাহে: "ওরে আমার মণ্টু ফিরে এসেছে—আর কী গানই গাইছে!"—ভুলে গিয়ে যে "তাঁর মণ্টু" আর সে-মণ্টু নেই—এখন এমনই নিঃস্ব যে তিনি ট্রেনভাড়া পাঠিয়েছিলেন ব'লেই কলকাতা আসতে পেরেছিল। কিন্তু তিনি আমাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা:

"বিষয় গেছে তো কী হয়েছে? মণ্টু আমার কাছে থাকবে—আমার বড় ছেলে হ'য়ে। ওকে কিছু ভাবতে হবে না।"

আমার আর দুই মামাও ধনীই ছিলেন, কিন্তু আমাকে কিছু ভাবতে হবে না এতবড় ভরসা দেবার মতন বুকের পাটা তাঁদের ছিল না।

আমি তাঁর কাছে বরাবরের জন্যে থাকতে রাজি হই নি কারণ আশ্রম সম্বন্ধে আমার ভুল ভাঙলেও শ্রীঅরবিন্দকে আমি বরণ করেছিলাম সর্বান্তঃকরণেই, তাই মেজমামাকে প্রায়ই বলতাম শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞান, চরিত্র, বিদ্যা, বুদ্ধি—সর্বোপরি মহত্ত্বের কথা। শুনতে শুনতে তাঁর চোখে জল ভ'রে আসত আর বলতেন: "তাঁকে আমি জানি না বাবা, যোগযাগেরও কিছুই বুঝি না—কিন্তু তোর মুখে যা শুনলাম তাতে এইটুকু আমার লাভ হ'ল যে তোর ভক্তির ছোঁয়াচে তাঁকে আমিও ভক্তি করতে শিখলাম—এ আমার মস্ত লাভ···" এই ধরনের সে কত কথা!

এর পরে—১৯৩৭ থেকে—আমার জীবনের একটা নতুন অধ্যায় সুরু হ'ল: প্রতি বৎসর আমি দুতিনমাস কলকাতায় ও আরো নানা শহরে চ্যারিটি কন্সার্ট দিয়ে যে-টাকা তুলতাম নিয়ে গিয়ে নিবেদন করতাম গুরুদেবের চরণে গুরুসেবার্থে। প্রথম প্রথম কলকাতায়ই আমার বেশি সময় কাটত মেজমামার ও মেজমামিমার স্নেহ-সান্নিধ্যে এবং আমার গীতিশিষ্যা ৺উমা বসুকে গান শিখিয়ে। ৺উমা ১৯৪২ সালে আমাদের ছেড়ে চ'লে যায়। তার অপূর্ব প্রতিভা, চরিত্র ও গুরুভক্তির কথা আমার "ছায়ার আলো" বইটিতে লিখেছি, তাই উপস্থিত মেজমামার প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

কলকাতায় শ্রীঅরবিন্দের চ্যারিটি কন্সার্টে মেজমামা নানাভাবেই সহায়তা করতেন, কেবল বলতেন তিনি শুধু শ্রীঅরবিন্দের কথা ভেবেই আনুকূল্য করছেন, তাঁর আশ্রমের কথা ভেবে নয়। কেউ কেউ তাঁকে বলত শ্রীঅরবিন্দকে মানলে আশ্রমকেও মানতেই হবে। তাতে মেজমামা উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বলতেন: "কক্ষনো না। কারণ শ্রীঅরবিন্দ তো ঘরে বন্ধ হ'য়ে আছেন—আশ্রমে কী হচ্ছে না হচ্ছে খবর রাখবেন কী ক'রে? আর কে না জানে—গুরু বড় হ'লেই শিষ্য বড় হয় না—যেমন বাবা বিদ্বান্ হ'লেই ছেলে বিদ্বান্ হয় না? তাছাড়া মহাজনদের আশেপাশে অভাজনরাই সব চেয়ে বেশি গোল করে।" আমি হেসে এ-প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বলতাম: "কিন্তু আমার ভালো লাগছে মামা, যে শ্রীঅরবিন্দের 'পরে তোমার আর ক্ষোভ নেই।" প্রত্যুত্তরে তিনি বলতেন: "একথা ঠিক। তবে তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে যে আর কোন কাঁটা নেই তার কারণ শুধু এই নয় বাবা, যে তিনি

মহাত্মা তার কারণ—দেখতে পেয়েছি এ-আট বৎসরের সাধনায় তোর কত উন্নতি হয়েছে। আমি গাছকে তার ফল চেখে বিচার করারই পক্ষপাতী জানবি। তাই যখন দেখলাম যে শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদে তোর মধ্যে এমন ভক্তি জেগে উঠেছে—যার প্রসাদে তোর মুখে বেরুল এমন অপূর্ব গান 'বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম'—তখন থেকেই তাঁকে প্রণাম করতে ইচ্ছা হয়েছে, সত্যি বলছি।" (এ-গানটি অনামীতে দ্রষ্টব্য।)

"তবে চলো না মামা একবার।"

মেজমামা শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে বললেন: "না বাবা। তোকে তো বলেছি কেন যেতে চাই না।"

মেজমামা কারণ যা বললেন তা প্রকাশ ক'রে লাভ নেই।

এই সময়ে মাঝে মাঝে শরৎদা ও হরিদাসবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ত ও তাঁরা খুশি হ'য়েই আমাকে আশীর্বাদ করতেন যে মেজমামার সঙ্গে আমার মিটমাট হ'য়ে গেছে।

শুধু মিটমাট হ'য়ে যাওয়া নয়—মেজমামার ও মেজমামিমার অনাবিল স্নেহ যেন আরো গভীর হ'য়ে উঠল আমাদের পুনর্মিলনের পরে। প্রতিবারই যখন কলকাতা থেকে পণ্ডিচেরি ফিরতাম মেজমামা স্টেশনে আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসে বিদায় আলিঙ্গনের সময়ে চোখের জল ফেলতেন যেন তাঁর সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা।

১৯৩৮ থেকে ১৯৫০-এর নভেম্বর পর্যন্ত আমি শ্রীঅরবিন্দের শ্রীচরণে অর্ঘ্য সাজাতে ভারতবর্ষে বড় বড় শহরে কন্সার্ট দিয়ে টাকা তুলেছি প্রায় আড়াই লক্ষ। ১৯৫০-এ তিনমাসে বাষট্টি হাজার টাকা তুলে যখন কাশীতে আর একটি কন্সার্ট দেবার জন্যে শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে রিহার্সাল দিচ্ছি সেই সময়ে হঠাৎ রেডিওতে খবর এল শ্রীঅরবিন্দ মহাপ্রয়াণ করেছেন।

আশ্রমে ফিরে মনে হ'ল সব শূন্য। গুরুদেব নেই যেখানে সেখানে থাকতে আর মন চাইল না, কারণ আমি শুধু তাঁরই ডাকে পণ্ডিচেরি গিয়েছিলাম। মেজমামা ব্যথিত হ'যে আমাকে তার করলেন, "আমার কাছে চলে আয়।" কিন্তু আমি ঠিক করলাম খুব দূরে কোথাও যাব—যতদূর হয় ততই ভালো। হবি তো হ ঠিক এই সময়েই সানফ্রান্সিস্কো থেকে নিমন্ত্রণ এল—যেকথা আমার "দেশে দেশে চলি উড়ে" তে লিখেছি! কিন্তু আমি তখন নিঃস্ব। উপায়? কিন্তু রাখে-কেষ্টকে ঠুঁটো করে কে? আবুল কালাম আজাদ ইন্দিরা ও আমাকে একান্ত অপ্রত্যাশিত ঔদার্যে বিশ হাজার টাকা দিলেন "কালচারাল মিশনে" বিশ্বভ্রমণ করতে। ১৯৫৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারি

আমরা বেরুলাম। টোকিয়ো, হনোলুলু, সানফ্রান্সিস্কো, লস এঞ্জেলস, সেণ্ট বার্বারা, শিকাগো, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লণ্ডন, গোটিংগেন, জুরিক, রোম ও কায়রোতে নৃত্য, গীত ও বক্তৃতা ক'রে ২৭শে আগস্ট দেশে ফিরলাম প্রায় নিঃস্ব অবস্থায়ই বলব। আমার মাসিক আয় তখন দুশো আড়াইশোর বেশি নয়। আশ্রমে ফিরতে প্রাণ চাইল না—কৃষ্ণহীন দ্বারকায় কে থাকতে চায়? ভেবেচিন্তে স্থির করলাম কয়েকটি বই লিখে কয়েক হাজার টাকা পেলে হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে একটি জমি কিনে ছোট্ট একটি কুটির তুলে বাকি জীবনটা কোনোমতে টিমটিম ক'রে কাটিয়ে দেব। দিল্লি হ'য়ে সেইজন্যই হরিদ্বারে গেলাম সেপ্টেম্বরে (১৯৫৩)। কিন্তু হা হতোস্মি—সেখানে গঙ্গাতীরে জমিদার জমির এত দাম হাঁকল যে নিরাশ হয়ে ফিরলাম মান্দ্রাজে—সেখানকার খরচ কম ব'লেও বটে, আর ইন্দিরার প্রিয় বোন কান্তা আমাদের নিমন্ত্রণ করল ব'লেও বটে। কিন্তু তাদের বাড়িটি অত্যন্ত ছোট, মাত্র তিনটি ঘর। কান্তা ও তার স্বামী নোতি থাকত একটি ঘরে; তাদের দুটি ছেলে মেয়ে ও ইন্দিরার দুই ছেলে রাত্রে শুত খাবার ঘরে; আমি ও ইন্দিরা একটি ঘরে—স্তূপাকৃতি বইভরা তোরঙ্গ সাজিয়ে। আমার লেখার জন্যে ইন্দিরা একটি ভাঙা জানালাহীন পাঁচহাত লম্বা দুহাত চওড়া কয়লার ঘর সাফ করিয়ে জানালায় চিক লাগিয়ে দিল। এই জানালাহীন কয়লার ঘরে ব'সে আমি মাসের পর মাস বই লিখে চললাম। কান্তা ও নোতি নিতে না চাইলেও আমি জোর ক'রে ওদের প্রতি মাসে দুশো টাকা দিতাম—ওদের খরচ সঙ্কুলান করতে।

কিন্তু এ-ব্যবস্থা তো সাময়িক! কোথায় স্থিরাসীন হই ভাবতে লাগলাম আকাশ-পাতাল। এই সময়ে আদেশ পেলাম; "আকাশবৃত্তি নিয়ে ভবিষ্যৎচিন্তা ছেড়ে গুরুদত্ত সাধনার জের টেনে চলো।" এখানে একটু থেমে বলি "আকাশবৃত্তি" কথাটির মানে। কারণ একথাটির অর্থ আজকালকার বহু বিদগ্ধ বাঙালিই জানেন না।

অনেক সাধুসন্ন্যাসীই তাঁদের সাধনার একটি বিশেষ অবস্থায় আকাশবৃত্তি অবলম্বন ক'রে থাকেন। কোনো অভাবই কাউকে জানাতে পারবে না, তবে কেউ স্বেচ্ছায় কিছু দিলে গ্রহণ করতে পারো—এইই হ'ল আকাশবৃত্তির মূল বিধান। এ-বৃত্তি যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁরা সময়ে সময়ে খুবই কষ্টে পড়েন বৈ কি—আরো এই জন্যে যে কাউকে অভাবের কথা জানানোর উপায় নেই, ধার করলেও ব্রতভঙ্গ। আমার "অঘটন আজো ঘটে"-তে শ্যামঠাকুরের চরিত্রে আকাশবৃত্তির কথা কিছু লিখেছি—কী ভাবে এ-বৃত্তিতে সাধকের পরিচয় হয় একটি মহাসত্যের সঙ্গে: যে,

ভগবানের উপর যে নির্ভর করে ভগবান্ তাকে ফেলেন না। গীতায় আছে, ঠাকুর বলছেন :

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।
অর্থাৎ
অনন্যমনে যারাই আমার পূজা-উপাসনা করে,
তাদের সকল ভারই করি আমি বহন ধরণী 'পরে।

আকাশবৃত্তি নিতে প্রথম দিকে আমি সত্যই ভরসা পাই নি, কারণ যদি কিছু না জোটে এ-ভয় কাটিয়ে উঠতে সময় নিয়েছিল। তবু যে বুক ঠুকে এ-বৃত্তি অবলম্বন করতে পেরেছিলাম সে খানিকটা ইন্দিরার বিশ্বাসে ভর ক'রেই বলব। সে বলল : "ঠাকুরের উপর নির্ভর করলে তিনি ভক্তকে আশ্রয় দেবেন না এ আমি ভাবতেই পারিনা, দাদা! তাছাড়া আমি জানি আমাদের মাথা গুঁজবার স্থানও তিনিই ক'রে দেবেন—যদি আমরা শুধু সাধনার কথাই ভাবি আর সব চিন্তা ছেড়ে।"

হঠাৎ মনে বিপর্যয় জোর এসে গেল। ঠিক করলাম কয়েকটি বই লিখে তো অন্তত কিছু পাওয়া যাবে। তারপর দেখাই যাক না ঠাকুরের প্রতিজ্ঞা সত্য কিনা : "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" ভাবলাম : এই প্রথম দারিদ্র্যের মুখ দেখলাম—ভালোই হ'ল—নৈলে হয়ত নির্ভর কাকে বলে জানতে পারতাম না।

কাউকে সত্যিই ঘুণাক্ষরেও জানাইনি কিছু। কিন্তু আমার মেজমামার কাছে তো আর আমার দুরবস্থার কথা অগোচর ছিল না। তিনি ছুটে হরিদাসবাবুর কাছে গিয়ে খোঁজ নিয়ে লিখলেন আমাকে :

"মণ্টুবাবা, হরিদাসবাবুর কাছে শুনলাম তোর বই বিক্রির আয় এখনো কিছু আছে। কিন্তু মাত্র দুশো টাকায় তোর চলবে কী ক'রে বাবা? তুই কি অভাবের মুখ দেখেছিস কোনোদিন, না হিসেব ক'রে খরচ করেছিস? তোর পকেট খরচই যে ছিল চার পাঁচশো টাকা বাবা, আমি তো সবই জানি। তাই তুই আমার কথা রাখ বাবা, লক্ষ্মীটি!—ইন্দিরা মাকে নিয়ে সোজা আমার কাছে চ'লে আয়। আমি যতদিন আছি তোর কোনো অভাব হবে না। আর যদি আমার কাছে বরাবরের জন্যে থাকতে তোর বাধে তবে আমি তোকে হরিদ্বারে একটি কুটির ক'রে দিই—কারণ শুনলাম তুই সেখানেই একটি আশ্রম করতে চাস। তুই এতে না করিস

নে বাবা। তুই অভাবে কষ্ট পাচ্ছিস ভাবলে যে তোর মামিমার আর আমার মুখে অন্ন রোচে না রে!"

উত্তরে আমি চোখের জল মুছে লিখি: "মামা, আমি স্বভাবে সংশয়ী হ'লেও এ-বিশ্বাস আমার আছে যে ঠাকুর দুঃখ দেন তাঁর উপর নির্ভর শেখাতেই। তাই আমি আকাশবৃত্তি নিয়েছি—আরো পরখ করতে—শাস্ত্রবাক্য সত্য কিনা: যে, তাঁর পায়ে যে ঠাঁই চায় তাকে ঠাকুর ফেলতে পারেন না। তুমি জানো মামা—আমার দোষ ত্রুটি অগুন্তি হ'লেও এক জায়গায় আমার গলদ নেই: যে, আমি সত্যিই ঠাকুরকে চাই—ধন মান সুখ প্রতিষ্ঠা নয়। তাই তুমি ভেবো না, ঠাকুর আমাকে দেখবেনই দেখবেন। হরিদ্বারে তুমি আমার কুটির ক'রে দেবে তোমার এ-প্রস্তাবে আমার চোখে জল এসেছে, কিন্তু ক্ষমা কোরো মামা, এতে আমি মনকে কিছুতেই রাজি করাতে পারছি নে—বিশেষ ক'রে তোমার দুই মেয়ে জামাইয়ের কথা ভেবে। আমি সংসারী না হ'লেও সংসারের সঙ্গে এটুকু পরিচয় আমার আছে যে তুমি আমাকে বিশ ত্রিশ হাজার টাকা দিলে তারা ভাববেই ভাববে যে আমি চেয়ে চিন্তে তোমার কাছে এ-টাকা আদায় ক'রে তাদের প্রাপ্যে ভাগ বসিয়েছি।"

মেজমামা উত্তরে লিখলেন: "তোর চিঠি পেয়ে শুধু আমার বুকেই বাজে নি বাবা, তোর মামিমাও কেঁদে সারা—বললেন: 'মন্টু কি আমাদের ছেলে নয়? তবে একথা ওর মনে ওঠে কী ক'রে?' আরো অনেক কথা বললেন। কিন্তু সে যাক, তুই লক্ষ্মী বাবা আমার, আমি বেঁচে থাকতে অন্যের গলগ্রহ হ'যে থাকিস নে। হরিদ্বারে জমি কিনে একটি কুটির কর যত টাকা লাগে আমি দেব। আমার দুই মেয়েকে আমি দুটি বাড়ি দিয়েছি—তাছাড়া আমার জামাইরাও রোজগেরে—কাজেই তাদের বঞ্চিত করার প্রশ্নই ওঠে না…"

তখন আমি মেজমামাকে লিখলাম: "আমি ইন্দিরার বোনের এখানে ঠিক তার গলগ্রহ হ'য়ে নেই মামা। আমাদের খরচ বাবদ মাসে দুশো টাকা দিই। তাছাড়া তুমি ভেবো না অনর্থক: সার সি পি রামস্বামী—আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য—সেদিন আমাকে নিজে থেকেই লিখেছেন যে আমি সেখানকার আর্ট ডিরেক্টর হ'লে তিনি সুখী হবেন। নিতান্ত যদি না চলে সেই চাকরিই নেব। কিন্তু মামা, যে-মানুষ আকাশবৃত্তি অবলম্বন করেছে ভিক্ষাই তার উপজীব্য, চাকরি নয়। তবে আমার মনে হয়—আমাকে ভিক্ষা ক'রেও অন্নসংস্থান করতে হবে না, টাকা না চাইতেই আসবে, আশ্রমও আমাদের গ'ড়ে উঠবে যথাকালে। তাই

তোমাকে আর মামিমাকে প্রণাম ক'রে বলি—অসুস্থ শরীরে আমাদের জন্যে তোমরা মিথ্যে ভেবো না। তোমরা আমার জন্যে যা করেছ তারোপরে তোমাদের উপর আর চাপ দেওয়া যায় না।"

আমার ও মেজমামার কয়েকটি পত্রের মাত্র এইটুকু চুম্বক দিয়েই এখানে এ-পত্রাধ্যায়ের সমাপ্তি টানি।

এর কিছুদিন পরেই খবর এল—মেজমামিমার হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে। আমি মাদ্রাজ থেকে কলকাতা রওনা হব কী ক'রে ভাবছি—কারণ আকাশবৃত্তি নেওয়ার পরে তো আর কারুর কাছে ট্রেনভাড়া চাওয়া যায় না—এমন সময়ে এক প্রকাশকের কাছ থেকে ৮০০৲ পেলাম। ইন্দিরা বলল হেসে: "দেখলে তো?"

কিন্তু দেখার তো এই সবে সুরু—অতঃপর ঠাকুরের যে-অঘটনঘটনপটীয়সী লীলা দেখলাম অশ্রান্ত পর্যায়ে—কী ক'রে কয়েক বৎসরের মধ্যে নিঃস্ব গ'ড়ে তুলল ঠাকুরের প্রকাণ্ড মন্দির—এখনো লিখবার সময় আসে নি। যদি যোগজীবনের কাহিনী কোনোদিন লিখি তবে বলব কী ভাবে ভক্তাধীন দিনের পর দিন আমাদের তল্পি ব'য়ে এসেছেন।

ইন্দিরাকে নিয়ে কলকাতা রওনা হলাম। উঠলাম এলগিন রোডে আমার বন্ধু ৺রঞ্জন সেনের বাড়ি। রঞ্জন ছিল আমার সহপাঠী। তার দুই কৃতী পুত্র কল্যাণ ও মিলন আমাদের নিঃস্ব জেনেও কী ভক্তিভরেই যে অভ্যর্থনা করল সে-ও ঠাকুরের আর এক লীলা। কারণ কলকাতার আমার কয়েকটি শুভার্থী তাদের কাছে গিয়ে আমাদের সম্বন্ধে বহু অকথা কুকথাই বলেছিল। কিন্তু কল্যাণ ও মিলন তাদের নিন্দুক ব'লে চিনে ধুলোপায়েই বিদায় দিয়ে আমাদের পায়ের ধুলো নিল—এও কি এক কম অঘটন? আমার আর এক প্রিয় বন্ধু তরুণ রায়ও তার চরিত্রবল, বুদ্ধি ও প্রতিভা নিয়ে দাঁড়াল আমাদের পাশে। কিন্তু মেজমামার কথায় ফিরে আসি।

মামিমার মৃত্যুর পরে যখন মেজমামাকে কলকাতায় দেখলাম—তখন ইন্দিরাও চোখের জল রাখতে পারল না। মামা একেবারে ভেঙে পড়েছেন। মামিমাকে তিনি প্রাণাধিক ভালোবাসতেন, চল্লিশ বৎসরের দাম্পত্য জীবনে একদিনের জন্যেও কাছছাড়া করেননি।

মেজমামার শেষডাক আসবার আগে যখন ইন্দিরাকে নিয়ে প্রথমবার তাঁর কাছে যাই তখন তাকে সমাধিস্থ দেখেই তিনি গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে আমাকে বলেন: "শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণের পরে ভাবনায় আমার সত্যিই রাতে ঘুম হ'ত না

বাবা! কেবলই মনে হ'ত—তোর মত নিঃসহায় অপটুকে এখন দেখবে কে? এখন দেখলাম—সাক্ষাৎ মা এসেছেন। তুই যে সত্যিই ভক্ত রে, তাই ভক্তের ভগবান্ তোর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন এমন ভক্তিমতীকে যে শুধু নিখাদ সোনা নয়—রক্ষাকবচও বটে। আমি আর তোর জন্যে ভাবব না বাবা! কারণ আর তোর ভয় নেই!"

মনে পড়ে মামিমার মৃত্যুর পরে শেষবার কলকাতায় ইন্দিরার কাছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তাঁর কান্না, আর তার হাত ধ'রে নিজের মাথায় চেপে ধরা: "ছেলেকে আশীর্বাদ করো মা!"

বৈষয়িক মামার এ কী রূপান্তর—ভক্তের মূর্তি!

তাঁর শেষ পত্রে মেজমামা আমাকে লেখেন—এর কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়—"মাকে আমার কথা বলিস বাবা, বলিস আমাকে আশীর্বাদ করতে। সে আশীর্বাদ করলে আমারো আর ভয় থাকবে না।"

আমার অন্য বিচক্ষণ আত্মীয়েরা সবাই চম্‌কে উঠেছিলেন মেজমামার এ-রূপ দেখে। তার কারণ তাঁরা শুধু যে ইন্দিরাকে চিনতে পারেন নি তাই নয়—মেজমামাকেও চিনতে পারেন নি তাঁর স্বরূপে।

দশ

পিতৃদেবের আরো দু-একটি বন্ধুর কথা না বললেই নয়—যাঁদের প্রভাবে আমার বাল্য ও কৈশোর মন গ'ড়ে উঠেছিল। এঁদের মধ্যে একজন হলেন তাঁর জীবনীকার খ্যাতনামা দানশীল জমিদার কবি দেবকুমার রায়চৌধুরী। নামটি তাঁর ক্ষেত্রে হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল উপাধিই বলব। এমন সুপুরুষ কদাচ দেখা যায়। কেবল আমার মন একটু খুঁৎ খুঁৎ করত তাঁর কেশবিন্যাসের ঘটায়। ডানদিকের কপালে একটি ঘনকৃষ্ণ কুন্তলগুচ্ছ এ-কার ভঙ্গিতে অর্ধকুণ্ডলীকৃত—বাঁদিকে ঠিক অম্‌নি আর একটি অর্থাৎ উল্টো এ-কার—সিমেট্রি বজায় রেখে। এখন, পিতৃদেব ছিলেন যাকে ইংরাজিতে বলে masculine—বাংলায়, পুরুষসিংহ। যা কিছু মেয়েলি, পুরুষের মধ্যে তার ছায়াও তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন: সৌন্দর্যে নারী শ্রেষ্ঠ এ-রটনা সত্যভিত্তিহীন—পুরুষের সৌন্দর্যই হ'ল সেরা সৌন্দর্য। একথায় পিতৃদেবের পুরো সায় না থাকলেও খানিকটা সায় ছিল। তিনি বলতেন: শৈশবে বালক-

বালিকা সমান সুন্দর (মানে সুশ্রী হ'লে অবশ্য), যৌবনে যুবতীর সৌন্দর্য যুবককে হার মানায়, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে পুরুষের সৌন্দর্য দীপ্যমান্ হ'য়ে উঠতে পারে কিন্তু নারীর লাবণ্য ঝ'রে যায়ই যায়। "এহেন পুরুষ"—বলতেন তিনি—"কী দুঃখে মেয়েলি লাবণ্যের অনুকারী হ'য়ে দ-য়ে মজবে! যে যার স্বধর্মে স্বভাবে কায়েম থাক —পরধর্মো ভয়াবহঃ।"

সুতরাং, বুঝতেই পারছেন, দেবকুমারবাবুকে পিতৃদেবের সামনে কেশপ্রসাধনের জৌলুষ জাহির করতে কেন বেশ একটু বিব্রত হ'তে হ'ত? আমার সামনেই পিতৃদেব কতবারই তাঁকে বলেছেন: "উদার ললাটেই পুরুষের প্রতিভা তার ছাপ ফেলতে পারে, ছোট্ট কপাল, চাঁচর কেশ—ও মেয়েদেরই মাধুরী থাক না।" কাকা ঈষৎ রাঙা হ'য়ে উঠে বলতেন: "দ্বিজদা, আমার এই দুর্বলতাটুকু মাফ করতেই হবে নিজগুণে…" ইত্যাদি। এর পরে আর কথা বলা চলে না।

দেবকুমারবাবুকে আমি নাম ধ'রে কাকা বলতাম না। বলতাম শুধু "কাকা"। তিনি ছিলেন যে সত্যিই পিতৃদেবের ছোট ভাই। পিতৃদেবকে তিনি তো ভালোবাসতেন না—করতেন পূজা। সববিষয়েই পিতৃদেবই ছিলেন তাঁর আদর্শ—"হিরো"। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো কথা কেউ বলবামাত্র তিনি হয় রুখে উঠে বলতেন যুদ্ধং দেহি, না হয়—মানে, যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব হ'লে—কানে আঙুল দিয়ে স্থানত্যাগ। পিতৃদেব নানা কারণে শত্রুবৃদ্ধি করেছিলেন—বিশেষ ক'রে স্পষ্টবক্তা হওয়ার দরুন। কাজেই তাঁকে অনেকেই পিছনে নিন্দা করত দাম্ভিক ব'লে। কাকা এতে ব্যথিত হ'য়ে মাঝে মাঝেই তাঁকে বলতেন কাকুতি-মিনতি ক'রে: "দ্বিজদা, সত্যভাষণ মানেই কি যা ভাবি সব ব'লে ফেলা? ট্যাক্ট চাই এ-সংসারে।" পিতৃদেব বলতেন: "মানি—কিন্তু ওখানেও যে উভয়সংকট ভাই। তাই তো 'সুখমৃত্যু' কবিতায় লিখেছি যে—শীলতার অন্য নাম শুভ্র মিথ্যা কথা।" কাকা মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বলতেন: "কিন্তু লোকে যে আপনার বিরুদ্ধে কত কথাই বানিয়ে বলে—" পিতৃদেব বাধা দিয়ে বলতেন হেসে: "জানি হে জানি। তাই না কৃষ্ণ-রাধা সংবাদে লিখেছি—লোকের কথা কোরো না প্রত্যয়, লোকে কী না বলে?" পিতৃদেব প্রায়ই নানা অভিযোগ অনুযোগকে এইভাবে পাশ কাটিয়ে যেতেন নিজেরই নানা উক্তি উদ্ধৃত ক'রে।

পিতৃদেব কাকাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন খানিকটা সেন্টিমেণ্টাল ঢঙেই বলব। কারণ বোধহয় এই যে পিতৃদেবের বন্ধুপরিষদে সেন্টিমেন্টে সাড়া দেবার প্রতিভায় কাকার জুড়ি ছিল না। একটিমাত্র উদাহরণ দেই।

মাতৃদেবীর অকালমৃত্যুর পরে পিতৃদেবের নানা আত্মীয়বন্ধুহিতৈষী তাঁকে পুনর্বিবাহ করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতেন একথা অন্যত্র বলেছি। একবার অনেকের উপরোধে কাকাও তাঁকে অনুরোধ ক'রে বসেন। উত্তরে পিতৃদেব বিরক্ত হ'য়ে তাঁকে বলেন : "এমন কথা যদি তুমি ফের মুখাগ্রেও আনো তবে আমি তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ ক'রে দেব।" উত্তরে কাকা তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে লেখেন যে তিনি খানিকটা বাধ্য হ'য়েই অমন কথা লিখেছিলেন, যেহেতু তাঁর নিজের মত : "বিবাহ আবার কবার হয় ?" উত্তরে পিতৃদেব উজিয়ে উঠে লেখেন : "আমি আবার বিবাহ করব ? যে-আমি আমার মানসমন্দিরে আজো সেই স্বর্ণপ্রতিমার পূজারতি ক'রে থাকি ?···দ্বিতীয়দার বিবাহ প্রেমও নহে, পরিণয়ও নহে—সে শুধু কায়ের প্রশ্রয়। কামপরিণয় সমাজের দিক থেকে অবস্থাবিশেষে সমর্থিত হ'লেও হৃদয় তাতে বাধা দেয়। সমাজকে জীবনে অনেক ঠকিয়েছি, কিন্তু নিজেকে—হৃদয়কে—ঠকিয়ে কেমন ক'রে বাঁচব ভাই ? 'বিয়ে আবার কবার হয়'—এ তোমার লাখ কথার এক কথা।" (দ্বিজেন্দ্রলাল—৩০৯-১১ পৃঃ)

কাকা পিতৃদেবকে এত গভীরভাবে ভালোবাসতেন যে তাঁর নিজের পুত্রকন্যা থাকা সত্ত্বেও পিতৃদেবের মৃত্যুর পরে আমার ও মায়ার ভার নিতে চেয়েছিলেন। আমার মাতামহ ও মেজমামা আমার অভিভাবক হয়েছেন জেনেও তিনি মনে স্বস্তি পান নি—ভাবতেন থিয়েটার রোডের অসাহিত্যিক ধনসম্পদের আবহে আমি সুখী হব না হয়ত। তাই একদিন আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন সাশ্রুনেত্রে : "মণ্টু, তুমি যদি তোমার দাদামহাশয়ের থিয়েটার রোডের বাড়িতে একটুও দুঃখ পাও তবে সোজা আমার কাছে চ'লে এসো—দ্বিজদার আত্মা তাতে সুখী বৈ অসুখী হবে না। কারণ একথা আমি বড় গলা ক'রেই বলতে পারি যে, তাঁরা শ্বশুরই হোন্ বা শ্যালকই হোন্—আমার মতন দ্বিজদাকে কেউ ভালোবাসে নি—কাজেই চেনেও নি।"

আমি আর্দ্রকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলাম যে, তাঁর সাদর নিমন্ত্রণ আমি ভুলব না, কিন্তু থিয়েটার রোডে আমার দাদামহাশয়ের স্নেহনিলয়ে আমাকে সবাই গভীর স্নেহ করেন, তাই তাঁদের মনে কষ্ট দিয়ে আমি আর কোথাও যেতে পারব না।

এ-কথালাপের একটু রিপোর্ট দিলাম খানিকটা আভাস দিতে—পিতৃদেব কাকার বুকের কতখানি স্থান জুড়ে ব'সেছিলেন তাঁর অসামান্য স্নেহশক্তির জোরে।

আজ ছেলেবেলাকার নানা অবিস্মরণীয় স্মৃতি নিয়ে যখন রোমন্থন করি তখন একটা কথা প্রায়ই আমার মনে হয় : যে, বন্ধুবৎসলতাও একটা প্রতিভা—মানে

যে পারে সে আপনি পারে। আমরা কথায় কথায় বলি : অমুক আমার বন্ধু। বলতে বলতে ভুলে যাই যে যথার্থ বন্ধু হ'তে যে সে পারে না।

বন্ধু সে-ই যে বন্ধুর দুর্দিনেও তাকে স্নেহের বর্ম দিয়ে ঘিরে রাখতে চায়। আজকালকার যুগ ঠিক বন্ধুত্বের অনুকূল নয়। এ-যুগকে বলা যেতে পারে মনঃশীলতার যুগ, গবেষণার যুগ, গতির যুগ, বিশ্বমানবের পরস্পরের কাছে আসার যুগ। এককথায়, মানুষ যেন এযুগে সব কিছুকেই ঢেলে সাজাতে যাচ্ছে—খানিকটা, ঐতিহ্যকে বরখাস্ত ক'রে না হোক—যেন নানা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নিজেকে নতুন ক'রে পেতে চেয়েই। এ-প্রবণতার মধ্যে ভালোও আছে মন্দও আছে। ভালো এইটুকু যে মানুষ তার চিরচেনা গণ্ডির মধ্যে থাকতে চাইছে না, অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইছে—অচেনারা এগিয়ে আসতে চাইছে পরিচয়ের কোঠায়। কিন্তু অন্যদিকে মানুষ খানিকটা হারাচ্ছে না কি তার প্রীতির গভীরতা, বন্ধুত্বের নিবিড় আনন্দ, শ্রদ্ধার শান্তি, ভক্তির ভাবাবেগ? আজকাল জোর ক'রে কিছু বলতে ভরসা পাই না, কেন না এ-যুগে পরিবর্তন ঘটছে এত দ্রুতগতিতে যে তার ফলে খতিয়ে লাভের কোঠার সঙ্গে লোকসানের কোঠায় মিলিয়ে দেখার হয়ত সময় আসে নি। তবে যে-কথাটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম সেটা এই যে মানুষ এ-যুগে—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—

All sides he sees and turns to every call,
He has no certain light by which to walk.

কিনা

চারিদিকে দৃষ্টি তার—প্রতি ডাকে চায় দিতে সাড়া,
নাই ধ্রুবালোক তার গতিপথে দিতে সুনির্দেশ।

ফলে কী হয়েছে? না, তার নীড় ভেঙে যাচ্ছে—পারিবারিক, সামাজিক, বান্ধবিক। তাই পিতৃদেবের মতন বন্ধুবৎসলতা সে-সময়ে—মানে পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগে—যতটা সুলভ ছিল আজ আর ততটা সুলভ নেই। থাকতে পারে না, কেন না বন্ধুবৎসলতার মূল রসদদার হৃদয়বৃত্তি আর হৃদয়বৃত্তি অনুশীলনের অপেক্ষা না রেখে পারে না। তাই এযুগ দেশবন্ধু রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের মতন মানুষের বিকাশের অনুকূল ব'লে মনে হয় না। এ-যুগে নানা আবিষ্কার চমক ও আলোড়নের সংঘাতে হৃদয় তার গাঢ়তার ভারকেন্দ্র থেকে খানিকটা যেন চ্যুত হয়ে পড়ছে। সম্ভবত এ-যুগের এই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য ক'রেই শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের মতন মনস্বী পিতৃদেবের লোকান্তরের পরে কাকাকে লিখেছিলেন : "তার তুল্য বন্ধু এযুগে বোধহয় আর জন্মাইবে না। বন্ধুদের কাছে সে আপনাকে একেবারেই বিনামূল্যে বিকাইয়া দিয়াছিল। তার গৃহ আমাদের জুড়াইবার স্থান ছিল, তার হৃদয় আমাদের বিলাসের কাম্য কানন ছিল। সে যে কী ছিল তা শুধু আমরাই জানি।" (দ্বিজেন্দ্রলাল)

"বিলাসের কাম্য কানন" কথাটির ভাষ্য এই যে আমাদের সুরধামে পিতৃদেবের নানা বন্ধুই যখন তখন এসে হাজির হতেন সত্যিই তাঁর স্নেহ ও হাসির সংস্পর্শে জুড়াতে। এঁদের মধ্যে গ্রহীতাই ছিল বেশি, কিন্তু দাতাও ছিলেন কয়েকজন, মানে যাঁরা আনন্দের আবহকে গ'ড়ে তুলতেন উচ্ছল কথালাপে ও রসিকতায়। এঁদের মধ্যে দুজনের কথা খুব বেশি মনে পড়ে আজ : শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও "সাহিত্য" পত্রিকার সম্পাদক খ্যাতনামা শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি। এঁরা উভয়ে যখন পিতৃদেবের আলাপ-পরিধির মধ্যে চা খেতে খেতে ব্যঙ্গবিদ্রূপের তুফান তুলতেন তখন সভায় যেন একটা হাসি ও আনন্দের কল্লোল ফেটে পড়ত। পরের জীবনে বার্ণার্ড শ ও চেস্টারটনের উক্তিপ্রত্যুক্তির কাহিনী পড়বার সময়ে পিতৃদেবের এ-দুই রসিক তথা মনীষী বন্ধুর কথা মনে পড়ত। দুঃখের বিষয় তাঁদের কথালাপের তীরন্দাজির রিপোর্ট লিখে রাখি নি। তবু একটু আভাষ দিতে চেষ্টা করব একদিনের দৃষ্টান্ত দিয়ে।

একদিন পাঁচকড়িবাবু ও সুরেশবাবু পরস্পরকে নিয়ে হাসিহাসি করছেন এমন সময়ে পাঁচকড়িবাবু বললেন : "জানো দ্বিজু, সুরেশের লাইব্রেরির কথা ?"

পিতৃদেব : লাইব্রেরি ? সুরেশের ?

পাঁচকড়িবাবু : একেবারে জলজ্যান্ত—যাকে বলে flourishing ! শেল্‌ফের পরে শেল্‌ফ, আলমারির পরে আলমারি—এক গঙ্গা বই ! আর প্রতি আলমারির মাথায় বড় বড় হরফে নোটিস লেখা : দয়া ক'রে কেউ কোনো বই ধার চাইবেন না—ইতি অক্ষম। সুরেশ বড় সোজা লোক নয় দ্বিজু, যার সাহেবি অনুবাদ হল : he is not a straight man, বুঝলে না ?

আমি (সবিস্ময়ে) : সে কি ? সুরেশবাবু কেন এমন নোটিস জারি করলেন ?

পাঁচকড়িবাবু (মৃদুস্বরে) : বোলো না বাবা, কাউকে ! কারণ সুরেশ ওর লাইব্রেরিটি গ'ড়ে তুলেছে লোকের কাছে বই ধার ক'রে এনেই কি না।

পিতৃদেব (সকলের হাস্যধ্বনিকে তাঁর অট্টহাস্যে ছাপিয়ে হাততালি দিয়ে) : সাবাস ! ক্লাসিক !

সুরেশবাবু: তবে আমিও বলি আরো ক্লাসিক কাণ্ড—পাঁচকড়িবাবুর। জানেন তো পাঁচকড়িবাবু তাঁর কাগজে ঠোকেন সবাইকে অপত্যনির্বিশেষে! সম্প্রতি ওঁর নেকনজর পড়েছে ছুজনের উপরে: রবিবাবু ও আশুবাবু—হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইস চান্সেলার। আমি একটা কাজে তাঁর কাছে যেতেই পাঁচকড়িবাবুর কথা উঠল। তাতে কথায় কথায় আশুবাবু কী বললেন শুনবেন?

পিতৃদেব (সহাস্যে): বাঃ, শুনব না?

সুরেশবাবু: আশুবাবু বললেন—"সম্প্রতি পাঁচকড়ি রবিবাবুকেও খুব এক হাত নিয়েছে তার কাগজে, পড়েছেন নিশ্চয়ই? আমি একটু গরম হ'য়েই রবিবাবুকে গিয়ে বললাম: "রবিবাবু, পাঁচকড়িকে নিয়ে তো আর পারা যায় না। যা তা লিখছে আপনার ও আমার সম্বন্ধে। লাইবেলের চার্জ এনে ওকে না ফাঁসালে আর চলে না। কী বলেন আপনি?' তাতে রবিবাবু মুচকে হেসে বললেন: 'সে কি আশুবাবু? পাঁচকড়িবাবুর নামে লাইবেলের চার্জ?' আমি বললাম: 'নৈলে ওর মুখ বন্ধ করি কী ক'রে?' রবিবাবু বললেন: 'আহা, ওঁর কথার কী মূল্য আছে বলুন তো যে ওঁর মুখ বন্ধ না করলেই নয়? ভাবুন, ওঁর যিনি সাক্ষাৎ জন্মদাতা—কিনা যিনি ওঁকে সবচেয়ে বেশি চিনতেন—তিনি ওঁর নামকরণ করার সময় ওঁর পাঁচকড়ির বেশি মূল্য ধার্য করেন নি।' হো হো হা!

পাঁচকড়িবাবু: হা হা হা! নিয়েছ বটে একহাত সুরেশ—ওস্তাদের মার শেষ রাতে, বলে না? এসো ভায়া, বুকে এসো।

অথ উভয়ের বক্ষাবক্ষি, যবনিকা-পতন।

বাদপ্রতিবাদটা একটু রং চং দিয়ে বললাম আর্টের খাতিরে। কিন্তু তা ব'লে নক্সাটি কাল্পনিক ঠাউরে বসবেন না যেন, কারণ আমাদের সুরধামে এ-জাতীয় কবির লড়াই প্রায়ই বাধত।

সুরেশবাবুর রসিকতার আর একটি নমুনা:

তখন পিতৃদেব চাকরি থেকে অবসর নিয়ে সুরধামের নিচের তলায় তাঁর বিখ্যাত ইভনিং ক্লাবের পত্তন করেছেন, উপরের তলায় থাকি আমরা—মানে পিতৃদেব, মায়া, আ[illegible]। তাই এ[illegible]জেঠতুত ভাই শচীন ও তার বড় বোন নসিদিদি। রামভরস ব'লে এ[illegible]র ভোজপুরী ছিল ইভনিং ক্লাবের তদারকে বাহাল। একদিন বিকেল[illegible]ক সুরেশবাবু এসে রামভরসকে বললেন বাজার থেকে আট আনার ছানার মুড়কি কিনে আনতে। রামভরস বেরিয়ে যাবার একটু পরেই পিতৃদেব

দোতলা থেকে আমার সঙ্গে নিচে নেমে দেখেন—সুরেশবাবু। "এ কী? সুরেশ?—অসময়ে?" তিনি বললেন: "এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম দ্বিজদা, ভাবলাম সন্ধ্যার আর কতই বা দেরি, ইভনিং ক্লাবে গিয়ে একটু জুড়োই। রামভরস ছিল হাজির, তাকে বাজারে পাঠিয়েছি আট আনার ছানার মুড়কি কিনে আনতে। মানে ক্ষুধার্ত আর কি, বুঝলেন না?"

পিতৃদেব: ক্ষুধার্ত? তা আমাকে খবর দিলে না কেন? গরম লুচি ভাজিয়ে দিতাম!

সুরেশবাবু: আপনি উপরে হয়ত বিশ্রাম করছিলেন—তাছাড়া আপনি তো মাত্র কর্তা—গিন্নি না থাকলে যিনি ঠুঁটো—বলে না: গৃহিণী গৃহমুচ্যতে?

এমনি সময়ে রামভরসের প্রবেশ।

সুরেশবাবু (ছানার মুড়কি মুখে দিয়েই): দ্বিজদা! করেছেন কী? কাকে বাহাল করছেন কিংকর? ও যে ঘটোৎকচ!

আমি (হেসে): সে কি? ঘটোৎকচ তো রাক্ষস—

সুরেশবাবু: অমন কথা বলে? বলো—কামচারী—যে উড়ে যেতে পারে।

রামভরস (হতবুদ্ধি): কী হয়েছে বাবু?

সুরেশবাবু: আর কী হয়েছে? কী কাণ্ড তুমি করেছ বলো তো? তোমাকে বললাম পাশের দোকান থেকে দুটো ছানার মুড়কি আনতে—তুমি উড়ে গেলে কিনা সটান বৃটিশ ম্যুসিয়মে? এ যে মান্ধাতার আমলের চীজ, বাবা!

পিতৃদেব (হো হো ক'রে হেসে, আমাকে): যা, তোর নসিদিকে বল গরম লুচি ভাজতে—আর হ্যাঁ হ্যাঁ, আলুর দম, বুঝলি? আমিও খাব।

এইরকম বে-বন্দোবস্তের সরগরম গৃহস্থালি ছিল আমাদের। পাঁচকড়িবাবু মিথ্যা বলেননি: পিতৃদেবের সুরধাম ছিল তাঁর বন্ধুদের শান্তিপান্থশালা—যে যখন খুশি আসবে ও চা জলযোগ ক'রে খুশি হয়ে ফিরবে। এইজন্যে সুরধামকে আমার পিতৃবন্ধুরা নাম দিয়েছিলেন আনন্দধাম—যেখানকার মূলসূত্র পিতৃদেব বেঁধে দিয়েছিলেন তাঁর "পূর্ণিমামিলন" হাসির গানে:

> সাহিত্যিক সব ছোট বড় এই খানেতে হ'য়ে জড়ো
> আনন্দে আর ভ্রাতৃভাবে করতে হবে কালহরণ······
> ধনী গরিব বড় ছোট সবার হেথায় একাসন।

শ্রীঅরবিন্দের কাছে পরে শুনেছিলাম যে সৃষ্টির আলো অন্তরে জ্বললে সে

বাইরের পরিবেশকে নিজের মতন ক'রে গ'ড়ে তোলবার শক্তি তেমনি সহজে আহরণ করে যেমন সহজে মাটির তলাকার বীজ তার রসদ আহরণ করে অন্ধ ভূগর্ভের নানা স্তর থেকে। পিতৃদেব সবাইকেই ডাক দিতেন সহজ প্রীতির আকর্ষণে, আর নিজের রসসৃষ্টির স্বাভাবিক শক্তিবলে অপরের মনের মধ্যেকার রসসৃষ্টির শক্তি জাগিয়ে তুলতেন। এই জাগরণটাই আনত আনন্দের সাড়া যার ফলে সুরধাম আনন্দধাম উপাধি অর্জন করতে পেরেছিল। একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিই।

খ্যাতনামা মনস্বী জজ শ্রীবরদাচরণ মিত্র পিতৃদেবের আন্তরিক ভক্ত ছিলেন। একবার পিতৃদেবের আসরে এসে কাকাকে যা বলেছিলেন তাঁর ভাষায়ই বলি (দ্বিজেন্দ্রলাল ৪০৫ পৃষ্ঠা) ঃ

"একপ্রহরকাল সেখানকার (আনন্দধাম সুরধামের) নিত্যনৈমিত্তিক হাস্যকৌতুক, সাহিত্যিক বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক ও সঙ্গীতাদির পরে উঠিয়া যাইবার সময় বরদাবাবু আমাদের বলিয়াছিলেন ঃ 'হিংসা হয় মশায়। সাধ যায় এ-চাকরি ছেড়ে দিয়ে আপনাদের দলে ভিড়ি। আপনারা কী সুখেই আছেন! দ্বিজবাবুর এ-আনন্দধামে আমি মাসে মাসে যদি অন্তত দশটা দিনও এসে এক একবার ব'সে যেতে পারতাম তো আমার জীবনীশক্তি নিশ্চয় দুগুণ বেড়ে যেত।"

পিতৃদেবের এই বন্ধুবৎসলতার ছোঁয়াচ আমার শৈশব মনে লেগেছিল ব'লেই উত্তর জীবনে দেশে বিদেশে বন্ধুদের সখ্য প্রীতিকে আমি এত আদরণীয় ব'লে মনে করতে শিখেছিলাম ও তাঁদের প্রীতিরসে দিনে দিনে সরস হ'য়ে উঠতে পেরেছিলাম। আর বন্ধুত্ব সম্বন্ধে এই যে মূল্যজ্ঞান আমার বালক মনে এত সহজে জেগে উঠতে পেরেছিল—তার কারণ বাল্যকালেই পিতৃদেবের বন্ধুবৎসলতার শক্তি আমার মন টেনেছিল—দিনে দিনে, মাসে মাসে, তিলে তিলে। তাই তো উত্তর কালে পণ্ডিচেরির গুরুগম্ভীর আশ্রমে গিয়েও আমি হাস্যবিমুখ হ'তে পারিনি—সেখানকার অনেক গম্ভীরাত্মার মুখের ঘনঘটা দেখে যতই প্রতিহত হতাম ততই জপতাম ঃ এ আমার স্বধর্ম নয়। কিন্তু সামাজিকতায় যতই আসর জমিয়ে নাম করি না কেন, পিতৃদেবের আসর-জমাবার যে অফুরন্ত শক্তি ছেলেবেলায় চাক্ষুষ করেছিলাম তার স্মৃতি মনে পড়লেই টের পেতাম কেন তাঁর সামাজিক প্রতিভার সঙ্গে তুলনায় আমার মেলামেশার সহজপটুতার দীপ্তি বামন না হোক কনিষ্ঠ। এর কারণ—সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর দরাজ প্রাণশক্তি ছিল প্রতিভারই সামিল যার সঙ্গে কেবল প্রতিভাই কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে। প্রাণশক্তির একটা বিশেষ স্ফুরণে সে কেমন ক'রে প্রতিভার আলোয়

ঝলকে ওঠে তার প্রমাণ অনেকেই সে-যুগে পেয়েছিল "ডাকাতে ক্লাবে" তাঁর ক্লান্তিহীন রসদ জোগানোর দৃশ্যে! তাই বলি একটু এ-ক্লাবের কথা।

আমার বাল্যকালে প্রায়ই "ডাকাতে ক্লাবের" গল্প শুনতাম আমার নানান পিতৃবন্ধুর মুখে। এ-সম্পর্কে শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতির বিবৃতিটি উদ্ধৃত করবার ম'ত:

"ডাকাতে ক্লাবটা সে-সময়ে সামাজিক মেলামেশার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। দ্বিজুবাবুকেই এর প্রথম সভাপতি হতে বলা হয়, কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ ব'লে তিনি সে-সম্মানটি শ্যাম মিত্র মহাশয়কে প্রদান ক'রে সকলের অনুরোধ এড়াতে না পেরে অগত্যা নিজে সহকারী সভাপতি হন। প্রতি রবিবারে ক্লাবে সকলেই জমায়েৎ হতেন। 'ডাকাতে'-রা সকাল বেলা থেকেই ক্লাবে সমবেত হয়ে সারাটা দিন একত্র কাটাতেন। পরে কখনো নৈশভোজনের ব্যবস্থা হ'ত। তখন তাঁরা অনেক রাত্রি অবধি গান গল্প আবৃত্তি তর্কবিতর্কে কাটিয়ে রাতদুপুরে আড্ডার সমাপ্তি টানতেন। মাঝে মাঝে তাঁদের কাউকে নোটিস জারি করা হ'ত—'অমুক দিন তোমার বাড়িতে ডাকাতি হবে।' সর্বপ্রথম গগন ঠাকুর মহাশয়কে এই চিঠি দেওয়া হয়।...সে-পার্টিটা খুব জাঁকালো রকমের হয়েছিল ও সেখানে রবিবাবুর চার পাঁচটি গান—যা এখন খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—প্রথম গীত হয়। হায়, সে-সব কী দিনই গেছে!" (দ্বিজেন্দ্রলাল ২৫৯ পৃষ্ঠা)

ডাকাতে ক্লাবের বিবরণ পরে—আমার যৌবনে—আরো শুনি কবি ও সুরকার শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেনের মুখে—যখন তাঁর গানের প্রচারে আমি অগ্রণী হ'য়ে নানা প্রবন্ধাদি লিখে ও বক্তৃতা দিয়ে সুরকার হিসাবে তাঁকে তাঁর প্রকাশ্য মর্যাদা দিতে ব্রতী হয়েছি। তখন আমি লক্ষ্ণৌয়ে তাঁর সুরম্য নিলয়ে অতিথি। একদিন অতুলদা বললেন: "জানো দিলীপ, ডাকাতে ক্লাবে—উঃ সে কী হল্লাই করতাম আমরা—যাকে বলে dare-devils। একদিন হ'ল কি, তোমার বাবার উর্বরমস্তিষ্কে খেয়াল গজালো—সারারাত সভা বসাতে হবে, দেখি কে জেতে। রবিবাবু সে-দিন সভাপতি হ'লেন বাধ্য হয়ে। কী করেন বলো, তোমার বাবা তো সহজ নাছোড়বান্দা ছিলেন না।

"রাত তিনটে পর্যন্ত রবিবাবু আমাদের গানে গল্পে আবৃত্তিতে মজিয়ে রাখলেন। কিন্তু তারপর করজোড়ে বললেন: 'এবার আমাকে মাফ করতেই হবে—দ্বিজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কে পেরে উঠবে? আমি বাড়ি যাই, চোখদুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছে। এহেন আসরে এক রঙিন দ্বিজেন্দ্রবাবুই সভাপতির সঙিন দায়িত্ব বহন করার যোগ্য।'

"তোমার বাবা 'জো হুকুম' ব'লে সভাপতির আদেশ শিরোধার্য ক'রে এগিয়ে এলেন ও রবিবাবুর প্রস্থানের পরে একাই একশো হ'য়ে কখনো গান কখনো গল্প কখনো আষাঢ়ের কবিতা আবৃত্তি ক'রে চললেন। তাঁর একটা পিঠ পিঠ জবাব কোনোদিন ভুলব না। তাঁর 'কর্ণবিমর্দন কাহিনী' তিনি পজ্‌ঝটিকা ছন্দে লিখেছিলেন জানো নিশ্চয়ই। তাতে একটি শ্লোক ছিল :

চাপকান্ পরিয়া আপিস নিত্য
আসি হি পুরুষানুক্রম ভৃত্য।

তিনি এ-কাহিনীটি আবৃত্তি ক'রে আমাদের চিত্ত জয় ক'রে থামতেই আমি বললাম : 'দ্বিজদা, সব তো বুঝলাম কিন্তু বাংলায় ঐ আসি হি-র হি এল কোত্থেকে ?' তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন—ওটা নিশ্চয়াত্মক অব্যয়। হা হা হা। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের এমন নির্জলা রূপ আমি আর দেখি নি দিলীপ, সত্যি বলছি।"

আমি (হেসে) : তারপর ?

অতুলদা : তারপর আর কী? চলল সভা—রাতভোর। যখন সূর্যদেব উঠলেন তখন দেখা গেল কোচে, ফরাসে, সোফায় চার পাঁচজন অঘোর নিদ্রায় হোরাইজিণ্টাল, কেবল তোমার বাবা, নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়, সুরেশ-বাবু ও আমি পার্পেণ্ডিকুলার—অবিষণ্ণ। হ্যাঁ, তখন কী হ'ল জানো ? তোমার বাবা বললেন : "এবার চলো অতুল, আমার বাড়ি—আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে সাক্ষী দেবে যে রাতটা আমি ডাকাতে ক্লাবেই কাটিয়েছি, আর কোথাও নয়। দিলীপ, একথার যে কী নিহিতার্থ বুঝবে কেবল সেদিন যেদিন বিয়ে করবে—হাঃ হাঃ হাঃ।"

এ আমি একটুও বাড়িয়ে বলি নি, বিশ্বাস করুন। সত্যিই এমনি ছিল পিতৃদেবের অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও সর্বংসহ স্বাস্থ্য। আমি তাঁকে একদিনও শয্যাশায়ী দেখি নি। এখন বলুন—তাঁর দহরম মহরম করার অবিশ্বাস্য ক্ষমতাকে প্রতিভা উপাধি দিলে অত্যুক্তি হয় কি ?

প্রাণেই প্রাণ জাগে। তাই আমার জীবনে মানুষের প্রীতির রাখী ও স্নেহের আদানপ্রদান চিরদিনই একটা খুব বড় স্থান অধিকার ক'রে এসেছে। পণ্ডিচেরির যোগাশ্রম নিয়ে গুরুদেবের কাছে প্রায়ই লৈপিক অনুযোগ পেশ করতাম : "আপনার আশ্রমে এসে দেখি গুরুভাইরা প্রায় সবাই শুধু যে হাসতে ভুলে গেছেন তাই নয়, মনে করতে সুরু করেছেন যে হাসি আত্মার অনাত্মীয়।" ভাগ্যক্রমে গুরুদেব চিঠিতে নিত্যনতুন রসিকতা করতেন আমার সঙ্গে, নৈলে সেখানে পঁচিশ বৎসর তো দূরের

কথা পঁচিশ দিনও টি ঁকতে পারতাম কি না সন্দেহ। কিন্তু ফিরে আসি পিতৃদেবের বন্ধুবৎসলতার প্রসঙ্গে।

জীবনে বন্ধু কার বাঞ্ছিত নয়—বিশেষ ক'রে প্রাক্‌বিবাহ কৈশোরে তথা যৌবনে—যখন মানুষ তার সামাজিক জীবনে সবচেয়ে বেশি রস আহরণ করে তার বন্ধুদের স্নেহসঙ্গ থেকে? আমার বাল্যজীবনে পিতৃদেবের পরেই আমার বন্ধু গুরু দিশারি ছিলেন নির্মলদা—যাঁর কথা অন্যত্র বলেছি। পরে কৈশোরে আমার যে কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু লাভ হয় তাদের মধ্যে সুভাষের স্থান ছিল সবার উপরে। তার কথা বলব যথাস্থানে—আমার কৈশোর-যৌবন স্মৃতিচারণে। উপস্থিত এ-অধ্যায়টি শেষ করি।

বলছিলাম, কৈশোরে ও যৌবনে মানুষের প্রীতি প্রণয় আবেগ উচ্ছ্বাসের ভারকেন্দ্র ন্যস্ত হয় বন্ধুবান্ধবের 'পরে। অর্থাৎ সখা সুহৃৎ মিত্র বন্ধু—এদের কাছ থেকেই আমরা কৈশোরে তথা যৌবনে সবচেয়ে বেশি রসের রসদ আহরণ ক'রে থাকি। তারপরে বিবাহ ক'রে সংসারে ঢুকে জড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের প্রাণের ভারকেন্দ্র ভর করে পারিবারিকতায় ও কর্মজীবনে। এসময়েও বন্ধুরা আমাদেরকে অনেক আনন্দই দিয়ে থাকেন বটে—তাঁদের প্রীতির সহজ সরল সমর্থনে। বস্তুত বন্ধুবান্ধবের দান ও গ্রহণ বিনা কোনো সারবান্ মানুষেরই পারিবারিক জীবন সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে না একথা কে না মানবে? কিন্তু এ-সব মেনে নিয়েও তবু বলব যে বিবাহের পরে খুব কম মানুষের কাছেই বন্ধুদের প্রীতি সখ্য সহযোগের সে-মূল্য থাকে যা প্রাক্‌বিবাহ যুগে ছিল।

কিন্তু পিতৃদেব শুধু যে নানা দিক দিয়েই একটি অনন্যতন্ত্র মানুষ ছিলেন তাই নয়, মাতৃদেবীর মৃত্যুর পর থেকে তিনি যেন পুনরায় বন্ধুদের পানে উজাড় ক'রে দিতে ছুটেছিলেন তাঁর স্নেহ প্রীতি সৌহার্দ্য যা তাঁর পারিবারিক জীবনকে ছাপিয়ে উঠত। তাছাড়া বিপত্নীক হওয়ার পরে তাঁর স্নেহপ্রবণ হৃদয়বৃত্তি পারিবারিক জীবনের চৌহদ্দি কেটে বেরিয়ে পড়েছিল —খানিকটা উদাসীন ছন্দেই বলব। এ-সম্পর্কে আর একটি কথা আজকাল আমার খুব বেশি ক'রেই মনে হয়: যে, যাঁরা দিলদরিয়া প্রাণ নিয়ে জন্মান তাঁরা সবাই একটি গভীর সত্য যেন খানিকটা চাক্ষুষ ক'রে থাকেন তাঁদের সহজবোধের দৃষ্টিলোকে: যে, মানুষের মনুষ্যত্ব সার্থক হয় তার দানের প্রবৃত্তিতে, হাতিয়ে নেবার প্রবৃত্তিতে নয়। হাতাতে চাই আমরা খানিকটা মোহবশেই বলব, কেন না একথা বোধ হয় কেউই অস্বীকার করবেন না যে আমরা অনেক কিছুই চাই

অজ্ঞানের ফেরে পড়েই। তাইতো একটু জ্ঞান হ'তে না হ'তে আমরা দেখতে পাইই পাই যে অনেক কিছুই আমরা সত্যিই চাই না—শুধু বাইরের হাজারো ডামাডোলের প্ররোচনায় ভেবে বসি যে চাই। তাই যখন তা পাই দেখি যে অন্তরের কোনো গভীর তৃষ্ণাই তাতে ক'রে মেটে না, ফলে আসে হতাশা, স্বপ্নভঙ্গ, সিনিসিস্‌ম্‌। কিন্তু মোহবশে যা চাই, মোহভঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি তাকে আর প্রশ্রয় না দিতাম তবে ভুল-চাওয়ার বেদনাদীক্ষার ফলে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হ'ত। য়ুরোপের অনেক বস্তুতান্ত্রিক মনীষীরাও একথা আজ বুঝবার কিনারায় এসেছেন যে-কথা আমাদের ঋষিরা বুঝতে পেরেছিলেন সে কবে: "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্‌?"—যে-বস্তু অমৃত উপলব্ধি এনে না দেয় কী করব তাকে নিয়ে? য়ুরোপের মনীষীরা স্বভাব-বৈরাগী এমন কথা বলছি না অবশ্য, অমৃত বলতে আমরা কী বুঝি সে নিয়েও বিশেষ মাথা ঘামান না তাঁরা; কিন্তু একটা কথা তাঁরা বুঝবার কিনারায় এসেছেন আজ: যে, কাড়াকাড়ি ক'রে বরণীয় কোনো বরকেই আয়ত্ত করা যায় না, তাই এ-যুগে তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো বিচক্ষণ ভাবুক বলা সুরু করেছেন যে, ছোট মুখে ছোট আরামে ছোট চাওয়ায় শুধু অতৃপ্তিই সার কেন না জীবন সার্থক হয় সৃষ্টিতে—সঞ্চয়ে নয়: man can be fulfilled only through his creative impulses, mere acquisition can never bring lasting happiness—এই হ'ল এ যুগের শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের একটি মস্ত আবিষ্কার।

মহাপ্রাণ মনীষীরা জীবনকে দেখেন খানিকটা এই স্রষ্টা প্রাণ বা হৃদয়ের চোখে—মন-বুদ্ধি-বিচারের চোখে নয়। তাই তাঁরা এই সত্যটিকে বুদ্ধিমন্তদের অনেক আগেই চাক্ষুষ করেন যে, দানে যে অপার সুখ গ্রহণে তার ভগ্নাংশও উপচিত হয় না; বাইবেলের ভাষায়, it is more blessed to give than to receive. পিতৃদেবের সংস্পর্শ তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছে এত বেশি কাম্য ছিল এই জন্যেই যে তাঁর মধ্যে দিয়ে লোকে এই আশ্চর্য সত্যটিকে প্রত্যক্ষ করত যে, একটি মানুষ সংসারের হাজারো দৈনন্দিন মালিন্যের মধ্যে বাস ক'রেও নিজেকে বিলিয়ে এমন নির্মল হ'য়ে ফুটে উঠতে পারে শুধু তার প্রাণের সহজ সৃষ্টিশক্তির গুণে—গানে, গল্পে, হাস্যে, আলাপে, অনাবিল স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধুবাৎসল্যে। আমার মাতৃদেবীর মৃত্যুর পর থেকে পিতৃদেবের জীবনের গতি উধাও হয়ে ছুটে চলেছিল দুটি মূল ধারায়: সাহিত্যসৃষ্টি ও স্নেহপ্রীতির উচ্ছ্বাস। মাতৃহারা শিশু তো কতই আছে, কিন্তু কয়টা পিতা তাদের কাছে একাধারে পিতামাতা হ'য়ে উঠে তাদের ভুলিয়ে

দিতে পারেন মায়ের অভাব! এ যে তিনি পেরেছিলেন তার প্রমাণ হিসেবে আমি অকুণ্ঠে নিজেকে পেশ করতে পারি। সময়ে সময়ে মা-র অপরূপ সুন্দর স্নেহ-কোমল মুখ ও আয়ত চোখ দুটি আমার মনে পড়ত বটে—মনে পড়ত কী মিষ্টি গুঞ্জনস্বরে তিনি আমাকে কোলে টেনে নিয়ে ঘুম পাড়াতেন পিতৃদেবের ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে—যে-গানটি পরে আমার মামিমা মাসিমারাও গাইতেন :

আয় রে আমার সুধার কণা, আয় রে ননীর ছবি!
আয় রে নিশার সোনার চাঁদ, আয় রে উষার রবি!
উড়ে উড়ে বনে বনে বেড়াস বনের পাখি!
যাস কোথা তুই, আয় রে জাদু, বুকে ক'রে রাখি?

ভোরে উঠে ছুটে ছুটে খেলিস মনের সুখে।
ছেড়ে খেলা সন্ধেবেলা আসিস আমার বুকে।
এম্‌নি ক'রে পাড়াব ঘুম দিয়ে শত চুমো :
সোনা আমার, মাণিক আমার, জাদু আমার, ঘুমো।

মনে পড়ত বৈকি আমার শৈশবে হারানো মার আদরের ডাক যখন আমার স্কুলসতীর্থ ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যেতাম তাদের বাড়িতে আর তার লক্ষ্মীপ্রতিমা মা আমাকে আদর করতেন পরম স্নেহে, বলতেন : "আহা বাছা, এসো, আমার হাতে খাও, কাছে ব'সে।" মনে পড়ত বৈকি তখন যে আমার মাও ঠিক এইভাবেই আমাকে হাতে ক'রে খাওয়াতেন—সে কত যত্নে!

কিন্তু সে ক্ষণিক : পিতৃদেবের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতে তাঁর হাসি গান গল্পে স-ব যেতাম ভুলে, তিনি থাকতেন আমার সমস্ত মন জুড়ে। নিজেকে যে তিনি দুহাতে বিলিয়ে দিতে পারতেন। স্নেহ করে অনেকেই, কিন্তু স্নেহকে উচ্ছল সুরে নিবেদন করা প্রতিভার অপেক্ষা রাখে—ঠিক যেমন, অনুভব করতে পারে অনেকেই, কিন্তু তাকে ফুটিয়ে তুলে অপরকে সে-অনুভবের খানিকটা আস্বাদ দিতে পারে এক শিল্পী প্রতিভা। এ-প্রতিভা তাঁর সহজাত ছিল ব'লেই না তিনি অমন সুন্দর ঢঙে লিখতে পেরেছিলেন তাঁর "জীবন পথের নবীন পান্থ" কবিতায় :

করি' দিবসের শুষ্ক কার্য হায়, দাসত্বের ধূলি মুছিয়া অঙ্গে,
ফিরি গৃহে বৎস, উৎসুক আশায় : করিব আলাপ তোমার সঙ্গে।

বর্ষায় চড়িয়া বক্ষোপরি, ফিরে, চাহিয়া শুনিবি জীমূতমন্দ্রে,
বসন্তে গাহিবি মলয় সমীরে, শরতে হাসিয়া ডাকিবি চন্দ্রে।
উচ্চারিবি ধীরে অমিয়সম্ভার সম্বোধনে মিষ্ট বচনখণ্ডে,
শুধু প্রশ্নে দিবি উত্তর কথার, দিবি সিক্ত চুমা ভরিযা গণ্ডে! (মন্দ্র)

একেই বলে অকুণ্ঠ অকৃপণ দান। আমার কাছে তিনি কতটুকুই বা পেতেন? শিশুমনের, বালদৃষ্টির সাড়ে পনের আনা সংবদ্ধ থাকে সামনের দিকে। খেলা-ধুলো পড়াশোনা সঙ্গী সাথী এই সব নিয়েই সে মেতে থাকে—বাপ মাকে চায খতিয়ে প্রয়োজনবোধেই বলব। শিশু একটু আধটু ভালোবাসে না এমন কথা বলি না, কিন্তু শিশুর মধ্যে সরলতা, পবিত্রতা, অনাসক্তি বর্গীয় কযেকটি মহাগুণ বিরাজ করলেও সে স্বভাবে আত্মকেন্দ্র স্বার্থপরই বটে। পরার্থনিষ্ঠা সে আপনা থেকে শেখে না—তাকে শেখাতে হয। আমি পরিণত বয়সে আমার মামা মাসিদের ছোট ছোট শিশুদের অনেককেই স্নেহ করতাম বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি নানান্ অগুণ দেখে প্রায়ই প্রতিহত হতাম আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবতাম —আমিও নিশ্চয় পিতৃদেবকে কতবারই এইভাবেই প্রতিহত ক'রে থাকব—অজান্তে।

নিশ্চযই তিনি দুঃখ পেতেন আমার মধ্যে নানা দোষ ত্রুটি স্খলন দেখে। কিন্তু স্নেহশীল সহিষ্ণুতায় তিনিপ্রতিভাধর ছিলেন ব'লেই বার বার ঘা খেযেও কখনোজানান নি নিজের দুঃখ, বেদনা, আশাভঙ্গ। এ তিনি পেরেছিলেন গড়পড়তা স্নেহশীল পিতা ছিলেন ব'লে নয়, সত্যে তাঁর অসামান্য আস্থা ছিল ব'লে। তিনি আমাকে নানা উপমা দিয়ে প্রায়ই বলতেন এই কথাটিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে সত্যনিষ্ঠা হ'ল বনিয়াদের মতন, তাই সত্যে অচলপ্রতিষ্ঠ হ'লে বাইরের ধুলোবালি ঝড়ঝাপটায়ও মানুষ ভেঙে পড়ে না, কিন্তু সত্যে যার আস্থা নেই তার মহতী বিনষ্টি :—বাইরে যতই বোলবোলা হোক না কেন—অন্তঃসারশূন্য প্রতিষ্ঠা তার আজ না হোক কাল ধ্বংসে পড়বেই পড়বে।

আর একটা জিনিস মনে হয় আজ—কেন না গতানুগতিকতার মোহ যে কী সাংঘাতিক দেখে দেখে ও ঠেকে শিখে আজ আরো দাম দিতে শিখেছি অনন্যতন্ত্র দৃষ্টির—যে বলে: "আপনাতে মন আপনি থেকো, যেও না কো কারো ঘরে।" এর মানে নয় যে অপরের প্রভাব সর্বথা পরিহার্য। না—বলতেন পিতৃদেব প্রায়ই—সাধুর প্রভাব, মহতের প্রভাব পবিত্রের প্রভাব বরেণ্য কিন্তু কে সাধু আর কে মহৎ চিনবার সহজশক্তি অর্জন করতে হবে আন্তরিক দৃষ্টিসাধনার আলোয়। মানে, বাইরে থেকে সাহায্য

নেব কিন্তু কাকে গ্রহণ আর কাকে বর্জন করব তার নির্দেশ দেবে আমার অন্তরের শুভবুদ্ধি, আর কেউ না। তিনি বলতেন প্রায়ই : "নিজের পায়ে ভর ক'রে দাঁড়াতে হবে, বাবা! আমি আর কদিন? কোন্ বই প'ড়ে তোর লাভ হবে, কোন্ পথে চললে তুই লক্ষ্যমুখে চলবি আর কোন্ বিপথে হবি লক্ষ্যভ্রষ্ট এ-নির্দেশ চাইতে হবে অন্তরের কাছে—সত্যজিজ্ঞাসায়। এই জন্যেই তোকে আমি কোনো বই পড়তেই বারণ করিনে। আমি চাই তোর অন্তরের তৃষ্ণাই তোকে পথ দেখাবে—কোন্ প্রভাব তোর কাছে তৃষ্ণার জল। তোর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে বাবা, কিন্তু মনে রাখিস বুদ্ধি নানা সুখ-সুবিধার জোগান দিতে পারলেও লক্ষ্যপথের দিশা দিতে পারে এক হৃদয়। তাই সংশয় সন্দেহ দ্বিধা দ্বন্দ্ব যখনই তোর দৃষ্টিকে ঘুলিয়ে দেবে তখন মুশকিল আশান হ'তে আছে এক হৃদয়—তার কাছেই হাত পাতবি, আর কারুর কাছে নয়।"

এই ধরনের কত অমূল্য কথাই যে তিনি বলতেন—তার কয়টাই বা মনে আছে?

তবে নাই থাকল। মানুষ ভুলেও ভোলে না এ হ'ল এ-যুগের মনস্তাত্ত্বিকদের একটি গভীরতম আবিষ্কার—

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর একটি অপরূপ কবিতায় :

"অন্যমনে চলি পথে ভুলিনে কি ফুল
ভুলিনে কি তারা?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি' দেয় সুর।"

তাই এ আমি জানি যে, তাঁর দৃষ্টান্ত, স্নেহ, ব্যক্তিরূপ উপদেশ প্রভৃতি থেকে আমি পরম নির্দেশ পেয়েছিলাম ব'লেই বাল্যে ও কৈশোরেই আমার মধ্যে খাঁটি জিজ্ঞাসা জেগে উঠতে পেরেছিল। আর এ-মূল জিজ্ঞাসা জাগাতে পারেন কেবল সেই সদ্‌গুরু যিনি নিজেকে পরিবেষণ করতে পারেন তাঁর চিন্তার মধ্যে দিয়ে, সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, প্রেমের মধ্যে দিয়ে—সর্বোপরি, তাঁর আন্তরিকতার দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে।

এগার

কোনো ছক কেটে বাল্যস্মৃতি লেখা শুরু করি নি—যখন যা মনে এসেছে—লিখে গেছি খুশখেয়ালে। চেয়েছি শুধু একটা জিনিস—লেখাটা যেন হয় স্বতঃস্ফূর্ত—spontaneous—ভাষা যেন হয় সরল, সুবোধ, নিরলংকৃত অথচ ভাবের তোড়ে যদি স্থানে স্থানে গুরুগম্ভীরও শোনায়—শোনাক। ইংরাজ কবি বলেন নি কি : "The sound must seem an echo to the sense?" এককথায়, লিখে যাই লেখনীর কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে—দেখা যাক না কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

কিন্তু গত দশটা অধ্যায় লিখে ভাবতে একটু আশ্চর্য লাগছে বৈ কি যে মাঝে মাঝে পারম্পর্য ভেঙে দেওয়া সত্বেও একটা ছক মতন দাঁড়িয়ে গেছে—আমার অজ্ঞাতেই বলব। মানে, যাঁদের কথা সব আগে ব'লে ফেলেছি তাঁদের কথা সব আগে না বললে আমার বাল্যযুগের কাহিনী ঠিক মতন ফোটানো যেত না। তাই দেখছি ছক নিতান্ত মন্দ হয় নি, পর পর এসে গেছেন পিতৃদেব, মেসোমহাশয়, জ্যাঠামহাশয়, লোকেনকাকা, বিজয়কাকা…ইত্যাদি। কিন্তু আর না। আমার বাল্যজীবনের পরিবেশ এতক্ষণে খানিকটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে নিশ্চয়ই—কী বলেন? একটি বালক নির্ভেজাল জিজ্ঞাসু ও চঞ্চল মন নিয়ে নানা দিকে উঁকি ঝুঁকি দিতে দিতে আবিষ্কার করল যে, সে সংশয়ী বুদ্ধিবাদী পিতার যোগ্য বংশধরই বটে : তার্কিক তথা নাস্তিক।

কিন্তু আমার বালপ্রগল্ভতাকে নিয়ে অনেকেই হাসাহাসি করতেন। কেবল মেসোমহাশয় আমার জিজ্ঞাসুবৃত্তি তথা তর্কস্পৃহাকে খানিকটা বুঝতেন। তাই তাঁর নানা প্রবীণ বন্ধুদের কাছে আমাকে পেশ ক'রে বলতেন : "নাও, তর্ক করো তো বাবা—ভগবান কেন নামঞ্জুর—যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও তো।"

অমনি মাসিমা ঝংকার দিয়ে ব'লে উঠতেন : "কেন সবাই মিলে লক্ষ্মীছাড়া বোলচালে এমন লক্ষ্মি ছেলেটার মাথা খাচ্ছ বলতে পারো? না বাবা, তুই ওঁর কথা শুনিস নে, ভগবান আছেন এই কথাই সত্যি। যারা বলে তিনি নেই তারা মতিচ্ছন্ন।"

মাতৃকল্পা মাসিমাকে ভালোবাসতাম, কাজেই তাঁর মনে ব্যথা দিতে মন চাইত না। শুধু তাই নয়, ভগবানের কৃপার কথা বলতে বলতে তাঁর সুন্দর মুখ যখন আবেগে কোমল হ'য়ে উঠত, চোখের কোণে জল চিক চিক করত, কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে আসত—তখন মনে একটু খটকা লাগত বৈ কি। তখনো রীতিমত ভাবতে তো শিখি নি—শিশু যেমন একটা নতুন শব্দ শিখলেই স্থানে অস্থানে তার প্রয়োগ করে, ঠিক তেমনি পিতৃদেবের আসরে আমি যে-সব জুৎসৈ যুক্তিতর্ক শুনতাম অন্যত্র গিয়ে চালিয়ে দিতাম—যেন আমার নিজের ভেবে-বের-করা যুক্তি। আমার ছেলেমানুষি বিজ্ঞতায় অধিকাংশ প্রবীণই হাসতেন, কেউ কেউ মজা দেখতেন, কেউ কেউ বা ভ্রূকুটি করতেন বিরক্ত হ'য়ে—কিন্তু আমিও ছিলাম বড় একটা কেওকেটা নয় তো—কাউকেই রেয়াৎ করতাম না। এক মেজমাসিমার কথা ভেবে মাঝে মাঝে পিছু হটতাম: "তাই তো—যদি মাসিমা ও তাঁর মতন আরো অনেকে ভগবানকে ডেকে এত শান্তি পেয়ে থাকেন তবে কি সেটাও ভগবানের স্বপক্ষে একটা যুক্তি নয়?" কিন্তু একটু আগুপিছু ক'রে ঠিক করতাম যে পুরুষ মানুষ মরদ—সে যুক্তিপথেরি শক্ত পথিক—ভয় কি? বিশ্বাসের নরম পথের চারণী হোক অবলারা—যারা এর বেশি পারে না। পিতৃদেব বলতেন কথায় কথায় যে, মেয়েমানুষের পুরুষালি ভঙ্গি তবু সওয়া যায় কিন্তু পুরুষের মেয়েলি ভঙ্গি অসহ্য। তাঁর সোরাব-রুস্তম নাটিকায় তিনি পুরুষের মেয়েলিয়ানাকে ব্যঙ্গ ক'রে একটি গান বেঁধেছিলেন, শুনে আমরা হেসে গড়িয়ে পড়তাম (পুরুন গাইছেন):

নিদয় বিধাতা কেন না আমারে
জগতে পাঠালে রমণী ক'রে গো!
শুধু সহিব না প্রসববেদনা,
দশ মাস তারে জঠরে ধ'রে গো!

মেসোমহাশয়ও বলতেন এই কথাই অন্যভাবে—যে, মেয়েদের শেখাতে হবে খানিকটা পুরুষিয়ানা—ভাঙতে হবে তাদের ভয়ের ভিৎ যার উপরে ভক্তেরা তোলেন ভগবৎবিশ্বাসের অপলকা ইমারত। আরো বলতেন: মেয়েরা স্বভাবে ভয়কাতুরে ব'লেই তাদের অশ্রু-উর্বর মনের মাটিতে তিনশো তেত্রিশ কোটি দেবদেবী ব্যাঙের ছাতার মতন গজিয়ে ওঠেন রাতারাতি। শুনে আমার বালকমন গৌরবে উজিয়ে উঠত: ভাগ্যে আমি পুরুষ—মেয়ে হ'য়ে জন্মাই নি! মেসোমহাশয়ের যুক্তি আমার মন নিত আরো চাক্ষুষ ক'রে যে, ভয় পেয়ে আমার আত্মীয়ারাই কোকিয়ে কেঁদে

উঠতেন—আত্মীয়েরা নয়। অতএব ভয়জ বিশ্বাস বিশেষ ক'রেই মেয়েলি—এ-যুক্তির কাটান কোথায়? বৎসর কয়েক পরে প্রতিভাধর শরৎচন্দ্রের কাছে শুনি একটি আশ্চর্য কথা যা আমাকে ভাবিয়ে দিয়েছিল বৈকি। তিনি বলেছিলেন: "মণ্টু, যারা মাত্র উপর উপর দেখে তারাই এমন অসার কথা বলে যে, মেয়েরা অবলা। শারীরিক বলে ওরা আমাদের চেয়ে কম মানি, কিন্তু সত্যিকারের শক্তি হ'ল মনের নেবার শক্তি, প্রাণের দেবার শক্তি, যাই ঘটুক না কেন সইবার শক্তি, হেরেও হার না মানার শক্তি—যখন কোনো আশাই নেই তখনো "হাল ছাড়ব না"—বলবার শক্তি। এসব স্থানে মেয়েরা অবলা তো নয়ই—বরং তারাই পুরুষকে ভরাডুবি থেকে রক্ষা করে তাদের সহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও চরিত্রবলে।" হুবহু এই কথাগুলিই যে তিনি বলেছিলেন তা নয়, তবে তিনি মানবজীবন সম্বন্ধে তাঁর বিচিত্র ও গভীর অভিজ্ঞতার এজাহারে প্রায়ই যে-সব জোরালো যুক্তি তলব করতেন তাদের বাদী সুরটি ছিল এইই বটে। তাঁর অন্নদা দিদি, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, কমলমণি, বিজয়া, বিন্দুবাসিনী, রমা, বিশ্বেশ্বরী প্রমুখ মহীয়সীদের মধ্যে কাউকেই "অবলা" বলবার পথ খুঁজে পেতাম না। তাছাড়া হঠাৎ একদিন বাগবাজারে শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর দর্শন পাই! তাঁর শান্ত মুখের মধ্যেও এমন এক সমাহিত শক্তির উদ্ভাস দেখেছিলাম যার নামকরণ করা কঠিন। তবে মনে আছে তাঁকে দেখেই মনের মধ্যে বেজে উঠেছিল চণ্ডীর একটি শ্লোক: "বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—অর্থাৎ শুধু নানা বিদ্যা কি কলা নয়, প্রতি নারীই ভগবতীর মূর্ত বিগ্রহ। এরও পরে তন্ত্রে পড়ি—নারী পুরুষের শক্তি। এ-জাতীয় গুরুগম্ভীর কথার নিহিতার্থ বাল্যে কি কৈশোরে আমার মনে প্রবেশপথ খুঁজে না পেলেও আমার জিজ্ঞাসু হৃদয়ের দ্বারে টোকা মেরে যেত বৈ কি। কিন্তু মানুষ যতদিন না নিজের মধ্যে হাজারো স্বতোবিরোধের পরিচয় পায় ততদিন সব কিছুই দেখে সরল চোখে, কোন্ যুক্তিটা সু আর কোনটা কু—কিছুতেই ঠিক করতে পারে না। কাজেই, বলাই বাহুল্য যে, আমার বাল্যজীবনে চোখে কম দেখতাম ব'লেই চলতে পারতাম আরো বেশি জোরে: জীবনের হাজারো স্বতোবিরোধের মাত্র এক আধটা মাঝে মাঝে আমার বালকমনকে অথই জলে ফেলবার উপক্রম করত বটে, কিন্তু যুক্তির সাঁতারে নিরাপদ ডাঙার নাগাল পেতে দেরি হ'ত না। শরৎচন্দ্রই প্রথম আমাকে হকচকিয়ে দেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যে, জীবনের যে-সব সরল সূত্রকে আমরা নিশ্চিত ব'লে আঁকড়ে ধরি তারা আশ্রয় দিতে পারে না দুটি কারণে: এক, জীবন আদৌ সরল নয় ব'লে; দুই, কোনো

সরল সূত্রের মূলই জোরালো নয় ব'লে। তাই কোনো একরোখা জীবনদর্শনই স্থায়ী আশ্রয় দিতে পারে না—দিতে পারে মেরেকেটে কিঞ্চিৎ আশ্বাস বা আত্মপ্রসাদ—তাও অপলকা। কিন্তু এ-জাতীয় গভীরোক্তির আলোকদিশা পেয়েছিলাম আমি পিতৃদেবের দেহান্তের পরে—কৈশোরে, অর্থাৎ আমার সতের আঠার উনিশ বৎসরের গ'ডে ওঠার সময়ে। এই সময়ে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রভাব ছিলেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু সে পরের কথা—যদি কৈশোর স্মৃতি কখনো লিখি তখন বলব—তাঁর কাছে কত পেয়েছি, শিখেছি, জেনেছি! এখন বাল্যস্মৃতির কোঠায়ই চারণ করা যাক। যেখানকার যা, আর যখনকার তা।

এই সময়ে, বেশ মনে আছে, পিতৃদেবের কাছে পুরুষদের মেয়েলিপনার বিরুদ্ধে নানা ব্যঙ্গ শ্লেষ হাসাহাসি শুনতাম। পিতৃদেবের জীবনীকার বরিশালের জমিদার শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী প্রায়ই এক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের মেয়েলি ঢঙে গান গাওয়ার এমন চমৎকার নকল করতেন যে আমরা সবাই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তাম।

কিন্তু গ্রহিষ্ণু মনের বালাই বিস্তর। যাই কেন না ভালো লাগুক তাকে পেয়ে বসে যেন। কাজেই এই সময়ে পুরুষদের মেয়েলিপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে করতে হ'য়ে উঠলাম ধনুর্ধর নওজোয়ান!—মেয়েরা?—দূর! তাদের কথা ধরতে আছে? অথ, রুখে উঠে মেয়েদের ছায়া মাড়ানোও ছেড়ে দিলাম—এমন কি দিদিমা যে দিদিমা—মা-র অকালমৃত্যুর পরে যিনি একরকম আমাকে নিজে হাতে ক'রে মানুষ করেছিলেন বললেই হয়—তাঁর কাছেও ধরা দিতে চাইতাম না। তিনি আমাকে সত্যই ভালোবাসতেন তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের চেয়েও বেশি। আমার ছয় বৎসর থেকে দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি ছিলাম তাঁর নেওটো—রাতে তাঁর কাছে শুতেই সবচেয়ে ভালোবাসতাম। দিদিমা পরে প্রায়ই হাসতে হাসতে এই গল্পটি করতেন। আমার ছ'বছর বয়সে একদিন তাঁর কাছে শুয়ে ঘুমুচ্ছি নিশুত রাতে, এমন সময়ে প্রবল বাজ পড়ার শব্দে চম্‌কে জেগে উঠলাম। দিদিমার ঘুম ভাঙে নি তখনো। আমি নাকি ভয় পেয়ে তাঁকে ঠেলে জাগিয়ে দিয়েছিলাম: "ও নানি! ও নানি!"

দিদিমা (চম্‌কে): কী রে!

আমি (সভয়ে): ভোঁকোর।

এই ভোঁকর শব্দটি কোত্থেকে এসেছিল আমার মনে নেই। এশব্দটি বাংলা

ভাষায় নেই ব'লেই আমার বিশ্বাস। অথচ ইংরাজিতে অনোম্যাটোপিয়া ব'লে একটি শব্দ আছে যার মানে—কোনো কিছু শুনে তার অনুরূপ ধ্বনি দিয়ে শব্দ রচনা করা। ভোঁকোরকে এই জাতীয় শব্দ বলা চলে। কিন্তু যা বলছিলাম।

এহেন পরম স্নেহময়ী দিদিমার কাছেও এসময়ে সহজে যেতে চাইতাম না। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে ধস্তাধস্তি ক'রে ছাড়িয়ে নিয়েই দে চম্পট। তিনি বলতেন: "আহা, কাছে আয় না ধন!" ব'লে নিজে হাতে কত কি খাওয়াতে চাইতেন। কিন্তু আমি তুলতাম শিরপা! মেয়েদের হাতে খাওয়া কি পুরুষের সাজে? ছি!

কিন্তু দিদিমাও ছিলেন সুচতুরা। বললেন: "শোন্—যেদিন রাতে তুই আমার কাছে শুবি তার পরদিন সকালেই তোকে একটি ক'রে টাকা দেব।"

মহা ফ্যাসাদে প'ড়ে গেলাম। পৌরুষ বড়, না টাকা? টাকার আমার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কেন জানেন?—বই কিনতে। পিতৃদেব হাতখরচ দিতেন মাসে দশ পনের টাকা। কিন্তু তা দিয়ে আর ক'টা বই কেনা যায়? অথচ সময়ে সময়ে গুরুদাস লাইব্রেরিতে গিয়ে এ ও তা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মনে হ'ত—না কিনলেই নয়। পিতৃদেবের কাছে বরাদ্দের বেশি চাইতে ভরসা পেতাম না। কিন্তু দিদিমার কাছে "পুরো রাজত্ব আর অর্ধেক রাজকন্যাও চাওয়া যায়"—বলতেন পিতৃদেব হেসে। তাছাড়া এখানে অপৌরুষ বা অমর্যাদার তো লেশও নেই—বা বা বা! এ যে চুক্তি—কনট্রাক্ট। পিতৃবন্ধুদের মুখে প্রায়ই শুনতাম প্রবচন: "Fair exchange is no robbery" বটেই তো। পরে কেম্ব্রিজে এল এল বি পড়বার সময়ে আইনের পারিভাষিক মকৃশ করেছিলাম—quid pro quo: আমি দিদিমার কাছে শুয়ে তাঁকে কৃতার্থ ক'রে উপার্জন করতাম অর্থ। কোনো বইয়ের দাম ধরুন তিন টাকা! বেশ। পর পর তিন রাত শুতাম গিয়ে দিদিমার কাছে। চতুর্থ দিন ভোরে উঠেই ছুট—গুরুদাস লাইব্রেরি। পাঁচকড়ি দে'র ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস: গোবিন্দরাম, মায়াবী, মায়াবিনী, নীলবসনা সুন্দরী, হত্যাকারী কে······কিম্বা দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পিশাচ পুরোহিত, অজয় সিংহের কুঠি, চীনের ড্রাগন···ইত্যাদি। পিতৃদেবের কাছে যে-মাসোয়ারা পেতাম তা' নিয়ে বঙ্গবাসী অফিসে দৌড়ে গিয়ে কিনতাম পঞ্চানন তর্করত্নের অনূদিত নানা পুরাণ, ভাগবত, সংহিতা ইত্যাদি।

আমার নাস্তিকতাকে নিয়ে প্রবীণ ও মুরুব্বিরা অনেকেই হাসাহাসি করলেও

আমি চলতাম সমানেই আমার অকালপক্কতার ঝাণ্ডা উড়িয়ে। বলতাম মনে মনে : নাস্তিক হ'তে হ'লে সব আগে চাই মরদ হওয়া—ভয় পেয়ে ভক্তি—ওতে আমি নেই। এমনি ক'রেই আমি বার বৎসর বয়সেই হ'য়ে উঠলাম ঝাঁঝালো নাস্তিক তথা রোখালো তার্কিক। এক মেজমাসিমার কথা ভেবে সময়ে সময়ে মন একটু নরম হ'ত বটে, কিন্তু সে সাময়িক দুর্বলতা বৈ তো নয়। তাছাড়া তাঁর সঙ্গে কাটত কতটুকুই বা সময় !

নাস্তিক হ'য়ে প্রস্ফুটিত হবার পরে প্রথম প্রথম আমার মধ্যেকার সদ্যোজাত অনীশ্বরতার ঝাঁঝালো গন্ধে মনে প্রাণে পুলক উঠত জেগে। কী বাহাদুর ছেলে আমি! সবাইকেই দিচ্ছি থ ক'রে আমার নাস্তিক যুক্তিবাদের তীক্ষ্ণ শরসন্ধানে! আমার ছোট মুখে বড়-কথা শুনে আমার বয়োবৃদ্ধ আত্মীয়রা বিরক্ত হতেন খুবই, বলতেন : বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি! আমার এক আত্মীয় একদিন আমার প্রগল্‌ভতায় রাগ ক'রে বলেছিলেন : "দ্বিজদা আর গিরিশদাতে মিলে তোকে দাঁড় করাচ্ছেন এক কিম্ভূতকিমাকার!" স্পষ্ট মনে আছে সেদিনকার কথা। হঠাৎ ধমক খেয়ে হকচকিয়ে কেঁদে ফেলেই চম্পট। কিন্তু ঘরে এসেই ফের রুখে উঠলাম : লোকের কথায় কী যায় আসে—লোক না পোক···ইত্যাদি। ঘা খেলে আরো জপতাম পিতৃদেবের একটি প্রিয় উদ্ধৃতি : "Do well and right and let the world sink" আর ঐ সঙ্গে নিজেকে নিজেই দিলাশা দিয়ে বলতাম : "চিন্তাকে স্বাধীন রাখাই চাই—লোকে যা বলে বলুক। পরে যতই বুদ্ধির পরিণতি হয়েছে ততই বুঝেছি, হাড়ে হাড়ে, চিন্তাকে স্বাধীন রাখা কত কঠিন। নাম-না-জানা উৎস থেকে দিনে রাতে কতশত উড়ে-আসা-বুলির বীজে যে আমাদের মনের মাটিতে হাজারো প্ররোচনায় নৈমিষারণ্য গজিয়ে ওঠে তার খবর রাখাই কি সোজা কথা। কত শোনা-কথা যে পারিপার্শ্বিক মতামতের সায়ে প্রথমে রূপ নেয় বিশ্বাসের—পরে বদ্ধমূল সংস্কারের—তার হদিশ পেতে হ'লেও বহু নিরীক্ষা, বিচার, বিশ্লেষণের সাধনা চাই। চিন্তাকে সত্যি স্বাধীন রাখতে পারেন শুধু সেই মহাজন যিনি খানিকটা অন্তত নিষ্কাম, নির্বাসনা হ'তে পেরেছেন। কিন্তু অত শত কি বোঝে বারো তের বৎসরের বালক —তা সে যতই কেননা অকালপক্ক প্রডিজি হোক না!

কাজেই বাল্যাবস্থায় স্বাধীন চিন্তার জয়গান শুনতে শুনতে যদি স্বাধীন ভাবুক

উপাধি পাবার বিপর্যয় লোভ আমাকে পেয়ে ব'সে থাকে তবে সে-লোভকে আশা করি অক্ষমণীয় অপরাধ ব'লে সুধীবৃন্দ আমাকে দায়রা সোপর্দ করবেন না! এ-সাফাই গাইছি আরো এই জন্মে যে, অনেকেই আমার প্রগল্‌ভতাকে বড় ক'রে দেখে আমার জিজ্ঞাসুতার কোন দাম দিত না।

এমন সময়ে স্বনামধন্য শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্তের "ভক্তিযোগ" বইটি আমার হাতে পড়ল—সাক্ষাৎ অশ্বিনীকুমার—অগ্নিযুগের একজন আদি হোতা—যাঁকে সেযুগে শ্রীঅরবিন্দও করেছিলেন উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ। পিতৃদেবও তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন শুধু স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা বলে নয়, গিল্টির বাজারে বিরল খাঁটি সোনা বলে। মেসোমশায়ের কাছেও শুনেছিলাম এ-তেজস্বী মনীষীর দুঃসাহস ও দেশাত্মবোধের কথা। ভগবান নামঞ্জুর হ'লেও মানুষের মহত্ত্ব, ত্যাগ, তিতিক্ষা, বীর্য এসব তো বাতিল হয় না। পিতৃদেবের একটি অবিস্মরণীয় কবিতার দুটি চরণ আজো আমার কানে বাজে :

পরের দুঃখে কাঁদতে শেখা—তাহাই শুধু চরম নয় :
মহৎ দেখে কাঁদতে জানা—তবেই কাঁদা ধন্য হয়।

প্রাক্‌-অরবিন্দ-যুগে অশ্বিনীকুমারের মহত্ত্বের উল্লেখ করবামাত্র উচ্ছ্বাস জেগে উঠত দীনতম দেশভক্তেরো মনে। তিনি ছিলেন সে-যুগের যুবকসমাজের আদর্শ, বাংলার মুকুটমণি, যাকে বলে—Uncrowned King of Bengal.

এ-হেন বরেণ্য মানুষও হঠাৎ বিপ্লবের পথ ছেড়ে ভক্তির পথ ধরলেন কী দুঃখে? ভক্তিযোগ প'ড়ে আমি কেমন যেন বিহ্বল মতন হ'য়ে গেলাম। এ কী ব্যাপার? আমার সাধের সদ্যোজাত থিওরি সব ঘুলিয়ে গেল যে, ভক্তি ঠাঁই পায় কেবল ভীরুদের মনে, অবলার অন্তরে। কারণ অশ্বিনীকুমাকে আর যাই বলা যাক না কেন, দুর্বল বা ভয়কাতুরে বলার তো পথ ছিল না! তবে? নাস্তিবাদীদের একটি প্রধান রটনার শূন্যতা ভরাট করে কে? তেজস্বী মহাজনও ভক্তিবাদী হ'য়ে দাঁড়ালে শঙ্কাকে কেমন ক'রে ভক্তিমাতা নাম দেওয়া যায়? মেসোমশায়কে গিয়ে জানালাম মুশকিলের কথা। তিনি হেসে বললেন : "আমি তো বলি নি বাবা, যে আমার নাম মুশকিল-আসান। জীবনে কত কী ঘটে প্রত্যহই—কটার ব্যাখ্যা করতে পারি আমরা?" ওদিকে মাসিমা আহ্লাদে আটখানা—"এই সব বই-ই পড় বাবা—বিদ্‌ঘুটে কালাপাহাড়ি আর গোয়েন্দাকাহিনী ছেড়ে।"

কিন্তু সবে-জাগা নাস্তিক্যের অভিমান—ছাড়্ বললেই কি ছাড়া যায়? সেই চিরকেলে দোটানার দোল: বিশ্বাস না সংশয়? ভক্তি না বিচার? কঃ পন্থাঃ?

এমনি সময়ে এলেন নির্মলদা স্থরধামে। বলি তাঁর কথা এবার—বলতে আজো বুক ভ'রে ওঠে।

বারো

নির্মলদা ছিলেন আর একটি আশ্চর্য চরিত্র। ষোলো সতের বৎসর বয়সে যে-কিশোরের আস্তিক্য-বুদ্ধি অচলপ্রতিষ্ঠ তাকে অসামান্য না বলবে কে? কিন্তু তিনি শুধু যে ভক্তিবিশ্বাসেই অসামান্য ছিলেন তা নয়, বহু-গুণে-গুণী এই মানুষটিকে ভিড়ের মধ্যে দেখলেও নগণ্যদের একজন ব'লে মনে হ'ত না কারুরই। রূপে ছিলেন তিনি অপরূপ, আবৃত্তিতে অসাধারণ, হাসিতে অনিন্দনীয়, স্বরে সুকণ্ঠ, আলাপে অনবদ্য—এককথায় চলন-বলনে মার্কামারা। আর কী সুন্দর উচ্চারণ! ইংরাজি আমি জানতাম যেমন দশবারো বছরের বালক জানে: মানে গড়পড়তা। কিন্তু ইংরাজিতে accent-এর মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হই প্রথম নির্মলদার চমৎকার উচ্চারণ শুনে। উদাহরণতঃ—houses আমরা সবাই উচ্চারণ করি স দিয়ে। নির্মলদাই প্রথম আমাকে হেসে বলেন: "ভেতো। ভেতো! সাহেবেরা উচ্চারণ করে Z (জেড) দিয়ে!" ছাত্রহিসাবে তিনি মোটেই মেধাবী ছিলেন না, কিন্তু ইংরাজি ভাষাকে তিনি ভালোবেসে ফেলেছিলেন, তাই উচ্চারণে এমন নিপুণ হ'য়ে উঠেছিলেন তাঁর নিত্য-সজাগ সাধনায়। আবৃত্তিতে তাঁর এই সহজপটুতা ছিল ব'লেই পরে তিনি অভিনয়েও খ্যাতিলাভ করেন। পিতৃদেব হেসে তাঁর নামকরণ করেছিলেন Prince Charming—অস্কার ওয়াইল্‌ডের ভাষায়। তিনি ঠিকই ধরেছিলেন, কারণ নির্মলদার সঙ্গে আলাপ করতে না করতে মানুষ সবচেয়ে আকৃষ্ট হ'ত তাঁর "চার্ম"-এ। ব্যারি তাঁর বিখ্যাত What Every Young Woman Knows-নাটকে চার্ম-এর সংজ্ঞানির্ণয় করেছেন এই ব'লে: "It is a sort of bloom on a woman. If you have it, you don't need to have anything else and if you don't have it, it does not matter what else you have."

"চার্ম" শব্দটির প্রয়োগ সুপ্রযুক্তই হয়েছে নির্মলদার সম্পর্কে। কারণ তাঁর কমনীয়তার মধ্যে খানিকটা মেয়েলি ভাব ছিল বৈ কি। তাঁর আস্কন্ধবিলম্বিত ঘন

কুঞ্চিত কেশদামের শোভায় মুগ্ধ না হ'ত কে? অথচ ছেলেদের মধ্যে এরকম চুলের বহর মানায়, না মানায় না? মন স্থির করতে পারতাম না। নির্মলদাকে ভালোবেসেই প'ড়ে গিয়েছিলাম ফ্যাসাদে। নৈলে হয়ত বলতাম পূর্ববৎ রোখালো সুরেই যে, পুরুষের স্কন্ধে মানায় না এমন রাশি রাশি চুলের জটলা। ভালো যে বেসেছে সেই জানে—প্রীতি কেমন অজান্তে আমাদের প্রেজুডিসের বিষদাঁত হরণ করে।

কিন্তু তা ব'লে বলা চলে না যে, নির্মলদার ঢং ছিল মেয়েলি। অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুখাবয়ব দুয়ে মিলে তিনি ছিলেন কন্দর্পকান্তিই বটে। তাছাড়া তিনি জানতেন বৈ কি যে তিনি নয়নমনোহর। তাই প্রসাধনে তাঁর ঔদাসীন্য ছিল না, না বেশভূষার পারিপাট্যে এতটুকু অবহেলা। কিন্তু অতঃপর এগুবার আগে একটু পিছিয়ে যেতে হবে ফের, কেননা নির্মলদার মধ্যে ভক্তিবিশ্বাসের উদ্ভবের ইতিহাসটুকু না বললে আমাদের সম্বন্ধটুকু ফোটানো সম্ভব হবে না।

নির্মলদার মা—আমার পিসিমা—ছিলেন খুব সুন্দরী! মেম-বিনিন্দিত রং। নাম—মালতী। পিতৃদেবের কাছে শুনেছিলাম—আমার পিসেমহাশয় নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ি তাঁকে না কি নর্মচ্ছলে দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত "মালতী মালতী মালতী ফুল মজালে মজালে মজালে কুল" ব'লে ডাকতেন। একে সুরসিক ও সুপুরুষ, তার উপরে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। কাজেই শান্তিপুরে তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যেই বেশ নামজাদা ডাক্তার হ'য়ে উঠেছিলেন। যৌবনে তিনি ছিলেন একজন নিষ্পরোয়া বিলাসী, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে হঠাৎ প্রাণপ্রিয়া গৃহলক্ষ্মীর মৃত্যুতে প্রায় ভেঙে পড়বার মুখে আশ্রয় পান ধর্মের শান্তিধামে। দেখতে দেখতে ধর্ম তাঁকে পেয়ে বসল, কেন না তিনি ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছিলেন তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই। এসবই আমার নির্মলদার কাছে শোনা—বলাই বাহুল্য।

কিন্তু শুধু ধর্মকে চাওয়া নয়—"ধর্ম যে ধারণ করে—ধারণাৎ ধর্মমিত্যাহুঃ—শাস্ত্রের এ বাণীটির মর্ম বুঝবি রে, যেদিন তাঁকে দেখবি"—বলতেন নির্মলদা প্রায়ই। (নির্মলদার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নি: পরে পিসেমহাশয়ের ভাবসমাধি দেখে আমি অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম) খৃষ্ট বলেছিলেন: যে সত্যি চায় সে পায়ই পায়। পিসেমহাশয় সত্যি চেয়েছিলেন দুটি জিনিস: সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্তি ও ভগবানের চরণে ভক্তি। ভগবান শুনেছিলেন তাঁর প্রার্থনা। সংসারের সঙ্গে রফা হয়েছিল এই ভাবে: তিনি সকালবেলা বেরুতেন রুগি দেখতে—তাঁর রাউণ্ডে।

কয়েক ঘণ্টা বাদে ফিরে যা ফী পেতেন বিশ ত্রিশ টাকা—তাঁর বড় পুত্রবধূর হাতে দিয়ে খালাস : "সংসার চালাবার এই খরচ নাও মা—কিন্তু ঐ সঙ্গে আমাকেও লিখে রাখো খরচের খাতায়। আমি করব শুধু কায়ক্লেশে ভরণ, তোমরা করবে প্রাণপণে পোষণ, বুঝলে তো চুক্তি? আমি এই রোজকার সংসারখরচ এনে দেব তোমার হাতে—তার পরই আমি পর্দানশীন আমার সাধনার অন্দরমহলে, ব্যস্।"

যে কথা সেই কাজ। তিনি আর সাতেও না, পাঁচেও না—কোনো সামাজিক মজলিশেই যেতেন না, থাকতেন একান্তে—বাইরের মহলে মাত্র দুটি ঘরে—একটিতে শুতেন, একটিতে ধ্যান-ধারণা, জপ-তপ, স্বাধ্যায় তথা ভাগবতপাঠ—সর্বোপরি কীর্তন—কীর্তন—কীর্তন—পরে এই ঘরে আমিও তাঁকে গান শোনাই। শান্তিপুর কীর্তনের দেশ—তাঁকে আর পায় কে? আর একে ভারিক্কি ভক্ত তার উপর ডাকসাইটে ডাক্তার—তাঁকে কীর্তন শোনাতে না চাইবে কোন্ কীর্তনী?

যথাকালে কলকাতায় রটল এ-খবর—নির্মলদা তখনো আসেন নি আমাদের এখানে। পিতৃদেব বললেন: "ও মণ্টু, জানিস্—ধর্ম ধর্ম ক'রে নিকুঞ্জের মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে রে! মালতী থাকলে হ'ত না এমন দুর্গতি, আহা!"

আমি তৎক্ষণাৎ মেনে নিলাম দ্বিরুক্তি না ক'রে। মাসিমার কাছে গিয়ে পিতৃদেবের নাম না ক'রে পিসেমহাশয়ের কাহিনী পেশ ক'রে মুরুব্বিয়ানা স্বরে বললাম: "তা মাথা খারাপ হবে না—সাক্ষাৎ স্ত্রীর শোক—!" মাসিমা শুনে হেসেই খুন: "থাম্ থাম্ ফাজিল ছেলে! স্ত্রীর শোকের তুই কী জানিস বল্ তো? তাছাড়া পিসেমহাশয়ের মাথা খারাপ হয়েছে কে বলল তোকে?"

আমি পিতৃদেবের নাম না ক'রে বললাম: "সবাই জানে।"

মাসিমা (রেগে): ছাই জানে! সত্যি ধার্মিক যিনি হন তাঁকে জানেন এক ঠাকুর, বুঝলি? আর জানে তারা যারা ঠাকুরের কৃপা পেয়েছে। তোর পিসে-মহাশয়ের কথা আমি শুনেছি এম্নি একজনের কাছে। সে বলে—তিনি মহাযোগী, মহাভক্ত। আর তুই বললি কিনা তাঁর মাথা খারাপ? যাঃ—পালা।"

মাসিমার তিরস্কার অবশ্য গায়ে মাখলাম না। হাজার ভালোবাসি না কেন তাঁকে—মেয়ে তো—"স্বাধীন চিন্তার" কী-ই বা জানবে, বুঝবে!

এ-হেন পিসেমহাশয়ের ছয় ছেলে এক মেয়ে। নির্মলদা তাঁর পঞ্চম পুত্র। পিসেমহাশয় পিতৃদেবকে লেখেন যে নির্মলদা কলকাতায় পড়তে চান। পিতৃদেব চির-উদার। তখন রাঙা জ্যেঠামহাশয় আমাদের এখানে—বাড়ি ভর্তি। পিতৃদেব

হেসে বললেন : "বোঝার উপর শাকের আঁটি বৈ তো নয়।" কিছুদিন বাদে এর পরে আমার আর এক ভাই আসেন—ভুপেনদা, ফুলজ্যেঠামশায়ের ছেলে। নির্মলদাতে আর তাঁতে ঘটত রসিকতার প্রতিযোগিতা।

অথ : নির্মলদার অভ্যুদয় আমাদের আনন্দময় সুরধামের কলোচ্ছল পান্থশালায়। তখন তাঁর বয়েস ষোলো সতের, আমার বার তের।

তাঁকে দেখামাত্র—love at first sight যাকে বলে।

ভালোবেসেছিলাম ব'লেই তাঁর কাছে অত মন দিয়ে শুনতাম জীবন্ত ধর্মের কাহিনী। এর আগে পড়েছিলাম নানা ধর্মগ্রন্থে ধার্মিকের ইতিহাস ও যোগীদের কীর্তিকলাপ। কিন্তু নির্মলদার মুখে শুনতে না শুনতে মরা গাঙে যেন প্রত্যয়ের বান ডেকে গেল! অনেক আগুপিছুর পরে আমি মনস্থির ক'রে ফেলেছিলাম যে ধর্মটর্ম কোন কাজের কথা নয়, হ'তে হবে দেশের ও দশের একজন—যুক্তি তর্ক বিদ্যা অধ্যবসায়ের পথে। নির্মলদা আসতেই সব ঘুলিয়ে গেল—তর্কও গেল ফেঁসে যেই তিনি আমার নাক ম'লে দিয়ে বললেন, "ওসব ছাড়্। বিশ্বাসই পথ—তর্কে বস্তুলাভ হয় না রে হয় না—দিগ্‌গজ পণ্ডিতদের বাড় বাড়লেও না, বা ফাজিল প্রডিজি নয়কে হয় ক'রে দাঁড় করালেও না না না……" ইত্যাদি।

আমাকে ফাজিল বলা সত্ত্বেও মন ফের দুলে উঠল বৈ কি। মাসিমা তো নির্মলদার কথা শুনে আহ্লাদে আটাননখানা। "এই নির্মলদাই তোর বন্ধু রে মণ্টু, তোর মেসো শত্তুর—বুঝলি?" বলতেন মাসিমা প্রায়ই।

কিন্তু মেসোমহাশয় নির্মলদাকে স্নেহ করলেও তর্কে দারুণ হারিয়ে দিতেন। তাই নির্মলদা প্রথম দিকে তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। মাসিমার দেহান্তের পরে নির্মলদার প্রথম চোখ ফোটে, তিনি দেখতে পান মেসোমহাশয়ের মহত্ত্ব—যে-কথা ইতিপূর্বে লিখেছি। যাহোক, যা বলছিলাম।

আমি নির্মলদাকে বললাম অশ্বিনীকুমারের "ভক্তিযোগ"-এর কথা। নির্মলদা বললেন : "ভালো। কিন্তু ভক্তির সন্ধান যদি চাস তবে পড় এ-যুগের গীতার গীতা—শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।"

যেই পড়া সেই কেমন ক'রে ঘটল এ-অঘটন ভাবতে আজো ধাঁধা লাগে আমার! কিন্তু ঘটেছিল এ-কথা তামা তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে হলপ ক'রে বলতে পারি। প্রায় ভেসে যায় আর কি নাস্তিক্যের স্বপক্ষে হাজারো মনগড়া যুক্তি, চোখা চোখা বুকনি! পরমহংসদেবের একটি এক্সাহারে সব যেন ভেস্তে গেল : যে,

ভগবান কবি-কল্পনা নন, তিনি সত্যের সত্য, তাঁকে শুধু যে চাক্ষুষ করা যায় তাই নয়, তাঁর সঙ্গে কথালাপ পর্যন্ত করা যায়। ছুটলাম মেসোমহাশয়ের কাছে "কথামৃত" নিয়ে। সব শুনে তিনি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন: "উঁহুঁ:! বিশ্বাস হয় না। মানুষ তো কত কী দেখে।..." ইত্যাদি।

বিমর্ষ হ'য়ে নির্মলদার কাছে এসে রিপোর্ট করতেই তিনি রেগে আগুন: "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি মানুষ ছিলেন না কি? আর কে তোর মেসোকে পোঁছে বল্ তো? কী জানেন তিনি অবতারতত্ত্বের বা ধর্মজীবনের শুনি—যে এ-ধরনের অনধিকারচর্চা করতে আসেন?"

আমি অত সহজে পিছুহটার পাত্র নই। বললাম: "ধর্মতত্ত্বের কে কী জানে তা নিয়ে তো কথা নয়। কথা হচ্ছে ঠাকুর যদি থেকেও দেখা না দেন তবে জানব কেমন ক'রে তিনি আছেন?"

নির্মলদা: জানবি কেমন ক'রে? মানে? দুদিন আগে আমাকেও তো জানতিস না—আজ জানলি কেমন ক'রে?

আমি (সপরিহাসে): ভালোবেসে।

নির্মলদা (পিঠপিঠ): সাবাস জোয়ান। ভগবানকে জানবারও ঐ একই পথ।

আমি: কিন্তু ভগবানকে না দেখে তিনি আছেন ধ'রে নিয়ে ভালোবাসতে যাবো কী দুঃখে—যখন ভালো না বেসে খাসা আছি।

নির্মলদা (দুর্দান্ত সুরে): ভগবানকে ভালো না বেসে যে-থাকা তাকে যদি "খাসা থাকা" বলা যায় তাহ'লে বলতে হয়—ঐ কুকুরটাও খাসা আছে শুকনো হাড় চিবিয়ে।

কী! কুকুরের সঙ্গে আমার উপমা? রেগে আগুন হ'য়ে সাতদিন নির্মলদার সঙ্গে কথা বন্ধ। এরকম পরিস্থিতি আমাদের মাঝে মাঝেই হ'ত। তারপর কোনো একটা অছিলা পেতে না পেতে ঘটত পুনর্মিলন—উঃ, সে কী আনন্দ!—আর অমনি শুরু হ'ত ফের ভগবানকে নিয়ে নিষ্পত্তিহীন বাগ্বিতণ্ডা, বাগ্বিতণ্ডা থেকে মতান্তর, মতান্তর থেকে মনান্তর, মনান্তর থেকে ফের কথাবন্ধ—শেষাঙ্কে ফিরে ফিরে পুনর্মিলন—বৃত্ত কবে ফুরোয়?

এইভাবে চলেছি আমরা তর তর ক'রে, এমন সময় এল পুজোর ছুটি। নির্মলদা ফিরে গেলেন শান্তিপুরে। ছুটির পর কলকাতায় ফিরে এসেই বললেন:

"জানিস্, রাঙাকাকা কী বললেন এবার?—কী অপূর্ব দর্শন সে, আহা!" রাঙাকাকার কথা নির্মলদার মুখে কতবারই যে শুনেছিলাম—আশ্চর্য ভক্তি বিশ্বাস সরলতা তাঁর!—তাই বললাম উৎসুক কণ্ঠে: "কী ভাই! বলতেই হবে।" নির্মলদা বললেন ঠোঁট বেঁকিয়ে: "নাঃ। তুই যে অবিশ্বাসী, পাষণ্ডী, তোকে বলব না।" আর যাবে কোথায়? আমি নির্মলদার কাছে প্রায় নতজানু: "বলুন, নির্মলদা, লক্ষীটি ভাই! দুটি পায়ে পড়ি।" তখন নির্মলদা বললেন বিজ্ঞ হেসে: "শোন্ তবে, কী জ্যাঠামি করিস যুক্তি যুক্তি ক'রে? যুক্তিতর্ক কি দিশা পায় ঠাকুরের? বিশ্বাসে মিলয়ে…" আমি বাধা দিয়ে বললাম: "ও ঢের শুনেছি। এখন রাঙাকাকা কী বললেন সেই কথাই হোক।"

নির্মলদা: তুই বার-বার বলিস্—স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করব না। আরে বেল্লিক! ভগবানের দেখা পাওয়া অত সহজ না কি? বিশ্বাস ক'রে বছরের পর বছর তাঁর শরণ নিলে তবে পাওয়া যায় তাঁর দর্শন। না, শোন্—এ আমার কথা নয় যে দেখেনি—স্বয়ং রাঙাকাকার কথা যিনি দেখেছেন—স্বচক্ষে।"

"কী দেখেছেন ভাই? ভগবানকে? সাক্ষাৎ?"

"নয়ত কী? শোন্ রে লম্বকর্ণ! কান খাড়া ক'রে শোন্।" ব'লে বললেন রাঙাকাকার কাহিনী। শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিল। সে কতদিনের কথা—৬২—১৩=৪৯ বৎসর হ'তে চলল—কিন্তু কাহিনীটি আজও আমি ভুলতে পারিনি। কারণ বোধহয় এই যে, চাক্ষুষ এজাহারের কথা সেই আমি প্রথম শুনি। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পড়া আরম্ভ করি এই মহাশ্রুতির একটু আগেই হবে। রাঙাকাকার জবানিতেই বলি—একটু ড্রামাটিক ভঙ্গি হয়ে গেলে আশাকরি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা অপরাধ ক্ষমা করবেন—বাংলার সেরা নাট্যকারের কুলতিলক আমি, ড্রামা না ভালোবেসে পারি?

ব'লে রাখি, বহুদিন আগের ঘটনা, তাই খুঁটিনাটিতে একটু আধটু ভুল থাকতে পারে, কিন্তু মূল ছবিটি আঁকতে ভুল হ'তেই পারে না, কেন না এ-ঘটনাটি আমার কাছে চিরদিনই গণ্য হ'য়ে এসেছে—ইংরাজি ভাষায় যাকে বলে ল্যাণ্ডমার্ক, যা হোক, শুনুন নির্মলদার বিবৃতি।

"রাঙাকাকা বললেন: 'ওরে নির্মল, দিলীপকে বলিস যে এ অন্ধ বিশ্বাস নয় রে নয়। টমাস যেমন দেখেছিলেন মৃত খৃষ্টদেবকে জীবন্ত—তেমনি অনেক ভক্তই গুরুকে, মা-কে ঠাকুরকে দেখতে পান চর্মচক্ষে—জলজ্যান্ত। আরে, হ্যাঁ রে হ্যাঁ,

দাদা তো দেখেছেনই—তিনি মহাপুরুষ, তাঁর মন চিদাকাশে বিচরণ করে”—(এ-কথাটি রাঙাকাকা নির্মলদাকে প্রায়ই বলতেন)—আমি যে আমি—সাধন-ভজন প্রায় কিছুই করিনি—সেই আমিও দেখেছি মা দুর্গাকে সাক্ষাৎ সাম্‌নে—জীবন্ত—যেমন তোকে দেখছি রে নির্মল !” বলে নির্মলদা বিজ্ঞ হাসলেন ফের।

আমার বুকের রক্ত উচ্ছল হ'য়ে উঠল। বললাম: “বলুন বলুন নির্মলদা, থামবেন না, লক্ষ্মীটি !”

নির্মলদাও শয়তান কম না, বললেন: “উঁহু:, ঠাকুর বলেছেন গীতায় 'নাভক্তায় কদাচন'—অভক্তকে এসব কথা বলা মানে throwing pearls before swine !”

অন্য সময় হ'লে ফের সপ্তাহকাল বাক্যালাপ বন্ধ হ'ত, কিন্তু এখন তিনি আমাকে কায়দায় পেয়েছেন, কৌতূহলের লক্ষ শ্রুতি আমার রোমে রোমে উঠেছে জেগে—কাজেই গালমন্দ গায়ে না মেখে বললাম: “বলুন নির্মলদা, লক্ষ্মীটি ! দুটি পায়ে পড়ি আপনার !”

নির্মলদা নাটকীয় ঢঙে গ'র্জে বললেন: “আচ্ছা মূঢ় ! তবে শোন্ মন দিয়ে।

“রাঙাকাকা বললেন: 'হ'ল কি, এবার পুজোয় হঠাৎ দারুণ বাতে ধরল। একেবারে শয্যাশায়ী। সোম বচ্ছর আশা ক'রে আছি দশমীতে মা'র ভাসান দেখব গঙ্গার বুকে—এমন সময় কি না বাত ! আর সে কি সোজা বাত ? একেবারে গাঁটে গাঁটে ! বিছানা ছেড়ে গঙ্গাতীরে যাব কী ? এধার থেকে ওধারে পাশ ফিরতে পর্যন্ত পারি না। মা-কে কেঁদে বললাম: তোকে মা, কে বলে কৃপাময়ী ? রামপ্রসাদ বলেছিলেন কি সাধে:

মায়ের এমনি বিচার বটে !
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে তার কপালেই বিপদ ঘটে !

গিরিশ ঘোষ মিথ্যে লেখেননি:

পাষাণী পাষাণের মেয়ে,
বারেক না তুই দেখিস চেয়ে।

'ঘুম ভেঙে উঠে দেখি চোখের জলে বালিশ ভিজে—বিজয়া দশমীর গোধূলি লগ্নে।

'বাড়ির সবাই চ'লে গেছে গঙ্গায় ভাসান দেখতে। আমার বুক জুড়ে অভিমান উঠল ফুলে। বললাম: মাগো ! এরি নাম কি কৃপা ? বাইরের

লোকের কাছে ঘা খেলে ছেলে মার বুকে এসে জুড়োয়, কিন্তু যেখানে মা-ই বিমুখ সেখানে সান্ত্বনা দেবে কে? কৃত্তিবাসের উপমা মনে পড়ে মা।—শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথায় বাঁধবি তাগা?

'বলছি আর কাঁদছি একলাটি—বিছানার শুয়ে। হঠাৎ কেমন যেন ঘোর মতন এসে গেল, শুনলাম অপরূপ কণ্ঠস্বর—কী মিষ্টি যে—ওরে নির্মল! সে ভাবতে গেলেও—বলতে বলতে শয্যাশায়ী রাঙাকাকা শিউরে উঠলেন। চোখ মুছে ফের শুরু করলেন: 'কী বলব রে নির্মল। সে কি বলবার কথা বাবা? কে আমি? কী-ই বা আমার যোগ্যতা? সংসারী কীট, মাকে কতটুকুই বা ডেকেছি বল্? সুখে যখন থাকি তখন তাঁকে মনে পড়ে না, দুঃখে পড়লেই যত অনুযোগ অভিযোগ—মা মা মা! এর নাম কি ভক্তি? মা দেখা দেন না কি সাধে রে? অথচ তবু তিনি তো পাতানো মা নন, প্রতি মার বুকে মা হ'য়ে দুধ যোগাতেও তিনি, সন্তানের কণ্ঠে "মা মা" ব'লে কান্না জাগাতেও তিনি। হঠাৎ ঘরের আবছা আঁধারে জ্ব'লে উঠল এক অপরূপ সোনালি আলো—সে যে কী আলো রে নির্মল, কী বলব তোকে? আর সঙ্গে সঙ্গে কী দেখলাম রে!—সাম্‌নে দাঁড়িয়ে স্বয়ং জ্যোতির্ময়ী মা! দশভুজা! আ হা হা! আমার দিকে তাকিয়ে সে কী অপার স্নেহের হাসি রে নির্মল! বললেন: "দুঃখ কেন ধন? আমার ভাসান সবাই দেখতে পেল কেবল তুই পেলি নে? আচ্ছা, দেখ্ চেয়ে। বলতে না বলতে হঠাৎ দেখি সাম্‌নে দুকূলপ্লাবিনী গঙ্গা—কিন্তু জলের গঙ্গা নয় বাবা, তরল আলোর গঙ্গা, কাঁচা সোনার রঙ সে-আলোর প্রতি ঢেউয়ে—আর দেখলাম একটা দুটো নয়—অগুন্তি দুর্গা-প্রতিমা সেই গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে এক একটি সোনার নৌকোয়, আর প্রতি প্রতিমার মুখে মন্ত্রের মতন ঝঙ্কার বাজছে: দেখ্ চেয়ে ধন! নয়ন ভরে দেখ্—শুধু দেখ!'

রাঙাকাকার গলা ধ'রে এল, তিনি চোখ মুছলেন ফের।"

মনে আছে—সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমুতে পারিনি। কেবল মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে: "এও কি হয়?" পরে রাঙাকাকার দর্শনের কথা নির্মলদার দাদা বাঙ্কাদার মুখেও শুনেছিলাম, কাজেই এসব নির্মলদার বানানো গল্প নয়। তা ছাড়া নির্মলদা ছিলেন বদ্‌রাগী বটে, কিন্তু সত্যবাদী। আবাল্য মহাসাধক পিতা ও পিতৃব্যের সংস্পর্শে গ'ড়ে উঠেছিলেন শুধু-যে স্বভাব-ভক্ত হ'য়ে তাই নয়, স্বভাব-সত্যবাদী হ'য়ে। এ-সমস্ত মানুষটি আজ পরলোকে। কিন্তু তাঁর-মুখে-শোনা এই অলৌকিক দর্শনের কাহিনী আমার জীবনে প্রথম বিপ্লবের সূচনা করে। আমি যেন

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও মানতে বাধ্য হই যে সাধক মিথ্যা গাননি : "ডাক্ দেখি মন, ডাকার ম'ত—কেমন শ্যামা থাকতে পারে ?"

অথচ তবু মন যে বিশ্বাস ক'রেও করতে চায় না। তাই না আবহমান কাল নাস্তিক বুদ্ধির সঙ্গে আস্তিক অন্তরের রফা আর হোলো না কোনো মতেই। দেহের বস্তুকণা, মনের সংশয়, সংসারের হাজারো দুর্ভোগ সবই যে দাঁড়িয়ে সরল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। অথচ আশ্চর্য এই যে, তবু এই একরত্তি বিশ্বাস ম'রেও মরে না—পাহাড়-প্রমাণ নাস্তিক যুক্তির চাপেও নিষ্পিষ্ট হয় না, যুগে যুগে চলে দেহ ও মনের অস্বীকারের সঙ্গে অন্তরের সরল অঙ্গীকারের বিতণ্ডা! বহু বৎসর পরে শ্রীঅরবিন্দের চরণে আশ্রয় নিয়ে একদিন হঠাৎ যেন ফের শুনেছিলাম আমার বালক-মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি—নতুন ছিল শুধু যোগ-দীক্ষালব্ধ নব প্রতীতি—যে ছাড়া আর কেউ অক্ষতদেহে সংশয়ী মনের তীরন্দাজির সামনে দাঁড়াতে পারে না। তাই এ-গানটি এখানে দিচ্ছি—বাল্যকালের সংশয় কী ভাবে পরিণত বয়সের প্রতীতির সাম্‌নে হার মেনেছিল সেই কাহিনী পেশ করতে। গানটির শিরোনামা দিয়েছিলাম : "নাস্তিক।"

তনু বলে : "আমি জানি না অতনু, কেমনে মানিব তারে ?
তনুর ওপারে যে-অতনু তারে কেহ কি জানিতে পারে ?"
তবু তনু জানে, মানে যুগে যুগে
তাই আজো বাঁশি বাজে বুকে বুকে
তোমারি প্রণয়-জয়-যৌতুকে—একথা বলিব কারে ?
তনুরে অতনু না বহিলে তনু কেহ কি বহিতে পারে !

মন বলে : "চিনি মানস-মোহিনী চিন্তা চঞ্চলারে
মনের ওপারে যে-অচিন তারে কে বলো চিনিতে পারে ?"
তবু মন-কূলে মনের অতীতে
তুমি চমকাও চাহনি চকিতে
মন তারি আলো বিলায় নিভৃতে—একথা বলিব কারে ?
মনে তুমি ফুল না ফুটালে মনোমালা কে গাঁথিতে পারে ?

হে চির-শ্যামল! যত সুকোমল সুর প্রাণে ঝংকারে
তোমারি বাঁশির আনে রেশ—তাই সুরে সাধি সুরপারে।

জানে না তোমারে, তবু ত্রিভুবন
রূপ-রাসে পায় অরূপের ধন
বিরহে মিলন, মরণে জীবন—একথা বলিব কারে ?
"নাই নাই" বলি, তবু উচ্ছলি অধরারি অভিসারে !

তের

বলেছি—নির্মলদাকে আমি ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু সে-ভালোবাসার মধ্যে কতখানি রোমান্স ছিল বুঝবেন শুধু তাঁরাই যাঁরা ছেলেবেলাকার প্রথম সৌহার্দ্যের কথা স্মরণ করতে পারেন। আজো মনে পড়ে নির্মলদার অপরূপ মুখাবয়ব, গড়ন, হাসি, উচ্চারণ, কণ্ঠস্বর—কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টার 'পরে জোর দিই ? একথা অবশ্য ঠিক যে পিতৃদেব, রাঙা জ্যেঠামহাশয় বা গিরিশ মেসোমহাশয়কেও আমি কম ভালোবাসিনি। কিন্তু তাঁরা যতই কেন না বন্ধুভাবে আমার সঙ্গে মিশুন না, ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের ব্যবধানকে ডিঙিয়ে যখন কাউকে ভালোবাসা যায় তখন তার মধ্যে থাকতে পারে না নব-আবিষ্কারের শিহরণ। নির্মলদা আমার জীবনে এসেছিলেন first love হ'য়েই বলব। এর বাংলা "প্রথম প্রেম"—কানে ভালো শোনায় না। না শোনাক, তবু এইই তার সংজ্ঞা। এ-প্রেমের মধ্যে, যে-বিস্ময় থাকে তাকে ভোলা যায় না কিছুতেই। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে—তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বন্ধ হওয়া। সে আর এক রোমান্স। নির্মলদা আমার ঠিক সামনেই ব'সে ভূপেনদা কি মেঘেনদার সঙ্গে গল্পে মত্ত, আমিও তথৈবচ, কিন্তু আমিও চাইছি নির্মলদাকে দেখাতে যে তিনি আর আমার কেউ না, তিনিও দেখাতে চাইছেন যেন আমার সঙ্গে তাঁর সাত জন্মেও পরিচয় ছিল না। অথচ বেদনার মধ্যেও আনন্দের চকিতচ্ছটা খেলে যায় যখন তখন, কেন না জানি—নির্মলদার প্রাণও আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্মে ঠিক তেমনি আকুলি বিকুলি করছে, যেমন আমার প্রাণ করছে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে: মুখে আমরা যতই ঔদাসীন্য দেখাই, যতই অভিনয়ের ভঙ্গি করি—মনে মনে ততই উন্মুখ হ'য়ে উঠি পরস্পরের মিতালির জন্মে, বাইরে যতই দেখাই তাচ্ছিল্য—ভিতরে ভিতরে ততই অধীর হ'য়ে উঠি পরস্পরের স্নেহস্পর্শের জন্মে।

পিতৃদেব জানতেন সবই, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করতেন না আমি না দরবার করলে। আমার সঙ্গে তিনি সর্বদাই ব্যবহার করতেন এমন ভাবে যাতে আমার

আত্মসম্মানে ঘা না লাগে—এ-বিশ্বাস না ভাঙে যে আমি বয়সে নাবালক হ'লেও স্বাধীনতার দাবিতে সাবালক। নির্মলদা আমাকে গভীর স্নেহ করেন জেনে নির্মলদার প্রতি তাঁর স্নেহও গভীর হয়ে উঠেছিল। আমার উপর নির্দেশ ছিল—একলা বাড়ির বাইরে না বেরুতে। কিন্তু আমি চাইতেই অনুমতি দেন যে নির্মলদার সঙ্গে বেরুতে পারি। তাঁর ভয় ছিল পাছে আমি রাস্তা পার হ'তে গাড়ি চাপা পড়ি। নির্মলদার অভ্যুদয়ের আগে তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন হেসে: "কার সঙ্গে বেরুতে পারবি শুনবি? যার গোঁফ আছে।" সে-সময়ে গোঁফ কামাতেন খুব কম প্রবীণ। নির্মলদা শুনে মহাখুশি, বলতেন প্রায়ই সগর্বে: "দেখলি রে অপোগণ্ড! তোতে আমাতে তফাৎ?—এই দেখ্ আমার গোঁফ—থুড়ি, গাঁফ" ব'লেই সদ্যোস্তিন্ন গুম্ফের দুই প্রান্ত চোমরাতেন আর আমি হেসে কুটিকুটি। নির্মলদা ছিলেন সত্যিকার রসিক, কিন্তু তিনি যদি হতেন অরসিকের রাজা তাহলেও বুঝি আমি তাঁর এতটুকু ঠোঁট বেঁকানো দেখে হেসে গড়িয়ে পড়তাম সমানই। তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে আমার যেন চোখ তৃপ্ত হ'ত না, মনে প'ড়ে যেত পিতৃদেবের অতি প্রিয় পদাবলী: "জনম অবধি হাম রূপ নিহারলুঁ নয়ন না তিরপিত ভেল।" শুধু তাঁর রূপই বা বলি কেন? তাঁর রুচিও আমাকে ছিনিয়ে নিত আমার নিজের রকমারি বদ্ধমূল প্রেজুডিস থেকে। যেমন ধরুন, আমি খেলাধুলার প্রতি কোনোদিনই খুব প্রসন্ন ছিলাম না—কিন্তু নির্মলদা যেই বললেন টেনিস যে খেলতে পারে না সে অসভ্য, অম্‌নি সুরধামের সামনের মাঠে টেনিস কোর্টের বায়না ধরলাম, নির্মলদা হ'লেন আমার টেনিস-গুরু, উঠলাম টেনিসে মেতে—দেখাতেই হবে যে টেনিসেও আমি বড় কেওকেটা নই—নৈলে নির্মলদার কাছে মান থাকে না যে! কিম্বা ধরুন, নির্মলদা যেতেন ফুটবল ম্যাচ দেখতে: অম্‌নি, ওমা, দুমাসের মধ্যেই আমি হ'য়ে উঠলাম ফুটবলের পাণ্ডা! ১৯১১ সালে মোহনবাগানের সাহেবদের হারিয়ে শীল্ড জিতে নেওয়া উঃ, সে কি ভুলবার?—সাক্ষাৎ গোরাদের হারালো ভেতো বাঙালি! মনে পড়ে: সে-ম্যাচে নির্মলদার সঙ্গে আমি মাঠে হাজির পাঁচ ঘণ্টা আগে—গ্যালারিতে সীট পেতে! তিনি গর্জাচ্ছেন: "বাক্ আপ্—শূট্—পাস্"—আমিও দোয়ার দিচ্ছি সঘনে। দু ঘণ্টা চেঁচিয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন গলা আমার বসা নয়—একেবারে নেতিয়ে পড়েছে—ফিশ ফাশ ফিশ! কিন্তু উপায় কি? নির্মলদার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারলে কি মান থাকে?

একটা কথা আমার আজকাল খুব বেশি ক'রেই মনে হয়—যখন আমার বাল্য-জীবনের কথা ভাবি। আমি কাউকেই সত্যি ভালোবাসতে পারি নি যে হাসতে

ভালো না বাসে। মেঘেনদা, ভুপেনদা, নির্মলদা সবাই ছিলেন হাসিখুশি। নির্মলদা তার উপরে খাঁটি রসিক—শুধু হাসতে নয়, হাসাতেও তাঁর জুড়ি ছিল না আমার সমবয়সীদের মধ্যে। কত মজার মজার গল্পই যে করতেন—আজো ভুলতে পারি নি। দু'একটা উদাহরণ দিলামই বা। কারণ হাসতে পারার ক্ষমতা সবারই থাকলেও হাসাতে পারে এক প্রতিভা ওরফে রসিক।

"জানিস মণ্টু," বললেন নির্মলদা, "আমাদের এক আত্মীয় আছেন শান্তিপুরে—তাঁকে আমরা বলি মামা। মামা ভারি রসিক। একদিন গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা না কিসে তিনি পড়লেন—যার বুকের মাঝখানে তিল সে কদাচ মূর্খ হয়। মামা তো ভেবেই সারা।

'কী ব্যাপার, মামা?'

'আর ব্যাপার ভাই, মনে শান্তি নেই। এই দেখ্, ছাপার অক্ষরে দৈবজ্ঞের লেখা: বক্ষের মাঝখানে তিল থাকিলে সে কদাচ মূর্খ হয়! আমার বুকের যে ঠিক মাঝখানেই তিল—থুড়ি, তাল।"

'তবে আর ভাবনা কি?'

'ভাবনা নেই? তুই বলিস কি নির্মল? ধর্ যদি আমি ঐ কদাচর মধ্যে পড়ে গিয়ে থাকি?' ব'লে নির্মলদার সে কী হাসি!

কয়েক বৎসর বাদের ঘটনা। নির্মলদার অমন ভ্রমরকান্তি কুঞ্চিত কুন্তলে "শনির দৃষ্টি পড়েছে গা" বলতেন নির্মলদা। অমন ললনা-লাঞ্ছিনী কেশসমৃদ্ধি দেউলে হবার জো! মেসোমহাশয় বলতেন: "দেখ দেখ, নির্মল আমাদের চাঁদ ডুবু-ডুবু হওয়ার লগ্নে কুমুদিনীর মতনই ম্লান!" নির্মলদা সে কত কবিরাজ দেখালেন—কত তেল, গঙ্গামৃত্তিকা, বটিকা, শাম্পু, টোট্‌কা—উঁ হুঁ:—চুল রাজি নয় শীর্ষে বসবাস করতে! একদিন মেজ-মাসিমা শুনে বললেন: "নির্মল? শোনো। টাকের খুব ভালো ওষুধ আছে হোমিওপ্যাথিতে।" নির্মলদা তখন নটশিরোমণি শ্রীগিরিশ ঘোষের কাছে লুকিয়ে লুকিয়ে অভিনয়ে তালিম নিচ্ছেন তো—মেজ-মাসিমার কথায় নটোচিত ম্লান হেসে বললেন: "নেই মাসিমা নেই—জানে শুধু ঐ হা হতোস্মি।"

"আমি বলছি আছে—শোনো নির্মল—"

"বৃথা মাসিমা, বৃথা," বললেন নির্মলদা সদীর্ঘশ্বাসে, "যদি থাকত—তবে আমাদের শান্তিপুরের মামা যে মামা তিনিও কি হাল ছেড়ে দিতেন?"

মাসিমা হেসে বললেন: "সেই 'কদাচ মূর্খে'র মামা? কিন্তু—"

"শুনুন মাসিমা ! তাঁরও টাক পড়ল শেষটায়। কেউ ঠেকাতে পারল না। তবে শেষের দিকে তিনি ভবিতব্যকে মেনে নিয়েছিলেন ফিলসফারের মতনই—এই যা। কী ভাবে শুনবেন ! মামার যখন চুল ওঠা শুরু হ'ল তখন তিনি আমার চেয়েও বেশি অধীর হয়েছিলেন—কত তেল মালিশ টোটকা শিকড়—যে যা বলে মামা তাই করেন চুলের অপঘাত ঠেকাতে। শেষে একদিন আমাদের বাড়ির দেয়ালে একজনের ছবি দেখেই ব'সে পড়লেন। বললেন : 'হা হতোস্মি ! উনি যখন টাককে ঠেকাতে পারেন নি তখন আমার কী সাধ্য ?' মাসিমা, সে ছবিটি কার জানেন : সপ্তম এডোয়ার্ডের—হা হা হা !" মাসিমাও হেসে কুটিকুটি।

হাসির রেশ মিলিয়ে যেতে মাসিমা ধরলেন ফের : "কিন্তু ঠাট্টা না নির্মল, সত্যিই হোমিওপ্যাথিতে টাকের ওষুধ আছে। শোনো, আমার একবার মাথার চুল উঠে যেতে শুরু হ'তে খুব জলুনি ধরল মাথার মাঝখানে—কেন জানি না। খুব গরম হয়ে দব্‌দব করত আর জলত। এই হ'ল সিম্‌টম। তা তোমার টাক কি জ্বলে ?"

নির্মলদা (পূর্ববৎ নাটকীয় ঢঙে) : জ্বলে মাসিমা—কিন্তু (খুব গম্ভীর হ'য়ে) সে টাক নয়।

মাসিমা (আশ্চর্য হ'য়ে) : টাক নয় ? তবে ?

নির্মলদা (বুক চেপে ধ'রে, আর্তকণ্ঠে) : হৃ-দ-য়।

মাসিমা মুখে আঁচল দিয়ে হাসতে লাগলেন—খিল খিল খিল—তিন মেয়ে শান্তি সুধা কল্যাণী তো হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে আর কি ! মেসোমহাশয় পরে এ-গল্পটি করতেন কত লোকের কাছেই, বলতেন নির্মলদাকে দেখিয়ে : "এ সাঁচ্চা রসিক বুঝলে—ভেজাল নেই এখানে।"

মেশোমহাশয় মিথ্যে বলেন নি। কারণ নির্মলদা ছিলেন শুধু সাঁচ্চা রসিক নয়—সাঁচ্চা সদানন্দ—যেখানেই যেতেন বসতেন আসর জমিয়ে—তরুণ বয়সেই। মেসোমহাশয় বলতেন ওর ভাবনা কী ? চেহারাতেই half the battle—বুঝলে না ?"

অনেক বৎসর বাদের আর একটি গর্ভাঙ্ক।

আমি পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আট বৎসর অজ্ঞাতবাস যাপন করে ১৯৩৭ সালে ফিরে গান গেয়ে "সারা বাংলা দেশ চ'ষে বেড়াচ্ছি" (রবীন্দ্রনাথের ব্যাজোক্তি আমাকে লক্ষ্য ক'রে) এমন সময়ে একদিন একই আসরে আমি ও

নির্মলদা। নির্মলদা অপূর্ব আবৃত্তি করলেন রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাস"। বলতে ভুলেছি, ইতিমধ্যে নির্মলদা কলকাতার রঙ্গমঞ্চে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ব'লে গণ্য হয়েছিলেন—আমরা তো মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম।

পরে আমি গাইলাম আমার সে-যুগের একটি মার্কামারা গান, ভৈরবীতে কীর্তন—আঁখরসহ—"বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম"। নির্মলদা আমাকে জড়িয়ে ধ'রে "আহা!" ব'লেই চোখ মুছলেন।

আবৃত্তি ও গানের পরে আমাদের পাশাপাশি বসানো হ'ল চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় মহাভোজে। নির্মলদার এক ভাইঝি মীরা আমাদের সামনে থালা রেখে হেসে বলল: "আপনাদের দুজনকে পাশাপাশি গলাগলি ভারি মানায়, ফুল-কাকা! মনে হয় বটে ভাই ভাই।"

নির্মলদা (পিঠপিঠ): যা বলেছিস মীরা! কেবল একটা কথা বলি চুপি চুপি: এইজন্যেই আমরা উঠেছি।

মীরা (সবিস্ময়ে): মানে?

নির্মলদা: মানে, মণ্টু যে গানে এত নাম করেছে তার কারণ ও আমার মতন দেখতে। আর আমি যে থিয়েটারে ডাকসাইটে অভিনেতা হয়ে উঠেছি তার কারণ আমি ওর মতন দেখতে।

সকলের মধ্যে সে কী হাসি!

এক্ষেত্রে আমাকেও কিছু বলতেই হয়, নৈলে মান থাকে না। বললাম: "তবে আমিও একটা গল্প বলি শোন মীরা! আমাদেরি মতন দুই ভাই যদু মধু একবার গলাগালি ছেড়ে দলাদলি শুরু করে। যদুর ছিল দাড়িগোঁফ, মধুর দাড়িগোঁফ কামানো। যদু একদিন রেগে মধুকে বলল: 'তোর মুখ দেখলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় রে। তোর মুখের সঙ্গে আমার মুখের আদল আছে ব'লেই না আমি দাড়ি রেখেছি।' মধু বলল: 'আর আমার মুখ তোর মতন সজারুর দাড়িতে অখাদ্য হ'য়ে উঠেছিল ব'লেই না আমি দাড়ি কামিয়েছি।' মনুসংহিতায় আছে—এরাও দুজনে ছিল নাকি আমাদের মতন মামাতো পিসতুত ভাই—একেবারে হরিহরাত্মা।"

আর একটি মাত্র উদাহরণ দিই নির্মলদার প্রত্যুৎপন্নমতির। বলেছি তিনি যখন সুরধামে প্রথম আসেন তখন তাঁর দিব্যি গোঁফ ছিল। পরে একবার শান্তিপুরে গিয়ে গোঁফ কামিয়ে কলতাতায় ফেরেন। রাঙা-জ্যেঠামহাশয়ের ছোট ছেলে রবির

বয়স তখন সাত কি আট—(সে এখন দিল্লিতে সঙ্গীত-অধ্যক্ষ)—বলল : "এ কী ! নির্মলদা ! আপনাকে যে আর চেনাই যাচ্ছে না !"

নির্মলদা (তর্জনী দিয়ে উপরের ঠোঁট ঢেকে তৎক্ষণাৎ) : এইবার ?

সত্যি, নির্মলদা ছিলেন ব্যক্তিরূপের বিকাশে একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। শুধু রূপে গুণে প্রতিভায় নয়—জীবন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য তাঁর চলনে বলনে পদে পদেই ফুটে উঠত। তাছাড়া তাঁর ছিল সৎসাহস। স্বয়ং গিরিশ ঘোষ তাঁকে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন : "তুমি বড় অভিনেতা হবে।" মহাজনের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু এজন্যে নির্মলদাকে কম সইতে হয় নি। শান্তিপুরের কুলীন ব্রাহ্মণ—পরম ভাগবত পিতার যোগ্য পুত্র—পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা হবে ? তাঁর আত্মীয় স্বজন সবাই রৈ রৈ ক'রে উঠলেন। কিন্তু নির্মলদা যা একবার ধরতেন আর ছাড়তেন না—লোকমতকে হেসে উড়িয়ে দিয়েই অভ্যুদিত হ'লেন পেশাদারী রঙ্গঞ্চে। মনে রাখবেন সে সময়ে শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি ছাড়া ভদ্রঘরের শিক্ষিত কোনো যুবকই থিয়েটারে ঢোকেনি। আমি বলছি না নির্মলদা থিয়েটারে ঢুকে ভালো করেছিলেন। কেন না সে সময়ে থিয়েটারের আবহ ছিল অত্যন্ত কলুষিত। কিন্তু নির্মলদা থিয়েটারে ঢুকেও একদিনও মদ খাননি, কি বেলেল্লামি করেন নি। তাঁর অনিন্দ্য কান্তি, মঞ্জুভাষ ও মিষ্ট হাসিতে সবাই মুগ্ধ হ'ত। সবাই মানত—বড় ঘরের ছেলের নিখুঁৎ শালীনতা বটে ! শেষ পর্যন্ত তাঁর মুখের উজ্জ্বল হাসিটি একটুও স্তিমিত হয়নি, সকালে উঠেই ঠাকুরঘরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যপূজা ছিল তাঁর প্রথম কাজ ও থিয়েটারের শেষে তাঁর ছবির সামনে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে শয়ন—শেষ কৃত্য।

এহেন শ্রদ্ধাবান্, অমায়িক স্নেহশীল প্রতিভাবান্ ভাইকে ভালো না বাসবে কে ? কিন্তু তা বলে মনে করবেন না যেন যে এ ছিল ঠিক মামুলি ভাই-ভাইয়ের স্নেহ। সে-সময়ে আমার "তুত" ভাই বোন (first cousin) ছিল সংখ্যায় পঞ্চাশের উপর। কিন্তু এদের মধ্যে অনেককেই আমি ভালোবাসলেও কাউকেই নির্মলদার মতন স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতে পারিনি। একথা এত জোর দিয়ে বলছি শুধু প্রতিপন্ন করতে যে, নির্মলদা আমাকে নাস্তিকতার রসাতল থেকে ভক্তির স্বর্ণশিখরে কিছুতেই এত সহজে টেনে তুলতে পারতেন না যদি তার আনন্দময় আরোহণী না যোগাত আমাদের পরস্পরের প্রতি নিষ্কলুষ ভালোবাসা। সুভাষকে আমি আরো গভীরভাবে ভালোবেসেছিলাম বটে, কিন্তু

সে পরে—যৌবনে। আমার বাল্যজীবনের মধ্যকাণ্ডে আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিলেন নির্মলদা। আজো ভাবতে মনে শিহরণ জাগে যে, ভগবানের করুণায় এমন শুচি ও উজ্জ্বল সখ্যের স্বাদ পেয়েছিলাম বাল্যকালেই। তাঁর অনিন্দ্য কান্তি চেয়ে চেয়ে দেখে যেন আমার আশ মিটত না, তাঁর সুমিষ্ট প্রবল কণ্ঠস্বর আমার কানে যেন সুধা নিংড়ে ঢেলে দিত, তাঁর হাসির ঢেউয়ে আমার প্রাণের সুরধুনীতে কলধ্বনি উঠত জেগে—সব চেয়ে ভালো লাগত তাঁর আলিঙ্গন ও কথায় কথায় আমার গাধা, ফাজিল, অকালপক্ক ইত্যাদি সুমধুর নামকরণ। সত্যি বলছি, আমার মন সময়ে সময়ে যেন অথই আনন্দে সাঁতার কাটত যখন রাতে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে শুতাম আর সকালে উঠেই দেখতাম তাঁর নিদ্রাশ্লথ পবিত্র মুখ—যাতে সংসারের তাপগ্লানির লেশও ছিল না। মনে পড়ত শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে ঠাকুরের একটি কথা যে অবিবাহিত ব্রহ্মচারী ছেলেদের তিনি চাইতেন এই জন্যেই যে কিশোর মন বেদাগ—সাংসারিক মোহগ্লানিমুক্ত। কত সত্যি কথা! পরে একদিন নির্মলদা বলেছিলেন আমায়—করুণ হেসে—তখন তিনি বিবাহিত: "মনে পড়ে মণ্টু, ঠাকুরের কথা—রশুন যে-বাটিতে একবার বাটা হয়েছে সে-বাটি যতই ধোও না কেন একটু গন্ধ লেগে থাকবেই? তাই তো আজ আর আমার মনে এমনকি ঠাকুরের নামেও সে-সাড়া জাগে না ভাই! মনে আছে তোর—আমরা দু'জনে যখন দক্ষিণেশ্বরে যেতাম, ঠাকুরের ঘরে বসবামাত্র কেমন বুকে জেগে উঠত উচ্ছ্বাস—চোখে জল? কিন্তু আজকাল দক্ষিণেশ্বরে গেলেও আর সে-ভক্তিভাবে মনপ্রাণ ছেয়ে যায় না—যাবে কী ক'রে বল্? মনে পড়ে না ঠাকুরের উপমা—ব্রহ্মচারীর মন শুকনো দেশলাইয়ের কাঠি, ভগবানের নামের স্পর্শে এক মুহূর্তে জ্ব'লে ওঠে, আর সংসারীর মন ভিজে কাঠি হাজার ঘষো জ্বলে না তো—শুধু কাঠিগুলোই নষ্ট!"

নির্মলদার এ-আক্ষেপ শুনে সেদিন আমি চমকে উঠেছিলাম বেশ মনে আছে। কেননা নির্মলদা বিবাহ ক'রে সংসারী হবেন একথা আমার কৈশোরে আমি ভাবতেও পারতাম না। সঙ্গে সঙ্গে যেন নতুন ক'রে আবিষ্কার করেছিলাম শুধু পবিত্রতার সঙ্গে ভক্তির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধই নয়—দুই কিশোর ভক্তিপন্থীর স্নেহসম্বন্ধ ভগবানের আশীর্বাদে কী বিমল আনন্দময় হ'য়ে উঠতে পারে এ-সত্যটিও বটে।

কৈশোরের স্নেহপ্রীতি ভগবদ্‌ভক্তিবিধৃত হ'লে কেমন অপরূপ হয়ে ওঠে যখনই স্মরণ করি তখনই যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করি—পবিত্রতার সঙ্গে আনন্দের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আমরা ভগবানকে ভালোবাসার দরুনই হয়েছি সদানন্দ সতীর্থ

একথা ভাবতেও যেন অঙ্গে অঙ্গে জেগে উঠত পুলক-উচ্ছ্বাস।—নির্মলদা আমাকে ভালোবাসেন আবিষ্কার করতাম রোজই যেন নতুন ক'রে, আর মন হয়ে উঠত আত্মহারা—যেন এ একটা অঘটন। কবি এডগার অ্যালেন পো-র কথা মনে পড়ত—রাঙা জ্যেঠামহাশয় প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন—"It is a happiness to wonder!"

এ-আনন্দ-বিস্ময়কে ভগবানের দান ব'লে চিনতে সে-সময়েও আমাকে বেগ পেতে হয় নি, কেবল একটি সত্য সে-সময়ে আমি দেখতে পাই নি: যে, নির্মলদা ও আমার মধ্যে এ-অম্লান ভালোবাসা জেগে উঠেছিল বিধাতারই বিধানে—কেননা এই ভালোবাসার ছোঁয়াচেই আমি ভালোবাসতে শিখেছিলাম—যাঁকে নির্মলদা সবচেয়ে ভালোবাসতেন: শ্রীরামকৃষ্ণদেব। বহু বৎসর পরে নির্মলদাই আমাকে প্রথম চম্‌কে দেন এ-সত্যটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে—বলেন: "ওরে, ঠাকুরকে ভালো না বেসে তুই পার পেতিস কেমন ক'রে শুনি! আমি যাঁকে ভালোবেসেছি তাকে যে তোরও ভালো না বেসেই উপায় ছিল না রে—যখন আমাকে তুই ভালোবেসে ফেলেছিলি। সাহেবেরা বলে না—'Love me, love my dog?' এখানে কেবল চুপি চুপি dog-কে উল্টে দেওয়া হয়েছে—হা হা হা।"

এর প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে শ্রীঅরবিন্দের একটি পত্রের নির্দেশে হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে যায়। তিনি লিখেছিলেন: "Your destiny is to be a yogi" পড়বামাত্র মনে আছে, কে যেন দেখিয়ে দিল—কেন আমার নাস্তিক পরিবেশে নির্মলদার মতন পরম আস্তিকের অভ্যুদয় হয়েছিল সে-সময়ে। আমার কোষ্ঠীতেও লেখা ছিল আমি সন্ন্যাসী হব। মেজমাসিমা প্রায়ই বলতেন এজন্যে আমার মা নাকি কাঁদতেন: "আমার একমাত্র ছেলে কিনা সন্ন্যাসী হবে!" কিন্তু সন্ন্যাসী হওয়া আমার ভবিতব্য—খণ্ডাবে কে? তাই না গেরুয়া বসন তথা গঙ্গাস্নান আবাল্য আমার মন টানত, তাই না মহাভারতের কৃষ্ণকথা আমাকে অভিভূত করত, তাই না নির্মলদার মতন একরোখা রামকৃষ্ণ-পূজারীর দৈব অভ্যুদয় হয়েছিল সুরধামের গান-কাব্য-হাসির এস্থেটিক আবহে। অর্থাৎ যোগদীক্ষা আমার নিয়তি ছিল ব'লেই নির্মলদার সে-সময়ে আমাদের এখানে আসাটাও ছিল ভবিতব্য। কেন না এ-সময়ে যদি তিনি না আসতেন তবে আমার নাস্তিক পরিবেশে আমি কিছুতেই আমার দুই হিরোর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারতাম না—আর জীবনের প্রভাতেই এ-প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না পারলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঈশ্বরদীক্ষায় দীক্ষিত হ'য়ে বারো তের বৎসরেই

পণ নিতাম না যে কোনোদিনও বিবাহ করব না। অবশ্য এ-ধনুর্ভঙ্গ পণ ছেলেবেলায় নেয় অনেকেই কেবল রাখতে পারে তারাই যারা পেয়েছে ঠাকুরের কৃপা। কিন্তু শুধু এ-চিরকুমার ব্রত গ্রহণ করার জন্যেই নয়—যে-পরিবেশে আমার শৈশব ও বাল্যজীবন গ'ড়ে উঠেছিল সে-পরিবেশে ভগবানের ডাক বড় জোর কানে বাজতে পারে কিন্তু প্রাণে বেজে উঠবার সুযোগ পায় না। তাই নির্মলদাকে ভালোবাসবার দরুনই যে পরমহংসদেবের কৃপার আলো আমার অন্তরে পৌঁছেছিল পরমহংসদেবের এ-বিশ্বাসকে আমি নির্ভরযোগ্য ব'লেই মনে করি, যদিও একথা অপরের কাছে প্রমাণ করা অসম্ভব। নিবেদিতা তাঁর My Master As I saw Him বইটিতে এক জায়গায় লিখেছিলেন (এ-উক্তিটি পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষই উদ্ধৃত ক'রে বলে এ অপরূপ বইটি পড়তে): "Some of the deepest convictions of our lives are gathered from data which, in their very nature, can influence no one but ourselves." আমার মনে হয় যাঁরাই জীবনের দৃশ্যত: অকারণ অথচ গভীর সার্থকতা-ভরা নানান অঘটনের কথা একটু তলিয়ে ভেবে দেখবেন তাঁরাই এ-উক্তিটির সত্যতার স্বপক্ষে এজাহার না দিয়ে পারবেন না। তাই প্রমাণ-প্রয়োগের অপচেষ্টা রেখে সরলভাবে ব'লে যাই নির্মলদা আমার জীবনে বিধাতার বরদান হ'য়ে এসেছিলেন ঠিক কী ভাবে।

চৌদ্দ

নির্মলদা যখন সুরধামে এসে মেট্রোপলিটান স্কুলে ভর্তি হন তখন তিনি কাব্য, সাহিত্য, সংগীত, হিন্দুস্থানি গানে তালের চরকাবাজি—এসবের কিছুই খবর রাখতেন না। তাই তিনি আমাকে যেদিন প্রথম বললেন: "মণ্টু, লালচাঁদ বড়ালের 'সখি আই হুঁ ময়' জাতীয় বাজে ওস্তাদি গানে তানের শ্রাদ্ধ ক'রে কী হবে?" সেদিন আমি বিজ্ঞ হেসে বলেছিলাম: "এ হ'ল আর্ট নির্মলদা, আর্ট! আপনি বুঝবেন না।"

ভেবেছিলাম নির্মলদা এতে মুষড়ে পড়বেন। কিন্তু নির্মলদাকে তো তখন চিনতাম না—যিনি জানতেন ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে-র মন্ত্র! কিন্তু বলি যথাপর্যায়ে।

নির্মলদা পিতৃদেবকে সত্যিই শ্রদ্ধা করতেন ও বিশেষ ভালোবাসতেন তাঁর ভক্তির গান ও স্বদেশী নাটক, কিন্তু নাস্তিকতার স্বপক্ষে তাঁর যুক্তিতর্ক আদৌ বরদাস্ত করতে পারতেন না। আমাকে প্রথম প্রথম তিনি তাঁর এ-বিদ্রোহিভাব জানান নি,

কিন্তু আমি তাঁর নেওটো হ'য়ে উঠতে আমার নাস্তিক যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে নানা অছিলায়ই আস্তিকতার হুঙ্কারে আমাকে অপদস্থ করতে চাইতেন। কিন্তু তখনো আমি পিতৃদেবের পরিমণ্ডলের মধ্যে শোভমান—আর্ট ও যুক্তির আনন্দে মশগুল—কাজেই নির্মলদার আস্তিক্য-তীরন্দাজি আমাকে স্পর্শ করত না।

কিছুদিন বাদে নির্মলদা রুখে উঠলেন: আস্তিকতার জয়ধ্বনি ছেড়ে স্থুরু করলেন নাস্তিকতাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ। খুব নিপুণ ব্যঙ্গ—আর বেশিক্ষণ নয়। তাঁর অনুরাগী হ'য়ে ওঠার দরুনই তাঁর ব্যঙ্গ আমাকে ক্রমশ বিঁধতে আরম্ভ করল। আঘাত দিতে পারে সে-ই যে ভালোবাসে—আর নির্মলদা আমাকে সত্যিই গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন তো। তারপরে কেমন ক'রে কী ঘটল ভালো মনে নেই, কেবল মনে আছে একদিন সমাধি নিয়ে তর্কের পরে তাঁর সঙ্গে গেলাম শান্তিপুরে—পিসেমহাশয়কে দেখতে, বা তাঁর ভাবসমাধি দেখতে বলাই ভালো।

মনে আছে সে-সময়ে নির্মলদার আস্তিক যুক্তি আমার মনকে স্পর্শ করলেও আমার মরমে পশেনি। কাজেই পিসেমশায়কে দেখতে গিয়েছিলাম খানিকটা কৌতূহল-বশেই বলব।

কিন্তু তাঁকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। কী স্থন্দর পুরুষ! মুখের উপর সে কী দিব্য আভা! কী স্নিগ্ধ হাসি! আর কী স্থন্দর আয়ত নেত্র—সর্বদাই যেন জলে ভাসছে!

আমাকে দেখেই বললেন: "এসো এসো বাবা! দ্বিজুর ছেলে? বেশ বেশ। শুনেছি তুমি চমৎকার গাইতে পারো। ভক্তির গান জানো? আমি অন্য কোনো গান শুনি না।"

আমি পুলকিত হয়ে ধ'রে দিলাম কথামৃত থেকে একটি গান। নির্মলদা আমাকে আগে থেকে ব'লে রেখেছিলেন এ-গানটি পিসেমশায়ের একটি বিশেষ প্রিয় গান। এ গানটির স্থরও আমাকে নির্মলদাই শেখান। সহজ সাদামাটা ভৈরবী—একবার শুনেই শিখে নিয়েছিলাম। গাইলাম হার্মোনিয়ম বাজিয়ে:

সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ করো করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা ইন্দ্রপদ, কারে করো অধোগামী।

তারপরে যা ঘটল আমি কোনোদিনই ভুলতে পারব না। গান শুনতে শুনতে

পিসেমহাশয়ের গৌরবর্ণ মুখ রাঙা হ'য়ে উঠল, নিমীলিত ছুচোখ বেয়ে অনর্গল অশ্রুধারা আর থেকে থেকে আবেগভরে হুঙ্কারধ্বনি! চরিতামৃতে ও অন্য বৈষ্ণবগ্রন্থে দশার কথা পড়েছিলাম, হুঙ্কারের কথাও যে পড়িনি তা নয়, কিন্তু গান শুনতে শুনতে পিসেমশায়ের মত শান্তমূর্তি লোক যে এভাবে ঘন ঘন হুঙ্কার দিতে পারেন ও তাঁর সারা শরীরে পুলকরোমাঞ্চ জেগে উঠতে পারে—এ আদৌ ভাবি নি।

বেশ স্পষ্ট মনে আছে—বাড়ি এসে একদিকে যেমন মন খারাপ অন্যদিকে তেমনি প্রাণ উতল। তাহ'লে সংসারে থেকেও এ-রকম দুর্লভ অবস্থা সম্ভব?—ভগবানের নামে শিহরণ, রোমাঞ্চ, অশ্রুধারা—এ কি সোজা কথা? পিতৃদেবকে গিয়ে ফের জেরা করা সুরু করলাম: "আপনি বলেন কী? এর নাম মাথা খারাপ? আপনি নিজেই কি 'ও কে গান গেয়ে চলে যায়' গাইতে গাইতে শ্রীগৌরাঙ্গের নামে মেতে ওঠেন না?"

পিতৃদেব তর্কোন্মুখ আত্মজকে কী যুক্তি দিয়ে শান্ত করেছিলেন মনে নেই, তবে মনে আছে যে একটু আশ্বস্ত হয়েছিলেন ও স্বীকার করেছিলেন যে যদি পিসেমহাশয় ভগবানের নামে পুলকশিহরণে মেতে উঠে থাকেন তবে তাতে খতিয়ে তাঁর লাভই হ'ল বৈ কি—যেহেতু পরমানন্দ যে-উপলক্ষেই আসুক না কেন—সেটা জমা হয় হাঁ-এর কোঠায়—প্রাপ্তির খাতায়।

ঠিক স্মরণ নেই, তবে যতদূর মনে প'ড়ে আমার বিজ্ঞ মূঢ় নাস্তিকতার ভাঙন ধরে মোটামুটি এই পর্যায়ে:

এক: ভক্তিযোগ প'ড়ে মনের মধ্যে জিজ্ঞাসার স্ফুরণ।

দুই: নির্মলদার অভ্যুদয় ও তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসা।

তিন: নির্মলদার আস্তিকতার গুণগান ও নাস্তিকতার নিন্দা।

চার: তাঁর উপরোধে আমার শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প'ড়ে বিহ্বল ভাব।

পাঁচ: মনের মধ্যে দ্বন্দ্বের সুরু: বিশ্বাস বড় না যুক্তি?

ছয়: নির্মলদার রাঙাকাকার দর্শনকাহিনী শুনে মনের মধ্যে অনেক সযত্নপুষ্ট ধারণার ওলটপালট হ'য়ে যাওয়া।

সাত: শান্তিপুরে গিয়ে পিসেমহাশয়কে গান শুনিয়ে তাঁর ভাবসমাধি অবস্থায় পুলক শিহরণ, কম্প, হুঙ্কার দেখে শুনে অথই জলে পড়া।

আট: শান্তিপুর থেকে কলকাতায় ফিরে আমার নাস্তিক পরিবেশের দোটানার মধ্যে পড়া। এবার এই দোটানার একটু বর্ণনা করার সময় এল।

সুরধামে পিতৃদেবের চারিদিকে যে-পরিমণ্ডলটি গ'ড়ে উঠেছিল তার ছিল ত্রিবিধ ঠমক: সাহিত্যিক, সাঙ্গীতিক ও হাস্যরসাল। আমার মাতৃদেবী যখন মহাপ্রয়াণ করেন তখন পিতৃদেবের বয়স ৩৭।৩৮—নানা স্থান থেকে পুনর্বিবাহের প্রস্তাব আসে। "না" বলতে বলতে বিরক্ত হ'য়ে পিতৃদেব শেষে গিরিশ মেসো-মহাশয়কে বলেন একটি প্রশ্নোত্তরপত্র (Questionnaire) রাখতে—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা আসতে না আসতে তার নাকের সামনে ধরবেন। শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী পিতৃদেবের জীবনীতে "সুরভি" অধ্যায়ের শেষে এ-প্রশ্নোত্তর পত্রটি ছেপেছিলেন। তা থেকে বাহুল্য-ভয়ে মাত্র কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর উদ্ধৃত করব।

প্রশ্ন: আমার ঘরকন্না দেখে কে?

উত্তর: ঘরই নেই তার আবার কন্না।

প্রশ্ন: আমার বৃদ্ধ বয়সে রোগে ইত্যাদিতে সেবা করে কে?

উত্তর: গিরিশ ও সুশী।

প্রশ্ন: আমার ছেলেপিলে দেখে কে?

উত্তর: মাস্টার।

প্রশ্ন: আমি বিবাহ করলে পরোপকার করা হয় না কি? যেহেতু আমি বিবাহে টাকা নিই না।

উত্তর: এতদূর স্বার্থত্যাগ শিখিনি।

প্রশ্ন: বিবাহ না করলে জীবনের উদ্দেশ্য থাকে না। আমার জীবনের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: সাহিত্যের সেবা।

সত্যিই সাহিত্যকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। এই সময়ে সাহিত্য-পরিষদে তিনি একটি গান সদলবলে গেয়ে লোককে মাতিয়ে তোলেন। বঙ্গভাষার এমন স্তব গান বিরল। তাতে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন:

জানো কি জননী, জানো কি কত যে আমাদের এই কঠোর ব্রত?
হায় মা, যাহারা তোমার ভক্ত নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত?
তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য সহেছি মা সুখে তোমারি জন্য,
তাই দুই হস্তে তুলিয়া মস্তে ধরেছি যেন সে মহৎ মান।

সে-সময়ে বাংলা বই লিখে প্রায় কেউই তেমন অর্থ করেন নি, এমন কি কবিগুরু

রবীন্দ্রনাথও নন। পত্রিকাদিতে সাহিত্যিক প্রবন্ধ, গল্প কি কবিতা লিখে প্রায় কেউই দক্ষিণা পেতেন না, বইটইও বেশি কাটত "পোকায়"—বলতেন অকিঞ্চন বাঙালি লেখকবৃন্দ। অন্তত সেযুগে লেখা যাঁদের নেশা তাঁরাও সাহিত্যকে পেশা করার কথা যে ভাবতেই পারতেন না একথা অকুতোভয়েই বলা যায়। এহেন যুগে তিনি মাতৃদেবীর মৃত্যুর পরে স্থির করেন পারিবারিক সুখ ছেড়ে সাহিত্যের সেবায়ই জীবন উৎসর্গ করবেন।

এই সাহিত্যের ছিল তিনটি ভাগ: নাটক, কাব্য, গান। স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে তিনি হাসির গান গাওয়া ছেড়ে নাটক-লেখায় মনোনিবেশ করেন। "প্রবাসে" নামে একটি অপূর্ব কবিতায় তিনি এই সময়ে যেন রোখ ক'রেই লেখেন:

হাস্য শুধু আমার সখা? দুঃখ আমার কেহই নয়?
হাস্য করে অর্ধজীবন করেছি তো অপচয়।

কিন্তু এ-উক্তি হ'ল শোকসম্ভব—কাজেই অত্যুক্তি। হাসি ও গান ছিল তাঁর সহজাত কবচকুণ্ডলের মতনই—না হেসে তিনি পারবেন কোত্থেকে? বারো বৎসর বয়সে তিনি চাঁদ দেখে একটি গান বাঁধেন ও শুধু গান বাঁধা নয় একটি চমৎকার সুর দিয়ে গাইতেন। আমার ঠাকুরদা দেওয়ান শ্রীকার্তিকেয়চন্দ্র রায় সে সময়ে ছিলেন বাংলা দেশের একজন সেরা গায়ক—রীতিমত কালোয়াৎ—খেয়াল শিখেছিলেন বিখ্যাত আহম্মদ খাঁর কাছে। তিনি একদিন আড়াল থেকে এ-গানটি শুনে চমৎকৃত হ'য়ে বালকপুত্রকে তলব করেন। পিতৃদেব ঠাকুরদাকে অত্যন্ত সমীহ করতেন, কাজেই ঠাকুরদা তাঁকে ভরসা দেওয়া সত্ত্বেও গাইতে সাহস পান নি। ঠাকুরদা হেসে বলেন: "ভয় কি রে? আমি তোর গান শুনে চম্‌কে গিয়েই শুনতে চাইছি, ধমক দিতে নয়। গা না।" অগত্যা পিতৃদেব গানটি স্বরচিত সুরে গেয়ে তাঁকে শোনান। শুনে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: "তুই গানে যশস্বী হবি।" পিতৃদেব এ-ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ ক'রে একবার হেসে আমাকে বলেছিলেন: "আর আমিও—বাপকা বেটা তো—তোকে এই ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে—তুই মস্ত গাইয়ে হবি কেন না তুইও তো নোস কেওকেটা।" প্রতি কথাই তিনি বলতেন এম্‌নি সরস ক'রে।

বলেছি, লোকেন কাকা, রাঙাজ্যেঠামহাশয় ও বিজয়কাকা পিতৃদেবের কবি-প্রতিভার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন ও প্রায়ই দুঃখ করতেন যে পিতৃদেব নাটক লিখতে গিয়ে কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেন। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে থেকে থেকে রকমারি বাগ্-বিতণ্ডা হ'ত। তিন বন্ধু একবাক্যেই বলতেন যে, নাটক লেখা ভালো হ'লেও কবিতা

লেখা আরো ভালো। পিতৃদেব বলতেন : "কিন্তু নাটক লেখা বেশি কঠিন।" লোকেন কাকা একদিন সুরধামে উদয় হ'য়ে এই নিয়ে ফের দুর্দান্ত তর্ক জুড়ে দিলেন। পিতৃদেব শেষে তর্কে হার মেনে বললেন : "আচ্ছা আচ্ছা, কবিতা লেখা ছাড়ব না তাহ'লে।"

কিন্তু বললে হবে কি ? এ-সময়ে তাঁর আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনির উপরে নাটক লেখার পরিশ্রমের পরে কবিতা লেখার সময় থাকত কতটুকুই বা ? লিখবার সময় পেতেন তিনি সকালে ঘণ্টা দুই ও রাত্রে বড়জোর একঘণ্টা। কাজেই লোকেন কাকার কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তিনি মন্দ্রর পরে আলেখ্য ও ত্রিবেণী ছাড়া আর কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করতে পারেন নি—যদিও নাটকের জন্য তাঁকে গান রচনা করতে হ'ত প্রচুর। গান বাঁধতেন তিনি অবলীলাক্রমে—কখনো কখনো হয়ত গুন গুন করতে করতে দাড়ি কামাতে কামাতেই মুখে মুখে গান বেঁধে আমাকে শোনাতেন। বিজয়কাকা দেখে শুনে তাঁর নাম দিয়েছিলেন "গানের পাখি।" এই গানগুলির জন্যে তাঁর অচিরেই নামডাক হয় বটে, কিন্তু তবু লোকে তাঁকে শুধু স্বদেশী গানের কবি ডি. এল. রায় ব'লেই ডাকত—তিনি যে কত বড় প্রেমের কবি ও ভক্তির কীর্তনী ছিলেন তাঁর স্বদেশী গানের সুর শুনতে শুনতে যেন ভুলে গেল সবাই—দুচারটি ব্যতিক্রম বাদে। এজন্যে আমার মনে বরাবরই খেদ রয়ে গেছে, কেন না আমি ছিলাম এই ব্যতিক্রমের দলে। আমার কী যে ভালো লাগতো মন্দ্রে তাঁর নবদ্বীপ ও সুখমৃত্যু, আলেখ্যতে বিধবা ও কবি, ত্রিবেণীতে প্রবাসে ও সোনার স্বপ্ন ইত্যাদি কবিতা পড়তে—তাঁর প্রেমের ও ভক্তির গানের তো কথাই নেই।

নির্মলদা এখানেও আমার সঙ্গে বাদ সাধলেন। বললেন এসব কবিতা ভালো বটে, কিন্তু কবিতা লিখে কেউ কখনো ভগবানকে পায়নি। কবিতা গান হাসি এরা হ'ল চিত্তরঞ্জক কি না সামাজিক বিলাস, ভগবান—অন্তরের অন্তর্যামী, ব'লে বলতেন : "তবে তুই গাইতেই যদি চাস তো গা"—ব'লেই ধ'রে দিতেন (তাঁর কণ্ঠ ছিল প্রবল ও সুমিষ্ট যদিও সুর তাঁর গলায় তেমন খেলত না :)

মজল আমার মন ভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে
বিষয়মধু তুচ্ছ হ'ল কামাদি কুসুম সকলে।

তিনি এ-বিষয়ে কত কথাই যে বলতেন—আর বলতেনও কি যেমন জোরের সঙ্গে, তেম্নি গুছিয়ে ! পরে বুঝি যে, যে-বিষয় কেউ মন দিয়ে চর্চা করে সে-বিষয় নিয়ে সে বলতেও পারে সহজেই। ভাষার জড়তা আসে—যখন ভাব কোনো উপলব্ধিতে কায়েমি হয় নি। নির্মলদা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালোবেসেছিলেন তাঁর

তীক্ষ্ণ তথা বলিষ্ঠ মনের সমস্ত ঐকান্তিকতা দিয়ে। কাজেই তাঁর চোখের দৃষ্টি হ'য়ে উঠেছিল যেমন ঋজু, ভাষাও ফুটে উঠেছিল তেমনি সহজ ছন্দে। তাই বলছিলাম যে, আমার মনকে আর্টের আসক্তি থেকে ছিনিয়ে নিতেই নির্মলদা এসেছিলেন—না এসে পারতেন না ব'লে। অর্থাৎ আমার নিয়তি আমাকে সন্ন্যাসের দিকে ঠেলতে চেয়েছিল ব'লেই এমন যোগাযোগ গ'ড়ে উঠেছিল—যার ফলে নির্মলদা ও আমার মধ্যে গভীর স্নেহসম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে। তিনি না এলে কাব্য সাহিত্য সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগে আমার কৈশোরেই ভাঁটা প'ড়ে যেত না। যৌবনে ফের এ-অনুরাগ জেগে ওঠে বটে, কিন্তু তখন আর এরা আমার মনকে তেমন বিহ্বল করতে পারে নি। পারবে কেমন ক'রে? আমি যে পেয়ে গিয়েছিলাম এক গভীরতর আনন্দের আস্বাদ, পুলোকোচ্ছল পূর্বরাগের উপলব্ধি। নির্মলদা আমার মনকে সেই যে নাড়া দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-কথামৃতের অভিঘাতে—সে-নাড়ার স্মৃতি মাঝে মাঝে নানা হৈ-চৈয়ে ম্লান হ'য়ে এলেও আবার জেগে উঠত—যেই মনে কোনো আঘাত বাজত। বৈরাগ্যেরও উদয় হ'ত সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু যৌবনের উচ্ছলতা, অটুট স্বাস্থ্যের চঞ্চলতা ও গানগল্পের মজলিশে পপুলারিটি এই তিনটি অনুষঙ্গী আমার এমন পিছু নিত যে ভগবদ্ভক্তি ভাঁটিয়ে প'ড়ে যেত তাদের আড়ালে। সাংসারিক যশ মান প্রতিষ্ঠা উচ্চাশা যে-অনুপাতে ফেঁপে ওঠে আধ্যাত্মিক ভাব ভক্তি অভীপ্সা ঠিক সেই অনুপাতেই ঢিমিয়ে আসে এ-কথা আমি প্রথম উপলব্ধি করি যৌবনের জয়যাত্রার লগ্নে। কিন্তু তবু নির্মলদা যে-বীজ আমার বাল্যমনে বুনে তাঁর স্নেহোৎসাহের সিঞ্চনে অঙ্কুরিত ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন সে-বীজ ছিল যাকে বলে "মরিয়া না মরে রাম।" নানা ওঠাপড়া, আশানিরাশা, দ্বিধাদ্বন্দ্বের কুটিল কারসাজিতে থেকে থেকে ভক্তি আমার প্রায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেত না কি আর? যেত বৈ কি। যৌবন-জলতরঙ্গের কি সোজা দাপট? কিন্তু তবু আশ্চর্য এই যে, তিমির-তুফান কেটে যেতে না যেতে ফের ভক্তির ডাক শুনতে পেতাম স্পষ্ট। অনেকদিন বাদে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার চারটি চরণ প'ড়ে আমার মনে হয়েছিল যেন ঠিক আমার সেই সময়ের তরুণ মনের অভিজ্ঞতার ছবি। কবিতাটি এই:

কালো মেঘ আকাশের তারাদের ঢেকে
মনে ভাবে জিৎ হোলো তার।
মেঘ কোথা মিলে যায় চিহ্ন না রেখে,
তারাগুলি রহে নির্বিকার।

একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। যখনই দুঃখ, নিরাশা, বেদনার ঝড়ে দিশাহারা মন কাঁদত "ভরাডুবি হ'ল ব'লে"—কি "যা একবার যায় তা আর ফেরে না"—অমনি ঘটত একটা না একটা অঘটন, আর ফিরে আসত শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি। এই বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়েই বুঝি অন্তরে অন্তরে যে, ঠাকুরের কৃপা হার মানতে জানে না—তাই বরাবরই অপ্রত্যাশিতভাবে আলোজয়ী মেঘচমূ নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যেত—আর সঙ্গে সঙ্গে তারাগুলিকে দেখা যেত তেম্‌নি জ্বলন্ত—অম্লান, "নির্বিকার!"

একটি মাত্র উদাহরণ দিই আমার বক্তব্যকে ফোটাতে। ১৯১৭ সালে আমি বি-এসসি পরীক্ষা দিয়ে ফেল করি—ব্যবহারিক রসায়নে। বি. এসসি নিয়েছিলাম পরে আমি আই-সি-এসে বিজ্ঞান নেব ব'লে। আমাদের দেশে তখন বিজ্ঞানের প্রতিপত্তির উঠতি বয়েস। তাই লোকজনের প্ররোচনায় "আই-এস-সি" নিলাম "আই-এ" না নিয়ে। আমার নেওয়া উচিত ছিল আই-এর পাঠ—সংস্কৃত, ইতিহাস ও ন্যায়। কিন্তু দশচক্রের ফেরে প'ড়ে আমি নিলাম আই-এস-সির পাঠ—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই আমার চক্ষুস্থির! এ কী কাণ্ড! কয়লা, ক্ষার, আগুন, বকযন্ত্র, তুলাদণ্ড, নানা দুর্গন্ধ গ্যাস—এই সব নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে সত্যি আমার কান্না আসত—কেন মতিচ্ছন্ন হ'ল আমার? থিওরেটিকাল ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে আমি অবোধ ছাত্র ছিলাম না, কিন্তু ল্যাবরেটরিতে এলেই আমার মনে হ'ত যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনের কথা। আমি তখন সত্যিই যে নিজেকে যুধিষ্ঠিরের মতন ধার্মিক মনে করতাম তা নয়, তবু তাঁর কথা মনে হ'ত হয়ত এই সান্ত্বনার কাছে হাত পাততে চেয়ে যে, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও যখন নরক-দর্শন করতে হয়েছিল তখন আমাকে প্রতি সপ্তাহে তিনবার ক'রে নরকে ঢুঁ মেরে যেতে হচ্ছে এতে এত ক্লিষ্ট হবার কী আছে? কিন্তু বৃথা প্রবোধ। ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেই আমার বুকের মধ্যে হু হু ক'রে উঠত, হায় হায়, আমি কি হ'য়ে দাঁড়ালাম তাই না কি যার অভ্যুদয়ে "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা" উল্টে গিয়ে বেজে উঠল বা—"কুলং বিনষ্টং জনকো বিষণ্ণঃ?"

এরকম ছাত্র যে প্র্যাকৃটিকাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে না এ-ভবিষ্যদ্বাণী করতে জ্যোতিষী হ'তে হয় না। ১৯১৭ সালে বি-এসসি পরীক্ষায় ফিজিক্স প্র্যাকটিকালে আমি টায়ে টায়ে পাশ করেছিলাম—একশোর মধ্যে একচল্লিশ পেয়ে—চল্লিশ পেলে পাশ। কিন্তু কেমিস্ট্রিতে প্র্যাকটিকালে লজ্জার হ'ল স্রেফ ভরাডুবি: একশোর মধ্যে

মাত্র ৩২ নম্বর—হা হতোস্মি! আমার গর্ব ছিল—আমি মেধাবী, পরীক্ষায় ফেল করতেই পারি না, কিন্তু "অতিদর্পে হতালঙ্কা"—আমি তো কোন্ ছার!

কেঁদে-কেটে আমি অস্থির! ভাবলাম বিবাগী হ'য়ে যাই—এ-কালামুখ আর যেন কাউকে না দেখাতে হয়। অবশ্য যদি হঠাৎ ধরণী দ্বিধা হ'য়ে আমাকে গ্রাস করতেন তবে সবদিক দিয়েই সুবিধা হ'ত—দমবন্ধ হওয়ার যন্ত্রণা বাদে। কিন্তু হায় রে, কলিযুগের কালাচাঁদদের লজ্জানিবারণ করতে ধরিত্রী দেবী এগিয়ে আসা ছেড়ে দিয়েছেন যে! কাজেই আমি ভাবতে লাগলাম কার "লোহার তরীতে" কোন্ অস্তাচলের নিরুদ্দেশে যাত্রা করি? ১৯১৮ সালে পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে গণিতে অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে হারানিধি মানকে ফিরে পেয়ে রগঘেঁষে প্রাণ বাঁচে বটে—কিন্তু ১৯১৭ সালের দুর্লগ্নে কোনো জ্যোতিষীই তো আমাকে ব'লে দেন নি যে সুদিন এল ব'লে—পরের বছর আমি ৭৫ পার্সেন্ট নম্বর পেয়ে কুলের মুখোজ্জ্বল করব। কাজেই আমি ফেল হবার পর মাস দুই তিন সত্যিই লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতাম। আমার শুভার্থী আত্মীয়বৃন্দ—বিশেষ ক'রে গিরিশ মেসোমহাশয়—একরাশ তথ্য জড়ো করে ধরলেন—কোন্ উত্তরযশস্বী কবে কোন্ পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন বা থার্ড ক্লাস পেয়েছিলেন। "পরীক্ষায় যারা আগুনের হল্‌কার মতন দীপ্তিমান্ হয় তাদের অনেকেই পর জীবনে ক্ষণায়ু উল্কার মতনই ছাই হ'য়ে যায় দেখতে দেখতে"—এমন সান্ত্বনাও দিলেন স্নেহময় বিজয়কাকা। কিন্তু বৃথা। আমি সত্যিই লজ্জায় যেন কারুর দিকে সোজা তাকাতে পারতাম না। এমন সময়ে ভরসা এল অচিন্তিত পথে। দেখা দিলেন অপূর্ব সন্ন্যাসী—কুমারনাথ। বলি তাঁর কথা।

পনের

হাল আমলে একটা ধুয়ো উঠেছে যে সত্যের প্রমাণ হ'ল সংখ্যার সাক্ষ্য। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতই প্রামাণ্য, সংখ্যালঘিষ্ঠদের এজাহার নগণ্য। ধর্মের ধামে এ-সূত্রের অনুসিদ্ধান্ত—corollary—আরো বেশি ব্যাপক ও সঙিন। যথা, বেশির ভাগ লোক ভগবানকে দেখে নি, অতএব ঈশ্বরবাদ একটা কুসংস্কার; ধ্যানধারণা জপতপের পথে চ'লে খুব কম তপস্বীই রিপুঞ্জয়ী হয়েছেন, অতএব যাঁরা বহুসাধনায় নিষ্কাম নির্লোভ হয়েছেন ব'লে কামী লোভীদের প্রণাম পান তাঁরা হয় ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী, না হয় আদৌ জানেনই না যে তাঁদের রিপুজয় হয় নি। এমন কি, মহা

প্রতিভা মুষ্টিমেয় অথচ প্রতিভার কীর্তি অপ্রতিবাদ্য হওয়ার দরুন এমন অসার কথাও সত্য ব'লে মান পেতে বসেছে যে, চেষ্টা করলে সবাই প্রতিভাধর হ'তে পারে। ভাবটা এই যে মানুষ সব সমান—কাজেই যে-সব মনীষী তাঁদের সমকালীন সহযাত্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বুদ্ধি বা কীর্তির ঘোড়-দৌড়ে জিতলেন তাঁরা প্রতিভায় বড় ব'লে জয়ী হন নি, অর্থনৈতিক—ইকনমিক—সুযোগ সুবিধার আনুকূল্য পেয়েছিলেন ব'লেই কীর্তিমন্ত হয়েছেন। এ সব থিওরিবাজির ভাববিলাসের মূলেই আছে আমাদের অজ্ঞান অহমিকা যে নিজের অক্ষমতাকে স্বীকার করতে লজ্জা পায় ব'লেই অসামান্যদের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রতিভাকে নাকচ করতে ছোটে।

যাঁদের কীর্তির হিসেব মেলে তাঁদের প্রতিষ্ঠাও যদি টলমল ক'রে ওঠে তাহ'লে যাঁদের কীর্তির নথিপত্র মেলা ভার তাঁদের মহত্ত্বকে নামঞ্জুর করা আরো কত সহজ হ'য়ে দাঁড়ালো! এই শ্রেণীর মহীয়ান্‌দের মধ্যেই পড়েন যোগী তপস্বীরা। এঁরা মানুষকে কত কী দেন, কিন্তু সে-দানের কোনো প্রামাণ্য দলিলপত্রই নেই। তাঁরা কত শান্তিহীনকেই না দিয়েছেন শান্তি, আর্তকে অভয়, রুগ্নকে রোগমুক্তি, শোক-বিধুরকে সান্ত্বনা, পথহারাকে লক্ষ্যদিশা! কিন্তু এ-দানের স্বাক্ষরপত্রে যদি বা মহাজন বা প্রসাদধন্যের সই মেলে তা হলেও তাঁদের এজাহার জনসাধারণের গণতান্ত্রিক বুদ্ধির দরবারে বাতিল হতে চলেছে—যেহেতু কৃপাধন্য সাক্ষীরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। ফের সেই চিরন্তন ফ্যালাসি—সংখ্যা দিয়ে সত্যের ওজন করার বিড়ম্বনা।

কুমারনাথের কথা বলতে তাই তো সংকোচ হচ্ছে এত। তাঁর কাছে আমি আমার জীবনের পরম দুর্লগ্নে পাই প্রত্যক্ষ সান্ত্বনা, শান্তি, অভয়। কিন্তু এমন কোনো দলিলপত্রই নেই যার এজাহারে সাবুদ করতে পারি যে আমার প্রাপ্তি জীবন্ত উপলব্ধি—ধোঁয়াটে কল্পনাবিলাস নয়! এই মানুষটিকে আমি মাত্র একদিন দেখেছিলাম—কিন্তু আজো ভুলতে পারি নি। তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিলও খুব বেশি নয়, কিন্তু যে-কয়েকটি কথা তিনি বলেছিলেন উৎকীর্ণ হ'য়ে রইল স্মৃতির পাষাণফলকে—সে-দাগ আজো তেমনি স্পষ্ট ও গভীরই আছে। এমন মানুষের দেখা পরে আমি আরো পেয়েছি—যেমন রাখাল মহারাজ ওরফে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—তাঁরো সংস্পর্শে এসেছিলাম আমি মাত্র একদিন অথচ তাঁকে আর ভুলতে পারি নি। কিন্তু কুমারনাথের দানের কথা ভাবতে আমার আরো আশ্চর্য লাগে এই জন্যে যে তাঁর জীবনীর প্রায় কিছুই সাধারণ্যে পেশ করতে পারি না আজ। বহু বৎসর পরে আমার এক উচ্চশিক্ষিত ব্যারিস্টার বন্ধুর কাছে শুনি—পশ্চিমে কোথায় যেন তিনি শুয়ে ছিলেন নিরাশার

অন্ধকারে এমন সময়ে দোরে ধাক্কা—এক সন্ন্যাসী এসে তাঁকে দীক্ষা দিয়েই চ'লে গেলেন! এ-মূর্তি কল্পনাপ্রসূত ছিল না কেন না তাঁর সঙ্গে বন্ধুর আরো একবার দেখা হ'য়েছিল আর্তির লগ্নে—কিন্তু যদি দেখা নাও হ'ত তবু বন্ধু তাঁর সহসালব্ধ গুরুদেবকে ভুলতে পারতেন না কোনোদিনও—তিনি বলেছিলেন আমাকে। আর কেন ভুলতে পারতেন না?—এই জন্যে যে তাঁর মন্ত্রচৈতন্যের স্পর্শে শুধু-যে বন্ধুবর শান্তি ফিরে পান তাই নয়—তাঁর আন্তর জীবনে বিপ্লবে ঘ'টে যায়। কুমারনাথের স্পর্শে আমার জীবনে এ-ধরনের কোনো ওলটপালট না ঘটলেও তিনি আমার কাছে চিরদিনই স্মরণীয় ও বরণীয় থাকবেন—কেন না যাঁরা জীবনে পরমানন্দে অচলপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন তাঁদের একবার দেখলেও আর ভোলা অসম্ভব। তাই তো কুমারনাথের একটি কথা আমার মনে আজো বাজে মন্দিরের শ্রান্তিহীন ঘণ্টার মতন:

"কুলপি কি বাবা? আমি সব খাই—পরমানন্দে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই যে আনন্দ ঝরতে দেখি বাবা! দাও কুলপি এনে—খাব বৈ কি।"

কী অদ্ভুত কথা ও কোন্ ভূমিকায় একবার ভাবুন! আমাদের থিয়েটার রোডের বাড়িতে তিনি এসেছিলেন যখন ফেল হওয়ার পরে আমি মনঃকষ্টে বিবাগী হব হব ভাবছি। ঠিক এই সময়ে আমাদের গেটের কাছে এসে একটি কুলপিওয়ালা হাঁক দিল। অম্‌নি আমি বললাম সন্ন্যাসী ঠাকুরকে—সরলভাবেই: "আপনি কুলপি খান কি?" সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কেউ বাজারের কুলপি খেতে নিমন্ত্রণ করে না। তাঁকে দিতে হয় শুদ্ধান্ন—বলতেন আমার দাদামহাশয়। তাই আমি তাঁকে কুলপি খাবেন কি না জিজ্ঞাসা করাতে দাদামহাশয় বাধা দিয়ে বলেছিলেন, "তুই কী পাগল ছেলে রে! যা ওঁর জন্যে ভালো আম কেটে নিয়ে আয়। আর ডাবের জল।" কুমারনাথ তখন বাধা দিয়ে হেসে আমাকে বলেন ঐ কয়টি কথা। পরে দাদামশায়ের সঙ্গে তাঁর কথা হয় বারান্দায়। আমি কৌতূহলবশে ঘরে ব'সে চুপিচুপি শুনি তাঁদের কথাবার্তা। কুমারনাথকে দাদামহাশয় কী কী প্রশ্ন করেছিলেন মনে নেই, তবে একটি প্রশ্নের উত্তরে কুমারনাথ কী বলেছিলেন ভুলব না কোনোদিনও: "না প্রতাপবাবু, ডাক্তারেরা অনেক ভুল বলে। খাঁটি ঊর্ধ্বরেতা কি ধৈর্যরেতা অ্যাবনর্মাল হ'তে পারে কিন্তু বিপন্ন কি বিষণ্ণ হয় নি কোনোদিনই। আমার আজ আঠারো বৎসরের মধ্যে একদিনও বীর্যপাত হয়নি—স্বপ্নেও না। আর আমি যে পরমানন্দে অষ্টপ্রহর কায়েম আছি তার বনিয়াদই হ'ল এই অটুট ব্রহ্মচর্য।"

একথাগুলি পরিষ্কার মনে আছে। কিন্তু কুমারনাথ সম্বন্ধে একটু বলি—তিনি কে, কী বৃত্তান্ত।

গিরিশ মেসোমহাশয়ের কাছেই প্রথম শুনি তাঁর কথা সুরধামে—পিতৃদেবের জীবদ্দশায়। মেসোমহাশয় যা বলেছিলেন তার সার মর্ম এই—যদিও ভাষা আমারই :

"কুমারনাথকে জানতাম অনেকদিন থেকেই! যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি উদার, তেমনি পরোপকারী। সংসারে কোনোরকম ঘা খেয়ে কি নিরাশ হ'য়ে তিনি সন্ন্যাসী হন নি—সহজ বৈরাগ্য এসেছিল ব'লেই একদিন স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন উদাসীনের ম'ত। পরিব্রাজক হ'য়ে সারা ভারতবর্ষ টহল দেওয়ার পর তিনি রাণাঘাটে এক কালীমন্দির স্থাপন ক'রে না কি তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। কী ছিল তাঁর সাধনা বা সিদ্ধির স্বরূপ তিনিও আমাকে বলেন নি, আমিও জিজ্ঞাসা করি নি। আমি শুধু জানি—কুমারনাথ খাঁটি মানুষ। আর যেমন সহৃদয় তেম্‌নি বলিষ্ঠ। এমন দৈহিক বল খুব কমই দেখা যায়। জানো একবার কী হয়েছিল? কুমারনাথ মাঝদরিয়ায় একটি মেয়েকে ভেসে যেতে দেখে তাকে বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দেন, কিন্তু ভাদ্রের ভরা গঙ্গা—তাকে ধরতে বেগ পেতে হয়। যখন হাঁপিয়ে প'ড়ে তার নাগাল পান তখন মেয়েটি তাঁর দু পা চেপে ধরে।—'সে কী ধরা ভাই!'—বললেন কুমারনাথ—'চোখে অন্ধকার দেখলাম—অমন জোয়ান আমি তো—তবু কিছুতে ছাড়াতে পারলাম না! শেষে যখন দেখি নিজের পা ছাড়িয়ে না নিতে পারলে দুজনেই ডুবব তখন মারলাম ওর পেটে ঘুঁষি। ও সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছায় এলিয়ে পড়তেই আমি ওকে টেনে তীরে আনি ওর চুলের গোছা ধ'রে।'...আর একটি কথা শুধু শুনেছি লোকমুখে : যে, রানাঘাটে উনি না কি শ্মশানে শবসাধনা ক'রে মা কালীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। কিন্তু সে-সিদ্ধির ফলই বা কী আর কীর্তিই বা কতখানি আমি কুমারনাথকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করি নি। কেবল এইটুকু জানি যে উনি খাঁটি বৈরাগী, তেজস্বী ও নিখুঁৎ সত্যনিষ্ঠ পুরুষ। শুনেছি ওঁকে সবাই 'মা কালীর কোলের ছেলে' ব'লে থাকে, কেউ বা বলে উনি ব্রহ্মজ্ঞ। কিন্তু জানোই তো মণ্টু, আমি না চিনি মা কালীকে, না খবর রাখি ব্রহ্মজ্ঞানের।"

এহেন কুমারনাথকে দেখার ইচ্ছা আমার ছিল বহুদিন থেকেই। কিন্তু রানাঘাটে শ্মশানে গিয়ে খোঁজ নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করা—এতটা পেরে উঠিনি। তা ছাড়া মেসোমহাশয়ের কাছে তাঁর কথা যখন প্রথম শুনি তখন আমি নিতান্তই

নাবালক—তাই তাঁর সাধনা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধিকে মনে মনে উদ্দীপক জনশ্রুতির চেয়ে কোনো গুরুতর মর্যাদা দিই নি। নৈলে তাঁকে ভুলে ব'সে থাকব কেন?

কিন্তু কী আশ্চর্য—আমার জীবনের ঠিক এ-দুর্লগ্নেই যে এ-ভুলে-যাওয়া মানুষটি হঠাৎ "পর্বতের চূড়া সম সহসা প্রকাশ" হ'লেন, এও কি নিয়তি নয়? মেসোমহাশয় পরে বলেছিলেন যে, কুমারনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল কলকাতায়ই—মাস কয়েক আগে, আর তখন তাঁকে তিনি বলেছিলেন আমার কথা। হয়ত আমার কাঁচা ভক্তির কথা শুনেই তিনি এসে থাকবেন আমাকে আশীর্বাদ করতে—জানি না। কিন্তু যেটা জানি সেটা এই যে তাঁকে প্রণাম করবামাত্র আমার দেহমন যেন জুড়িয়ে গেল—ঠিক যেমন জুড়িয়ে গিয়েছিল বছর দুই পরে যখন রাখাল মহারাজকে প্রণাম করি বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাড়িতে। হ্যাঁ, আর একটি কথা পরিষ্কার মনে আছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: সংসার যদি সত্য হয় তবে বৈরাগ্য তো মিথ্যাই বটে? রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত লাইনটি উদ্ধৃত করেছিলাম:

> "বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়:
> অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ……।"……ইত্যাদি

তাতে তিনি হেসে বলেছিলেন: "কবির কথা খুবই সারগর্ভ বটে, কিন্তু বাবা, বন্ধনের মাঝে মুক্তির স্বাদ পায় কে? যে বদ্ধ না যে জীবন্মুক্ত? যদি শুধু জীবন্মুক্তই এ-স্বাদের অধিকারী হয় তবে প্রশ্ন ওঠে এ-জীবন্মুক্ত হবার উপায় কি? উত্তর একটি বৈ দুটি নেই—বৈরাগ্য। তাই বাবা, বৈরাগ্যও সত্য, বন্ধনের মাঝে মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায় এও সত্য। কেবল সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতেই হবে যে বৈরাগ্যই সব আগে দেখায় মুক্তির পথ—কেন না যার মনে আদৌ বৈরাগ্যের উদয় হয় নি সে তো মুক্তি চাইবেই না। এই জন্যই বলেছে—'সর্বং ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্'—কি না সংসারে ভয় আনে সব কিছুই, কেবল বৈরাগ্যই দেয় অভয়। গিরিশের কাছে শুনেছি পরমহংসদেবের 'কথামৃত' তোমার কণ্ঠস্থ। তাহ'লে তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে তাঁর সেই জালে-ধরা-পড়া মাছদের বর্ণনা যারা জাল থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টাও করে না—মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে তলানির কাদায়? বদ্ধজীবের কী চমৎকার উপমা! আর এই-যে বদ্ধজীব এরা চিরটাকাল

বদ্ধই থেকে যেত যদি না থেকে থেকে বৈরাগ্য হানা দিয়ে তাদের মায়াবন্ধন কেটে দিয়ে যেত। এই বন্ধন কাটা হ'লে তবেই পাশবদ্ধ জীব হ'য়ে দাঁড়ায় জীবন্মুক্ত শিব—আর তখনই সে বলতে পারে বড় গলা ক'রে যে বন্ধনের মধ্যে বাস ক'রেই চাখবে মুক্তিসুধা। কিন্তু যতদিন তার এ-অবস্থা না হচ্ছে ততদিন সে যত বড় বড় গালভরা বুলিই কপচাক না কেন—শেষ পর্যন্ত বদ্ধই থেকে যাবে—যদিও অভিমানের অন্ধমোহে হয়ত রটিয়ে বেড়াবে—সে জীবন্মুক্ত।"

আমি তাঁর শান্ত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে টুকলাম: "কিন্তু তাহ'লে কি বলবেন রবীন্দ্রনাথ মিথ্যে জাঁক করতেই লিখেছিলেন ওকথা?"

কুমারনাথের সে-প্রশান্ত হাসি ভুলব না কোনোদিন। আমরা তর্ক করি নিজের মতকে প্রতিপন্ন করতে, কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ ছিল নিরুত্তাপ—যেন তুমি তাঁর কথা নাও বা না নাও, তাঁর এতটুকু আসে যায় না। তিনি হেসে বললেন: "এই দেখ, তুমিও আমাকে ভুল বুঝলে। রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা যে সত্যি কথা আমি তো প্রথমেই স্বীকার ক'রে নিয়েছি। আমি শুধু বলেছি—বন্ধনের মধ্যে থেকেও মুক্তিস্বাদ পায় কেবল সে-ই মহাজন যে কামনা বাসনার মোহমায়া কাটিয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ হয়ত জীবন্মুক্ত। তাছাড়া তিনি যে মস্ত আধার এতে তো সন্দেহ নেই—তাই তাঁর মুখে একথা সাজে। তুমি কি বলবে বিবেকানন্দের মুখে যে-সব কথা মানাত সে-সব কথা যদু-মধু-সিধু-বিধুর মুখেও সমান মানাবে? তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে ব'লেই আমি বললাম যা আমি বুঝেছি ও জেনেছি জীবনের প্রত্যক্ষ ভাষ্যে। আসলে এ হ'ল অধিকারিভেদেরই কথা বাবা, যাকে আমি সত্য ব'লে চিনেছি আমার নানান ওঠাপড়ার পরে। আর আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি একটি কথা: যে, বন্ধনের মধ্যে বাস ক'রে মুক্তিস্বাদ পাওয়া চারটিখানি কথা নয়। তোমার রবীন্দ্রনাথই বলেন নি কি—'যে পারে সে আপনি পারে—পারে সে ফুল ফোটাতে?' আমি বহু ঠেকে শিখে তবে জেনেছি যে এ পারে কেবল সে-ই মা-র কৃপা যাকে বরণ করেছে—উপনিষদে যাকে বলেছে 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—বুঝলে না? এ-কৃপা যে পায় নি সে ঐ জালে-ধরা-পড়া মাছের মতনই বদ্ধ থাকতে চাইবে, আর বদ্ধ জীবের মুখে মুক্তির জাঁক খানিকটা ভুতের মুখে রামনামেরি সামিল নয় কি?"

এখানে ব'লে রাখি—আমি নিজের ভাষায়ই উদ্ধৃত করেছি তাঁর ব্যাখ্যার চুম্বকটুকু—আর এটুকু যে আমার আজো মনে আছে তার কারণ এ নিয়ে পরে গিরিশ

মেসোমহাশয় তথা নির্মলদার সঙ্গেও একাধিকবার আলোচনা হয়েছিল। মেসোমহাশয় শুনে কী বলেছিলেন আমার ভালো মনে নেই, কেবল এইটুকু ছাড়া যে জীবন্মুক্তির আদর্শের সঙ্গে তাঁর বিবাদ নেই, তাঁর প্রশ্ন—বিধাতাই মুক্তিদাতা কি না। নির্মলদা কুমারনাথের কথা শুনে এতই উৎসাহিত হয়েছিলেন—(তখন তিনি সবে থিয়েটারে ঢুকেছেন, কিন্তু বিবাহ করেন নি)—যে বলেছিলেন রানাঘাটের শ্মশানপীঠে গিয়ে ধরবেন কুমারনাথকে। আমি শুধু আজ বলতে চাই যে তাঁর কথাগুলি যে আমি আজো ভুলতে পারি নি তার কারণ সে-বিরল কৃপাধন্য মানুষকে একবার দেখলে আর ভোলা যায় না যে "সহজিয়া" পদবী পেয়েছে "সহজ"-কে লাভ করার অমৃতানন্দে।

এ-সৌম্য, সদানন্দ, জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষ আজ এ-জগতে নেই, কিন্তু তাঁর দীপ্ত মুখ, নির্মল হাসি ও অনাহত প্রফুল্লতার কথা স্মরণ ক'রে আমি যে মনে মনে তাঁকে কতবারই প্রণাম করেছি—কী বলব? শুধু প্রণাম করাই নয়—কতবারই যে তাঁকে সর্বান্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি তাঁর ব্যক্তিরূপের দীপ্ত প্রভায় তিনি আমার মনের আঁধার দূর করেছিলেন ব'লে! সত্যি বলছি, আমার আরো আশ্চর্য লেগেছিল ভাবতে যে তিনি কি ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার কাছে এলেন যখন আমি একটুখানি আলোর জন্যে, শান্তির জন্যে ছটফট করছি! তবু লোকে বলে—অঘটন আর ঘটে না এ-যুগে?

কুমারনাথ আমার দাদামহাশয়ের কাছে বিদায় নিয়ে আমাকে রাস্তায় ডেকে চলতে চলতে বলেন আরো কয়েকটি কথা। সব কথা মনে নেই তবে একটি কথা মনে গেঁথে আছে: তিনি বলেছিলেন—আমি যেন বৈরাগ্য ও মুক্তি নিয়ে বেশি না ভাবি—যেন ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ কিছু ক'রে না বসি। আমি আশ্চর্য হ'য়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি ফের তেমনি স্নিগ্ধ স্বরেই বলেন: "হ্যাঁ বাবা, আমি টের পেয়েছিলাম তুমি কী ভাবছিলে। তাই বলছি তোমাকে—আমার এ-কথাটি তুমি মনে ক'রে রেখো: নির্ভরসা হবার কিছু নেই তোমার, আর তোমাকে বেশিদিন সুদিনের জন্যে ব'সে থাকতেও হবে না। কি জানো? ভগবানের জন্যে আকুল হওয়া ভালো হ'লেও অধীর হওয়া ভালো নয়। আমার গুরুদেব একটি উপমা দিতেন: গাছ থেকে ফল পাকলে সে বোঁটা থেকে খ'সে পড়ে সহজেই, টানাটানি ক'রে তাকে ছিনিয়ে নিলে তার পাকতে দেরিই হয়। ঘা খেয়ে বৈরাগ্য—যাকে পরমহংসদেব বলতেন 'মর্কট-বৈরাগ্য'—আসতেও যেমন যেতেও তেমনি—ঠিক সোডা

বোতলের গ্যাসের মতন—ভস্ ক'রেই ব্যস্—খতম! যে-বৈরাগ্য অচলপ্রতিষ্ঠ তার উল্টো পিঠের মার্কা—'অনুরাগ'। তাই বলছি—তুমি যখন ঠাকুরকে ভালোবেসেছ তখন আর ভেবো না: ঠাকুরই তোমাকে ডেকে নেবেন সময় হ'লেই।"

তাঁর স্নেহবাণীতে আমার চোখে জল এল, বললাম: "আপনার কথা মনে থাকবে। কিন্তু আমার দুঃখ কী ক'রে বোঝাব আপনাকে? আমি অত্যন্ত অভিমানী—পরীক্ষায় ফেল হ'য়ে যে বিষম ঘা খেয়েছি—"

তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন: "ঘা? পরীক্ষায় ফেল হওয়ার দরুন! বাবা, কচি মেয়েদের পুতুল ভেঙে গেলে কান্না দেখেছ কি? তাদের তখন পুত্রশোক হয় যেন। কিন্তু একটু পরেই আর একটা পুতুল এনে বিয়ে দেয় না কি?—বাবা, বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষা খতিয়ে গৌণই বটে, আসল পরীক্ষা হ'ল বিবেকের—কি না, অন্তরে লুকিয়ে আছে যে সত্য-সীতা তার অগ্নিপরীক্ষা। তোমাকে ফেল-হওয়ার ঘা এত বেজেছে কেন জানো? মোহ বাবা, নিছক মোহের ফেরে—যার কাজই হ'ল তিলকে তাল করা।"

তিনি আরো কয়েকটি দামী কথা বলেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিনে। এখন ভারি খেদ হয়: আহা রে! সেদিন যদি লিখে রাখতাম তাঁর কথামৃত তখনি তখনি—কুড়েমি না ক'রে! "শ্রীম" আমাকে বলেছিলেন ভালো কোনো কথা শুনলে লিখে রাখতে। কিন্তু তাঁর কথার বীজে ফসল ফলেছিল অনেক পরে—বিলেতে—যখন রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হয়। কিন্তু সেকথা লিখব যৌবনস্মৃতিতে। এখন বাল্যস্মৃতিতে ফিরে আসি।

কুমারনাথের কাছে আমি কী শিখেছিলাম, কী পেয়েছিলাম তখন ভালো ক'রে অনুধাবন করতে পারিনি। কিন্তু কালের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি যে, তাঁর দীক্ষায় দুটি সত্যের সঙ্গে আমার গভীর পরিচয় হয়? একটি এই যে, ভারতে বহু সিদ্ধ তান্ত্রিকের সংস্পর্শে এসে সাধারণ মানুষের মধ্যেও খানিকটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিদীক্ষার শুভফল চারিয়ে গেছে। মেসোমহাশয় বলেছিলেন কুমারনাথের অনেক ভক্তই তাঁর আশীর্বাদে শান্তি ও সান্ত্বনা পেয়েছেন। দ্বিতীয় সত্যটি এই যে আমার একটি জিজ্ঞাসার উত্তর মিলেছিল: সিদ্ধ মহাপুরুষরা কেন রুক্ষ কঠোর হন? কুমারনাথ সেদিন কথায় কথায় এ-প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন আমাকে যে, এ-প্রসিদ্ধির মূলে আছে অজ্ঞান, কেন না খাঁটি সিদ্ধ মহাপুরুষ কঠোর সাধনার ফলেই হ'য়ে দাঁড়ান কোমল কমনীয়। পরে এ-কথার স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ

পেয়েছি বহুবারই—যখনই কৃপা পেয়েছি কোনো নির্ভেজাল সাধুর—যেমন রাখাল মহারাজ, রমণ মহর্ষি, জয়কৃষ্ণ গিরি, রামদাস ইত্যাদি। এঁদের কথা বলব যথাস্থানে।

আমি ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না—বাল্যস্মৃতির মধ্যে থেকে থেকে কৈশোর ও যৌবন স্মৃতিকে টেনে আনার দরুন সাধারণ পাঠকদের অসুবিধা হবে কি না। আমার নিজের মনে হয়—হবে না, কারণ আমি বরাবরই দেখেছি যে, যে কোনো মানুষের জীবনের নানা ঘটনা তথা অঘটনকে যথার্থ বুঝতে হ'লে সময়ে সময়ে তাকে দীর্ঘ সময়ের দূরবীনের মধ্যে দিয়ে দেখতে হয়। কারণ কোনো ঘটনা একটা বিশেষ সময়ের পরিধির মধ্যে ঘটলেও তার নিহিতার্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে উত্তরকালের অনেক ঘটনাসমষ্টির আলোকপাতে। খানিকটা ডিটেকটিভ নভেলে রহস্য-সমাধানের মতন। শার্লক হোম্‌সে Silver Blaze ব'লে একটি অপূর্ব গল্প আছে—লোকেনকাকা বলতেন প্রায়ই এ-কাহিনীটির কথা। কুকুর ছিল আস্তাবলে। অশ্বচোর যখন আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে যায়—কুকুর ডাকেনি। কুকুরের এই নীরবতার দিকে কারুরই চোখ পড়েনি কেবল শার্লক হোম্‌সের ছাড়া। কিন্তু গল্পটি যখন পড়া যায় তখন কুকুরের না-ডাকাটা বিস্ময়কর ম'নে হ'লেও কেন সে ডাকেনি তা কল্পনা করাও যায় না: অর্থাৎ সে ঘেউ ঘেউ ক'রে ওঠেনি এই জন্যেই যে স্বয়ং প্রভুই—ট্রেনার—ছিলেন চোর, রক্ষক—ভক্ষক। কিন্তু যখন সমাধান হ'য়ে গেল মন আনন্দে বিস্ময়ে পুলকিত হ'য়ে ওঠে—দেখে যে সব জলের মতনই সাফ হ'য়ে গেছে।

ঠিক তেমনি কত ঘটনাই ঘটে এক বয়সে—যার ভাষ্য খুঁজে পাওয়া যায় না সে-সময়ে। মনে হয় বুঝি অনেক কিছু ঘ'টে গেল অকারণ, দৈবাৎ বা কোনো নিষ্ঠুর দয়াময়ের হৃদয়হীন বিধানে। কিন্তু দৈবাৎ যে কিছুই ঘটে না, জগতের সামান্যতম জীবের ক্ষণিকতম নৃত্যও যে মহাকালের বিশাল নটমঞ্চে ঘটে তাঁরই অদৃশ্য সুতো টানার ফলে—ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে থেকে সবাইকে নিয়ে পুতুলের মতন নাচিয়ে নিয়ে চলেন তাঁর আনন্দসাধনার পূর্ণবিকশনের জন্যেই—একথাটি জীবনের ভাষ্যে বুঝতে হ'লে সময়ে সময়ে একটা বিচ্ছিন্ন স্মৃতিকথাকে পরের ঘটনার আলোয় দেখা বিশেষ কাজে আসে। আমি যে পরের বার পরীক্ষায় গণিতে ফার্স্ট ক্লাস অনর্স-এ পাশ করেছিলাম তার একটি কারণ নিশ্চয়ই কুমারনাথের আবির্ভাব। নৈলে হতাশ্বাসে ও অপমানে হয়ত আমি ল্যাবরেটারির দুঃসহ দুর্গন্ধ অন্ধকূপে না ঢুকে স্রেফ বৈরাগী হ'য়ে বেরিয়ে যেতাম কোথাও—পরে পুনর্মূষিক হ'য়ে ফিরে এসে আরো দুরন্ত গ্লানি সইতে।

ষোলো

কুমারনাথের কথা যে ভুলতে পারিনি তার আরো একটা কারণ ছিল। বলেছি, আমি অশৈশব বুদ্ধিবাদী নাস্তিক্যের আবহাওয়ায় মানুষ—যেখানে আচার, আনুষ্ঠানিকতা, মন্ত্রতন্ত্রের কোনো স্থানই ছিল না। হিন্দু আচারনিষ্ঠতাকে পিতৃদেব অশ্রান্ত ব্যঙ্গ ক'রে এসেছেন প্রথম থেকেই। শেষ জীবনে যখন তিনি ভক্তির দিকে ঝুঁকে বাঁধলেন অনেকগুলি শরণাগতির গান তখনো পাঁজিপুঁথি, হাঁচি-টিকটিকি, খাওয়া-ছোঁওয়া, বার-তিথি জাতীয় সংস্কারকে তিনি মন্দই মনে করতেন। উদাহরণতঃ মনুসংহিতার একটি শ্লোক প্রায়ই ভয়ংকর গম্ভীর স্বরে প'ড়ে আমাদের হাসিয়ে মারতেন ব্যাখ্যা করবার সময়ঃ

রাজান্নং তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চসম্।
আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নং যশশ্চর্মাবকর্তিনঃ॥

"অর্থাৎ শোনো শোনো সবে পাপাত্মা মানবে!"—বলতেন তিনি সঘনে—"রাজার অন্ন খেয়েছ কি বীর্য-পৌরুষটি টুপ্‌ ক'রে নিভে গেছে, শূদ্রের অন্ন খেলেই গেলে—ব্রহ্মতেজ ডুবল, স্যাকরার অন্ন খেয়েছ না কি?—হায়, হায়, ম'লে ব'লে! কিন্তু প্রাণ যায়—সেও ভালো চামারের অন্ন খেয়ো না—কেন না তাতে মান ডুববে। অথ ভাষ্যঃ প্রাণ গেলে ভিক্ষে মেগে খাওয়া যায়, কিন্তু মান গেলে?—শুধু ফোঁস-ফোঁস-ফোঁস কান্না!"

বলা বাহুল্য, তাঁর এ হাসা-হাসিতে যোগ দিতে কারুরই বাধত না—কি নাস্তিক, কি আস্তিক। সবাই হেসে গড়িয়ে পড়তেন যখন তিনি গাইতেনঃ

আহা, কী মধুর টিকি! আর্য ঋষি কী
বানিয়েছিলেনই কল গো!
ও সে আপনার ঘাড়ে আপনিই বাড়ে
(অথচ) চতুর্বর্গ ফল গো!

তাঁর "একঘরে" পুস্তিকায় তিনি কোন্ পণ্ডিতের টিকির কত দাম তার এক নির্ঘণ্ট তৈরি করেছিলেন। প্রায়ই বলতেন আমাকেঃ "ভগবান্ বরণীয় হোন্ বা না হোন্, শুচিবাই যে বর্জনীয় একথা যাঁরা না মানবেন তাঁরা আমাকে এড়িয়ে চলবেন—সাধ্য কি? আমিই যে তাঁদের ছায়াও মাড়াব না বাবা!"

হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিকতাকেও তিনি কম ব্যঙ্গ করেন নি—তারস্বরে গাইতেন :

চোর হও ডাকাত হও—গঙ্গায় দাও ডুব।
গয়া কাশী পুরী যাও—পুণ্যি হবে খুব।
মদ্য মাংস খাও যদি—হ'য়ে পড়ো শৈব।
(আর) না খাও যদি বৈষ্ণব হও—এর গুণ কত কইব ?

অমনি আমি ও মায়া কোরাসে যোগ দিতাম :

(তাই) ছেড়ো নাক এমন ধর্ম, ছেড়ো নাক ভাই !
এমন ধর্ম নাই আর দাদা এমন ধর্ম নাই।
(ঢোল বাজত) : তড়ালাক তড়ালাক তড়ালাক তড়ালাক দুম্ !

তাঁর "একঘরে" পুস্তিকায় তিনি আরো লেখেন যে হিন্দু সমাজপতিরা বিলাত-যাত্রার জন্যে তাঁকে জাতে ঠেলে গোময় ভক্ষণ ক'রে, জাতে উঠতে আদেশ দিতে তিনি জবাব দেন : "জাতে 'নামতে' বলাই উচিত ছিল।" এই নিয়ে রাঙাজ্যেঠা-মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হ'ত। কারণ জ্যেঠামহাশয় বেদ-বেদাঙ্গ, মুনি-ঋষি আচার-বিচারকে শ্রদ্ধা করতেন—বলতেন : ঐতিহ্যকে অপমান করতে নেই। পিতৃদেব তাঁর একথা কোনোদিনই নেননি। তিনি বলতেন : "কোদালকে তরোয়াল, কি আগাছাকে ফুল বলতে পারব না কিছুতেই—শাস্ত্রের, ঋষির, এমনকি অবতারের আদেশ হ'লেও নয়। স্বামী বিবেকানন্দ মিথ্যা বলেন নি যে আমাদের ধর্ম এখন ঢুকেছে গিয়ে শুধু ভাতের হাঁড়িতে···" ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, এখানে তিনি নতুন কথা কিছুই বলেন নি। আমাদের এ-যুগে প্রায় শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেই (৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বা ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতন দুচারজন শ্রদ্ধেয় আচারী হিন্দু বাদে) ছুঁৎমার্গ, শুচিবাই, পঞ্জিকা, তিথি, ব্রত, বিধিনিষেধের ঘটাকে অবজ্ঞার চোখেই দেখে এসেছেন মনস্বী রাজা রামমোহন রায়ের শুভ অভ্যুদয়ের পর থেকে। এমন কি, যেসব আধুনিক হিন্দু মুখে ব্রাহ্মসমাজের রীতিনীতিকে ব্যঙ্গ করতেন তাঁরাও, জান্তে বা অজান্তে, ব্রাহ্মসমাজের আচার-বিরোধিতার ছোঁয়াচে কমবেশি কালাপাহাড়ই হয়ে উঠেছিলেন। আমি এঁদেরই প্রভাবে গ'ড়ে উঠেছিলাম তো—এই মনোভাবেরই রাজ্যে—কাজেই আমার মনেও একটা তীব্র বিমুখতা কায়েমি হ'য়ে গিয়েছিল যে প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতা,

ছোঁওয়াছুঁয়ি, কাঁসরঘণ্টা মালা তিলক এসবই অবজ্ঞেয়। পরের জীবনে এ-মতের কিছু বদল হ'লেও একটা মত আমার আজো বদলায় নি: যে, আচারের বাড়াবাড়ি খতিয়ে ক্ষতিই করে এবং ছুঁৎমার্গ কখনই সমর্থনীয় নয়—কারণ যখন সব মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন (এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ) তখন কাউকে ছুঁলে বা কারুর হাতে খেলে লৌকিক জাত যেতে পারে, কিন্তু পারলৌকিক ধর্ম মারা পড়তেই পারে না। জানি, এ নিয়ে অশ্রান্ত তর্ক চালানো যেতে পারে এবং সে-বিতণ্ডার ঝড়ের পর পিতৃদেবের "কলিযজ্ঞের" ভাষায় দেখা যাবে (অনুষ্টুপছন্দে):

পরিশেষে সভাস্থলে সবাই অপরাজিত।
দিলে হি বক্তৃতাচোটে উড়াইয়া পরস্পরে॥

একটু আগে বলেছি—আচার সম্বন্ধে আমার মতামতের কিছু বদল হয়েছে কালাতিপাতে। কী ভাবে পরিবর্তন হ'ল একটু বললামই বা।

একসময়ে শাস্ত্রবাক্যকে নির্বিচারে ডিশমিশ করাকে খুব বাহাদুরি মনে করতাম। কিন্তু পরে ঠাকুরকে ডাকতে গিয়ে বুঝেছি যে, শাস্ত্রের সমালোচক হওয়া যত সহজ মর্মজ্ঞ হওয়া ঠিক তত সহজ নয়। শুধু তাই নয়, যথার্থ শাস্ত্রবাণী—কি না আপ্তবাক্য—শ্রেষ্ঠ সাধকদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দস্তাবেজ বৈ আর কিছুই নয় ব'লে এ-এজাহারকে বাতিল করলে জিজ্ঞাসু পড়েই পড়ে অথই জলে—দাঁড়াবার মাটি না পেয়ে। তাছাড়া এও মানতেই হবে যে, আচার বিচার ধর্মাধর্ম শিক্ষা না দিলেও সংযমে দীক্ষা দেয় বৈ কি। তবু—সাধ্যমত নিরভিমান জিজ্ঞাসু হ'য়ে চেষ্টা করার পরেও—সব শাস্ত্রীয় বিধানকেই শিরোধার্য করতে পারি না। এদের মধ্যে একটি বিধান হ'ল অত্যধিক আচারনিষ্ঠতা, ওরফে শুচিবাই। আমার কিছুতেই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে, সত্যিকার মহাপুরুষ বা পরম ভাগবত তাঁদের অন্তরে পেয়েছেন সাক্ষাৎ ভাগবতী বাণী যে, ব্রাহ্মণেতর জাতির ছোঁওয়া কিছু পানাহার করলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ মারা পড়বেই পড়বে। শাস্ত্রের মধ্যে সর্ববিধ বিধানই মেলে—ব্রাত্য হরিজনকে ছুঁও না তথা সর্বভূতে সমজ্ঞান, নারী ভগবতী তথা নরকের দ্বার, কর্ম করো তথা নৈকর্ম সাধো, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ তথা ভক্তি নিম্নাধিকারীর জন্যে, জ্ঞান মহত্তম তথা জ্ঞানের খোঁজা হ'ল তুষের মধ্যে ধান খোঁজার সামিল ইত্যাদি স্ববিরোধী যে-বিধানই চাও না কেন পাবেই পাবে শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করতে না করতে। আমার

যৌবনে শরৎচন্দ্র প্রায়ই হেসে বলতেন : "শাস্ত্র মণ্টু? শাস্ত্র তো কল্পতরু—হাত-জোড় ক'রে যে-কোনো বর চাও পেয়ে যাবে।" কথাটা আমাকে খুবই ভাবিয়ে দিয়েছিল। কারণ আপ্তবাক্য থেকেই আমার তত্ত্বজিজ্ঞাসার সুরু, কাজেই শাস্ত্রকে সরাসর বাতিল করলে যে দাঁড়াবার বনিয়াদ মিলত না একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। যথা, আমার বাল্যজীবনে রামকৃষ্ণ-কথামৃত আমার হাতে পড়েছিল। কিন্তু যদি না পড়ত তাহ'লে কী হ'ত? জানি না—কারণ জীবনের গতি কখন কোন দিকে মোড় নেয় কে বলতে পারে? কেবল আমার এই দৃঢ় বিশ্বাসটুকুর কথা বলতে পারি যে পরমহংসদেবের প্রভাব-পরিধির মধ্যে না এলে শুধু যে "ভগবানকে পাওয়া মানবজীবনের উদ্দেশ্য" এ-বিশ্বাস শৈশবেই আমার অন্তরে থিতিয়ে যেত না তাই নয়, আমি তেরো চোদ্দ বৎসর বয়সেই ঠাকুরের ছবির সামনে শপথ করতাম না যে আমি কোনোদিন বিবাহ করব না। কাজেই মহাজনের জীবন ও বাণীকে প্রণাম না করার কথা আমি আজো ভাবতেই পারি না।

কিন্তু সমস্যা আসে তখনই যখন নানা মুনির নানা মতের কচকচিতে মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ভেবে পায় না কার নির্দেশ প্রামাণ্য। বহু নাকানি-চোবানি খেয়ে তবে আমি এই সত্যটির দেখা পেয়েছিলাম যে শাস্ত্রে যে নানা অধিকারীর জন্যে নানা সময়ে নানা কথা বলেছে এই কথাটি না বোঝার ফলেই আমরা ফাঁপরে পড়ি। অর্থাৎ কোনো বিধিনির্দেশকে বুঝতে হ'লে তাকে বিচার করতে হবে তার দেশকাল-পাত্র পর্যালোচনা ক'রে তবে। তাই পন্থা হ'ল দুটি : হয় গুরুবরণ ক'রে গুরুবাক্য মেনে নেওয়া—নয় নিজের বুদ্ধি বিবেক বিচারকে মেনে পরীক্ষা করতে করতে চলা। কিন্তু এখানেও মুশকিল কম নয় যেহেতু গুরুবাদীদের মধ্যেও বিষম মতভেদ আছে। এমন কথাও শাস্ত্রে পাওয়া যায় যে, গুরু অসৎ কি মিথ্যাচারী হ'লে তাকে ত্যাগ করাই কর্তব্য—এ স্মৃতিবাক্যটি মধুসূদন সরস্বতী তাঁর বিখ্যাত গীতাভাষ্যে প্রামাণ্য বলেই উদ্ধৃত করেছেন :

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ
উৎপথং প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।

অর্থাৎ গুরু যদি অহংকৃত হন ও তাঁর কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান না থাকে তবে সে-উন্মার্গগামী পরিত্যাজ্য। অন্যদিকে একদল শাস্ত্রী বলেন যে :

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

এম্‌নি একজন গোঁড়া শাস্ত্রদাস একদিন পিতৃদেবের কাছে একথা বলতে না বলতে তাঁর ওষ্ঠাধর বক্র হ'য়ে উঠল, ও তিনি

"আহা হা হা কী ভাব রে ! সখী ধরো ধরো !"

ব'লেই তিনি মুদ্রিত নেত্রে মুখে মুখে রচনা সুরু ক'রে দিলেন :

যদ্যপি আমার গুরু করে ব্যভিচার,
তথাপি গাহিব : "মরি, কী গুরু আমার !"
যদ্যপি আমার গুরু করে গরু চুরি
তথাপি বলিব ধন্য শ্রীগুরু-মাধুরী !

এই রকম আরো অনেকগুলি শ্লোক তিনি টপাটপ রচনা করেছিলেন—সব মনে নেই। কিন্তু এটুকু মনে আছে যে তাঁর ব্যঙ্গের তীরন্দাজিতে আমার গুরুবাদে ভক্তি—তখনকার মতন অন্তত—বেশ একটু জখম হয়েছিল। কারণ গুরু যাই হোন না কেন তাঁকে মন বুদ্ধি দিয়ে বিচার করবে না এ-বিধানকে শিরোধার্য করতে হ'লে ভণ্ড ব্যভিচারী গুরু আর ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ গুরু—উভয়কেই সমান পদবী দিতে হয়—যাতে বিবেক বিদ্রোহ না ক'রেই পারে না।

এ থেকে আমি কী উভয়সংকটের কথা তুলছি আশা করি বেশি ভাষ্য ক'রে বোঝাতে হবে না ? আমি বলতে চাইছি এই কথাটি যে, শাস্ত্র বা গুরুবাক্য নির্বিচারে মানতে গেলে বিপদ সমূহ—আরো এই জন্যে যে, সংসারে মহাপুরুষ সদ্‌গুরুর চেয়ে কাপুরুষ বদ্‌গুরুই বেশি। তাই তত্ত্বজিজ্ঞাসায় "কঃ পন্থাঃ" এ-জটিল প্রশ্নের কোনো সরল উত্তরই নেই। এ নিয়ে আথাল পাথাল ভাবতে ভাবতে আমার যৌবনে যখন আমি প্রায় বানচাল হবার জো, তখন একদিন যাই শরৎচন্দ্রের কাছে। তিনি অবশ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানী ছিলেন না, তবু তাঁকে এত ভক্তি করতাম যে তাঁর কাছে গিয়ে নানা সময়ে নানা সমস্যারি আলোচনা করতাম। সেদিন "নানা মুনির নানামত" প্রসঙ্গ উঠেছিল।

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন : "আর ভাবতে ভাবতে ভ্যাবাচ্যাকা—এই না ? ঠিক এম্‌নি হয়েছিল আমাদের এক পণ্ডিত মশায়ের। তাঁকে একজন জিজ্ঞাসা করেন : 'পণ্ডিত মহাশয়, বিশ বৎসর ধ'রে যদি পাণিনি পড়ি তবে পাণিনিতে পণ্ডিত হতে পারব তো ?' পণ্ডিত মশায় তো শুনে আগুন : 'কী ? মূঢ় ! বিশ বৎসরে পাণিনি-পণ্ডিত ? জানিস আমি চল্লিশ বৎসর পাণিনি প'ড়ে এতদিনে সবে মূর্খ বনেছি ?"

শরৎচন্দ্র নানা সূত্রেই আমাকে বলতেন যে, সত্যজিজ্ঞাসুর পক্ষে বেশি শাস্ত্র প'ড়ে খতিয়ে মূর্খ ব'নে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়, কারণ একজন শাস্ত্রী যা বলবেন আর একজনের কাছ থেকে পাবেই পাবে ঠিক তার উল্টো বিধান। একজন করবেন নয়কে হয়, আর একজন—হয়কে নয়।

কথাটা আমার বুদ্ধি গ্রহণ করেছিল, তাই এই নির্দেশ পথে ভাবতে ভাবতে ঠিক করি যে, যেহেতু আমার সমস্যার সমাধান কিছু আর একজন ক'রে দিতে পারে না, সেহেতু শাস্ত্রজলধির ডুবুরি হ'য়ে আমি কেবল সেই সেই মুক্তামণি চয়ন করব যাদেরকে ভালোবাসতে পারা যায়। এই সময়ে ভাগবতের একটি শ্লোক পড়ি :

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চা বিড়ম্বনম্।

এ-শ্লোকটি আমার "এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" বাণীটির চেয়েও বেশি মনে লেগেছিল। কারণ এখানে সেই বিধানটিই মিলে গিয়েছিল যা আমি খুঁজছিলাম : "যেহেতু আমি সর্বভূতে আত্মারূপে বিরাজ করছি সেহেতু মানুষকে অপমান করলে আমাকে অপমান করা হয়। আর আমাকে লীলালোকে অপমান ক'রে তীর্থে মন্দিরে সাড়ম্বরে মান-দেওয়া বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি?"

কিন্তু একথা আমাকে তখনকার মতন সান্ত্বনা দিলেও মনে পড়ত কয়েকটি পরম শ্রদ্ধেয় মানুষের কথা যাঁরা ব্রাহ্মণেতর কারুর ছোঁওয়া খেতেন না। এঁদের মধ্যে একজনকে ভুলতে পারি নি আজো। তিনি হাইকোর্টের জজ পুণ্যচরিত্র শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর মতন বিবেকী, তেজস্বী ও মহৎ সংযমী কোনো যুগেই ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মায় না। পিতৃদেবের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন ব'লে তাঁকে আরো ভালোবেসেছিলাম। সত্যব্রত সামশ্রমীও ছিলেন আর একজন বরেণ্য মানুষ। তাই মন বিমর্ষ হ'ত বৈ কি ভাবতে যে এঁরা ছুঁৎমার্গ মেনেও বরেণ্য হয়েছেন। সুতরাং ছুঁৎমার্গকে সরাসর ডিশমিশ করিই বা কী ক'রে? মহা বিপন্ন হ'য়ে প'ড়ে ভাবছি : "এঁরা বড় হ'লেও সামাজিক মানুষ, মহাসাধক বা পরম ভাগবত নন। আহা যদি এখন কোনো পরম ভাগবতকে হাতের কাছে পেতাম!"—

ঠিক্ এম্‌নি সময়ে কুমারনাথের অভ্যুদয়। তাঁকে দেখবামাত্র সত্যিই মনে পড়েছিল খৃষ্ট মিথ্যা বলেন নি : "He who seeketh findeth. বটেই তো—

খুঁজলেও যদি সত্যের দিশা না মেলে তবে খোঁজা ছাড়া আর কী করতে পারি আমরা? আষ্টেপিষ্টে-বাঁধা মানুষের পক্ষে সত্যের দেখা পাওয়া কি সোজা কথা? মানুষ যতই জ্ঞানের বুদ্ধির অভিমান করুক না কেন, সে কতটুকুই বা জানে, বোঝে? আর তাই না এত শত সাম্প্রদায়িকতার হানাহানি মারামারি! ভরসা কেবল এইটুকু যে দিশা খুঁজলে দিশা মেলে, ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে দয়াল সাড়া দেন—কেন না দয়া করাই তাঁর স্বভাব।

এ আমি বার বারই দেখেছি, সত্যি বলছি, যে যখনই আকুল হ'য়ে চেয়েছি—পেয়েছি উত্তর, দিয়েছেন কেউ না কেউ দেখা। মহাতান্ত্রিক, ধৈর্যরেতা কুমারনাথের দেখা মিলেছিল আমার জীবনের একটি গভীর সংকটলগ্নে। আর তাঁর সদানন্দ মূর্তি মুহূর্তে আমার সংশয়গ্রন্থি মোচন করে দিয়েছিল এই জন্যেই যে, তিনি কঠোর সাধনায় পেয়েছিলেন জগন্মাতার কৃপার আলো যার ফলে তাঁর লাভ হয়েছিল জীবন্মুক্তি। যখন এহেন জীবন্মুক্ত পুরুষ এসে আমাকে বললেন: তিনি খাওয়া-ছোঁওয়া, আচার-বিচার মানেন না, তখন মন আমার উঠল গান গেয়ে: "আমিও মানব না। ছুঁৎমার্গ যারই কেন স্বধর্ম হোক না, আমার স্বধর্ম নয়—হ'তেই পারে না।" উত্তর-কালে মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দও আমার এ-আত্মনির্দেশে সায় দিয়েছিলেন ব'লে আরো ভরসা পেয়েছিলাম যে আচারবিচারের বাড়াবাড়িতে সায় না দিলে আমার পথভ্রষ্ট হবার ভয় নেই।

কুমারনাথের সৌম্য শান্ত মূর্তি দেখে মন আমার ভ'রে উঠেছিল আরো এই জন্যে যে সেই আমি প্রথম চাক্ষুষ করি সহজিয়া ছন্দের মনোরম বিকাশ। ঠিক যেন ফুলটি হ'য়ে ফুটে উঠেছেন, কোথাও এতটুকু খিঁচ নেই, শুধু রূপ গন্ধ ও খোলা হাওয়ায় আনন্দোচ্ছল হেলা-দোলা।

তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছিলাম আর একটি নির্দেশ যে, বৈরাগ্য যতদিন না সহজ স্বায়ত্ত হয় ততদিন তার অভয় না চাওয়াই ভালো। তিনি এ-সময়ে না এলে হয়ত আমি অসময়ে গেরুয়াধারী হ'য়ে কিছুদিন মিথ্যে সময় নষ্ট ক'রে লোক হাসিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতাম। ভগবান্ যেন আমাকে এ-দারুণ দুর্গতি থেকে বাঁচাতেই আমার কাছে পাঠালেন তাঁর এ-সৌম্য দূতটিকে। তাইতেই তাঁর কাছে আমি পেয়েছিলাম আমার কয়েকটি দারুণ সংশয়ের সমাধান যার ফলে আমি ঠিক করি: (১) ঝোঁকের মাথায় বৈরাগী হব না; (২) ছুঁৎমার্গকে আমার স্বধর্ম ব'লে মানব না; (৩) যাঁরা মানেন তাঁদের মত যে ভ্রান্ত এমন ধারণাও পোষণ

করব না। এককথায়, হ'তে হবে আমাকে সহজিয়া—তাহলেই আমার মন ভরবে, প্রাণ জুড়ুবে, সংশয়-কালো অন্তরে প্রত্যয়-আলো জ্ব'লে উঠবে। কিন্তু এখন ফিরে যাই ফের বাল্য-অধ্যায়ে—নির্মলদার প্রসঙ্গে।

নির্মলদার কথা যখনই ভাবি তখনই সব আগে মনে হয় একটি কথা: যে, আমার জীবনের এ-অধ্যায়ে তিনি আমার কাছে এসেছিলেন ভাগবতী করুণার নির্দেশেই বটে। নৈলে সাহিত্য, সঙ্গীত ও যুক্তিবাদ এ-তিন প্রভাবের বেড়াজাল থেকে আমি শুধু যে মুক্ত হ'তে পারতাম না তাই নয়—যোগসাধনা ও আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকবারও কোনো তাগিদ পেতাম না আমার মনের মধ্যে। তাঁর কাছ থেকে আমি কী পেয়েছিলাম ভাবতে আমার মনে পর-পর তিনটি প্রশ্নের একটিই উত্তর জেগে ওঠে। যথা:

(১) কে প্রথম আমার মনে ভক্তির বীজ বোনে?—

উত্তর: নির্মলদা।

(২) কে আমার নাস্তিকতার দর্পচূর্ণ ক'রে শেখায় নত হ'য়ে ঠাকুরের কাছে চাইতে—"শরণ দাও" ব'লে?

উত্তর: নির্মলদা।

(৩) সর্বোপরি, কে আমাকে প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, নাস্তিকের বাইরের রূপের যতই কেন চেকনাই থাকুক না, ভগবানের যারা কোনো খবরই রাখে না তারা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের আলোক-রাজ্যের প্রজা নয়?

উত্তর: নির্মলদা।

সতের

আপ্তবাক্যে বলেছে: "অজ্ঞান তিমিরান্ধস্যজ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন"—কি না অজ্ঞানতিমিরান্ধের চোখ যিনি তাঁর জ্ঞানের জাদুদণ্ডে উন্মীলিত করেন তাঁরই নাম গুরু। এ-সংজ্ঞা-অনুসারে নির্মলদাকেই আমার প্রথম গুরু বলতে হয় বৈ কি। এ আমার কথার কথা নয়: আমি সত্যিই মনে করি তিনি সুরধামে না এলে আমার নাস্তিক্যমূঢ় মনের চোখের ঠুলি খ'সে পডত না। তাই তাঁর কথা আরো একটু ফলিয়ে বলব ঋণশোধ করতে—যে-ঋণকে আমি প্রায় গুরু-ঋণের সামিলই মনে ক'রে এসেছি।

কিন্তু একটা কথা: নির্মলদা গুরুর মতনই আমার নাস্তিক একগুঁয়েমির তিমিরান্ধতা দূর করলেও আমার রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন তাঁর বুদ্ধি, বিদ্যা কি মেধার গুণে নয়। বাস্তবিক তর্কে তিনি আমাকে হারাতে পারতেন না ব'লেই মাঝে মাঝে রেগে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে দিতেন। তিনি আমার নাস্তিক্যের ভিৎ টলিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিরূপের প্রভাবের জোরে—এমন কথাই বা বলি কেমন ক'রে—যখন ভাবি পিতৃদেব ও মেসোমহাশয়ের ব্যক্তিরূপের কথা: উভয়েই বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রবলে ও বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞতায় নির্মলদার চেয়ে পরিপক্কতর ছিলেন—বটেই তো। তাছাড়া ভাবুন—আমার চারপাশে প্রায় সবাই চাইত আমি ভগবান আছেন কি না এ নিয়ে মাথা না বকিয়ে পড়াশুনোয় মন দিয়ে সুবোধ বালক হ'য়ে ফুটে উঠি। তাদের সবাইকার মিলিত চাপও টিঁকল কই নির্মলদার মুসলানির সামনে? আমাকে তিনি যেন আমার ধ্রুবতারা জন্মভূমি থেকে ছিনিয়ে নিয়েই রওনা ক'রে দিলেন অধ্রুব প্রিয়-অচিন অভিসারে। তাঁকে আমি ভালোবেসেছিলাম ব'লেই যে তাঁর প্রেমাস্পদকে ভালোবাসতে বাধ্য হয়েছিলাম এমন কথাও বলতে পারি না। —কেন না পিতৃদেবকে ও মেসোমহাশয়কে যে আমি আরো বেশি ভালোবাসতাম এ নিশ্চয়। তবে? কেমন ক'রে তিনি আমার সমগ্র পরিবেশের প্রভাব থেকে আমাকে লুটে নিয়ে নিবেদন করতে পারলেন তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে?

এর একটিমাত্র উত্তর আছে: যে, আমার নিয়তির নিয়ন্তা তাঁকে পাঠিয়েছিলেন এই মিশনেরি মিশনরি ক'রে। আর এ-জন্যে তাঁকে চাপরাশ জুগিয়ে দিয়েছিল পরমহংসদেবের কৃপাই বটে যার প্রসাদে নির্মলদা তাঁকে ভালবাসতে শিখেছিলেন অত কম বয়সেই তাঁর কিশোর অন্তরের পবিত্র আবেগ দিয়ে।

ভগবানের এই কৃপাই পরে পিতৃদেবের মনের মোড়ও ঘুরিয়ে দেয় পরমহংসদেবের তথা ভক্তির দিকে। তাঁর এ-পরিবর্তন ঘটে আবার নির্মলদার ও আমার যুগল টানে। কেমন ক'রে ঘটল এ-অঘটন গুছিয়ে বলতে হ'লে আমাকে একটু উপক্রমণিকা করতে হবে। শুনুন বলি। বিচিত্র সে-ইতিহাস।

বলেছি, আমার বাল-মন তথা কিশোর মতিগতি গ'ড়ে উঠেছিল সাঙ্গীতিক, সাহিত্যিক ও সামাজিক এই ত্রিবিধ রসের আবহে—হাল আমলের রাষ্ট্রীয় পরিভাষায় —"সেক্যুলার" পরিবেশে। এ-ঐহিকতা কেমন? না, যেন বুদ্ধির ঝাঁজালো পোর-এর উপরে আবেশরঙিন শিল্প-মণ্ডনের ছোপ লাগিয়ে একধরণের সৌখিন পুলিপিঠে গ'ড়ে তোলা। সৌখিন আর্টের এ-চটকদার স্বাদের পসারী সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর

লোক : আর্টের জোগানদার ওরফে আর্টিস্ট ও আর্টের সমজদার ওরফে গ্রহীতা। বলাই বাহুল্য পিতৃদেব ছিলেন প্রথম শ্রেণীর মানুষ—কিনা স্রষ্টা শিল্পী। "উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল"-এ আমি লিখেছি যে, তাঁর অন্তরটা ছিল উদাসী। কিন্তু এ-উদাসীর অন্তরাত্মাটি ছিল খুব গোপন-সঞ্চারী, মাঝে মাঝে যেন খানিকটা অন্যমনস্ক হয়েই নিজের গহন অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসত বটে, কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে—তার পরেই পাছে কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে ঝটিতি হ'ত পর্দানশীন। কাজেই বেশির ভাগ লোকেই তাঁকে চিনত সাহিত্যিক, সাঙ্গীতিক ও শিল্পী ব'লেই বটে। যতদিন মানুষ নিজের অন্তরের অন্তরতমের নির্দেশে চলবার দীক্ষা না পেয়েছে ততদিন বাহ্য তকমায়ই তার পরিচয় দিলে খুব ভুল হবে না। তাই পিতৃদেবের ব্যক্ত ব্যক্তিরূপটি তার দীপ্তি ও পাথেয় সংগ্রহ করেছিল আর্টের পথেই বলব। অর্থাৎ জীবনের অন্ত্যলীলায় তিনি অনেকগুলি অপূর্ব ভক্তির কীর্তন লিখলেও ভক্ত বা সাধক বলতে যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন না।

কিন্তু এখানে একটা কথা একটু তলিয়ে ভাবতে হবে। প্রতি মানুষের বিকাশ খতিয়ে একটা বিশেষ ধারায় হ'লেও প্রতি উচ্চ-বিকশিত (evolved) মানুষের নানা সম্ভাবনা (potentiality) থাকে—যেমন ধরুন, বঙ্কিমচন্দ্র। স্বধর্মে কথাসাহিত্যিক হ'লেও বলা চলে যে, তিনি প্রচারক, প্রবন্ধকার বা হাস্যরসিক হ'য়েও ফুটে উঠতে পারতেন—যদি বাইরের চাহিদার বদল হ'ত। প্রমাণ: কৃষ্ণচরিত্র, অনুশীলন, কমলাকান্ত, লোকরহস্য। পিতৃদেব প্রায়ই বলতেন: "উঃ! অমন আশ্চর্য বহুমুখী প্রতিভা যে-কোনো দেশেই বিরল রে মণ্টু!" কিন্তু আমিও শয়তান ছিলাম কম নয়, বলতাম মুখটিপে হেসে: "যেমন আপনি, না?" তিনি হো হো ক'রে হেসে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলতেন: "বলি নি তুই হবি বাপকা বেটা?" (তখন আমার বয়স প্রায় ষোলো—ঠিক বালক নই আর, কিশোরই বলব।) কিন্তু যা বলছিলাম।

আর একটা উদাহরণ দিলে আমার উক্তিটি হয়ত আরো সুবোধ্য হবে: ধরুন, রবীন্দ্রনাথ। বহুমুখী প্রতিভা না ব'লে তাঁকে সর্বতোমুখী প্রতিভা বলতেই সাধ যায়। তাঁর কাছে আমরা সকলেই কত কী আনন্দপ্রসাদ পেয়েছি যতই ভাবি ততই মনে হয় তিনি অত্যুক্তি করেন নি যখন লিখেছিলেন:

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপমধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,

অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে···
যা পেয়েছি, যা করেছি দান,
মর্তে তার কোথা পরিমাণ ?

তিনি যা "দান" করেছেন তাতে ক'রে আমাদের দৈনন্দিন জীবনলোকের শুধু রাজপথগুলিই নয়, অলিগলিও তিনি সমৃদ্ধ ক'রে গেছেন তাঁর রসাল ফলে ফুলে লতায় পাতায়। প্রচারক, সংস্কারক, ধর্মযাজক, প্রবন্ধকার, কথাসাহিত্যিক, তার্কিক, অভিনেতা—কোন্ পদবী তাঁকে না মানায়? তবু একথা বললে ভুল হবে না যে খতিয়ে তিনি কবিই বটে—মহাকবি। তাঁর সত্তর বৎসরের অভিভাষণে কবি এই কথাটিই বলেছেন বড় সুন্দর ক'রে: "এই সত্তর বৎসর নানা পথ আমি পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, আজ আমার আর সংশয় নেই—আমি চঞ্চলের লীলাসহচর।···যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ ক'রে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে—আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।" আমাকেও তিনি এই কথাই লিখেছিলেন তাঁর একটি পত্রে—যেটি তীর্থংকরে ছাপিয়েছি: "বয়স সত্তর হ'ল।···কোনো পঁচিশে বৈশাখ ষোলোবৎসর বয়সের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলুন অনেকগুলো পথের সাম্‌নে অনেকগুলো আন্দাজের মুখে। তার মধ্যে সবগুলোকে বাদ দিয়ে আজকে অন্তত একটাতে এসে ঠেকেছে। এটুকু নিঃসন্দেহে পাওয়া গেল যে আমি কবি।"

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধেও একথা সমান খাটে, বলাই বাহুল্য। কেউ বলে তিনি স্বধর্মে বড় নাট্যকার, কেউ বলে ব্যঙ্গ কবি, কেউ বলে বড় সুরকার। লোকেনকাকা বলতেন: "দ্বিজু, তুমি ব্যারিস্টার হ'লে সব চেয়ে বড় ব্যারিস্টার হ'তে—যদিও স্বধর্মে তুমি কবি—par excellence, একথা অকাট্য—" অর্থাৎ, শিল্পীই বটে যাঁকে খতিয়ে হৃদয়বৃত্তিই পথ দেখায়।

এসবই মেনে নিয়েও বলব যে কবির কাব্যজগতে হৃদয় রসের রসদ যোগালেও তাঁর বিকাশের আখড়া মনোলোকই বটে—যার উপজীব্য যুক্তি, বুদ্ধি ও বিচার। তাই প্রতি খাঁটি কবিকে সকৃতজ্ঞে প্রণাম ক'রেও তাঁকে বুদ্ধিবাদী বলেই বরণ করব—মরমিয়া সাধক কি পরম ভাগবত ব'লে নয়। আমার শৈশব বাল্য কৈশোর ও যৌবনের পরিবেশে আমি আমার সমকালীন যাঁদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হই তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন এই বুদ্ধিলোকেরই বাসিন্দা ওরফে ইনটেলেকচুয়াল—

অর্থাৎ যাঁদের জীবনের ধারয়িত্রী তথা প্রাণের স্তন্যদায়িনী বুদ্ধিই বটে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "সিন্থেসিস অফ যোগ" গ্রন্থে মিথ্যা বলেন নি যে,—চাই বা না চাই—আমরা সবাই "বুদ্ধিযুগেরই সন্তান" বৈ কি।

এ-হেন যুগের উপাস্য নন ভগবান্। আধুনিক উচ্চশিক্ষিত সংস্কারক মনীষীরা অনবদ্য ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করলেও ব্রহ্মবাদী বলতে যা বোঝায় তা তাঁরা ছিলেন না—কেন না তাঁদের স্বরাজ্য ছিল না ব্রাহ্মীস্থিতিতে—গীতা যার উপমা দিয়েছে আপূর্যমান অচলপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রের সঙ্গে। কবি বলতে যাঁরা ঋষি বোঝেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের মতৈক্য হওয়া সম্ভব নয় এই জন্যে যে, ঋষি-পদবাচ্য শুধু তিনি যাঁর স্বধর্ম সত্যকে, তত্ত্বকে প্রকাশ করা, আর কবি বলি তাঁকেই যাঁর স্বধর্ম সুন্দরকে সরসকে প্রকাশ করা। কথাটা যখন উঠলই, একটু ভাষ্য করি।

শ্রীঅরবিন্দকে আমি বরণ করেছিলাম শুধু গুরু ব'লে নয়—একাধারে কবি ও ঋষি ব'লেও বটে। তাঁর নির্দেশেই প্রথম আমি চিনতে শিখি একটি গভীর সত্য : যে, চকিত মুহূর্তে কবি বা মনীষী মর্মকোষে পরমানন্দের আভাস পেলেও মনের স্তরে বসবাস করলে সে-আনন্দের কোনো পূর্ণ কি স্থায়ী উপলব্ধি হ'তে পারে না, কেন না আনন্দস্বরূপের সঙ্গে জীবের চিরমিলন হ'তে পারে কেবল অন্তরাত্মার গহন লোকে। এ-ধ্রুবলোকে উত্তীর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত মানুষ মূলতঃ মনোলোকের প্রজা হ'য়েই বসবাস করে বুদ্ধিকে খাজনা দিয়ে। ব্রাহ্মসমাজের পরম শ্রদ্ধেয় দিকপালদেরকেও এই কারণেই বুদ্ধিবাদী, মনস্বী বা মনীষী পদবীই দিতে হয়—মুনি ঋষি যোগী তপস্বী উপাধি দেওয়া চলে না। কথাটা একটু খুলে বলি—নৈলে বোঝাতে পারব না ভাগবত মহিমাকে আমি আমার বাল্যকালে না হোক কৈশোরে ও যৌবনে কী ভাবে পরিকল্পনা করেছিলাম।

ব্রাহ্মসমাজ তার নব নব সংস্কারের প্রেরণা পেয়েছিল দুটি ভাবধারা থেকে : খৃশ্চানদের রাজসিক পরার্থনিষ্ঠা ওরফে সার্ভিস, ও ইংরাজ কবিদের অতীন্দ্রিয়তা-মিশেল বুদ্ধিবাদ ওরফে মিসটিসিস্‌ম। প্রথমটির নজির—আপ্তবাক্য : "Thou shalt love thy neighbour as thyself." অর্থাৎ মানুষকেই বরণ করতে হবে ভগবানের শরণ নিয়ে। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি বলছি না যে বুদ্ধিবাদী ব্রহ্মোপাসনার মধ্যে ভগবদ্‌ভক্তির আমেজ মিলতেই পারে না। পারে, কিন্তু এ-ভক্তি তাঁদের কাছে গৌণ—মুখ্য নয়; উপায় মাত্র—লক্ষ্য নয়। অন্য ভাষায় : ভগবানকে স্তবস্তুতি করব বটে কিন্তু মানুষকেই উন্নত করতে, নৈতিক করতে, নিখুঁৎ

করতে! (রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি পত্রে আমাকে লিখেছিলেন ঠিক এই কথাই ; "বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ।") ব্রাহ্মসমাজের পরম শ্রদ্ধেয় আচার্যেরা বিশ্বমানববাদী হ'য়ে ভুল করেছিলেন এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমার মনে হয় বাংলার তৎকালীন পরিবেশে তাঁদের এ ছাড়া উপায়ই ছিল না। কেন না হিন্দুসমাজের বহু অনাসৃষ্টির আগাছা তাঁরা ঝেঁটিয়ে সাফ করতে পারতেন না যদি তাঁরা য়ুরোপের বলিষ্ঠ বুদ্ধিবাদকে সম্মার্জনীর কাজে নিয়োগ না করতেন। তাই তাঁদেরকে স্বদেশী উপাসনাতেও আমদানি করতে হয়েছিল বৈদেশিক চালচলন : বক্তা, বেদী, বিধিবদ্ধ উৎসব ও রবিবাসরিক সার্মন—ভাষণ। কিন্তু সব মেনেও একথা বলতে হবেই হবে যে ভারতের মুনি ঋষি তত্ত্বদর্শীরা অধ্যাত্মসত্যকে বরণ করেছিলেন আত্মার উপজীব্য ব'লে—মানুষের নৈতিকতার অনুশাসক ব'লে নয়।

ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় প্রেরণা ছিল বিদেশী কবিদের কাব্যবাণী : বাইরণের, শেলির, ওয়র্ডসওয়র্থের, মিলটনের, ব্রাউনিঙের। পিতৃদেবের আসরে বিজয়কাকা —যিনি ছিলেন একজন মহৎ ও উদার বুদ্ধিবাদী ব্রাহ্ম—প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন মিলটনের বিখ্যাত :

For who would lose,
Though full of pain, this intellectual being,

কিম্বা ওয়র্ডসওয়র্থের

One impulse from a vernal wood
May teach you more of man,
Of moral evil and of good
That all the sages can.

ঝংকারে, আত্মপ্রসাদে, চিন্তায় কাব্যরসে সমৃদ্ধ বৈ কি, কে না মানবে? কিন্তু এ-জাতীয় মহৎ কাব্যকে প্রণাম ক'রেও বলতেই হবে যে, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ বিকাশে সেবাব্রতী খৃশ্চানিটি বা নিসর্গনিষ্ঠ বুদ্ধিবাদের বাণী কোনো দিনই অঙ্গীকৃত হয় নি—কেন না "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ"—অর্থাৎ যিনি প্রিয়ের প্রিয় অন্য সব কিছুর চেয়ে প্রিয়—তাঁর অপরোক্ষানুভূতিই ছিল ভারতীয় মহাসাধকদের মুক্তির মন্ত্র, ভক্তির লক্ষ্য, জীবনের বেদান্ত, মরণের পারানি। ভারতীয় সাধকদের একজন শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র আচার্য শঙ্কর বলেছেন : "বিনা অপরোক্ষানুভবং ব্রহ্ম

শব্দৈর্নমুচ্যতে”—অর্থাৎ কিনা কথায় চিঁড়ে ভেজে না, তাঁকে না পেলে কিছুই হ'ল না। ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বহু উপকার করেছেন একথা সকৃতজ্ঞে মেনেও তাই বলতেই হবে যে, হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ মন্ত্রকে ব্রাহ্ম আচার্যেরা খানিকটা পাশ কাটিযেই গেছেন—ব্রহ্মসঙ্গীতে “জয় ব্রহ্ম জয়” ব'লে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা সত্ত্বেও। ভগবান্ আমাদের মানসিক নীতিরও ধারয়িতা বটে কিন্তু নৈতিক উন্নতির কি পার্থিব প্রগতির জন্যে আমরা তাঁর আরাধনা করি না। আমরা তাঁকে চাই তাঁরি জন্যে, তাঁকে না পেলে “অমৃত” হওয়া যায় না ব'লেই—পারমার্থিকদের প্রাণমন্ত্র হ'ল “যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?” এককথায়, সব আগে চাই তাঁকে পাওয়া—তার পরে বাকি সব কর্তব্যসমাপন হবে—তাঁরি নির্দেশপথে। এই মহাবাণী—ভারত-আত্মার শাশ্বত বাণী—আমাদের এ-যুগের বুদ্ধিবাদীরা ভুলে গিয়েছিলেন ব'লেই পরমহংসদেবের সঙ্গে ব্রাহ্ম আচার্যদের প্রায়ই বাধত। সে-যুগে ব্রাহ্মসমাজের প্রায় কেউই যে পরমহংসদেবকে ঠিক বুঝতে পারেন নি—তার নিদান খুঁজতে হবে এইখানেই—অর্থাৎ ব্রাহ্ম প্রচারকদের প্রায় সবাই ছিলেন মূলতঃ বুদ্ধিবাদী, আর নিছক বুদ্ধির দীক্ষায় শুধু-যে আধ্যাত্মিক সাধনে সিদ্ধি হয় না তাই নয়—এমন কি চিনতেও পারা যায় না নিখাদ আধ্যাত্মিক মহিমার মহত্ত্বকে। এইজন্যেই সে-যুগের হিন্দু তথা ব্রাহ্ম বুদ্ধিবাদীদেরকে পরমহংসদেব হাজার চেষ্টা ক'রেও এই সাদা কথাটা বোঝাতে পারেন নি যে লৌকিক বুদ্ধি, যুক্তি কি কমনসেন্স দিয়ে ভগবানের মহাবিশ্বলীলা না যায় বোঝা, না বোঝানো। তিনি ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেককেই গভীর স্নেহ করতেন কিন্তু করলে হবে কি, তাঁরা কিছুতেই পরমহংসদেবের একথা নিলেন না যে, হিন্দুদের কাছে ব্রাহ্মদের অনেক কিছুই শিখবার আছে, বিশেষ ক'রে হিন্দুদের উদার, গভীর, লীলাবাদী সর্বাস্তিবাদ থেকে। তাই তিনি বলতেন হেসে: “ব্রাহ্মরা ধ'রে আছে শানাইয়ের এক নিরাকারের পোঁ, হিন্দুরা তুলছে তাঁর সাকার রূপের হাজারো বোল পরন।” ব্রাহ্মরা একান্ত নিষ্ঠাভরে ব্রহ্মগুণগান ক'রেও যে হিন্দুদের মতন সত্যিকার ব্রহ্মবাদী হ'তে পারেন নি তার কারণ তাঁরা—পরমহংসদেবের ভাষায়—“ব্রহ্মের ইতি করতেন,” অসহিষ্ণু স্বরে ঘোষণা করতেন যে নিরাকার উপাসনাই একমাত্র সর্বগ্রাহ্য উপাসনা—প্রতিমাপূজা, ব্রত, তীর্থ, মন্ত্র, যাগযজ্ঞ, গুরুবাদ এসবই মিথ্যা কুসংস্কার। পরমহংসদেব একে বলতেন “মতুয়ার বুদ্ধি” কি না ডগম্যাটিস্‌ম্—যে খৃশ্চানদের ম'ত বলে: ভগবানকে আমি যে-ভাবে পূজা করি সে-ভাবে যে তাঁর পূজা না করবে সে যাবেই যাবে জাহান্নমে। খৃশ্চানদের অহঙ্কৃত গোঁড়ামির খানিকটা ছোঁয়াচ

ব্রাহ্মদের আচার বিচারে লেগেছিল কারণ ব্রাহ্ম যাজক তথা যজমান খানিকটা খৃশ্চানি আত্মাভিমানের নির্দেশে চলতে চেয়েই ভেবে বসলেন যে, বিন্দুপ্রমাণ বুদ্ধি ধারণ করতে পারে সিন্ধুপ্রমাণ ভগবানকে। তাই তিনি কথায় কথায় বুদ্ধিবাদীদের উপমা দিতেন সেই পিঁপড়ের সঙ্গে যে পাহাড়ের একটি দানা মুখে ক'রে ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বলেছিল : "কাল এসে সমস্ত পাহাড়টাই নিয়ে যাব।"

শিক্ষিত ব্রাহ্মরা সাকার পূজাকে অবজ্ঞা ক'রে ধর্মে-অন্তর্দৃষ্টি খুইয়েছিলেন ব'লেই হিন্দুদের গভীর আধ্যাত্মিকতাকে ঠিক চোখে দেখতে শেখেন নি। বুদ্ধিকে যদি ভগবৎদীক্ষার গুরু ব'লে বরণ করা যায় তবে এই ধরণের ঠিকে-ভুল না হ'য়েই পারে না। একথা একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার আগে একটি ব্যক্তিগত কথা বলি—নৈলে হয়ত কেউ কেউ আমাকে ভুল বুঝতে পারেন।

কথাটি এই যে, ব্রাহ্মসমাজের কাছে আমি নানা দিক দিয়েই ঋণী ও ধর্ম সম্বন্ধে গভীর মতভেদ সত্ত্বেও বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মকেই আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি বরাবরই। হিন্দুসমাজের নানা নীতিশৈথিল্য, গতানুগতিকতা ও কুসংস্কার দূর করবার জন্যে তাঁরা সে-যুগে পদে পদে যে-সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন তা থেকে আমি নিজেও কম শিখি নি। স্ত্রী-শিক্ষা, আন্তর্জাতিক বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, ছেলেমেয়েদের গান-গাওয়া এসব সংস্কারে তাঁরাই সব-প্রথম অগ্রণী হন যার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্রাহ্মদের অনেক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবই চারিয়ে যায় শিক্ষিত হিন্দুর মনে—খানিকটা অজান্তেই বলব। কিন্তু তবু একথা আমাকে সত্যের খাতিরে বলতেই হবে যে, ধর্মের নানা আগাছা দূর করতে কোমর-বাঁধাটা শুভ বুদ্ধির প্রেরণা হ'লেও ধর্মের শ্রেষ্ঠ অনুভবে হিন্দু মহাসাধকরা যে আলোকশিখরে উঠেছিলেন ব্রাহ্ম-সমাজের মনীষীরা তার কোনো খবরই রাখতেন না। নৈলে পরমহংসদেবের মতন যুগ প্রবর্তক মহাপুরুষকেও কি তাঁরা পৌত্তলিক ব'লে অবজ্ঞা করতে পারতেন—শিবনাথ শাস্ত্রীর মতন সাধুপুরুষও তাঁর ঐশ্বরিক ভাবসমাধিকে হিস্টিরিয়া ব'লে সন্দেহ করতেন।

এইবার ভূমিকা ছেড়ে নাটকের মঞ্চে নামি। নাটক ব'লে ভালোই হ'ল, কারণ যা বলতে যাচ্ছি তা চোখে-দেখা হ'লেও একটি মাত্র ব্রাহ্ম তার্কিকের সঙ্গে আমার তর্কযুদ্ধের বিবরণ নয়, দুতিনটি ব্রাহ্মকে তাল পাকিয়ে আমি একটি ব্রাহ্ম-আচার্যের মধ্যে পেশ করতে যাচ্ছি। গিরিশ মেসোমহাশয়ের 'ধর্মশালায়' এ-জাতীয় ব্রাহ্ম প্রায়ই আসতেন ও হিন্দুদের নানা সংস্কারকে মন্দ প্রমাণ করতে উঠে প'ড়ে

লাগতেন। সময়ে সময়ে তাঁদের সঙ্গে আমার বাধত, কখনো আমি জিততাম, কখনো তাঁরা। পরে সময়ে সময়ে তর্কের আবেগে মুখ ফসকে অত্যুক্তি করার ফলে আসত অনুতাপ—কখনো আমার, কখনো বা তাঁদের। এই ধরনের কয়েকটি বাগ্‌বিতণ্ডাকে জুড়ে একটি তর্কচিত্র ফলিয়ে তুলেছি খানিকটা নাটকীয় ঢঙেই বলব, অর্থাৎ যা বলব তা মূলত সত্য হ'লেও খানিকটা আর্টিস্টিকভাবেই সত্য, কেন না এই ধরনের গোঁড়ামি, আঘাত ও অনুতাপ শুধু ব্রাহ্মদের মধ্যে নয়, বহু ধর্মোৎসাহী হিন্দুদের মধ্যেও দেখা যেত। অন্যভাষায়, যেমন ব্রাহ্মদের মধ্যে গোঁড়ামি প্রকট হ'ত হিন্দুদের প্রতি তাঁদের স্বাভাবিক বিমুখতা বশে, ঠিক তেমনি হিন্দুদের নানা আলোচনায়ই প্রকাশ পেত ব্রাহ্মদের প্রতি তাঁদের সামাজিক প্রেজুডিস।

যাঁর কথা বলতে যাচ্ছি—তাঁর নাম দেওয়া যাক সদাস্নিগ্ধবাবু—তিনি ছিলেন একজন মানুষের মতন মানুষ—ব্রাহ্মসমাজের একজন সর্বশ্রদ্ধেয় আচার্য। তাঁর তেজস্বিতা, সত্যপরতা, সরল স্নিগ্ধ ব্যবহার, সর্বোপরি জ্বলন্ত আদর্শবাদে সবাই মুগ্ধ হ'ত। এমন সাহসী মানুষ যে এক অভিনেত্রীকে বিবাহ ক'রে থিয়েটার ছাড়িয়ে এনে ঘরনী করেন। মেসোমহাশয় তো এজন্যে তাঁকে নিরন্তরই ধন্য ধন্য করতেন। বাস্তবিক, এমন সৌম্য, সদাশয়, ভাবদীপ্ত আদর্শবাদী আমি জীবনে বেশি দেখি নি। আমি তাঁর আরো অনুরাগী হয়ে উঠেছিলাম মেসোমহাশয়ের কাছে একদিন এই ধরনের কথা শুনে :

"জানো মণ্টু, সদাস্নিগ্ধবাবু তোমার একজন সত্যিকার সমজদার। তোমার তর্কাতর্কি শুনে অনেকে তোমাকে ফাজিল বলে শুনে তিনি কাল আশ্চর্য হয়ে বললেন কি জানো ? বললেন : সেকি গিরিশবাবু ? ক্রিটিকরা ওর মধ্যে প্রগল্‌ভতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না! দেখতে পেল না যে ছেলেটি অসামান্য—live wire যাকে বলে ? তাছাড়া এই বয়সেই ভগবান্ নিয়ে ভাবা, তর্ক করা—এ কি সোজা কথা নাকি ?"…ইত্যাদি। এর পরে আমি তাঁর ভক্ত না হয়ে করি কী ?

মেসোমহাশয়ের ওখানে সদাস্নিগ্ধবাবুর সঙ্গে যখন আমার প্রথম আলাপ হয় তখন আমি নাস্তিক্যের পেখম মেলে বিশ্বাসীদের ঠুকরে বেড়াচ্ছি, প্রাণের মায়া ছেড়েই আমার কালাপাহাড়ি মতামত জাহির ক'রে চলেছি—ঈশ্বর ফীশ্বর নেই, মানুষ তাঁকে ডাকে ভয় পেয়ে, দুর্বলতার ভিতেই জন্মায় ভক্তির আগাছা…ইত্যাদি ইত্যাদি।

সদাস্নিগ্ধবাবু আমার এ-ধরনের মতামতে সত্যিই ক্লিষ্ট হতেন একথা পরে শুনি মেসোমহাশয়ের মুখে। কিন্তু আমার সামনে তিনি এ-নিয়ে কোনোদিন আক্ষেপ

প্রকাশ করেন নি—শুধু ধীর স্থির সহিষ্ণু সুরে দেখাতে চেষ্টা করতেন নাস্তিক্য কেন মন্দ ও ঈশ্বরভক্তি কেন বরণীয়।

এর পরে বৎসর ঘুরতে না ঘুরতে নির্মলদার প্রভাবে প'ড়ে আমি বদ্‌লে গেলাম—হয়ে দাঁড়ালাম দুর্ধর্ষ প্রতিমাপূজক তথা গুরুবাদী।

আট দশ মাস সদাস্নিগ্ধবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নি। হঠাৎ যেদিন ফের দেখা, তিনি আমার সবে-জাগা আস্তিক্যবুদ্ধি দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হ'তে না হ'তে বিষম ঘা খেলেন আমার পৌত্তলিক ও গুরুবাদী রূপ দেখে। তবে স্বভাবে তিনি ছিলেন উৎসাহী—ardent যাকে বলে—কাজেই আমার সঙ্গে ফের তর্ক জুড়ে দিলেন বোঝাতে কেন গুরুবাদ মিথ্যাচার ও প্রতিমায় ঐশিত্ব আরোপ করা অযৌক্তিক তথা হসনীয়। আমি তাঁর গায়ে-পড়া আক্রমণে আশ্চর্য হ'য়ে গুরুবাদ ও সাকার পূজার স্বপক্ষে যুক্তি জড়ো করতে না করতে তাঁর স্নিগ্ধ সদাশয় রূপ বদ্‌লে গেল মুহূর্তে ঠিক যেমন কালবৈশাখীর ঝড়ে আচম্বিতে স্বচ্ছ হাওয়া বদ্‌লে রূপ নেয় কালো আঁধির। কিন্তু আমিও তো কম একগুঁয়ে নই—তাঁর রোখ দেখে উঠলাম রুখে। প্রাণে যেমন প্রাণ জাগে, তেমনি তাপেও তো তাপ জাগবে। আমি প্রতিমা-পূজার স্বপক্ষে কী কী যুক্তি দিয়েছিলাম মনে নেই, কেবল পরমহংসদেবের একটি কথা উদ্ধৃত করেছিলাম মনে আছে: "চিন্ময়ী প্রতিমা।" (কথামৃতের প্রথম অধ্যায়ে এই কথা দুটি তিনি বলেন মাস্টার-মহাশয়কে—তাঁর তর্কের উত্তরে যে, ভগবান তো মাটির প্রতিমা নন) সদাস্নিগ্ধবাবু শুনে উদ্দীপ্ত হ'য়ে বললেন: "আমার কী যে দুঃখ হয় বাবা, তোমার মত সুবুদ্ধি ছেলের এই লক্ষ্মীছাড়া কুমতি দেখে!" ব'লেই তিনি পরমহংসদেবের বিরুদ্ধে কয়েকটি শ্লেষোক্তি করলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে সে-স্থান ত্যাগ করলাম—যথাবিধি কানে আঙুল দিয়ে।

পরদিন তিনি আমাকে ফের ডেকে পাঠিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন অসহিষ্ণু হ'য়ে তিনি শুধু যে অন্যায় করেছেন তাই নয়, অন্যের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করাও তাঁর পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে। শেষে বলেছিলেন: "তবে কি জানো বাবা, তোমার মতন সুবুদ্ধি ছেলেও যে পরমহংসদেবের কথায় এতটা উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে সত্যিই আমি ভাবতে পারিনি—বিশেষ ক'রে এ-যুগে, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে।

তাঁকে আমি উত্তরে বলেছিলাম: "আমি উদ্দীপ্ত হয়েছিলাম শুধু এইজন্যে যে পরমহংসদেবকে আমি গুরুপদে বরণ ক'রে ভালোবেসে ফেলেছি।"

যেই একথা শোনা অমনি তাঁর চোখ জলে ভ'রে এল। আমি তো অবাক্! কাল যাঁর প্রসঙ্গে তাঁর মুখে মেঘ ছেয়ে উঠেছিল আজ তাঁর নাম করতে না করতে কি না চোখে জল!

তিনি চোখের জল মুছে আমাকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন: "আশীর্বাদ করি বাবা, ভগবানকেও যেন তুমি এম্‌নি সহজেই ভালোবাসতে পারো। কে জানে হয়ত তুমি যাঁকে গুরুর পদবী দিয়ে ভালোবেসেছ তাঁর প্রতি তোমার সরল অনুরাগই তোমার মনের মোড় ফিরিয়ে দেবে, আর তখন তুমি মানুষকে ছেড়ে ভগবানকে গুরু করবে। ভগবান যে কাকে কোন্ পথ দিয়ে কোথায় নিয়ে যান কেউ কি জানে বাবা?"

আঠারো

সদাস্নিগ্ধবাবুর কথা আমার মনে গেঁথে আছে শুধু তাঁর সদাশয়তার জন্যেই নয়। তিনি যেন এসেছিলেন আমার খানিকটা চোখ খুলে দিতেই—যার দৌলতে আমি পরিণত বয়সে আরো পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলাম—গোঁড়ামির অসহিষ্ণুতা কী ভাবে সদাশয় মানুষকেও অন্ধ আত্মাভিমানী ক'রে তোলে। আমি ব্রাহ্মদের মধ্যে চরিত্রবান, কর্তব্যনিষ্ঠ, শ্রদ্ধেয় মানুষ দেখেছি যথেষ্ট যাঁদের মধ্যে সদাস্নিগ্ধবাবু ছিলেন একজন বরেণ্য মানুষই বলব। কিন্তু যে-মানুষ নাস্তিক বালককেও ভগবানের দিকে টেনে আনতে চেয়ে তার প্রগল্‌ভ ঔদ্ধত্য সইতে নারাজ নয়—সে-মানুষ প্রতিমা-পূজা ও গুরুবাদের তরফের যুক্তিকে অধীর হ'য়ে 'লক্ষ্মীছাড়া কুমতি' নাম দিতে পরে দেখে আমি কেমন যেন বিহ্বল হ'য়ে গিয়েছিলাম। সম্ভবত মেসোমহাশয়ই তাঁকে পরে বুঝিয়ে থাকবেন যার ফলে তিনি অনুতপ্ত হ'য়ে আমাকে তলব ক'রে নিজের ভ্রম স্বীকার করেন। এতে ক'রে তাঁর স্বভাবের মহত্ত্ব আরো উজ্জ্বলই হ'য়ে উঠেছিল মানি, কিন্তু তা ব'লে যে-মোহ তাঁর মতন তিতিক্ষাশীল মানুষকেও অতখানি উগ্র ক'রে তুলেছিল তাকে গোঁড়ামি ছাড়া আর কোনো নামই তো দেওয়া যায় না। পিতৃদেবের দীক্ষায় আশৈশব আমি গোঁড়ামিকে এড়িয়ে চলতেই শিখেছিলাম, কিন্তু আমি ছেলেবেলায় খানিকটা সরল ভাবেই ধ'রে নিয়েছিলাম যে, যেহেতু ব্রাহ্মরা হিন্দু গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, সেহেতু তাঁদের মন হিন্দুদের চেয়ে বেশি খোলা ও উদার। সদাস্নিগ্ধবাবুর অসহিষ্ণু একদেশদর্শিতা আমাকে যেন চোখে আঙুল দিয়েই দেখিয়ে

দেয়—গোঁড়ামি কত ছদ্মবেশে উড়ে এসে শিক্ষিত, তেজস্বী, মহৎ মানুষেরও মন জুড়ে বসে।

গোঁড়ামির ব্যাপক চতুরালির নানা ছলাকলার কথা আমি পরে শুনি শরৎচন্দ্রের কাছে—কৈশোরে। সতের আঠারো বৎসর বয়সে তাঁকে সদাস্নিগ্ধবাবুর কথা বলতে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দেন কেন তিনি নাস্তিক্যের স্বপক্ষে নানান্ মতামত সইতে পারা সত্ত্বেও প্রতিমাপূজার স্বপক্ষে যুক্তি বরদাস্ত করতে পারেন নি। শরৎচন্দ্র তাঁর দত্তা উপন্যাসে রাসবিহারীর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্ম গোঁড়ামির ধূর্ততার দিকটা দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে হিন্দু ছিলেন ব'লে ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপ অনেক উদার হিন্দুর কাছেই একটু বেশি তীব্র ও অশোভন মনে হ'ত। কিন্তু তাঁর একটি কথা আমি কোনদিনই ভুলব না—কারণ এ-অভিযোগটি ছিল সত্যভিত্তি: যে, হিন্দুসমাজকে সংস্কৃত করবার "দুর্দান্ত উৎসাহে" আমাদেরকে ছেড়ে বেরিয়ে এসেই ব্রাহ্মরা ভুল করেছিলেন, আমাদের মধ্যে থেকেই তাঁদের চেষ্টা করা উচিত ছিল হিন্দুসমাজের অনাচার ও কদাচারের প্রতিকার করা। একথা তিনি তাঁর "পল্লীসমাজে" চমৎকার ক'রে ফলিয়ে তুলেছেন। কথাটা অবশ্য নতুন নয়, বিবেকানন্দ বলেছিলেন তাঁর আমেরিকান শিষ্যদের সে কবে: "Every step that has been really gained in the world has been gained by love···condemnation accomplishes nothing." (Inspired Talks)। কিন্তু প্রতিভাধর শরৎচন্দ্র তাঁর নানা চরিত্রের দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে এ-মহোক্তির সত্যটিকে জাজ্বল্যমান ও জীবন্ত ক'রে তুলেছিলেন। তিনি শিবপুরে আমাদেরকে বারবারই বলতেন: "হিন্দুসমাজকে ব্রাহ্মরা খৃশ্চানদের মতন প্রহারই করেছেন কিন্তু উদার করতে পারেন নি।" ব্রাহ্ম-সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর এ-অভিযোগ পুরোপুরি সত্য ব'লে আমি মনে করি না, কারণ ব্রাহ্মরা খৃশ্চানদের মতন হিন্দুসমাজের সব সংস্রব ত্যাগ করতে পারেন নি। বহু হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে মেলামেশা ছিল, হৃদ্যতা ছিল, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধারও অভাব ছিল না। তাই ব্রাহ্মদের "সমালোচনার" জন্যে না হ'লেও তাঁদের সততা ও চরিত্রবলের দৃষ্টান্তে হিন্দুদের অশেষ উপকার হয়েছিল। এমন কোন্ হিন্দু আছে যে আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের "গোরায়" পরেশবাবু বা "ঘরে বাইরে"তে চন্দ্রনাথ-বাবুর আশ্চর্য মহত্ত্বে মুগ্ধ না হবে? আর ব্রাহ্মসমাজে এ-রকম মহৎ মানুষ থেকে থেকে কার না চোখে পড়েছে? এ-আলোচনা ফেনিয়ে তুলতে চাই না, কেননা আজকের দিনে শিক্ষিত ব্রাহ্ম ও শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে প্রভেদ প্রায় নেই বললেই চলে

এবং ব্রাহ্মদের মধ্যেও অনেকেই নিজেদের হিন্দু ব'লে পরিচয় দিতে সুরু করেছেন। এই-ই হ'ল ঠিক চাল। কারণ ব্রাহ্ম বা শিখরা হিঁদুয়ানির আচার না নিলেও হিন্দুর ঐতিহ্যকে দুয়ো দেবেন কেমন ক'রে! আমার স্পষ্ট মনে আছে—সে-যুগেও পিতৃদেবের ও মেসোমহাশয়ের অনেক চিন্তাশীল ব্রাহ্ম বন্ধুই বলা সুরু করেছিলেন যে, হিন্দুসমাজের বেড়াজাল কেটে বেরিয়ে আসা একসময়ে তাঁদের পক্ষে আবশ্যিক ছিল বটে, কিন্তু সে-উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হয়েছে তখন ব্রাহ্মদের আর আলাদা থাকা উচিত নয়। পক্ষান্তরে অনেক উদারনৈতিক হিন্দুও একথায় সায় দিয়ে বলতেন যে, হিন্দু-সমাজও সমৃদ্ধতর হবে শিক্ষিত ব্রাহ্মদের ফিরে পেলে। তাই ব্রাহ্মসমাজের একদেশ-দর্শিতার আলোচনা রেখে সাধারণভাবে বুদ্ধিবাদীদের গোঁড়ামির সম্বন্ধেই বলি এবার যা বলতে চাই।

আমার ঠিক বাল্যকালে না হোক, কৈশোরে ও যৌবনে অনেক ঘা খেয়ে তবে আমি পরমহংসদেবের একটি প্রার্থনার তাৎপর্য বুঝতে পারি: "মা, আমার বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।" একথা প্রথম বুঝতে সুরু করি আমার কয়েকজন বুদ্ধিমান্ বন্ধুর সবজান্তামি দেখে। দেখি যে, বুদ্ধির দম্ভে তাঁরা ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রে প্রায় অজ্ঞান-তিমিরান্ধ হ'য়ে পড়েছেন অথচ ভাবছেন তাঁরা বেজায় চক্ষুষ্মান্। তাঁদের আস্ফালনের হসনীয় ঔদ্ধত্যে প্রতিহত হ'য়েই আমি প্রথম ভাবতে সুরু করি—যুক্তি তর্কের আলোয় আমি কী কী পেয়েছি। তখন দেখতে পাই, ক্রমে ক্রমে, যে মানস-রাজ্যের অণোরণীয়ান্ বুদ্ধিলোকে মহতো-মহীয়ানের বিরাট্ বিশ্বলীলার কিছুই বোধগম্য হয় না ব'লেই আত্মপ্রসন্ন বুদ্ধিবাদীরা তত্ত্বদর্শীদের জীবনদর্শনের ভাবপরিগ্রহ করতে পারেন না।

কী বলতে চাই বোঝাতে পরমহংসদেবের একটি উপমা উদ্ধৃত করি: "কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ জ্বাল দিয়েছে, কেউ দুধ খেয়েছে।" ঠিক তেমনি কেউ ভগবানের খবর পেয়েছে, কেউ তাঁর স্পর্শ পেয়েছে, কেউ বা তাঁকে অন্তরঙ্গ রূপে জেনেছে, চিনেছে। এই জানা ও চেনাই সবচেয়ে বড় কথা—কারণ শুধু এই পরম পরিচয়ের ফলেই মানুষ হয় কৃতকৃত্য, তার ঘটে চরিত্রের রূপান্তর, নবজন্মের যুগান্তর। যেমন ঐ উপমা-সম্রাটেরি উপমা: "যে তাঁর সঙ্গে মাখামাখি করেছে তার নাম বিজ্ঞানী, সিদ্ধের সিদ্ধ। সে বাইরে থেকে দেখতে আর পাঁচটা মানুষের মতন হ'লেও ভিতরে ভিতরে আর মানুষ থাকে না—যেমন স্পর্শমণির ছোঁয়ায় যে-তলোয়ারের ইস্পাত সোনা হয়ে গেছে তার বাইরে তলোয়ারের রূপ থাকলেও তাকে

দিয়ে আর হিংসা করা যায় না। আরো, তাঁর রূপের যে স্বাদ পেয়েছে তার কি ভালো লাগে অন্য কোনো রূপের স্বাদ? তার কাছে যে পরমাসুন্দরীর রূপও মনে হয় চিতার ভস্ম…" ইত্যাদি কত বলব ?

এ-জাতীয় অপরোক্ষ উপলব্ধির ঝংকৃত বাণীর পাশে রাখুন সেই কবিদের বুদ্ধি-কল্পনার বাণী যাঁরা ভগবানের দেখা না পেয়েই শুধু তাঁর গুজব শুনে ঘোষণা করেন :

He prayeth best who loveth best
All things both great and small,
For the dear God who loveth us
He made and loveth all.

—Coleridge

কিম্বা ওয়র্ডসওয়র্থের বুদ্ধিবাদী প্রার্থনা :

Give unto me, made lowly wise,
The spirit of self-sacrifice ;
The confidence of reason give ;
And in the light of truth thy Bondman let me live.

ঐ সঙ্গে আর একটি সত্যও আমার চোখে পড়ে : যে, কবি শিল্পীর স্বধর্ম এক, যোগী ঋষির স্বধর্ম আর—যেকথা রবীন্দ্রনাথ আমাকে মাঝে মাঝেই বলতেন, লিখেও-ছিলেন। একটি উদাহরণ দিই। ধরুন, সত্তর বৎসরের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের কবির স্বধর্ম-বর্ণনা : "এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহু বিচিত্র হন তখন তিনি নানাবর্ণের আলোক-রশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন। আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমি নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি, যে-আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের আনন্দে অধীর আমরা তাঁর দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এ-ই আমার কাজ।"

এ-ধরনের স্পন্দমান বাণীতে সাড়া না দেবে কোন্ অসাড় প্রাণ? কিম্বা যখন শেলি গান :

Life, like a dome of many-coloured glass,
Stains the white radiance of Eternity.

তখন কোন্ ভাবুক না বলবেন : "কী সুন্দর !"

কিন্তু সব মেনেও তবু বলতেই হবে যে, এ-জাতীয় কাব্যবাণী সেই অপরোক্ষানুভবস্পন্দিত মন্ত্রের সমগৌরবী নয় যার নির্ঘোষ শুনি উপনিষদে :

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥

জেনেছি আমি সে মহান্ পুরুষে—তমসাপারে
আসীন যিনি সুচির-আদিত্যদীপ্তি।
মহামৃত্যুরে পারায় সে-ই—যে জেনেছে তাঁরে,
আর কোনো পথে নাই তো অমৃতসিদ্ধি।

কিম্বা

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

সূর্য তারকা চন্দ্র ভায় না কেহ সেথায়,
বিদ্যুতো নহে, অগ্নি ভাতিবে সেথা কেমনে?
তাঁহারি আলোর অনুসরণে এ-বিশ্ব ভায়,
যাহা কিছু আছে চিরচিন্ময় তাঁরি দীপনে।

আমাকে ভুল বুঝবেন না : আমি এমন কথা যদি বলি যে কাব শিল্পী বিজ্ঞানী কর্মীরা ভাগবত উপলব্ধির কোনো খবরই রাখেন না তাহ'লে সেটা হবে "সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" এই আর্ষবাণীর মূঢ় প্রতিবাদ। যা কিছু আছে তিনি ধারণ ক'রে আছেন ব'লেই আছে, নৈলে এ-জগতের সৃষ্টিই হ'ত না—এক বহু হ'তে চেয়েছিলেন ব'লেই এ-বহুবিচিত্র রূপরসবর্ণময়ী প্রাণলীলা তাঁকে জানান দিয়ে এসেছে আবহমানকাল। কবিশিল্পীরা যে যোগী ঋষির অনুভবের সরিক একথা শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন। কিন্তু এসব মেনে নেওয়ার পরেও সত্যের খাতিরে বলতেই হবে যে কবির অনুভূতি এক, যোগীর অনুভূতি আর, যেহেতু একজনের অনুভব পরোক্ষ, অপরের—অপরোক্ষ। একজন কল্পনার পাখায় চিদানন্দের নাগাল পেতে চান, অন্যজন সেই চিদানন্দের মধ্যে

নিজের অহংকে বিলীন ক'রে গেয়ে ওঠেন : "আমি মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত ব্যোম ভূমি তেজ বায়ু এসব থেকে ভিন্ন : আমি স্বরূপে শুধু চিদানন্দরূপ শিব—শিবোঽহম্ !"

সুদূর শৈশবে এ-সব নিয়ে মাথা বকানো অবশ্যই আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। বস্তুত, নির্মলদার অভ্যুদয়ের আগে আমি কবি শিল্পী বুদ্ধিবাদীদেরই চরম দিশারি ব'লে মনে ছ'কে নিয়েছিলাম। নৈলে আমাকে হয়ত একথা বিশ্বাস করতে এতটা বেগ পেতে হ'ত না যে, ভক্তির ব্যাকুল আবাহনে কি বাণীর তন্ময় ধ্যানে ভগবানের সঙ্গে ভক্ত বা ধ্যানীর প্রত্যক্ষ মিলন হয়—যাকে গীতায় ঠাকুর বর্ণনা করেছেন এই ব'লে : "ভক্তি দিয়ে শুধু যে আমাকে দেখা ও জানা যায় তাই নয়—আমার মধ্যে তলিয়ে যাওয়া যায়।" শ্রীঅরবিন্দ এই পরম জ্ঞানের নাম দিয়েছেন—Knowledge by identity. আজ আমি জেনেছি, পরম নৈশ্চিত্যেরি ভূমিকায়, যে ভগবানকে দর্শন স্পর্শন করা যায় ও সে দর্শন স্পর্শনের ছিটেফোঁটা পেলেও যে-আনন্দ আমাদের অন্তর-লোককে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে তার সঙ্গে কবিশিল্পীর আনন্দের তুলনাই হয় না। অন্য ভাষায়, ভগবানের মিলনানন্দের পাশে কাব্যের কল্পনানন্দ তেম্‌নি নিষ্প্রভ যেমন সূর্যালোকের পাশে চন্দ্রালোক। কিন্তু প্রাক্-নির্মলদা-যুগে আমি চারদিক থেকেই শুনতাম কেবল এই রটনা যে, ভগবান যদি থাকেনও তবে তাঁকে বড় জোর ছোঁওয়া যেতে পারে, ধরা অসম্ভব। যৌবনেও আমার বুদ্ধিবাদী তরুণ সতীর্থ বা প্রবীণ উপদেষ্টাদের মধ্যে এক শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ছাড়া কাউকেই দেখি নি যিনি পরমহংসদেবের এ-কথায় কান দিতেন যে, ভগবানকে নিত্যসাথীরূপে পাওয়া যায়। মনে আছে রামপ্রসাদের বিখ্যাত "এবার কালী তোমায় খাব—তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পাতন দুটোর একটা ক'রে যাব" শুনে আমি কতবারই যে হাসাহাসি করেছি এর ওর তার সঙ্গে! একদিনের কথা মনে পড়ছে। বলি :

তখন নির্মলদা সবে এসেছেন। আমার নাস্তিকতায় সবে ভাঙন ধরেছে, কিন্তু আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি তাকে জীইয়ে রাখতে—খানিকটা নিজের মান বাঁচাতেই বলব।

সেদিন নির্মলদার সঙ্গে কথায় কথায় ফের তর্ক বেধে গেল মেসোমহাশয়কে নিয়ে—যেমন প্রায়ই বাধত আমাদের মধ্যে। আমি বললাম : "মেসোমহাশয় বলেন : সর্বশক্তিমান্, অনন্ত ঈশ্বর হয়ত থাকলেও থাকতে পারেন কিন্তু তিনি দেবদেবীর রূপ ধ'রে আসেন একথা চোখে দেখি নি তো—কাজেই বিশ্বাস করতে পারি না।"

নির্মলদা (সব্যঙ্গে হাততালি দিয়ে) : বা বা বা বা ! কী চমৎকার রায় ! তোর মেসো দেব-দেবীকে চোখে দেখেন নি অতএব তাঁদের এজাহার নামঞ্জুর— যাঁরা দেখেছেন। ওরে, তিনি বা তুই কী ক'রে দেখবি দেব-দেবীকে, শুনি ? যে-ইঁদুর-ছানার চোখ ফোটেনি সে বলছে আলো নেই, অতএব যে ইঁদুরের চোখ ফুটেছে—তার দেখা আলোর এজাহার বাতিল হ'য়ে গেল ! বলিহারি যুক্তি !

আমি (আতপ্ত) : গালাগালিও যুক্তি নয়, নির্মলদা।

নির্মলদা : আর হাসাহাসিই বুঝি যুক্তি ! উকিল বটে।

আমি (রেগে) : উকিল মানে ? যাঁরা বলেন তাঁরা দেখেছেন যে, ভগবান ভক্তবৎসল হ'তে চেয়ে চার হাত পা কি শুঁড় গজিয়ে ভক্তকে এসে যখন তখন ঢুঁ মারেন তাঁদের দিব্যচক্ষুকে নিয়ে হাসাহাসি করব না তো কী করব শুনি ? বাঃ !

নির্মলদা (ঠোঁট বেঁকিয়ে) : তুই হাসাহাসি করলেও কেউ কান্নাকাটি করবে না। যাঃ !

ফের কথা বন্ধ। ফের কয়েকদিন ঘরের দেওয়ালকে উদ্দেশ ক'রে নির্মলদাকে নিমন্ত্রণ পাঠানো : "যদি কেউ আমার সঙ্গে টেনিস খেলতে চায়—মাঠে আসুক।" নির্মলদা নীরবে হেসে বেরিয়ে আসতেন। অপরূপ ব্যবস্থা বটে : টেনিস খেলা আছে, আকাশকে সম্বোধন করে—fifteen love, thirty-all, deuce…ব'লে চেঁচানো আছে, কেবল কথাবলাটুকুই রদ ! পিতৃদেব বারান্দায় ব'সে কবিতা বা নাটক লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখতেন আমাদের অদ্ভুত আড়ির কাণ্ড আর হাসতেন মুখ টিপে।

টেনিস খেলা শেষ হ'তে তাঁর কাছে ছুটে যেতেই তিনি আমাকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন হেসে : "ফের কথা বন্ধ ?"

আমি (রুষ্ট মুখে) : কী করি বলুন ? নির্মলদা আমাকে ইঁদুরছানা বললেন যে।

পিতৃদেব (তড়িৎ-স্পৃষ্টবৎ) : ইঁদুরছানা ? তোকে ? বলিস কি ? তাহ'লে আমার কী সর্বনেশে অবস্থা হ'ল বল্ দেখি ?

আমি (রাগ ক'রে তাঁর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে) : যান্ !

পিতৃদেব (হেসে) : যাব আর কোন্ চুলোয় বল্ ? তবে এক সান্ত্বনা : তুই যদি ইঁদুরছানা হোস তবে আমি যা দাঁড়ালাম নির্মলও তাই দাঁড়িয়ে গেল।

আমি (সবিস্ময়ে) : মানে !

পিতৃদেব : মানে শাস্ত্রে বলে : নরানাং মাতুলক্রমঃ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

ব'লেই নির্মলদাকে তলব। নির্মলদা কুণ্ঠায় তো এতটুকু, বললেন : "আমি ওকে ইঁদুরছানা বলি নি ছোট মামা, বলেছিলাম বাচ্চা ইঁদুর।"

পিতৃদেব (হেসে) : আর তুই ধাড়ি! ওঃ—হোঃ হোঃ হোঃ।

তাঁর হাসি ছিল বিষম সংক্রামক—আমরাও হেসে ফেললাম—সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি। এ রকম সে কতই না মজার রেষারেষি হ'ত আমাদের মধ্যে। দু'জনেই সমান রোখালো, অভিমানী—হবে না? কিন্তু ফের গম্ভীর হই।

নির্মলদা আমাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে চেষ্টাও করতেন আমাকে তর্কে হারাতে। সব সময়ে পারতেন না—আর যখনি তর্কে হারতেন ধরতেন ফের শ্লেষের সুর। তর্কে আমি তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠলেও ব্যঙ্গের আখড়ায় কোনোদিনই জিৎতে পারতাম না, কারণ বলেছি নির্মলদা ছিলেন শুধু রসিক নয়—মারাত্মক বিদ্রূপী। তাই তো তিনি পরে হাসির পার্ট অভিনয়ে অত নাম করেছিলেন।

ঘড়ি ঘড়ি তীরন্দাজি করতেন তিনি অবশ্য রেগে গিয়েই, কিন্তু তবু বাণ তাঁর ছিল মর্মভেদী। ফলে ক্রমাগত আহত হ'তে হ'তে আমার আত্মাভিমান হ'য়ে উঠল শতচ্ছিদ্র, দুর্বল। এই সময়েই তিনি শান্তিপুরে ফিরে গিয়ে গোঁফ কামিয়ে এসে বলেন তাঁর রাঙাকাকার দর্শনের কাহিনী—যে-কথা ইতিপূর্বে বলেছি। এবার সেখান থেকেই ফের খেই ধরি।

নির্মলদার মুখে তাঁর রাঙাকাকার দর্শনের কথা শুনে আমি প্রথম দিকে থ হ'যে গেলেও—একটু প্রকৃতিস্থ হ'তে না হ'তে হঠাৎ কেমন খুশি হ'য়ে উঠলাম : যাহোক্ নিষ্পত্তি হ'য়ে গেল তো অবশেষে যে, পরমহংসদেবের মতন মহাপুরুষ না হ'য়েও ভগবানকে চাক্ষুষ করা যায়। বাঁচা গেল!

আশ্বস্ত হওয়ার প্রধান হেতু এই যে পরমহংসদেবের এজাহার শোনার পরেও আমি চাইতাম এমন কোনো সমসাময়িক সাক্ষীর এজাহার যিনি মাথায় আমাদেরই সমান—অর্থাৎ অসামান্য বিভূতি কি অবতারকল্প মহাপুরুষ নয়। কিন্তু চাইলে হবে কি, আমার পরিচিত পরিধির মধ্যে এযাবৎ এধরনের একজন সাক্ষীও মেলে নি। তাই নির্মলদার মতন প্রেমাস্পদের মুখে এ-অপরূপ দিব্যদর্শনের কাহিনীটি শোনা আমার জীবনে একটি অঘটনই বলব। কেন না কে ভেবেছিল শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়ে আমাদের সগোত্র হ'য়েও নির্মলদা এ-ধরনের চমকপ্রদ তথ্য নিয়ে এসে আমার বাল্যজীবনে হানা দিবেন আমার বুদ্ধিদৃপ্ত সংশয়কে ভেঙেচুরে আমার মনে সরল অন্ধ

বিশ্বাস জাগিয়ে দিতে? ভাবুন: আমার প্রতিভাধর পিতৃদেব, পূজনীয় মেসোমহাশয় তথা তাঁদের সমধর্মী গুণী শিল্পী পণ্ডিত সবাই আমাকে যে-সংশয়ের দীক্ষা দিয়ে এসেছিলেন তার বিপক্ষে একলা দাঁড়ালেন কিনি? —না, এক সদ্যোভিন্নগুম্ফ নাবালক—নির্মলদা! আর শুধু দাঁড়ানো নয়—কয়েকমাসের মধ্যেই আমাকে ছিনিয়ে নিলেন আমার নাবালক নাস্তিক্যের অজ্ঞান তিমির থেকে সরল বিশ্বাসের উদ্ভাসিত আলোক-শিখরে উত্তীর্ণ করতে! তবু বলব না একে অঘটন—তত্ত্বজিজ্ঞাসার তীর্থযাত্রায় আমার জীবনের প্রথম লোভনীয় পান্থশালা?

কিন্তু তবু সংশয় হ'ল মরিযা না মরে রাম এ কেমন বৈরী: একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। এর একটা কারণ নিশ্চয়ই যুগধর্ম। কারণ এ দেখেছি যে আমাদের ঠিক আগের যুগে সরল বিশ্বাস এত বিরল ছিল না। মনে আছে, পিতৃদেব যখন দৃপ্ত ভঙ্গিমায় হেসে বলতেন তিনি নাস্তিক তখন তাঁর প্রবীণ বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করতেন, শুধু তাঁর তরুণ ভক্তরাই উঠতেন উজিয়ে। এ-বৈষম্য অবশ্য সে-সময়ে আমার চোখে পড়েনি—পড়েছিল স্মৃতির চোখে অনেক পরে—১৯৩০-এর কোঠায়—যখন আমি শ্রীঅরবিন্দের চরণচ্ছায়ায় ব'সে সাগ্রহে অনুধাবন করছি তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মহিমময় বাণী, বিশ্বাসের স্বপক্ষে তাঁর অপরাজেয় ওকালতি। একথা বলব না যে তিনি তাঁর স্বোপলব্ধ সত্য ব'লে যেসব বাণীকে আমার জ্ঞানবুভুক্ষু মনের কাছে পেশ করেছিলেন যেসব অশ্রুতপূর্ব। (মনে পড়ত পরমহংসদেবের বিবেকানন্দকে সস্মিত মৃদুভর্ৎসনা যে, অন্ধ বিশ্বাসকে অন্ধ ব'লে তিরস্কার করাই অন্ধতা, কেননা বিশ্বাস স্বভাবেই অন্ধ—কি না যুক্তিনিরপেক্ষ।) কিন্তু একথা সকৃতজ্ঞেই স্বীকার করব যে শ্রীঅরবিন্দই প্রথম আমার "অজ্ঞানতিমিরান্ধ" নয়নকে তাঁর "জ্ঞানাঞ্জনশলাকায়" ফুটিয়ে দিয়ে দেখতে শেখান কেন বিশ্বাসকে বলা যায় স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠ, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর প্রথম সহায় ও অন্তরাত্মার প্রধান উপজীব্য। তাই তখনই আমি প্রথম বুঝতে শিখি কেন যুক্তি দিয়েই যুক্তির সীমানা নির্দেশ করা দরকার—পরমহংসদেবের ভাষায়—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

উনিশ

উপনিষদে বলেছে :

ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ?
ক্ষীয়ন্তে সর্বকর্মানি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

অর্থাৎ কিনা, সেই মুক্তিনাথকে দেখলে তবেই "হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন ও সর্বসংশয় ছিন্ন" হয়। কিন্তু তাঁর দর্শনের আগেও আর একটি উপলব্ধি হ'তে পারে—যে এগিয়ে দেয় এই পরম প্রাপ্তির দিকে—সেটি হচ্ছে দীনতা। শুধু তারই আলোয় মানুষ দেখতে পায় বুদ্ধির দৌড় কত দূর। যাঁরাই পরাৎপরের দর্শন লাভ করেছেন তাঁরাই বলেছেন—আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রীর একটি মস্ত পাথেয় হ'ল এই পরম জ্ঞান যে, আমরা আসলে কিছুই জানি না, জানতে পারি না—ভগবৎকৃপা বিনা। বহুবৎসর পরে পণ্ডিচেরি আশ্রমে একদিন ধ্যানে যখন এই উপলব্ধির আলো আমার অন্তরলোককে উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছিল তখন শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন (৩১-৫-১৯৩৬) : "All true understanding could come only when one realised that one was completely impotent." অর্থাৎ সত্য জ্ঞানের সুরু হয় যখন অভিমান মাথা নিচু ক'রে চোখের জলে বলে : "হার মেনেছি।"

কিন্তু গোল বাধে ঐ স্বভাব নিয়ে। এ-যুগ হ'ল প্রধানতঃ বুদ্ধির যুগ, বিজ্ঞানের যুগ, ঐহিকতার জয়-জয়কারের যুগ। এ-যুগের সন্তানের বুদ্ধিদৃপ্ত স্বভাবের ধনুর্ভঙ্গ পণ—"আগে জানব তবে মানব।" আধ্যাত্মিক দীক্ষার আদি পাঠ ঠিক উল্টো—"আগে মানো তবে জানবে।" মানব কাকে ? না, গুরুবাক্যকে—শাস্ত্রবিধিকে। আমাদের আগের যুগের মানুষ একথায় নারাজ হ'তেন না কেন-না সে-যুগের ধর্মই ছিল খানিকটা এই দীক্ষাদাতার কাছে মাথা নিচু ক'রে বলা "আমি জানি না গুরু! তুমি বলো কোন সাধনায় জানতে পারব পরম তত্ত্ব।" আমাদের মন একথায় শিরপা তোলে, যেহেতু এ-যুগের ধর্ম হ'ল তর্ক বিচার বিশ্লেষণ গবেষণা—যে চোখ রাঙিয়ে বলে : খবর্দার! কানপাতলা হয়েছ কি ডুবেছ। কোনো কিছুকেই মেনে নিও না ভারিক্কি এজাহার বিনা।" উগ্র বুদ্ধিবাদের এ-অতৃপ্তিকর পথ ছেড়ে যে বিনতির, দীনতার পথ ধরেছে সে-ও এ-ধমককে পুরোপুরি পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। তাই তো বিশ্বাসকেও সে চায় খানিকটা বুদ্ধির, যুক্তির জারকে জারিয়ে নিতে—নৈলে পাছে অগ্নিমান্দ্য হয়! কিন্তু আমাদের পূর্বসূরীরা বিশ্বাসের বটিকা গলাধঃকরণ ক'রে পরিপাক করতেন

সহজেই কেননা সে-যুগের মানুষের প্রকৃতি ছিল এ-যুগের মানুষের প্রকৃতির চেয়ে অনেক বেশি সরল—unsophisticated ; এ-হেন প্রকৃতি ঐতিহ্যকে সহজেই মেনে নিতে পারে। দেখেশুনে বুদ্ধিবাদী য়ুরোপীয়রাও স্বীকার করবার কিনারায় এসেছেন যে Zeitgeist—যুগধর্ম—ঠাকুরটি বড় সোজা পাত্র নন—আকাশে-বাতাসে গা-ঢাকা হ'য়ে আমাদের চালাচ্ছেন যেমন "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে" প্রচ্ছন্ন থেকে সর্বভূতকে পুতুলনাচ নাচাচ্ছেন। সংক্ষেপে, শ্রীঅরবিন্দের প্রদীপ্ত জ্ঞানের অকাট্য ব্যাখ্যার প্রসাদেই আমি প্রথম দেখতে পাই যে, মানুষ যেখানে ভাবে সে সবচেয়ে স্বাধীন—কিনা সংকল্প বা ইচ্ছার ক্ষেত্রে—সেখানেও অলক্ষ্য লোকমত বা যুগধর্মই তাকে চালায় যদিও সে ভাবে—সে চলছে নিজের নিরঙ্কুশ ইচ্ছারই তাগিদে। এই ভ্রান্তিবিলাস যিনি ঘটান তাঁরি নাম মায়া—যাকে পেরুতে পারেন কেবল তিনি যাঁর মায়েশের সঙ্গে হয়েছে শুভদৃষ্টি—মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। সুতরাং এ-বুদ্ধিপন্থী সংশয়ী যুগে যদি বেচারি দিলীপকুমারের নাবালক মনে রোখালো সংশয়-ঠাকুর কুকুরের লেজের রোমের মতন বার বার সোজা ক'রে দেওয়ার পরেও ফের বেঁকে ব'সে থাকেন তবে তার অসহায় বালবুদ্ধিকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় কি?

কিন্তু দোষ দেওয়া না গেলেও সংশয়ের কুটিল কালো অভিজ্ঞতা যাঁরই হয়েছে তিনিই জানেন তার দুরন্ত দুঃখ—বিশেষ ক'রে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার তীর্থপথে। "বিশেষ ক'রে" বলছি এই জন্যে যে, এ-পথের পথিকের সবচেয়ে বড় পাথেয় সরল বিশ্বাসই বটে, যেমন সবচেয়ে বড় বিত্তাপহারক—সংশয়-দৈত্য। গীতার ঠাকুর এমন ধমকও দিয়েছেন যে "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"—সংশয়কে প্রশ্রয় দিয়েছ কি মরেছ! তাই ভগবান্ ডাকলে সাড়া দেন, দেখা দেন—একথা গ্রহণ করার পরেই ফিরে ফিরে সংশয়মেঘ হৃদয়াকাশে হানা দিয়ে ফেলত আমাকে অনৈশ্চিত্যের অন্ধকারে। মনে হ'ত—এ-ও কি সম্ভব? কৈশোরে ও যৌবনে আমি পিতৃদেবের "সীতা" নাটকে বাল্মীকির একটি অপূর্ব ভাষণ পড়তে পড়তে মুখস্থ ক'রে ফেলেছিলাম শুধু এই জনশ্রুত বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরতে যে, ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান হ'ল প্রেম। ব্যাপারটি একটু খুলেই বলি, কেননা এ-আলোচনাটি আমার মনের বিকাশের ইতিহাসে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

রাম সীতাকে বর্জন করেছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ সুরু হ'ল বশিষ্ঠের আদেশে। অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে হ'লে রাজার পাশে রাণী থাকা চাই। শাস্ত্রীয় এ-বিধানে বাল্মীকি সায় দিয়ে রামকে বললেন: সীতাকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে সিংহাসনে বসাতে। কিন্তু রামের গুরু বশিষ্ঠ বাদ সাধলেন—জেরা ক'রে: "প্রেম বড় না কর্তব্য বড়?"

উত্তরে বাল্মীকি প্রেমের মহিমা সম্বন্ধে যা বললেন পিতৃদেব প্রায়ই গাঢ় কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন আর আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন ক'রে উঠত! প্রেমের এমন অপরূপ স্তব বিশ্বসাহিত্যেও খুব কম কবির কাব্যেই পাওয়া যায়। এ-অংশটুকু পরে আমি যে-ইংরেজি অনুবাদ করেছিলাম সেটি ১৯৫৩ সালের আমার ও ইন্দিরার বিশ্বভ্রমণে নানা সভায় যখনই আবৃত্তি করেছি, তখনই শ্রোতারা উচ্ছ্বাসে বলেছেন একবাক্যে: "প্রেমের সম্বন্ধে অপূর্ব ভাষণ বটে!" বাল্মীকির ভাষণটি এই:—

করিয়াছ প্রশ্ন তুমি ঋষি—কর্তব্য কি প্রেম বড়?
আমি মূর্খ আমি বুঝি—প্রেম উচ্চ, প্রেম শ্রেষ্ঠতর।
প্রেম পথ দেখায়, কর্তব্য চলে সেই পথ বাহি'।
প্রেম দেয় বিধি, নিত্য কর্তব্য পালন করে তাহে।
প্রেম নহে ভ্রম, মহাভাগ:—বাতুলের স্বপ্ন নহে।
প্রেম সত্য, প্রেম, পুণ্য, প্রেম কভু মিথ্যা নাহি কহে।
যেথা ধর্ম সেথা প্রেম: যেথা পাপ—প্রেম নাহি রহে।
প্রেম প্রভু, কর্তব্য তাহার ভৃত্য বিশ্বচরাচর
প্রেমের রাজত্ব নহে? বিশ্বস্রষ্টা নিয়ন্তা ঈশ্বর
নহে প্রেমময়? প্রেমে সুগঠিত বিধি ও সমাজ।
প্রেমবদ্ধ পরিণয়ে নিত্য নব সৃষ্টি, মহারাজ!
কর্তব্য—নির্জীব, মূক, হিম, অবসন্ন, নিরাকার
কঠিন পাষাণস্তূপ। তাহে শিল্পী ভাস্করের ম'ত
প্রেম দেয় মূর্তি। শুষ্ক কর্তব্যকংকালখানি ঘিরে
প্রেম দেয় মাংস পরিচ্ছদ। রিক্ত তরুবরশিরে
প্রেম দেয় কুসুম পল্লব। রৌদ্রতপ্ত ধরাতলে
প্রেম আসে রাত্রিসম—পবিত্র শিশিরস্নিগ্ধ জলে,
সুমন্দ পবনে। ধীরে, চিন্তায় ললাটখানি ছেয়ে
প্রেম আসে সুপ্তিসম, কর্তব্য কি উচ্চ প্রেম চেয়ে?
—চেয়ে দেখ মহারাজ, চেয়ে দেখ ঋষি, এ-সুন্দর
বিশ্ব মুঞ্জরিত প্রেমে। দিগন্তবিতত নীলাম্বর
প্রেমে উদ্ভাসিত। প্রেমে সূর্য ওঠে! প্রেমে নীলাকাশে
পুঞ্জে পুঞ্জে জাগে লক্ষ নক্ষত্র। চন্দ্রমা প্রেমে হাসে।

প্রেমে বহে বারিধারা। প্রেমে বিশ্বে নির্ঝরিণী ছোটে।
প্রেমে বিকশিত কুঞ্জে প্রেমে রাশি রাশি পুষ্প ফোটে।
অন্ধকারে প্রেম দেয় আলো। বিশ্বহাহাকার মাঝে
স্বর্গীয় সঙ্গীতে নিত্য নিয়ত প্রেমের বীণা বাজে।

অনেক কবিতা থাকে যা ছেলেবেলায় ভালো লাগে, কিন্তু বয়স যতই বাড়তে থাকে ততই আসে কেমন যেন নীরস হ'য়ে! মনে হয়—নাঃ, এ উচ্ছ্বাসী কবিতা মাত্র, ধোপে টেকে না। কিন্তু আর এক শ্রেণীর কবিতা আছে যার মধ্যে বয়সের সঙ্গে নতুন সৌন্দর্য, ভাব ও তাৎপর্য চোখে পড়ে। পিতৃদেবের এ প্রেমোচ্ছ্বাসটি এই জাতীয়। তাই আবার উত্তর জীবনে এর মধ্যে ক্রমশ যেন আরো গভীর রস পেয়েছি—দিনে দিনে মন যেন আরো সায় দিয়েছে, বলেছে: এইই তো আমার ভগবান্—যিনি প্রেমে-গড়া তনু, প্রেমঘন সত্তা, সুতরাং আনন্দময়, কেননা আনন্দের নির্যাস নিহিত যে প্রেমে।" বহুবৎসর পরে ইন্দিরা তার সমাধিতে একটি মীরা ভজন শোনে—জন্মাষ্টমীর আগের দিনে। সে গানটির বাণীও এই যে বিশ্বজগৎ আব্রহ্মস্তম্ব প্রেমে বিবৃত। তাই মীরা গাইলেন, ইন্দিরা শুনল—পরে আমি সে-গানটি জন্মাষ্টমীর দিন গেয়েছিলাম (৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮):

য়ে সব প্রেমকা খেল হয় প্রাণী! খেল রহা হৈ খিলারী:
প্রেমকি ডোরসে বাঁধকে খেলে, নাচে সৃষ্টী সারী।

এর অনুবাদ আমি করেছিলাম ঐ একই সুরে ছন্দে:

সকলি প্রেমের খেলা মন, প্রেমে করে লীলা লীলাময়,
প্রেমডোরে বেঁধে খেলায় নিখিল, নাচে সবে জয় জয়!
প্রেমে দোলে নভে গ্রহ তারা শশী,
প্রেমে ওঠে রবি কিরণে বিকশি',
প্রেমে ব'য়ে চলে সিন্ধু উছসি', প্রেমে হরি বরাভয়।
প্রেমে জলধর জল হ'য়ে ঝরে,
প্রেমে বনে বনে কোকিল কুহরে,
প্রেমে রাঙে হাসি কলির অধরে, প্রেমে শ্যাম চিন্ময়।

প্রেমেই ভক্ত ডাকে : "কোথা হরি !"
প্রেমে ধ্যানী ধ্যানে লয় তাঁরে বরি',
প্রেমে ধায় ত্যাগী সব পরিহরি'—বঁধুর সাথে প্রণয়।
হরির প্রেমের লীলা কে বা জানে ?
রাণী ভিখারিণী হয় তার টানে।
প্রেমের পাগল হ'য়ে কলতানে গায় মীরা : "জয় জয়" !

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনদর্শনে নানাসুরেই বলেছেন যে, সৃষ্টিতে রুদ্র আছেন ব'লেই সিদ্ধান্ত হয় না যে শিব নেই। তাঁর নানা কবিতায় নানা ভাষণেই তিনি বলেছেন : দুঃখ পাপ আঁধার সংশয় এরা হ'ল না-র দিক—"নঙর্থক" আনন্দ পুণ্য বিশ্বাস আলো এরা—হাঁ-র দিক—"সদর্থক"।

বাল্যকালে এত তলিয়ে ভাববার ক্ষমতা আমার নিশ্চয়ই ছিল না। কিন্তু তবু একথা বাড়িয়ে বলা নয় যে, বাল্মীকির এই কাব্যোচ্ছ্বাসটি পড়তে না পড়তে তখনকার মতন আমার হৃদয়ে জেগে উঠত ঐ সদর্থক উৎসাহের জোয়ার, বিশ্বাসের আলো—বিশেষ ক'রে বাল্মীকির প্রশ্নে : "বিশ্বস্রষ্টা নিয়ন্তা ঈশ্বর নহে প্রেমময় ?" অর্থাৎ আছে এই কথাই সবচেয়ে বড় সত্য।

কিন্তু ঐ "তখনকার মতন।" কারণ এ-বিশ্বাসের রঙিন উৎসাহ ধোপে টিকত না : নঙর্থক সংশয়ের ছায়া এসে সদর্থক শ্রদ্ধার আলো-কে ঢেকে ফেলত। অমনি মনে প্রশ্ন উঠত : 'কিন্তু বাল্মীকি যে-প্রেমের কথা বলেছেন সে-প্রেম আকাশপারের ভগবানের অদৃশ্য অন্তর আলো ক'রে থাকলে আমাদের কী এল গেল ? এ-প্রেমের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'লে তবে না ! যে-প্রেমকে আমরা জানি, যে-স্নেহের আমরা খবর রাখি, কাছে আসতেই যার শিহরণ, উজাড় ক'রে দিয়েই যার আনন্দ সেবায় যার তৃপ্তি, ত্যাগেই যার সুখ, যে "মিলনে নিখিলহারা, বিরহে নিখিলময়"—এমন কি স্বপ্নেও যার উচ্ছ্বাস-কল্লোলের বিরাম নেই—এহেন প্রেমকে কি ভগবানে ন্যস্ত করা সম্ভব ?—যিনি মহতো মহীয়ান্, ত্রিভুবনেশ্বর, সর্বশক্তি, সর্বগ, সর্বজ্ঞ—যাঁর প্রতিমা হ'ল "শশী তারা রবি সাগর নির্ঝর ভূধর অটবি, নিকুঞ্জ ভবন বসন্ত পবন তরু লতা ফল ফুল মধুরিমা"—তিনি কীটস্য কীট, লক্ষ শোক-তাপ-জরা-দৈন্য-লজ্জা-মলিন মানুষকে ভালোবেসে তার "দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে" স্নেহোচ্ছলা জননীর মত আয় আয় ব'লে ডাকতে

পারেন কখনো? দূর! ও-সব কবিকল্পনা, আকাশকুসুম! ভাবতাম—(বালবুদ্ধি তো—সব-তাতেই নজির চায়)—ঐ দেখ না কেন, আমার যে-পিতৃদেব তাঁর এক ভাবের মুহূর্তে প্রেমের মহিমা সম্বন্ধে এত উচ্ছ্বাস ক'রে গেয়েছেন :

যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি,
শত রূপে মাগো বিরাজিত তুমি,
বসন্তে কি শীতে, দিবসে নিশীথে বিকশিত তব বিভবগরিমা।
খুঁজিয়া বেড়াই অবোধ আমরা,
দেখি না—আপনি দিয়েছ মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা!

তিনিই আবার আর এক মেজাজে হা-হুতাশ করেননি কি :

"কেন খুঁজতে যাসরে বিমল প্রেমে এ-জগতে ভাই?
কেন মিছে খোঁজা পাবি না যা—নাই হেথা যা নাই?"

এ-ধরনের হা-হুতুশে ভাব আমার আসত—যখনই নির্মলদার কাছে ঘা খেতাম। অভিমান উঠত ফুলে—যাকে এত ভালোবাসি সে এমন কঠিন হ'তে পারে? সে-সময়ে ভুলে যেতাম যে শুধু তিনিই যে আমাকে আঘাত দেন তা নয়, আমি নিজেও কম শয়তান নই। কিন্তু বাল্যকালে মানুষ আর যাই পারুক না কেন অপরের দিকটা—point of view—কখনই বুঝতে পারে না—তার নিজের সুখ দুঃখ নিয়েই তার যত মাথাব্যথা—ভাবটা : যেন বিশ্বলীলা তাকে কেন্দ্র ক'রেই প্রদক্ষিণ করছে।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড়ার পর থেকে আমার মধ্যে কি জানি কি এক অদ্ভুত ওলট পালট হ'য়ে গেল—নানান বদ্ধমূল ধারণা উবে না যাক্, শিথিল হ'য়ে এল। পিঠ-পিঠ নির্মলদার রাঙাকাকার কাহিনী দিল হানা। সর্বোপরি, পিসেমহাশয়ের সমাধি দেখে আরো যেন অথই জলে পড়ে গেলাম। বালকের মন বেশি গ্রহিষ্ণু বটে, কিন্তু সে নানা স্ববিরোধী ইঙ্গিতই সমান আগ্রহে গ্রহণ করে। তাই পিতৃদেবের আসরে কি মেসোমহাশয়ের দৃঢ় নাস্তিবাদে বিশ্বাসে অবিশ্বাস এলেও ফের নির্মলদার ভক্তি-বিশ্বাসের ছোঁয়াচে মনে জেগে উঠত সরল স্বীকারের আবেগ, ঠাকুরকে ডা৲.. চোখে জল ভরে আসত, বুকের মধ্যে কেমন করত—তার পরে আবার তর্কাতর্কির আবহাওয়ায় ফের অবিশ্বাস উঠত মাথা চাড়া দিয়ে। ইংরাজিতে যাকে বলে see-saw।

এই সময়ে পিতৃদেব কয়েকটি গান বাঁধেন যার মধ্যে হঠাৎ একটা নতুন সুর উঠল বেজে। এর আগেও তিনি ভগবানের মহিমা বর্ণনা ক'রে গান বেঁধেছেন, কিন্তু এ-গানটিতে ভক্তির পাশাপাশি ফুটে উঠল শরণাগতির ডাক, জগজ্জননীকে আপন ক'রে নেওয়ার সুর। তাই যখন তিনি গাইতেন—আর গাইতে গাইতে তাঁর মুখ আবেগে লাল হ'য়ে উঠত—তখন এক অনামা আবেগে আমি তাঁর সঙ্গে গাইতাম :

এবার তোরে চিনেছি মা, আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি ?
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা পাঠিয়ে দিছি যমের বাড়ি।

কিম্বা

চরণ ধরে আছি প'ড়ে, একবার চেয়ে দেখিস না মা !
মত্ত আছিস আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা !

নির্মলদা আমার মুখে এই গানগুলি শুনে শুধু যে উজিয়ে উঠতেন তাই নয়—আমার সঙ্গে সঙ্গে দোয়ার দিতেন। কিন্তু আমার মতন তান দিতে পারতেন না ব'লে আমাকে একটু সহজ ক'রে গাইতে হ'ত। এজন্যেও আমার আত্মপ্রসাদের কমি ছিল না—চিরদিন যে-শিশু প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে তার মাথা গরম হবে না তো হবে কার ?

কিন্তু এ-গানগুলি নির্মলদাতে আমাতে গাইতে গাইতে আমাদের মধ্যে একটা নতুন ধরনের আলোচনার পত্তন হ'ল যেন : আমরা যেন গানের মধ্যে দিয়ে খানিকটা গীতিকারের মনের পরশ পেতে সুরু করলাম। মনে হ'ল—এ-হেন নরম দরদী শ্রদ্ধালু মানুষ নিজেকে নাস্তিক ব'লে পরিচয় দেন কী দুঃখে ? নির্মলদা স্বভাবতঃই এসব বিশ্লেষণে আমার চেয়ে নিপুণ ছিলেন—বছর তিনেক বয়সে বড় তো—বলতেন : "দূর্ গাধা ! তোর বুদ্ধি খেলে শুধু তর্কের দাপটে। এটুকুও কি তুই বুঝতে পারিস নে যে আমাদের মনের নানা মেজাজ—এক মেজাজে যা সত্য মনে হয়, তার উল্টো মেজাজে তাকে মিথ্যা মনে না হ'য়ে পারে ? তুইই তো গ্রামোফোন থেকে তুলেছিস রবীন্দ্রনাথের গান :

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না ?
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না !"

গানটি গ্রামোফোনে গেয়েছিলেন বিখ্যাতা মানদাসুন্দরী। তাঁর গলায় টপ্পার তান খুব খেলত। আমি ক'যে সেই সব তান লাগিয়ে যথাকালে শোম্-এ ফিরে এলে বলতাম হাঁঃ। পিতৃদেব হেসে বলতেন: "এ কী রে? ভক্তির গানে 'হাঁঃ'!"

"শোম্ যে বাবা!"

তিনি হেসেই অস্থির: "হ'লেই বা শোম্। হাঁঃ বলিস নে আর লালচাঁদ বড়ালের মতন। ও চলে হিন্দি গানে—যার কথার না আছে মাথা না মুণ্ডু।"

নির্মলদা ভারি খুশি: "কেমন? হয়েছে তো! ভারি অহঙ্কার ছুটো তান দিয়ে হিন্দি গান গাইতে পারিস ব'লে! এবার? পড়ল তো মুখে চুনকালি?"

আমি তো রেগে আগুন: "ঈ-শ। আপনি নিজে পারেন না তান দিতে—তাই হিংসে!"

এই ধরনের রেষারেষি চলত নির্মলদাতে আমাতে। কিন্তু এসব খুঁটিনাটির মূল্য আমার কাছে থাকলেও পাঠকরা হয়ত মুখভার করবেন—তাই ভালো কথা বলি ফের।

নির্মলদার সঙ্গে যতই হাসাহাসি করি না কেন, এটুকু আমি বুঝতাম—খানিকটা আবছাভাবেই বলব—যে তিনি অনেক কিছু আমার চেয়ে বেশি বোঝেন—বিশেষ ভগবানের সম্বন্ধে। তাছাড়া তখন আমার মন ভগবানের দিকে সবে ঝুঁকেছে বৈ তো নয়—মন প্রাণ কিছু ভক্তির রঙে রঙিয়ে ওঠেনি নির্মলদার মতন। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠতা মুখে স্বীকার না করলেও তাঁর শরণাপন্ন আমাকে হ'তেই হ'ত! একদিন জিজ্ঞাসা করলাম: "আচ্ছা নির্মলদা, রবীন্দ্রনাথ বলছেন তিনি মাঝে মাঝে ভগবানের দেখা পান। আপনি বলেন ভগবানের দেখা পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়—'শ্যামাধন কি সবাই পায়—অবোধ মন বোঝে না এ কি দায়!' তাহলে কি বলব রবীন্দ্রনাথ দেখা টেখা পান নি মোটেই?"

নির্মলদা কোণঠেসা হ'লেই ধমকানো সুরু করতেন, বললেন: "কে কী পেয়েছে না পেয়েছে সে-চিন্তা ছেড়ে তুই নিজের চরকায় তেল দিবি কবে রে গাধা? আর তোর উর্বর মস্তিষ্কে এত অগুন্তি প্রশ্ন গজায়—যে মনে পড়ে ব্যাঙের ছাতার কথা। তোর কাজ—সব আগে বিশ্বাস করা ঠাকুরের কথা যে, যেই তাঁকে সব ছেড়ে 'কেঁদে কেঁদে ডাকবে' সেই তাঁর দেখা পাবে।"

আমি (ধমক খেয়ে বিরস কণ্ঠে): আহা। যেন কাঁদব বললেই কান্না আসে। আপনি পারেন কাঁদতে—যে বলছেন?

নির্মলদা (নরম হ'য়ে): তা বটে। তবু গোঁ চাই—এটুকু তো মানবি? ঠাকুর বলতেন না সেই চাষার কথা—যে তার ক্ষেতে জল না আনা পর্যন্ত নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল? আমাদেরও হ'তে হবে তেম্‌নি একগুঁয়ে—যদি ঠাকুরের দেখা সত্যি চাই।

আমি (একটু উপশান্ত হ'য়ে): তা বটে...কিন্তু...আচ্ছা নির্মলদা, রোখ যে করব—রোখ যদি না আসে?

নির্মলদা: নাম কর না তুই প্রাণপণে। গীতা কী ছাই পড়লি, শুনি? ঠাকুর কি বলেন নি যে অভ্যাস আর বৈরাগ্য চাই সব আগে?

আমি (হেসে): আপনার কথা ঠিক যেন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ—খাওয়া সহজ বটে, কিন্তু রোগ সারে না। "নাম ক'রে যা প্রাণপণে, অভ্যাস বৈরাগ্য চাই"—সবই তো বুঝলাম। কিন্তু নাম করতে যে ভালোই লাগে না ছাই?

নির্মলদা: রাঙাকাকা বলেন নাম করতে প্রথম প্রথম তাঁরও ভালো লাগত না। লিখতে লিখতেই সরে রে। বাবার মুখেও শুনেছি যে নামকে আঁকড়ে ধরলে নামী দেখা দেনই দেন। তুই দেখলি তো তাঁর ভাবসমাধি সেদিন স্বচক্ষেই!

আমি (সাগ্রহে): ভাবসমাধি না হয় দেখলাম—কিন্তু ভাবসমাধিতে পিসে-মহাশয় যাঁকে দেখলেন তাঁকে তো আর দেখতে পেলাম না। তাই দেখলাম কী-ই বা—বলুন তো? একি খতিয়ে পরের মুখে ঝাল খাওয়াই দাঁড়াচ্ছে না?

নির্মলদা: তুই হেলে না ধ'রেই চাস কেউটে ধরতে—যাঃ! কত সাধনা করার পর বাবার ভাবসমাধি হয়েছে জানিস?

আমি (একটু চুপ ক'রে থেকে): আচ্ছা নির্মলদা, ভাবসমাধি মানেই কি ঠাকুরকে দেখা?

নির্মলদা (ত্যক্ত): জানি না—যাঃ!

আমি (নাছোড়বন্দ): যাব না মোটেই। আপনাকে বলতেই হবে।

নির্মলদা: বলতেই হবে? কী বলব শুনি! ভাবসমাধি কি আমার হয়েছে?

আমি (মাথা নেড়ে): না হোক্, তবু বলতেই হবে—বলুন যা জানেন। —আচ্ছা, যদি নিজে না জানেন, বলুন না পিসেমহাশয়ের কথা। তিনি কি

বলেন—ভাবসমাধিতেই ভগবানের দেখা পান?—আর এরই নাম কি ভগবানকে পাওয়া?

নির্মলদা (চিন্তিত মুখে) : বাবা তো কিছুই ভাঙেন না রে, জানব কী ক'রে বল্? তবে এইটুকু বলতে পারি যে, রাঙাকাকাকে বাবা কিছু কিছু বলেন তাঁর উপলব্ধির কথা, আর রাঙাকাকা প্রায়ই বলেন গদ্গদ স্বরে : "ওরে, আমার হয়েছে মাত্র এক আধটা দর্শন—কিন্তু দা দা—উঃ!—তাঁর মন হামেশা চিদাকাশে বিচরণ ক'রে বুঝলি ?"

বার বার বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ-কথোপথনের রিপোর্ট মোটেই মূলানুগ নয়—অনেকখানিই কল্পনার রঙ লেগেছে এতে। তবে এর মূল বিষয়বস্তুটি নির্জলা সত্য : মানে, নির্মলদার সঙ্গে আমার এই ধরনের তর্ক, বচসা, মনকষাকষি, ধমক, রুখে-ওঠা ও পরিশেষে পুনর্মিলন দিনের পর দিন জের টেনে চলত যেন এক অশেষ বৃত্তাকারে—যেমন দিনের পরে আসে রাত, রাতের পরে দিন।

আমি এ-সূত্রে দেখাতে চাচ্ছি একটি আশ্চর্য সত্য যে বারো তের বৎসরের গর্বী বালক দিলীপকুমার সত্যিই তার ষোলো সতের বৎসরের কিশোর নির্মলদাকে গুরুপদে না হোক আধ্যাত্মিক দিশারির পদেই বরণ করেছিল—এবং একজন যেমন অপরের কাছ থেকে চাইত ভগবৎদিশা তেমনি অপর জন তাকে গভীর স্নেহে কাছে টেনে সাধ্যমত চেষ্টা করত ভগবৎমুখী করতে—কখনো তর্ক ক'রে, কখনো ধম্‌কে, কখনো তুতিয়ে পাতিয়ে।

কুড়ি

নির্মলদার উদ্ধৃত "চিদাকাশ" কথাটি আমার মনে গেঁথে আছে কারণ কারুর অন্তরাত্মা কোনো নাম-না-জানা আকাশে সঞ্চরণ করতে পারে একথা কোনোদিন আমি কল্পনাও করিনি—নির্মলদার কাছে এ-খবর পাওয়ার আগে। বালক মন তো, তার উপর তার মহাসাধক পিসেমশায়ের মনের এ-অবস্থা! উজিয়ে উঠবে না?

তখন মনের আমার মোড় ফিরেছে, কাজেই নির্মলদা আমাকে পেয়ে বসলেন। এই-ই তো তিনি চাইছিলেন "to convert the blind"—বলতেন তিনি প্রায়ই উন্নাসিক হাসি হেসে। কাজেই এর পরে তিনি আমার অসহায় "চিদাকাশে" রকমারি বুকনির ঝাণ্ডা ওড়াতে সুরু করলেন আর এই সব "সৎকথা" নিরন্তর শুনতে

শুনতে আমার নাস্তিক বোলচাল ক্ষীণায়মান হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবর্দ্ধমান হ'য়ে উঠল প্রথমে শ্রদ্ধা—পরে একটু একটু ক'রে বিশ্বাস ও ভক্তি।

এর পরে দুটি বই হ'য়ে উঠল আমার নিত্যসাথী বললেই হয়: শ্রীম-প্রণীত "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" ও স্বামী সারদানন্দ প্রণীত "শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ।" বিশেষ করে "কথামৃত" বার বার পড়েও যেন আশ মিটত না—পড়তে পড়তে সময়ে সময়ে চোখের জলে বইয়ের পাতা সত্যি সত্যিই ঝাপসা হ'যে আসত। সবচেয়ে বেশি মন কেমন করত যখন পড়তাম সেই ভাগ্যবান্ শিশুর কাহিনী যার কথা পরমহংসদেব বলতে এত ভালবাসতেন—যাকে তার "দাদা মধুসূদন" হাত ধ'রে মাঠ পার ক'রে দিয়েছিলেন। এ-কাহিনীটি পড়বার সময়ে—বিশ্বাসের সুলগ্নে—একটি বারও আমার মনে আর প্রশ্ন কি সংশয় উঁকি মারত না: শিশু শুনেছিল তার পিতার মুখে যে মধুসূদন তার দাদা হয—ডাকলেই দেখা দেবে। মাঠের মাঝে একলা ভয় পেয়ে সরল বিশ্বাসে কেঁদে ডাকল: "কই দাদা মধুসূদন, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি—ভয় করছে।" অমনি নারায়ণ দাদা মধুসূদন হ'যে তাকে মাঠ পার ক'রে বাড়ি পৌঁছে দেন। বুকের মধ্যে আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠত সত্যিই: পরমহংস-দেব কী অমৃতময় বাণীই না শোনালেন: দাদা মধুসূদন যে আমাদের আপন জন, তিনি পার না করলে করবে কে? শুধু চাই ঐ শিশুর সরল বিশ্বাসে তাঁকে আপন দাদা ব'লে চেনা—আকুল হয়ে ডাকা—সব ছেড়ে চাওয়া। "সরল হ'লে আন্তরিক হ'লে ভগবান্ দেখা দেবেনই দেবেন—একশোবার!" বলতেন ঠাকুর বড় গলা ক'রে। ভাবতেও মনের মধ্যে সে কী ভরসার আনন্দ যে উঠত জেগে! ধ'রে রাখতে পারতাম না যেন!

কিন্তু হায়রে দোটানার দুরবস্থা!—এ-আনন্দ নিয়ে যেই মেসোমশায়ের কাছে ধর্না দেওয়া—যেই গল্ গল্ ক'রে বলা ঠাকুরের কথা, মধুসূদন দাদার কথা—আরও কত কী—অমনি মেসোমশায়ের সন্দিগ্ধ হাসিতে দেখতে না দেখতে দ'মে যাওয়া—ফের সংশয়মেঘ উঠে সরল বিশ্বাসকে ঢেকে ফেলা। তার উপর, দুঃখ একা আসে না—মনোদুঃখে নির্মলদার কাছে ফিরে গিয়ে যেই বলি: "মেসোমশায় বললেন বিশ্বাস হয় না"—অম্‌নি তিনি অগ্নিশর্মা: "তোর মেসোমশায় কী এমন নবাব খাঞ্জা খাঁ শুনি যার রায় মেনে ঠাকুরের ফাঁসির হুকুম দিতে হবে?"

আমি (আম্‌তা আম্‌তা ক'রে): মেশোমহাশয় বলেন: মহাপুরুষদের শিষ্যরা অনেক আষাঢ়ে গল্প বানিয়ে থাকেন—

নির্মলদা (উদ্দীপ্ত) : রেখে দে তোর সবজান্তা মেসোকে কুলুঙ্গিতে তুলে—বাইরে বের ক'রে আর লোক হাসাস নি, বুঝলি ?

আমি (রুষ্ট) : এ আপনার ভারি অন্যায়—অকারণে গরম হওয়া।

নির্মলদা (সুর বদ্‌লে) : আচ্ছা শোন্—নরম সুরেই বলি : তুই কেন কথায় কথায় তোর মেসোর নজির দিস্ বল্‌তো ? যে নিজে অন্ধকারে সে অন্ধকে দিশা দেবে কী করে ? কোন্‌টা আষাঢ়ে গল্প আর কোন্‌টা সাক্ষাৎ ইতিহাস বাৎলে দেবেন কিনি—মহাপুরুষেরা ছাড়া ? তোর মনে নেই মথুরবাবুর ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক : "ঈশ্‌! মা কালী এই লাল জবার গাছে সাদা জবা ফোটান দেখি !"

আমি (দ'মে গিয়ে) : মনে আছে। পরদিনই সেই গাছে একই বোঁটায় দুটি ফুল ফুটেছিল একটি সাদা একটি লাল। মথুরবাবু হার মেনেছিলেন।

নির্মলদা (সব্যঙ্গে) : কেবল তোর ধনুর্ধর মেসো—Vanquished argues still ! এ না হ'লে মেসো ! কিন্তু ঠাট্টা না—বল্‌তো তুই—এ-ও কি ঠাকুরের ভক্তদের বানানো গল্প বলবি ? শ্রীম আমাকে নিজে বলেছেন ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনেছিলেন মথুরবাবুর সঙ্গে তাঁর এ-বচসা। (আমার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে) তোকে ধম্‌কাই তোর ভালোর জন্যেই রে, বিশ্বাস কর্। তাই বলি কুতর্ক ছেড়ে ঠাকুরের কথায় কান দিতে—যিনি এসেছিলেন যুগাবতার হ'য়ে। আর হেসে উড়িয়ে দিতে শেখ্ তাদের কথা যারা হুজুগে গুজবী। কারণ যারা জেগে ঘুমোয়—তাদের জাগানো যায় না, বুঝলি ? ঠাকুর দেন নি কি সেই উটের উপমা কাঁটাঘাস চিবিয়ে যার চোয়াল বেয়ে দরদর ক'রে রক্ত পড়ছে—তবু সে ঐ কাঁটাঘাসই খাবে ? আর তুই কিনা এই সব বিজ্ঞ সংসারীর কথায় কান দিস—যারা ঐ উটের মতন হাজার ঠেকলেও শিখবে না, বিয়ে ক'রে ভুগবে, তবু বার বার বিয়ে না করে থাকতে পারবে না, ছেলে ম'রে যাবে, মেয়ে বিধবা হবে, তবু বছর বছর বংশবৃদ্ধি ক'রেই চলবে ? যদি সত্যি দিশা চাস তো নম্র হ'য়ে ঠাকুরের কথা মেনে এই সরল বিশ্বাসকে বরণ ক'রে নে যে ভগবান্ ডাকলে দেখা দেন। আর তাঁর কথা মনে রাখিস—ডাকতে হয় মনে, কোণে, বনে। তাই বলছি—কর্ সাধুসঙ্গ, পড়্ তাঁর কথামৃত আর নির্জনে তাঁকে শুধু কেঁদে কেঁদে ডাক্—"দেখা দাও" ব'লে। ব্যস্।

আমি (মুগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঢোক গিলে) : কিন্তু নির্মলদা······মানে ডাকলে তিনি সত্যি দেখা দেন তো ?—ধরুন, যদি না দেন ?

নির্মলদা : ফের সংশয় সন্দেহ ? ডাকলে তিনি দেখা দেননা তো ঠাকুর কি

হাম্‌বাগ না কি? তবে কি না—(গম্ভীর হ'য়েও কোমল সুরে)—সত্যি যদি দেখা চাস তবে ডাকও তেমনি হওয়া চাই। তোর মনে নেই ঠাকুর গাইতেন:

"আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে যদি মা মরি,
আখেরে এ-দীনে না তারো কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করী!"

বলতে বলতে তাঁর গলা ধরে আসতে, বলতেন: "ঐ একটি বৈ দুটি পথ নেই রে দাদা—শুধু ডাকা আর ডাকা। ওরে ভাই, আমরা আর কিছু কি পারি যে পারব?"

বলতে বলতে কতদিনই যে তাঁর ভাবান্তর দেখেছি—চোখে জল—সে কী বলব! সত্যিই অভাবনীয়! ধরুন, হয়ত তিনি কখনো ধম্‌কে সুরু করেছেন, কি মেসোমহাশয় প্রমুখ নাস্তিকের বিজ্ঞ যুক্তিকে ব্যঙ্গ ক'রে জুড়ে দিয়েছেন ভগবানের ঝাঁজালো ওকালতি—কিন্তু দেখতে দেখতে মেজাজের ঋতু-পরিবর্তন—ঠাকুরের কথা বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসত। আমার অভিভাবক হ'য়ে আমারই সামনে কেঁদে ফেললে মান থাকবে না শুধু এই ভয়েই চোখের জল গোপন করতে "আসছি" ব'লেই দিতেন চম্পট। সব ছাপিয়ে মনে পড়ে তাঁর সেই স্নেহের ডাক—ব্যাজ-স্তুতি—বোকা, ফাজিল, লম্বকর্ণ—আরো কত কী অভিধা!

এমনিই শুভ্র গাঢ় স্নেহ ছিল তাঁর! বুঝি ঠাকুরের কৃপায় দুভাই যখন এক পথে চলতে গিয়ে গুরুভাই হ'য়ে দাঁড়ায় তখন তাদের মধ্যে এই রকমই অমল স্নেহ গ'ড়ে ওঠে। তাঁর মুখে শুনতাম শ্রীগিরিশ ঘোষ তাঁকে বলতেন স্বামীজি রগ-চটা মানুষ ছিলেন তো—মাঝে মাঝেই রাগ ক'রে রাখাল মহারাজকে যা তা বলতেন, কিন্তু রাখাল মহারাজ চোখের জল ফেলে বার বার চ'লে যাবেন পণ নিয়েও যেতে পারতেন না আর কোথাও। বলতেন: "আমি চ'লে গেলে নরেন কাকে ভালোবেসে গাল দেবে?" এই বিশ্বাসে পরে যখন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে প্রয়াণ করি তখন বড় আশা নিয়েই গিয়েছিলাম যে সেখানে পাব এম্‌নি গুরুভাই! কিন্তু সে অন্য কথা। নির্মলদার কথাই বলি।

এই সময়ে—এবং পরেও—নিজেকে আমি সাধ্যমত নানা দিক থেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি নিস্পৃহভাবে। নিজের কয়েকটি গুণ যে চোখে পড়েনি এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে, কিন্তু একটি দোষ বেজায় উগ্র হ'য়েই দেখা দিত পদে পদে: আমার দুর্জয় অভিমান। পিতৃদেব মাতৃহারা সন্তানকে পারৎপক্ষে শাসন করতে চাইতেন না, বলতেন বন্ধুদের কাছে খানিকটা মিনতির

সুরেই : "ও বড় অভিমানী !" কিন্তু আমি ঠাকুরের কৃপায় ও নির্মলদার কথায় এটুকু বুঝতে শিখেছিলাম যে এ-যেন পেটুককে "ভোজনবিলাসী" নাম দিয়ে সান্ত্বনা দিতে চাওয়া। নির্মলদা আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন—অভিমানের নিদান অহঙ্কারই বটে। তাঁকে ভালোবেসেছিলাম ব'লেই আমার নিহিত অহঙ্কার সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন হ'তে পেরেছিলাম, নৈলে কি তের চোদ্দ বৎসর বয়সেই আমি ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেটে চাইতাম আত্মশোধন—গাইতাম সরল অনুতাপে (রজনী সেন এগানটি মাঝে মাঝে গাইতেন আমাদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাসায়—আমি শুনেই শিখে নিয়েছিলাম) :

কোন্ ছেলে তোর আমার মতন কাটায় জীবন ছেলেখেলায় ?
খেলায় মত্ত হ'য়ে কে আর পরশরতন হারায় হেলায় ?
আমার মতন কে অবাধ্য (যার) সংশোধন মা, তোর অসাধ্য ?
(তুই) "আয়" ব'লে চাস কোলে নিতে, "দূর হ" ব'লে ছুটে পালায় !

আর একটি গান গাইতাম রবীন্দ্রনাথের—যখনই অভিমানের দরুন আঘাত পেতাম :

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

ঠাকুর এ-প্রার্থনায় পুরোপুরি সাড়া না দিলেও একদিক দিয়ে সাড়া এসেছিল এইভাবে যে, নির্মলদার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কটূক্তি কিছুই আমি গায়ে মাখতাম না—বরণ ক'রে নিতাম শাপে বর ব'লে। খানিকক্ষণ মুখ ভার ক'রে থাকতাম, তারপর তিনি যেই ডাক দিতেন সুড়সুড় ক'রে মাথা নিচু ক'রে তাঁকে গিয়ে প্রণাম করতাম—মেনে নিয়ে যে বুদ্ধি বা মনীষায় না হ'লেও ভাগবত জ্ঞানে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তিনি আমার চেয়ে অনেক বড়।

আর একদিক দিয়ে ঠাকুর সাড়া দিয়েছিলেন : আমার নাস্তিকতার মোহ কেটে যেটে না যেতে নির্মলদার কথায় আমি সাধুসঙ্গের জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলাম। আমার দিদিমা এতে ভয় পেতেন। আমি ছিলাম তাঁর বড়ই আদুরে। বলতেন সবাইকে : "ওরে, ও সন্নিসি হ'য়ে যাবে ওর কুষ্ঠিতে লিখেছে। ওকে তোরা কেউ কিছু বলিস নি রে—ও ধ্যানে-বসা ছেলে।"

"ধ্যানে বসা ছেলে" শুনে আমি তো যাকে বলে অথই জলে। নির্মলদাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন : "জানি না—যাঃ, দিক্ করিস নে।" কিন্তু

আমিও কম নাছোড়বন্দ নই তো—তাঁকে চিঠি লিখতে হ'ল তাঁর রাঙাকাকার কাছে। তিনি জবাবে জানালেন যে, আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসা যে ছেলের মাথা আগে ভূমিষ্ঠ হয় তাকেই বলে ধ্যানে-বসা ছেলে। কিন্তু আমি একথা শুনে হেসেই কুটি কুটি : "দূর্, যত সব মেয়েলি কাণ্ড!" নির্মলদা একথায় সায় দিয়ে বলতেন : "ঠিক বলেছিস। ও-সব নিয়ে মাথা বকাস নি। কে ধ্যানে-বসা ছেলে, কে কোলে-শোওয়া মেয়ে—কী যায় আসে? ওসব–ঠাকুর বলতেন 'হাবিজাবি খবর—মনের বাজে খরচ।' তোকে আমাকে চাইতে হবে শুধু তাঁর শরণ আর শরণ। ঠাকুর বলতেন মনে নেই?—'শরণাগত রাম শরণাগত!' বলতেন—একমনে নির্জনে গান গেয়ে মার শরণ চেয়ে রামপ্রসাদ পেযেছিল তাঁর চরণ। তুই তোর মেসোকে আদর্শ না ক'রে এই রামপ্রসাদকেই আদর্শ কর্ না রে। তাঁর মতন গান গেয়ে ডাক্ না—দাও শরণ দাও চরণ ঠাকুর! গা না"—ব'লেই ধ'রে দিতেন :

প্রসাদ বলে ভবার্ণবে ব'সে আছি ভাসিয়ে ভেলা
জোযার এলে উজিয়ে যাব ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা।

জানিস রাঙাকাকা এ গানটি কী যে ভালোবাসেন!

আমি : কিন্তু নির্মলদা, গুরু—গুরুর কী হবে!

নির্মলদা : আঃ, ঠাকুরকেই গুরু কর না!

আমি : কিন্তু তিনি তো নেই—

নির্মলদা : ফে—র নষ্টামি! আমি বলছি তিনি আছেন। তুই জানিস—তাঁর কত ভক্তকে তিনি দেখা দেন?

আমি (শিউরে উঠে) : দেন? পরমহংসদেব? সত্যি, নির্মলদা?

নির্মলদা : হ্যাঁরে হ্যাঁ—আমি কি ধাপ্পা দিচ্ছি তোকে?

আমি (কুলকিনারা না পেয়ে) : আপনাকে দেখা দিয়েছেন?

নির্মলদা (ঈষৎ দ'মে গিয়ে) : ওরে, আমি কি তাঁকে তেমন ভালোবেসেছি না ডাকার মতন ডেকেছি যে তাঁর দেখা পাব? তবে তিনি দেখা দিয়েছেন অনেককেই—রাখাল মহারাজকে, অন্নদাঠাকুরকে, গিরিশবাবুকে আরো কত কত ভক্তকে—কে খবর রাখে?

গিরিশ ঘোষের নাম শুনেই উঠলাম আমি উৎকর্ণ হ'য়ে। কেন বলি।

অন্নদাঠাকুর সম্বন্ধে আমি তখন বিশেষ কিছু জানতাম না, নাম শুনেছিলাম

মাত্র। কিন্তু গিরিশবাবু মাঝে মাঝে আমাদের এখানে আসতেন পিতৃদেবের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর চেহারার মধ্যে এমন একটা শান্ত সৌম্য উদাসী ভাব দেখেছিলাম যে আমি সত্যই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তাছাড়া নির্মলদার কাছে অষ্টপ্রহর গিরিশ-গুণগান শুনতে শুনতে আমার মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস গজিয়ে উঠেছিল যে গিরিশবাবু মহাপুরুষ যদি নাও হন—সাধুপুরুষ নিশ্চয়ই।

কিন্তু কেউ সাধুপুরুষ অকুণ্ঠে মেনে নিলেও তাঁকে পরপার থেকে জলজ্যান্ত গুরু এসে দর্শন দিয়েছেন এতটা মেনে নিতে একটু বেগ পেতাম বৈ কি—আরো এই জন্যে যে পিতৃদেব প্রায়ই আমাকে পই পই ক'রে মানা করতেন "পরের মুখে ঝাল" খেতে। বলতেন: "ভক্তি ভালো জিনিস বাবা, কিন্তু ওর একটা বিপদ আছে—মানুষকে অজ্ঞান্তে গোঁড়া ক'রে তোলে। আর এই গোঁড়ামির মতন সর্বনেশে জীবনে কমই আছে—বিশেষ ক'রে ধর্মক্ষেত্রে উনি কুরুক্ষেত্র ডেকে আনতেই আছেন, জানবি।"

পরের জীবনে পিতৃদেবের এই সদুপদেশটি আমার যে কী উপকার করেছিল—হয়ত কোনোদিন লিখব—গুরুবাদের প্রসঙ্গে—যখন আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে একটু একটু ক'রে আমার অনেক গুরুভাইয়ের মতন আমিও গোঁড়া হ'য়ে ভাবতে সুরু করেছি কত কী যা-তা। কিন্তু সেকথা লিখতে আজো লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হ'য়ে যায় ব'লে হয়ত লিখতে পারব না কোনোদিনো। যাক্।

আমার উভয়সংকটের দুঃখটা কল্পনা করুন—একদিকে নির্মলদা অন্যদিকে সাক্ষাৎ পিতৃদেব! অনেক ভেবেচিন্তে মহা বিপন্ন হ'য়ে শেষে মেসোমহাশয়কেই সালিশি মানলাম। তিনি শুনে একটু গম্ভীর হয়ে রইলেন, পরে বললেন: "গিরিশবাবু কি নির্মলকে নিজে মুখে একথা বলছেন না নির্মল আর কারুর কাছ থেকে শুনেছে? মানুষ যখন কাউকে গুরুর মতন ভক্তি করে তখন গুরুর মহিমা বাড়াতে প্রায়ই অম্লানবদনে তিলকে তাল করে কি না"...ইত্যাদি।

নির্মলদাকে গিয়ে একটু আমতা আমতা ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম: "আচ্ছা নির্মলদা, গিরিশবাবু তিলকে তাল করেন নি তো—মানে, হয়ত মাত্র স্বপ্নে দেখা পেয়েছেন—"

নির্মলদা (অগ্নিশর্মা): তোর অপরূপ মেসোর অনুপম জেরা—না? তোকে আমি চিনি না বুঝি? কাল আমার কাছে শুনেই ছুটেছিলি হ্যারিসন রোডে তোর চীফ জাস্টীস মেসোকে কনসাল্ট করতে। তোর অদৃষ্টে দুঃখ আছে, ব'লে দিলাম—

তুই লিখে রাখ্। নৈলে কিনা সাক্ষাৎ গিরিশবাবুকে ঠেশ দিয়ে তুই এমন কথা বলিস? যা যাঃ—তোর সঙ্গে আর যদি কোনোদিনো কথা কই ফের!" কিন্তু এযাত্রা কথা বন্ধ হয় নি—নির্মলদার হাতে পায়ে ধ'রে "আর অমন করব না" ব'লে পার পাই। আর বলা বাহুল্য, এর পরে গিরিশবাবুর প্রতি ভক্তি আমার আরো বেড়ে ওঠে।

শেক্সপীয়র বলেছেন: The course of true love never did run smooth"—কি না: সত্য প্রেমের পথ কুসুমাস্তৃত নয়। একথা গভীর ভক্তির সম্বন্ধেও সমানই খাটে—বলাই বাহুল্য। কাজেই গিরিশভক্তির জন্যে যদি নির্মলদাকে (ও সেই সূত্রে আমাকে) খানিকটা নাটকীয় ঢঙেই দুঃখ পেতে হ'য়ে থাকে তাহ'লে তাতে আপনি নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন না—কেন না প্রেম ভক্তি মানুষকে কী ভাবে স্পর্শকাতর ক'রে তোলে না জানে কে? কিন্তু আমি সে-সময়ে জানতাম না, তাই শক্-টা বেজেছিল খুবই দুঃসহ হয়ে। কী ভাবে—বলি, যদিও ব্যাপারটা একটু ঘোরালো তথা ঝাঁঝালো ব'লে সরল ভঙ্গিতে পেশ করা খুব সহজ নয়। তবু চেষ্টা করতেই হবে।

প্রতি বড় শিল্পী বা সাহিত্যিকের চারদিকে প্রায়ই এমন কয়েকটি চক্রী জোটে যাদের পেশা হ'ল ঝগড়া বাঁধানো, নামে লাগানো। এই শ্রেণীর কয়েকটি লোক মাঝে মাঝেই পিতৃদেবের কাছে গিরিশবাবুর বিরুদ্ধে নানা ইঙ্গিত করতেন। পিতৃদেব পরচর্চা পছন্দ না করলেও এঁরা এমন চতুরভাবে গিরিশনিন্দা সুরু করতেন যে তিনি তাদের ঠিক থামিয়ে দিতেও পারতেন না—কেন না তাঁরা গিরিশবাবুর কথা পাড়তেন নৈর্ব্যক্তিক সমালোচকের ঢঙে—ভাবটা এই যে নিরপেক্ষ সমালোচনা তো নিন্দনীয় হ'তে পারে না।

সেসময়ে আমি কুটচক্রীদের চাল নিশ্চয়ই ভালো ধরতে পারতাম না, কিন্তু তবু যখন এই দলধ্বজেরা পিতৃদেবের কাছে বলতেন যে গিরিশবাবু ও তাঁর ভক্তবৃন্দ "দ্বিজুবাবু"কে বড় নাট্যকার ব'লে মানেন না, বলেন—"উনি তো হাসির গানের কবি"—তখন আমি একবার পিতৃদেবকে বলেছিলাম যে, নির্মলদা বলেন এঁরা বরের ঘরের মাসি ক'নের ঘরের পিসি। পিতৃদেব অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলেন: "নির্মল কি আমার বন্ধুদের মিথ্যাবাদী মনে করে না কি?" আমি থতমত খেয়ে পৃষ্টপ্রদর্শন ক'রে সোজা নির্মলদাকে গিয়ে একথা বলতেই তিনি ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেন: "ছোটমামা এঁদের সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরই বা মনে করেন কেন শুনি? তোর মনে আছে—পরমহংসদেব একবার যদু মল্লিককে বলেছিলেন মোসাহেব না রাখতে?

কারণ এই মোসাহেবরাই যত নষ্টের গোড়া জানবি।" আমি গিরিশবাবু সম্পর্কে নির্মলদার দিকে হ'লেও তিনি পিতৃদেবের কোনো বন্ধুকে মোসাহেব আখ্যা দিলে রুখে উঠে পিতৃভক্ত পুত্র ব'নে গিয়ে তাঁর ওকালতি জুড়ে দিতাম। "দিলাম" না ব'লে "দিতাম" বলছি এইজন্যে যে গিরিশবাবু বনাম পিতৃদেব তর্ক আমাদের মধ্যে প্রায়ই বাধত এই সময়ে।

কথায় কথায় কথা বাড়ে—কাজ নেই। এতটাও বলতাম না ফেনিয়ে যদি না এর পরের অঙ্কে ব্যাপারটা গভীর শোকাবহ হ'য়ে দাঁড়াত। হ'ল কি, একদিন পিতৃদেবের এই শ্রেণীর এক "বন্ধু" নির্মলদাকে ঠাট্টা ক'রে আমার সামনেই জিজ্ঞাসা করলেন গিরিশবাবুর কাছে তিনি এত ঘন ঘন যাতায়াত করছেন কিসের লোভে —দীক্ষা নিতে না কি? বলেছি—নির্মলদা ছিলেন রগচটা মানুষ, বললেন ঝাঁজালো সুরে: "আপনি নিজের চরকায়ই তেল দিন না মশাই—অপরের জন্যে মাথা ব্যথা রেখে।" ব'লেই তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ। ভদ্রলোক আমাকে সালিশি মানলেন: "দেখলে মণ্টু! আমি কী এমন কটু কথা বলেছিলাম যে—" আমি বিরক্ত হ'য়ে সোজা নির্মলদার অনুসরণে উধাও হ'লাম—আমাদের পড়ার ঘরে। সেখানে দেখি মেঘেনদার সামনে নির্মলদা লেকচার সুরু করেছেন ছোটমামার এই সব মোসাহেবদের শয়তানি সম্বন্ধে। অম্‌নি আমার মনটা নির্মলদার 'পরে অপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

ওদিকে সেই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই পিতৃদেবের কাছে গিয়ে নির্মলদার নামে লাগিয়েছিলেন। কারণ একটু বাদেই পিতৃদেব নির্মলদাকে তলব ক'রে পাঠালেন! বলা বাহুল্য, আমিও গেলাম তাঁর পিছু পিছু—বুকের মধ্যে তখন আমার ডমরু বাজছে!

দেখলাম পিতৃদেবের মুখ গম্ভীর। নির্মলদাকে দেখেই বললেন: "অমুককে তুমি অপমান করেছ?"

নির্মলদা (রুখে উঠে): তিনি আগে আমাকে অপমান করেছেন।

পিতৃদেব: না। তিনি বললেন তোমাকে তিনি কিছুই বলেন নি।

নির্মলদা: গিরিশবাবুর সম্বন্ধে ঠেস দিয়ে কথা—

পিতৃদেব: সে তাঁর মত—তার জন্যে তুমি তাঁকে যা তা বলতে পারো না। তিনি আমার বন্ধু, মনে রেখো। আর শোনো নির্মল, তোমার বাবা তোমাকে আমার এখানে পাঠিয়েছেন পড়াশুনো করতে। আমি চাই না তুমি থিয়েটারি দলে মেশো।

নির্মল : গিরিশবাবুর কাছে যাই আমি থিয়েটারি দলে মিশতে না—সৎকথা শুনতে।

পিতৃদেব (উষ্ণ স্বরে) : কথার উপর কথা কোয়ো না। শোনো : —এখানে যদি থাকো আমার কথা শুনতে হবে। যাও।

পিতৃদেব সহজে রাগতেন না, কিন্তু একবার রাগলে তাঁর সামনে দাঁড়াবে কে ?

নির্মলদা ঘরে এসে খানিক গুম হ'য়ে মুখ নিচু ক'রে ব'সে রইলেন। তারপর খসখস ক'রে এক চিঠি লেখা স্থরু ক'রে দিলেন। আমি তাঁর কাছে যেতেই তিনি "তুই একটু ওদিকে যা" বলে আমাকে ডিশমিশ ক'রে দিয়ে লিখেই চললেন।

খানিকবাদে তাঁর তোরঙ্গটিতে বইখাতাপত্র প্যাক ক'রে একটা ভাড়া গাড়ি ক'রে চ'লে গেলেন তাঁর মেজদাদার ওখানে। (তিনি এক আফিসে কাজ করতেন এক সস্তা মেসে থেকে—সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে।) যাবার সময় আমাকে জড়িয়ে ধ'রে মেসের ঠিকানা দিয়ে "দেখা করিস" সেখানে—আর···আর এই চিঠিটা দিস ছোটমামাকে—" ব'লে থর-থর-ক'রে-কেঁপে-ওঠা ঠোঁট কামড়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। যাবার সময়ে গাড়ি থেকে মুখ বার ক'রে চেঁচিয়ে বললেন : "ছোট-মামাকে বলিস আমি আর ফিরে আসব না এখানে—আর—আর—তাঁকে আমার প্রণাম জানাস।—হাঁকাও !"

আমি চক্ষে অন্ধকার দেখলাম। পিতৃদেব আলিপুর কাছারি থেকে সন্ধ্যাবেলা ফিরতেই বন্ধ খামটি তাঁর হাতে দিয়ে "নির্মলদা"—ব'লেই কেঁদে ফেললাম।

পিতৃদেব আমাকে জড়িয়ে ধ'রে শান্ত ক'রে খামটি খুলে চিঠিটি পড়লেন। পড়ার শেষে আমার হাতে দিয়ে গম্ভীর মুখে "পড়্" ব'লেই বেরিয়ে গেলেন।

চিঠিটা বার বার পড়লাম। নির্মলদা লিখেছিলেন ইংরাজিতে। তিন-চার পৃষ্ঠা চিঠি। তার সার মর্ম এই যে তিনি সেখানে থাকতে পারেন না যেখানে গিরিশবাবুর অপমান নিত্যকর্ম ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকে। আমি সোজা গিয়ে রাঙা-জ্যেঠামহাশয়কে দিলাম চিঠিটি। তিনি প'ড়ে বললেন : "নির্মল খুব অন্যায় ক'রেছে গুরুজনকে এরকম উদ্ধত চিঠি লিখে। কিন্তু কী চমৎকার ইংরাজি লিখেছে রে !"

আমি কী বলব ভেবে না পেয়ে বললাম : "কিন্তু নির্মলদা বাবাকে বাংলায় না লিখে ইংরাজিতে চিঠি লিখতে গেলেন কেন ?"

রাঙা জ্যেঠামহাশয় করুণ হেসে বললেন : "বোধ হ ইংরাজিতে রাগের 'রেটরিক' বেশি সহজে যোগান দেয় ব'লে।"

চিঠিট আমার কাছে বহুদিন ছিল। বহুবার পড়েছিলাম ব'লে তার অনেকগুলি লাইনই আজো মনে আছে, কিন্তু শুধু একটি মাত্র লাইন উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে। শেষের দিকে নির্মলদা লিখেছিলেন: "I love Girish Babu, I adore Girish Babu, but I am sorry I can't say the same about your flawless friends who run him down—who are not fit to lace his shoes..."

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

এ সময়ে আমার বয়স পনের হবে—নির্মলদার আঠার কি উনিশ।

একুশ

নির্মলদার সুরধাম থেকে নিষ্ক্রমণ খানিকটা ড্রামাটিক ভঙ্গিতেই হয়েছিল বৈ কি। হওয়াটা বিচিত্র নয়। তিনি পরে একজন সেরা নটের পদবী পেয়েছিলেন খানিকটা এই জন্যেই নয় কি যে, ড্রামা ছিল তাঁর রক্তে। ওদিকে পিতৃদেবও ছিলেন নাট্যকার। চারিদিকের তোড়জোড় নাটকীয় হ'লে ড্রামার ডামাডোল কি স্বাভাবিক না হ'য়ে পারে?

কিন্তু ড্রামার অঙ্গে অঙ্গে শুধু চমকই তো নয়—সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও থাকে জড়িয়ে। এ-দুঃখ আসে ড্রামার উত্তেজনা বা ক্রোধের কর্মফলেই। আমাদেরও এল। দুঃখ পেলেন আরো অনেকেই—যদিও ব্যথা সবচেয়ে বাজল আমাদের তিনজনকে। আমি অবশ্য ভাবতাম যে জগতে আমার মতন দুঃখী আর কেউ নেই—এর মধ্যেও খানিকটা নাটকীয় আমেজ ছিল জানি—কেবল তা ব'লে দুঃখটা কাল্পনিক ছিল না মোটেই।

নির্মলদা প্রথম দিকে খুবই গৌরব অনুভব করেছিলেন: খানিকটা শহীদদের ভঙ্গিতেই বলব। ভাবটা: আমার বিশ্বাসের জন্যে ত্যাগ করতে আমি রাজি। এক্ষেত্রে ত্যাগটা ছিল অকাট্য এও মানতেই হবে। সুরধামের সুন্দর পরিবেশ, কবি-গুণী-গায়ক-অধ্যুষিত রসচক্র, টেনিস-কোর্ট, সতীর্থ, চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়, একসঙ্গে থিয়েটার বায়স্কোপ ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাওয়া—নিরঙ্কুশ হ'য়ে আমরা ক'ভাই মিলে রাজা উজির মারা—এসব ছেড়ে নির্মলদা কি না আশ্রয় নিলেন তাঁর দরিদ্র চাকরে দাদার এক ঘিঞ্জি ময়লা গলির আলোহাওয়াহীন মেসে! পিতৃদেবকে ভাবিয়ে

দিয়েছিল বৈ কি। কারণ তাঁর আত্মসম্মান নির্মলদাকে তাঁর ঔদ্ধত্যের জন্যে দোষ দিলেও ন্যায়দর্শী মন এ-গুরুভক্তটিকে তার বিবেকবুদ্ধির জন্যে মনে মনে খানিকটা অভিনন্দন না ক'রেও পারে নি। তাছাড়া তিনি ছিলেন তো স্বভাবকবি—কাজেই এটুক কল্পনা করতে তাঁকে বেগ পেতে হয় নি যে নির্মলদা তাঁকে আঘাত দিতেই পরুষ পত্র লেখেন নি, গিরিশবাবুকে গভীর ভক্তি করতেন ব'লেই তাঁর নিন্দাবাদ সহ্য করতে পারেন নি। এর পরে হয়ত তিনি কতকটা সচেতনও হয়ে থাকবেন যে তাঁর সাম্নে গিরিশবাবুর নিন্দাবাদ মাঝে মাঝে যখন ফেঁপে উঠত তখন সেসব কথা পাশের ঘর থেকে নির্মলদা পরিষ্কার শুনতে পেতেন। কিন্তু মামাও তো ছিলেন অভিমানী কম না, তাই সব বুঝেও রগচটা ভাগিনেয়কে তলব ক'রে যুদ্ধকাণ্ডের পরে শান্তিপর্বের সূচনা করতে রাজি হন নি।

এ তো গেল তাঁর তরফের কথা। কিন্তু এই সূত্রে একবার আমার তরফের কথাটাও ভাবুন। নির্মলদা যে নির্মলদা তিনিও কি না সব জেনেশুনেও নিজের দুঃখকেই এত বড় ক'রে ধরলেন যে একবারও ভাবলেন না আমার উভয় সংকটের কথা—এক মুহূর্তেই আমাকে ডিশমিশ করে দিলেন! তিনি না কথায় কথায় বলতেন তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শুধু রক্তের নয়—"পারমার্থিক"—"আমরা তুতো ভাই নই রে, গুরুভাই?" তা, তার চেয়েও বেশি: কারণ আমি ছিলাম তাঁর গুরুভাই প্লাস চেলা—যাকে তিনিই প্রথম দেখিয়ে দেন কোন্ আলোয় কাটে অজ্ঞান-তিমির। এ-হেন দিশারি কি না রাগের মাথায় আমাকে ছেড়ে চ'লে যেতে পারলেন আমাদের পুনর্মিলনের পথে এমন এক বাধাকে উচ্ছ্রিত ক'রে—যাকে ইচ্ছা করলেও সরিয়ে দেওয়া সুকঠিন!

সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটে তাঁর মেসে আমি মাঝে মাঝে যেতাম মেসোমহাশয়ের ওখান থেকে—তিনিও আসতেন প্রায়ই মেসোমহাশয়ের "ধর্মশালায়"—পাঁচ মিনিটের পথ—আসা-যাওয়া ছিল খুবই সহজ। মাসিমা তাঁকে প্রথম থেকেই স্নেহ করতেন, তাঁর তিন মেয়ে শান্তি সুধা কল্যাণীও পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিত নির্মলদার প্রিয়পাত্রী হ'তে। কাজেই নির্মলদার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাতের অঙ্গন (rendezvous) হ'য়ে উঠল মেসোমহাশয়ের সদাসরগরম শ্রীক্ষেত্রে—যেখানে সবাই সমান, সবাই আদৃত, সবাই স্বাগত। নির্মলদা মেসোমহাশয়ের ঔদার্য, সত্যনিষ্ঠা, শালীনতা—সর্বোপরি দরদী কল্পনাশীলতার মর্মজ্ঞ হন এই সময়ে। সঙ্গে সঙ্গে মেসোমহাশয়ের প্রতি তাঁর বিমুখতা সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতনই যায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে। সেখান থেকে তিনি

আমাকে প্রায়ই ধ'রে নিয়ে যেতেন তাঁর দীন মেসের মলিন নিরালোক ঘরে—আর আমার চোখে জল ফেটে পড়ত! সুরধামের রম্য নিকেতন ছেড়ে নির্মলদাকে কি না এই ক্লিন্ন মেসের কদন্ন খেয়ে কলেজ যেতে হচ্ছে! না জানি কত কষ্টই হচ্ছে তাঁর—আহা! মাঝে মাঝে আমি তাঁর জন্যে দিমুময়রার রসগোল্লা কিনে আনতাম—খুব সহজ, কেননা দিমুময়রার বিখ্যাত দোকান ছিল এই সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটেই—আর নির্মলদা আমাকে "এ কী রে! তুই এলি আমার ঘরে, আমিই না তোকে খাওয়াব"—ব'লেই জলভরা চোখে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। অতঃপর প্রতিযোগিতা চলত কার অশ্রুনদীর কল্লোল বেশি। ভাবোচ্ছ্বাস সারা হ'লে সুরু হ'ত গল্পালাপ—বেশির ভাগই পরমহংসদেব ও গিরিশবাবুর সম্বন্ধে। আমি একদিন মরিয়া হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম: "গিরিশবাবু জানেন এ-ঝগড়ার কথা?" নির্মলদা প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন: "ওরে শোন্—কাল দক্ষিণেশ্বরে যাবি?…পরশু বেলুড়ে… তরশু স্বামী সারদানন্দের কাছে?…ইত্যাদি।

আমরা যেতামও এখানে ওখানে। পিতৃদেব বাধা দিতেন না কারণ তিনি জানতেন নির্মলদা আমার কতবড় শুভার্থী। তাছাড়া মুখে তিনি নিজেকে যতই নাস্তিক ব'লে জাহির করুন না কেন, মনে মনে তো জানতেন তিনি কী। কাজেই নির্মলদার কল্যাণে আমি যে পরমহংসদেবের দিকে ফিরেছি এজন্যেও তাঁর মন নির্মলদার প্রতি কোমল হয়ে উঠেছিল—তিনি সত্যিই উন্মুখ হ'য়ে প্রত্যাশা করতেন ঘরের ছেলে কবে ফের ঘরে ফিরবে। আমি মঠ দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার দরুন প্রায়ই বড় গলা ক'রে হেসে বলতেন: দেখ হে, আমার পুত্ররত্নের কাণ্ড—এই বয়সে শুধু গান গেয়েই তুষ্ট নয়—গুন গুন ক'রে গায়:

"ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্—

ক্ষণজন্মা নয় তো কী? থ্রী চিয়ার্স—হিপ্ হিপ্ হুরে!"

কিন্তু ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসুক এ দুজনেই চাইলেও স্নেহের ক্ষেত্রে যা হয় এক্ষেত্রেও তাই হ'ল: বাধা এল অভিমানের দিক থেকে। পিতৃদেব বলতেন: নির্মল আগে ভুল বুঝুক, নির্মলদা ভাবতেন: ছোটমামা আগে ডেকে পাঠান। একদিন পিতৃদেবের কাছে মেসোমহাশয় কথাটা তোলেন। অমনি পিতৃদেবের মুখ রাঙা হ'য়ে উঠল, বললেন: "নির্মল যদি কিছু বলতে চায় আমাকে সোজা বলে যেন।" ব'লেই স্থানত্যাগ।

মেসোমহাশয় নির্মলদাকে বলেন একথা। নির্মলদা স্থির করেন ক্ষমা চেয়ে ফিরে আসবেন। কেবল পেরেও পেরে উঠছিলেন না। বহুদিন পরে পড়ি একটি প্রবচন ফরাসী ভাষায়: "C'est le premier pas qui coute"—অর্থাৎ মুস্কিল হ'ল প্রথম পা ফেলা।

এই সময়ে পিতৃদেবের সন্ন্যাস-রোগের সূত্রপাত হয়। মেডিকেল কলেজের ডাক্তার ক্যালভার্ট তাঁর রক্তের চাপ পরীক্ষা করে শিউরে উঠলেন। বন্ধুবান্ধব উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন পেন্সন নিতে।

আমি নির্মলদাকে গিয়ে বললাম। নির্মলদা পিতৃদেবকে খুবই ভালোবাসতেন কিন্তু অভিমানীও ছিলেন দারুণ। বললেন: "আমি ক্ষমা চাইতে পারি এক্ষনি, কিন্তু সুরধামে ফিরি কী ক'রে বল্—যেখানে গিরিশবাবুর নিন্দা হয়?"

পিতৃদেবকে গিয়ে একথা বলতে তিনি খানিকক্ষণ বিমর্ষ হ'য়ে চুপ ক'রে থেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—নির্মলদা গিরিশবাবুকে এত ভক্তি করেন ঠিক কী জন্যে? আমি উত্তরে—খানিকটা নির্মলদার সাফাই গাইতেই—বললাম: "গিরিশবাবু নির্মলদার গুরু যে!"

পিতৃদেব (সবিস্ময়ে): "বলিস কি? তুই ঠিক জানিস?"

আমি (সকুণ্ঠে): ঠিক জানি না, তবে নির্মলদা গিরিশবাবুর গুরুভক্তির প্রসঙ্গ উঠতে না উঠতে যে-ভাবে উজিয়ে উঠতেন তাতে আমার এই রকমই মনে হয়েছিল।

পিতৃদেব তখনো কথামৃত পড়েন নি, তাই জানতেন না যে গিরিশবাবুর গুরু ছিলেন স্বয়ং পরমহংসদেব। মনে পড়ে—আমি এই দুর্ঘটনার পরেই তাঁকে "কথামৃত" দিয়ে বলি—পড়তেই হবে। তাঁর হাতে তখন বিস্তর কাজ। "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকা বেরুবে, তিনি "ভারত আমার ভারত আমার", "যেদিন সুনীল জলধি হইতে" জাতীয় গান ও প্রবন্ধাদি লিখছেন। তবু আমার উপরোধে তিনি কথামৃত দু দুখণ্ড প'ড়ে ফেললেন। ঠিক এর পরেই তিনি কয়েকটি অপরূপ শরণাগতির গান বাঁধেন—যার মধ্যে সবচেয়ে নাম হয় দুটি গানের: প্রথম, "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে"—নিখুঁৎ সংস্কৃত লঘুগুরু মাত্রাবৃত্তে—যে-গানটি কয়েক বৎসর পরে আমার মুখে শুনে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেন: "প্রতি হিন্দুরই এ-গানটি কণ্ঠস্থ থাকা উচিত—শঙ্করাচার্যের 'দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে' স্তোত্রটির মতন।" শরৎচন্দ্র পরে পিতৃদেবের এক স্মৃতিবার্ষিকীতে আমার মুখে এ-গানটি শুনে

বলেছিলেন : "দ্বিজেন্দ্রলালের অকালমৃত্যু না হ'লে তাঁর কাছে এই রকম আরো কত প্রাণস্পর্শী গানই না আমরা পেতাম।...ইত্যাদি"

এ-অপূর্ব গানটির দাম আমার কাছে খুবই বেশি। কারণ আমি ছিলাম আশৈশব গঙ্গাস্নানবিলাসী। না, শুধু স্নানবিলাসীই নয়, গঙ্গা আমাকে টানত নিরন্তরই—গঙ্গায় অবগাহন করবামাত্র মনে হ'ত যেন দেহের সব তাপ গ্লানি গেল জুড়িয়ে, মনের সব অশুচি গেল ধুয়ে, প্রাণের সব তামসিকতা গেল উবে! আজও পুনায় বহু ভক্তিমন্ত ভক্তিমতীদের চোখ মুছতে দেখেছি যখনই ইন্দিরার হিন্দি অনুবাদটি গাওয়ার পরে মূল বাংলা স্তোত্রটি গাই :

পরিহরি ভব সুখ দুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে :
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে!

এ স্তবকটি আমি যখনই গাইতাম তখনই আমার বুকের মধ্যে যেন অশ্রুসাগর দুলে উঠত—আরো এই জন্যে যে আমি এ-গানটির মধ্যে শুনতে পেতাম অনিবার্যের পদধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ত যে, পিতৃদেবও টের পেয়েছিলেন, তাই বুঝি তাঁর বিখ্যাত "নীলাকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো" গানটিতে দিনের শেষে চেয়েছিলেন মায়ের কোলে পরম শরণাগতি :

সাঙ্গ আমার ধুলাখেলা, সাঙ্গ আমার বেচাকেনা।
এইছি করে হিসেব-নিকেশ যাহার যত পাওনা-দেনা।
এখন বড় ক্লান্ত আমি, ওমা কোলে তুলে নে না।
যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো।

এই সময়ে তাঁর আর একটি কথা মনে পড়ে পরমহংসদেব সম্পর্কে। বোধ হয় মা-র ছেলে মা-র কোলে ফিরবার জন্যে উন্মুখ হয়েছিলেন ব'লেই তিনি আমাকে বলেছিলেন সহজ উচ্ছ্বাসে : "ওরে কথামৃত পড়লে আর মনে সন্দেহ থাকে না যে তিনি ছিলেন নিখাদ সোনা।" আমি পরে শ্রীমর কাছে এ-উক্তিটি রিপোর্ট করি, কিন্তু সেকথা যথাস্থানে—উপস্থিত যা যা ঘটল যথাপর্যায়ে বলতে চেষ্টা করি।

পিতৃদেবের জীবনীকার শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী তাঁর দ্বিজেন্দ্রজীবনীর শেষে লিখেছেন যে সুরধামে গিরিশবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কথাটা ঠিক, কিন্তু তখন আমি বাইরের মাঠে টেনিস খেলছিলাম, কাজেই এ-দুই নাট্যকারের

কথাবার্তা শুনতে পাইনি। পিতৃদেবের মহাপ্রয়াণের পরে জীবনীটি পড়বার সময় ভারি আক্ষেপ হয়েছিল—কেন টেনিস খেলা ছেড়ে শুনতে এলাম না? —টেনিস খেলা তো নিরবধি, কিন্তু বাংলাদেশের দুই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের এহেন শুভদৃষ্টি তো দুবার হয় না।

দেবকুমারবাবু পিতৃদেবের সঙ্গে গিরিশবাবুর কথালাপের যে-বিবরণ দিয়েছেন পড়তে পড়তে আমার দুঃখ রাখবার জায়গা পাইনি যে নির্মলদা এ-সময়ে সুরধামে ছিলেন না। থাকলে দেখতে পেতেন—মহাজনকে সবচেয়ে সহজে বোঝে মহাজনেই বটে। দ্বিজেন্দ্র-গিরিশ-সংবাদের এ-রিপোর্টের মাধ্যমে আরো একটি আনন্দময় সত্য ফুটে ওঠে জ্বল জ্বল করে যে, নিন্দুকদের নিন্দা সময়ে সময়ে দুঃখাবহ পরিবেশ সৃষ্টি করলেও তাদের কথায় যে ধুলোবালি ওঠে সে খানিকটা আঁধির মতনই—যখন ওঠে তখন চারদিক আসে আঁধার হ'য়ে, কিন্তু তারপরেই ফের আলোময়ী ঘোম্‌টা খুলতে না খুলতে কালো ঝড় দেয় রণে ভঙ্গ। আমার মনে হয় যে গিরিশবাবু নির্মলদার কাছে সব শুনেই এসেছিলেন—যদিও এ আমার অনুমান মাত্র। যাই হোক এবার রিপোর্টটি থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করি।

দেবকুমারবাবু দ্বিজেন্দ্র জীবনীতে লিখছেন (৫৭৩-৫৭৫ পৃষ্ঠা):

"সভাস্থলে গিরিশবাবু আসিয়া উপবিষ্ট হইলে সসম্ভ্রমে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সমীপবর্তী হইয়া বলিলেন: 'আপনি যে এত কষ্ট ক'রে এলেন এ আমার সৌভাগ্য।'

"একটু হাসিয়া বিনীতভাবে গিরিশবাবু বলিলেন: 'না না—সে কী কথা?··· ···কিন্তু আজ কেবল যে এই নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছি তাই নয়, বিশেষ একটা কথাও আছে।·········দেখুন, আমাদের দুজনের মধ্যে যাতে স্থায়ী মনান্তর কি বিচ্ছেদ ঘটে সেজন্যে নানা জনে নানা ফিকির-ফন্দি চালাচ্ছে।······কিন্তু আমি বেশ জানি--আপনার সম্বন্ধে তারা আমার কাছে যেসব কথা বলেছে তার মূলে কোনো সত্য নেই, আর আমি বিশ্বাস করি—আমার নিন্দাবাদও আপনি নিছক মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেন।···অবশ্য আমি এযাবৎ যত রাশি রাশি বই লিখেছি তার সবগুলিই সার্থক হয়েছে এমন কথা পাগল ছাড়া কেউ বলবে না। কিন্তু দুচারখানি যে মন্দ হয়নি একথাও কি আপনি অস্বীকার করেন? ভালোমন্দ—'

"দ্বিজেন্দ্রলাল বাধা দিয়া বলিলেন: 'ছি ছি! এরকম কথা কি আপনার মুখে সাজে?···আপনিই তো এবিষয়ে আমাদের গুরু! বাস্তবিক, আপনাকে অনুসরণ ক'রেই তো আমরা তবু এই-যা দুএকখানা নাটক লিখতে শিখেছি।'

"গিরিশবাবু বলিলেন : 'কী বলেন আপনি ?…আপনার উপর আমার অগাধ আশা। ভবিষ্যতে আপনিই যে এ-দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার—আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ ভরসা এ বিষয়ে কি আর কোনো রকম সন্দেহ আছে ?…

"দ্বিজেন্দ্রলাল কথাটার গতি ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন : 'আমি আপনার বিরুদ্ধে কোনো কথা বিশ্বাস করব—এ কি সম্ভব ? যেসব লোক ঐ-রকম কানকথা বলতে আসে তাদের মৎলব কি আর আমি বুঝি না ! ততটুকু বুদ্ধি আমার আছে।'

"গিরিশবাবু উল্লসিত হইয়া বলিলেন : 'বাঃ ! এইই তো চাই ! দেখুন, আমরা কেউ কাউকে তুচ্ছ করতে পারি না। আমাদের মধ্যে এই সদ্‌ভাবটুকু যেন সর্বদা অটুট থাকে। লোকে যার যা খুসি বলুক গিয়ে—আমাদের তাতে কী আসে যায় ?"

স্মৃতিচারণে অপরের রিপোর্ট বা নজির না দেওয়াই বাঞ্ছনীয় জেনেও এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম—পরের কথাটা ফুটিয়ে তুলতে। তাই অবহিত হোন।

আমি শুধু এই সূত্রে নয়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পিতৃদেবের দুঃখময় মনান্তরের সূত্রেও একটি কথা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম পনের যোল বৎসর বয়সেই : যে, দূর থেকে মানুষ মানুষকে প্রায়ই ভুল বোঝে। গিরিশবাবুর সঙ্গে পিতৃদেবের দেখা হ'তে না হ'তে যেমন উভয়ের কাছেই এটা পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছিল, তেম্‌নি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পিতৃদেবের যদি একটিবারও মোকাবিলা হ'ত তাহলে চক্ষের নিমেষে সব ভুল-বোঝার নিরাকরণ হ'ত ঠিক-বোঝার পাল্টা টানে। আর একটি কথাও বুঝেছিলাম আমি ঐ বয়সেই : যে হিন্দুদের নানা গুণ থাকলেও একটি মস্ত দোষ আছে যার ফলে তার বহু দুর্গতি হয়েছে : মহৎকে ছোট করার অধ্যবসায়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর আমেরিকা থেকে লেখা একটি বিখ্যাত পত্রে ঠিকই লিখেছেন (নং ৭২, পত্রাবলী) :

"কোনো জাতি কিম্বা ব্যক্তির পক্ষে বড় হইতে হইলে তিনটি বস্তুর প্রয়োজন : সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস, হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবকে বর্জন, যাহারা সৎ হইতে কি সৎকাজ করিতে সচেষ্ট তাহাদের সহায়তা করা।

"কী কারণে হিন্দুজাতি তাহার অদ্ভুত বুদ্ধি ও অন্যান্য গুণাবলি সত্ত্বেও ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল ? আমি বলি, হিংসা। এই দুর্ভাগা হিন্দুজাতি পরস্পরের যশখ্যাতিতে যেভাবে হিংসাপরায়ণ তাহা কোনো কালে কোথাও দেখা যায় নাই। যদি আপনি কখনো পাশ্চাত্যদেশে আসেন তবে এ-দেশবাসীর মধ্যে এই হিংসার অভাবই সর্বপ্রথম আপনার নজরে পড়িবে।" রবীন্দ্রনাথও আমাকে একাধিকবার বলেছিলেন : "আমরা বড় আত্মঘাতী জাত দিলীপ, যাদের ধ'রে বড় হব তাদেরই সব আগে ছোট করি—

যে-ডালে বসি সেই ডালেরই মূলে কুড়ুল হানি!" পিতৃদেবও একথা বলেছেন তাঁর বহু নাটকে নানা ভাবেই: যে, হিন্দুদের পতনের একটি প্রধান কারণ—কেউ কারুর ভালো দেখতে পারে না। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজে' হিন্দুদের পরশ্রীকাতরতার দৃশ্য ফুটে উঠেছে তার অপ্রতিবাদ্য চিত্রমহিমায়। নির্মলদার কাছে শুনেছিলাম গিরিশবাবুও বলতেন প্রায়ই বাঙালির হানাহানির কথা—উদ্ধৃত করতেন একটি প্রবচন:

যেখানে বাঙালি, সেখানে মা কালী
সেখানে পাঁঠাবলি, আর সেখানে দলাদলি।

গিরিশবাবু যে রসিক ছিলেন সেকথা সবাই জানে, কিন্তু গুজব থেকে জানা আর যাকে ভালোবাসি তার মুখ থেকে শোনা এ-দুয়ের মধ্যে তফাৎ আশমান জমীন। নির্মলদা গিরিশবাবুর রসিকতার কত দৃষ্টান্তই যে দিতেন দিনের পর দিন! একটি আজো মনে আছে: এক আনাড়ি জমিদারের গল্প। গানের আসরে মুখ্যু জমিদার-কুলতিলক বসেছেন লালপানির বোতল নিয়ে। গাইছেন নামজাদা রমজান ওস্তাদ, বাজাচ্ছেন ডাকসাইটে ভোলানাথ তবলচি। বাজাবার আগে তিনি বাঁয়ার কড়াগুলি টানছিলেন যথাবিধি। জমিদারবাবুকে তাঁর মোসাহেবরা বলেছিলেন: "হুজুর, আপনিই হলেন পেট্রন—মাঝে মাঝে সাবাস দেবেন—এ ও তা নিয়ে। নৈলে গানবাজনা জমবে না।" তবলচির হাতে যখন বাঁয়া তবলায় বোলের ফুলঝুরি ফাটলো তখন জমিদার প্রভু জড়িতস্বরে ব'লে উঠলেন: "কেয়াবাৎ! কী কড়াই টানলি ভুলো!"

বাইশ

যথাবিধি ফের হারানো খেই ধরি।

বলছিলাম—পিতৃদেবের সঙ্গে গিরিশবাবু যখন দেখা করতে এসেছিলেন ঠিক তখনই আমি টেনিস খেলায় মশগুল ছিলাম ব'লে আজো খেদ হয়। কারণ গিরিশ-বাবুকে আমি মনে মনে শুধু যে ভক্তি করতাম তাই নয়, চিনেছিলাম রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য ব'লে যার সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্তের কাছে: "মদ? খাক না, খাক না, কদিন খাবে?" এ-ও আমি পড়েছিলাম যে ঠাকুর গিরিশবাবুকে শুধু যে বলেছিলেন: "তোমার গুরু হ'য়ে গেছে" তাই নয়, বলেছিলেন থিয়েটার না ছাড়তে: "তোমাকে দেখে পরে লোকে অবাক্ হবে।"

কিন্তু টেনিসখেলা শেষ হ'তে দেরি হ'য়ে গেল! যখন দৌড়ে ঘরে গিয়ে জুতো খুলে হাত-মুখ ধুয়ে পিতৃদেবের বৈঠকখানায় হাজির হলাম, তখন গিরিশবাবু বিদায় নিতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমি ঘরে ঢুকেই তাঁকে গড় হয়ে প্রণাম করলাম।

গিরিশবাবু (দু'হাত জোড় করে): নারায়ণ! নারায়ণ! মণ্টু না?

আমি (সলজ্জে—বুক ঢিপ ঢিপ করছে): আজ্ঞে।

গিরিশবাবু (সস্নেহে): নির্মলের কাছে তোমার ভক্তি-বিশ্বাসের কথা শুনে যে কী আনন্দ হয়েছে বাবা, কী বলব? এই বয়সেই তাঁর কৃপা পেলে—!

পিতৃদেব (চমকে): কৃপা? কার?

গিরিশবাবু (উদ্দেশে প্রণাম করে): আর কার?—যিনি এযুগে এসেছিলেন প্রেমের ঠাকুর হ'য়ে আমাদের উদ্ধার করতে। দ্বিজুবাবু! কী বলব আপনাকে তাঁর কথা—তিনি মানুষ ছিলেন না।

বলতে বলতে চোখে জল! পিতৃদেব সসম্ভ্রমে মাথা নিচু করলেন।

গিরিশবাবু চ'লে গেলে পিতৃদেব আমাকে বললেন: "নির্মল তোর কথা গিরিশবাবুকে এত কী বলত রে?"

আমি (আমতা আমতা): কী আর বলবে? এই—এই দক্ষিণেশ্বর—বেলুড় মঠে যাওয়ার কথা।

পিতৃদেব (আমার দিকে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে): তুই কারুর কাছে মন্ত্র নিয়েছিস নাকি?

আমি (সহজ সুরে): না বাবা। (একটু থেমে) তবে আমার মনে হয় নির্মলদা গিরিশবাবুর কাছে মন্ত্র নিয়েছেন।

পিতৃদেব (চিন্তিত সুরে): তুই এর আগেও একদিন বলেছিলি যে গিরিশবাবুকে নির্মল তার গুরু করছে। সেদিন আমার বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু ক্রমশই মনে হচ্ছে যে, তুই ঠিকই ধরেছিস—নৈলে নির্মল এ ভাবে এককথায় চ'লে যেতে পারত না আমাদের মায়া কাটিয়ে।

আমি তৎক্ষণাৎ খবর দিতে ছুটলাম সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটে, কিন্তু শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি, নির্মলদা ঠিক সেই সময়েই গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে গিয়েছিলেন শান্তিপুরে। আমার মনে হয় সে-সময়ে নির্মলদা কলকাতায় থাকলে আমি একথা বলবামাত্র তিনি ছুটে এসে ক্ষমা চাইতেন পিতৃদেবের কাছে। মেসোমহাশয়কে গিয়ে বলতে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন: "এ-সংসারে দুর্বুদ্ধিকে উস্কে দিতে সবাই

মুখিয়ে থাকে মণ্টু, কিন্তু সুবুদ্ধির বেলাই যত গোল বাধে—যোগাযোগ হ'য়েও হয় না।"

কিন্তু গিরিশবাবুর কথা আরো একটু বলার আছে। তাই অবহিত হোন্।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি প্রিয় রামপ্রসাদী গানে আছে: "না দেখে তায়, শুনে কানে—মন গিয়ে তায় লিপ্ত হোলো।" অর্থাৎ অনুরাগের আগেই পূর্বরাগ, যে গায়: "তারে চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশি শুনেছি—মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।" এ আমার জীবনে উপলব্ধ সত্য, কাব্যকথা মাত্র নয়। সুভাষকে আমি ভালোবেসে ফেলি এম্‌নিই—চোখে দেখার আগে—আমার এক স্কুল-সতীর্থ নিবারণের মুখে তার অসামান্য মেধা ও চরিত্রের গুণগান শুনে—যে কথা আমি অন্যত্র লিখেছি। তবু এখানে কথাটা ফের পাড়লাম নিবেদন করতে যে এই বহু পুরাতন প্রসিদ্ধিটি জীবনে একাধিকবার উপলব্ধি করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

অবশ্য সুভাষকে বা শরৎচন্দ্রকে চোখে দেখার আগেই যেভাবে মনে প্রাণে বরণ ক'রে নিয়েছিলাম গিরিশবাবুকে ঠিক সেভাবে—সর্বান্তঃকরণে—ভালোবাসিনি আমি। কিন্তু তাঁর প্রতি একটু একটু ক'রে আমার মনে অনুরাগের পূর্বাভাস জেগে উঠেছিল তাঁকে চোখে দেখার আগেই। তাঁর ফটো অবশ্য আমি দেখেছিলাম কিন্তু সেটা অবান্তর—তিনি ছিলেন না বিবেকানন্দ কি রবীন্দ্রনাথের মতন গন্ধর্বকান্তি যাঁর ছবি দেখা বাঁশি-শোনারই সামিল ব'লে গণ্য হতে পারে। আমার মন টেনেছিল তাঁর গুরুভক্তি ও অটল বিশ্বাস। কথাটা একটু খুলে বলি কেন না "বিশ্বাস বনাম যুক্তি" তর্ক আমাকে বড় বেশি ভুগিয়েছে—আর এ-তর্কে ভক্তি বিশ্বাসের দিকে আমাকে ঠেলেছিলেন যে-কয়টি মহাজন তাঁদের মধ্যে গিরিশবাবুর স্থান কারুর চেয়েই কম নয়।

"কথামৃতে" তথা "রামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে" আমি পড়েছিলাম যে বিবেকানন্দ-প্রমুখ যুক্তিবাদী তার্কিকদেরকে ঠাকুর প্রায়ই ধমকাতেন এই ব'লে যে, বিশ্বাস চক্ষুষ্মান্ হয় না—স্বভাবে সে অন্ধ ব'লেই। কিন্তু আশৈশব যুক্তি ও বুদ্ধির গুণগান শুনে আসার দরুন "অন্ধ বিশ্বাস" কথাটা শুনতে না শুনতে মন আমার বেঁকে বসত। কাজে কাজেই ঠাকুরের ধমক আমাকে গায়ে মাখতে হয়েছিল—আমি স্বভাবে অবিশ্বাসী না হ'লেও খুঁৎখুঁতে ছিলাম ব'লে। গীতায়ও পড়তাম: "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" সবই তো বুঝি এবং যতই বুঝি ততই মন খারাপ। কিন্তু উপায় কী? স্বভাবে যে সংশয়ী আপ্ত-বাক্যের তিরস্কারে কি তার মতিগতির মোড় ফেরে?

স্বভাব বদলানোর দুটি মাত্র উপায় আছে: এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—যেমন ধরুন, যে ভূতে বিশ্বাস করে না সে ভূত দেখল স্বচক্ষে! দুই: তাদের সঙ্গে দহরম মহরম করা যারা ভূত দেখে ভূতুড়ে ব'নে গেছে।

এ-সম্পর্কে পিতৃদেবের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি মনে পড়ছে: "জানিস মণ্টু, একবার তোর জাঁকালো জনককেও জাঁক করার পরেই রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছিল 'যঃ পলায়তি স জীবতি' বলতে বলতে! হ'ল কি, আমি বড় গলা ক'রেই বলতাম বিলেতে যে ভূত ফুত সব বাজে কুসংস্কার কল্পনা···এই সব। হঠাৎ এক মস্ত সাহেব বৈজ্ঞানিক ধরল চেপে: 'বাজে? কোন্ যুক্তিতে শুনি?'—আমি বললাম: 'কারণ কেউ কখনো ভূত দেখে নি।'—'যদি বলি—আমি দেখেছি?'—'আমি বলব—আমি নিজে না দেখলে পরের মুখে ঝাল খেতে রাজি নই।'—'তথাস্তু, চলো আমার সঙ্গে—তোমাকে ভূত দেখাবই দেখাব, কেবল কথা দাও স্বচক্ষে ভূত দেখলে আমাদের সাইকিক রিসার্চ সোসাইটির সভ্য হবে?' আমি আর কথাটি নয়—আসছি ব'লেই দে চম্পট। বোকা হ'লেও বুদ্ধি আছে তো—হাঃ হাঃ হাঃ!"

এ-দৃষ্টান্তটি দিচ্ছি শুধু এই কথাটি পেশ করতেই নয় যে, কেউ কখনো দেখেনি এ-যুক্তির কাটান মেলে কেবল দেখায়, ঐ সঙ্গে বলতে যাচ্ছি আরো একটি জরুরি কথা: যে, দেখারো সর্ত আছে, শুধু দেখব বললেই দেখা যায় না। তবে যাঁরা এ-সর্ত পালন করতে নারাজ তাঁরা চলবেনই তো নাস্তিক্যের পথে। কিন্তু নাস্তিক হ'য়ে যে-বেচারি মনে শান্তি পায় না সে প্রায় সব সর্তই মেনে নেয় দেখবার লোভে—যেমন আমি নিয়েছিলাম—খানিকটা বাধ্য হ'য়েই বলব। একটু আগে বলেছি এ-সর্তের একটি হ'ল—যাঁরা দেখেছেন তাঁদের সঙ্গ করা—অর্থাৎ সাধুসঙ্গ। কথামৃতে পড়তাম পরমহংসদেবের উপদেশ—ভক্তি বিশ্বাস চাও তো সাধুসঙ্গ করো। ভাগবত তো সাধুসঙ্গের মহিমাকীর্তনে আত্মহারা:

মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ
সদ্যঃ পুনন্ত্যপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া—

কি না—"গঙ্গাজলে বার বার অঙ্গ ধুলে তবে মানুষ শুদ্ধ হয় কিন্তু সাধুরা স্পর্শমাত্রেই শুদ্ধিদান করেন।"

আমার জীবনে গিরিশবাবুর শুভাগমন হয়েছিল প্রথমে নাট্যকার হিসেবেই বটে, কিন্তু নির্মলদার নির্দেশে তাঁকে আমি দেখতে শিখি নতুন দৃষ্টি দিয়ে—তত্ত্বদর্শী ভক্তিমান্ হিসেবে। বলবেন হয়ত—এর নাম তো ঠিক সাধুসঙ্গ নয়! বাইরের

দৃষ্টিতে হয়ত নয়—কিন্তু তলিয়ে দেখলে কি চোখে পড়ে না যে ঘটকের ঘটকালিতেও সাধুর প্রতি এমন ভক্তি জাগতে পারে যার ফলে তিনি চোখের আড়াল থেকেও হন প্রায় জীবন্ত, প্রত্যক্ষ? কেমন জানেন? ধরুন, যদু ভালোবাসে মধুকে। মধু যদুর কাছে অষ্টপ্রহর সিধুর গুণগান করে। শুনতে শুনতে যদু মধুকে ভালোবেসেছে ব'লেই সেই প্রেমের প্ররোচনায় সিধুকে দেখতে সুরু করে মধুর চোখে—তার স্তব-স্তুতি শোনে মধুর কানে—এক কথায় সিধু বলতে মধুর মনে যে-শিহরণ জাগে একটু একটু ক'রে যদুর মনেও লাগে তার ছোঁয়াচ। এ আমার কথার কথা নয়। কারণ সত্যিই কথামৃত প'ড়ে আমি গিরিশবাবুর সম্বন্ধে কৌতূহলী হ'লেও তাঁকে ভালোবাসতে শিখি নির্মলদারই দীক্ষায়। তিনি গিরিশবাবুর স্তবে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে যখন আমার কাছে উদ্ধৃত করতেন ঠাকুরের সাধুবাদ যে, "গিরিশের বিশ্বাস পাঁচসিকে পাঁচ আনা, আঁকড়ে পাওয়া ভার"—তখন সে-উচ্ছ্বাসের ঢেউ প্রায়ই অজান্তে আমার বুকের তটে এসে লাগত। "শুধু কি তাই রে?"—বলতেন নির্মলদা উজিয়ে উঠে—"জানিস কি—গিরিশবাবুকে ঠাকুর কোনোরকম উপদেশই দিতেন না, বলতেন ও নিজেই সব কাটিয়ে উঠবে!" নির্মলদা আরো জোর দিয়ে বলতেন যে, গিরিশবাবুর সব ভার ঠাকুর নিয়েছিলেন গিরিশবাবু তাঁকে বকলমা দিয়েছিলেন ব'লে।

আমি: বকলমা কী জিনিস নির্মলদা।

নির্মলদা: তুই একটা—(অবজ্ঞাভরে) ইয়ে। বকলমা কী তাও জানিস না! বকলমা হ'ল—কী যেন বলে—হ্যাঁ letter of administration—অর্থাৎ অছি আর কি, তোর সম্পত্তি দেখবে শুনবে তোর পাঞ্জা পেয়ে তোর হ'য়ে সই ক'রে। অর্থাৎ তোর দুরবস্থা দেখে এক দয়ালু এগিয়ে এলেন সব ব্যবস্থা করতে।

আমি (সবিস্ময়ে): আপনি বলছেন কী নির্মলদা? ঠাকুরকে গিরিশবাবু ভার দিয়েছিলেন তাঁর পরকালের ব্যবস্থা করতে?

নির্মলদা (উষ্ণ): এতে তোর চোখ কপালে উঠে গেল কেন শুনি? পরমহংসদেব গিরিশবাবুর গুরু ব'লেই তো এ-ভার তাঁকে নিতে হবেই হবে। জানিস আজই সকালে গিরিশবাবু আমাকে কী বললেন!

আমি (সাগ্রহে): বলুন না ভাই!

নির্মলদা (ইচ্ছে করেই): নাঃ, বলব না তোকে—তুই যে দাম্ভিক—

আমি (মুচকে হেসে): আর আপনিই বুঝি বিনয়ের অবতার? হা হা হা—

নির্মলদা (এক মুহূর্তে জল) : হা হা হা ! নিয়েছিস বটে এক হাত ! তবে তোর সাতখুন মাপ, কেন না তুই এ-নাস্তিক আবহাওয়ায় মানুষ হ'য়েও পেরেছিস ঠাকুরের দিকে ঝুঁকতে। তোকে মুখে গাল দিলেও মনে মনে তারিফ করি অনেক সময়েই, জানিস ?

আমি (গ'লে গিয়ে) : আর আমি ? আমার মতন আর কে আপনার এমন নেওটো বলুন তো ?

নির্মলদা (আমার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে সস্নেহে) : জানি রে জানি। তোর আমার সম্বন্ধ তো ঐহিক নয় রে—পারমার্থিক।

(নির্মলদা থেকে থেকে এম্‌নি গালভরা সংস্কৃত বুলি কপচাতেন।)

আমি : তবে বলুন।

নির্মলদা : আচ্ছা শোন্, কিন্তু সুরধামের কাউক্কে বলিস নি—গিরিশবাবু আমাকে বলেন সাধক যে হবে তাকে সব আগে শিখতে হয় মন্ত্রগুপ্তি। (ফের ঐ গুরুগম্ভীর বুলি)

আমি (টুপ ক'রে) : তাই বুঝি আপনি কারুর কাছে বলেন না যে গিরিশবাবুকেই আপনি গুরু-বরণ করেছেন ?

নির্মলদা (এড়িয়ে গিয়ে) : বাজে কথা রাখ্। শোন্। যা বলছি বলিস নি কাউকে। যেমন ঠাকুর বলতেন না ধ্যান করবি মনে কোণে বনে, কাউক্কে জানতে দিবি না—তেম্‌নি এসব গুহ্য কথা—সবার জন্যে নয়। তোকে বলছি, কিন্তু তুই যদি কাউকে ঘুণাক্ষরেও বলিস—

আমি (ব্যস্ত হ'য়ে) : আঃ কী যে আপনি ! বলছি—

নির্মলদা : আচ্ছা আচ্ছা, শোন্ তবে বলি। গিরিশবাবু আমাকে অনেক কথাই বলেছেন পরমহংসদেবের সম্বন্ধে—তবে তুই যে মুখহল্‌সা—হল্ হল্ ক'রে সবাইকে ব'লে ফেলিস—আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে, শোন্। গিরিশবাবু বললেন (স্বর নিচু ক'রে) তিনি পরমহংসদেবের মধ্যে দেখেছেন—মা কালীকে—এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি। শুধু তাই নয়, আমাকে আজ বললেন কী জানিস ? বললেন : "নির্মল, বাবা ! তোমাকে কী বলব তাঁর করুণার কথা ? লোকে বলে ঘড়ি ঘড়ি : তিনিই বিবেকানন্দকে তৈরি করেছেন—সোজা মহিমা তাঁর ? কিন্তু বাবা, আমি প্রায়ই একে ওকে তাকে বলি যে ঠাকুরের মহিমার সব চেয়ে বড় প্রমাণ বিবেকানন্দ নয় রে নয় —সব চেয়ে বড় প্রমাণ আমি। কারণ বিবেকানন্দ ছিলেন বিরাট্ আধার।

আগুনের ফুলকিকে বাতাস দিয়ে গনগনে আগুন করা কষ্টসাধ্য হ'লেও সম্ভব। কিন্তু লোহাকে সোনা করতে পারে কেবল পরশমণি বাবা, আর কেউ নয় জেনো। তাই তো আমাকে তিনি গ'ড়ে তুললেন, এক তাল মাটি থেকে সুন্দর প্রতিমা গড়ার মতন—তিনি ছেলেবেলায় ছিলেন স্বভাব-পটুয়া—জানো তো?—পরের জীবনে অধমতারণ ক'রে হ'য়ে দাঁড়ালেন পতিত-পাবন, বুঝলে বাবা?" বলতে বলতে—সত্যি বলছি মণ্টু, বিশ্বাস কর—তাঁর চোখের জল উপছে পড়ল আজই সকালে!

তাঁর সঙ্গে আমার গিরিশবাবুর সম্বন্ধে এই ধরনের আরো কত কথাই যে হ'ত! আজ দুঃখ হয—যদি সেসব কথার একটা রেকর্ড রাখতাম তাহ'লে গিরিশবাবুর মহৎ উদার বিশ্রব্ধ চরিত্র সম্বন্ধে আরো কত কথাই যে তাঁর অকৃতজ্ঞ দেশবাসীকে শোনাতে পারতাম যাঁরা তাঁর ভক্তি বিশ্বাস প্রতিভার কথা আজ ভুলতে বসেছে।

কিন্তু নির্মলদার মাধ্যমে গিরিশবাবুর মহিমা শুধু যে আমিই নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম তাই নয়—পিতৃদেবকেও নির্মলদার গিরিশভক্তি খানিকটা প্রভাবিত করেছিল বৈ কি। কেমন ক'রে—বলবার চেষ্টা করব—যদিও ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো খুব সহজ নয়।

নির্মলদা সুরধাম ছেড়ে চ'লে যাবার আগে পিতৃদেব গিরিশবাবুর নাট্য-প্রতিভার ও অভিনয়নৈপুণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন বটে, কিন্তু গিরিশবাবুর ভক্তি বিশ্বাস শ্রদ্ধা গুরুভক্তি এসবের বিশেষ ধার ধারতেন না। নির্মলদাকে তিনি স্নেহ করতেন আন্তরিক; নির্মলদাও তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন বৈ কি; কিন্তু তবু গিরিশবাবুর সম্পর্কে শ্রদ্ধাসংকটের ফলে তিনি এককথায় সুরধাম ছেড়ে চ'লে যেতে পিতৃদেব শুধু যে মনে খুব আঘাত পেয়েছিলেন তাই নয়, খানিকটা চমকে গিয়েছিলেনই বলব—বিশেষ ক'রে আমার মুখে শোনার পরে যে নির্মলদা গিরিশ-বাবুকে গুরুবরণ করেছিলেন। এরই পরে তিনি মন দিয়ে কথামৃত পড়া সুরু করেন —একথা বলেছি আগের অধ্যায়ে। কিন্তু তাতে একটি কথার আভাস দেওয়া হয় নি: যে, গিরিশবাবুর প্রতি নির্মলদার গভীর ভক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁর মনকে গভীর নাড়া দিয়েছিল। যেমন অশ্রদ্ধার ছোঁয়াচে অশ্রদ্ধা জাগে তেমনি শ্রদ্ধার ছোঁওয়ায় জাগে শ্রদ্ধা, প্রেমের স্পর্শ—প্রেম। পিতৃদেব কথামৃতপাঠান্তে গিরিশবাবুর পরমহংসদেবের প্রতি ভক্তির কাহিনী নিয়ে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে আলোচনা

করতেন, কেন না স্বরধামে গিরিশবাবুর কথাপ্রসঙ্গে পরমহংসদেব-তর্পণে তিনি সত্যিই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এতদিন পর্যন্ত তিনি গিরিশবাবুকে নাট্যকার ও অভিনেতা ব'লেই মান দিতেন। নির্মলদার সঙ্গে তাঁরছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকে তিনি যেন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন সাধু গিরিশচন্দ্রকে, ভক্ত গিরিশচন্দ্রকে, গুরুদাস গিরিশচন্দ্রকে। এর পরে আর একটা ঘটনা হ'ল যার ফলে তিনি গিরিশচন্দ্রের ভক্ত ও ভাবুক রূপের মর্যাদা দিতে শিখলেন আরো বেশি ক'রে—এই নতুন চোখে তাঁকে দেখার দরুনই বলব। ব্যাপারটা এই—

গিরিশবাবু আমাকে আশীর্বাদ ক'রে পিতৃদেবকে নিমন্ত্রণ করেন তাঁর "শঙ্করাচার্য" নাটকটির অভিনয় দেখতে আসতে। ধর্ম সম্বন্ধে এইটিই তাঁর শেষ নাটক। এর পরে তিনি আর বেশিদিন দেহধারণ করেন নি।

পিতৃদেবের সঙ্গে আমিও শঙ্করাচার্য দেখতে গিয়েছিলাম। নাটকটি দেখতে দেখতে তাঁর মুখচোখের ভাব দেখে আমি আশ্চর্য হ'য়ে যাই। থেকে থেকে কেবল "আহা…আহা…"! আর দ্বিতীয় উক্তি নেই। মনে আমার কী যে পুলক জেগে উঠল!—কথামৃতের বটিকাই সক্রিয় হয়েছে—অবধারিত!

এ-সিদ্ধান্ত করার কারণ—পিতৃদেব ঠিক এর পরেই পরপারে ও ভীষ্ম লেখেন। পরপারে তাঁর প্রথম সামাজিক নাটক ভীষ্ম—পৌরাণিক। প্রথম পরপারের কথাই বলি। এ-নাটকটির মধ্যে অনেক আঙ্গিকী দুর্বলতা আছে একথা মানতেই হবে। শরৎচন্দ্র আমাকে পরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন প্রধান দুর্বলতাটি কোথায়। বলেছিলেন: "তোমার বাবা তাদের সঙ্গে ঘর করেন নি তো তাই জানবেন কেমন ক'রে যে গণিকারা ঠিক ওভাবে বদ্‌লে যায় না। এই জন্যেই পরপারে ড্রামা না হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেছে মেলোড্রামা।"

কথাটা তিনি ভুল বলেন নি। পরপারে বা ভীষ্ম নাটক হিসেবে রসোত্তীর্ণ হয় নি—যেমন হয়েছিল তাঁর মেবারপতন, পাষাণী, সীতা, চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, দুর্গাদাস, রাণাপ্রতাপ। (তাঁর তারাবাঈ নাটকটিও অতি চমৎকার যদিও এটি আজ পর্যন্ত অনাদৃত) কিন্তু তবু এদুটি নাটক আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে এই প্রথম তিনি ভক্তির দিকে মোড় নিলেন সর্বান্তঃ-করণে। পাষাণী ও সীতাতে ঠিক ভক্তির গুণগান নেই—আছে ভক্ত ও ঋষির নৈতিক মহত্ত্বের অপূর্ব অঙ্কন—ক্ষমার, সতীত্বের মহিমা। পরপারেতেই দেখতে

পাই প্রথম তাঁর অন্তর্নিহিত উদাসীর আত্মপ্রকাশ যে মা-র নামে মাতোয়ারা হ'য়ে গাইতে পারে :

চরণ ধরে আছি প'ড়ে একবার চেয়ে দেখিস না মা !···

কিম্বা

আর কেন মা ডাকছ আমায় ? এই যে এইছি তোমার কাছে !···

কিম্বা

এবার তোরে চিনেছি মা, আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি···

···ইত্যাদি অপূর্ব ভক্তির গান !

ভীষ্ম নাটকটির স্মৃতিমূল্য আমার কাছে কালাতিপাতে ক'মে গেলেও এ-নাটকটি আমি এখনো ভালোবাসি এইজন্যে যে এতেও তাঁর অসামান্য কাব্য প্রতিভা পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে···ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা···নীলাকাশের অসীম ছেয়ে···শ্রেণীর অপরূপ ভক্তিসঙ্গীতে আরো স্বতঃস্ফূর্ত হ'য়ে যেন ফুলের মতন সহজ আনন্দেই ফুটে উঠেছে। আমি জানি যে এযুগে খুব কম কাব্য কি নাট্যরসিকই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে ভক্তিসঙ্গীতেই গানের চরম বিকাশ। কিন্তু স্মৃতিচারণের লক্ষ্য তো তর্কাতর্কি বা আত্মমতপ্রতিষ্ঠা নয়—আত্মবিকাশের পথে যে-যে-প্রভাব এসেছে তাদের অঙ্কন, তাই আমি এখানে অকুতোভয়েই বলব যা আমার মনে হয় কাব্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ সম্বন্ধে।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে মানুষের সব চেয়ে বড় সম্পদ তার হৃদয়বৃত্তি—সহানুভূতি, শ্রদ্ধা, অনুকম্পা, দয়া, দরদ, প্রীতি, ভক্তি, প্রেম। এই সব হৃদয়বৃত্তির সবচেয়ে বড় উপজীব্য হ'ল ভাগবতী কৃপা। এ-কৃপা যখন আমাদের ব্যক্তিসত্তায় অবতরণ করে তখনই তারা সার্থক হ'য়ে ওঠে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদনে।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য : আবহমানকাল মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আধার যাঁরা তাঁরা সবাই বলেছেন একবাক্যে যে ভগবানই আমাদের অন্তিম লক্ষ্য ও সবার চেয়ে প্রিয় "—প্রেষ্ঠো ভবান্ তনুভৃতাং"—প্রভু তুমি দেহীর প্রিয়তম স্বজন, বলেছেন যে ভগবানকে না পেলে এ-জীবন থাকে দুঃখদা মায়া, তাঁকে পেলে এ-জীবন হয় আনন্দ-লীলা।

এ-দুটি উপপত্তি (premise) যদি মেনে নিই (মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই কারণ এ হ'ল আধ্যাত্মিক উপপত্তি, যুক্তিপ্রতিপাদ্য নয়) তা'হলে মানতেই

হবে যে, মানুষের হৃদয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তি যখন ভগবানের সঙ্গে পূর্ণমিলনে ধন্য হয় তখনই সে অঙ্গীকার করতে পারে—তার আগে নয়—

"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর !
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর !"

ভীষ্ম নাটকটির মধ্যে আমি পাই এই ভগবৎশরণাগতির রস—তাই এ-নাটকটি আমার প্রিয়—যদিও ভীষ্ম ভক্তিনাট্য হিসেবে গিরিশবাবুর শ্রেষ্ঠ ভক্তিনাট্যের সমগৌরবী নয়। তাছাড়া ভীষ্মেও অনেক অত্যুক্তি আছে যার ফলে সেও হয়ে দাঁড়িয়েছে, খানিকটা মেলোড্রামাই বলব।

কিন্তু পিতৃদেবের সাহিত্যের রসমূল্য-নির্ধারণ আমার স্মৃতিচারণের এলাকার মধ্যে পড়ে না। আমি শুধু এই সূত্রে দেখাতে চাচ্ছি যে নির্মলদা ও আমার মাধ্যমে তাঁর ভক্তিজীবন কিছু খোরাক পেয়েছিল—তাঁর দৃষ্টি ঐ দিক থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিল পারমার্থিক আলোকলোকে যার প্রধান উপজীব্য ভক্তিসুধার নিত্যরস—এবং ঐ দৃষ্টিবরের প্রেরণা না পেলে তিনি কৃষ্ণমহিমার মর্মজ্ঞ হ'তে পারতেন না, (দেবকুমার রায়চৌধুরীর দ্বিজেন্দ্র-জীবনী ৬১৮ পৃঃ) ঃ

"ভাবপ্রবণ বাঙালির প্রাণে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা—তা সে প্রকৃতই হোক, প্রক্ষিপ্তই হোক বা রূপকই হোক—চিরকাল আদরের জিনিষ, আরাধনার বস্তু। সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া কখনই অন্তরের সহিত আর কাহাকেও গ্রহণ করিবে না, করিতে পারে না। আমরা মহাভারতের কৃষ্ণ বা রামায়ণের রামকে দূর হইতে প্রণাম করিতে পারি। কিন্তু আরাধনা করিব, ধ্যান করিব, প্রেমভরে আলিঙ্গন করিব—ঐ বৃন্দাবনের চপল, ননীচোরা লীলাময়, বংশীধারী, প্রাণোন্মাদী রাসবিহারী শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরকে। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।"

তাঁর কাব্য তথা মানব-জীবনের এই শ্রেষ্ঠ বিকাশের উন্মেষলগ্নেই কাল তাঁকে আমাদের কাছ থেকে হরণ ক'রে নিয়ে গেল—নৈলে আমরা তাঁর কাছে পেতাম আরো কত অনুপম ভক্তির নাটক—শরণাগতির গান—মহৎ চরিত্র !

তেইশ

গত অধ্যায়ে উদ্ধৃতি দিয়েছি পিতৃদেবের উচ্ছ্বাস কৃষ্ণ সম্বন্ধে। তাঁর শেষ জীবনে হঠাৎ তাঁর অন্তর্নিহিত বৈষ্ণব ভক্তটি সব বাধা কাটিয়ে গান গেয়ে উঠল (পদগুলি আদ্যন্ত সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দে বাঁধা) :

নূপুর-শিঞ্জিত নৃত্য-বিমোহন কপট চপল চতুরালি !
প্রেম নিমীলিত নয়ন বিলোল কদম্বতলে বনমালী !

মানুষের বহির্জীবন প্রায়ই তার আসল স্বরূপটিকে ঢেকে রাখে যেমন—শাস্ত্রীয় উপমা—মায়া ঢেকে রাখে মায়েশকে। সাধুসঙ্গ (অথবা গুরুপ্রসাদ) সাধনা ও কৃপা এই তিনটি শক্তিই প্রধানত আমাদেরকে মোহমায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে অজ্ঞানের ঘেরাটোপ খুলে দেয়। পিতৃদেবের শেষ জীবনে তিনি খানিকটা পরমহংসদেবের কৃপায়ই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সংশয় থেকে স্থায়ী প্রত্যয়ে, অস্বীকার থেকে অটল ভগবদ্ভক্তিতে। বাঁধা-ধরা যুক্তির পথে একথা আমি প্রমাণ করতে পারি না মানি। কিন্তু তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে খোলা মন ও শ্রদ্ধা নিয়ে যাঁরা এ-স্মৃতিচারণ পড়বেন (যদিও এ-শ্রেণীর ধর্মপ্রসঙ্গ আজকের দিনে হয়ত সেকেলে ব'লেই অগ্রাহ্য হবে নব্য বিচক্ষণদের কাছে) তাঁরা খানিকটা আঁচ পাবেনই পাবেন ভগবৎকৃপা কীভাবে সক্রিয় হয় নানা প্রণালীর মধ্যে দিয়ে।

বলেছি, আমাদের বহির্জীবনের নানা তথ্য প্রায়ই ভুল বোঝায়। এর কারণ : আমাদের বাইরের পরিবেশ গ'ড়ে ওঠে অনেক কিছু দৃশ্যত আকস্মিক (accidental) যোগাযোগে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের অন্তরলোকেই ভাগবতী চেতনা থাকে গুপ্ত হ'য়ে —যে নিয়তির চাপে হেরেও হারে না—বাইরের প্রতিকূল পরিবেশকে মেনেও মানে না। এই চেতনার আত্মপ্রকাশের প্রথম চিহ্ন—তৃষ্ণা বা জিজ্ঞাসা। কিন্তু এ-জিজ্ঞাসা সবার মনে জাগে না একভাবে। কারুর মনে জাগে দেরিতে। কারুর মনে বা হঠাৎ বিপ্লব ঘটিয়ে সব কিছু তছনছ ক'রে দিয়ে যায়।

আমার বালক মনে এই শেষের অঘটনই ঘটেছিল—যার ফলে ঠাকুরের কৃপায় আমার নাস্তিক পরিবেশের সব বিদ্রোহ-বাঁধই ভেসে গেল হঠাৎ-জাগা সরল ভক্তি-প্লাবনের তোড়ে—আর অমনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব হ'য়ে উঠলেন আমার জীবনের সর্বেসর্বা—তাঁর কথামৃতের সুধার কাছে কাব্য নাটক গানের রস হ'য়ে গেল বিস্বাদ। নির্মলদাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম এ-অসম্ভব কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল ? তিনি

মুখ টিপে হেসে বললেন: "গিরিশবাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রে তোকে উত্তর দেব।" গিরিশবাবুর কাছ থেকে ফিরে বললেন: "তিনি হেসে শুধু আওড়ালেন গীতার একটি শ্লোক:

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং
আশ্চর্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবৎ চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

কেহ দেখি' তারে লয় বিস্ময়ে মানি!
কেহ বলে: সে যে অপরূপ বিস্ময়!
কেহ বিস্মিত হয় শুনি' তার বাণী!
জানাশোনা পারে তবু সে অজানা রয়।"

আমি এ-সমস্যা নিয়ে আর কারুর কাছে যাই নি, কারণ গিরিশবাবুর কথা আমার মন নিয়েছিল: আমি তাঁর উত্তরটিকে ব্যাখ্যা করেছিলাম মনের মতন ক'রে, বলতাম মনে মনে—যাঁর কাণ্ড সবই অদ্ভুত তাঁকে বুঝবে কে?

প্রায় বিশ বৎসর পরে শ্রীঅরবিন্দকে লিখি একথা পণ্ডিচেরিতে। তিনি এ-হেঁয়ালির ব্যাখ্যায় শুধু লিখেছিলেন যে আমার হৃদয় বংশীধরের ঘরছাড়া বাঁশি শুনেছিল এই জন্যেই যে স্বভাবে আমি ছিলাম উদাসী: "Your destiny is to be a Yogi" আমি প্রথমে তাঁর এ-ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করতে পারিনি। একবার তাঁকে এমন কথাও লিখেছিলাম যে, আমার স্বভাব সম্বন্ধে তাঁর ভুল হয়েছে কেননা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলেছেন (কালিংপঙে ১৯৩৮-এ) "আর কেন দিলীপ? এবার আশ্রমবাস ছেড়ে বেরিয়ে এসে গান ক'রে ফের মাতাও সবাইকে। নির্জনে ব'সে ধ্যান-ধারণা—ও হ'তে পারে শ্রীঅরবিন্দের মতন জ্ঞানীর স্বধর্ম, তোমার আমার নয় যারা স্বভাবে শিল্পী।" আর্টিস্ট কথাটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন যোগীর প্রতিপক্ষ স্বরূপ। শ্রীঅরবিন্দ একথার উত্তরে আমাকে যা লেখেন তা অনামীর দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশ করেছি রবীন্দ্রনাথের নাম গোপন রেখে। তার মোট কথাটা এই যে রবীন্দ্রনাথ আমাকে চিনতে পারেননি, কেননা আসলে আমি আগে যোগী পরে আর সব—গুণী, কবি, সাহিত্যিক, সুরকার, রসিক। একথা তিনি একাধিক

পত্রে লিখেছিলেন। এখনো আমার এ-বিষয়ে সংশয় হ'ত হয়ত যদি না গত কয়েক বৎসরে (১৯৫০-এ গুরুদেবের দেহান্তের পরে) ইন্দিরার মাধ্যমে অনেক কিছু চাক্ষুষ করতাম যা অভাবনীয়। সে সব কথা হয়ত পরে কোনোদিন লিখব "বয়স্কের স্মৃতি" (বৃদ্ধ নাই বললাম) বা "অঘটনের রাজ্যে" নাম দিয়ে—কারণ লেখাটাও আমার অন্যতম স্বধর্ম ব'লে আমি জেনেছি। তাই নিষ্পরোয়া হ'য়ে বলি যা বলছিলাম—অন্তত বাল্য-কাণ্ড যখন সুরু করেছি তখন সারা না করলে লঙ্কাকাণ্ড কি উত্তরকাণ্ডে পৌঁছানোর আশা দুরাশা।

তবু এ-কথার উল্লেখ করলাম আমার যোগিসম্ভব যোগ্যতাকে পেশ করতে নয়—শুধু জানাতে যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি আমার এ-ধরনের নাড়ীরটান গ'ড়ে উঠল কেমন ক'রে আজো আমি ভেবে পাইনে। কৈশোরে যখন কলেজে পড়ি তখন আমার এক তীক্ষ্ণধী প্রিয়বন্ধু একবার আমাকে আক্রমণ করেন আমার ধর্মবিশ্বাস নিয়ে। তিনি নিজেকে "নাস্তিক" বলেন আজও। সেদিন তিনি যখন ধর্মের জাল-জালিয়াতি নিয়ে তাঁর নিশিত শরসন্ধান সুরু করলেন তখন আমি তর্কে তবু যাহোক কোনোমতে স'য়ে ছিলাম, কিন্তু যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও নিশানা ক'রে বাক্যবাণ বর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন তখন আমি সত্যিই কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। আমার নাজেহাল অবস্থা দেখে তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন বৈ কি, কিন্তু তার চেয়েও বেশি হয়েছিলেন বিস্মিত! কারণ আমাকে তিনি বুদ্ধিমান্ কিশোর ও গুণী গায়ক ব'লেই মনে করতেন, ভালোও বাসতেন আমাকে—অবশ্য নিজের মতন ক'রে—কিন্তু আমি-যে সত্যি ধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণকে এতখানি বুকের দরদ দিয়ে দেখতে পারি তা তিনি ভাবতেই পারেন নি।

এ-বন্ধুটির কথা উল্লেখ করলাম কারণ আমার কৈশোরের তথা যৌবনের বন্ধুদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন এঁরই দলে—অর্থাৎ, বুদ্ধিবাদী—ইনটেলেক-চুয়াল। এই আবহাওয়াযই আমি আশৈশব গ'ড়ে উঠেছি। সাহেব পুরাণে বলে মানুষকে তৈরি করে দুটি প্রভাব—পরিবেশ (environment) ও বংশ (heredity)। হাল আমলে এমন অদ্ভুত কথাও প্রতিষ্ঠা পেতে আরম্ভ করেছে যে যুগই তৈরি করে মানুষকে—অত্যাধুনিক বিজ্ঞম্মন্যরা আর এক পর্দা সুর চড়িয়ে বলা সুরু করেছেন: "আর যুগকে তৈরি করে আর্থিক পরিবেশ—economic forces." এ-উক্তিটির ষোলো কড়াই কানা বলি না; শ্রীঅরবিন্দ ঠিকই লিখেছেন যে এমনকি অতি নাবালক দৃষ্টিভঙ্গির পিছনেও কিছু-না-কিছু সত্য থাকেই থাকে। তাই এটুকু মেনে নিতে

আমি নারাজ নই যে, আমরা যে-আবহাওয়ায় ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠি সে-আবহাওয়ায় আমাদের মনের প্রাণের কয়েকটিমাত্র সম্ভাবনা ও প্রবণতা জেগে ওঠে। ধরুন আমি পরে অঙ্কশাস্ত্রে ভালো ছেলে ব'লেই গণ্য হই—তাই কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন যদি গাণিতিক পরিবেশে থাকতাম তবে হয়ত অঙ্কশাস্ত্রে নাম করতাম। কিম্বা যদি দাবাড়ুদের সঙ্গে মিশতাম তবে দাবায় আমার সহজ নৈপুণ্য আমাকে নামকরা দাবাড়ু করত। কিম্বা যদি ওস্তাদ বনতাম—তবে রেডিওতে ফি হপ্তা গেয়ে গণমনের জয়ধ্বনির সেলামি পেতাম, কি টকির টপে উঠে পেতাম টেকচাঁদের অভিনন্দন। সবই মানি, কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থাকেই থাকে—যুক্তি যার কোনো হদিশই দিতে পারে না—যে, একক নির্মলদার প্রভাব কী ক'রে আমাকে তাঁর চেয়ে ঢের বেশি পরিণত ও জোরালো প্রভাব থেকে ছিনিয়ে নিল—আমার বুদ্ধিবাদী আবহে দিনে-দিনে তিলে-তিলে গ'ড়ে ওঠা যুক্তিতর্কপ্রীতি কেমন ক'রে হার মানল এই একটি নাবালকের প্রভাবে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে যখন বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায় তখন বুঝি —কেন বুদ্ধি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে এলেও দৃষ্টি যতই গভীরে পৌঁছয় মানস-চক্ষু ততই ঝাপসা দেখে। ডুব সাঁতার দিতে গেলে যতই গভীরে ডুবি ততই বাইরের আলোর তেজ ক'মে আসে—ডুবুরির মুখোস প'রে আরো নিচে নামলে দেখি বাইরের আলো অবলুপ্ত—সব কালোয় কালো। ঠিক তেমনি, আমাদের অন্তরলোকের গহনে যতই তলিয়ে যেতে থাকি—ততই দেখি সেখানে বুদ্ধির আলো কোনো কাজই দেয় না, অথচ সত্যি ডাকার মতন ডাকলে ভাগবতী কৃপার সাড়ায় আর একটা আলো ফুটে ওঠে যা পথ দেখায়, বলে : "যে-মশাল এতদিন তোমাকে পথ দেখিয়েছে সে-মশাল এখানে মেকি টাকার মতনই অচল, এখানে তোমাকে হাত পাততে হবে এক গভীরতর আলোর কাছে—"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—কি না বচন ও মন যেখানে অথই জলে।

"তথাস্তু—কিন্তু কী ভাবে এ-আলো পথ দেখাবে শুনি?" মন প্রশ্ন করে সভয়ে। অমনি উত্তর পাই :

"যুক্তির আলো যেভাবে দেখায় সেভাবে নয়—গোনাগুন্তি ভাবনা-চিন্তার পথে নয়—সরল প্রার্থনার পথে, অনাসক্তির সাধনার পথে, ধ্যানের নিথর নির্দেশের পথে—সর্বোপরি ভক্তের ব্যাকুল ডাক ও ভগবানের দয়াল সাড়া দেওয়ার পথে।"

এই দৈববাণী-ই শোনালেন শ্রীরামকৃষ্ণ—আর যেই আমি শুনলাম অমনি মন আমার উঠল উজিয়ে—কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো : "ঈশ্বর-দর্শনই

জীবনের উদ্দেশ্য…তাঁকে না পেলে কিছুই হ'ল না বাবু…আগে তাঁর চাপরাশ পাও তবে লোকশিক্ষা দিতে ছুটো, নৈলে কে তোমার কথা শুনবে?…জগৎ কি এতটুকু গা যে তুমি চাও তার উপকার করতে? ভগবানের সঙ্গে দেখা হ'লে যদি তিনি বর দিতে চান কী চাইবে শুনি?—আরো স্কুল, ডিস্পেন্সারি, হাসপাতাল ক'রে দিন ঠাকুর? না, চাইবে পরম জ্ঞান, শুদ্ধা ভক্তি—যা পেয়ে কর্মে নামলে আর ভয় থাকে না—হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে কাঁঠালের রসে হাত চটচট করে না আর।…" কত বলব? তাঁর প্রতি বাণীই যে কী অপরূপ সুরে আমার বুকের তারে বেজে উঠত ব্যাখ্যায় বোঝাবো কেমন ক'রে? আর একথা যতই ভাবি ততই মনে হয়: "না না না—ও একটা কথাই নয় যে, আমরা শুধু সমসাময়িক সমাজের হাজারো শক্তির খেলার পুতুল; উপনিষদের এই কথাই ঠিক যে ঠাকুর যাকে চান সে-ই ফেরে তাঁর দিকে; কৃপা যাকে বরণ করে সেই তাঁকে সত্যি বরণ ক'রে হয় কৃপাধন্য, আপ্তকাম; 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—এইই হ'ল আসল কথা, বাকি সবই—বাহ্য, অবান্তর, আকস্মিক, যা কালপ্রসূত তা কালেই লীন হয়; থাকে শুধু সেই আন্তর সত্তা যে চিরন্তন, অপরিণামী, অচল, যে 'আপনি হাসে আপনি গায় আর আপনি দেয় করতালি'। এই সত্তা কখন যে কাকে কোন্ পথে চালাবে কেউ জানে না এক সেই সর্বান্তর্যামী ছাড়া—যিনি বুদ্ধিবাদীদের গুরুগম্ভীর ছককাটা, ব্যবচ্ছেদ, মাপজোপের কিছু দূর পর্যন্ত অনুমোদন করলেও এ-সব বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলির নাগালের বাইরে থেকেই চালান জগৎচক্রকে—অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্—the Light of lights, the Cause of causes, the King of kings, the Leader of leaders: তিনি যুগে যুগে তাঁর প্রিয় প্রতিনিধি সন্তানদের মুখ দিয়ে কথা কন—শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁদের মধ্যে একজন সেরা প্রতিনিধি। যে ক'রেই হোক তাঁকে আমার বালক মন এক আঁচড়ে চিনে নিয়েছিল যুগাবতার ব'লে, কারণ আমার স্বধর্ম ছিল সন্ধান—আর চাইতাম সত্যি ভক্তিকেই বটে—যে নিত্য করে অসাধ্য সাধন। নৈলে কি মানুষ যুগে যুগে হাজারো বারণের বেড়াজাল কেটে উধাও হ'তে পারত অকূল বাঁশির সেই ঘরছাড়া ডাকে যার রেশ আজো তার জের টেনে চলেছে, গেয়ে:

আরো কাছে আয় ওরে, আরো আছে আয়!
সেও তোর পথ চেয়ে—যে তোরে কাঁদায়।

কিন্তু এ-জাতীয় প্রতীতি যুক্তিসহ নয়। যাকে আমরা সাবধানী সুবুদ্ধি বলি

সে এই অকূল বাঁশিকে কুড়াকই বলে। আমি নিজের মতিগতির ওঠাপড়া ভয়-ভাবনার পর্যালোচনায় যে-আলো পেয়েছি সে খতিয়ে আমারি পথের পাথেয়—আমারি নিয়তি-নির্দিষ্ট আলো।

তাই আজ মনে হয় যে আমি এই অচিন পথের পথিকরূপেই চিহ্নিত হয়েছিলাম ভগবানকে চাওয়াই আমার স্বধর্ম ব'লেই—শ্রীঅরবিন্দের এ-নির্দেশ মিথ্যা নয়। তিনিই ঠিক চিনতে পেরেছিলেন আমার স্বরূপকে স্বভাবকে—যা রবীন্দ্রনাথ পারেননি। তিনি আমাকে কল্পনা করেছিলেন তাঁর কবি মন দিয়ে ব'লে—তাঁর ভাষায়—"আপন মনের মাধুরী মিশাযে আমারে করিয়া রচনা।"

আর ঠিক সেই জন্যেই শৈশবেই আমি কৃষ্ণের দিকে এত আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কৃষ্ণের আমি কীই বা বুঝতাম সে-বয়সে?—না, সে-বয়সেই বা বলি কেন—কতটুকু বুঝি কতটুকু জানি সে অচিন-চিরচেনা, অগাধ বহুবাঞ্ছিতের—আজ চল্লিশ বৎসর ধ'রে তাঁকে ডাকাডাকির পরেও? শুধু এইটুকু জেনেছি নিঃসংশয় উপলব্ধিতে যে, পেয়েছি তাঁর দুর্লভ কৃপা যার জাদুস্পর্শেই জীবনে আমার ঘটল বিপ্লব—"আপনার যারা হয়ে গেল পর, পর হ'ল আপনার।"

আপনার যারা পর হ'য়ে গেছে ভাবতে আজও ব্যথা বাজে বৈ কি, কিন্তু এ ছাড়া অন্য কীই বা হ'তে পারত? এইই যে জীবনের ধর্ম: যারা স্বভাবে সমধর্মী তারাই তো পরস্পরের সবচেয়ে কাছে আসতে চাইবে আত্মার আত্মীয় হ'য়ে—যারা নয় তারা চলবেই চলবে তাদের নিজের নিজের পথে—কেউ বা শিল্পের, কেউ বিজ্ঞানের, কেউ চিন্তার—এককথায় সংসারের চিরন্তন কামনা বাসনা সুখ দুঃখ হাস অশ্রুর আলো-আঁধারী পথে। নির্মলদা ছিলেন আমার আত্মার আত্মীয়দের অন্যতম ব'লেই না তিনি দেখা দিতেই আমরা হাত মিলিয়ে বলেছিলাম: ঠিক্, এই পথই আমাদের পথ—ভগবানের পথের পথিক হ'য়েই আমাদের হবে পথ চলতে—যে যা বলে বলুক! তাই নির্মলদা পরে সংসারী হন একথা বাইরের—মানে তথ্যের—দিক দিকে সত্য মেনেও বলব যে তিনিও স্বভাবে উদাসীনই ছিলেন। গীতার কথা আমি সর্বান্তঃকরণে মানি যে, "কল্যাণকৃৎ-এর দুর্গতি হ'তেই পারে না" এবং সে যদি ঝোঁকের ভুলে পথভ্রষ্টও হয় তবু তার ভয় নেই—সে পরজন্মে "শুচি ও শ্রীমন্তের গৃহে" জন্ম নিয়ে ফের ধরবে তার মাঝপথে হারানো খেই। তাই তো শেষ জীবনে বহু দুঃখ পেয়েও নির্মলদার মুখের অনুপম হাসিটি নিষ্প্রভ হয়নি, তিনি বলতেন সমানই প্রত্যয়ের প্রস্বনে: "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

নির্মলদার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত পক্ষপাত-বশেই এ-উচ্ছ্বাস নয়। একথার স্বপক্ষে একটি পরম প্রমাণ আমি পেয়েছি আমার জীবনের আর এক সন্ধিলগ্নে (যাকে বলে at the parting of the ways) ১৯২৮ সালের শেষে—যখন আমি আমার সাংসারিক সব স্বপ্ন আশা কামনা বিসর্জন দিয়ে বৈরাগী হ'য়ে শ্রীঅরবিন্দের চরণে আশ্রয় নিই।

সে-কাহিনী বলবার সময় হয়নি এখনো, তাই শুধু এইটুকু বলি যে সে-সময়ে যখন আমি ঐ ঘরছাড়া বাঁশির ডাকে সব ছেড়ে অকূলের অভিসারকে বরণ করি, তখন আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই ছিলেন আমার বিপক্ষে, কেবল নির্মলদার সে কী আনন্দ! আমি পণ্ডিচেরি পৌঁছনর পরে তাঁর এক চিঠি পাই। ছোট চিঠি কিন্তু কী সুন্দর, নিটোল মর্মস্পর্শী! তিনি লিখেছিলেন:

"স্নেহের মণ্টু, তুমি যা পারলে আমি পারিনি ভাই। তাই আজ শুধু আমার আশীর্বাদ নয়, প্রণামও নিও তুমি। এ-চিঠির কথা কাউকে বোলো না ভাই, লক্ষ্মীটি! —অন্তত যতদিন আমি বেঁচে আছি। শুধু তোমার আমার মধ্যেই থাক্ আমাদের আত্মার আত্মীয়তার কথা। ধন্য তুমি! কী আনন্দ! মনে পড়ে কি তোমার ঠাকুরের গান:

'ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি?'

তাঁর এ-আনন্দের কথা এতদিন ছিল তোমার শোনা কথা, আজ নিশ্চয় চোখে দেখেছ? ······ইতি তোমার স্নেহবদ্ধ নির্মলদা।"

পরে শুনলাম মৃত্যুকালে তিনি ঠাকুরের—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের—ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে তাঁর নাম শুনতে শুনতে মহাপ্রয়াণ করেন—তাঁর রাঙা পায়ে ঠাঁই পেতে। পেয়েছেন নিশ্চয়। ঠাকুরকে যে চিরজীবন ভালবেসে এসেছে ঠাকুর তাঁকে ফেলতে পারেন কখনো? যেদিন তাঁহার মহাপ্রয়াণের খবর পাই মেঘেনদার টেলিগ্রামে, সেদিন নিভৃত রাতে চোখের জলে তাঁকে প্রণাম জানিয়েছিলাম ঠাকুরের ছবির সামনে:

ভ্রান্তি আঁধারে দিয়েছিলে তুমি দিশা,
"কথামৃতের" বাণীবাহ নিরুপম!
তাহারি প্রসাদে পোহাল আমার নিশা,
ওগো আত্মার আত্মীয়! নমো নমো!

চব্বিশ

পিতৃদেবের তার্কিক থেকে ভক্তরূপে রূপান্তর শেষের দিকে খুব দ্রুতবেগে হয়েছিল প্রধানতঃ দুটি কারণে: এক, নির্মলদা সুরধাম ছেড়ে চলে যাওয়ার ফলে তাঁর মনে আঘাত লাগে—আরো আমার কথা ভেবে। তিনি তো জানতেন নির্মলদাকে আমি কোথায় বসিয়েছিলাম! দুই: নির্মলদার নিষ্ক্রমণের পরে "কথামৃতে" গিরিশবাবুর বিশ্বাস ও ভক্তির কথা প'ড়ে তাঁর গ্রহিষ্ণু উদার মনে একটু অনুতাপ মতন এসেছিল। ভুল স্বীকার করতে তিনি কোনদিনই পিছপাও ছিলেন না। এর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দুর্দৈবটি ঘটে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতান্তরে মনান্তর নিয়ে। এক্ষেত্রে সত্যের খাতিরে আমি বলতে বাধ্য যে, "কাব্যে দুর্নীতি"-কে উপলক্ষ ক'রে রবীন্দ্রনাথকে তিনি যে অশোভন আক্রমণ করেছিলেন তাকে কোনো দিক দিয়েই সমর্থন করা যায় না, বড়-জোর এইটুকু বলা চলে যে ঝোঁকালো মানুষ রোখের মাথায় যে কাজ ক'রে বসেন তার শেষ পরিণতি কোথায় তা তিনি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারেন না। তাই পিতৃদেব গোড়ায় বুঝতে পারেন নি তাঁর কর্মফল তাকে কী ভাবে ভোগাবে শেষ পর্যন্ত। লোকেনকাকা দেবকুমারবাবুকে এসম্বন্ধে যে পত্র লেখেন তাতেও এই ধরনের যুক্তিই পেশ করেছেন: "সোনার তরী নিয়ে দ্বিজুর সঙ্গে আমারই ঘোর বাদবিতণ্ডা হয়। আপনিও জানেন—তারি ফলে উনি 'কাব্যে দুর্নীতি' প্রবন্ধটা লিখেছিলেন। কিন্তু কি কুক্ষণেই তিনি এটা লিখলেন!—তাঁর উদ্দেশ্য না বুঝে কয়েকজন দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক তাঁকে নাস্তানাবুদ করতে লাগলেন। দ্বিজু রবিবাবুর real admirer ছিলেন—তাঁকে রবিবিদ্বেষী বলা বেয়াদবি। He never actually meant anything bad when he wrote it: তবে অত রোখালো ভাবে চিত্রাঙ্গদা ও রবিবাবুর কথা না বলাই উচিত ছিল।—ঐখানেই তাঁর দোষ হয়েছে, কিন্তু দ্বিজু যখন যা-ই ধরতেন half-heartedly করতে পারতেন না। তাঁর স্বভাবই সে-বিষয়ে বাধা ছিল। ব্যাপারটা যে শেষে এমন শোচনীয় দাঁড়াবে তখন জানলে সাত তাড়াতাড়ি তাঁকে ওসব কথা ছাপতে দিতাম না কখনই।" (দ্বিজেন্দ্রলাল—৫৩১ পৃষ্ঠা)

লোকেনকাকা দুজনকেই গভীর ভালোবাসতেন তাই তিনি ঠিক নিদানটিতে পৌঁছেছিলেন যে, পিতৃদেব সেই ঝোঁকালো প্রকৃতির মানুষ যারা কোন কাজে আগুয়ান্ হ'লে চরমপন্থীই হ'য়ে ওঠে—মাঝপথে থামতে পারে না। তাছাড়া

লোকেনকাকার একথাও অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে, পিতৃদেব অন্তরে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার গভীর ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মনান্তরের পরেও মৃত্যুর কিছু আগে তিনি দেবকুমারবাবুকে একটি পত্রে লিখেছিলেন: "রবিবাবুকে সাহিত্যিক সম্মিলনের সভাপতি করায় 'বঙ্গবাসী' তোমার উপর অত নারাজ হইয়া চটিয়া উঠিলেন কেন জানি না। আমি যদিও রবিবাবুর ঐসব লালসামূলক রচনাবলীর বিরোধী তবু একথা আমি মুক্তকণ্ঠেই মানি যে, বর্তমান সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনিই সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি এবং তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার সঙ্গে এখন আর কাহারো তুলনাই হইতে পারে না।" (দ্বিজেন্দ্রলাল—৪৪৯ পৃষ্ঠা)

এই জন্যেই তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন যখন রবীন্দ্রনাথ এ-বাতবিতণ্ডার পরে আমাদের এখানে আসা ছেড়ে দিলেন। তবু তিনি আশা ছাড়েন নি যে বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলন ঘটবে—যেকথা আমি রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্রে লিখেছিলাম —"গোরা" সম্বন্ধে পিতৃদেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কথা ব'লে। তা থেকে দুটি লাইন উদ্ধৃত করি: "বস্তুতঃ এত সুন্দর সামাজিক উপন্যাস কদাচিৎ নয়নগোচর হয়…ইহা শুদ্ধ উপন্যাস নহে, ইহা ধর্মগ্রন্থ।…এ-উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের গৌরব।"

যাঁকে তিনি এত শ্রদ্ধা করতেন সেই রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব তিনি হারালেন ঝোঁকের মাথায় তাঁকে অন্যায় আক্রমণ ক'রে! আজো মনে পড়ে আমার একটি অবিস্মরণীয় দিনের কথা। রবীন্দ্রনাথ সেদিন আমাদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাসায় এসে "সে যে আমার জননী রে" গানটি গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। গানের শেষে যখন পিতৃদেব তাঁকে আবিরে রাঙিয়ে দেন তখন কবিগুরু হেসে বলেছিলেন: "আজ দ্বিজেন্দ্রবাবু শুধু যে আমাদের মনোরঞ্জন করেছেন তাই নয়—আমাদের সর্বাঙ্গ রঞ্জন করলেন।" (দ্বিজেন্দ্রলাল—৪১১ পৃষ্ঠা)

রবীন্দ্রনাথকে সেই আমি প্রথম দেখি। আজো মনে পড়ে অনিন্দ্যকান্তি কবির লালে-লাল-হ'য়ে-ওঠা প্রতিভাদীপ্ত মুখের সে অপরূপ শোভা! কবির উক্তিটিও পিতৃদেব কতবারই যে সগর্বে উদ্ধৃত করেছেন আমাদের কাছে! অথচ তবু কী গ্রহবৈগুণ্যের চক্রান্তেই যে ঘটল এ-অঘটন—কে বলবে?

মতান্তর থেকে মনান্তর ও মনান্তর থেকে বিচ্ছেদ ঘটল কী ভাবে সে নিয়ে আর ফলাও ক'রে লিখতে যাওয়া এখন অনাবশ্যক। সাময়িক আন্দোলনের ফলাফলও সাময়িক ব'লে তাকে জীইয়ে রাখতে না চেয়ে ডিশমিশ করাই সমীচীন। আজ শুধু আমি দু একটি কথা লিখতে চাই যার কিছু সার্থকতা আছে ব'লে মনে করি।

প্রথম কথা এই যে, পিতৃদেব রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করার পরে মাথা ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছিলেন তিনি অন্যায় করেছেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন—তাই একথা সরলভাবেই দেবকুমারবাবুর কাছে স্বীকার করেছিলেন। দেবকুমারবাবুর এ-সম্বন্ধে অনেক কিছুই লিখেছেন, আমি কেবল একটু সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হব :

"সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার কাছে গেলাম। দেখি—তখনো তিনি শুষ্কমুখে বসিয়া আছেন। সমবেত বন্ধুরা নানাজনে নানারকম হাসি-তামাশা করিতেছেন কিন্তু তিনি নীরব, বিমর্ষ, চিন্তান্বিত। আমি যাইবামাত্র গৃহের বহির্দ্বার পর্যন্ত উঠিয়া পার্শ্ববর্তী নিভৃত বারান্দায় আসিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন: 'তোমার কথাই ঠিক। সত্যিই আমার অত্যন্ত ভুল হ'য়ে গেছে। আমি আর এমন কাজ করব না।…' একটা মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া (শব্দটা আজো যেন আমার কানে লাগিয়া আছে!) সত্যনিষ্ঠ বন্ধু আমার বলিলেন : 'আমার ভিতরটা যেন জ্বলছে।…তর্ক ক'রে আমি হয়ত এখনো প্রমাণ করতে পারি যে, কাজটা কিছু দোষের হয় নি। কিন্তু (বুকে হাত রাখিয়া) এই খানেই যে সব তর্কের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত! এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী আছে?"

এইই হ'ল তাঁর মধ্যেকার বড় মানুষটির সুপ্রকাশ—স্মরণীয়, বরণীয়। ভুলভ্রান্তি কে না করে? কিন্তু ভুল ক'রে অকপটে স্বীকার করে শুধু সত্যাশ্রয়ী বিবেকী।

এর পরেও একটু পুনশ্চ আছে। ব্যাপারটা এই যে তিনি তাঁর কয়েকটি কলহ-বিলাসী মিথ্যাবাদী বন্ধুকে চিনতে পেরেছিলেন ব'লেই আরো বেশি অনুতপ্ত হয়েছিলেন যে তাদের কথা বিশ্বাস করেছিলেন : যখন তাঁরা বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরাগীদের উস্কে দিয়েছিলেন তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে। এ-শোকাবহ দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ যে-সব কথা লিখেছিলেন তা তাঁর মহাজনোচিত শালীনতারই পরিচয় দেয়। কারণ পিতৃদেবের কটূক্তির উত্তরে তিনি ব্যথিত হওয়া সত্ত্বেও আত্মবিস্মৃত না হ'য়ে শুধু যে কটূক্তির প্রত্যুক্তি করেন নি তাই নয়, পিতৃদেবের প্রশংসাই করেছিলেন, যথা : "আমি মাসিকপত্রে দ্বিজেন্দ্রবাবুর অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছি। তাঁহার লেখার সেই সকল 'অপ্রবুদ্ধ উপভোগে'র বিবরণ পড়িয়া অনেক বিচারক আমাকে দ্বিজেন্দ্রবাবুর অযথা স্তাবক বলিয়া অপবাদ দিয়াছেন। আমি তাহাতে কান দিই নাই।…দ্বিজেন্দ্রবাবু কেন অযথা কল্পনা করিতেছেন যে, আমি একদল চেলা আমার চাদিপাশে তৈরি করিয়া তুলিয়াছি? যদিচ তাঁহার অনুরক্ত বন্ধুবর্গের অভাব

নাই তথাপি আমি রাগ করিয়াও এরূপ অপবাদ তাঁহাকে পাল্টা ফিরাইয়া দিতে পারি নাই।"

পিতৃদেবের আষাঢ়ে ও বিশেষ ক'রে মন্দ্র গ্রন্থের প্রশংসায় রবীন্দ্রনাথ প্রায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিলেন। পিতৃদেব যে তাঁর মতন প্রতিভাধর কবির প্রশংসায় পুলকিত হয়েছিলেন। একথা বলাই বাহুল্য—আমার কাছে প্রায়ই বলতেন: "রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন রে, প্রবন্ধ ও সমালোচনায়ও অতুলনীয়—লোকেন বলত ঠিকই: তিনি একাধারে শেলি, এমার্সন ও ম্যাথিউ আর্নল্ড।"

রাঙা জ্যেঠামহাশয় প্রায়ই আমার কাছে খেদ করতেন: "এহেন মহাকবিকে বন্ধুরূপে পেয়েও যে দ্বিজু খোয়ালো এই হ'ল সাহিত্যে তার সবচেয়ে বড় ক্ষতি, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'আষাঢ়ে' ও মন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তার সবচেয়ে বড় লাভ।"

দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলায় তখনো প্রখ্যাত হন নি, তবু রবীন্দ্রনাথ তাঁর আষাঢ়ে পড়ামাত্র এইমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী করেন:

"ছন্দের মিলের উপর গ্রন্থকারের যে-আশ্চর্য দখল তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তপ্ত লৌহবক্ষে হাতুড়ি পড়িতে থাকিলে যেমন স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি হইতে থাকে, তাঁহার ছন্দের প্রত্যেক ঝোঁকের মুখে তেমনি করিয়া মিলবর্ষণ হইয়াছে।...তা ছাড়াও সাময়িক পত্রে মধ্যে মধ্যে 'আষাঢ়ে' রচয়িতার এমন সকল কবিতা বাহির হইয়াছে যাহাতে হাস্য এবং অশ্রুরেখা, কৌতুক এবং কল্পনা, উপরিতলের ফেনপুঞ্জ এবং নিম্নতলের গভীরতা একত্র প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয়। তিনি যে কেবল বাঙালিকে হাসাইবার জন্য আসেন নাই, সেই সঙ্গে তাহাদিগকে যে ভাবাইবেন ও মাতাইবেন, এমন আশ্বাস দিয়েছেন।" (আধুনিক সাহিত্য)

এ-সূত্রে সত্যিই আশ্চর্য হ'তে হয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক তথা দৈবজ্ঞ দৃষ্টির (prophetic vision-এর) পরিচয় পেয়ে। পরে আমি একবার একথা তাঁকে লিখেছিলাম গভীর আক্ষেপ ক'রে যে পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁর মনান্তর হ'ল অভাবনীয় দশচক্রে। তিনি উত্তরে আমাকে লিখেছিলেন (জানুয়ারি ১৯২৭):

"অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। তোমার চিঠির উত্তরে আমি এই কথাটি জানিয়ে দিতে চাই যে, কোনদিনই তোমার পিতার বিরুদ্ধে কারো সঙ্গে আমি আলোচনা করিনি। তার কারণ, যার কাছ থেকে আমি কোনো ক্ষোভ পাই তার সম্পর্কে আমি সর্বপ্রযত্নে আত্মসংবরণ ক'রে থাকি। তোমাদের মতো যাদের আমি ভালবাসি তাদের

কখনো কখনো নিন্দা করা আমার পক্ষে অসম্ভব নয়, কিন্তু যাদের সম্পর্কে আমার কোনো প্রতিকূলতা আছে তাদের নিন্দায় আমি পারৎপক্ষে যোগ দিই নে। তোমার পিতাকে আমি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা করেছি। সেকথা জানিয়ে তাঁকে ইংলণ্ড থেকে আমি পত্র লিখেছিলাম। শুনেছি সে-পত্র তিনি পেয়েছিলেন এবং উত্তর লিখেছিলেন। সে-উত্তর আমার হাতে পৌঁছয় নি।" (তীর্থংকর)

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সে সময়ে দেখেছিলাম এক আশ্চর্য সহিষ্ণুতা। আশ্চর্য বলছি এইজন্য যে কবি-শিল্পীরা চিরকালই একটু বেশি রকম স্পর্শকাতর হয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না। কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে এবং কল্পনাপ্রবণ লোকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোটো ছোটো দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু···তিনি জানিতেন বর্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না।" (আধুনিক সাহিত্য)

আমরা অপরের মন জানি নিজের মনকে যাচাই ক'রে। বঙ্কিম-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এমন নিপুণ বিশ্লেষণ করেছিলেন যে নিজের মনের ও প্রতিভার ধারার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আলোয় একথা বলবারও অপেক্ষা রাখে না—এ হ'ল প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মতনই অনস্বীকার্য। ঠিক তেম্‌নি নিপুণ ছিল পিতৃদেবের মনস্তত্ত্ব তথা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ। শুধু তাই নয়—তাঁর অগাধ স্নেহ পেয়ে পরে যখন জীবনের নানান নিঃস্ব মুহূর্তে পথের পাথেয় পেতাম তখন বিস্মিত হ'তাম তাঁর ধৈর্য ও তিতিক্ষা দেখে। একবার তাঁর এক প্রিয়পাত্র আর একজনের কাছে তাঁর নিন্দা করেন। রবীন্দ্রনাথ এতে আঘাত পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই (তাঁরই কথা স্মরণীয়: কাঁটা ছোট হ'লেও বেঁধে) কিন্তু লিখেছিলেন আমাকে: "অমুকের লেখা নিয়ে তুমি মনকে পীড়া দিও না। আমার ছবি বা গান তাঁর ভালো লাগে না এতে কোনো অপরাধ নেই।···ব্যক্তিগত আঘাত মাত্রকেই আমরা অত্যন্ত বেশি বাড়িয়ে তুলি—যতটা বেদনা পাই তার অনেকখানিই স্বকৃত।" স্থানাভাবে পুরো পত্রটি উদ্ধৃত করতে পারলাম না—তীর্থংকরে প্রকাশিত এ-পত্রটির মধ্যে দিয়ে বড় চমৎকার ফুটে উঠেছে তাঁর সহজাত আত্মবিশ্বাসের তেজের সঙ্গে পরমত-সহিষ্ণুতার বল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কথাই আমার লিখবার আছে—তাঁর কাছে যা পেয়েছি তার ঋণ অপরিশোধ্য ব'লেই চেষ্টা করতে হবে, দেখাতে কেন এ-ঋণ অপরিশোধ্য। কিন্তু সে

কথা যথাস্থানে লিখব : অর্থাৎ, আমার কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতিতে। এখানে তাঁর মহিমার সম্বন্ধে শুধু আর একটু বলেই সমাপ্তি টানব।

আমি অন্যত্র লিখেছি—পিতৃদেবের কাছে তাঁর কয়েকটি কপট বন্ধু সত্য বন্ধুর পদবী পেয়েছিল ব'লেই তাদের কথা তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যখন তারা তাঁকে বলেছিল যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজে আক্রমণ করছেন না বটে কিন্তু তাঁর ভক্তদের উস্কে দিচ্ছেন প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে। রাঙা জ্যেঠামহাশয় আমার কাছে প্রায়ই দুঃখ করতেন : "দ্বিজু মহৎ হ'লেও ওর এক মস্ত দুর্বলতা আছে—ও ভারি কানপাতলা।" আমি জ্যেঠামহাশয়ের কথায় প্রথমে সায় দিই নি, কিন্তু যখন দেখলাম তাঁর ভক্তরা রবীন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্রের "চেলা"-দের সম্বন্ধে যা যা বলেছিলেন তিনি গলাধঃকরণ করলেন তখন মানতে হয়েছিল বৈকি যে জ্যেঠামহাশয় মিথ্যা বলেন নি।"

মনে আছে সে-সময়ে নির্মলদা প্রায়ই বিস্ময় প্রকাশ করতেন : "ছোটমামা তীক্ষ্ণবুদ্ধি হ'যেও মানুষ চিনতে পারেন না এ এক পরম আশ্চর্য—ঐ দেখ্ না অমুক অমুক যে বিশ্বনিন্দুক না জানে কে? আমরাও ধরতে পারি ওদের চাল—কিন্তু ছোটমামা পারেন না! তাজ্জব!

পরের জীবনে সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র প্রমুখ মহৎ মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হওয়ার পরে এ-সমস্যার খানিকটা সমাধান পেয়েছিলাম দেখে যে দুজনেরি ছিল ঐ এক অক্ষমতা : কপট বা ধূর্ত মানুষকে চিনতে না পারা। সমাধানটি কিছু নূতন নয়—গীতাকার ব্যাখ্যা করেছিলেন সে কবে : "সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি?" অর্থাৎ মানুষ চলে তার প্রকৃতি যেপথে তাকে চালায়—জোর ক'রে প্রকৃতি বদলানো যায় না। কথাটা যে সত্য কে অস্বীকার করবে? তাই সরল মানুষ সবাইকেই সরল দেখে, উদার মানুষ সবাইকেই বিশ্বাস করে, অসচ্চরিত্র সবাইকেই সন্দেহ করে…ইত্যাদি। অপিচ নেশা করা যার অভ্যাস হ'য়ে গেছে সে যেমন বার বার নেশা করব না পণ নিয়েও প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে না, ঠিক তেমনি উদার সত্যনিষ্ঠ মানুষ বার বার ঠেকলেও শেখেন না, বার বার ঠকেন তবু মিথ্যুককে তার স্বরূপে চিনতে পারেন না, ভাবেন সত্যবাদী।

আরো কারণ আছে : হয় কি, বন্ধুবৎসল অমায়িক মানুষ কাউকে একবার বন্ধু ব'লে গ্রহণ করার পরে আর তাকে সহজে রূঢ়ভাবে থামিয়ে দিতে পারেন না।

স্পর্শকাতর মানুষ সহজে অপরকে দুঃখ দিতে কুণ্ঠিত হনও এই কারণেই। ফল হয় এই যে, কুটিল লোককেও তাঁরা বিশ্বস্ত ব'লে ভুল করেন। পরে আমার যৌবনকালে চোখের উপর দেখেছি—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যেও মনান্তর হয় ঠিক এই কারণেই—অর্থাৎ "বরের-ঘরে-মাসি-কনের-ঘরে-পিসি-"দের কথায় কান দেওয়ার জন্যে।

কিন্তু সব মেনেও তবু বলবই যে, সত্য-শিব-সুন্দরের অভিসারী মহৎ মানুষ ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও পথ হারায় না। তাই পিতৃদেবও সাময়িক ঝোঁকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার করলেও দুদিন বাদেই অনুতপ্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার গুণগান করেছিলেন আরো উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মনান্তর সম্বন্ধেও এই কথা সমান প্রযোজ্য : তাই তো মোকাবিলা হবার সঙ্গে সঙ্গে ভুল বোঝার আড়াল স'রে গিয়ে উভয়েরই মধ্যে সহজ প্রসন্নতা ও শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছিল। এই প্রসন্ন শ্রদ্ধা ও গৌরবী প্রীতিই স্মরণীয়—যে কথা দেবকুমার বাবুর "দ্বিজেন্দ্রলাল"-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন তাঁর মহৎজনোচিত মনোজ্ঞ তর্পণে :

"দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বাংলার পাঠক সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন না তখন হইতেই তাঁহার কবিত্বে আমি গভীর আনন্দ পাইয়াছি এবং তাঁহার মহিমা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সত্য,, অর্থাৎ আমি যে তাঁর গুণপক্ষপাতী, এইটেই আসল কথা, মনে রাখিবার যোগ্য।···এই উপলক্ষে আমি কেবলমাত্র এই কথাটি জানাইতে চাই যে, সাময়িক পত্রে যে-সকল সাময়িক আবর্জনা জমা হয় তাহা সাহিত্যের চিরন্তন উৎসবসভার সামগ্রী নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে আমার যে-পরিচয় স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য তাহা এই যে আমি অন্তরের সহিত তাঁহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেখা বা আচরণে কখনো তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই।"

সমর্সেট মম-এর একটি লেখায় একবার পড়েছিলাম দুঃখ কষ্ট দুর্দৈবের অভিঘাতে যেমন নীচ প্রকৃতির মানুষ আরো নীচ হয়ে যায়—তেমনি মহৎ মানুষ আরো মহৎ হ'য়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ পিতৃদেব গিরিশচন্দ্র শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্র প্রমুখ মহৎ মানুষের নানা আচরণেই আমি এই নীতির স্বপক্ষে প্রমাণ পেয়েছি। শরৎচন্দ্র ও সুভাষের সম্বন্ধে যখন লিখব তখন এ বিষয়ে আরো লিখবার ইচ্ছা আছে আমার কৈশোর ও যৌবন-স্মৃতিতে।

এবার ফিরে আসি হারানো খেই ধরতে।

বলছিলাম কি, নির্মলদার স্থরধাম ত্যাগ শুধু আমার জীবনের নয় পিতৃদেবের জীবনেরও একটি বিশেষ ঘটনা যেহেতু তাঁহার নাটক ও গান যে ভক্তির দিকে মোড় নিল তার জন্যে নির্মলদা—এবং ঐসঙ্গে আমিও—খানিকটা দায়ী বৈকি।

কিন্তু জীবনে এক একটা ঘটনা ঘটে যা ঘটায় অনেকখানি ওলট-পালট—খানিকটা নদীর খাত বদলানোর মতনই বলব। অর্থাৎ এই এখানে ছিল গ্রাম, এল তরঙ্গলীলা—ওখানে ছিল জল, দেখা দিল ধূ ধূ বালুচর।—সারা দৃশ্যটাই যায় বদলে।

নির্মলদার প্রস্থান আমার জীবন-ছন্দের মধ্যেও ঘটাল ঠিক এম্‌নি বিপর্যয়। আগে যাঁকে দৈনন্দিন জীবনের আনন্দময় সাথীরূপে হাতের কাছেই পেতাম তিনি খানিকটা দূরে চ'লে যাওয়ার জন্যেই মনে নিবিড় হয়ে উঠল শূন্যতা, আর শূন্যতার ফলে জেগে উঠল ঝিমিয়ে-পড়া আকুলতা—কেমন ক'রে ভগবানকে পাব?

পিতৃদেবের সাহিত্যিক বন্ধুদের প্রতি আর নেই তো তেমন টান! মেঘেনদা ভূপেনদা প্রভৃতির সঙ্গে পড়াশুনা করি বটে, কিন্তু এরা কেউই নয় তো আমার আত্মার আত্মীয়! মন কেমন যেন শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যও উঠল মাথা চাড়া দিয়ে—পরমহংসদেবের কথামৃত হ'য়ে উঠল আমার স্বাধ্যায়, তাঁর ছবি আমার ধ্যান, তাঁর বিধান আমার মন্ত্র, তাঁর তিরস্কার আমার অঙ্কুশ "রোখ চাই নৈলে কি সাধনা হয়···কৃপা কৃপা বললেই তো হয় না—সাধনা চাই।" এই জন্যেই নির্মলদাতে আমাতে মাঝে মাঝেই অতিষ্ঠ হ'য়ে বেরিয়ে পড়তাম—কখনো যেতাম বেলুড়ে কখনো দক্ষিণেশ্বরে কখনো বা উদ্বোধন অফিসে স্বামী সারদানন্দের কাছে। সবচেয়ে ভালো লাগত আমার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ছোট ঘরটি। আমি পরে ভারতের প্রায় সব তীর্থেই গিয়েছি, কিন্তু আমার কাছে আজো তীর্থের তীর্থ র'য়ে গেছে ঠাকুরের এই পুণ্য সাধনপীঠটি—সেখানে গিয়ে বসতে না বসতে নির্মলদা ও আমার বুকে ভক্তির বান ডেকে যেত যেন—ঠাকুরের খাটটির সামনে মাটিতে বসতে না বসতে চোখে বইত ধারা—যখন সন্ধ্যাবেলা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতাম তখন মন ভ'রে উঠেছে কূলে কূলে।

কিন্তু এ-ব্যবস্থা তো দৈনন্দিন হ'তে পারে না। আমাকে শুধু-যে ধ্যানধারণা করতে হ'ত তাই তো নয়, গান সাধতে হ'ত, পড়াশুনোও করতে হ'ত যে! স্কুলে "মেধাবী ছাত্র" নাম কিনেছিলাম, সুনামের মাণিক একবার হাতে পেলে আর খোয়ানো চলে কি? —ম্যাট্রিকে স্কলার্শিপ না পেলে মুখ থাকে কখনো? কাজেই

বছর দুয়ের মধ্যেই দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ায় ভাঁটা পড়ে এল পরীক্ষার চাপে। বয়স তখন আমার পনের পেরিয়েছে—বৎসরখানেকের মধ্যেই ম্যাট্রিক দিতে হবে।

অথচ সাধনাও তো করা চাই। বন যদি না মেলে কোণ কোণই সই। কিন্তু আমাদের হট্টমন্দিরে কোণ? সোনার পাথরবাটি? ভাবতে ভাবতে আমার উর্বর মস্তিষ্কে এক ফন্দি গজালো। আমাদের সুরধামে তিনতলার ছাদের এক কোণে পাঁচিলে সার সার ঘুলঘুলি ছিল। একদিন হঠাৎ কি মনে হ'ল—তিন চারটি চওড়া তক্তা লাগালাম এ-পাঁচিলের ঘুলঘুলি থেকে ও-পাঁচিলের ঘুলঘুলি পর্যন্ত—কোনাকুনি ভঙ্গিতে। তা'হলে দুটো গায়ে ঠেকানো পাঁচিল হ'য়ে দাঁড়ালো দেয়াল আর তক্তাগুলো হ'য়ে দাঁড়ালো মেজে—ফ্লোর—একটি পনের বছরের ছেলের ত্রিকোণ আসনের মতন। উপরেও লাগালাম তক্তা। হ'য়ে দাঁড়াল অবিকল কোণই বটে ঠিক একটি ত্রিকোণ দরজাহান কুঠরি আর কি। ছাদের দরজা বন্ধ করে দিলেই এ-কুঠরিটি হ'য়ে দাঁড়ালো নিরালা কোণ শুধু আমার সাধনপীঠ, প্রিয় কক্ষ নয়—মুক্তিমন্দির।

মুক্তি বলতে আমি এমন ইঙ্গিত করছি না যে আমি ঐ বয়সেই আমার আত্মীর আত্মীয়াদের সঙ্গ পুরোপুরি বর্জন ক'রে হ'তে চেয়েছিলাম রোখালো মুক্তিবৈরাগী। আমি বরাবরই মিশুক মানুষ—বোধ হয় আজো আছি—কিন্তু ঐ যে বললাম—প্রতি মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তো একাধিক ব্যক্তিরূপ? আমার মধ্যেও জটলা করেছিল: সামাজিক বালক, উচ্চাশী গায়ক, মেধাবী ছাত্র তথা যশঃপ্রার্থী শিল্পী যে অহঙ্কারে সময়ে সময়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করত, জানত মনে মনে যে সে বড় একটা কেওকেটা নয়: অথচ ঐ সঙ্গে পাশাপাশি লুকিয়ে ছিল আর একটি দীন অসহায় শিশুও বটে, যে চাইত তার মধুসূদন দাদাকে, যে কুঠরিতে ব'সে পড়ত বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের:

ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ স্মৃতে জন্মজরান্তকাদি ভয়ানি সর্বাণ্যপযান্তি তাত॥

ভয়ে করে ভয় যে হরণ, স্মরণে যার জন্মমরণ
শোক তাপ হয় বিলীন পলে, সে মহীয়ান্ যখন ঝলে
হিয়ায় পিতা আমার—কোথা শঙ্কা আমার, কোথায় ব্যথা?

কখনো বা গিরিশচন্দ্রের ধ্রুবচরিত্রে ধ্রুবের কান্না:

"কোথা পদ্মপলাশলোচন! দেখা দাও!"

কখনো বা চৈতন্যের ব্যাকুলতা (গিরিশবাবুর চৈতন্যলীলা কলকাতায় খুঁজে পাই নি—কাজেই স্মৃতি থেকে লিখলাম বলে উদ্ধৃতিতে একটু আধটু ভুল থাকতেও পারে—৫০ বৎসর আগে পড়া বই তো) :

প্রভু কোন্ হেতু কিছু নাহি জানি—
ভাবি কুলে রই,
কূলে আর রহিতে না পারি,
প্রাণ ধায়, বুঝালে না ফেরে
সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকূল পাথারে।

অমনি আমার বালকবুকের মধ্যে আকুলি বিকুলি করে উঠত চোখের জলের মধ্যে দিয়ে চৈতন্যলীলার পাতা ঝাপসা হ'য়ে আসত :

কই প্রভু কই মোর কৃষ্ণভক্তি হ'ল
অধম জনম বৃথা কেটে গেল
বলো কোথা যাব ?
কোথা কৃষ্ণ পাব ?
দেহ পদধূলি—
বনমালী যেন পাই।

কখনো বা পড়তাম কৃষ্ণকর্ণামৃতে বিল্বমঙ্গলের :

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে

অর্থাৎ

হাতটি ছাড়ায়ে নিয়ে অন্ধের দূরে হরি সরে যাও
হেন বীরত্বে কোথা তব গৌরব ?
আমার হৃদয় হ'তে যদি পারো দূরে যেতে হে উধাও,
মানিব তখন তব পাশে পরাভব।

এ-চরণগুলি নমুনা হিসেবে দিলাম শুধু ফুটিয়ে তুলতে—এই সময়ে কী ধরনের প্রার্থনা আমার বালক মনে জেগে উঠত। বস্তুতঃ, এই সব অবিস্মরণীয় ভক্তি-উচ্ছ্বাস মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার চিত্তপটে আজো ভেসে ওঠে সে-হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলির মধুর প্রতিচ্ছবি। ছেলেবেলার সে-আশ্চর্য সরলতার কথা আরো বেশি ক'রে

মনে হ'ত প্রৌঢ় বয়সে—যখন আমি পণ্ডিচেরিতে সাধনা নিয়ে নিত্য নব সংশয়ে প্রায় দিশাহারা। তখন মনে কী যে বল পেতাম ভাবতে যে আমার সে-সময়কার বিবেক বৈরাগ্য ভক্তির মধ্যে ছেলেমানুষি অনেক কিছু থাকলেও ভেজালের চিহ্নলেশও ছিল না।

পঁচিশ

বাল্যস্মৃতির শেষ অধ্যায়ে একটি কথা বলি: এ-কাহিনী আত্মজীবনী নয়। আত্মজীবনীতে দশে মিলে করে কাজ, তাই তার বহর বড়। উপক্রমণিকাতে বলেছিলাম—এ-স্মৃতিচারণ—এতে এখানে ওখানে পুনরুক্তি থাকবেই থাকবে। সাধ্যমত পুনরুক্তি বর্জন করতে চেষ্টা করেছি তবু কোথাও কোথাও পুনরুক্তি ঘটেছে—ঘটনার পারম্পর্যও সর্বত্র রাখি নি। তবু এ-অসুবিধের উল্টো পিঠে এই ক্ষতিপূরণটুকু আছে যে লেখার গতি-কে বাধা না দেওয়ার ফলে লেখাটা হ'য়ে উঠেছে স্বচ্ছন্দ, অনাড়ম্বর।

কিন্তু আরো একটি কথা বলার সময় এল শেষ অধ্যায়ে! কথাটি এই যে, আমার ধর্মজীবনের বিকাশ কী ভাবে কোন্ পথে হ'ল 'শুধু সেই ছবিটি আঁকবার জন্যেই আমি আমার স্মৃতিমঞ্জুষা থেকে যথাসম্ভব মালমশলা আহরণ করেছি। এক-কথায়, আমি স্থানে স্থানে হাসিমস্করার অলিগলিতে ঢুঁ মারলেও আমার অন্তর্জীবনের বিকাশ-চিত্রণের রাজপথে ফিরে আসতে দেরি করি নি।

আজ সুদূরের প্রসারিত পরিপ্রেক্ষিতে একটা জিনিস বেশি ক'রেই চোখে পড়ে। সেটা এই যে আমার জীবনবিধাতা আমাকে যুক্তি-তর্ক-বিশ্লেষণ-সংশয় বর্গীয় বিশ্বাস-পরিপন্থী আবহে ফেলে অলক্ষ্যে যেন মুখ টিপে হেসেছিলেন দেখতে চেয়ে—প্রতিকূল পরিবেশে তাঁর দুরন্ত দুলালটি কী ভাবে বেছে নেয় তার পথের পাথেয়কে—অন্তরের উপজীব্যকে। গায়ত্রী ছন্দের ধ্যানের ধনের মতন হয়ত এই ভাবেই তিনি আমার শুভবুদ্ধির প্রচোদন করতে চেয়েছিলেন—কে জানে? আমি যাঁকে ছেলেবেলায় বরণ করেছিলাম তিনি বড় সোজা ঠাকুর নন। ভাগবতে শরশয্যায় শয়ান ভীষ্ম কৃষ্ণকে দেখিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন:

> "নহ্যস্য কর্হিচিদ্ রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্।
> যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি॥

অর্থাৎ

কি চাহেন চিন্তামণি—কোন্ পথে—কেহই চিন্তায়
পায় নাই দিশা—মুনিঋষিরাও মানে হার হায়!

তবু কালাতিপাতে লীলাময়ের লীলারহস্যের কোনো কিছুই যে চোখে একটুও স্পষ্টতর হয় নি তা নয়। তাই আজ দেখতে পাই যে, এই প্রতিকূল পরিবেশে পিতৃদেবের নাস্তিক সংশয় আমার মনে ছাপ ফেলেছিল—পরের জীবনে আমাকে পরমত-অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামির মোহ থেকে বাঁচাতে। পিতৃদেবের রোখালো মুক্ত মনকে আমি অন্তরের সঙ্গে ভালোবেসেছিলাম স্বভাবে আমি মুক্তিকামী ছিলাম ব'লেই। তাঁর অকুতোভয় অস্বীকারও আমার মন টেনেছিল এই জন্যেই—মুক্তিপথে নেতি-বিচার নানা আবর্জনা ঝেঁটিয়ে সাফ ক'রে দেয় ব'লে! নেতিবাদ, যুক্তি-তর্ক, সদসৎবিচার—এসবই আমাদের পথ পরিষ্কার করে। কারণ এসবের কাজই হ'ল—সত্যছদ্মবেশী মোহ থেকে স্বয়ংসিদ্ধ সত্যকে তফাৎ করা। তাই সত্যজিজ্ঞাসুদের পক্ষে নেতিবাদ শুধু যে স্বাস্থ্যকর তাই নয়—চক্ষুরুন্মীলক বললেও অত্যুক্তি হবে না। পরিণত বয়সে আমি আরো স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম—যেকথা স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রনির্ঘোষে বলেছিলেন বারবার—যে মোহ একবার আমাদেরকে পেয়ে বসলে তামসিকতাকেই আমরা ভুল করি সাত্ত্বিকতা বলে। তাঁর "ভাববার কথা"-য় স্বামীজি "বর্তমান সমস্যা" শীর্ষক নিবন্ধে তাই তো এত দুঃখ ক'রে লিখেছেন "সত্ত্বগুণ এখনো বহুদূর···রজোগুণের মধ্য দিয়া না গেলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কী করিবে?" আর সবচেয়ে সর্বনেশে হ'ল এই যে, তামসিকতার মোহান্ধতায় প'ড়ে-পাওয়া যূথমতরা আমাদেরকে চালায়—সত্যজিজ্ঞাসা নয়। এই যূথমতের অঙ্কুশচালকের দল ধর্ম বলতে ভাবেন গতানুগতিকতার দাসত্ব। তাই তো আমি সানন্দেই সায় দিয়েছিলাম যখন রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে"-তে পড়েছিলাম: "সত্যের উপরে কোনো একটা মোহকে প্রবল ক'রে রাখবার চেষ্টা—এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ। চিত্তকে মুক্ত ক'রে দিলেই আর আমরা বল পাই নে।"

চিত্তবান্ পিতৃদেবের জপমন্ত্র ছিল—পৌরুষ, ওজস—নিজের বিবেকের উপরে ভর ক'রে দাঁড়ানোর সাহস। তাঁর এই বিবেকদীক্ষাকে প্রৌঢ়বয়সে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম করেছি বারবারই—সে আমার রক্ষাকবচের কাজ করেছিল ব'লে। শুধু

বিবেকদীক্ষাই নয়, তিনি তাঁর মাতৃহারা শিশুটির শুভৈষণায় এমন সদাসজাগ ছিলেন যে তাঁকে আমি অল্পবয়সেই ভালো না বেসে পারি নি। তিনি কথায় কথায় তাঁর বন্ধুদের হেসে বলতেন আমাকে ও মায়াকে দেখিয়ে: "এইটি আমার যথা, আর এইটি আমার সর্বস্ব।"

পিতা কবে না স্নেহ করেন? মানি। কিন্তু তা ব'লে মানতে পারি না যে সব পিতৃস্নেহের মধ্যেই মেলে সন্তানকে বিবেকনিষ্ঠ সত্যমুখী ক'রে তোলার অতন্দ্র সাধনা। তাই না তিনি চেয়েছিলেন আমাকে ভোলাতে যে তিনি গুরু-গম্ভীর পিতা—বলতেন ডাক দিয়ে: "ওরে, আমি সব আগে তোর বন্ধু—পরে উপদেষ্টা, পিতা, অভিভাবক—যা বলিস।"

বন্ধু ব'লে বন্ধু! একটা দৃষ্টান্ত দেই। নির্মলদা সুরধামে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ইস্কুলে ভর্তি হই—তের বৎসর বয়সে। তখন ইংরাজিতে আমি কাঁচা ছিলাম। পিতৃদেব হেসে বললেন: "কুছ পরোয়া নেই—আমি নিজে তোকে ইংরাজি শেখাব।" কথাবৎ কার্য: অত ব্যস্ততার মধ্যেও সর সর ক'রে লিখে ফেললেন—তিন ভাগ Lessons in English. ইংরাজি ভাষায় তাঁর ছিল অসামান্য ব্যুৎপত্তি—বাইশ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে Lyrics of Ind লিখে ছাপিয়ে স্বয়ং এডুইন আর্নল্ডের তারিফ পান। সে-সময়ে ইংরাজি পড়তে আমার তেমন ভালো লাগত না, সংস্কৃত আমার বার আনা মন জুড়ে ছিল। তবু তাঁর কাছে ইংরাজি শিখে চার পাঁচ মাসেই আমি ইংরাজিতে ভালো ছেলে হ'য়ে দাঁড়ালাম—ম্যাট্রিকে ইংরাজিতে সত্তর পার্সেন্ট নম্বর পেলাম। আরো বেশি পেতাম যদি ইংরাজি ভাষায় সে-সময় রস পেতাম। কিন্তু যা বলছিলাম।

পিতৃদেবের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব আমার গ্রহিষ্ণু বালক-মনের উপর দিনে দিনে গভীরতর হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু অন্যদিকে যা ঘটল তাতে অনেকে হয়ত একটু আশ্চর্য হবেন—কিন্তু তবু বলতেই হবে—কেন না ব্যাপারটা অঘটন হ'লেও অনস্বীকার্য সত্য, কিনা "ফ্যাক্‌ট্": অর্থাৎ আমার বিশ্বাস ও ভক্তির বিকাশ দেখে তিনিও হ'লেন শুধু মুগ্ধ নয়—খানিকটা প্রভাবিতই বলব। এ-প্রভাব এল একটু একটু ক'রে বটে, কিন্তু বলে না "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ"—অনেকগুলি তৃণ নিয়ে গড়া রশি দিয়ে মাতা হাতীকেও বাঁধা যায়! আমি যখনই কোনো সাধু সন্তের কাছে যেতাম ফিরে এসে বলতাম তাঁকে: কী দেখলাম, কী শুনলাম, কী শিখলাম, আর তিনি শুনতেন সাগ্রহে। ফলে তিনি

সৎকথা শুনতে শুনতে ঝুঁকলেন আরো তাঁর দিকে যাঁকে আমি ভালোবেসে-ছিলাম মনে প্রাণে—অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে।

কয়েকটি নমুনা আগে দিয়েছি—এবার দেব শেষ নমুনাটি শেষ অধ্যায়ে। কারণ পিতৃদেবের জীবদ্দশায় যত সাধু দেখেছিলাম তার মধ্যে সেরা সাধু ছিলেন শ্রীম—কাজেই আমার সে-সময়কার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধুর কাহিনী সবশেষে আসাই ভালো—ক্লাইম্যাক্সের মতন। এখানে ব'লে রাখি—আমাদের কথালাপে নাটকীয় কল্পনার কিছু মিশেল থাকলেও ছবিটি তাতে ক'রে রঙিয়েই উঠেছে, বিকৃত হয়নি—কেন না এই ঢঙেই আমাদের কথালাপ হ'ত। সে-সময়ে নির্মলদা স্থরধামেই ছিলেন। তবে ঠিক কোন্ সাল কিছুতেই মনে করতে পারছি না। যাহোক এবার বলি।

আমি : শ্রীম-কে দেখে এলাম বাবা!

পিতৃদেব (হেসে) : তোর ঠাকুরের বস্ওয়েল? বেশ বেশ। বল্ কী হ'ল।

আমি : উঃ! ওয়ণ্ডরফুল, বাবা! আর কী স্থন্দর যে দেখতে—

পিতৃদেব : তোর নির্মলদার চেয়েও?

আমি : যা—ন্! আপনি ভা—রি—! সীরিয়স কথায়—

পিতৃদেব (হেসে কণ্ঠবেষ্টন ক'রে কাছে টেনে) : আচ্ছা আচ্ছা, এবার সীরিয়স হচ্ছি—তোর ফেভরিট পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীকেও টেক্কা দেব—হুঁম্। আমি না পারি কী? বল্ তুই।

আমি (হেসে) : হ'ল কি—নির্মলদার সঙ্গে কাল হঠাৎ তর্ক বাধল। আমি পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করি বটে—আরো আপনার ভরসা পেয়ে—

পিতৃদেব : রোস্ রোস্—আমার ভরসা মানে?

আমি : বাঃ, আপনি সেদিন বলেন নি যে পরমহংসদেব সাধু একথা তেম্নি জলজ্যান্ত সত্য যেমন সত্য—ঐ দোরটা দোর।

পিতৃদেব (প্রসন্ন) : বলেছি, আর বলার পরে কথাটা শুধু যে ফিরিয়ে নেব না তাই নয় আরো একটু জুড়ে দেব—তাঁর ভাবে-ভোলা ছবি দেখলে মনে না হ'য়েই পারে না যে তিনি মহাপুরুষ।

(এ-সব কথা তিনি সত্যিই বলেছিলেন)

আমি (আহ্লাদে আটখানা) : একথা কালই গিয়ে বলব শ্রীম-কে।

পিতৃদেব (হেসে): বলিস, কেবল আমার মতন নাস্তিকের কথার কী মূল্য বল্ তাঁর মতন আস্তিকের কাছে?

আমি: আপনার যত বাজে কথা—নাস্তিক কি গান বাঁধতে পারে:

"গিরিগোবর্ধন গোকুলচারী—যমুনা তীর নিকুঞ্জবিহারী—
শ্যাম সুঠাম কিশোর ত্রিভঙ্গিম চিত্তবিনোদনকারী?"

পিতৃদেব (পুনরায় আমার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে হেসে): ওরে, কবিদের তুই আজও চিনিস নে তো। তাই জানিস না তাঁরা ঝোঁকের মাথায় লেখেন অনেক কিছুই যার জন্যে পরে পস্তান। যাকে ইংরাজিতে বলে marrying in haste to repent at leisure. না না—ফিরিয়ে নিচ্ছি—বল্ তুই—আমি আর টুকব না। তোর নির্মলদার সঙ্গে কী নিয়ে তর্ক বাধল?

আমি: নির্মলদার আশ্চর্য বিশ্বাস, কিন্তু কিরকম যেন একটা গোঁড়ামি ওঁকে পেয়ে বসে সময়ে সময়ে। আমাকে বললেন কী জানেন?—যে, কথামৃতের প্রতি কথাটি বেদবাক্য। এ কখনো হয় বাবা? বলুন তো?

পিতৃদেব (প্রসন্নকণ্ঠে): তুইই বল্ না।

আমি (রোখালো ঢঙে মাথা নেড়ে): না, হয় না। কোনো মানুষই অভ্রান্ত নয়—হ'তে পারে না—এক কৃষ্ণ ছাড়া—তবে তিনি যে "ভগবান স্বয়ং"—মানুষ নন তো।

পিতৃদেব: হুঁম্। কী ক'রে জানলি?

আমি: বাঃ, আপনিই তো লিখেছেন:

জয় নারায়ণ শ্রীশ জনার্দন জয় পরমেশ্বর ভবভয়হারী!
জয় কেশব মধুসূদন জয় গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারি!

পিতৃদেব (কোণঠাসা হ'যে): আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে। না হয় মেনেই নিলাম যে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ পারের পারী, ভবভয়হারী, সুতরাং অভ্রান্ত। তার পর কী? নির্মল বলে—শ্রীরামকৃষ্ণদেবও ঠিক অম্‌নি সাক্ষাৎ ভগবান্?

আমি (সংক্ষেপে): নৈলে আমার সঙ্গে বাধবে কেন বলুন? আমি বলি—তিনি মহাপুরুষ, যুগাবতার, অপাপবিদ্ধ সবই মানি, কিন্তু তিনি একেবারে সাক্ষাৎ ভগবান্ এ—এ গোঁড়ামি নয়? বলুন তো?

পিতৃদেব (হেসে): কী ক'রে বলি বল্? আমার চোদ্দ পুরুষেও কেউ ভগবানকে চর্মচক্ষে দেখে নি যে রে।

আমি (চম্‌কে গিয়ে বিজ্ঞভাবে): তা বটে। তবে কি বলবেন—আমারো বলা উচিত নয় যে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ হ'তে পারেন না ?

পিতৃদেব: নিজের ধারণা বলবি না কেন ? তবে বেশি জোর ক'রে বলা ভালো নয়—তিনি কী হ'তে পারেন আর কী হ'তে পারেন না। তবে এ আমার কথা নয় বাবা, সেদিন তোর-দেওয়া কথামৃতেই পড়ছিলাম—যাকে পরমহংসদেব বলতেন "মতুয়ার বুদ্ধি"—আর প'ড়ে একটু চম্‌কে গিয়েছিলাম বৈ কি। কিন্তু আমার কথা যাক—শুনি তোর গল্প।

আমি (একটু মুষড়ে প'ড়ে): আমি কিন্তু জোর ক'রেই বলেছিলাম। তাই তো ফের বাধল নির্মলদাতে আমাতে।

পিতৃদেব: তোদের বাধতেও যেমন, মিলতেও তেমনি।

আমি (আত্মরক্ষার্থে): কী করি বলুন ? নির্মলদা যে রোখালো—

পিতৃদেব: আর তুই লজ্জাবতী লতাটি ! হাঃ হাঃ হাঃ।

আমি (সাভিমানে): যা—ন্। আপনার সঙ্গে আর যদি কখনো কথা কই—

পিতৃদেব (পুনরায় বুকে টেনে): আচ্ছা আচ্ছা আর করব না, করব না, করব না—এই তিন সত্যি করছি। বল্ তুই। তারপর ?

আমি (কিঞ্চিৎ উপশান্ত): তারপর আর কি ? নির্মলদা কথামৃতের সব কথাই বেদবাক্য বলার সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠলাম রুখে, বললাম: "মানি না।" নির্মলদা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললেন: "ঠাকুরের শ্রীমুখের কথা তুই না মানলে তো তাঁর এইটি !—যাঁকে স্বয়ং স্বামীজি বলেছেন অতুলনীয়।" আমি বিষম রেগে গিয়ে বললাম: "ঠাকুর অতুলনীয় হতে পারেন, কিন্তু তা ব'লে কথামৃতে শ্রীম যা যা লিখেছেন তা যে সবই ঠাকুরের মুখের কথা—তাঁর বানানো কিছুই নেই এ তো প্রমাণ হয় না।" নির্মলদা রেগে আগুন, বললেন: "থাম্ থাম্ ডেঁপোর সর্দার ! এইটুকু বুদ্ধি নিয়ে ধরাকে সরা—আঙুল ফুলে কলাগাছ ! কী জানিস তুই—কার কেমন স্মৃতিশক্তি যে ব'লে বসলি—তাঁর বানানো কথা ? জানিস তুই শ্রীম কে ? তাঁর মতন সত্যবাদী বিরল। তার উপর কী অদ্ভুত তাঁর স্মরণশক্তি—সাক্ষাৎ শ্রুতিধর।" আমি মরীয়া হয়ে আরো এক পর্দা চড়িয়ে বললাম: "শ্রুতিধর হ'তে পারেন—কিন্তু ঠাকুর যা যা বলতেন তাঁর সবই মনে থাকত বলতে চান না কি ?" নির্মলদা বললেন: "বুদ্ধিমন্ত বটে ! তর্কটা ছিল কী নিয়ে শুনি ?—তিনি কী লেখেন নি তাই নিয়ে—না, যা যা লিখেছেন সে-সবই সত্যি কি না"

তাই নিয়ে? এখন কোণঠাসা হ'য়ে তুই আসল তর্কটাই ধামা-চাপা দিতে চাইছিস।" কাবু হয়ে আমি একটু স্বর নামিয়ে বললাম: "আচ্ছা তাই সই। কিন্তু শ্রীম যা সব লিখেছেন সমস্তই যে হুবহু ঠাকুরের মুখের কথা মেনে নিইই বা কেমন ক'রে? তিনি কিছু শোনামাত্র ডায়ারিতে টুকে রাখতেন না।" নির্মলদা সোল্লাসে বললেন: "হিপ হিপ হুররে! পেয়েছি তোকে এবার কায়দায়। হ্যাঁ, তিনি যা শুনতেন ঐ ডায়ারিতেই তখনি তখনি রোজ লিখে রাখতেন—আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি তাঁর সে ডায়ারি—চল্ তুই, তোকেও দেখাব তবে ছাড়ব। চল্। আর যদি না যাস তবে হার মেনে নাক খৎ দে।"

পিতৃদেব: বটে? উনি ডায়ারি লিখে রাখতেন রোজ? ইন্‌টারেস্টিং বৈ কি—এ আমিও জানতাম না।

আমি (বিজ্ঞভাবে): আমিও না। তাই একটু প্যাঁচে প'ড়ে গেলাম বৈ কি—কারণ এ আমি একেবারেই ভাবি নি। ঝোঁকের মাথায় তর্ক করেছি—যেমন—যেমন আপনিও তো করেন।

পিতৃদেব (মুখ টিপে হেসে): তোতে আমাতে একটু তফাৎ আছে হয়ত। মরুক গে। তুই গিয়ে কী দেখলি বল্ না।

আমি: বলছি, শুনুন। শ্রীম খুব কাছেই থাকেন, জানেন? নির্মলদা আমাকে টেনে নিয়ে সটাং হাজির—একেবারে তাঁর বসবার ঘরে। দেখি কি, তক্তপোষের উপরে তিনি ব'সে। চারদিকে ছড়ানো বই। ঘরে কয়েকটি ধূপকাঠি জ্বলছে। সামনে ঠাকুরের ছবি। ওধারে শেল্‌ফে কয়েকটি মরোক্কো-বাঁধানো একসার লম্বা বই। পরে শুনলাম—এই গুলিই তাঁর বিখ্যাত ডায়ারি। কিন্তু কী সুন্দর শ্রীম-র উজ্জ্বল সৌম্য মুখ বাবা! বড় বড় চোখ—সর্বদাই যেন জলে ভাসছে তার উপরে সে যে কী মিষ্টি হাসি—কী বলব? মনপ্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল।

পিতৃদেব (উৎসুক): তারপর? বল্ বল্—থামিস নে।

আমি (বেজায় খুশি): নির্মলদা সোজা ঘরে ঢুকে তাঁকে ঢিপ ক'রে প্রণাম করতেই তিনি মুখ তুলে চেয়ে একগাল হেসে বললেন: "এসো এসো নির্মল!··· আর এ-ছেলেটি?" নির্মলদা পরিচয় দিতেই ব'লে উঠলেন: অ্যাঁ! ডি. এল. রায়ের ছেলে—যিনি 'সীতা' 'পাষাণী' লিখেছেন? 'ওকে গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়' গান বেঁধেছেন? বোসো বোসো বোসো বাবা! ধন্য তুমি!" (পিতৃদেবকে) কেমন এবার খুশি?

পিতৃদেব (সহাস্তে) : খুশি ব'লে খুশি ! মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল !

আমি : আপনার সঙ্গে কে পেরে উঠবে বলুন ? যা হোক শুনুন। শ্রীম তো আমাকে খুব আদর ক'রে ডেকে কাছে বসিয়ে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কেন তাঁর কাছে এসেছি। আমি লজ্জায় তর্কাতর্কির কথা তুলতে পারলাম না, বললাম : "এসেছি ঠাকুরের কথা শুনতে। না, মিথ্যা বলি নি বাবা, মা ভৈঃ ! কারণ সত্যিই আমার ইচ্ছা ছিল দেখা হ'লে তাঁকে ঠাকুরের কথাই জিজ্ঞাসা করব—ডায়ারি দেখে আমার কী হবে বলুন ?

পিতৃদেব (হেসে) : জানি রে জানি, তুই হলি বাপকা বেটা—মিথ্যে বলবি কী দুঃখে ? তোকে আমি অবিশ্বাস করি নি, মা ভৈঃ ! তুই নদী নয়—নদের ম'তন "কল্লোলিয়া যা"।

(সত্যি বলছি এই ভাবেই উক্তি-প্রত্যুক্তি চলত—পিতাপুত্রের মধ্যে। এ-রঙে কথাবার্তা ওদেশে হ'লেও এদেশে বড একটা হয না। আর আমি তাঁকে ঠাট্টা করলে প্রায়ই তিনি কথাটা বলতেন পাল্টে।)

আমি (হেসে) : আপনি ভারি দুষ্টু। যেন কল্লোল শুধু আমিই করি। যাহোক শুনুন। কী বলছিলাম ?

পিতৃদেব : শ্রীম-কে তুই বললি—সত্যনিষ্ঠ হ'য়েই—যে তুই তাঁর কাছে এসেছিস ঠাকুরের কথা শুনতে।

আমি : হ্যাঁ হ্যাঁ ! আর অম্নি কী যে ঘটে গেল—চক্ষের নিমেষে—সে কী বলব ? জীবনেও নাটক ঘটে বাবা ! হ'ল কি জানেন ? তিনি আমার কথা শুনেই কেঁপে উঠে চেঁচিয়ে ডাকলেন : "প্রভাস—ও প্রভাস ! আয় রে আয় ! দেখে যা, এইটুকু ছেলে আমার কাছে এসেছে কি না ঠাকুরের কথা শুনতে রে—ঠাকুরের কথা শুনতে—দেখে যা—দেখে যা। আহা—" ব'লেই নির্মলদাকে—"তোমাদের এ পূর্বজন্মের সুকৃতি বাবা, নৈলে কি এমন জিজ্ঞাসা জাগে তোমাদের বয়সে ?—" ব'লে আমার দিকে ফিরে—"দেখ বাবা দেখ, আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে—" ব'লেই দুটি হাত সোজা ক'রে আমার সামনে বাড়িয়ে দিলেন। দেখি কি, সত্যিই দুহাতেরই লোম খাড়া হ'য়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়—দুফোঁটা চোখের জল গাল গড়িয়ে পড়ে আর কি ! তিনি কোঁচার খুঁটে দুচোখ মুছে ধরা গলায় বললেন : "বেঁচে থাকো বাবা—শতায়ু হও।"

ইতিমধ্যে বাড়ির মধ্য থেকে তিনচার জন লোক এল ছুটে আমাকে দেখতে।

আমি তো থ। কারণ ভাবুন একবার কাণ্ডটা—কোথায় আমি গিয়েছি তাঁকে দর্শন করতে—না উল্টা বুঝিলি রাম!—ওরা ছুটে এল কি না আমাকে দেখতে!—আপনার নববধূর ভাষায়—"আমি একটা নতুন কেনা ঘোড়া কি গরু যেন!"

পিতৃদেব: ওঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ড্রামা বটে—চুটিয়ে! তা হবে না। ড্রামাটিস্টের কুলতিলক তো তুই—ড্রামা ভালোও বাসিস স্বভাবে—কাজেই "যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" আর কি! যাক্, তারপর!

আমি: তারপর আর কী? তিনি উজিয়ে উঠে একটানা ব'লে চললেন ঠাকুরের কথা! আহা! কী সুন্দর কথা সে বাবা! বলতে লাগলেন চোখের জল মুছতে মুছতে—কী ভাবে ঠাকুর গাইতেন, নাচতেন, ছোটদের সঙ্গে ফচ্‌কিমি করতেন, খাওয়াতেন, গান গাইতে গাইতে কী ভাবে শিশু ভোলানাথ হ'যে যেতেন দিগম্বর—এই সব—আর সব ছাপিয়ে তাঁর অগাধ স্নেহের কথা। বললেন: "তাঁর সে তো মানুষের স্নেহ নয় বাবা, মানুষ এমন ভালোবাসতে পারে না। তাঁর ছিল এম্‌নি স্নেহ যে মনে হ'ত কত দিনের চেনা, কত আপন! দেবতা থাকেন দূরে দূরে মান বাঁচিযে। ঠাকুর ধরা দিলেন একেবারে কাছের মানুষ হয়ে…" এই রকম যে কত সুন্দর সুন্দর কথা বাবা! কিন্তু আমার মন মুগ্ধ হ'ল ঠাকুরের কথা শুনেও তত না—যত তাঁর গুরুভক্তি দেখে। কাউকে গুরু করতে আমার কেমন ভয় ভয় করে জানেনই তো, অথচ তবু কেন জানি না পথে আসতে আসতে কেবলই চোখে জল ভ'রে আসে ভাবতে ওঁর গুরুভক্তির কথা। ঠাকুর শ্রীম-কে কতখানি ভালোবাসতেন জানি না, কিন্তু শ্রীম ঠাকুরকেযে কী ভালোই বেসেছিলেন স্বচক্ষে দেখে এলাম বাবা! সত্যি, ভাবুন একবার!—এত বৎসর পরেও গুরুর নামটি মাত্র শুনেছেন—অম্‌নি তাঁর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিযে উঠেছে! এ রকম গুরুভক্তি মানুষের হয়? কী বলেন আপনি?…যান। আপনি কিছুই বলছেন না—

পিতৃদেব (বিব্রত): আমি কী বলব বল্ দেখি? গুরুবাদের গ-ও যে আমি জানি না রে! তবু…কেন জানি না শ্রীম-র গুরুভক্তির কথা তোর মুখে শুনে ভাবতে ভালো লাগছে যে তিনি তাঁকে এতটা ভালোবেসেছিলেন. তবে গুরু বলে নয়—মানুষ ব'লে।

আমি (জেরার সুরে): তার মানে?…বলুন না! কী যে আপনি—

পিতৃদেব (হেসে): ওরে, আমার মতামত শুনে তোর কী হবে বল্ তো? আমি সব আগে চাই—তুই নিজে ভাবতে শিখবি। তাই তোর না আস্তিকতা

না নাস্তিকতা কোনো কিছুতেই আমি কথা কইনি—তোর ধর্ম একান্ত ক'রে তোরই হোক্ শুধু এইটুকুই চেয়েছি ব'লে। আর ঠিক এই জন্যেই আমি চিরদিন গুরুবাদের বিপক্ষে রে!—আমার নিয়তির ব্যবস্থা ক'রে দেবেন আর একজন আমি তাঁকে জয় গুরু ব'লে দণ্ডবৎ করতে না করতে—এ আমি ভাবতেই পারি না। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই বাবা—ভবিষ্যতে যদি তুই গুরু করিসও কোনোদিন তাহ'লে

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।"

—এ দুর্দান্ত বুলি কপচাস্ নে বাবা! গুরুভক্তিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু গুরুভক্তির গোঁড়ামি যদি তোকে পেয়ে বসে তাহ'লে ম'রেও আমি শান্তি পাব না রে!

গোঁড়ামির কথা বলতে বলতে তাঁর মুখ রাঙা হ'য়ে উঠত। আজো ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিই যে, এমন পিতৃদেবকে তিনি আমার বাল্যজীবনের শিক্ষাগুরু রূপে চিহ্নিত করেছিলেন—যার জন্যে গুরুভক্তির গোঁড়ামিও আমাকে উত্তরজীবনে পেয়ে বসতে পারেনি।

ছাব্বিশ

পরদিন সকালে ফের ছুটলাম শ্রীম-র ওখানে নির্মলদার হাত ধ'রে। পথে যেতে যেতে নির্মলদা হেসে বলেন: "ওরে, মহা বিপদ হয়েছে।"

আমি (চম্‌কে): কী?

নির্মলদা (গম্ভীর): মনে নেই—ছোটমামা তোকে আমার সঙ্গে বেরুতে অনুমতি দিয়েছিলেন?

আমি (হেসে): হ্যাঁ হ্যাঁ। তখন আপনার গোঁফ—থুড়ি গাঁফ ছিল—হিঃ হিঃ—

নির্মলদা (বাধা দিয়ে) চোপরাও। বাপের কথা অমান্য ক'রে খিল্ খিল্! চল্ বাড়ি ফিরে। গোঁফ আর কামাব না—ফের গজালে তবে তোকে নিয়ে বেরুব—হোঃ হোঃ হোঃ।

সে অপরূপ হাসি আজও কানে বাজে।...

শ্রীম ফের আদর ক'রে পাশে বসালেন। দেখতে দেখতে দুপেয়ালা চা এসে হাজির।

আমি কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠতেই—

শ্রীম : খাও বাবা! তোমাকে কাল মিষ্টিমুখ করানো হয় নি—ঠাকুরের কথা বলতে গেলে আমি সব ভুলে যাই কি না। (বলতে বলতে চোখ দুটি ফের চিকিয়ে ওঠে)

নির্মলদা : ওকে আপনার ডায়ারি দেখাবেন?

শ্রীম (উঠে সন্তর্পণে এক খণ্ড ডায়ারি শেল্‌ফ্‌ থেকে বার ক'রে) : এই দেখ বাবা—তখন কী ভাবেই যে দিন গেছে! কোনোদিন ভুল হ'ত না আমার লিখে রাখতে—আর স্মরণশক্তিও ছিল তো তাজা—

আমি আবিষ্ট হ'য়ে ডায়ারিগুলির পাতা উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলাম। বুকের মধ্যে যেন কেমন ক'রে উঠল ভাবতে যে, যাঁর কথামৃত আজ লক্ষ লক্ষ তাপিতের আর্তি দূর করছে, দিশাহীনকে পথ দেখাচ্ছে, ভক্তিহীনকে বিশ্বাসের পাথেয় যোগাচ্ছে, হতাশের অন্ধকারে এনে দিচ্ছে ভরসার আলো—সে সবই তাঁর শ্রীমুখের মহাবাণী—আর এমন মানুষের কথামৃত—যিনি যুগাবতার হ'য়ে এসেছিলেন এ-বস্তুতান্ত্রিক যুগে প্রেমময়ের সুধা পরিবেশণ করতে—যিনি সারা জীবন সামান্য একটি ঘরে অকিঞ্চনের মতনই কাটিয়ে গেছেন শুধু অকিঞ্চনের কাছে এই বাণী বহন ক'রে এনে দিতে যে সর্বেশ্বর অকিঞ্চনের যেমন বন্ধু এমন আরো কারো নন। পরে যখন ভাগবতে প্রথম পড়ি রুক্মিণীর কাছে কৃষ্ণের মৃদু পরিহাস :

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বৎ নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে॥

অর্থাৎ

অকিঞ্চন আমি, অকিঞ্চনেরি লো বন্ধু প্রিয় আমি নিত্য।
আমাকে সাধে না তো তাই গো তারা রাণী, যাহারা বৈভবদৃপ্ত।

তখন মনে পড়ে ছিল শ্রীম আমাকে সেদিন বলেছিলেন :

পরমহংসদেবের কাছে একদিন এম্‌নি এক নিঃস্ব এসে বলে হাহাকার ক'রে : "ঠাকুর, আমার কেউ নেই।" তাতে ঠাকুর আনন্দে আত্মহারা, হাততালি দিয়ে হৃদয়কে ডেকে বলেন : "ও হৃদু, দেখ্‌ রে দেখ্‌ কে ভাগ্যবান্‌ এসেছে আজ আমার কাছে—ওরে, যার কেউ নেই তারই যে ভগবান্‌ আছেন!" আহা কী মিষ্টি কথা—কথামৃতই বটে।

কিন্তু পরমহংসদেবের কথামৃতের ভাব কি একটা? সম্প্রতি স্বামীজির পত্রাবলি

পড়তে পড়তে আরো যেন দেখতে পাই কত লোক তাঁর কাছ থেকে কত কী পেয়েছে—উপদেশ, প্রেরণা বাণী! স্বামী বিবেকানন্দ পেলেন লোক-শিক্ষার বাণী, গিরিশচন্দ্র ভক্তির, লাটু মহারাজ তপস্থার, ব্রহ্মানন্দ ভাবসমাধির—কত বলব!

কেবল এ-যুগে তাঁর একটি বাণী সবার হৃদয়েই বেজে উঠেছে যেন নতুন আলোয়, সুরে: "যত মত তত পথ—সব সাধনারই পথও তিনি, পাথেয় ও দিশাও তিনি, লক্ষ্যও তিনি।" বহু বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর তর্পণ করেছিলেন:

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ-জগতে,
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি'
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি॥

যাক, যা বলছিলাম।

নির্মলদা আর একখণ্ড ডায়ারি নিয়ে পাতা উলটোচ্ছিলেন, হঠাৎ বললেন: "মণ্টু কাল ঠাকুরের সম্বন্ধে সব কথা গিয়ে ছোট মামাকে বলেছে।"

শ্রীম: বটে! (আমাকে) তা তিনি কি বললেন শুনে? বলো বাবা, বলো।

আমি: বললেন—ঠাকুর মহাপুরুষ—তাঁর ভাবেভোলা ছবি দেখলেই মনে হয়।

শ্রীম: আহা! এমন বাপ পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা। শোনো বাবা! একটি কথা বলি তোমাকে। তুমি তাঁর কথাবার্তা রোজ লিখে রাখবে একটি খাতায়—যেমন আমি রেখেছি। না, শুধু তাঁর নয়, যখনই কোনো মহাজনের মুখে মনে-রাখার-ম'ত কিছু শুনবে টুকে রাখবে, কেমন?

আমি একটু আশ্চর্য হ'য়ে ঘাড় নেড়ে "রাখবো" বলতেই তিনি বললেন: "আর একটি কথা। তোমার বাবা সামান্য লোক নন—যদি সামান্য লোক হ'তেন তবে এমন কথা বলতে পারতেন না যে ঠাকুর মহাপুরুষ···আহা, কী কথা! মহাপুরুষকে মহাপুরুষ ব'লে চেনা কি সোজা কথা বাবা? তাই বলা রইল: রোজ তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তবে ধ্যান করতে বসবে কেমন? শাস্ত্রে বলেছে কি জানো বাবা?—গুরু পিতা মাতা তিন জন তুষ্ট হ'লে তবে তপস্যা সফল হয়—এই দেখ

না—" ব'লে পাশ থেকে মনুসংহিতা খুলে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে পড়লেন : "তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্বং সমাপ্যতে।"

পথে আসতে আসতে নির্মলদা বললেন : "আহা। কী মিষ্টি কথা তাঁর বল্ তো!" আমার চোখে কেন জানি না জল এসে গেল ভাবতে আমার পিতৃদেবের প্রণম্য মহত্ত্বের কথা।

পিতৃদেবকে যথাকালে সব বললাম। তিনি তো হেসেই খুন : "যা যাঃ—রোজ প্রণাম করতে হবে না—আমি গুরু নই—বিনা প্রণামেই প্রসন্ন হই।"

"সে কি বাবা!—সাক্ষাৎ মনু—"

"মনু অনেক বাজে কথাও বলেছেন রে—যেতে দে।'

আমি একটু দ'মে গিয়েই ফের রুখে উঠলাম : "কিন্তু আপনার কথা আমি টুকে রাখবই রাখব—'যা যাঃ' বললে শুনছি নি।"

সে-সময়ে আমার মনে বহুবারই এই প্রশ্ন জাগত—শ্রীম কেন আমাকে মহাজনদের বাণী লিখে রাখতে বলেছিলেন। এ-প্রশ্নের উত্তর তখন পাই নি—পেয়েছিলাম পরে—যখন "তীর্থঙ্কর" ও Among the Great বেরুতে না বেরুতে বহু লোকের চিঠি পেতে আরম্ভ করি। তখন মনে হয়েছিল যে সিদ্ধদের মধ্যে একটা অন্তর্দৃষ্টি জন্মায় ব'লেই তিনি দেখেছিলেন আমার মধ্যে কোনো বিশেষ অনুলিপিকারের শক্তি। কিন্তু নির্মলদাকে পরে একদিন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন : "বলেছিলেন কেন বলব? শোন্ তবে আমিও বলি একটা মিষ্টি কথা। আমি কয়েকদিন আগে তাঁকে বলেছিলাম তোর কথা। বলেছিলাম তুই নাস্তিক পাষণ্ডী হ'লেও তোর স্মরণশক্তি অদ্ভুত! দুশো গান মুখস্থ—আরো কত কী!"

আমি (হাততালি দিলে) : বলিহারি! কী মিষ্টি কথা রে!

নির্মলদা (ঠোঁট বেঁকিয়ে) : তা কোদালকে কোদাল বলব না?

আমি (পিঠপিঠ) : তাহলে কি আপনি দাঁড়ালেন তলোয়ার? বাবার একটা গান আছে : "সমানে সমানে হয় প্রণয়েরি বিনিময়—" হাঃ হাঃ হাঃ।

নির্মলদা (অট্টহাস্যে) : এক হাত নিয়ে নিলি বটে। কিন্তু শোন্, শ্রীম তোর তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির কথা শুনে তোকে যে কাজের ভার দিয়েছেন—তোকে সে-ভার নিতেই হবে—মনে রাখিস। তাই যদি ছোটমামার ভালো ভালো কথা টুকে না রাখিস তবে নরকে যাবিই যাবি। মনে রাখিস ঠাকুরের কথা : "সত্যে আঁট না থাকলে ভগবান্ মেলে না।"

আমি কথা দিয়ে কথা রেখেছিলাম সত্যিই। একটি মোটা খাতা কালো মরক্কোয় বাঁধিয়ে লিখে রাখতাম পিতৃদেবের নানা টুকরো মতামত, রসিকতা, যুক্তিবাদ। কিন্তু তাঁর হঠাৎ চিরবিদায়ের পরে সুরধাম ছেড়ে থিয়েটার রোডে প্রয়াণের হাঙ্গামে আরো অনেক কিছুর সঙ্গে এই মূল্যবান্ খাতাটিও আমার হারিয়ে যায়। এ-দুঃখ ভুলতে আমার অনেকদিন লেগেছিল।

তাঁর অকালমৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে ঠিক সময়েই। তাই বলি সে-কথা।

মাতৃদেবীর মৃত্যুর পর থেকেই পিতৃদেবের ঔদাসীন্য এসেছিল নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি। দেবকুমার বাবু ওঁর জীবনীতে এ-প্রসঙ্গ ফলিয়েই বলেছেন—উদ্ধৃতি দেওয়ার দরকার দেখি না। তার উপরে অফিসে তাঁকে খাটতে হ'তও অত্যন্ত বেশি। তিনি ছিলেন বিবেকী পুরুষ, কাজে কখনো ফাঁকি দিতেন না। এ-হাড়ভাঙা খাটুনির পরে নাটক লেখা, গান বাঁধা, সুর দেওয়া, থিয়েটারে তাঁর নাটকের রিহার্সাল দেওয়া, আমাকে নিজে ইংরাজি পড়ানো—আরো হাজারো ঝামেলায় তাঁর রক্তের চাপ বেড়ে যায় হুহু ক'রে। তিনি পেন্সন নিয়ে সুরধামের নিচের তলা ভাড়া দেন—যেখানে বিখ্যাত ইভিনিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তার উপর তিনি ভার নেন "ভারতবর্ষ" সম্পাদনের।

কিন্তু তিনি টের পেয়েছিলেন যে তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাই তাঁর "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে"-তে ফুটে উঠেছিল তাঁর "অন্তিম দিনের" প্রার্থনা :

পরিহরি' ভবসুখদুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে" গানটিতে—আকুল ডাক :

এখন বড় শ্রান্ত আমি ওমা কোলে তুলে নে না।

"আর কেন মা ডাকছ আমায়" গানে—মধুর মিনতি :

সাঙ্গ হ'ল ধূলাখেলা
হ'য়ে এল সন্ধে বেলা
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা, শেষে তোমায় হারাই পাছে।
আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে
বাহু দিয়ে নেও মা ঘিরে
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি মা, তোমার ঐ বুকের মাঝে।

ভক্তি-প্রবণতা তাঁর ছিল বরাবরই, কিন্তু ক্রমাগত বুদ্ধিবাদীদের সাহচর্যে তাঁর

সহজাত ভগবৎভক্তির স্রোত যৌবনে মন্দা হ'য়ে এসেছিল। শেষ জীবনে কথামৃত প'ড়ে পরমহংসদেবের দিকে ঝোঁকার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রচ্ছন্ন ভক্তি ফের আত্মপ্রকাশ করেছিল—ঠিক্ যেমন পাথরচাপা নির্ঝরিণী হঠাৎ পাথর ঠেলে আত্মপ্রকাশ করে অফুরন্ত উৎসধারে। প্রকৃতির এই পরিবর্তন ঘটে যখন—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—**the psychic being comes to the front**: মানে, যখন মনের হাজারো যুক্তিতর্ক হাল ছেড়ে দেয় অন্তরাত্মাকে, বুদ্ধির মায়াতাপ নিরস্ত হয় চৈত্যপুরুষের নিরঞ্জন সুধাস্পর্শে।

এই সময়ে তিনি লেখেন তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ গান—ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক রূপকে ফুটিয়ে তোলেন তাঁর অপরূপ ভাবোচ্ছ্বাসিত কবিত্বে: একদিকে ভারতের আত্মিক ঐতিহ্য:

ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র,
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননি, দর্শন উপনিষদে দীক্ষা,
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম শিল্প ধর্ম শিক্ষা।
চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।

অন্যদিকে ভারতের অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী রূপ:

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ,
উঠিল বিশ্বে সে কী কলরব, সে কী মা ভক্তি, সে কী মা হর্ষ!
জননি! তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি।
জননি! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা, কত না হর্ষ!
জগৎপালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!

এই দুটি অতুলনীয় ভারতস্তোত্র পরে প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে জুন জুলাই মাসে। কিন্তু তখন তিনি আর ইহজগতে নেই!

চাকরি থেকে অবসর নেবার পরে রক্তের চাপে তাঁর মাঝে মাঝেই ঘুম হ'ত না। মনে আছে আমরা ঘুমতাম আর তিনি বারান্দায় পায়চারি করতেন। মাঝরাতে যখনি ঘুম ভেঙেছে দেখি তিনি হয় আরাম-কেদারায় শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে, নয় বারান্দায় পায়চারি করছেন—কখনো বা গুন গুন ক'রে গান করছেন।

কিন্তু অসুখ করলেও তিনি একদিনের জন্যেও ম্রিয়মাণ হন নি, কি কাউকে বলেন নি তাঁর গভীরায়মান ক্লান্তি বা বৈরাগ্যের কথা। তবে কখনো কখনো অতর্কিতে আভাস ফুটে উঠত। যথা, এই সময়ে দেবকুমারবাবুকে একটি চিঠি লিখেছিলেন (দ্বিজেন্দ্রলাল ৬৫২ পৃঃ) :

"ওহে দেবকুমার—

তুমি এলে না? বেশ!···ওহে, আমি দিন দশেকে একখানা অপেরা লিখেছি (সোরাব রুস্তম)।···বিজয় তো শুনতে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে—এত ট্র্যাজিক কখনো অপেরা হয়? সত্যি সত্যিই ভীষণ ট্রাজেডি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমার কী হ'ল বল দেখি? হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলি!

তোমার দ্বিজদা।"

কিন্তু এ-বিষাদকে তিনি তাঁর উচ্ছল হাসি গল্পে চাপা দিলেও আমার কাছে অগোচর ছিল না। সন্ধ্যায় ও রাতে তিনি ঠায় তারার দিকে চেয়ে থাকতেন কত সময়েই যে! তাঁকে দেখে সত্যিই মনে হ'ত সোরাব রুস্তমের একটি দৃশ্য : সোরাব তার পতিবিচ্ছেদবিধুরা মাকে জিজ্ঞাসা করছে :

এই যে মা, একাকিনী, এখনো এখানে?
কী ভাবিছ মা আমার?···কী দুঃখ তোমার?···
কী হেতু মলিন তুমি? দেখিয়াছি আমি
সন্ধ্যাকাশ পানে তুমি চেয়ে চেয়ে রহ।
পরে সূর্য অস্ত যায়। পরে ছেয়ে আসে
পশ্চিম আকাশে ছায়া। সন্ধ্যাতারা উঠে।
পরে ধীরে ধীরে ধীরে আকাশ শিহরি'
অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জে রোমাঞ্চিত হয়।
তবু সেই চেয়ে আছ?

কয়েকটি দশপদী স্বরবৃত্ত সনেটও লেখেন তিনি এই সময়—আসন্ন অবসানের ছায়ায় ভরা। সব শেষেরটি লিখে দিচ্ছি :

করেছি কর্তব্য যাহা, সেইটুকুই আমার যাহা জমা।
করেছি অন্যায় যাহা, সেইটুকুই খরচ, দিও বাদ।
তোমাদের যেটুকু দিয়েছি দুঃখ, কোরো ভাই ক্ষমা।
তোমাদের যেটুকু দিয়েছি সুখ, কোরো আশীর্বাদ

তোমাদের মধ্যে আমি আসি নিক করতে বিসম্বাদ,
কেড়ে নিতে কারো অংশ, দিতে কারো মনে দুঃখ ভাই!
দুঃখ যদি দিয়ে থাকি ভ্রান্তিবশে—ক্ষম' অপরাধ।
বিনিময়ে দুঃখ যদি পেয়ে থাকি, কোনো দুঃখ নাই।
জমার চেয়ে খরচ বেশি হ'য়ে থাকে, তোমরা দোষী নহ।
জমা যদি বেশি থাকে—তোমাদেরি সেটা অনুগ্রহ।

দেবকুমারবাবু এই সময়ের একদিনের কথালাপ বিশদ ক'রেই লিখেছেন "উপসংহারে"। তার এক জায়গায় আছে :

দেবকুমার : চলুন, গাড়ি ক'রে একটু বেড়িয়ে আসা যাক :

দ্বিজেন্দ্রলাল : একলা একলা এবার যাব বটে বেড়াতে—তবে সে একটু দূরে। (৬৪৯ পৃঃ)

এক বন্ধুকে লিখেছিলেন একটি কবিতা (ত্রিবেণী)

"যদি এই গানে হাস্যে লভিয়াছি তব প্রীতি।
সার্থক আমার হাস্য সার্থক আমার গীতি।"

কিন্তু তবু তাঁর মন আজ উদাস তাই :

প্রভাতে এ-জীবনের হাসায়েছি বঙ্গভূমি,
করিয়াছি তীব্র ব্যঙ্গ—বন্ধুবর, জানো তুমি।
জীবনের এ-সন্ধ্যায় মিলায়ে গিয়াছে হাসি,
সব হাসি শুয়ে আছে কান্নার পাশাপাশি।

* * *

যথাকালে বেজে উঠল সব হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দেবার ডাক—১৭ মে, ১৯১৩—৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২০।

আমি বিকেলে গিয়েছি ফুটবল ম্যাচ দেখতে। হঠাৎ বড়মামার কম্পাউণ্ডার ভগবতীবাবু এসে বললেন : চলুন চলুন—সর্বনাশ! আপনার বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।"

বিকেলবেলা সাহিত্যসেবায় নিরত ছিলেন এমন সময়ে হঠাৎ মাথার রক্তকোষ ছিঁড়ে যায়। তাঁর শেষ ডাক : "মণ্টু!"

যখন ট্যাক্সি ক'রে ফিরলাম তখন পিতৃদেব নিঃসম্বিৎ। একঘর লোক, মাথায়

বরফের ব্যাগ, ঠোঁট দুটি নীল, নিশ্বাসের কষ্ট—stertorous breathing : সবাই চোখ মুছছে।

রাত নটায় বাণীর প্রিয়পুত্র, কৃষ্ণের ভক্ত, জগন্মাতার দুলাল, পরমহংসদেবের অনুরাগী, দেশপ্রেমিক, উদার, বন্ধুবৎসল, সত্যনিষ্ঠ, অকুতোভয় কবি ধরাধাম থেকে বিদায় নিলেন—অক্লান্ত জীবনসাধনায় মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ ক'রে, বন্ধুদের মধ্যে তাঁর প্রেমের বীজ বুনে আর নাস্তিক আস্তিক সবাইকেই তাঁর জীবনের চরম স্পন্দমান এজাহার উপহার দিয়ে :

সেই সে প্রেয়সী শান্তি—যে-শান্তি এ-বিশ্বে প্রীতিভরা।
সেই সে শ্রেয়সী গীতি—অনুকম্পায় বাঁধা যাহার সুর।
সেই গরীয়সী চিন্তা—পরহিতে নিত্য চিন্তা করা।
সেই মহাকাব্য—সহবেদনায় যাহা সুমধুর।
পরার্থেই দুঃখ সওয়া—সেই মহাদুঃখ মহাসুখ।
সে মহানন্দের কাছে—স্বার্থের আনন্দ কতটুক !

খবর পেয়ে এলেন নির্মলদা। শ্মশানে গেলেন আমার সঙ্গে। আমাকে বুকে জড়িয়ে সে কী কান্না!

* * *

ফিরে এলাম ভোররাতে। আমার মেজমামা খগেন্দ্রনাথ মজুমদার—যিনি পরে আমার অভিভাবক হ'য়ে পিতার অধিক স্নেহে আমাকে লালন করেন—আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন : "ভয় কি বাবা! আমি আছি।"

থিয়েটার রোডে দাদামহাশয় ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ওখানে এসে উঠলাম আমি ও মায়া। কিন্তু আমাদের অভিভাবক রইলেন মেজমামা—সত্যিই অভয়দাতা স্নেহনিলয় পিতৃকল্প মহৎ মানুষ। আর মেজমামিমা—মাতৃকল্পা মহীয়সী। এঁরাও আজ কেউ নেই এ-জগতে। রয়ে গেছে কেবল তাঁদের স্নেহের ঋণ—অপরিশোধ্য।

বাল্যস্মৃতি সমাপ্ত

২য় পর্ব

কৈশোর-যৌবন-স্মৃতি

এ-পর্বে যাঁদের কথা বলেছি :

আমার দাদামহাশয় শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার, দিদিমা বারাহিনী দেবী, মেজমামা শ্রীখগেন্দ্রনাথ মজুমদার, মেজমামিমা অমিয়া দেবী, ভগিনীপতি শ্রীউপেন্দ্রলাল মজুমদার, উষাদিদি, অতুলপ্রসাদ সেন, শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গম্ভীরবাবু, শৌখিনবাবু, ডাক্তার ধর্মবীর, মিসেস ধর্মবীর, শ্রীশরৎকুমার দত্ত, দেবিকারাণী, মসিয়ে এরমুঁ, জেন, রোমাঁ রোলাঁ, বার্টরাণ্ড রাসেল, ফ্রাউ কির্সিঙ্গার, ভ্লাদিমিয়া, মার্থা, ওলগা, শাপিরো, ফর্মিকি, বিরুকফ। গানের শিক্ষক : শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বকুবাবু, শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দৌলতরাম, জমীরউদ্দীন, গৌরীশংকর মিশ্র, জানকী বাই, অচ্ছন বাই, মোতি বাই, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, মন্মথনাথ দত্ত, ফৈয়স খাঁ, আবদুল করিম, চন্দন চৌবে······সর্বশেষে ধর্মপ্রসঙ্গে : শ্রীবরদাচরণ মজুমদার, শ্রীজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ······প্রভৃতি।

উৎসর্গ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ভক্তিবিনম্রেষু,

কবি হ'য়েও তবু মনে যার থাকে— এ বিশ্বে নয়
শিল্পরসই সবার সেরা ; মানী হ'য়েও নম্র রয় ;
মানসলোকের মুন্সি হ'য়েও খাজনা তাঁকেই চায় দিতে—
যাঁর আলোকের ঝংকারে মন করে বরণ সঙ্গীতে
দীপ্তিময়ের নিত্যচরণ ; তাই—জানে যে—বিনা সে
মায়ার মেলা ছায়ার খেলা হয় অনর্থবিলাসে :
তায় করে এ-স্মৃতিচারণ দেই উপহার এই আশায়—
দরদ দিয়ে বুঝবে সুজন—তাঁরি কথা বলতে চায়
কেন সে উচ্ছল হ'য়ে—যে পেয়ে তাঁর কৃপার কণা
কাব্যে গানে গল্পে তাঁরি গায় কৃতজ্ঞ বন্দনা।

গুরু পূর্ণিমা

ইতি
স্নেহার্থী দিলীপ



যুবক দিলীপকুমার

এক

কয়েকমাস আগে যখন স্মৃতিচারণ করতে প্রথম কলম ধরি, তখন মনের মধ্যে একটা পঞ্জিকা মতন তৈরি করি। মনে হল আমার জীবনস্মৃতিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা মন্দ নয়: প্রথম ভাগ—বাল্যস্মৃতি, দ্বিতীয় ভাগ কৈশোর ও যৌবন, তৃতীয় ভাগ—প্রৌঢ়, চতুর্থ ভাগ—বৃদ্ধ না ব'লে বয়স্কই বলি—অরিকুলের আপত্তি সত্ত্বেও।

তাহ'লে দাঁড়াল আমার বাল্যপর্ব দশ বৎসর থেকে ষোল বৎসর—পিতৃদেবের দেহান্ত পর্যন্ত (১৯০৭ থেকে ১৯১৩)। তারপর কৈশোর ও যৌবনপর্ব আসুক—কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে বিলাতযাত্রা ও বিলাত থেকে ফিরে এসে সঙ্গীতচর্চার কাহিনী, অর্থাৎ ষোল থেকে একত্রিশ: যখন আমি পণ্ডিচেরিতে আমার গুরুদেবের চরণে আশ্রয় নিই যোগজীবনে দীক্ষা নিয়ে (১৯১৬ থেকে ১৯২৮)। তারপরে প্রৌঢ় পর্ব হবে একত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন বৎসর—আমার আশ্রমজীবন : (১৯২৮ থেকে ১৯৫২)। তারপরের বয়স্ক পর্ব—আমেরিকা গমন ও ফিরে পুণায় হরিকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা: ১৯৫৪ থেকে এখন পর্যন্ত—১৯৫৯ সালের শেষ।

আপাতত কৈশোরপর্ব শুরু করা যাক্। তবে থেকে এ পর্বে স্মৃতিচারণ কৈশোরে শুরু হ'য়ে যৌবনে সারা হবে ব'লে রাখছি। তাই এ-পর্বের উপনাম হোক কৈশোর-যৌবন-স্মৃতি—যেমন এর আগের পর্বের নামকরা হয়েছে "বাল্যস্মৃতি"।

কৈশোর শব্দটি বাংলায় বড় বেশি ব্যবহার হয় না, যদিও পৌগণ্ড শব্দটির চেয়ে এর প্রতিষ্ঠা বেশি। সচরাচর আমরা তরুণ শব্দটিই ব্যবহার ক'রে থাকি কৈশোরের স্থলে। কিন্তু তরুণ বলতে যৌবনও বোঝায়। কৈশোর হ'ল আসলে ইংরেজি "অ্যাডলেসেন্স" শব্দটির অনুবাদ। কৈশোরের সঙ্গে যৌবনের একটি মূলগত প্রভেদ আছে: কৈশোরে বালক বালিকা সচরাচর খানিকটা লাজুক তথা স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। তাই এ অধ্যায়ে তরুণ মন থাকে খানিকটা ডাঁশা-র কোঠায়—পাকার ঠিক আগেই।

সংসারের কেউ বেশি বয়সে পাকে, কেউ কম বয়সে। আমি বাল্য-পর্বে একটু তাড়াতাড়িই পেকে উঠেছিলাম তর্কাতর্কিতে, মুরুব্বিয়ানায়, অজস্র সারগর্ভ তথা বাজে বই পড়ায়—যেকথা আমি আমার "বাল্যস্মৃতি"-তে বলেছি। কিন্তু

কৈশোরের বয়ঃসন্ধিকালে আমি পাকা হলেও যে সেয়ানা ছেলে ছিলাম না একথা প্রথম বুঝি যৌবনে—বিলেত পৌঁছে নানা চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার পরে—তার আগে নয়। কেন একথা বলছি তা শনৈঃ শনৈঃ প্রাঞ্জল হ'য়ে উঠবে আশা করি।

পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলালকে নিষ্ঠুর কাল আমাদের কাছ থেকে হরণ করে নিয়ে যায় অকালেই বলব—পঞ্চান্ন না পেরুতেই। তখন আমার বয়স ষোলো বৎসর চার মাস। পিতৃদেবের বড় ইচ্ছা ছিল ম্যাট্রিকে আমি প্রথম দশ জনের মধ্যে হই—কুড়ি টাকা বৃত্তি পেয়ে। কিন্তু এ-কীর্তি অর্জন করতে হ'লে পরীক্ষার্থীকে যে-ভাবে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ডুব দিতে হয়, আমার পক্ষে সে-ভাবে সব মন ও ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহার করে ডুবুরি হওয়া সম্ভব ছিল না। আমার যে ছিল হাজারো বালাই, রকমারি ঔৎসুক্য—ফুটবল, টেনিস, পুরাণ, মহাভারত, গোয়েন্দা-কাহিনী, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, বৈষ্ণব পদাবলী, পিতৃদেবের কবিতা নাটক তর্কাতর্কি, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, মঠ, দক্ষিণেশ্বর সাধুসন্ত—সর্বোপরি : গান-পাগলামি। মনে আছে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার দিন পনের আগে বড়বাজারে হঠাৎ এক মাড়োয়ারি বন্ধুর বাড়িতে আসেন—বিখ্যাত জানকী বাই—যাঁর কাছে আমি পরে এলাহাবাদে গান শিখি। পিতৃদেবকে ধরলাম, "এলাহাবাদের ছপ্পন ছুরির গান না শুনলে প্রাণ যদি না-ও যায় তাহ'লেও মান থাকবে না।" পিতৃদেব হেসে বললেন, কিন্তু ··সামনে পরীক্ষা—কম্পীট—"

"সে হবে বাবা। না গেলে মনঃকষ্টে যা জানি তাও লিখতে পারব না। কম্পীট না ক'রে হয়ত চম্পটই দিতে হবে।"

অগত্যা তিনি যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন। গ্রামোফোন থেকে আমি জানকী বাইয়ের কয়েকটি ঠুংরি ও ভজন শিখেছিলাম : বাঁসরিয়া বাজায়ে যায় এ রী, কনহৈয়া ; পানি ভরে রী কৌন অলবেলীকী নার ; শ্রীরামচন্দ্র কৃপাল···ইত্যাদি। বড়বাজারে বন্ধুভবনে জানকী বাইয়ের কালো কুৎসিত চেহারা দেখে ঘা খেলেও যেই তিনি গান ধরে দিলেন, আবেশে আমি যেন বিহ্বল হ'য়ে গেলাম, মনে রইল না তাঁর বাইরের মুখে অজস্র কাটা দাগ। শোনা যায় তাঁর অপরূপ কণ্ঠ শুনে ঈর্ষান্বিত কয়েকজন শত্রু গুণ্ডা লাগিয়ে তাঁকে খুব মারে। ছাপ্পান্ন ছুরির দাগ বসে তাঁর সর্বাঙ্গে, মুখেও চার পাঁচটা। তাই তাঁর নাম হয় ছপ্পন ছুরি। এ-রটনা সত্য না আষাঢ়ে গল্প জানি না, তবে তাঁর মুখে কয়েকটি কাটা দাগ তাঁর কালো কুশ্রী মুখকে আরো কুরূপ করে ফেলেছিল এ নিশ্চয়। কিন্তু ঐ যে বললাম, কান যখন পেয়ে বসে তখন চোখকে বলতেই হয়—"হার মেনেছি।" জানকী বাই একটি গান শেষ করতে না করতে

আমার কাছে তিনি হয়ে দাঁড়ালেন সাক্ষাৎ কিন্নরী। বাড়ির কর্তা (মাড়োয়ারি) আমাকে পেশ ক'রে দিলেন: "বাই সাহেবা, য়হ লড়কা বহুৎ আচ্ছা গাতা।"

গায় অনেকেই, কিন্তু বাঙালি ভদ্রঘরের ছেলে গাইতে পারে এহেন গুজব শুনে বাই সাহেবা মুচকে হেসে সভ্রূভঙ্গে বললেন: "ঐসা?" আমার পৃষ্ঠপোষক দমবার পাত্র নন, বললেন; "তব্ ক্যা? ওর খাস করকে আপকা গানা গাতা।" বাই সাহেবার ঔদসীন্য মিশেল অবজ্ঞা একটু ফিকে হয়ে এল, আমার দিকে চেয়ে বললেন: "কৌন্সা গানা?" আমি অনেকগুলি গানের নাম করলাম, বাই সাহেবা অতঃপর গাইতে বললেন। আমি কোন্ গানটা গেয়েছিলাম মনে নেই, তবে মানের দায়ে প্রাণের মায়া ছেড়ে গেয়েছিলাম মনে আছে—অবশ্য সারঙ্গির সঙ্গতে নয়, হার্মোনিয়ম বাজিয়ে।

গান শুনে বাই সাহেবার তেরছা ভুরু সোজা হ'য়ে এল; প্রসন্ন হেসে বললেন, "বহুৎ আচ্ছা বেটা—তুন্ লায়েক লড়কা হো।" তারপরেই: "কভি এলাহাবাদ আওগে?" আমি আহ্লাদে আটাত্তর খানা। সাক্ষাৎ জানকী বাইয়ের নেকনজরে প'ড়ে গেছি, আটাত্তর খানা কি—তার দশগুণ সাতশো আশি খানা হ'য়ে নির্বাণ লাভ করবার অবস্থা। বললাম যেতে পারি যদি তিনি গান শেখান। জানকী বাই এবার স্নেহে গ'লে গেলেন, মাথা নেড়ে পিঠে দিলাসা দিয়ে বললেন: "মগর আনা, ভুলনা নহি। আচ্ছা?"

এ-ঘটনাটি আমার গীতিজীবনের একটি কীর্তিস্তম্ভ বলবই বলব, লোকে হাসলেও গ্রাহ্য না ক'রে। কারণ লোকে কী জানে—জানকী বাইকে আমি গ্রামোফোন শুনেই আমার বালক হৃদয়ের কোন্ ময়ূরসিংহাসনে বসিয়েছিলাম পনের ষোলো বৎসর বয়সে?

তারপর জানকী বাই বললেন: "ক্যা গাউঙ্গি?" আমি উৎফুল্ল হ'য়ে বললাম: "ঝমাঝম্। জানকী বাই ধ'রে দিলেন—গারা রাগিণীতে:

পানি ভরে রী কৌন অলবেলী কী নার ঝমাঝম্...

ঘুরে ফিরে কেবলই তান শোমে ফিসে আসে—"ঝমাঝম্"। আর মনে হয় যেন সৌন্দর্যের সোনালি বারিপাত হচ্ছে। রাতে ঘুমিয়ে স্বপ্নেও শুনি—ঝমাঝম্"!

ম্যাট্রিকে পরীক্ষা দিতে গিয়েও কেবলই মনের তারে বেজে ওঠে ঝমাঝম্... ঝমাঝম্। কলে কম্পীট করা হ'ল না, সাতশোর মধ্যে পাঁচশো চুয়ান্ন পেয়ে দশ টাকা বৃত্তি পেলাম। আমার উপরে ছিল জনকুড়িক ছাত্র। আমার সতীর্থ ক্ষিতীশপ্রসাদ (চট্টোপাধ্যায়) পেল ছশো আঠার, হ'ল সপ্তম। সুভাষ তার চেয়েও বেশি নম্বর

পেয়ে হ'ল দ্বিতীয়। শ্রীপ্রমথনাথ সরকার হলেন প্রথম—কত নম্বর পেয়ে বলতে পারি না। গান পড়াশুনোর ক্ষতি করে না একথা আদর্শবাদীর মুখে রটতে পারে, কিন্তু বাস্তববাদীর অভিজ্ঞতা তাতে সায় দেয় না।

পরীক্ষায় ফল আশানুরূপ না হ'লেও দুঃখ হ'ল ভাবতে যে পিতৃদেব আমার বৃত্তি পাওয়া দেখে গেলেন না। তবে হয়ত তিনি দুঃখ পেতেন আরো বেশি যে, আমি কুড়ি টাকা বৃত্তি পেয়ে কম্পীট করলাম না—যা তিনি চেয়েছিলেন। হয়ত বলতেন: "বললাম পরীক্ষার ঠিক আগে এখানে ওখানে গানের জলসায় না যেতে—"

যাহোক বৃত্তি পাওয়ার দরুণ সুবিধা হল—প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থান পেলাম। না পেলে আমার কৈশোর জীবনের সবচেয়ে বড় লাভ—সুভাষের সঙ্গে আলাপ হ'ত না হয়ত। কিন্তু তার কথা বলবার আগে আমার কৈশোর জীবনের পরিবেশের কথা সংক্ষেপে কিছু বলা চাই।

১৯১৩ সালে যখন সন্ন্যাস রোগে পিতৃদেবের মৃত্যু হয়, তখন আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। মনে আছে—পিতৃদেবের মাঝে মাঝে বিষম লাগত ও কাশতে কাশতে মুখ লাল হ'য়ে উঠত। সে-সময়ে আমার সে যে কী উদ্বেগ হ'ত ভাষায় বোঝাতে পারব না। মনে হ'ত যদি হঠাৎ তিনি মারা যান?—অমনি নিশ্বাস যেন আমার বন্ধ হয়ে আসত।

তাঁকে ভালোবেসেছিলাম আমার পবিত্র পিতৃভক্ত বালক হৃদয়ের সংহত ঐকান্তিকতা দিয়ে। মনে আছে পিতৃহারা হবার পরে মনে হ'ত বুকের মধ্যে কোথায় যেন খালি হয়ে গেছে। গান হাসি গল্প কিছুই ভালো লাগত না। কিন্তু কারুর সামনে কখনো কাঁদি নি, এক পিতৃদেবের দেহান্তের দিন ছাড়া। একদিন গিরিশ মেশোমহাশয় এসে বললেন, "মণ্টু বাবা! অমন কোরো না। মাঝে মাঝে খুব কেঁদে নিও, নইলে ভেঙে পড়বে। বেশি চেপে রাখা ভালো না।" বলতেই নিরুদ্ধ অশ্রু উথলে উঠল, তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে সে কী কান্না! তিনিও চোখের জল মোছেন আমার বুকে চেপে ধ'রে।···

আমার মাতামহ বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এসময়ে তাঁর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়িটি বড়মামাকে ছেড়ে দিয়ে মেজমামা খগেন্দ্রনাথ, ছোটমামা নরেন্দ্রনাথ ও অবিবাহিতা ছয় মাসিকে নিয়ে থিয়েটার রোডের বাড়িতে আসেন। থিয়েটার রোডের বাড়ি ছিল প্রাসাদবিশেষ। সে সময়ে থিয়েটার রোডে আর একটিও বাঙালির বাস ছিল না। কাছাকাছি ক্যামাক স্ট্রীটে ছিলেন বটে

কয়েকটি বাঙালি ওমরাও—অফিশিয়াল, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমাদের আলাপ ছিল না। তাই দাদামহাশয় আমাকে ও মায়াকে থিয়েটার রোডে নিয়ে এলেন, তখন আমার প্রথম প্রথম এ-নির্জন পাড়াটি অত্যন্ত খারাপ লাগত। তবে আমরা প্রায়ই সকালে এসে জুটতাম ২০৩।১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে আমার বড়মামিমার কাছে। তিনি ১৯০৩ সালে আমার মার মৃত্যুর পর থেকে আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। থিয়েটার রোডে আমার ব্যারিস্টার মেজমামা আমাকে গভীর স্নেহ করলেও প্রথম দিকে তাঁর স্নেহের গভীরতা আমি বুঝতে পারি নি, কারণ তিনি একটু চাপা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন: কিন্তু যতই দিন গিয়েছে ততই বুঝেছি যে এ-সংসারে এমন অনাবিল স্নেহ কালেভদ্রে দেখা যায়। তিনি যাঁকে বিবাহ করেন তাঁকে আমরা ডাকতাম মন্দামামিমা ব'লে—এখানে তাঁকে মেজমামিমাই বলব। সে সময়ে তাঁর বয়স ষোলো—ছিপছিপে গড়ন, মুখশ্রী লাবণ্যে ভরা, হৃদয়টি স্নেহদিয়ে গড়া। বড় মামিমার মতন মেজমামিমাও আমাকে স্নেহ করতেন সর্বান্তঃকরণে। তাঁর মুখে কখনো একটি কড়া কথা শুনি নি আজ পর্যন্ত। তার উপর মেজমামিমা ছিলেন আমার প্রায় খেলার সাথী বললেই হয়—দৌড়ঝাঁপ করতাম তাঁর সঙ্গে থিয়েটার রোডের মস্ত ছাদে। কিন্তু বাঙালি মেয়ে তো—ষোলোতেই গিন্নী—আমাকে ডাকতেন "মণ্টুবাবা" বলে—যেন তিনি সত্যিই আমার নাড়ী কেটেছিলেন। বাংলার জলহাওয়ায় অল্পবয়সী মেয়ের মধ্যেও যে মাতৃস্নেহ এত সহজে বিকশিত হ'য়ে উঠতে পারে এ আমি উপলব্ধি করি প্রথম মেজমামিমাকে দেখে।

মেজমামা তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। চল্লিশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে তিনি মামিমাকে ছেড়ে পাঁচ সাতদিনের বেশি থাকেন নি বললেও অত্যুক্তি হবে না। বড়মামা বড়মামিমা ও আমার মাসিরা তাঁকে ঠাট্টা করতেন স্ত্রীর নেওটো বলে। কিন্তু মেজমামা গ্রাহ্যও করতেন না, হেসে বলতেন মেজমামিমাকে: "সাত পাকে যাকে জড়িয়েছ সাতান্ন উল্টো পাকেও তার হাত থেকে ছাড়ান পাবে না।"

মেজমামা সত্যি খুব রসিক ছিলেন। নইলে তাঁকে আমি ক্রমশ ভালোবাসতে পারতাম কি না সন্দেহ। একটি দৃষ্টান্ত দেই তাঁর রসিকতার। একদিন নির্মলদা এসেছেন আমাদের এখানে থিয়েটার রোডে। মেজমামা বললেন: "কী নির্মল, বিয়ে করছ কবে?"

নির্মলদা: আর মামা বিয়ে! থিয়েটারের কাণ্ড তো জানেন না: কেঁপেই অস্থির ভয়ে—কে কী বলে।

মেজমামা : তবে আর কি, বিষে বিষক্ষয়। বিয়ে করো—কাঁপুনিতেই কাঁপুনি ছাড়বে।

নির্মলদা : সে কি, মামা?

মেজমামা (হেসে) : শোনো তবে। জানো তো দশ বৎসর আগে তোমার এই মামিমাটিকে ঘরণী করি? আচ্ছা। এখন হ'ল কি জানো? বাসর ঘরে ছিল একটি মাত্র লেপ। সে কী দারুণ শীত রে বাবা! রাতে দুজনে মিলে এক লেপে অঙ্গ মুড়ে শুলাম বটে, কিন্তু মাঝ রাতে উঠে দেখি তোমার মামিমা খাটের এক কোণায় গুটিয়ে গেছেন লেপটিকে দুবার জড়িয়ে। না যায় তাঁর ঘুম ভাঙানো, না লেপ ছাড়ানো। তারপর বাকি রাতটা সে কী কাঁপুনি বলব কী? আজও সে কাঁপুনি থামে নি—তবে শীতে নয়, ওঁর ভয়ে।

কিন্তু মেজমামার কথা মুলতবী রেখে আপাতত থিযেটার রোডের পরিবেশের কথাটা আর একটু গুছিয়ে ব'লে নিই।

আমার মা ছিলেন বাড়ির বড় মেয়ে। তাঁর পরে আসেন আমার নয় মাসি ও তিন মামা। দিদিমা বলতেন : "জানিস! সুর (আমার মা), বলত বড় গলা ক'রে : আমরা তের ভাই বোন। সবাই বেঁচে ছিল রে—আঁতুড় ঘরে কেউ মরে নি। তবু মুখপোড়ারা বলে বেশি ছেলেমেয়ে ভালো নয়। কেন গা! ছেলেমেয়ে তো ভগবানের দান। এই এত বড় বাড়ি খাঁ খাঁ করত নাকি যদি পেটে দুচারটি গুঁড়ো-গাঁড়া না ধরতাম!"

এই রকম ছিল তাঁর বেপরোয়া সেকেলে কথার ভঙ্গি। যথা, আর একটা উদাহরণ : "মোটা?" বলতেন তিনি, "তাই হয়েছে কী? আমাদের এম্‌নিই আড়ন—ছিনে-পড়া আড়ন নিয়ে যারা জন্মায় সে-মুখপোড়ারা চিঁ চিঁ ক'রে মরুক : আমাদের শত্তুর রোগা লিকলিকে হোক, আমরা রোগা হ'তে যাব কী দুঃখে শুনি?" দিদিমা ছিলেন বহরে দশাসই। যাকে বলে গজেন্দ্রগামিনী—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে।

কখনো খুব হাসতেন, অনেকে তাঁর ধনদৌলতকে ঈর্ষা করতে ব'লে। বলতেন : "আমাদের জাতের এ স্বভাব গো, আর স্বভাব যায় না ম'লে—বলে না? কোথায় পড়েছিলাম, জানিস মণ্টু, এক গিন্নী জ্বলে পুড়ে মরত পাড়াপড়শীর শ্রীবৃদ্ধি দেখে, বলত রাতদিন সুর করে :

ওলো দাসী সর্বনাশী। ছাতে এসে দেখ আসি'
যত পাড়া প্রতিবাসী হাসি হাসি মুখ লো।

দেখ্—সাদা ভাতে ওলো কী সুগন্ধ, আরে মোলো
খাঁটি দুধ, নয় জোলো—জ্ব'লে যার বুক লো!"

আমাকে নানা জায়গায় গাইতে যেতে হ'ত। দিদিমার সদাসর্বদাই ভয়, পাছে গাইতে গাইতে আমার গলা ভেঙে যায়, কি অসুখ করে। বলতেন: "দেখ্, ওরা তোর সামনে হার্মোনিয়ম দিয়ে যদি বলে—'চেঁচা', তুই বলবি—না বাপু, চেঁচালে আমার গলা ভেঙে যায়।' যদি বলে—'পচা মাছ খা', তুই বলবি: 'না, পচা মাছ খায় বাগদিরা—খেলে অসুখ করে ভদ্দরঘরের ছেলেদের।"

দিদিমা যে এই ভাবে নিত্য নতুন কত রকম সম্ভব অসম্ভব বিপদ আপদের কথা আগে থেকে ভেবে তাদের কাটান বাতলে দিতেন, শুনে আমরা হেসে গড়িয়ে পড়তাম—যদিও বলাই বাহুল্য যে, তিনি কিছু কৌতুকরসের উদ্রেক করতে বলতেন না এসব। হয়েছিল কি, তাঁর কল্পনা ছিল শুভবুদ্ধির চেয়ে অনেক জোরালো। যথা: হঠাৎ লোহার সিন্দুকের চাবি পাওয়া যাচ্ছে না, চেঁচিয়ে উঠলেন: "ঐ হয়েছে—শিবু (চাকর) রেখেছে লুকিয়ে ময়দার মধ্যে। চাবির ছাপ রেখে ফেরত দেবে, তারপর সেই মাপের চাবি গড়িয়ে আমি কোথাও গেলে লোহার সিন্দুক খুলে..." ইত্যাদি। মেজমামিমা হেসে বলতেন: "মা, চাকরদের মাথায় এত বুদ্ধি খেলত না যদি না আপনি ঢুকিয়ে দিতেন।" কখনো বা দিদিমা মেজমামিমাকে বলতেন: "বৌমা, দুধ জ্বাল দেবার সময়ে ঘর ছেড়ে যেও না একবারও—যদি যেতে হয় কাউকে বসিয়ে তবে যাবে, নইলে চাকর বামুনে হাতায় ক'রে সরিয়ে রাখবেই রাখবে..." ইত্যাদি। পরে একদিন মেজমামিমা আমাকে বলেন: "মণ্টুবাবা! জানিস—মা মিথ্যে বলেন নি, সত্যিই ওরা দুধ সরায়—হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে আজ......" সেদিন আমার মাসিদের মধ্যে সে কী উত্তেজনা—যেন জালে হাতী পড়েছে!

উত্তেজনা না হবে কেন? পাঁচ পাঁচটি জলজ্যান্ত মাসি! একটি বিবাহিতা, স্বামী নিয়ে থাকেন থিয়েটার রোডের এক ঘরে। তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। আরো অজস্র ছেলেমেয়ে আসত বড় মামার ও অন্য নানা আত্মীয়ের। বাড়ি সরগরম। এহেন পরিবেশে কাকচিলে একটা কচুরি ছোঁ মেরে উধাও হ'লেও সবাই অট্টরবে পালা গান ধরে হট্টরাগিণীর—বামুন চাকর চোরাগোপ্তা দুধ খেয়ে যায় এ তো চিত্তোন্মাদী—সেন্‌সেশনাল খবর!

থিয়েটার রোডে একটি মস্ত হল ঘর ছিল। এখানে পরে—যৌবন অধ্যায়ে—আমি বিলেত থেকে ফিরে গানের আসর জমাতাম। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন

আই-এস-সি পড়া শুরু করি তখন কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে গিয়ে হিন্দি গান শিখতাম বকুবাবুর কাছে। এই প্রথম জলজ্যান্ত ওস্তাদের কাছে হিন্দি গান শিখে আমার সে কী ফুরতি!—"আজি রে মোহন বংশী বাজি রে আরে—সা নি ধা পা মা গা রে গা রে রে সা।" বকুবাবু ছিলেন বিখ্যাত অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল, এম-এ, পি-আর-এস শ্রীউপেন্দ্রলাল মজুমদারের ভাইপো—অল্প বয়সে ব'কে যান। রাতে ঘরের রেলিং ফাঁক ক'রে থিয়েটারে ছুটতেন। মদ গাঁজা সব তাতেই ছিলেন সমান পটু। উপেনদা —যিনি কোন পরীক্ষায় জীবনে সেকেণ্ড হননি—বিবাহ করেছিলেন আমার বড় জ্যেঠামহাশয়ের মেয়ে উষাদিকে। উষাদির কাছে শুনতাম কীভাবে বকুবাবু ব'কে গেলেন। উষাদি গল্প করতে একবার শুরু করলে আর থামতেন না। বিশেষ আমাকে পেলে। আমাকে তিনি কী যে ভালোবাসতেন! কেবল তাঁর ভয় ছিল পাছে বকুবাবুর মতন গান গান ক'রে আমারও ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়। আমি সন্ন্যাসী হ'য়ে পণ্ডিচেরি চ'লে গেলে তিনি কেঁদে সারা। উপেনদা তখন তাঁকে না কি ধম্‌কেছিলেন: সংসারী ঢের আছে ও হবে গো তোমাদের বংশে। একটি মাত্র ছেলে হয়েছে সাধু, আনন্দ করো—'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা গেয়ে।' সঙ্গে সঙ্গে রুখে উঠে আমাকে উদ্দেশ ক'রে একটি দীর্ঘ কবিতাই লিখে ফেললেন সঘনে। তিনি শেষ বয়সে গীতাবাদী হ'য়ে সত্যিই ধার্মিক হয়েছিলেন—তিন তলার ঘরে একা সাধনভজন করতেন শ্মশ্রুল আচারী হ'যে আমাকে বলেছিলেন: "তুমি মহাভাগ্যবান্ ভায়া, যে শ্রীঅরবিন্দের মতন গুরুর সেবা করার অধিকার পেয়েছ।" তাঁর লেখা কবিতাটি তাঁর দেহ রক্ষার পরে সুযোগ্য পুত্র ভক্তিমান্ (ডাক্তার) ব্রজেন্দ্রলাল আমাকে দেয়। তা থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করলে তাঁর বৈরাগ্যাশ্রিত মনটির কিছু পরিচয় দেওয়া হবে। কবিতাটির শিরোনামা ছিল "মণ্টু":

ওহে ত্যাগী, ওহে বিরক্ত সন্ন্যাসী!
লহ অর্ঘ মোর। এ-সংসারে আসি'
পরিহরি' ভোগ নবীন যৌবনে
ভ্রমিতেছ হেথা কার অন্বেষণে?
যাহা কিছু ছিল দিলে বিলাইয়া
সঙ্গীতে কীর্তনে আজ উচ্ছ্বসিয়া
সকলের মনে বিরাজে যে-জন
চাও কি করিতে তাঁহারি পূজন?

আমার দাদামহাশয় ছিলেন একটু সেকেলে লোক। তিনি নিজেকে নিশ্চয়ই সেকেলে ভাবতেন না। আমরাও তো আজ ষাটের কোঠা পেরিয়ে পেয়েছি তাঁর পদবী। তবে আজকাল যখন তরুণরা জনান্তিকে বলাবলি করে—"আহা বেচারি! ওল্ড. ফ্যাশণ্ড!" তখন কেবল সাহেবি শ্লোকটি মনে করে সান্ত্বনা পাই:

We think our fathers tools, so wise we grow !
Our wiser children will, too, think us so.

দাদামহাশয়কে কেন সেকেলে বলছি? প্রধান কারণ—তিনি চাইতেন আমার বিবাহ দিতে—বিলাত যাবার আগেই। দ্বিতীয়—বেশি গান বাজনা করা নিরাপদ নয় ও কেন নয় নানা যুক্তি দিয়ে আমাকে বোঝাতেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন থিয়েটার রোডে কোনো গানের আসরই বসাই নি। এমন কি আমার গানও সামনে ব'সে তিনি কোনোদিন শোনেন নি। শুনবার সময়ই বা তাঁর ছিল কোথায়? ভোর পাঁচটায় তিনি উঠে হাত মুখ ধুয়ে, প্রার্থনা ক'রে প্রাতরাশ সেরে রাউণ্ডে বেরুতেন, একটার সময় ফিরে দিদিমার হাতে একরাশ টাকা দিতেন—চৌষট্টি টাকা ফী। বিকেলেও ফের আর এক রাউণ্ড। প্রতিদিনে তিনি কম ক'রেও ন' দশটা ফী পেতেন বই কি। তাছাড়া কর্পোরেশন স্ট্রীটের বিখ্যাত ডিস্পেন্সারিতে অজস্র ওষুধ বিক্রির টাকা। যিনি নিযুতপতি হয়েছিলেন অনেকদিনই, থিয়েটার রোডে এসে তাঁর প্রতিপত্তি আরো বেড়ে গেল—বাঙালি প্রথম জেঁকে বসল সাহেবি পাড়ায়—জমবে না খাতির?

তবে সত্যিই খাতির করবার মতন মানুষ ছিলেন তিনি। আমার দিদিমা আট বৎসর বয়সে বিধবা হন। বারো বৎসরে দাদামহাশয় তাঁকে বিবাহ করেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাৎ সমর্থনে। ফলে তিনি জাতে-ঠেলা হ'লেও বলং বলং অর্থবলম্—মাসিদের বিবাহ আটকায় নি। কিন্তু অত টাকা যাঁর তাঁকে কখনো ভুলেও টাকার জাঁক করতে শুনিনি। মাটির মানুষ ছিলেন তিনি। ফি বছর কুষ্টিয়ায় স্বগ্রামে যাবেন দুর্গোৎসব করতে। গ্রামের জীবনের নানা সুখ শান্তির কথা প্রায়ই বলতেন আমাদের কাছে—যে-সরল জীবনযাত্রার পাঠ এ-যুগে উঠে যাবার জো হয়েছে। শহরের হাজারো উত্তেজনা আতিশয্যের ডামাডোলেও তাঁর কোনোদিন চিত্তবিক্ষেপ হয় নি—ঘড়ির মতন চলতেন এই অশ্রান্ত কর্মী, বিখ্যাত ধন্বন্তরী, অমায়িক পরোপকারী। দরিদ্রের কাছে ফী নিতেন না, কিন্তু ধনীকে রেহাই দিতেন না। ফলে ধনীরাও তাঁকে খুব খাতির করত—আরো এই জন্যে যে

তিনি একবারে নিঃস্ব অবস্থা থেকে উঠেছিলেন ঐশ্বর্যের শিখরে—যাকে ইংরাজীতে বলে self-made man.

বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন দাদামহাশয়ের আদর্শ। প্রায়ই বলতেন: "জানিস আমিও ঠিক তাঁরই মতন নিরাশ্রয় ছিলাম। এই কলকাতায় হেদোর ধারে বেঞ্চে শুয়ে রাত কাটিয়েছি কতদিন। আমি উঠেছি শুধু ঐ মহাপ্রাণ মানুষটির আশীর্বাদে, তাঁরি দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। বিধবা-বিবাহ করবার মতন বুকের পাটা কি আমার হ'ত রে যদি তিনি না থাকতেন পিছনে?"

দিদিমা শুনে সময়ে সময়ে হেসে টুকতেন: "বিধবাকে বিয়ে ক'রেই বেঁচে গেলে গো—আমার প-য়ে বুঝলে? নইলে তোমার মতন রোগা পটকাকে পুঁছত কে শুনি? জানিস মণ্টু, উনি এমন রোগা ছিলেন যে যখন আমার ফের বিয়ে হয় তখন শত্রুরা বলেছিল: এ-মেয়ে আবার বিধবা হবেই হবে—এ লিকলিকে বর কি বাঁচবে গা?" ব'লেই বড় গলা ক'রে: "এ আমার কথার কথা নয় ধন! বাবা আমাকে ব'লে গিয়েছিলেন: 'তুই যে বড় সেই বড়ই থাকবি।' তাই তো বাবুর (দাদামহাশয়কে তিনি 'বাবু' বলতেন) এত বোলবোলা। নইলে ওঁর কী ছিল সেদিন শুনি?—শুধু কি রোগা? তারপর দেখ্ না খাঁদা নাক—" বলে দিদিমার সে কী হাসি! তারপরেই আমাকে: "তাই তো বলি মণ্টুবাবু, গিন্নি হ'ল বাড়ির লক্ষ্মী। অমুকের মেয়েটি দেখে এসেছি—(তিন মাস অন্তর একটি ক'রে নতুন হবু-নাৎবৌ তাঁর পছন্দ হ'ত আর আমাকে এসে ধরতেন—বৌ আনতেই হবে)—টুকটুকে বৌ রে, দেখলে আর চোখ ফেরাতে পারবি নে। লক্ষ্মীটি ধন! রাজি?"

আমি (শিউরে উঠে): কী বলছ নানি? এ যুগে রোজগেরে না হ'লে কেউ বিয়ে করে? (আমাদের পশ্চিমে এক আয়া ছিল, সেই আমাকে আর মায়াকে শেখায় দিদিমাকে নানি বলতে, আর দাদামশায়কে—দাদাভাই)

দিদিমা (মুখ ভার ক'রে): এ-যুগের কথা আর বলিসনে তুই—যেমন মেয়েরা হচ্ছে ধিঙ্গি তেমনি ছেলেগুলো হাবাতে। তাছাড়া তোর আবার রোজগারের ভাবনা কী শুনি? তুই বিলেতে গেলে তোর বৌ থাকবে আমার কাছে—তাকে এক গা গহনা দেব, তোর বাবাও যা রেখে গেছেন তোর পক্ষে অঢেল। তাছাড়া আমি তোকে একটা বাড়ি দেব—লক্ষ্মীটি ধন! আর অমত করিসনে—অমুকের বাপ আজ নিজে এসেছিলেন ধর্না দিতে।" আমি বললাম: "কিন্তু সে যে বড় মানুষের মেয়ে নানি, ঘোড়ায় চড়া মেয়ে!" দিদিমা ঝংকার দিয়ে বলতেন: "আর আমরা বুঝি

ভিখিরি? যা যাঃ, বড় মানুষ ঢের দেখেছি। বউ কাঁটা হ'য়ে থাকে যদি বর মানুষের মতন মানুষ হয়।"

দাদামহাশয় (তৎক্ষণাৎ ফোড়ন কাটতেন): "আর যদি বউ হয় দশাসই তবে বর হ'য়ে পড়েন মিইয়ে-পড়া মুড়ি—যথা, আমি।"

দিদিমা (খুশি হয়েও অপ্রসন্ন ভঙ্গিতে): তাই বটে! তোমাকে যে না চিনেছে সে এখনও মার গর্ভে আছে, বুঝলে? ওরে মণ্টু, বাবুর কথায় কান দিস নে—উনি দেখতেই ভালো মানুষ—ভিতরে ভিতরে জানিস নে তো কী—জিলিপির প্যাঁচ!

দাদামশায়: জানবে না কেন—চোখে রোজ দেখে? জানিস মণ্টু, আমি ছেলেবেলা থেকেই ওঁর নেওটো। হবে না? ঘরজামাই ছিলাম তো, সেই থেকে—জানিস তো গল্প: "অভ্যেস"?

আমি: অভ্যেস?

দাদা মহাশয়: জানিস নে বুঝি? এক যে ছিলেন জমিদার—ডাকসাইটে কায়দাদুরস্ত। বলতেন: 'আমার কী যে স্বভাব—রোজ দুটি করে বোম্বাই আম দুপুরে, দুটি রাতে। এ না হলেই নয়—কী শীত, কী গ্রীষ্ম।' কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করত বৈকি: 'কিন্তু শীতকালে বোম্বাই আম পেতেন কোত্থেকে?'—অমনি তিনি মুচকে হেসে পিট পিট জবাব দিতেন: 'ও কি জানেন? ও কেমন অভ্যেস!'

দিদিমাও উঠতেন হেসে।

দুই

থিয়েটার রোডে এসে আমার জীবনের ছন্দ একেবারে বদলে গেল। পিতৃদেবের সুরধামে আমাকে ঘিরে ছিল সাহিত্য, সঙ্গীত ও ধর্মের আবহাওয়া। থিয়েটার রোডের প্রাসাদোপম বিলাস-নিলয়ে আমার চারদিকে শুধু উপকরণের অজস্রতা, ঐশ্বর্যের ঝংকার, সংসারিয়ানার ঘর্ঘর। আমার ঘরটিতে একটি পরমহংসদেবের ছবির সামনে রোজ ধ্যান করতাম বটে, কিন্তু দুচার মাসের মধ্যেই দেখি মন আর তেমন ধ্যানে বসছে না। থেকে থেকে চোখের জলে নিবেদন জানাই: "ঠাকুর, দেখো তোমার প্রার্থনা যেন না ভুলি: যেন এই ভুবনমোহিনী মায়ার ফাঁদে পা না দিই, কোন বড় মানুষের মেয়েকে কি সুন্দরী ষোড়শীকে বিয়ে না করে বসি। মন যদি দুর্বল হয় তুমি জোর দিও।"

তবু মন হয়ত আমার দুর্বল হ'য়ে যেত (কে না জানে বিলাসের আবহে ইচ্ছাশক্তির মেরুদণ্ড ঋজু রাখা দুরূহ ?) যদি না কলেজে এর কাটান মিলত সুভাষের সংস্পর্শে। আমার জীবনের প্রথম রোমান্স নির্মলদা : দ্বিতীয়—সুভাষ। নির্মলদাকে আমি ভালোবেসেছিলাম আমার বালক-মনের উন্মুখ কোমলতা দিয়ে। সুভাষকে ভালোবেসেছিলাম সমৃদ্ধতর কৈশোরের সবে-জাগা আদর্শবাদ দিয়ে।

এমন কথা বলছি না যে আদর্শবাদ আমার কাছে অজানা ছিল। পিতৃদেব শুধু মনে প্রাণে নয়, অস্থিতে মজ্জায় ছিলেন আদর্শবাদী। সাহিত্য, দেশভক্তি ও বন্ধু-বৎসলতার আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল—বিশেষ ক'রে মাতৃদেবীর দেহান্তের পর থেকে। কিন্তু দেশসেবার জন্যে সর্বস্ব-নিয়োগের আদর্শ বলতে যা বোঝায় তা তো তাঁর ছিল না। বস্তুত দেশকে ভালোবাসলেও দেশের চেয়েও তিনি ভালোবেসে-ছিলেন সাহিত্য ও সঙ্গীতকে। সুভাষই প্রথম আমার সামনে এসে দাঁড়ালো দেশভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ হয়ে, দেশাত্মবোধের প্রাণোন্মাদী প্রতীক হয়ে। তার মতন দেশভক্ত আমাদের দেশে আর জন্মায়নি এমন অত্যুক্তি করব না, কিন্তু আমার কাছে তার দেশভক্তি ও পবিত্রতার দৃষ্টান্ত যেভাবে জীবন্ত ও জ্বলন্ত হয়ে উঠেছিল, তার ব্যক্তিরূপের আশ্চর্য চুম্বকে আকৃষ্ট হয়ে আমি যেভাবে তার আদর্শে আমার মনকে রাঙিয়ে তুলবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে উঠেছিলাম, তার প্রতি কথা, হাসি, ভঙ্গি যেভাবে দিনের পর দিন আমার মনকে উদ্দীপ্ত ও প্রাণকে আবিষ্ট ক'রে তুলতো তার বর্ণনা করব কোন্ ভাষা দিয়ে ?

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণশক্তির উদ্দামতা ক'মে আসেই আসে। কৈশোরে ও যৌবনে যে-সব স্বপ্ন অভীপ্সা আদর্শ আমাদের ডাকে সব ছেড়ে দুরভিসার বরণ করতে, সময়ে তাদের উন্মাদনা ক'মে আসেই আসে। হাজারো সাবধানী যুক্তি, সুবিধাবাদী প্ররোচনা, স্থিতিশীল বিচার পথ আগলে দাঁড়ায় ভয় দেখিয়ে, ভুল বুঝিয়ে, সুর নামিয়ে। কিন্তু কৈশোরে ও যৌবনে মহত্ত্বের দীপ্ত প্রভা প্রথম দিকে আসে যেন চোখ ধাঁধিয়ে। সুভাষকে আমার কিশোর মন এই ভাবেই বরণ ক'রে নিয়েছিল উচ্ছল হ'য়ে—বিহ্বল হ'য়ে। তার রূপে, কণ্ঠস্বরে, সমগ্র ব্যক্তিরূপের টানে আমি উধাও হ'তে চেয়েছিলাম তার নির্দিষ্ট পথে তারি নায়কতা মেনে—সর্বান্তঃকরণে। কোনো সমবয়সী কিশোর যে আমার মতন একগুঁয়ে কিশোরকে এভাবে অভিভূত করতে পারে এ আমি সুভাষকে দেখবার আগে বিশ্বাসই করতে পারতাম না। কিন্তু কীভাবে তার প্রভাব আমার উপর ক্রমশ সক্রিয় হয়েছিল একটু ব্যাখ্যা করবার

চেষ্টা করি—যদিও মানব-চরিত্রের অনির্দেশ্য চুম্বকের ঠিকমত ব্যাখ্যা হয় কি না বলা কঠিন। তবু চেষ্টা করি বলতে—যতটা পারি।

তখন আমি ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ি—পদবীতে স্কুলের সেকেণ্ড বয়, মহামেধাবী সতীর্থ শ্রীমান্ ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—আমার হিরো—ফার্স্ট বয়। নিবারণ মৈত্র ব'লে আমাদের একটি সহপাঠী কথায় কথায় আমাকে বলে: "কী তোমাদের ফার্স্ট বয় ক্ষিতীশ চাটুজ্জে! কটকে আমার বন্ধু সুভাস বোস পড়ছে—এ-বৎসরে সেও মাট্রিক দেবে। তোমার ক্ষিতীশকে মারিবে যে কটকে বাড়িছে সে, বুঝলে?"

আমি তো রেগে অগ্নিশর্মা, কারণ আমার অনিন্দ্য বন্ধু যে ম্যাট্রিকে প্রথম হবেই হবে এ সম্বন্ধে আমার মনে সংশয়ের বাষ্পও ছিল না। তার উপরে এ-সময়ে ক্ষিতীশ নব্বইটি ইংরাজি প্রবন্ধ মুখস্থ ক'রে ফেলেছে, অঙ্কে ১০০-র মধ্যে ১০০ পায়, সংস্কৃত ইংরাজি বাংলা সব-তাতেই চৌখস। শুধু কি তাই? সে খোদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রদৌহিত্র। সে-সময়ে ক্ষিতীশ আমার কাছে আদর্শ সুবোধ বালক। তার কথায় আমি উঠি বসি—মানে, স্কুলে। তাকে এম্‌নিই মানতাম যে একবার সে আমাকে এক বাইজির গান শুনতে মানা করায় আমি যেতে সাহস পাইনি। হয়েছিল কি, স্কুলে মানিক ব'লে একটি সহপাঠী ছিল আমাদের। সে ছিল সুবর্ণ বণিক—বড় মানুষ। তাদের বাড়িতে এক মস্ত বাইজির গান হবে এক বিবাহে। আমি তো পা বাড়িয়েই আছি। এ-হেন সময়ে, হা হতোস্মি! ক্ষিতীশ সভ্রূভঙ্গে ব'লে বসল: "ধিক্, ভালো ছেলে বাইজির গান শুনবে!" আমি অমনি ব'সে পড়লাম। ফার্স্ট বয় ক্ষিতীশের চোখে সেকেণ্ড বয় দিলীপ ছোট হ'য়ে গেলে শেষরক্ষা হবে কি? অথ—যাওয়া হ'ল না। দ্বিতীয়বার যখন জানকী বাইয়ের গান শুনতে যাই—ক্ষিতীশকে বলিনি ঘুণাক্ষরেও—ভালো ছেলের মন্দ বনবার দুর্দম দুরভিসন্ধির কথা। সর্বোপরি, ক্ষিতীশকে আমার পিতৃদেবও অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

এ-হেন ক্ষিতীশকে হারিয়ে দেবে কি না সুভাষ? কোথায় কলকাতা—ভারতের রাজধানী, আর কোথায় কটক—অজ পাড়া-গাঁ!—এহেন পরিস্থিতিতে গ্রাম্য অবোধ শহুরে সুবোধকে কোণঠাসা করবে? দুর দুর! নিবারণের সঙ্গে কথা বলাই ছেড়ে দিলাম।

কিন্তু ওমা! ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরুতেই চক্ষুস্থির: সুভাষই তো! সন্দেহের অবকাশ কোথায়? হয়েছে দ্বিতীয়। ক্ষিতীশ হয়েছে সপ্তম। দাদামহাশয়ের গল্প মনে পড়ল: "হা আল্লার ভিরকুটি!"

ভ্রূকুটিই বটে: তবে আল্লার নয়—সুভাষের। সেদিন রাতে তাকে স্বপ্নে দেখলাম—কোথায় তার ফটো দেখেছিলাম, সম্ভবত নিবারণেরই কাছে—শুভ্র সুন্দর উজ্জ্বল নির্মল! নিবারণের কাছে আরো শুনেছিলাম সুভাষের বিবেকানন্দ-প্রীতি, গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে সংস্কৃত-স্তোত্রপাঠ, দেশভক্তি—আরো কত কী! ফলে পূর্বরাগ মনের মধ্যে তার আবছা দ্যুতির মায়া বিছিয়ে দিল। সুভাষকে স্বপ্নে দেখেই বরণ করলাম তার ম্যাট্রিক কীর্তির টানে। না, শুধু এই কীর্তির টানে কেন বলছি? সুভাষের নাম তখনই ছাত্রমহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। মস্ত বাপের ছেলে, অধ্যাপকের প্রিয়, সহপাঠীদের হিরো, সর্বোপরি দেশের শ্রেষ্ঠ কিশোর জনসেবকদের অগ্রণী। তার উপর সে কি না ক্ষিতীশকে হারিয়ে দিল পরীক্ষায়? এ যে-সে মনুষ্য নয়—বলল আমার বিনত বালক মন—উচ্ছ্বসিত বিস্ময়ে।

অঘটন এ-যুগে ঘটে না? কে বলল? না ঘটলে প্রেসিডেন্সি কলেজে আসতে না আসতে তার দেখা মিলল কেমন ক'রে? প্রথম দিন মনে আছে—এক সহপাঠী বলল: "ঐ ঐ ঐ সুভাষ!" তখন সুভাষ ছাত্রজগতের নামজাদাদের মধ্যমণি, পড়ে আই-এ। আমি আই-এস-সি। কিন্তু এ-ক্লাস থেকে ও-ক্লাস যেতে দৃষ্টিবিনিময় তো হয়। আলাপ করতে কী যে তৃষ্ণা জাগে—অথচ সাহস পাই কই? এমন সময়ে বিধাতা সদয়নেত্রে তাকালেন। হল কি, কলেজের কী একটা সভায় আমি গান করতে নিমন্ত্রিত হই। তাতে সুভাষ জোর হাততালি দেয়। আমার তো হাতে চাঁদ এল! সুভাষের কাছে চিহ্নিত হলাম—তবু হব না আত্মহারা? মনে পড়ত বৈষ্ণব পদাবলীর গান: "দুঁহুঁ দোঁহা দরশনে উপজিল প্রেম—দারিদ্র্য বেঢ়ল যেন ঘটভরা হেম!" অর্থাৎ শুভদৃষ্টিতে প্রেম—সে কেমন? না, যেমন দরিদ্রের হাতে এক ঘড়া মোহর! এ না হ'লে প্রথম প্রেম? মার্লোর বিখ্যাত লাইনেরও সায় নেই কি: "Whoever loved that loved not at first sight?"

এক একজন মানুষ আসে—বহু দুঃখ কষ্ট ঝড় ঝাপটার মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে—যেন ভূমিকম্পের ফলে সহসা-উচ্ছ্রিত গিরিশৃঙ্গের মত। যেমন বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ। আর এক জাতের মানুষ আছে যারা আঁতুড় ঘরে জন্মায়ই সোনার টোপর প'রে। এদের বিলাতি নাম born leader: এরা জন্মালে যে-শাঁখ বাজে সে মামুলি আনন্দের শাঁখ নয়—বিস্ময়ের তূর্য ঘোষণা করে: এলো এলো ক্ষণজন্মা এলো—বরণ ক'রে ঘরে তোলো—যাদের দেখলেই মনে হয় টেনিসনের Sir Galahad-এর ঘোষণা:

My strength is as the strength of ten because my heart is pure. আমি এমন ইঙ্গিত করছি না যে এই জাতের মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের অন্তিম বিচার সমসাময়িক মানুষের হাতে নয়—মহাকালের দরবারে চরম অনুমোদনের পাঞ্জায় তার রেজিস্টারি। কিন্তু এই সদাচলমান অধ্রুববর্তিত্ত জগতেও এক একজন বরেণ্য কীর্তিমান্ আসেন যাঁদের নিয়ে ধুমধাম না ক'রে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। উৎসবের কৌস্তুভ হ'য়েই যে এসেছে তারা—তাদের নিয়ে উৎসব করব না তো করব কাকে নিয়ে? তাদের জীবনই একটা জয়যাত্রা। সুভাষ ছিল এই জাতের মানুষ। ঐ টেনিসনেরই ভাষায় এ জাতের মানুষকে দেখলেই আমাদের প্রাণ যেন গান গেয়ে ওঠে, বলে: Thou lead and I follow"

এর প্রমাণ মিলল হাতে হাতে। প্রেসিডেন্সি কলেজে আসতে না আসতে সুভাষ ডিবেটিং ক্লাবের দিক্‌পাল হয়ে উঠল। শুনলাম সে নাকি চমৎকার ডিবেট করে। তার সুগৌর ব্রহ্মচর্যপূত উজ্জ্বল মুখকান্তি যখন বক্তৃতা দিতে উঠতে ঈষৎ রক্তিম হয়ে উঠত তখন আমার চোখ শিউরে উঠত আনন্দে বিস্ময়ে। মনে হ'ত এ আমি পারতাম না—ইংরাজিতে বাগ্মিতগুা—উঃ!

কিন্তু হবি তো হ সুভাষের সঙ্গে প্রথম বাক্যালাপ হয় আমার এই ডিবেটিং ক্লাব নিয়েই। সে থাকত ৩৮।২ এলগিন রোডের বাড়িতে। আমি ৩৪ থিয়েটার রোডে। তার বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হয়েছে কতবারই—যাই সুভাষের সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি। কিন্তু সে-সময়ে আমি সত্যিই অত্যন্ত লাজুক ছিলাম। তার উপর সর্বস্তুত সুভাষের সঙ্গে যেচে আলাপ! অতটা বুকের পাটা আর যারই থাকুক না কেন—আমার ছিল না। শুধু মনে মনেই কল্পনা করতাম তার সঙ্গে গল্প করছি, বিদ্যা জাহির করছি সংস্কৃত আউড়ে, আর গুণপনা জাহির করছি গান গেয়ে।

এমন সময়ে থিয়েটার রোডে হঠাৎ সুভাষের অভ্যুদয়—পর্বতের চুড়া যেন সহসা প্রকাশ! বুকের মধ্যে মৃদঙ্গ বেজে উঠল আমার—যখন সুভাষ বলল: "আপনার গান শুনেছি। খুব ভালো। কিন্তু আরো চাই, আমাদের ডিবেটিং ক্লাবে আপনাকে যোগ দিতে হবে ও অ্যাক্টিভ পার্ট নিতে হবে।"

ঠিক এই কটি কথা—আজো স্মৃতির ফলকে খোদাই করা আছে। সেই যে প্রথম পরিচয়—ভোলা যায় কি?

আমি ভয়ে মিইয়ে গেলাম: "অ্যাক্টিভ পার্ট? কিন্তু……আমি যে আদৌ বলতে পারি না, শুধু গান গাইতেই পারি।"

সুভাষ হাসল। আহা, কী মিষ্টি হাসি রে! এর আগে তাকে হাসতে দেখিনি। কারণ কলেজে ছাত্রদের মাঝে সে বিষম গম্ভীরানন হয়ে থাকত। কিন্তু সেদিন তার মনের প্রসার, নির্মল ঔদার্য যেন তার হাসিতে চিকিয়ে উঠল। অমন অপরূপ হাসি আমি জীবনে বেশি দেখিনি, পিতৃদেবের হাসির পরে। সে বলল: "কিন্তু ডিবেটিং ক্লাবে তো গানের ডিবেট হয় না, হয় কথার ডিবেট। অতএব আপনাকে বলতেই হবে।—না আম্‌তা আম্‌তা নয়। পারবেন না? সে কি? পারতেই হবে। আমাদের দেশে ডেমোক্র্যাসি আনতে হলে তার মহলা দিতে হবে প্রথম ডিবেটিং ক্লাবে—যেমন ওরা দেয় কেম্ব্রিজে অক্সফোর্ডে।..." আরও এক গঙ্গা কথা বলে গেল সে—সব উদ্ধৃত করার দরকার নেই। তবে মোট কথা দাঁড়াল এই যে, আমাকে হতে হল ডিবেটিং ক্লাবের সভ্য। সুভাষ যখন কাউকে একবার উপরোধ করত তখন তাকে 'না' বলতে পারত খুব কম লোকেই।

কিন্তু ইংরাজিতে বলে না:

You can take a horse to the water but you cannot make him drink? আমারও হ'ল তাই। ডিবেটিং ক্লাবে যাওয়া আর ডিবেট করা তো সমার্থক নয়। তাছাড়া ডিবেট করব কী ছাই? যে যা বলে তখনকার মতন মনে হয় সত্যিই তো। কিন্তু কী আশ্চর্য, যেই সুভাষ ওঠে অমনি মনে হয় তার প্রতিপক্ষ শয্যা নিয়েছে সুভাষের তর্কবাণে ছিন্নভিন্ন হয়ে! সত্যিই যেমন চমৎকার ছিল তার ভাষণ ভঙ্গি তেমনি নিপুণ তার ওকালতি। পরের জীবনে সিঙ্গাপুরে সে জর্মন ভাষায় এক ঘণ্টা চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিল—তার সহকারিণী শ্রীমতী লক্ষ্মীর মুখে শোনা। লক্ষ্মীর নাম শুনে মাদ্রাজে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম সুভাষের দেহান্তের পর। সে বলেছিল উদ্দীপ্ত ভাষায় সুভাষের সম্বন্ধে কত কথাই যে! খেদ হয়—টুকে রাখিনি ব'লে। যাক—যা বলছিলাম।

তারপর সুভাষের সঙ্গে আলাপ শুরু হয়। মাঝে মাঝেই সে থিয়েটার রোডে আসত ডিবেটিং ক্লাব কি অন্য নানা কাজের প্রস্তাব নিয়ে। আমরা বেড়াতে বেরুতাম—চৌরঙ্গির মাঠে বসে দুই বন্ধুতে কথা হত সূর্যাস্ত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। আহা সে যে কী আনন্দের দিনই গেছে। সুভাষ কত কথাই যে বলত—দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন, ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা, আদর্শনিষ্ঠা, ধ্রুবের জন্যে অধ্রুবকে ত্যাগ...কত কী! ওর কয়েকটা উদ্ধৃতি কেবল মনে আছে। কখনো বলত রবীন্দ্রনাথের একটি পদ উদ্ধৃত

করে যে নির্ভীক হ'তে হবে : "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।" কখনো বা আবৃত্তি করত ওর প্রিয় কবি বাইরনের চাইল্ড্ হ্যারল্ড্ থেকে : "Fair Greece! Sad relic of departed worth! Immortal, though no more; though fallen, great! (কান্তিময়ী গ্রীস! যার অস্ত গেছে অবর্ণ্য মহিমা! চিরঞ্জীবী, তবু নাস্তি—ধূলিলীন তবু মহীয়ান্।) ব'লেই বলত "এখানে গ্রীসের স্থলে Ind লেখা যেতে পারে আমাদের মধ্যে।"

কখনো বা উদ্ধৃত করত রোম প্রসঙ্গে বাইরনের উচ্ছ্বাস :

O Rome! my country! city of my soul (রোম! ওগো স্বদেশ আমার! হৃদয়ের বৃন্দাবন!) বলত ধরা গলায় : "দিলীপ! তোমার পিতৃদেব কী অপরূপ চরণই লিখেছিলেন : 'আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি! তোমাকে সর্বদা গাইতে হবে এই সব গান :

ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র!'

পরের জীবনে কতবারই সে নানা সভায় আমাকে বলেছে পিতৃদেবের স্বদেশী গান গাইতে ও গান শুরু হ'তে না হ'তে দেখেছি তাকে নিস্পন্দ, তন্ময়। দেশকে এভাবে ভালোবাসতে পারে কজন? আজকের দিনে দেশধ্বজের অবশ্য অপ্রতুল নেই, কথায় কথায় যাঁরা দেশ দেশ করে গলদশ্রু হতে সক্ষম। কিন্তু দেশের জন্যে সত্যি প্রাণ কাঁদে কজনের?

শুধু প্রাণ কাঁদাই নয়। পরের দুঃখে, দেশবাসীর দুঃখে দুঃখ বোধ করেন হয়ত অনেকেই, কিন্তু আমাদের দরদের মধ্যে প্রায়ই লুকিয়ে থাকে এক নিশ্চেষ্ট তামসিক আত্মপরতা কিংবা বেঁচে বর্তে থাকার দুরন্ত আগ্রহ। এমন কথা বলছি না যে আমরা যখন দেশের দুঃখে দুঃখিত হই তখন আমাদের মন আর্দ্র হয় না, কি 'আহা আহা' যখন বলি তখন বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে না। কিন্তু তারপর যদি কেউ প্রশ্ন করে : "তা তো হল, এখন করবে কী শুনি দেশোদ্ধারের জন্যে?"—তখন আমরা মাথা চুলকে বলি ইন্দ্রনাথের ভাবায় : "দেশ তো দেশেই আছে, কী আর উদ্ধার?" এক কথায় একে বলে playing safe. আমার মনে আছে একদিন শ্রীশরৎ বসুর বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে রাত তিনটে অবধি আমাদের গল্প। আমি তখন পণ্ডিচেরি আশ্রম থেকে মাস কয়েকের জন্যে কলকাতা ফিরেছি। সুভাষ বলল কথায় কথায় যে আমাদের দেশের দুর্গতির একটি প্রধান কারণ এই যে

আমাদের দেশের আদর্শবাদী ছেলেরাও আদর্শকে কাজে খাটানোর সময় কিন্তু কিন্তু করে।

আমি: অন্য দেশেও কি করে না?

সুভাষ: করে—যারা গড়পড়তা—যারা আদর্শবাদী নয়। আইরিশদের মধ্যে দেখতে পাবে কী অদ্ভুত তাদের পণ—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন যাকে বলে। জাপানিরা মুখে ভুলেও উচ্ছ্বাস করে না, কিন্তু suicide squadএ যোগ দিতে তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এদের কথা মনে করেই লিখেছিলেন না কি: 'ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা?' দেখ না অমুকের কথা—আদর্শবাদী ব'লে আমরা এক সময়ে তার কী জয়ধ্বনিই করেছি। বিবাহের আগে সে সত্যিই ছিল আদর্শবাদী। কিন্তু বিবাহের পরে কী করছে বলো তো—একটা চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরি নেবার সময়েও কী আপ্রাণ চেষ্টা তার বলো তো যাতে দুই কুলই বজায় থাকে। আমার সঙ্গে কী ঝগড়াটাই না সে করল যাতে অমুককে তার ছেড়ে-দেওয়া-কাজে বাহাল করা না হয়। Playing safe, playing safe, দিলীপ! কেউ চায় না আদর্শের জন্যে কিছু পণ রাখতে—আমাদের মেরুদণ্ডেই ঘুণ ধরেছে যে ভাই, চলতে গিয়ে না ট'লে পারি?"

আমি সুভাষকে বললাম—যে-কথা বিলাতেও ওকে বলতাম প্রায়ই: "সুভাষ, তোমার একটা মস্ত দোষ এই যে তুমি প্রত্যেকের কাছেই আশা করো যে সে চলবে তোমার চলার ছন্দে—'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন' গান গেয়ে অভীঃ স্বরে।"

যারা অস্থিতে-মজ্জায় আদর্শবাদী তারা প্রায়ই এই ভুলটি ক'রে থাকে কেননা যে-ত্যাগ তাদের কাছে শুধু কর্তব্য নয় স্বভাবসিদ্ধ সে-ত্যাগ যে অপরের কাছে দুরায়ত্ত হতে পারে এটা তারা ভুলে যায় সহজেই। তাই সুভাষের সম্বন্ধে অনেকেই বলত যে, সে মানুষ চিনতে পারে না। কিন্তু এই মানুষ চিনতে পারা কি চাট্টিখানি কথা? বহু ঘা খেয়ে তবে মানুষ এই সাদা কথাটি বুঝতে শেখে যে "যা চকচক করে তাই সোনা নয়।" শুধু তাই নয়, আদর্শবাদীদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় এক ধরনের অসহিষ্ণুতা। যেমন ওয়াশিংটন—বলতাম আমি প্রায়ই সুভাষকে। একদিন তাঁর পুরনো বিশ্বাসী সেক্রেটারি কয়েক মিনিট দেরি ক'রে হাজিরি দেন। ওয়াশিংটন তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন: "আমার ঘড়িটা স্লো ছিল স্যর।"

তাতে ওয়াশিংটন বলেন : "তাহলে হয় তোমাকে ঘড়ি বদলাতে হবে, নয় আমাকে—সেক্রেটারি।" সুভাষ শুনে হাসত কিন্তু স্বীকার করত না যে ওয়াশিংটন বাড়াবাড়ি করেছিলেন। দেশসেবার প্রসঙ্গে সে ছিল যে স্বভাবে একরোখা। যা কিছু দেশের কাজের অন্তরায় তার কাছে বর্জনীয়—কতকটা যেমন বৈরাগীর কাছে সংসার। একটা উদাহরণ দেই আমার যৌবন অধ্যায় থেকে। তখন আমি বিলেতে। আমার বাসায় আসতেন প্রায়ই আমার এক কবিবন্ধু যিনি ছিলেন একটু সুরাসক্ত। সুভাষ বলত তার সঙ্গে না মিশতে। আমি বলতাম : "সুভাষ তোমার এই এক আবদার—সংসারে নিখুঁত মানুষ নৈলে তার সঙ্গে মিশব না—এ-ধনুর্ভঙ্গ পণ নিলে যে শেষটায় ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হবে ভাই?" সুভাষ অম্লান, জবাব দিত : "তাই বলে জেনেশুনে ঠককে কোল দিতে হবে না কি? না দিলীপ, তোমারও এই এক মস্ত দোষ আছে, তুমি যার তার সঙ্গে মিশে তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করো। মনে রেখো—" একথাটি বলত সে প্রায়ই জোর দিয়ে—"দেশ তোমার কাছে অনেক কিছু আশা করে, আর আমাদের দেশের এতই দুর্দশা যে, আমাদের অনেককেই ম'রে তবে দেশকে বাঁচাতে হবে। এ ছাড়া পথ নেই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়, ভাই। তোমার ঐ কবিবন্ধুটি কবিতা লেখেন হয়ত অনবদ্য। কিন্তু রবিবাবুর গান তুমিই কি গাও না—"এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি?" না দিলীপ, তোমাকে আমরা কিছুতেই অব্যাহতি দেব না এখনো আমরা নাবালক ব'লে। এই বয়স থেকেই তৈরি হ'তে হবে দেশের সেবক হ'তে। যেমন—তোমার মুখেই তো শুনেছি—প্রহ্লাদ বলেছিল দৈত্যবালকদের যে শিশুকাল থেকেই বিষ্ণু না ভজলে বড় হবার পর আর ভজবার তাগিদই পাবে না ভিতর থেকে। শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রীর পত্র পড়েছ?

আমি : না।

সুভাষ (অধীর হয়ে) : ঐ দেখ। এসব না প'ড়ে পড়বে তুমি টুর্গেনিভ ডিকেন্স বালজাক। দেখ ভাই, একটা কথা বলি। আমাকে ভুল বুঝো না। আর্টের আমি বিরোধী না। কিন্তু সব কিছুরই একটা সময় আছে। শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রীর পত্রে আছে এই কথাটাই যে যদি কোনো রাক্ষস আমার মা-র বুকে চেপে বসে তখন কি আমি অন্য সব কাজ ফেলে সব আগে সে-রাক্ষসের মুণ্ডপাত করতে ছুটব না? আমারও ঐ কথা : আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ দেশবাসী উদয়াস্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রেও এক বেলা পেট ভ'রে খেতে পায় না, দুর্বৎসরে ঘাস পাতা খেয়ে জীবন যাপন করে পশুর

মতন। অথচ আমরা শহুরে বন্ধুরা মোটর ফিটন হাঁকিয়ে বেড়াই। তোমাকে বলছি দিলীপ, এ চলবে না, রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা বলেননি :

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

তিন

সুভাষ একটু "চাপা" প্রকৃতির মানুষ ছিল বরাবরই—ইংরাজিতে যাকে বলে রিজার্ভ্‌ড্‌। কিন্তু মনের মানুষ পেলে সে উজিয়ে উঠত সহজেই। পরে রাজনৈতিক জনতা-কল্লোলে সদাসর্বদা ভেসে চলতে বাধ্য হওয়ার দরুন ওর স্বভাবের একটু পরিবর্তন হয়েছিল বটে, কিন্তু সে বাহ্য। ও অন্তরে চিরদিনই ছিল নিঃসঙ্গ বৈরাগীই—যাকে টানত ভারতের অন্তর্মুখী সাধকদের ভাবধারা। এইখানেই ওর জীবনে এসেছিল খানিকটা অন্তর্দ্বন্দ্ব। কারণ ওর সমৃদ্ধ ব্যক্তিরূপের নানা দিক ছিল। একটা দিক ছিল জ্ঞানার্থী, একটা দিক চাইত অশ্রান্ত কর্মের মধ্যে দিয়ে কীর্তিপ্রতিষ্ঠ হ'তে, আর একটা দিক হতে চাইত ধ্যানী সাধক। ও আমাকে বলত যে, ঘুমের আগে প্রায়ই ও দুই ভ্রূর মধ্যে জ্যোতি দেখে। বিবেকানন্দেরও এমনি জ্যোতিদর্শন হত। একটি পত্রে ও আমাকে লিখেছিল যে, ওকে টানত কখনো কালী কখনো কৃষ্ণ কখনো শিব। এও সমৃদ্ধ ব্যক্তিরূপের একটি চিহ্ন, যে-কথা একবার শ্রীঅরবিন্দ বিশদ করেই আমাকে লিখেছিলেন। আমার 'অনামী'র দ্বিতীয় সংস্করণে সুভাষের পুরো পত্রটি ও শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য প্রকাশ করেছি। এ থেকে দেখতে পাওয়া যাবে ওর মধ্যে নানা প্রবণতাই সক্রিয় ছিল, যেমন উচ্চবিকশিত চেতনার মধ্যে হয়ে থাকে প্রায়ই। এককথায় ইংরাজিতে যাকে বলে "ওয়ান্‌-ট্র্যাক মাইণ্ড"—সুভাষের মনকে সে-তকমা দেওয়া চলে না। তাই ওকে বাইরে কর্মবীর ব'লে যদি অন্তরে ধ্যানী উপাধি দিই তাহলে তাতে ক'রে কোনো স্ব-বিরোধী উক্তির অভিযোগে পড়তে হবে না।

এই আদর্শ-বিরোধের ফলে মানুষ অনেক সময়েই আরো বিচিত্র হয়ে ফুটে ওঠে। সুভাষের মধ্যে দুটি মূল আদর্শের স্রোত বইত নিরন্তরই—এক ভারতের ধর্মজীবন, যার টানে ও একবার সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায়। আর এক হল ওর দেশাত্মবোধ—যার নিষেধে ও আধ্যাত্মিক সাধনাকে কিছুতেই পুরোপুরি বরণ করতে পারেনি। অথচ এজন্যে ওর মনের অতলে একটা চাপা বেদনা ছিল বরাবরই।

একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিই। যখন কংগ্রেস থেকে নেতারা অন্যায় ক'রে ওকে কংগ্রেস থেকে বরখাস্ত করলেন তখন আমি কলকাতায়। ওর কাছে ছুটে গিয়ে বলি : "সুভাষ, এবার চলো আমার সঙ্গে পণ্ডিচেরি—মাস কয়েকের জন্যে। আমার ফ্ল্যাটেই থাকবে—সমুদ্রের ধারে। একটু জুড়োবে—শান্তি পাবে। দেখলে তো রাজনীতি কী ব্যাপার?"

সুভাষ একটু চুপ করে থেকে বলল : "দিলীপ, তোমার সঙ্গে যেতাম এখনি—জুড়োতে। কিন্তু পারব না। ও হয় না।"

আমি : কেন সুভাষ?

সুভাষ (ম্লান হেসে) : কারণ একবার যদি যাই তোমাদের আশ্রমে তাহলে আর ফিরতে পারব না। আমার এখনো অনেক কাজ বাকি।

এই একটি প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে দিশা পাওয়া যায়, কী গভীরভাবে ওকে টানত ধ্যানের জগৎ যাকে ও সরিয়ে রাখত দেশের দুর্গতির কথা ভেবেই। এ-দেশপ্রেমকে প্রণাম না করবে কে—যার জন্যে ও দেশের কাজে সর্বস্ব নিয়োগ ক'রে অকৃতজ্ঞ ঈর্ষান্বিতদের চক্রান্তে নাস্তানাবুদ হওয়া সত্বেও এমন কি শান্তির ক্ষুধাকে বর্জন করতেও পেছপাও হয়নি।

কিন্তু তা ব'লে বলব না যে ওর একান্ত দেশপ্রেম দিয়েও ওর মহত্ত্বের পরিমাপ হতে পারে। "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"—একথা সুভাষের ব্যক্তিরূপের সম্বন্ধেও অক্ষরে অক্ষরে খাটে। দেশসেবায় ও কখনো সফল হয়েছে, কখনো বিফল: যে ব্রত ও উদ্‌যাপন করতে চেয়েছিল তার সবটা হয়ত সাধিত হয় নি। না-ই হ'ল। মানুষের বাহ্য কীর্তি দিয়ে তার চরম বিচার নয়—সে অন্তরে কী হয়ে উঠল তাই দিয়েই তাকে মাপতে হবে—যেকথা শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন একটি পত্রে :

"The ultimate value of a man is not to be measured by what he says, not even by what he does, but by what he becomes."

সুভাষের অন্তরপুরুষ হয়ে উঠেছিল মহিমান্বিত, দীপ্যমান্—এই-ই হল ওর মহত্ত্বের চরম তর্পণ। এ শুধু আমার মুখের কথা নয়। যখন ও বিলেতে আর পাঁচজনার মতন একটি পরীক্ষার্থী ছাত্ররূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে দিনের পর দিন পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে—তখনও ওর কাছে যে-ই আসত সে-ই ওর চারিত্রবল ও মহত্ত্বের আঁচ পেত। আমি ও ক্ষিতীশপ্রসাদ তো ওর প্রবল প্রভাবের পরিধির মধ্যে আসার দরুনই আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার সংকল্প ত্যাগ করি। লণ্ডনে কত যুবকই যে ওকে দেখতে না দেখতে বরণ করেছিল নেতারূপে সে কী বলব? ওর দেহান্তের পরে দেশ

ওকে ভক্তিভরে যে "নেতাজি" উপাধি দিয়েছিল সে কণক-মুকুট এ-যুগে আর কার মাথায় বসানো যায় ভেবে পাই না। কলকাতায় ফেরার পরেও কত দেশধ্বজই যে ওর আলোকিত প্রতিভার কাছে আসতে না আসতে মিইয়ে পড়েছিলেন না জানে কে? তবে অগ্নিশিখার ধর্মই তো এই যে, সে আশে-পাশের হাজারো স্ফুলিঙ্গকেই নিষ্প্রভ করে দেয় এক মুহূর্তে। এমন কি অনেক অহংকৃতের তীক্ষ্ণবুদ্ধির দাম্ভিকতাও ওর চরিত্রের অনির্ণেয় বহ্নির স্পর্শে স্তম্ভিত হ'ত। কেম্‌ব্রিজে পুরী ব'লে একটি পাঞ্জাবী র‍্যাংলার ছিল দারুণ অশ্লীলভাষী। একদিন আমার কাছে এসে সে চুপি চুপি বলে: "আমি সব পারি দিলীপ, কিন্তু সুভাষকে দেখলেই কেমন যেন মুখচোরা হয়ে পড়ি!" দৃষ্টান্ত বাড়াবার প্রয়োজন দেখি না, কেন না সুভাষ শুধু যে তার জীবনের সাধনা দিয়ে তার ত্যাগের দলিল সই ক'রে গেছে তাই নয়, মরণের শিলমোহর দিয়ে সে-স্বাক্ষরকে পাকা ক'রে রেখে গেছে। বিলেতে আমার এক বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন সাংঘাতিক সাহেব। তিনিও সুভাষের কথা উঠলে বলতেন: "ওকে দেখলে ভরসা হয় যে, হয়ত বাঙালি বাঙালি থেকেও বাংলাদেশ বাঁচতে পারে।" এঁর মত ছিল এই যে, আমাদের সভ্যতার ভিতরে ভিতরে ঘুন ধরেছে, তাই বাঁচতে হ'লে আমাদের সবাইকেই সাহেবি ধরনধারন ও ডিসিপ্লিনকে পুরোপুরি বরণ ক'রে নিতে হবে—জাতীয়তার অভিমান ছেড়ে। (শ্রীঅরবিন্দের পিতৃদেব শ্রীকৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয় এই মতের বশবর্তী হয়েই তাঁকে বিলেতে পাঠিয়ে অ-ভারতীয় করে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন)। সুভাষের সঙ্গে এ নিয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত আলোচনা হ'ত বিলেতে। সে বলত: "অমুকের কথার সবটাই অসার নয়। তবে কি জানো? আমাদের জাতীয় জীবনের যে-ঘুনের কথা সে বলছে সে আর কিছুই নয়—শুধু ব্যাপক তামসিকতা। এর কাটান মিলতে পারে শুধু অশ্রান্ত কর্মিষ্ঠতায়। কিন্তু কর্মিষ্ঠতা রাজসিক হ'লেও কিছু সাহেবদেরি একচেটে সম্পত্তি নয়। আমাদের জাতীয়তা বর্জন করলে চলবে না শুধু সাহেবদের রাজসিকতাটুকু ছেঁকে নিয়ে আত্মসাৎ করতে হবে। কেমন জানো? হার্বার্ট স্পেন্সরের কাছে ত্রিশ বৎসর আগে জাপানীরা এসে জিজ্ঞাসা করে—তারা মাথায় ছোট, দেশসুদ্ধ লোক য়ুরোপীয় মেয়ে বিয়ে করা ছাড়া উপায় কি? তাতে হার্বার্ট স্পেন্সর হেসে বলেন: "তার ফলে তোমাদের সন্তানেরা মাথায় লম্বা হতে পারে কিন্তু জাপানী নানা গুণের দৈন্যে খতিয়ে খাটোই হয়ে যাবে। 'Be yourselves—take from us what you need but let assimilation and not imifation be your motto.'

আমি অবশ্য নিজের ভাষায়ই পেশ করলাম সুভাষের ভাবধারা—কিন্তু তাই ব'লে আমার মতামত ওর স্কন্ধে চাপাই নি। অপিচ এ-সব লিখছি যে কোনো নতুন কথা জানাতে তা-ও নয়, লিখলাম শুধু এইজন্যে যে সুভাষের মতন মহাপ্রাণ মানুষের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি কথাও শ্রবণীয় মননীয় স্মরণীয়। তাছাড়া জীবনের তাপ লাগে যে-স্মৃতিকথায় তাতে বাস্তবতার কিছু মূল্য বর্তায়ই। এইজন্যই সুভাষের সম্বন্ধে আরো কিছু দামী কথা বলব আজ খানিকটা নিষ্পরোয়া ঢঙেই। অন্যত্র নানা রচনায় তার সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলেছি—কোথায় কবে কি লিখেছি সব মনেও নেই। না থাকুক—যদি এখানে ওখানে পুনরুক্তি থাকে তাহলেও আমার এই সাফাই থাকবেই যে, মহৎ চরিত্রপ্রভার নানা বিকাশকে নানা দিক থেকে দেখলেও খতিয়ে লাভই হবার কথা—লোকসান না।

বলেছি—থিয়েটার রোডে আমি যে-আবহাওয়ার মধ্যে প'ড়ে গিয়েছিলাম সে-আবহাওয়া আমার আন্তর বিকাশের অনুকূল ছিল না। কারণ বিদ্যা জ্ঞান সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প দর্শন এ-সব চর্চার কোনো পাটই ছিল না সেখানকার একান্ত বহির্মুখী আবহাওয়ায়। এক যা আমার মেজমামা একটু আধটু পড়াশুনো করতেন, কিন্তু আর সবাই চলতেন নিজের নিজের তালে—যেমন চলে গড়পড়তা মানুষ তেল নুন লকড়ির সন্ধানে। নির্মলদা মাঝে মাঝে আসতেন বটে, কিন্তু তিনি আবার সদ্য ঢুকেছিলেন থিয়েটারে, কাজেই তাঁর সাহচর্যে আরাম পেলেও পেতাম না সে-প্রেরণা যা তিনি জোগাতেন সুরধামে। হয়ত এর জন্যে আমি নিজেও খানিকটা দায়ী কিন্তু কারণ যাই হোক, বাইরের পরিবেশ প্রতিকূল হওয়ার দরুন আমাকে হাত পাততে হ'ত আমার অন্তরের অন্তঃপুরে। গাইতাম নিজের মনে পরমহংসদেবের প্রিয় গান :

আপনাতে মন আপনি থেকে যেও নাকো কারো ঘরে
যা চাবে তাই ঘরেই পাবে খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে।

এর একটা সুফল ফলেছিল এই যে, "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" হ'য়ে উঠল আমার গীতা—রোজ রাত্রে কয়েকটি অধ্যায় পড়ে তবে শুতে যেতাম। এইভাবে কথামৃতের প্রথম চার খণ্ড আমার চল্লিশ পঞ্চাশ বার পড়া শেষ হয়। আর বহু পাঠের ফলে যা হয়—তাঁর উক্তিগুলি হয়ে উঠল জীবন্ত—যেমন, জাপকের কাছে হ'য়ে ওঠে জপমন্ত্র। (আমাদের শাস্ত্রে স্বাধ্যায়কে দৈনিক সাধনার অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে যে এই জন্যেই এ-বিষয়ে সন্দেহ রইল না আর। স্বাধ্যায় মানে অবসর

সময়েও নিয়মিত সৎকথা-বরণ মহাবাক্য-স্মরণ ও সশ্রদ্ধ মনন—নিদিধ্যাসন আসে সব শেষে শ্রবণ মনন থিতিয়ে গেলে তবে।)

কিন্তু দিনের আলোয় আবার চারদিকের সেই হট্টগোল ওঠে কেঁপে। কোথায় সেই সাহিত্য আলোচনা, সঙ্গীতচর্চা, শিল্পী গুণী কবির সভা—যা সুরধামকে ক'রে তুলেছিল আনন্দধাম? কিছু ক্ষতিপূরণ মিলত বটে আমার মেজমামা ও মেজমামিমার অমল স্নেহে। দিদিমার স্নেহও ভাল লাগত বইকি, কিন্তু তিনি আর সবাইয়ের মতনই চাইতেন আমার সাংসারিক প্রতিষ্ঠা, বিবাহিত সমৃদ্ধি। এককথায় সে-স্নেহ ছিল যেন বড় বেশি অন্ধ, সংসারী, জৈবিক। তাতে আদৌ মনের পরশ ছিল না। সুরধামে আমি মানুষ হয়েছিলাম আদর্শবাদী বুদ্ধির দীপ্ত পরিবেশে। থিয়েটার রোডের আবহে মিলত না কোনো মহৎ আদর্শ কি বুদ্ধির রম্য প্রভা। তাই না আরো আঁকড়ে ধরেছিলাম সুভাষকে—খানিকটা যেমন মজ্জমান আঁকড়ে ধরে ভেসে যাওয়া গাছের গুঁড়িকে। উপমাটা যথাযথই এসে গেছে। কারণ সুভাষকে পরমহংসদেবের ভাষায় বলা চলে বই কি 'বাহাদুরি কাঠ'—যে শুধু নিজে ভেসে চলতে পারে তাই নয়, যারা তাকে আশ্রয় করে তাদেরও পারে তরাতে—'হাবাতে কাঠ' নয় যার উপর একটা পাখি বসলেও টুপ ক'রে ডুবে যায়।

জানি না সুভাষ সম্বন্ধে এ-তর্পণ এ-যুগের বাস্তববাদীদের কাছে উচ্ছ্বাস ব'লে মনে হবে কি না। মনে হ'লে আমি নাচার, কারণ আমাকে আঁকতেই হবে তাকে আমি যেমনটি দেখেছি জেনেছি বুঝেছি।

শাস্ত্রে বলে—আমাদের নানা ঋণ আছে: দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ, গুরু-ঋণ, পিতৃ-ঋণ। আমি মনে করি, বন্ধু-ঋণও একটি মহৎ ঋণ। বিশেষ সুভাষের মতন বন্ধু। সময়ে সময়ে যখন আশেপাশে গড়পড়তাদের দেখি তখন একটু গর্ব বোধ না করেই পারি না যে, যৌবনে এমন একজনের স্নেহ পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল যার সঙ্গে কাঁধ মেলাবার লোক শুধু আমাদের দেশে নয়, যে-কোনো দেশে খুব কমই মেলে। ওর উদ্দীপনা ছিল অলক্ষ্য স্পর্শমণির মত—অজ্ঞাতে কত লোকের কত খাদকেই না রেখে গেছে সোনা ক'রে!

কত কথাই না মনে আসে ভিড় ক'রে! কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলি? তার নানা সময়ে হাসি ঠাট্টা তিরস্কার অনুরোধ—কত কী, যার প্রতি স্পর্শই আমার মনকে সচকিত ক'রে তুলত। সবচেয়ে বেশি ক'রে মনে পড়ে তার গভীর স্নেহ। মন

ভিজে যেত তার এক একটি স্নেহের ডাকে। তার উপর যখন স্পর্শ এসে যোগ দিত তখন তো আর কথাই নেই। মনে পড়ে ১৯৩৭ সালের একটি অবিস্মরণীয় দিনের কথা। কিন্তু এ গর্ভাঙ্কের ছবি ফোটাতে হ'লে তার আগের দু একটি অঙ্কের কথা কিছু বলতে হবে।

বলেছি সুভাষ ছিল বিবেকানন্দের ভক্ত। পরমহংসদেবকে সে ভক্তি করত না এমন নয়, তবে মনে করত যে, অন্তত ভারতের দুর্দিনে দিশারি এক বিবেকানন্দই হতে পারেন আর কেউ নয়। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সে ছিল দোমনা। কখনো কখনো তাঁর নানা গভীর বাণীতে অভিভূত হ'ত বটে, কিন্তু তাঁর দেশের কাজ ছেড়ে একান্তভাবে অজ্ঞাতবাস বরণ ক'রে নেওয়াতে কিছুতেই তার মনপ্রাণ সায় দিত না। বলত প্রায়ই: "তাঁর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য ও শক্তি নিয়ে তিনি যদি আমাদের তামসিকতার রূপান্তর ঘটাতে না পারেন তবে তিনি কিসের যোগী?"

আমি সুভাষকে বলতাম: "কিন্তু সে শক্তির শরিক হ'তে হলে আমাদেরও খানিকটা প্রস্তুতি চাই না কি?" সে কিন্তু কিন্তু ক'রে বলত: "জানি না ভাই। কেবল এইটুকু বলতে পারি যে, বেশিদিন সর্ববিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার ফলে মানুষের কর্মশক্তি নিস্তেজ হয়ে যায় ব'লেই আমার ভয় হয় যে, শ্রীঅরবিন্দকে আমরা হারিয়েছি বা। সামাজিকতা ও নিঃসঙ্গতা দু'য়ের হার্মনিতেই একজন মস্ত মানুষ গ'ড়ে ওঠে, যেমন বিবেকানন্দ, তিলক, রবীন্দ্রনাথ। শ্রীঅরবিন্দ মহাপ্রতিভাবান্ সন্দেহ নেই কিন্তু—" ব'লেই থেমে যেত পাছে আমি ঘা খাই। আমার উত্তর জীবনে ওর নানা চিঠিতেই ও শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে একটু লিখেই থেমে যেত, আমি তাঁকে গুরুবরণ করেছিলাম ব'লে।

আমি যখন ১৯২৮ সালে সংসার ছেড়ে পণ্ডিচেরি আশ্রমে গিয়ে একাদিক্রমে আট বৎসর অজ্ঞাতবাস করি তখন ও খুবই দুঃখ ক'রে মাঝে মাঝে আমাকে লিখত ফিরে আসতে। আমার সে-সময়ে বৈরাগ্য প্রবল ও আশ্রমভক্তি খানিকটা গোঁড়ামির কোঠায় পৌঁছেছিল—যার সম্বন্ধে আমি সচেতন হই গুরুদেবের দেহান্তের পরে। তাই সুভাষের প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে আমি তার সঙ্গে পত্রালাপ বন্ধ করি। এতে ও মনে আঘাত পায় আরো এই ভেবে যে, আমাকে আঘাত করেছে। আমার মনও উৎসুক হয়ে ছিল ওর সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্যে—আরো এই জন্যে যে, সুভাষ আমাকে যে সব কথা লিখেছিল তার মধ্যে অনেকটা সত্য ছিল। অর্থাৎ সে সময়ে গুরুবাদের গোঁড়ামি সম্বন্ধে ও যা যা বলেছিল সে সব মন্তব্যে এমন অনেক সারগর্ভ

কথা ছিল যা পরে একটু একটু ক'রে আমার কানের মধ্যে দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু সে অন্য কথা।

এই সময়ে—১৯৩৭ সালে—পণ্ডিচেরি আশ্রমের সম্বন্ধে একটু একটু ক'রে নিরাশ হ'তে আরম্ভ করি—যার জন্যে আমার নিজের দোষও ছিল বইকি। কিন্তু নিজের দোষের কথা মানুষ বেশ একটু সদয় হয়ে বিচার করে ব'লে আমি ভাবতাম, অপরের দোষ সাড়ে পনের আনা যদি নাও হয়, সাড়ে তের আনা তো বটেই। যাই হোক, এইভাবে কিছুদিন কাটাবার পরে খবরের কাগজে পড়ি যে, সুভাষের কারামুক্তির দিন আসন্ন। চঞ্চল হ'য়ে উঠে আমি গুরুদেবের অমত সত্ত্বেও খানিকটা আবদার ধ'রেই তৎক্ষণাৎ কলকাতায় চলে আসি ১৯৩৭ সালে ফেব্রুয়ারিতে।

৩৪ নং থিয়েটার রোডে আমার দাদামহাশয়ের দেহান্তের পরে দিদিমাই হন সর্বেসর্বা। তিনি আমাকে সাগ্রহে পুনর্বরণ ক'রে নিলেন। দীর্ঘ প্রবাসের পরে ফিরেই আমি থিয়েটার রোডের প্রকাণ্ড হলঘরে গানের আসর জমানো শুরু করি। (১৯২২ থেকেই এ-গানের আসর শুরু হয়, এখন যেন আরো জেঁকে বসলাম—মাস কয়েক বাদে আশ্রমে ফিরতে হবে ভেবে আরো গা ভাসিয়ে দিলাম গানানন্দে।)

কিন্তু মন আমার কেবলই খচ খচ করে। সুভাষের মুক্তি হ'ল কই? আমি আনন্দে আছি কিন্তু সে যে এখনো জেলে। গুজব রটেছিল তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে। এমন সময় একদিন হঠাৎ এলগিন রোড থেকে টেলিফোন এল—সুভাষকে ছেড়ে দিয়েছে, সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সেদিনটি—১৭ই মার্চ—আমি ভুলব না কোনদিন।

তৎক্ষণাৎ গেলাম এলগিন রোডে সব কাজ ফেলে।

সুভাষের দেহ শীর্ণ হয়ে গেছে। চোখের কোলে কালি। কিন্তু মুখে অবসাদের চিহ্নও নেই। আমার সঙ্গে দেখা হ'তে না হ'তে সে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ফেলল। সে কী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না!

সুভাষ কাঁদবে এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমার চোখের জলও বাধা মানল না। আট বৎসর পরে আমাদের পুনর্মিলন। তার পরের কথা আমার The Subhash I Knew বইটিতে ফলিয়েই লিখেছি, তার এক অনুবাদও বেরিয়েছিল, কাজেই সে-সব কথার পুনরুক্তি করব না।

তবু সুভাষের অশ্রুপাতের কথার উল্লেখ করলাম এইজন্যে যে খুব অল্প লোকের কাছেই সে তার হৃদয়ের দুয়ার খুলত ব'লে তার চোখে জল প্রায় কেউই দেখেনি।

সবাই জানত যে, সে একজন আত্মবিশ্বাসদীপ্ত, অচলপ্রতিষ্ঠ মহাবীর। তার সুগম্ভীর শান্তোজ্জ্বল মুখ দেখলে সব আগে তার প্রতি সমীহই বোধ করত মানুষ। কিন্তু যাদেরই তার স্নেহ পাবার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল তারাই জানে সে-স্নেহ তৃষিতকে অমৃতে ভ'রে দিতে পারত। আমি নানা লেখায় বলেছি—একটুও অত্যুক্তি নয়—যে, সুভাষের এক কথায় আমি এমন কি রাজনীতিতেও প্রবেশ করতে পারতাম। আমার কাছে চিরদিনই রাজনীতির আবহাওয়া ছিল শুধু অপ্রীতিকর নয়—একান্ত দুঃসহ। কিন্তু একবার কে আমাকে বলে যে, সুভাষ চায় আমি কংগ্রেস ইলেকশনে দাঁড়াই চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ পার্টিতে নাম লিখিয়ে। আমার সেদিন রাতে ঘুম হয়নি। পরদিন সুভাষকে এক চিঠি লিখি—ও কোথায় ছিল মনে নেই—ও যদি চায় তবে আমি ইলেকশনে দাঁড়াব আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও। সুভাষ তার করে: দরকার নেই, ও ফিরলে কথা হবে।

ফিরে ও বলল যে ও মোটেই চায় না আমি পলিটিক্সে ঢুকি, আমি বাইরে থেকেই দেশের কাজ বেশি করতে পারব। বলল: "আমাদের এত সঙ্কীর্ণ মনে কোরো না দিলীপ। তুমি পলিটিক্সের জন্যে তৈরি নও এ আমি বুঝি। কিন্তু তুমি তোমার গানের প্রচারের মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশের কাজ করবে এ আমি চাইবই চাইব। আমার অনুরোধ তুমি অশ্রান্তভাবে গাইবে উদ্দীপক গান—তোমার বাবার অতুলনীয় স্বদেশী গান—মাতিয়ে দেবে সবাইকে গান গেয়ে···ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথাই সে আরো বিশদ ক'রে লিখেছিল তার একটি দীর্ঘ পত্রে মান্দালয় জেল থেকে ১৯২৫ সালে। সে-চিঠিটি অনামীতে ছাপিয়েছি—পড়লে কারুর সন্দেহ থাকবে না ওর আন্তর ঔদার্য সম্বন্ধে। কিন্তু এসব রেখে আজ বলি—থিয়েটার রোডে ফিরে আসায় ওর সঙ্গে কীভাবে এক নব সম্বন্ধ গড়ে উঠল।

সুভাষকে নিয়ে বৃটিশ সিংহ কম বিপদে পড়েন নি। কত তুতিয়ে পাতিয়ে ওকে হাকিম করার চেষ্টা করেছিলেন ডাকসাইটে সাহেবের দল। কিন্তু ওর এক জবাব: "তোমরা পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে ফিরে যাও যেখান থেকে এসেছিলে।" অগত্যা ওরা বিদ্রোহীকে জেলে পাঠায়। কিন্তু জেলে মানুষকে চিরদিন রাখা যায় না তো—ছেড়ে দিতেই হয়, নইলে স্বদেশী আন্দোলন আরো ফেঁপে ওঠে যে! আবার ছেড়ে দিতে না দিতে ও ফের হুমকি দেয়। সাধে কি সম্প্রতি এক সাহেব—Hugh Toye,—ওর নামকরণ করেছেন "The Springing Tiger!"

সুভাষ দেশে ফিরতে না ফিরতে ওকে ওরা জেলে পাঠায়। যথাকালে জেল থেকে মুক্তি দিতেই হয়—কিন্তু সুভাষ অনমনীয়—বাইরে আসতে না আসতে ফের চতুর্গুণ উৎসাহে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নিরুপায় হয়ে ওকে ফের ওরা জেলে পাঠায়। কিন্তু মহা মুশকিল! জেলে গেলেই ওর করবে অসুখ—কাজেই ফের ওকে ছেড়ে দিতেই হয়। ১৯৩৭ সালে ও যখন মুক্তি পায় তখন ওর শরীর খুবই খারাপ—ওজনে প্রায় দশ সের কমে গেছে, ঘুষঘুষে জ্বর। আমি তখন কলকাতায়, ওকে বলি কয়েক মাস বিশ্রাম নিতে পণ্ডিচেরিতে—আমার ফ্ল্যাটে, সমুদ্রের ধারে। সুভাষ ম্লান হেসে বলে—ওর বিশ্রাম হবে শুধু দিনের শেষে—হাতে ওর অফুরন্ত কাজ—দেশে কর্মীর অভাব ইত্যাদি। ক্ষুণ্ণ মনে আমি পণ্ডিচেরি ফিরে যাই।

ওর যে কথা সেই কাজ। অপটু দেহ নিয়েই ও ফের কর্মাবর্তে ঝাঁপ দিল। দেশের দুর্দশার তখন চরম অবস্থা। একদিকে বাংলাদেশে দেশবন্ধুর তিরোধানের পর থেকে নেতার দুর্ভিক্ষ, ওদিকে গান্ধীজির অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত দেশব্রতীদের দেখলে মন কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে যায় ভাবতে: এঁরা কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, চরকা কেটে অজস্র সুতো হলেই স্বরাজ আসবে এক বৎসরে? শুধু চরকা নয় অবশ্য, নিরীহ সত্যাগ্রহবাণও তূণীরে মজুদ আছে। কিন্তু সুভাষ কোনোদিনই বিশ্বাস করে নি যে, এ-বাণ মর্মভেদী হ'তে পারে। তবুও ও চাইত—অহিংস অসহযোগকেও কাজে লাগাতে, প্রকাশ্যে বোমাবিপ্লব বা বিদ্রোহকে আমল না দিয়ে। প্রায়ই আমাকে বলত যে, অহিংস অসহযোগে দেশে যেটুকু নবজাগরণ এসেছে তার সুবিধা নিলে কাজ এগুবে। কিন্তু মুশকিল হ'ল স্বাধীনভাবে কাজ করা নিয়ে। বিশেষ ক'রে সে-সময়ে কংগ্রেসে কাজ করতে হ'লে মহাত্মাজির প্রতি আজ্ঞা শিরোধার্য না ক'রে পথ ছিল না। কিন্তু সুভাষ স্বভাবে কোনোদিনই কারুর তাঁবেদার ছিল না, তাই সে এ-শর্ত পালন করতে রাজি হ'তে পারেনি। তাছাড়া, ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়ে এক বৎসরেও ঠেকে শিখেছিল যে, কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট মাত্র নামেই লোকনায়ক, কার্যক্ষেত্রে তিনি শুধু মহাত্মাজির হুকুমবরদার মাত্র। তাই ১৯৩৯-এও মহাত্মাজির মনোনীত সীতারামআইয়ারের বিরুদ্ধে দাঁড়াল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হতে চেয়ে। ওর উদ্দেশ্য ছিল—একটু স্বাধীন হয়ে দেশে বিপ্লবী মনোভাবকে গড়ে তোলা। ভোটে ও জিতল বটে, কিন্তু সে শুধু মুখেই জেতা, কংগ্রেসের রথের প্রতি চাকা তখন ঘোরে মহাত্মাজির নির্দেশে—ফলে মহাত্মাজির নির্বাচিত কমিটির সভ্যদের হাতে ও কীভাবে লাঞ্ছিত হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়

সে-বৃত্তান্ত ইতিহাসে লেখা হয়ে আছে, কাজেই আমার পক্ষে সে-সব কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হবে বাহুল্য। তাছাড়া স্মৃতিচারণে রাজনৈতিক দলাদলির চর্বিতচর্বণ খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকও বটে। তাই আমি আজ বলব শুধু সুভাষের চরিত্রের নানা গুণাবলীর কথা, ব্যক্তিরূপের ক্রমবিকাশের কথা, আঁকব ছোট ছোট ঘটনার চলচ্চিত্র যা আমার স্মৃতিপটে আজো তেমনি উজ্জ্বল, অবিস্মরণীয় রঙেই ঝলমল করছে।

অতীতের আবছায়া রঙ্গমঞ্চের দিকে যখন ফিরে তাকাই, তখন যেমন বাল্যপর্বের পটে সব আগে চোখে পড়ে পিতৃদেব, লোকেন্দ্র পালিত, গিরিশ মেশোমহাশয়, নির্মলদার ছবি—যাঁদের কাহিনী লিখেছি আমার "বাল্যস্মৃতি'তে—তেম্‌নি কৈশোর-যৌবন অধ্যায়ে জ্বল জ্বল করে ফুটে ওঠে পাঁচজনের ছবি পর পর : সুভাষ, শরৎচন্দ্র, সত্যেন, রবীন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণপ্রেম। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, এখন এফ আর এস হয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক—বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু যখনকার কথা বলছি, তখন তিনি খ্যাতিতে এত দীপ্যমান্ না হলেও তাঁর ব্যক্তিরূপকে ঘিরে থাকত এমন একটি আশ্চর্য চুম্বকশক্তি, যা কেবল মহত্ত্বের অধিগম্য, প্রতিভার সহজাত। আর কৃষ্ণপ্রেম? চরিত্র, জ্ঞান, নিষ্ঠা ও ভক্তির সমন্বয়ে তার তুলনা ভূভারতেও পাওয়া ভার। এঁদের কথা তাই বলতেই হবে বিশদ ক'রে। তবে সবপ্রথম সুভাষের পালা শেষ করি। সবশেষে লিখব শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কথা।

আমার 'দি সুভাষ আই নিউ' ও 'ভূস্বর্গচঞ্চল' এই দুই দুটি বইয়ে আমি সুভাষ সম্বন্ধে যা যা বলেছি সেসব কথার পুনরুক্তি করব না পারতপক্ষে। তবে স্থানে স্থানে বলা কথাও বলতে হবে একটু নতুন ক'রে—নইলে সুভাষের যে-ছবিটি আমার চিত্তপটে দীপ্যমান্ হয়ে আছে, এ-স্মৃতিচিত্রে ফুটিয়ে তুলতে পারব না।

চার

বলেছি থিয়েটার রোডে সুভাষের প্রথম অভ্যুদয় হয়—যখন আমরা সবে কলেজে ঢুকেছি। সে কেন এসেছিল তাও লিখেছি—আমাকে ডিবেটিং ক্লাবে টেনে আনতে! কিন্তু একটা কথা লেখা হয় নি—তার আবির্ভাবে সেদিন আমার তনু-মন-প্রাণে কেমন শিহরণের ঢেউ জেগেছিল। সে-শিহরণের মধ্যে পুলক ছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল আর একটি স্পন্দন : উজ্জ্বল বিস্ময় যে, সুভাষ কিনা এল আমার কাছে। এ বৈষ্ণব বিনয় নয়। আমি স্বভাবে সত্যনিষ্ঠ ব'লেই কোনদিন অতিবিনয়কে শ্রদ্ধার

চোখে দেখতে পারি নি। আমার মনে হয়েছে বরাবরই যে গুণী জানেই জানে তার গুণবত্তা, রূপবান তার রূপ, প্রতিভাধর তার প্রতিভা। আমিও জানতাম রূপ গুণ, বুদ্ধিতে আমি দেউলে হয়ে জন্মাই নি। আমার প্রতিভা সম্বন্ধে আমি অতিসচেতন ছিলাম কিনা ঠিক মনে পড়ছে না, তবে এটুকু বলতে পারি যে, পিতৃদেবের প্রতিভার পাশে নিজের প্রতিভাকে প্রতিভা নাম দিতে সত্যিই কুণ্ঠা হ'ত। কিন্তু তবু সব জড়িয়ে আমি যে একটা কেওকেটা নই, আমার এ-ধারণা ছেলেবেলায়ও আমার কথাবার্তায় প্রায়ই প্রকাশ পেত বইকি—যে জন্যে সে সময়ে অনেকেই আমাকে 'অকালপক্ব' ব'লে ডাকতেন ও মনে করতেন আমার পরকাল 'ঝর্ঝরে' হয়ে গেছে আত্মীয়স্বজনের অতিপ্রশ্রয়ে।

কিন্তু আমার অসাধু অহঙ্কারের বহর কম না হলেও আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল আমার একটি সাধু মনোবৃত্তি : মহত্ত্বের সামনে নিঃসংকোচে নত হতে চাওয়া : নিরীহ বিনম্রতায় নয়—সজাগ শ্রদ্ধায়। অর্থাৎ আমি শ্রদ্ধা করতাম রেখে ঢেকে নয়—সোচ্ছ্বাসে, সগৌরবে, মুখর উল্লাসে। আমার বাল্যস্মৃতি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা এ-কথার স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ পেয়ে থাকবেন।

সুভাষ সম্বন্ধেও ঐ কথা। তার গুণপনা শুনে আমার অবস্থা ঠিক কৃষ্ণগুণগান-শুনে বিমুগ্ধা রুক্মিণীর মতন না হলেও মন ভিজে উঠেছিল নরম ঔৎসুক্যে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তার অপরূপ মুখকান্তি, উদার ললাটে প্রতিভার ছাপ ও ঋজুদেহে বীর্যের সহজ দীপ্তি দেখে শুধু যে আমার পূর্বরাগ মুহূর্তে প্রণয়ে পরিণত হয় তাই নয়, মাথা আরো নুয়ে আসে : মনে হয় মিলল বুঝি বরেণ্য বন্ধু। কিন্তু তবু সুভাষ যে আমার বন্ধু হ'তে পারে এ বিশ্বাসকে সত্যিই কেমন যেন আমল দিতে সাহস পাই নি। কেবলই মনে হ'ত—আমার কী যোগ্যতাই বা আছে? কেবল একটা জায়গায় আমার গর্ব খর্ব হয় নি—আমি শুধু যে গাইতে পারি তাই নয়, আমার সতীর্থ বন্ধুদের মধ্যে একজনকেও দেখি নি আমার সমকক্ষ। এখানে আমি শুধু যে অহংকৃত ছিলাম তা নয়, ছিলাম অননুতপ্ত, কেননা আমি বলতাম সোজাসুজিই (বেশ মনে আছে) : "অহঙ্কার আবার কী? এ যে অকাট্য সত্য। তাই একে অস্বীকার করলেই মিথ্যাবাদী হব, অঙ্গীকার করলে সত্য কথনের জন্যে সাজা পাব কেন?" আমার অহঙ্কারী নাম রটেছিল কি সাধে?

আমার এক বন্ধু কথায় কথায় আমার গীতিপ্রতিভা নিয়ে অকুণ্ঠে বড়াই করবার কথা সুভাষকে জ্ঞাপন করে। সুভাষ আমাকে পরে হেসে বলেছিল—"আমি তোমার

দিকে প্রথমে ঝুঁকি এই কথা শুনেই—খানিকটা কৌতূহলবশে আর খানিকটা সানন্দে যে, তুমি মামুলি গড়পড়তাদের ঢঙে কথা কও না। পরে তোমার গান শুনে বুঝি তুমি সত্যবাদী—আত্মমুগ্ধ নও। তাই না তোমাকে ডিবেটিং ক্লাবে টেনে এনে আরো আলাপ জমাতে চেয়েছিলাম।"

কিন্তু একথা আমাকে ও বলে অনেক পরে। যেদিন ও আমার সঙ্গে প্রথম দেখা করতে আসে সেদিন ও একগঙ্গা কথার মধ্যে কেবলই বাইরন ও টেনিসনের নানা ছত্র উদ্ধৃত করেছিল। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—সতের বৎসরের কোন বাঙালি ছাত্র যে বাইরন টেনিসনে সত্যি এত রস পেতে পারে এ আমার কল্পনারও অতীত ছিল। আমি ইতিমধ্যে ইংরাজিতে বেশ পাকা হয়েই উঠেছিলাম, সংস্কৃতচর্চা রেখে একরাশ ইংরাজি বই পড়ে। কিন্তু সুভাষের সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ জমতে না জমতে দেখি—ইংরাজি ভাষায় তার দখল আমার চেয়ে অনেক বেশি! শুধু তাই নয়, ইংরাজিতে সে নানা উদ্ধৃতি আবৃত্তি করতও চমৎকার। আর যাবে কোথা? আমার উচ্ছ্বাসী মন সানন্দেই মাথা নুইয়ে অঙ্গীকার ক'রে নিল তার শ্রেষ্ঠতাকে।

এ-নম্রশীর্ষ হওয়ার ক্ষতিপূরণও মিলল অপর্যাপ্ত—সুভাষ ও আমার মধ্যে হ'ল মিতালি। মনে আছে এ-বন্ধুত্বের অভিনব স্বাদ পেতে না পেতে আমার মন কীভাবে উচ্ছল হ'য়ে উঠেছিল: সুভাষের মতন মহাজন কিনা আমার গলায় মালা দিতে এল স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে! ইংরাজিতে বলে—কৃতজ্ঞতা থেকে প্রেম এক ধাপ। অনস্বীকার্য।

সুভাষ ভিতরে ভিতরে বিনয়ী ছিল কি না জানি না, কিন্তু মুখে তাকে জাঁক করতে কোনোদিন দেখি নি। শালীনতা যে ছিল তার মজ্জাগত। অনেকে তাকে অহঙ্কারী বলত তার চাপা প্রকৃতির জন্যে। পরে রাজনৈতিক অঙ্গনে তার শত্রুদের কেউ কেউ বলত ব্যঙ্গ ক'রে: "অভিজাত-কুলতিলক কখনো সত্যি দেশসেবক হতে পারে—সত্যি দেশসেবক তো মহাত্মাজি।" সুভাষ একথা শুনে হেসে একদিন আমাকে বলেছিল মনে আছে: "ওদের কথা কি আমি গ্রাহ্য করি দিলীপ? জগতে সর্বত্রই অভিজাতরাই প্রথম এগিয়ে এসেছে দুর্গতদের তুলতে। আমাদের দেশে স্বাজাত্যের প্রথম মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল কাঁদের মুখে শুনি? —বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল। এঁদের মধ্যে কোন্ মানুষটি ছিলেন শ্রমিক চাষা মজুরদের স্বজাতি—বলবে আমাকে?" উত্তরকালে বিলেতে ও আমাকে প্রায়ই বলত: "প্রলেটারিয়েটকে জাগাতেও প্রথম দিকে এগিয়ে আসতে হয় মধ্যবিত্ত

বুর্জোয়াকেই, বুঝলে? এ আমার কাঁচামনের আবিষ্কার নয়—মহাবিচক্ষণ লেনিনের সাক্ষ্য—স্বয়ং লেনিন, বুঝলে?"

সে-সময়ে লেনিন ও ট্রটস্কির ব্যক্তিরূপের গুণগান করতে সুভাষ প্রায় আত্মহারা হয়ে পড়ত—যে-কথা অন্যত্র লিখেছি—যদিও পরিণত বয়সে বলশেভিক তন্ত্রে ওর আস্থা টলমলে হয়ে এসেছিল।

ওর সঙ্গে প্রথম আলাপের অধ্যায়ে আমার মনের পটে ওর যে-ছবিটি আজো উজ্জ্বল হ'য়ে আছে, সেটি হ'ল ওর হঠাৎ-হয়ে-ওঠা দলপতির রূপ—প্রফেসর ওটেনকে সদলবলে প্রহারের অব্যবহিত পরেই। ব্যাপারটা নিয়ে সে সময়ে কী হৈ হৈ কাণ্ডই না রটেছিল—যেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের বনেদকে ও খোঁচা দিয়ে বসেছে! কলকাতায় ছাত্র তথা প্রবীণ সমাজে সে কী অকল্পনীয় উদ্দীপনা, আনন্দ, ভয় ও উদ্বেগ। মুসলমানপাড়া লেনে বোমা ফাটায়ও সারা শহরে এত চাঞ্চল্য ছেয়ে যায় নি।

ব্যাপারটা সবাই জানে—ইতিহাসের দিক দিয়ে। আমি কিন্তু সেদিক থেকে ঘটনাটি বিবৃত করব না. স্মৃতিকথার স্বধর্মই পালন করব—বলব যা যা ব্যক্তিগতভাবে আমার গোচর হয়েছিল।

তখন আমি পড়ি বি. এস্-সি, সুভাষ বি. এ। হঠাৎ একদিন শুনলাম ইংরাজ অধ্যাপক ওটেন তাঁর ক্লাসে এক ছাত্রকে যা তা ব'লে গালিগালাজ করেছেন। ছাত্র-সমাজে সে-সময়ে এখনকার মতন কথায় কথায় স্ট্রাইক পিকেটিং ইত্যাদি হ'ত না। তার উপর এখানে অপমানকারী খাস সাহেব—রাঙামুখ গোরা। তখনো শ্বেতচর্মের প্রতিপত্তি বাঙালিদের মধ্যে কম ছিল না। (সুভাষ প্রায়ই বলত স-খেদে: "স্লেভ-মেণ্টালিটি ভাই, স্লেভ-মেণ্টালিটি!") ফলে ছাত্ররা রাগ করলেও অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কী যে ঠিক করবে ভেবে পায় নি। তাদের মধ্যে দু-দল ছিল—যেমন সর্বত্রই থাকে: নরম ও গরম। একদল চেয়েছিল ওটেন সাহেবের কাছে গিয়ে সুধামাখা হাসি হেসে বলতে (পিতৃদেবের হাসির গানের ভাষায়):

লাথি যদি না খাব তো জন্মেছিলাম কিসের জন্যে?
তুমি যদি না মারতে—তো মেরে সেটা যেত অন্যে।
বরং উচিত আগে তোমার পায়ে হাত আজ বুলিয়ে দেওয়া
পরে ধীরে ধীরে নিজের পিঠের দাগটা মুছে নেওয়া।

পরে বলা ভক্তিভরে : "প্রভু অনুগ্রহ ক'রে
পশ্চাতে মেরেছ লাথি, মারো একবার পুরোভাগে—
দেখি সেটা কেমন লাগে ?"

এ গানটি ঈষৎ বদ্‌লে উদ্ধৃত করলাম, কারণ পরে ছাত্রসমাজে একদিন এ-গানটি এইভাবে গেয়েই আমি খুব হাততালি কুড়িয়েছিলাম। কিন্তু গানটির হাসির আড়ালে যে-কান্না লুকিয়ে ছিল, তারই রেশ পৌঁছয় সুভাষের কানে। গানের শেষে সে আমাকে বলে : "এ গানে হাততালি দিল ওরা কী ব'লে, দিলীপ ? শুধু চাই চম্‌কে সচেতন হ'য়ে ওঠা—আমরা কোথায় নেমেছি !" কিন্তু সে অন্য কথা।

ছাত্রসমাজে আর একদল ছিল বটে গরমপন্থী, কিন্তু তারাও কেমন যেন দোমনা। অর্থাৎ তারা "ঘরে খিল দিয়ে রাজার মা-কে ড্যা'ন" বলতে পটু হলেও বাইরে এসে দিব্যি নিরীহ সভ্যভব্য বেশেই ঘুরে বেড়াত। এক কথায়, তারা মন স্থির করতে পারছিল না—কিং কর্তব্যম্‌ ?—কিছু একটা না করলেও মান থাকে না, অথচ কিছু একটা করতে গেলেও প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

এইখানেই দিঙ্‌নির্ণয় করতে অভ্যুদয় হয় "বর্‌ন্ লীডার"-এর। জনসাধারণের মধ্যে যে-আগুন চাপা থাকে তাকে প্রকাশ করতে পারে কেবল সে-ই—তার দুর্দম সাহসে, পরিণাম-চিন্তার-বিসর্জনে। এ করে সে ভেবেচিন্তে নয়, না ক'রে থাকতে পারে না ব'লেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সকলের ব্যথা অপমানের শরিক হ'তে। আগুনের স্বধর্মই যে এই—আগুন ছড়িয়ে দেওয়া।

তাই তো সুভাষ এই সময়ে 'পর্বতের চূড়া সম সহসা প্রকাশ" না হয়ে পারে নি। পরে একদিন আমাকে বলেছিল : "সত্যিই ভাই, আমি গুরুমারা বিদ্যেয় পোক্ত ছিলাম না কোনোদিনই। কিন্তু যখন দেখলাম ওদের মধ্যে গরমপন্থীদের মধ্যেও অনেকেই শুধু মুখে বড়াই ক'রেই খালাস, কাজের বেলায় গায়েব—তখন আর থাকতে পারলাম না—দিলাম ঝাঁপ, যা হবার হবে।" শুধু ঝাঁপ দেওয়া নয়, সুভাষ এসে বুক দিয়ে প'ড়ে করল এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। দলপতি হ'তে না হ'তে সে হয়ে উঠল বেপরোয়া—ছাত্রদের নিয়ে আজ যায় ডীন-এর কাছে, কাল্ প্রিন্সিপালের কাছে, পরশু ভাইসচ্যান্সেলারের কাছে। কিন্তু সবাই উপদেশ দেন চেপে যেতে। একজন গম্ভীরানন এমন কথাও বললেন যে, ওটেন সাহেব যে-ছাত্রটিকে গালাগাল দিয়েছেন তার কর্তব্য এ-কটূক্তিকে গুরুর তিরস্কার বলে শিরোধার্য করা—যার অন্য নাম আশীর্বাদ। শুনে সুভাষ অগ্নিশর্মা, পিঠপিঠ জবাব দিল :

"সার, সংসারে কোন কর্তব্যই একতরফা হয় না—পুরাকালে যখন শিষ্য গুরুর তিরস্কারকে আশীর্বাদ ব'লে শিরোধার্য করত, তখন গুরুও ছিলেন সত্যিই পিতার প্রতিনিধি। শিষ্য গুরুগৃহবাস করত তাঁকে পিতার সম্মান দিয়ে, কেননা তিনি তাকে বরণ করতেন সন্তান মনে ক'রে। এ-অর্থকরী বিদ্যার যুগে গুরু-শিষ্যের সে সম্বন্ধ হয়ে গেছে শুধু পুরাকথা নয়—রূপকথা।"

এইভাবে ও ছাত্রদের বোঝায় যে, রবীন্দ্রনাথের ভর্ৎসনাকেই করতে হবে পথের দিশারি :

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে!

ফল হ'ল—যা হবার : সুভাষকে দলপতি করে ছাত্ররা এগিয়ে এল দণ্ডনীয়কে দণ্ড দিতে : ওটেন সাহেব বিকেলে ক্লাস সেরে নিচে নামতেই তারা মুখোশ পরে তাঁর উপর চড়াও হয়ে দিল তাঁকে বেশ দু ঘা উত্তম-মধ্যম।

পরিষ্কার মনে আছে, পরদিন সকালবেলার কাহিনী : মেজমামা চায়ের টেবিলে খবরের কাগজ খুলেই চিৎকার : "ওরে মন্টু, তোদের সাহেবকে যে সুভাষরা দিয়েছে কাল গোবেড়েন।"

আমি লাফিয়ে উঠলাম : "দেখি, দেখি!" দাদামশায় (সেকেলে সজ্জন—ভয়েই সারা) বললেন : "এসব কী করছে ওরা—ছি ছি! এর নাম—"

মেজমামা (হেসে) : গুরুমারা বিদ্যে বাবা, একালের ধর্মই যে এই। (আমার দিকে কটাক্ষ ক'রে) তুই ওদের মধ্যে ছিলি না তো রে?

আমি (হেসে) : না। মেজমামিমা ফুল-প্রুফ অ্যালিবি দেবেন—আমি তিনটের শো-য়ে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম সিনেমায়—ছটা পর্যন্ত তাঁর নজরবন্দী।

দাদামশায় (স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) : বাঁচা গেল…কিন্তু—

আর কিন্তু—আমি ছুটলাম এলগিন রোডে। সেখানে সুভাষের সঙ্গে দেখা হতেই দোরে খিল দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললাম : "আমাকে বাদ দিলে কেন সুভাষ?"

সুভাষ গভীর স্নেহে আমার পিঠ চাপড়ে বলল : "তোমার ভাই মা বাবা নেই, দাদামহাশয়ের কাছে আছ—তোমাকে কেন মিথ্যে বিপদের মধ্যে টানা?—না দিলীপ, এ তোমার কাজ নয়। আমরা শাস্তি দিয়েছি বটে, কিন্তু তার জন্যে ভুগতে হবে।"

আমি : মানে? শুধু তোমাদের—

সুভাষ : হাঁ ভাই। তাছাড়া, এসব ব্যাপারে মন্ত্রগুপ্তি চাই। তুমি যে পেট-আল্‌গা মানুষ—হয়ত কাউকে ব'লে ফেলতে।

আমি ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা শুরু ক'রে দিলাম—যেন ব্যাপারটা বেশিদূর না গড়ায়—অন্তত সুভাষের বেশি ভুগতে না হয়।

কিন্তু কোথায় এক নাবালক কিশোরের উদ্বিগ্ন প্রার্থনা আর কোথায় বৃটিশ ব্যাঘ্রের গর্জন! সাত সাগরের পারে পার্লামেণ্টের তটে গিয়ে সুভাষের অমার্জনীয় দুরন্তপনার ঢেউ লেগেছে! সে অনেক কথা—সব বলবার না আছে সময়, না প্রয়োজন। মোট কথা এই যে, সুভাষ ধরা পড়ল "রিং লীডার" কলঙ্কের জয়তিলক প'রে। ধরা ও পড়ত না যদি ওর সঙ্গীদের ও বাঁচাতে না চাইত। তারা সবাই ওকে বলেছিল গা-ঢাকা দিতে। কিন্তু সুভাষ বলল : "অপরকে উস্কে দিয়ে যে তার দায়িত্ব নিতে পেছপাও হয় তার নাম কাপুরুষ।" ও তদন্ত কমিটির সামনে এগিয়ে এল অকুতোভয়েই। ওর শুভার্থীরা অনেকেই ওকে বুঝিয়েছিলেন, যেন কমিটির সামনে ও শুধু এইটুকু বলে যে, ছাত্ররা ঝোঁকের মাথায় অন্যায় ক'রে ফেলেছে।

সুভাষ বলল : "আমি বলব যা সত্য ব'লে আমি বিশ্বাস করি।" শুভার্থীরা প্রমাদ গণলেন, ধরলেন ওর মেজদাদা শ্রীশরৎ বসুকে। অতঃপর শ্রীশরৎ বসু আমাকে তদন্ত কমিটির সামনে সুভাষের এজাহারের কাহিনী সম্পর্কে বলেছিলেন সগর্বেই : "সুভাষ খালাস পেত যদি শুধু এইটুকু মাত্র স্বীকার করত যে, ছাত্ররা ওটেনকে মেরে অন্যায় কাজ করেছে। কিন্তু সে এজাহার দিল একটুও ইতস্তত না ক'রে : ছাত্ররা অপমানে জর্জরিত হয়ে তবে মেরেছে—they did it under a grave provocation"

এইই ছিল তার স্বভাব। সে আমাকে প্রায়ই বলত : "আমি সব সইতে পারি দিলীপ, কেবল কাপুরুষতা দেখলে আমার গা-র মধ্যে যেন রিরি ক'রে ওঠে।"

সবাই ওর জয়ধ্বনি করল বটে, কিন্তু ভুগতে হ'ল ওকেই সবচেয়ে বেশি। বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হ'ল দু বৎসর।

বিষাদে আমার মন ছেয়ে গেল। কিন্তু সুভাষ আমাকে বলল : "দুঃখ কী ভাই, পরীক্ষা না দিলে কি আর বিদ্যা হয় না? ভালোই হ'ল একদিক দিয়ে। আমি কলেজের যতসব অপাঠ্য পাঠ্যপুস্তক না প'ড়ে বাড়িতে খুশখেয়ালে ভালো ভালো বই পড়বার সময় পাব।"

ও মুখে একথা বলল বটে কিন্তু ওর চোখের নিচে কালি দেখে বুঝলাম, ওকে কত বেজেছে। চোখের জল কোনোমতে চেপে আমি পালিয়ে গেলাম।

পরদিনই সুভাষের এক চিঠি: "দিলীপ, আমার অনুরোধ তুমি আমার সঙ্গে এখন দেখা কোরো না। পুলিস আমার পিছনে লেগেছে, আমি চাই না তারা তোমারও পিছু নেয়।" ব্যস্। এইই ছিল ওর স্বভাব। যাদের ভালোবাসবে তাদের কথা যেমন ভাববে সব আগে—তেমনি তাদের বিপদে আপদে বুক দিয়ে পড়বে নিজের কথা না ভেবে। সাধে কি দেশ পরে ওকে "নেতাজি" উপাধি দিয়েছিল ওর মহত্ত্বের তর্পণে! কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

পাঁচ

আমি ১৯১৫ সালে আই. এস-সি পাশ করে ১৯১৭-য় বি. এস-সি পরীক্ষা দিয়ে ফেল করি। মনে দারুণ আঘাত লাগে—স্বভাবে গর্বী তো—পরীক্ষায় ফেল ক'রে মনে হল, চোখের আলোও কালো হয়ে গেছে। ফেল করেছিলাম প্র্যাকটিক্যাল কেমিস্ট্রিতে। কেন পাশ করতে পারিনি, সেকথা 'বাল্যস্মৃতি'তে লিখেছি। ভাবলাম—বি. এস-সি বদলে বি-এ নিই। এমন সময়ে হঠাৎ সুভাষ এসে হাজির। আমার মুখ মলিন দেখে বলল: "যত সব বাজে সেন্টিমেণ্টালিটি! একবার হঠাৎ ফেল করেছ তো হয়েছে কি? আমি তো পরীক্ষা দিতেই পারছি নে—তাই বলে কি মুষড়ে পড়েছি নাকি?"

আমি চোখের জল রাখতে পারলাম না। বললাম: "তুমি ভাই, অপরের অপমানের প্রতিকার করতে গিয়ে বরখাস্ত হ'লে। তোমার পরীক্ষা না-দেওয়া আর আমার পরীক্ষা দিয়ে ফেল করা কি এক জিনিষ?"

সুভাষ আমার পিঠে হাত রেখে কোমলস্বরে বলল: "আমি জানি ভাই, তোমার মনে কত বেজেছে। ফেল করলে আমাকেও এমনিই বাজত। কিন্তু একবার ফেল করেছ, তাতে হয়েছে কী? আসছে বছর আরো ভালো ক'রে পাশ করবে।"

আমি বললাম: "অসম্ভব। প্র্যাকটিকাল কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেই আমার মনে হয়, বলি: ধরণী, দ্বিধা হও, আমি নিস্তার পাই এ-বিড়ম্বনা থেকে। ছিঃ, ছিঃ! কয়লা, দুর্গন্ধ, অ্যাসিড, অ্যালকালি, ব্লো পাইপ, বুনসেন বার্ণার,

এ-গুঁড়োর মধ্যে কী আছে খোঁজা, আগুনে হাত পোড়া, অ্যাসিডে পাঞ্জাবি পোড়া—কবে যে মুখপোড়া বনব, তাই কেবল ভাবি।" বলে চোখের জলের মধ্যে দিয়ে উঠলাম হেসে।

সুভাষও হেসে উঠল : "পারবে হে পারবে—মুখ না পুড়িয়েও। তা ছাড়া প্র্যাকটিক্যাল তা মাত্র চল্লিশ পাস মার্ক। গণিতে অনার্স-এ হবে ক্ষতিপূরণ। —না-না বি-এ নিও না। এখন থেকেই হার মানলে চলবে কেন? প্র্যাকটিক্যাল কেমিস্ট্রিতে তোমাকে পাস করতেই হবে। মনে নেই সেই শ্লোকটি :

বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারব্ধমুত্তমগুণা ন পুনস্ত্যজন্তি ?

(অর্থাৎ বার বার বিঘ্ন দ্বারা প্রতিহত হয়েও শ্রেষ্ঠ মানুষ একবার যা ধরে তাকে আর ছাড়ে না।)

ওর কথার মধ্যে শুধু যে জোর ছিল তাই নয়—ও যে ওর নিজের দুঃখ ভুলে আমার ফেল হওয়া শুনেই ছুটে এসেছে, এতে যেন আমার প্রাণের মরা গাঙে বান ডেকে গেল। আমি রুখে উঠে কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ডুব দিলাম যেমন মহাবীর ঝাঁপ দেয় কুয়োয় মজ্জমান শিশুকে তুলতে। ফলে পরের বৎসর টেস্ট-এ প্র্যাকটিক্যাল কেমিস্ট্রিতে একশোর মধ্যে আশি পেলাম ও বি. এস-সিতে গণিত অনার্স প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ হয়ে সদ্যোত্তিন্ন গুম্ফে চাড়া দিয়ে এম. এস-সি পড়া শুরু করলাম ১৯.৮ সালে।

১৯১৯-এর মাঝামাঝি সুভাষ দর্শন শাস্ত্রে অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'য়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। আমি ছুটে গেছি এলগিন রোডে। ও আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি বললাম : "আমি অবিলম্বে বিলেত রওনা হচ্ছি —সেখানে ট্রাইপস নেব গণিতে আর আই সি-এস পরীক্ষার জন্যে তৈরি হব।"

সুভাষ বলল যে, সে-ও বিলেত যাবে স্থির করেছে, তা ভালোই হ'ল, আমি আগে রওনা হচ্ছি। বলল : "আমিও কেম্ব্রিজ থেকে আই. সি. এস পরীক্ষা দেব ঠিক করেছি। তবে শুনছি কেম্ব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের জন্যে সীট বেশি নেই। তা তুমি আগে যাচ্ছ ভালোই হ'ল। কেম্ব্রিজে পৌঁছে আমার জন্যে একটা সীট পেয়ে তার করলেই আমি পাড়ি দেব।"

আমি কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না, বললাম : "তুমি······তুমি সুভাষ···দেবে আই. সি. এস পরীক্ষা ?"

সুভাষ (হেসে): করি কী বলো? বাবা বললেন—তিনি আমাকে বিলেত পাঠাবেন না যদি না আমি আই. সি. এস দিই। তাঁর ধারণা—আই. সি. এস দিয়ে, আমি হাকিম হয়ে না বসলে আমার জেলে যাওয়ার ফাঁড়া কাটতে পারে না। কাজেই কথা দিতে হ'ল।

আমি (তবু স্তম্ভিত): বুঝলাম, কিন্তু তাই ব'লে তুমি কথা দিলে আই. সি. এস পরীক্ষা দেবে? তুমি !!

সুভাষ (ফের হেসে): আহা, ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমি আই. সি. এস পরীক্ষা দেব মাত্র এই কথাই দিয়েছি, পরীক্ষায় পাশ হ'লে কী করব সে-সম্বন্ধে তো কোনো কথাই দিই নি।

আমি (হদিশ না পেয়ে): মানে?

সুভাষ (ঠোঁটে তর্জনী রেখে): এর মধ্যেই চাণক্য-শ্লোক ভুলে গেলে: মনসা চিন্তিতং কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ? মন্ত্রগুপ্তি না হ'লে মন্ত্রসিদ্ধি হয় কি?

বাড়ি ফিরে সে কী পুলক আমার! বললাম মেজমামাকে। তিনি খুশি হলেন বটে, কিন্তু দাদামহাশয়কে বলতেই তিনি বিষম উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলেন। বললেন: "সুভাষের সঙ্গে মিশলে যে পুলিস্ পিছু নেবে রে!"

আমি: নিলেই বা।

দাদামহাশয়: নিলেই বা কী—মানে? একবার পুলিসের নজরবন্দী হ'লে কি আর রক্ষে আছে? বলে না—বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! তাছাড়া ওরা বেছে বেছে ধরে সেই সব ছেলেদের যারা বিয়ে করে নি, জানিস নে?

আমি (আমতা আমতা): বিয়ে?······মানে?

দাদামহাশয় (হেসে): সেটা না হয় তোর দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করিস—মাথা সাফ হ'য়ে যাবে।

নাতির সঙ্গে নাতবৌ নিয়ে এরকম ঠাট্টা তিনি প্রায়ই করতেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দাদামহাশয়ী ঢঙে। এ-বিষয়েও তিনি ছিলেন ষোলো আনা সেকেলেই বৈকি।

মরুকগে আই সি. এস, মরুকগে মন্ত্রগুপ্তি—সুভাষ আসবে বিলেতে—কেম্ব্রিজে তার সঙ্গে পড়ব ফের একসঙ্গে—থাকব এক কলেজেই, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া বেড়ানো গল্প-আলোচনা চলবে নিরঙ্কুশ—মাথার উপরে থাকবে না কেউ সামলাবার —এ যদি রোমান্স না হয় তো রোমান্স কার নাম শুনি? রাত্রে প্রায়ই আনন্দে ঘুম

হ'ত না। ছুটোছুটি করতে লাগলাম জাহাজের জন্যে—শুভস্য শীঘ্রম্। কেম্ব্রিজে দুটো সীট যোগাড় করাই চাই।

এ হ'ল ১৯১৯ সালের কথা। বত্রিশ বৎসর পরে, ১৯৫১ সালে শ্রীঅরবিন্দের মহাকাব্য সাবিত্রীতে পড়ি :

There is a darkness in terrestrial things,
That will not suffer long too glad a note.

অর্থাৎ

এ-মৃন্ময়ী ধরণীর অঙ্গে অঙ্গে অন্ধকার ছায়,
পরমানন্দের সুর তাই হেথা মুহূর্তে মিলায়।

যোগিকবি মিথ্যা বলেননি : আমার পরমানন্দও নিরানন্দে পরিণত হ'ল দেখতে দেখতে : দাদামহাশয় দিদিমা মাসিমারা সবাই এক জোটে ধুয়ো তুললেন : সুভাষের সঙ্গে থাকার দরুণ পুলিসের শনিদৃষ্টির একমাত্র কাটান্ হচ্ছে রাতারাতি বিয়ে ক'রে বিলাতযাত্রা। দাদামহাশয় যে খুব অকারণ ভয় পেয়েছিলেন তা নয় : সত্যিই পুলিসের চরেরা বিপ্লবী খুঁজত তাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, কিম্বা গীতাকে করেছে জীবন-সঙ্গিনী।

আজকের দিনের পাঠক হয়ত একথা পড়ে একটু অবাকই হবেন : সুভাষকে সহপাঠী পাওয়ার ফলে গৃহে এমন আতঙ্ক যার একমাত্র কাটান্—শুধু বিবাহ। এ যে আরব্যোপন্যাস—"লঙ্কায় রাবণ ম'লো, বেহুলা কেঁদে আকুল হ'ল" অবস্থা! কিন্তু পুরাকালের মনোভাব আমরা অনেক সময়েই সহজে অনুমান করতে পারি না উত্তরকালের কল্পনা দিয়ে। তাই হয়ত এ-যুগের পাঠক ঠিক পারম্পর্যটি অনুধাবন করতে পারবেন না—কোথায় সুভাষের বিলেত যাওয়ার প্রস্তাব আর কোথায় থিয়েটার রোডের আনন্দদুলালের রাঙা বৌয়ের জন্যে বাড়িসুদ্ধ লোকের উজিয়ে ওঠা!

শুধু কি তাই? কারণ থেকেই কার্য : দিদিমা আমাকে নিলামে চড়াতে না চড়াতে চারদিক থেকে ডাক এল বয়স্থা কুমারীদের অভিভাবক গ্রাহকদের তরফ থেকে : আর শুধু রাঙা বৌ-ই নয়, অতিগৌরী, ফরসা, শ্যামলী, কৃষ্ণা, লজ্জাবতী লতা, ঘোড়ায়চড়া নব্যা—সর্ববিধ কুমারীর নমুনারই শোভাযাত্রা শুরু হয় আর কি!

সুভাষকে গিয়ে ধ'রে পড়লাম : "কী ট্রাজিডি!" সে তো হেসেই অস্থির : "একে ট্রাজিডি বলছ কী দিলীপ, এ যে দস্তুরমত কমেডি! এ-যুগে বহুবিবাহ!"

সুভাষ-যে-সুভাষ সেও কিনা ঠাট্টা শুরু করল? সখেদে মনে মনে গাইলাম ছেলেবেলায়-শোনা বেদানা দাসীর টপ্পা :

যে যাতনা যতনে রাখি মনে,
সঙ্গোপনে,
পাছে শত্রু হাসে শুনে—
লোকলাজে প্রকাশ করি নে।

* * *

কিন্তু যেমন কাঁকড়া সঙ্গোপনে স্ব-বিবরে আত্মগোপন করলেও তার আর নিস্তার নেই, গর্ত খুঁড়ে তাকে সন্ধানীরা টেনে বার করে, তেমনি আমাকেও এখানে ওখানে টেনে নিয়ে যেতেন আত্মীয়স্বজনেরা। কখনো বা মামা-মামিরা বলতেন গান গাইতে হবে "চল্, অমুক বাবু নিমন্ত্রণ করেছেন—জানিস তো তিনি কেমন সমজদার!"—কিন্তু সমজদারের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে চক্ষুস্থির : দেখি "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব" এক কিশোরী চা ঢেলে দিচ্ছে! কখনো আত্মীয়েরা চাল বদলাতেন, বলতেন : "চল্—অমুক বাবুর সুন্দর টেনিস কোর্টে কী চমৎকার যে খেলা জমে সেখানে……" সেখানে গিয়ে আরো বিপদ—দেখি আর এক কিশোরী আরো নব্যা আরো সঞ্চারিণী—টেনিসে আমাকে করলেন পার্টনার, পরে টেনিস খেলা শেষ হ'তে না হ'তে শরবত, শরবতের পরেই কিশোরীর পিয়ানোবাদন—ভাগ্যে বলডান্সের ডামাডোল তখনো শুরু হয়নি!

দেখেশুনে শেষে আমিও চাল বদলালাম। কোথাও নিমন্ত্রণ শুনলেই চম্পট দেওয়া শুরু করলাম—হয় সুভাষের কাছে, না হয় দরদী বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্নেহদুর্গে, ২২নং ঈশ্বর মিল লেনে। সত্যেনের কথা পরে বলব যথাস্থানে—কীভাবে সে হাসত আমার সঙিন পরিস্থিতিতে। এখন ঘটকালির প্রসঙ্গটা সেরে নিই।

শেষে মরিয়া হ'য়ে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লাম, বললাম দিদিমাকে যে, সবাই মিলে ক্রমাগত এরকম চক্রান্ত করলে শেষটায় আমাকে অগত্যা বিবাগী হ'তেই হবে।

দিদিমা এবার ডরিয়ে উঠলেন : এ যে সুভাষের সঙ্গে বিলেতে একসঙ্গে পড়ার চেয়েও সাংঘাতিক! কারণ তিনি আমাকে এটুকু অন্তত চিনতেন যে, আমি ফাঁকা তোপ ছাড়ি না। তাছাড়া বলেছি আমার কোষ্ঠীতে ছিল আমি উত্তর জীবনে সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে যাব। তাই তিনি ভয় পেয়ে দাদামহাশয়ের সঙ্গে বহুক্ষণ ফিশফিশ করে পরামর্শ করে শেষটা স্থির করলেন আমাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করবেন না।

তবে সেই সঙ্গে বললেন হতাশ স্বরে : "কিন্তু তাহ'লে তামা-তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে তিন সত্যি কর যে, বিলেতে গিয়ে মেম বিয়ে করবি নে, করবি নে, করবি নে।"

আমি (সোৎসাহে): তিন সত্যি? তিন সতেরং তিরাশী সত্যি করতে রাজী আছি—মেম দেখবামাত্র শুগ্‌লির মতন কুঁকড়ে যাব, কুঁকড়ে যাব, কুঁকড়ে যাব, কুঁকড়ে—

দাদামহাশয় (খিল খিল করে হেসে): পাগল আর কাকে বলে! শুনিস নি সেই গল্প: মাতাল রঙে ছিলেন, বললেন: "হাতী লেঙ্গে, লে আও হাতী।" নেশা ভাঙতে হাতীওয়ালা হাতী নিয়ে হাজির দিতেই বললেন: "হাতী জো লেগা ও চলা গয়া।" তেমনই যে-তুই এখন বলছিস মেম বিয়ে করবি নে সে-তোকে কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে যখন মেমিয়ানায় মজবি রে?

আমি (কোণঠাসা হয়ে রেগে): যাক্ বা না যাক্—এখন আমি বিয়ে করছি না কিছুতেই।

দাদামহাশয় মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন। এ-বিংশ শতাব্দী, তার উপর বেঁকে-বসা-ছেলে তাঁর পুত্র নয়, দৌহিত্র মাত্র—যার উপর জোর চলে না—আরো এইজন্যে যে দৌহিত্র সাবালক তথা অত্যাধুনিক। ভেবেচিন্তে শেষে একদিন বললেন: "তাহ'লে এক কাজ কর্—চল এক মস্ত সাধুর কাছে—রাখাল মহারাজ। জানিস না তো—কী পেল্লায় সাধু—ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য! সাধুর আশীর্বাদই তোর রক্ষাকবচ হোক—যখন বিবাহ করবি নে গোঁ ধরেছিস, তোকে তো আর এ-যুগে জোর ক'রে ধ'রে ছাঁদনা তলায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। তবু এখনো ফের বলছি রে—বিয়ে করে রওনা হ'লেই ভালো করতিস—জানিস না তো ওদেশের রঙ্গিণীদের। মেম-সাহেবরা সে কত ছলাকলাই যে জানেন"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার দাদামহাশয় আদৌ জানতেন না যে আমি আবাল্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত। তাই এমন সন্দেহ তাঁর মনে একবারো উদয় হয়নি যে আমার বিবাহ-বিমুখতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে। আমার বন্ধুদের মধ্যে এক সুভাষকে বলেছিলাম যে পরমহংসদেবের ছবির সামনে আমি অঙ্গীকার করেছি যে—কৃষ্ণৈকান্ত ব্রহ্মচারী হ'য়ে—আমি চিরকুমার ব্রত নিয়ে তাঁর নির্দেশ মেনে চলব ভগবানের তীর্থযাত্রায়।

সুভাষ আমার এ-সংকল্পে সায় দিলেও সে এই সময় থেকেই ভগবৎব্রত ছেড়ে

দেশব্রতকেই সর্বান্তঃকরণে বরণ করেছিল। তাই চিরকুমারব্রতে তার মনের পুরোপুরি সায় থাকলেও সে নিরন্তরই আমাকে বলত বিবেকানন্দের কথা :

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

আমার সঙ্গে কেবল এই ক্ষেত্রেই তার একটা অমিলের ব্যবধান ছিল যার উপর দিয়ে কোনো রকম রফার সেতু বাঁধাও মুশকিল। কারণ বলেছি, আমার মনের সদাটলমানতা সত্বেও এইখানে আমি আমার শৈশবেই এমন একটা খুঁটি পেয়ে গিয়েছিলাম যে আমার পক্ষে ভগবৎব্রত ছেড়ে বিশ্বমানবী দেশব্রতকে বরণ করা প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি হয়ে উঠেছিল। সুভাষের কথায় আমি তখনকার ম'ত তার দেশভক্তিতে উজিয়ে উঠলেও তার কাছ থেকে চ'লে আসতে না আসতে সত্যিই পরিষ্কার দেখতে পেতাম যে সুভাষের স্বধর্ম আমার কাছে পরধর্ম। এতে মনে ব্যথা বাজত বৈ কি, কিন্তু এটুকু মনস্তত্ত্ব আমি জানতাম যার আলোয় দেখতে পেতাম আমার জীবনবিধাতা আমাকে কোন্ পথের নির্দেশ দিচ্ছেন। সে-পথ—না বিবেকানন্দ স্বামীর মতন অলোকসামান্য কর্মব্রতীর, না সুভাষের মতন অনন্যতন্ত্র দেশব্রতীর। সে-পথ হ'ল ভক্তির সেই চিরন্তন পথ যে-পথ দিয়ে ভক্ত যুগে যুগে চেয়েছে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে কৃতার্থ হ'তে। তাই সুভাষের কাছ থেকে ফিরে যখন ফের চারদিকে সুন্দরী বধূবরণের চক্রান্তে প'ড়ে যেতাম তখন সত্যিই কাতর হ'য়ে পরমহংসদেবের ছবির সামনে চোখের জলে ডাকতাম—একটুও বাড়িয়ে বলছি না : "দেখো ঠাকুর, পথ দেখিয়ে পথ ভুলিয়ে দিও না, গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিও না—মন হাজার দুর্বল হ'লেও তোমার ডাক ছাড়া আর কোনো ডাকে যেন আমি তোমাকে ভুলে না যাই, এমনকি যদি তোমাকে নাও পাই, তাহ'লেও আমাকে বিবাহ ক'রে সংসারী হ'তে দিও না কিছুতেই…" ইত্যাদি।

ছয়

এ হেন আমি যে রাখাল মহারাজের দর্শনের প্রস্তাবে উজিয়ে উঠব, সে কি আর বলতে হবে? স্বয়ং রাখাল মহারাজ—ঠাকুরের সাক্ষাৎ মানসপুত্র—যাকে ঠাকুর বলতেন নিত্যসিদ্ধের থাক—যার সম্বন্ধে উপমা দিতেন, হোমা পাখির—যে আকাশেই ডিম পাড়ে ও সে ডিম পড়তে পড়তে ফুটবামাত্র সদ্যোজাত পাখায় ফিরে উধাও হয় আকাশের দিকে, নিত্যসিদ্ধরাও, ঠিক এম্নি, সংসারে বদ্ধ হবার আগেই ভগবানের দিকে চম্পট দেয়—বলতেন ঠাকুর। কতবারই পড়েছি রাখাল মহারাজের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা, শুনেছি শ্রীম-র তথা স্বামী সারদানন্দের মুখে তাঁর আশ্চর্য বৈরাগ্য, প্রেম ও সমাধিভূমিতে অবস্থান করার কাহিনী। লোকে বলত তাঁকে রাজা মহারাজ। কারণ পরমহংসদেব বলতেন: "রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে।" রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট, স্বামী বিবেককানন্দের গুরুভাই, বৈরাগ্যের জ্বলন্ত বিগ্রহ, পঙ্কে থেকেও যিনি ছিলেন পঙ্কজের মতন নির্মল, বিবাহ করেও যিনি ছিলেন সহবাস-বিমুখ—আজ তাঁকে স্বচক্ষে দেখব?—মন আমার গান গেয়ে উঠল বৈ কি!

এখানে ব'লে রাখি: ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার ও বিহারী ভাদুড়ির সঙ্গে দাদামহাশয় পরমহংসদেবের গলক্ষতের চিকিৎসা করতে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন মাঝে মাঝে—কথামৃতে তাঁর নাম আছে দু তিন জায়গায়। দাদামহাশয় থিয়েটার রোডে প্রায়ই রাতের খাওয়া দাওয়ার পর গল্প করতেন রসিয়ে—ঠাকুরকে কী চোখে দেখেছিলেন। মনে পড়ে তাঁর মুখে শোনা কাহিনী যে—সমাধিতে সময়ে সময়ে ঠাকুরের হৃৎস্পন্দন থম্‌কে যেত, আদৌ নাড়ী পাওয়া যেত না। দাদামহাশয় বলতেন ঠাকুরের হাসির কথা, নাচতে নাচতে দিগম্বর হ'য়ে পড়ার কথা—সর্বোপরি তাঁর মধুর ভাবসঙ্গীতের কথা। উঠতে বসতে খোঁটা দিতেন: "ধেৎ! কী তা না না না ক'রে ওস্তাদি করিস তুই? তাঁর মতন গাইতে গাইতে যদি বিশ্ব ভুলে যেতে পারতিস তবে না বুঝতাম।" (এ-রকম খোঁটা যখন তিনি দিতেন তখন সময়ে সময়ে বেজায় লোভ হ'ত তাঁকে টুকি—আমার জন্যে একটি রাঙা বৌয়ের ব্যবস্থা ক'রে ভগবানের নামে বিশ্ব ভুলে যাওয়ার সাধনার মুখেই তিনি আমাকে চালাতে চাইছিলেন কিনা।) আর একটা কথা মনে পড়ছে—দাদামহাশয় বলতেন—ঠাকুর প্রায়ই ভাবোন্মত্ত হ'য়ে গাইতেন একটি গান: "রামকো জো না জানা সো ক্যা জানা হয় রে।" কিন্তু এ-গানটির কোনো উল্লেখই পাই নি পাঁচ খণ্ড কথামৃতে। যাক্, যা বলছিলাম।

রাখাল মহারাজ, ওরফে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সে-সময়ে কলকাতায় এলে প্রায়ই থাকতেন বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর দ্বিতল ভবনে। দাদামহাশয়ের মোটর থামল এই তীর্থোপম পুণ্যনিলয়ের সামনে—যেখানে ঠাকুর কতবারই উদ্দণ্ড নৃত্য ক'রে সবাইকে মাতাতেন—মা-র নামে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে না উঠতে ধূপের গন্ধ ভেসে এল। গায়ে আমার কাঁটা দিল ফের—ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোগীর দর্শন পাব আজ!

দেখেই মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। কী সৌম্য পবিত্র মূর্তি! গেরুয়া রঙে যেন আরো নির্মল, আরো উজ্জ্বল রঙে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে! গম্ভীর আনন অথচ এতটুকু কাঠিন্য নেই! আনন্দময় মহাপুরুষ দাদামহাশয়কে দেখে বালকের মতনই সরল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন: "এ কী! প্রতাপবাবু! আসুন আসুন! কতদিন বাদে…"

তারপর একথা সেকথা…কত গল্প হাসি ঠাট্টা—ঠাকুরের স্মৃতি নিয়ে রোমন্থন…যেমন দুই বন্ধুর মধ্যে অনেক দিন বাদে হঠাৎ দেখা হ'লে হ'য়ে থাকে। আমি মুগ্ধ হয়ে শুধু শুনি তাঁর মুখে ঠাকুরের কথা আর থেকে থেকে চোখে জল ভ'রে আসে—বহু কষ্টে সামলাতে হয়।

হঠাৎ চমক ভাঙল—আমার নিজের নাম শুনে।

দাদামহাশয় অনর্গল আমার কাহিনী পেশ করে শেষে বললেন: "ছেলে ভালোই বলব—পড়াশুনোয় কিছু গাফিলি করে না—গত বৎসর বি. এস-সি অনার্স গণিতে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেছে। কিন্তু আমি মহাভাবনায় পড়ে গেছি মহারাজ! হয়েছে কি—ওর বাবা অনেক টাকা রেখে গেছেন। তার ওপর ও এখন সাবালক—কাজেই বেপরোয়া, জানেন তো আজকালকার ছেলেদের কাণ্ড! তার উপর দেখতেই পাচ্ছেন দেখতে শুনতেও (হেসে) নিতান্ত অখাদ্য নয়। কিন্তু হ'লে হবে কি—দুর্দান্ত একগুঁয়ে, তার উপর ঝোঁকালো আর রোখালো। বলে বিয়ে করবে না—ভাবুন তো! এদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে সুন্দরী পয়মন্ত পাত্রী হাজির—দু' একজন টাকাওয়ালা বাপের মেয়েও আছে—অতি চমৎকার ঘর—কিন্তু ও কি সোজা দুরন্ত ঠাউরেছেন?—একবার গোঁ ধরলে ছাড়ায় কার সাধ্য? কাজেই ওকে বিয়ে করাবে কে বলুন তো?"

রাখাল মহারাজ (ফিক করে হেসে): বটে! বেশ বেশ। (একটু আমার দিকে চেয়ে থেকেই দাদামহাশয়ের দিকে ফিরে) আমি আপনার ভাবখানা বেশ

বুঝছি প্রতাপবাবু। শুধু আমি এক্ষেত্রে কী করতে পারি সেইটাই ভেবে পাচ্ছি নে। আমি নিজে সন্নিসি ঠাকুর হ'য়ে কোন মুখে ওকে তুতিয়ে পাতিয়ে বিয়ে থা ক'রে থিতু হ'তে বলি বলুন তো?—তাই বলি শুনুন—ওর উপরেই কেন ছেড়ে দিন না—যে বিয়ে করবে?

দাদামহাশয়: ওর উপরে ছেড়ে দিতে তো আমরা গররাজি নই মহারাজ, কিন্তু মুশকিল বেধেছে এই জন্যে যে, ও ধরেছে বিয়ে না ক'রেই বিলেত যাবে—এই বৎসরেই। কাজেই আমরা ভয় পেয়েছি বই কি, বুঝলেন না? ও যে রকম ঝোঁকালো ছেলে—ওদেশে মেমরাও যে কী বস্তু জানেন না তো—কী সাজসজ্জা রংঢং তাদের! ও পড়বেই পড়বে কোনো না কোনো রঙ্গিণীর ফাঁদে আর করবে তাকে ঘরণী। তখন?—(একটু থেমে) তাই তো ভেবে চিন্তে আপনার আশীর্বাদ নিতে ওকে ধ'রে নিয়ে এলাম মহারাজ!—সাধুদের আশীর্বাদের মতন রক্ষাকবচ সংসারে আর কী আছে বলুন? (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) তাছাড়া এখন আর উপায়ই বা কী বলুন?—হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি—তার উপর ও আবার কী বিষম গান-পাগলা জানেন না তো। আর মেয়েরা গান শুনলে—বুঝলেন কি না···

রাখাল মহারাজ (টুপ করে): তুমি গান গাইতে পারো বাবা? বেশ বেশ। শোনাও না একটি—মার নাম। জানো?

আমি 'জানি' বলে আনন্দে অধীর হয়ে ধরে দিলাম কথামৃতের একটি বিখ্যাত গান, কমলাকান্তের রচনা:

মজলো আমার মন ভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে।
বিষয় মধু তুচ্ছ হোলো কামনা কুসুম সকলে,
চরণ কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালোয় মিশে গেল,
প্রাণ অসত্য রিপু মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে।
কমলাকান্তের মনে আশা পূরণ এত দিনে।
সুখ দুঃখ সমান হ'ল—আনন্দ সাগর উথলে!

গান শুনতে শুনতে রাখাল মহারাজের মুখের চেহারা বদলে গেল—যেন একটা অলক্ষ্য আভা এসে তাঁকে ঘিরে ধরল।···আমার হৃদয়ে জেগে উঠল ভক্তি, চোখে অশ্রু। তারপর···কী যে হ'ল বলে বোঝাতে পারব না, শুধু এইটুকু বলি যে স্পষ্ট অনুভব করলাম আমার মাথার উপরে মহাযোগীর সব-তাপ-জুড়িয়ে-দেওয়া আশীর্বাদ!······

গান শেষ হ'লে দেখি—কী আশ্চর্য!—দাদামহাশয়ের চোখে জল! হয়ত এই প্রথম তাঁর মনে হ'য়ে থাকবে যে, গান শুধু বিপদে ফেলতেই মুখিয়ে নেই—বিপদ কাটাতেও পারে বা।

ওদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি—মহারাজ সমাধিস্থ! কী সুন্দর!…কী পবিত্র!…

অনেকক্ষণ বাদে তিনি চোখ খুললেন। তারপর ভাবনেত্রে আমার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। আমি চোখ নিচু করলাম। বুকের মধ্যে তখন আমার ডমরু উঠেছে বেজে……

হঠাৎ তিনি দাদামহাশয়ের দিকে ফিরে ধরা গলায় বললেন: "প্রতাপবাবু। ভয় নেই আপনার! এ ছেলের কোনো বিপদ হবে না বিদেশে বিভুঁয়ে।"

দাদামহাশয় সপ্রশ্ন নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকটা বিহ্বল ভাবেই বলব। তিনি বললেন: "জানেন—ও যখন গাইছিল—আমি কী দেখলাম? দেখলাম ওর চারদিকে ঠাকুরের কৃপার একটি—aura—মণ্ডল। এ-কৃপা হ'ল একটি বর্ম—বুঝলেন প্রতাপবাবু? হ্যাঁ সত্যিই বর্ম—আর আমি জানি তার মর্ম। ও দু একবার হয়ত হোঁচট খেতে পারে, কিন্তু পদস্খলন ওর হবে না—আপনাকে বলছি, বিশ্বাস করুন।" বলে আমার দিকে ফিরে: "এসো তো বাবা—একটু কাছে।"

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না, তাঁর পায়ে আমার মাথা রেখে ভেঙে পড়লাম…কেবল কান্না আর কান্না।

রাখাল মহারাজ আমার মাথায় ঘাড়ে সস্নেহে হাত বুলোতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা শান্তির প্রবাহ বইতে শুরু করে—মাথা থেকে নাভি পর্যন্ত।……

যখন আমি ফের মাথা তুললাম দেখি তিনি গভীর স্নেহে আমার দিকে চেয়ে!

আমি (ধরা গলায়): আমাকে · আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

রাখাল মহারাজ (একদৃষ্টে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মৃদু হেসে): কেবল একটি কথা…(তাঁর সুর মৃদুল হ'য়ে এল) মনে রেখো বাবা—সদাসর্বদা।

আমি (বিহ্বলভাবে): মনে রাখব?

রাখাল মহারাজ: হ্যাঁ বাবা। ঠাকুর আমাদের বলতেন কেবলই এই একটি কথা: স্মরণ মনন থাকলেই হ'ল—নিরন্তর মনে মনে তাঁর সঙ্গে মোকাবিলা—এরই নাম হ'ল যোগ—যোগের যোগ। মনে রাখতে হবে ঠাকুরের কৃপা, বলতে হবে

নিজেকে সর্বদাই : "আমি তাঁর কৃপা পেয়েছি—এ-কৃপার যোগ্য হ'তে হবে।" ব্যস আর কিছু নয়। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

এ-পরম দর্শনের অঘটন নাম দিয়েছি। কারণ যা দেখলাম তার বর্ণনা করতে পারি এমন ভাষা আমার জানা নেই। শুধু রবীন্দ্রনাথের একটি চরণ মনে আসে : যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।

সুভাষকে গিয়ে একথা বলতেই ওর চোখ অশ্রু-আভাসে সজল হ'য়ে উঠল। আমার দুহাত চেপে ধরে বলল : "আমিও এই কথাই বলি ভাই—'মনে রেখো' তুমি। —হ্যাঁ শুধু মনে রেখো যে কৃপা যে পায় তার জীবন বদ্‌লে যায়ই যায়।···আর" বলে একটু থেমে : "আমিও পেয়েছি এ-কৃপার আভাস। তাই তো চাই দেশের কাজে জীবন ঢেলে সার্থক হ'তে। এও তোমাকে বলেছি যে ঐ রাখাল মহারাজই আমাকে কাশী থেকে ফিরিয়ে পাঠান, বলেন, "আমাকে দেশের কাজ করতে হবে।"

আমি : জানি সুভাষ। আর এ তুমিই পারবে।

সুভাষ : পারে সবাই ভাই—কেবল চেষ্টা চাই, আগ্রহ চাই, অধ্যবসায় চাই। আমরা আজ বড় তামসিক হয়ে পড়েছি দিলীপ—স্বামীজি বারবারই বলতেন এই কথা।

আমি : জানি--

সুভাষ (উদ্দীপ্ত) : না, জানো না জানার মতন ক'রে। তাই তুমি দেশের কথা এখনো তেমন ক'রে ভাবতে পারো না যেমন ক'রে তিনি পারতেন। আমি যদি তাঁর কাছে কিছু শিখে থাকি ভাই, তবে সে তাঁর এই দেশপ্রেম—এই দেখ— (শেল্‌ফ্‌ থেকে নিবেদিতার The Master As I Saw Him টেনে—তৃতীয় অধ্যায় খুলে)—শোনো নিবেদিতা কী বলছেন তাঁর মহান্ হৃদয়ের সম্বন্ধে।

"There was one thing, however, deep in the Master's nature, that he himself never knew how to adjust. This was his love of his country and his resentment of her suffering. Throughout these years in which I saw him almost daily, the thought of India was to him like the air he breathed."

ব'লে সুভাষ ধরা গলায় পড়ে চলল প্রায় পনের মিনিট। ওর কাছে বইটি নিয়ে আমি দুদিনে দিনে রাতে প'ড়ে শেষ করি। এর সুফল হ'ল এইটুকু যে, স্বামীজির বাণীর আলোয় যেন সুভাষকে এক নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখলাম।

এর পরে স্বামীজির নানা বাণী যখনই ওর মুখে শুনেছি তখনই আমার মনে হয়েছে এই একটি কথাই ফিরে ফিরে: যে স্বামীজির উদ্দীপনাই ওকে দীক্ষা দিয়েছে জাগৃতি মন্ত্রে: মনে হয়েছে স্বামীজির সমানধর্মী যদি এযুগে কেউ জন্মে থাকে তবে সে সুভাষ। তাই তো আমার এত দুঃখ হ'ত দেখে যে, ও ধর্মের আলোয় আমাদের দেশবাসীকে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"-র মন্ত্রসাম না শুনিয়ে রাজনীতির মিথ্যামলিন আখড়ায় ওর অমূল্য জীবন বিসর্জন দিতে চলেছে। অবশ্য একথা বলছি না যে, ওর এ-ত্যাগ আমাদের দেয়নি কোনো বীর্যের পাথেয়। কোনো মহান্ ত্যাগই সংসারে বন্ধ্যা থাকতে পারে না। গীতা অকারণ বলেনি: "নেহাভিক্রমনাশোস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে" —অর্থাৎ কোনো সত্যসাধনার বীজই বন্ধ্যা হ'তে পারে না। রবীন্দ্রনাথও এই কথাই বলেছেন তাঁর অনুপম উপমায়:

জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।
যে ফুল না-ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে-নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

আমি শুধু এই কথাটি বলতে চাইছি যে, সুভাষ কুরুক্ষেত্রে না গিয়ে ধর্মক্ষেত্রে গেলে সে হ'য়ে দাঁড়াত বিবেকানন্দের পতাকাবাহী, আর তাহ'লেই তার শ্রেষ্ঠ দান দেশ পেত তার দীপ্ত বিকাশের মাধ্যমে।

সাত

সুভাষ কেম্ব্রিজে আসবে—তার সঙ্গে একসঙ্গে ফের পড়াশুনো খেলোধুলো করব···মন গান গেয়ে উঠল। আর তর সইল না, কলকাতা থেকেই সোজা রওনা হলাম এক ছোট বি আই এস এন জাহাজে, বিদঘুটে নাম—থংগোয়া। লণ্ডনে পৌঁছলাম ২রা জুলাই। সেখানে দিন সাতেক কাটিয়ে কেম্ব্রিজে গমন এবং সেখানে বিস্তর চেষ্টার পরে ফিট্‌স্ উইলিয়ম হলে সুভাষের ও আমার সীট প্রাপ্তি। সুভাষকে তার করলাম। সে পাল্টা তার করল: এলাম ব'লে।

আনন্দে মনের যেন পাখা উঠল। মহাউৎসাহে একটা গোটা কবিতাই বেরিয়ে গেল কলমের মুখে, তার শুধু দুটি লাইন মনে আছে—এই ধরনেরি হবে :

স্নেহের পরশ তব যে পেয়েছে বন্ধু, একবার :
জেনেছে সে সীমামাঝে আলোবরদান অসীমার।

কিন্তু উচ্ছ্বাসের অন্তরীক্ষ ছেড়ে এখন ঘটনার বাস্তব মঞ্চে নামি।

সুভাষ যখন ইংলণ্ডে এসে পৌঁছল তখনো কেম্ব্রিজের কলেজ খোলেনি। তাই কয়দিন আমরা লণ্ডনে কাটাই একত্রে। আমি চাইতাম ওকে থিয়েটার, সিনেমা, হিপোড্রোম প্রভৃতি প্রদর্শনীতে নিয়ে যেতে। কিন্তু ও কি আমোদপ্রমোদ করার পাত্র ? যাবে কেবল এখানে ওখানে ঐতিহাসিক স্থান দেখতে কিংবা বৃটিশ ম্যুসিয়মে। হ্যাম্পস্টেড হীথে ও একদিন মাত্র বেড়াতে গিয়েই বন্ধ করে দিল বেড়ানো—সেখানে নানা বেঞ্চেই প্রণয়ী প্রণয়িনীরা অবাধে প্রকাশ্যেই গলাগলি করে ব'লে।

বিবেকী বলতে যা বোঝায় সুভাষ ছিল তাই। সেইজন্যেই ও লণ্ডনে বেশি দিন থাকতে চায়নি—দুচার দিন বাদেই বলল : "চলো কেম্বিজে গুছিয়ে বসা যাক, এখানে সময় নষ্ট করে লাভ কী ?"

কিন্তু কেম্ব্রিজে স্থিতিশীল হ'তে না হ'তে ওর সেই একই অবস্থা : সেখানেও না যাবে কোনো হট্টগোলে, না কোনো আমোদপ্রমোদে। কেউ ধরলেই বলবে : "আমরা বিদেশে এসেছি দেশের কাজের জন্যে প্রস্তুত হ'তে, বিদ্যা জ্ঞান সঞ্চয় করতে—মিথ্যে হাসি গল্প তামাশায় সময় নষ্ট করতে নয়।"

* * * *

কলেজ খুলতেই সুভাষ আই. সি-এস-এর এক রাশ বই নিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে "মেণ্টাল অ্যাণ্ড মরাল সায়েন্স" ক্লাসে যাওয়া—একটি লেকচারও না বাদ দিয়ে। তারপর সে কী বিষম পড়া! শুধু পড়া আর পড়া!……

পরীক্ষা দিল মাত্র ন-মাস প'ড়ে। ওখানে আরো অনেক মেধাবী ভারতীয় ছাত্র আই. সি. এস পরীক্ষা দিয়েছিল দু তিন বৎসরের প্রস্তুতির পরে। ও তাদের প্রায় সবাইকেই হারিয়ে পরীক্ষায় দাঁড়াল চতুর্থ। তার উপরে ইংরাজিতে প্রথম।

চারদিকে ধন্য ধন্য সাড়া প'ড়ে গেল। কিন্তু যথাকালে বোমা ফাটল : সুভাষ লণ্ডনে লিখে দিল যে আই. সি. এস চাকরিতে ও ঢুকবে না। লিটন সাহেব তখন ভারতের আণ্ডার সেক্রেটারি : ওকে ডেকে পাঠিয়ে বোঝালেন অনেক ক'রে যে

আই সি এস হয়েও এ-নবযুগে আরো পরিপাটি সুষমার সঙ্গে দেশের সেবা করতে পারবে। কিন্তু সুভাষের যাকে বলে ভদ্রলোকের এক কথা: "You cannot serve God and Mammon, sir!" সুভাষ হেসে বলেছিল আমাকে, বেশ মনে আছে: "একথা শুনে সাহেবের গোরা মুখ হয়ে উঠল টকটকে লাল, বোধহয় তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে, এ-ধরনের সাফ জবাব কোনো ভারতীয় দিতে পারে কোনো সাহেবকে। কিন্তু তিনি রাগ দমন ক'রে বললেন: 'হঠকারী হ'লে ভুগতে হয়ই হয়, ইয়ং ম্যান! বিপদে পড়বে।' আমি মৃদু হেসে বললাম: "জেল তো? তার জন্যে প্রস্তুত আছি সার।"

ইংলণ্ডে সব ভারতীয়দের মধ্যেই র'টে গেল সুভাষের মহাকীর্তি: লণ্ডন. কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, গ্লাসগো, বার্মিংহাম···কোথায় নয়?—আই. সি. এস-এর মতন রাজপদ—মাত্র আট মাসে পাস ক'রেই ইস্তফা দেওয়া! সবাই জয়ধ্বনি ক'রে ঘোষণা করল সঘনে: "জয়তু দেশধ্বজ!"

কিন্তু বলে না—কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ?—ভারতীয় ছাত্ররা সুভাষের যে-কীর্তিতে উঠল পুলকিত হয়ে তাতে ওর পিতৃদেব উঠলেন বিষম উদ্বিগ্ন হ'য়ে, ওকে লিখলেন দীর্ঘ পত্র: তার মর্ম এই যে, ওটেন সাহেবকে মারার পর থেকেই ও পুলিসের নজরবন্দী হয়ে আছে, তার উপর যদি আই. সি. এস-এ ইস্তফা দেয় তবে বম্বেতে জাহাজ থেকে নামতে না নামতে ওকে হাতে বালা প'রে হরিণবাড়ি রওনা হতে হবে, বাপের বাড়ি হয়ে দাঁড়াবে অতীতের স্মৃতি। তাই—তিনি লিখলেন—সুভাষ অন্তত দেশে ফেরার আগে যেন চাকরি না ছাড়ে। উত্তরে সুভাষ তাঁকে লিখল যে, আই সি. এস চাকরিতে ঢুকতে হ'লে সব আগে দাসখৎ লিখে দিতে হয় বৃটিশরাজকে প্রভু ব'লে অঙ্গীকার ক'রে। একটা আদর্শ নিয়ে যে দেশের কাজে নামতে যাচ্ছে সে শুরুতেই মিথ্যা শপথ করে কোন্ মুখে? এইরকম আরো অনেক কথাই ও লিখল। উত্তর দিলেন ওর এক দাদা, তার মর্ম এই যে, সুভাষের পিতৃদেব অসুস্থ, সে দেশে ফিরেই ফের জেলে গেলে তাঁর অকালমৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সুভাষ শুকমুখে একদিন আমার বাসায় এসে এ-চিঠিটি দেখালো।

আমি (একটু চুপ ক'রে থেকে): তা'হলে কী করবে এখন?

সুভাষ (আশ্চর্য হয়ে): কী করব? মানে?

আমি (ইতস্তত ক'রে): মানে·· এখনো সময় আছে···তোমার······ইয়ে··· ইস্তফাপত্র প্রত্যাহার—

সুভাষ (উদ্দীপ্ত): মানে, চাকরির গোয়ালে মাথা মুড়োবো ? দিলীপ ! এমন কথা তুমি মুখে উচ্চারণ করতে পারলে ?

আমি : কিন্তু তোমার পিতৃদেব যে অসুস্থ—

সুভাষের চোখ চিকচিক্ ক'রে উঠল, কিন্তু সামলে নিয়ে বলল : "জানি ভাই। কিন্তু আমাদের আত্মীয় স্বজন প্রিয় পরিজনের কথা ভেবে পদে পদে আদর্শ ঠিক করতে হ'লে সে-আদর্শ যে কেমনতর হবে একবার ভেবে দেখেছ কি ? না, আমি সে-কথা ভাবছি না।

আমি : তবে ?

সুভাষ : ভাবছি আমি এখন ফিরে যাব কেমন ক'রে ? এর উপরে বাবার কাছে আর এখন জাহাজের ভাড়া চাইতে পারি না।

আমি (উদ্দীপ্ত হয়ে): সুভাষ, তুমি কি ভুলে গেলে যে, আমি এখনো বেঁচে আছি ? আর আমার মাথার উপরে এমন কেউ নেই যিনি আমার স্বাধীন ইচ্ছার পথ আগলে দাঁড়াতে পারেন। আমি পূর্ণ সাবালক—স্বাবলম্বী।

সুভাষ আমার কাছ থেকে নব্বই পাউণ্ড ধার নিল। সে যে কী তৃপ্তিতে আমার মন নাল নিটোল হয়ে উঠল ··সুভাষের একটুও কাজে আসতে পারা—এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয় ?

কয়েক সপ্তাহ বাদে ও একদিন সকালে আমার কাছে এসে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল যে, ইণ্ডিয়া অফিসের কর্তারা খবর পেয়েছেন কে ওকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে। আমি কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলাম, কিন্তু সুভাষ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল পাছে আমিও পুলিসের নেকনজরে পড়ে যাই ব'লে। আমাকে ও বরাবরই এ-জাতীয় উপদ্রব থেকে বাঁচাতে চাইত—আরো এইজন্যে যে, রাজনীতির মতিগতিকে আমি কোনোদিনই সুনজরে দেখতাম না. ওকে প্রায়ই বলতাম, ক্লিন্ন রাজনৈতিক আখড়ায় অবতরণ ক'রে মিথ্যার সঙ্গে পদে পদে আপোষ ক'রে চলা ওর উগ্র বিবেকী স্বভাবের পক্ষে হ'বে পরধর্ম—কাজেই ভয়াবহ। ও বলত : "কিন্তু রাজনীতির আখড়াতেই তো দেশভক্তির আনন্দমঠ প্রতিষ্ঠা করতে হবে ভাই ? নইলে সে-আখড়া যে হয়ে উঠবে শেয়াল কুকুরের লীলাভূমি।"

একথা আমাকে মানতেই হ'ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির আখড়ায় যে মহত্তম মানুষকেও পদে পদে মিথ্যাবাদী হ'তে হয়েছে এ-সত্যকেও সুভাষ অস্বীকার করতে পারত না। কাজেই শেষ পর্যন্ত এ-তর্কের কোনো নিষ্পত্তিই আমাদের মধ্যে

হয়নি—শুধু পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে-টুকু সত্য আছে তাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করা ছাড়া। কিন্তু এ-অতল সমস্যার তল পাওয়ার বিড়ম্বনা ছেড়ে ফিরে আসি ফের হারানো খেই ধরতে।

আজকের দিনে সুভাষের আই. সি. এস ছাড়ার মহা আন্দোলন পড়লে বড় জোর মনে হয়: "চিত্তাকর্ষক বটে।" কিন্তু সে-যুগে এ-আন্দোলন এমনই ফেঁপে উঠেছিল যে, সুভাষ বাইরনী ঢঙে বেশ বড় গলা ক'রেই বলতে পারত: "I awoke one morning and found myself famous!"

ফেমস ব'লে ফেমস! লণ্ডনে কেম্ব্রিজে অক্সফোর্ডে এডিনবরায় ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ একজোট হয়ে ওকে অভিনন্দন পাঠালো ফ্রেমে বাঁধিয়ে। একজন মন্দকবি-যশঃপ্রার্থী আরো এক চাল চাললেন—রুখে উঠে টেনিসনের বিখ্যাত:

Cannon to the right of them
Cannon to the left of them
Cannon in front of them
Volleyed and thundered—

অগ্নিগর্ভ হুঙ্কার-এর অনুকরণে লিখলেন (সে সময়ে এ-কবিতাটি পড়তে না পড়তে কিন্তু আমাদের চোখে দেশপ্রেমাশ্রু বয়েছিল একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না):

Bullets all round him hiss
But fall his feet to kiss
This occasion we never can miss
To thee, O Hero, we bow!
On, on the tyrants to fight!
Behold: Gone, gone is the night!
Trample on them in delight!
Hark: calls the new sunglow!

এ-কবিতাটি পেয়েই সুভাষ "ননসেন্স" বলে ছিঁড়ে ফেলে আর কি—আমি ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আমার ডায়ারির মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু পরে দেখি হারিয়ে গেছে—নৈলে সবটাই উদ্ধৃত করতে পারতাম। শুনে সুভাষ হেসে বলেছিল: "আপদ গেছে।" কারণ তাকে 'হিরো' হয়ে ভুগতে হয়েছিল কম

নয়। যেমন, একদা আর এক সেন্টিমেণ্টাল ছেলে আরো উজিয়ে উঠে আমাকে এসে বলল: "আপনি ওঁর বিশেষ বন্ধু, ওঁকে বলতে হবে যে, আমরা ওঁকে নিয়ে শোভাযাত্রা করব বাকিংহ্যাম প্যালেসের সাম্‌নে।"

একথা সুভাষকে বলতেই সে রেগে আগুন: "যত সব বাজে হুজুগ! এ জানলে আমি কাউকে বলতাম না। আমি করেছি কী শুনি? জেলে গেলেও বা কথা ছিল। আমাদের জাতের সর্বনাশ করেছে এইসব বাজে ভড়ং আর উচ্ছ্বাসে। রবিবাবুর 'গোরা'-র অবিনাশের কথা মনে করিয়ে দেয় এরা।"

কিন্তু ও রাগ করলেও আমার খুবই ভালো লাগত ওকে নিয়ে পাঁচজনের এ-ধরনের আবেগ উচ্ছ্বাস। তাই সুভাষকে প্রায়ই বলতাম: "সুভাষ, ব্যাপারটাকে তুমি দেখছ শুধু তোমার দিক থেকে। কিন্তু আমাদেরও একটা দিক আছে। বড়কে বড় ব'লে হুহুঙ্কার করারও একটা সার্থকতা আছে, কেননা সংসারে ছোট ও গড়পড়তারা এতই বেশি যে বড়কে নিয়ে মাতামাতি করাটা খানিকটা কাউণ্টারওয়েটের কাজ করে। ঘর্ঘরের খানিকটা ক্ষতিপূরণ মেলে বৈকি ঝংকারে।"

সুভাষ কিন্তু ছিল ভবীর মতন—অত সহজে ভুলবার পাত্র নয়, বলত: "কোনো একটা আন্দোলনে হুজুগেদের মাতামাতিও হয়ত হাতের কাজকে ক্ষেত্রবিশেষে এগিয়ে দিতে পারে, মানি, কিন্তু আমাদের মধ্যে কাজের লোক থাকলে তবে না। এখানে এত ভারতীয় ছাত্র দেখলে তো, বলো দেখি এদের মধ্যে ক'জনের প্রাণ কাঁদছে দেশের জন্যে? এরা সাড়ে পনের আনা এসেছে একটা ডিগ্রি নিয়ে বা ব্যারিস্টারি পাশ ক'রে ডাক্তার উকিল কি বড় চাকুরে হয়ে দেশে ফিরতে। কাজেই এদের মুখে বন্দে-মাতরম্ মন্ত্র কি খানিকটা ভূতের মুখে রামনামের মতই শোনায় না?"

হুবহু যে এই কথাগুলিই সে বলেছিল তা নয়, কিন্তু এই ধরনের মন্তব্য ও প্রায়ই প্রকাশ করত খুব জোর দিয়ে, যখনি ছাত্ররা উজিয়ে উঠত এ ও তা উচ্ছ্বাসে। আর তখন ও কত সুন্দর সুন্দর কথাই যে বলত, যদি টুকে রাখতাম তবে আজ দেশবাসীকে শোনাতে পারতাম—কেননা ওর প্রতি মন্তব্যের পিছনেই থাকত দেশের জন্যে ভাবা, দেশের জন্যে মাথাব্যথা। সবকিছুকেই ও কষত একটিমাত্র নিকষে: তাতে ক'রে দেশের কাজ এগোলো কিনা। আমাকে প্রায়ই বলত: "দিলীপ, এইজন্যেই আমিও চাই না তুমি পলিটিক্সে ঢুকে সরাসরি জেলে যাও। অবশ্য জেলে একদলকে যেতে হবেই হবে—কিন্তু তাদের কারাবরণ নিষ্ফল হবে—জেলের বাইরে

যারা দেশসেবক থাকবেন তাঁদের দল পুরু না হ'লে। এইজন্যেই আমি মহাত্মাজিকেও কাজে লাগাতে চাই—তাঁর অহিংসাবাদে সায় দিতে না পারা সত্ত্বেও। অহিংসায় কোনোদিন কোনো দেশ স্বাধীন হয় নি দিলীপ, কোনোদিন হবেও না।"

আমি : হয়নি হয়ত, কিন্তু যা কখনো হয়নি তা যে কখনোই হবে না—

সুভাষ : "আমি ওকথা অতটা সাধারণভাবে বলিনি। কেবল আমি দেখি এদের পুলিস ফৌজের সংঘবদ্ধতা, ডিসিপ্লিন। এদের বিরুদ্ধে অহিংসার নামাবলী গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পর পর দু গাল পেতে দিলে দুটোর একটাও নিষ্কৃতি পাবে না। যারা নিজেদের জাতকেই রেহাই দেয়নি তারা আমাদের রেহাই দেবে? তুমি কি মনে করো আমরা আজ যেটুকু শক্তি অর্জন করেছি সেটুকু আমাদের স্বায়ত্ত হ'ত যদি না একদল বোমারু বন্দে-মাতরম্ গাইতে গাইতে প্রাণ দিত? দিলীপ, তুমি এই বিপ্লবীদের সঙ্গে মেশো নি, কিন্তু আমি ওদের এই চক্রব্যূহের মধ্যে ছিলাম কিছুদিন। তাই তোমাকে অকুণ্ঠে বলতে পারি যে, আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব, শ্রেষ্ঠ ত্যাগ, শ্রেষ্ঠ বীর্যের যদি পরিচয় পেতে হয়, তবে সন্ধান করতে হবে নামজাদা রাজনৈতিকদের মধ্যে নয়, এই অখ্যাত লাঞ্ছিত নিরাশ্রয় দেশমিত্রদের মধ্যে—কারণ এ ঘুমের দেশে শুধু এরাই জেগেছিল সবার আগে—আর এরা জেগেছিল ব'লেই বাকি কোটি কোটি তন্দ্রালুরা পুরোপুরি না জাগুক, তবু যা হোক একটু আধটু আড়মোড়া ছাড়তে শুরু করেছে।"

এ-ধরনের কথা ও প্রায়ই বলত—আমি নিজের কথা ওর মুখে বসাচ্ছি না। আমি যে এসব কথা আজো ভুলিনি তার কারণ সুভাষ—বিশেষ ক'রে বিলেতে—এ ধরনের উদ্দীপক কথা ছাড়া প্রায় কোনো কথাই বলত না। বাইরের লোকের কাছে একেবারে নিশ্চুপ—আমাদের মধ্যে মুখ খুলবামাত্র শুধু দেশের কথা : কীভাবে দেশকে জাগাতে হবে, কীভাবে মহাত্মাজিকেও কাজে লাগাতে হবে, বিদেশী সাহায্য, আনন্দমঠের সন্তানদের মতন কীভাবে সারা দেশ ঢুঁড়ে কর্মী যোগাড় করতে হবে……এইসব কথা। আর বলতে বলতে সে এমনিই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত যে, আমি যে আমি (যে কোনোদিনই রাজনীতির নানা দলাদলির মিথ্যাচারে আহত না হয়ে পারিনি) সেই আমার রক্তও গরম হয়ে উঠত—যদিও আমি বুঝতাম যে, দেশের জন্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্বদেশী গান গেয়ে ও মঞ্চে বক্তৃতা করে দেশবাসীকে মাতিয়ে তোলা আমার স্বধর্ম নয়। আমি মনে মনে জানতাম যে, আমার বাল্যকালে আমি যে-ডাক শুনেছিলাম সেই ডাকে সাড়া না দিতে পারলে পরধর্ম পালন ক'রে

আমার জীবন দেশসেবার দিক্ দিয়েও সার্থক হবে না। তবে সুভাষকে এ-ধরনের কথা বললে ও অত্যন্ত দুঃখিত হ'ত ব'লে আমি পারৎপক্ষে ওর সঙ্গে তর্ক করতাম না আমার জীবনের মূল আদর্শ নিয়ে। ও সময়ে সময়ে আমার মৌনকে অসম্মতি ভেবে বলত বুঝিয়ে: "আমি ভগবানকে খোঁজার কোনো দামই দিই না এ-কথা ভাবলে কিন্তু তুমি আমার প্রতি ঘোর অবিচার করবে দিলীপ। তুমি জানো— আমি ছেলেবেলায় সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তখন স্বয়ং রাখাল মহারাজ আমাকে বলেন—আমাদের দেশের কাজ করতে হবে। তার পরেই আমি স্বামী বিবেকানন্দের লেখার দিকে ঝুঁকি ও আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদ্‌লে যায়। আমি ক্রমে ক্রমে দেখতে পাই যে তিনি ঠিকই বলেছিলেন যে, নিরন্নের ভগবান্ নেই। তাই তিনি সর্বপ্রথম দরিদ্রের মধ্যেই নারায়ণকে সেবা করতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন আমেরিকায় বারবারই যে, ভারত পাশ্চাত্ত্যের কাছ থেকে ধর্ম শিখতে চায় না, চায় নিরন্নদের জন্য কিছু সংস্থান জোগাড় করতে—কারণ খালি পেটে ধর্ম হয় না।

আমি এ-ধরনের যুক্তিতে অস্বস্তি বোধ করতাম আরো এইজন্যে যে, আমি কোনোদিনই বিশ্বাস করতে পারিনি—শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, মীরা, দাদু, তুলসীদাস প্রমুখ ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধকদের সর্বপ্রথম কর্তব্য ছিল ভারতের দুর্গাকে ছেড়ে নিরন্তর দুর্গতদের জন্যে অন্নসংস্থান করা। তাই সুভাষের মহাপ্রাণতাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মৃদু প্রতিবাদ না ক'রে থাকতে পারতাম না, বলতাম: "কিন্তু তাই ব'লে কি তুমি বলবে যে, সব আদর্শবাদীই এক গোয়ালে মাথা মুড়োবে? না, বলবে—স্বামীজীর জীবনের আদর্শ মহৎ ছিল ব'লে সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, পরমহংসদেবের জীবনের আদর্শ মহত্ত্বে খাটো? তিনি কি অগুন্তিবার বলেন নি যে ঈশ্বরদর্শনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য?"

সুভাষও একথায় একটু বিব্রত হত বৈকি, কারণ পরমহংসদেব যে ভগবৎ-সাধনায় ঐকান্তিকতাকেই সবচেয়ে বড় আদর্শ বলে মনে করতেন একথা সেও অস্বীকার করতে পারত না গাজোয়ারি ঢঙে, তাই এ-যুক্তিকে খানিকটা পাশ কাটিয়েই যেতে চাইত। না গিয়ে করে কি? তার্কিক হিসেবেও সে তো কিছু কম কুশলা ছিল না। তাই আমাকে কাবু করতে বলত: "কিন্তু এখানে গোল বাধে কোথায় বলব? তাঁর স্ববিরোধী উক্তিতেই। হ্যাঁ দিলীপ, স্ববিরোধী ছাড়া এর কী নাম দেব বলো? মনে নেই তোমার—স্বামীজি যখন তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি চান সমাধিতে বুঁদ হয়ে থাকতে—তখন তিনি কী বলেছিলেন?—বলেছিলেন: 'তুই তো

বড় হীনবুদ্ধি রে। আমি চাই, তুই বিরাট বটের মতন বহু ত্রিতাপে তাপিতকে আশ্রয় দিবি তোর ছায়ায়।' বলেন নি যে, স্বামীজিকে লোকশিক্ষা দিতেই হবে?

আমি: বলেছিলেন মানি। কিন্তু তিনি তাঁর জন্য শিষ্যদের কী বলতেন সেটাও ভুলো না: লোকশিক্ষা দিতে হ'লে সব আগে চাই ভগবানের আদেশ পাওয়া—চাপরাশ—যাকে ইংরাজিতে বলে sanction.

তর্কাতর্কি আমাদের চলত এইভাবেই—কোনো নিষ্পত্তি হত না কিন্তু তাই ব'লে একথা যেন কেউ মনে না করেন যে আমরা তর্কের জন্যেই তর্ক করতাম। সুভাষ আমার কাছে তার দেশসেবার আদর্শ পেশ করত দেশকে সে প্রাণাধিক ভালোবেসেছিল ব'লে, আর আমি তার এ-মতে সায় দিতে না পারলেও তার কথায় কান দিতাম তাকে ভালোবেসেছিলাম ব'লে। কাজেই আমাদের মতভেদও আমাদের অন্তরঙ্গতাকে ব্যাহত না ক'রে আরো গভীরই করত।

কিন্তু শুধু দেশের সম্বন্ধে নয়, সুভাষ যাই বলুক না কেন, আমি শুনতাম সাগ্রহে, খানিকটা শ্রদ্ধালু শিক্ষার্থীর মতনই বলব। এর একটা কারণ—ওর কথার পিছনে ছিল ওর সমগ্র ব্যক্তিরূপের সংহত আলো, বল, তেজ। একটা দৃষ্টান্ত দেই।

মেয়েদের সঙ্গে ও আদৌ মিশত না বিলেতে। শুধু মেয়েদের সঙ্গবর্জন নয়—যাঁরা ওকে বিলেতে দেখেছিলেন তাঁরা সকলেই একবাক্যে সাক্ষ্য দেবেন যে, বিলেতে যৌবনে ও কোনো ইংরাজ মেয়ের দিকে এমনকি চোখ তুলেও তাকায় নি। আমাদের ছাত্রসমাজে ওর এই ধরনের সেকেলে "ভালোছেলেমি"কে কেউ যে কখনো কটাক্ষ করত না এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু একটুও অত্যুক্তি হবে না, যদি বলি যে, ওকে যারা aloof, high-brow, Victorian, Puritan প্রভৃতি বিশেষণে দেগে দিয়ে আড়ালে আবডালে ব্যঙ্গ করত, তারাও মনে মনে ওর পবিত্রতা, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতাকে সমীহ না ক'রে পারত না। কেম্ব্রিজের ছাত্রেরা নারী সম্পর্কে আলোচনায় খুবই নিষ্পরোয়া ঢঙে কথা কইত—যেমন সর্বত্রই দামাল ছেলেরা ক'রে থাকে। কিন্তু সুভাষের সামনে কেউ কোনোদিন অশ্লীল আলোচনা করতে সাহস করেনি—এমনিই ছিল ওর ব্যক্তিরূপের প্রভাব। এ সম্বন্ধে একটা কথা হঠাৎ মনে হ'ল। লিখিই না।

আমি ১৯১৮-য় গণিত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ হই, তৃতীয় হয়েছিলেন কিরণ দে ব'লে একটি মেধাবী ছাত্র। ইনি পরে কেম্ব্রিজে ট্রাইপসে বি-স্টার র‍্যাংলার

হন—ওখানকার গাণিতিক পরীক্ষার সর্বোচ্চ উপাধি। কেম্ব্রিজে তিনি মাঝে মাঝেই আমার ঘরে আসতেন ও বলতেন, উজিয়ে উঠে :

"দিলীপদা! আজ দেখে এলাম ক্যাম নদীর তীরে এক নিভৃত কুঞ্জে… বুঝতেই তো পারছেন…দুজন…উঃ কী কাণ্ডই যে করে এরা! এদের লজ্জা ব'লে কি কিছু নেই?"

কোনোদিন হয়ত এসে বলতেন: "কাল লণ্ডনে গিয়েছিলাম হ্যাম্পস্টেড হীথে—সেখানে আরো এক কীর্তি দেখে আমি তো থ দিলীপদা। পাশাপাশি বেঞ্চিতে দুজন দুজন ক'রে…কী দুর্দান্ত ব্যাপার…সবার সামনে বুঝতেই তো পারছেন…দেখি আর মনে পড়ে যায়—চারুপাঠে পড়েছিলাম—যৌবন অতি বিষম কাল। তখন বুঝতে পারিনি কেন? আজ সব জলের মতন সাফ হয়ে গেছে"… ব'লেই সে কী খিলখিল ক'রে হাসি! আমিও না হেসে থাকতে পারতাম না।

একদিন কী কথায় কথায় আমি হাসতে হাসতে সুভাষকে বলি: "জানো সুভাষ, কিরণদা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন, যৌবন কেন বিষম কাল!"

সুভাষের মুখ ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠল: "মানে?"

আমি বললাম—কিন্তু বাদ সাদ দিয়ে অবশ্য।

সুভাষের চোখে তীব্র বিরক্তির আভা জ'লে উঠল, বলল: "কিরণ দের যদি এসব এতই লজ্জাকর মনে হয় তাহ'লে যান কেন হ্যাম্পস্টেড হীথে বা এখানকার ক্যামের তীরে যত সব নিভৃত কুঞ্জে?"

আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম, সুভাষ যে কিরণ দের রসিকতাকে এভাবে নেবে আমি ভাবতে পারিনি। বললাম: "কিন্তু কিরণদার অপরাধ কি?"

সুভাষ (উদ্দীপ্ত): অপরাধটা তবে কার শুনি? ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে না "Every nation gets the Government it deserves?" মানুষ সম্বন্ধেও ঐ কথা। এসব কুকীর্তি ঘড়ি ঘড়ি তাদেরই চোখে পড়ে যারা এই সবের খোঁজেই ঘুরে বেড়ায় নিভৃত কুঞ্জের আনাচে কানাচে। কিরণ দে এসব নিয়ে রিসার্চ না ক'রে যদি গণিত-রিসার্চে আর একটু মন দিতেন তবে নিজের সুনামও বাঁচত, দেশের টাকা তথা মানেরও মর্যাদা রাখা হ'ত। না দিলীপ, এ আমার পিউ-রিটান শুচিবাই নয়—ইংরাজীতে যাকে বলে horse sense—এ তাই। এখানে আমরা আসি কী করতে—বলবে আমাকে? দেশের টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে ফুর্তি ক'রে বিলাসী হয়ে দেশে ফিরতে, না দেশের কাজে নিজেদের জীবন নিয়োগ করবার জন্যে

সাধ্যমত প্রস্তুত হ'তে? এদেশে কত কী শেখবার আছে—কত ভালো ভালো বক্তৃতা হয়—কত ভালো নাটক, কন্সার্ট, প্রদর্শনী, লাইব্রেরি—কত মনীষীর সঙ্গ পেতে পারা যায় ইচ্ছে করলে। এসব ছেড়ে আমাদের দেশের কত শত কুলতিলক ল্যাণ্ডলেডির মেয়েকে নিয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞান হারায় বলো তো? দেখে শুনে আমার মনে পড়ে কেবল একটি সেকেলে প্রবচন: তোকে মেরে পারলাম না—ধ'রে পারলাম না—শেষে তোকে ছ্যা বললাম। ছ্যা না ব'লে পারা যায়? তুমিই বলো তো? দেশের ভবিষ্যৎ যাদের হাতে—তাদের এই মতিগতি? সময়ে সময়ে সত্যিই হতাশা আসে, দিলীপ! আমরা কবে হব জাপানী, জর্মন, আইরিশ ছাত্রদের মতন—কর্মব্রতী, নিষ্ঠাবান্, অধ্যবসায়ী?"···ইত্যাদি ইত্যাদি।

'চেস্টার্টন তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় লিখেছেন:

In a time of sceptic moths and cynic rusts,
And fatted lives that of their sweetness tire,
In a time of flying loves and fading lusts,
It is something to be sure of a desire.

এর ভাবার্থ এই যে, মানুষের যখন এমন দুর্লগ্ন আসে, যখন অমিত বিলাসে শুধু অতৃপ্তিই ওঠে পুঞ্জীভূত হয়ে—যখন প্রেম হয়ে ওঠে অস্থায়ী ও ইন্দ্রিয়াসক্তি, সংশয় ও অবিশ্বাসই হয়ে ওঠে সর্বেসর্বা—তখন কোনো একটি স্থায়ী অভীপ্সাকেও যদি সে আঁকড়ে ধরতে পারে তাহ'লে যেন সে বেঁচে যায়।

আমাদের মাথার উপর আজ ঘনিয়ে এসেছে সেই যুগ। আমরা সব মহৎ বিশ্বাসে, মহৎ স্বপ্নে, মহৎ আস্তিক্যে আস্থা হারিয়ে তার বদলি কোনো মহাদর্শের রসদ না পেয়ে যেন দেউলে হতে চলেছি।

এ-হেন যুগে সুভাষের আশ্চর্য অভীপ্সা ও পবিত্রতার কাহিনী অনেক বাস্তববাদীরা হয়ত আষাঢ়ে গল্প ব'লেই বাতিল ক'রে দেবেন এই ব'লে যে, এ-বিংশ শতাব্দীতে কোনো প্রকৃতিস্থ মেধাবী যুবক নরনারীর মেলামেশার ক্ষেত্রে সেকেলে ব্রহ্মচর্যের বিধি-নিষেধের খাতিরে এমন অস্বাভাবিক পথে চলতে রাজি হতেই পারেন না। কিন্তু নাস্তিক বিচারকদের পক্ষে আস্তিক্যের সব বিধানকেই অস্বাভাবিক মনে হতে পারে একথা মেনে নিয়েও বলব যে, তাঁরা যদি সুভাষকে কাছ থেকে দেখতেন তাহ'লে হয়ত তাঁদের মনেও একটু খটকা লাগত যে, যে-বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের বিধান মেনে কোনো যুবক আত্মশক্তিতে এভাবে সচেতন হয়ে দেশের জন্যে সর্ববলিদানব্রতী

হ'তে পারে সে-বিধানকে সরাসরি নাকচ করলে খতিয়ে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হওয়া সম্ভব কিনা।

সুভাষের ভগবদ্‌ভাবদীপ্ত দেশাত্মবোধ ও অটুট পবিত্রতা সম্বন্ধে যা যা লিখেছি সবই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ও যে শুধু বিবেকানন্দের মতনই ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি ব'লে মনে প্রাণে বিশ্বাস করত তাই নয়, সেই সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করত যে, ভারতের ব্রহ্মচর্যের বিধিনিষেধের সত্য সার্বকালিক ও সার্বজনীন। এ-বিশ্বাস যে ওর মনে শিকড় গেঁথেছিল সেও স্বামী বিবেকানন্দেরই উদ্দীপনায়। নৈলে হয়ত ও বিলেতে এসে বিলিতি মেয়েদের সংস্পর্শ এত সাবধানে বর্জন ক'রে চলত না।

কেবল এক ক্ষেত্রে ও ধরা দিয়েছিল। তাঁর নাম মিসেস জেন ধর্মবীর। সুভাষ তাঁকে জানকী ব'লে ডাকত। এঁর কথা একটু খুলেই বলতে চাই—কেন না সুভাষ তাঁকে সত্যিই দিদির পদবী দিয়েছিল, তিনিও তাকে ভালোবাসতেন ছোট ভাইয়ের মতন। তাঁর কাছে আমিই ওকে প্রথম একরকম জোর ক'রেই ধ'রে নিয়ে যাই। এ-চমৎকার পরিবারটির কথা আমি লিখেছি—আমার 'ভূস্বর্গ চঞ্চল' এ (তথা The Subhas I Knew-এ)। কিন্তু সে-বিবরণ লেখা হয়েছে একটু বিচ্ছিন্নভাবে। আজ একটু বিশদ করে লিখব, কেননা সুভাষের সঙ্গে পরে এ-পরিবারের এত ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল যে, কয়েক বৎসর বাদে ধর্মবীর-পরিবার ভারতে ফিরে এলে সে তাঁদের ডালহৌসি-নিকেতনে শরীর সারাতে গিয়ে অনেকদিন ছিল। তাঁদের সঙ্গে সুভাষের একসঙ্গে যে-ফটো নেওয়া হয় সেটি আমি আমার The Subhas I Knew বইটিতে ছাপিয়েছি।

ডাক্তার ধর্মবীর পাঞ্জাবী—লালা লাজপৎ রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। চিরদিন উগ্র স্বদেশী—দেশে ফিরে খদ্দর ছাড়া আর কিছু পরতেন না। বিলেতে গিয়ে বিশ পঁচিশ বৎসর ডাক্তারি পসারে বেশ দু' পয়সা উপায় ক'রে দেশে ফিরে লাহোরে কায়েম হন পরম আনন্দে। দেশের নানা কাজেই তিনি দুহাতে টাকা বিলোতেন—কংগ্রেসের নানা সভায় সজোরে হাততালি দিতেন ও দেশভক্তদের সাগ্রহে সমাদর করতেন নিজের বাড়িতে। আমার ও সুভাষের সঙ্গে এ-পরিবারের প্রথম আলাপ হয় সোয়ান্সইকে এক ভারতীয় ছাত্রসভায়। সুভাষ, (জাস্‌টিস) চাগলা, প্রকাশনারায়ণ সপ্রু (তেজবাহাদুরের পুত্র), ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চন্দুলাল দেশাই এবং আরো অনেক মেধাবী ভারতীয় ছাত্র সে-সভার মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। ধর্মবীর দম্পতি সুভাষের দীপ্ত ব্যক্তিরূপে মুগ্ধ হন। আমার নানা উর্দু ও হিন্দি গানও তাঁদের

ভালো লাগে। তাঁরা আমাদের উভয়কেই নিমন্ত্রণ করেন। সুভাষ সোজা "না" ক'রে দেয়। কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ "হাঁ" ব'লে তাঁদের মনোরম স্নেহনিলয়ে গিয়ে কয়েকদিন খুব আনন্দে কাটাই। অতঃপর সুভাষ আই. সি এস পাশ ক'রে চাকরিতে ইস্তফা দিতেই ডাক্তার ধর্মবীর আমাকে তার করেন সুভাষকে তাঁদের অভিনন্দন জানাতে ও কোনো প্রকারে তাঁদের ওখানে ধ'রে নিয়ে যেতে। সুভাষ প্রথমে যেতে রাজি হয়নি কিন্তু আমিও তো কম নাছোড়বান্দা নই, গেলাম তাকে নিয়ে অনেক তুতিয়ে পাতিয়ে। সুভাষ সেখানে গিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই মিসেস ধর্মবীরের সরল স্নেহে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে দিদি পাতায়। ডাক্তার ধর্মবীরকেও সুভাষ ভালোবেসে ফেলে—আরো তাঁর জলন্ত স্বাদেশিকতা তথা আন্তরিক স্নেহশীলতার দরুন। সেখানে আমাদের সপ্তাহকাল সে যে কী আনন্দেই কেটেছিল! সময়ের যেন পাখা উঠেছিল। আনন্দমেলা ভাঙবার দিনে সুভাষের কাছে উদ্ধৃত করেছিলাম পিতৃদেবের একটি কবিতার দুটি চরণ :

সুখের বছর হয় যে গত
একটি ছোট দিনের ম'ত,
দুখের বছর যুগের মত কাটে।

মনে আছে যেদিন আমরা ওঁদের কাছে বিদায় নিই সেদিন ধর্মবীর দম্পতির আমাদের স্টেশনে এসে ট্রেনে তুলে দেওয়ার কথা। সুভাষ খুব গম্ভীর মুখেই "গুড বাই" বলল বটে, কিন্তু বলবার সময়ে ওর চোখের তপস্বী আলো বেশ নরম হয়েই এসেছিল। তবু ও সামলে নিল কোনোমতে, কিন্তু ট্রেন ছাড়তেই হ'ল ওর ভাবান্তর। দেখি কি, আমাদের প্রত্যেকের আসনে দুটি মোড়ক। সামান্য উপহার—বাদাম-ভাজা ও চকলেট। কিন্তু অমনি সুভাষের চোখে বাষ্পাভাষ, বলল : "Women will be women!" নারী সম্বন্ধে এই-ই ওর প্রথম প্রশস্তি—য়ুরোপে—তাই আমার কাছে অবিস্মরণীয়। এর পরের বার যখন আমি ওঁদের অতিথি হই তখন মিসেস ধর্মবীর আমাকে দেখান সুভাষের একটি দীর্ঘ পত্র। তাতে ও লিখেছিল যে, তাঁকে যে ও দিদি ব'লেই বরণ করে নিয়েছিল একথা যেন তিনি অবিশ্বাস না করেন। লিখেছিল : "আমি দিলীপের মতন সহজে বন্ধুত্ব পাতাতে পারি না—বিশেষ ইংরাজ মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু আপনাকে আমার একবারও মনে হয়নি বিদেশিনী। বরং বলব, আপনার স্নেহে আমি এত মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, হয়ত সময়ে সময়ে ইংরাজের অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি, যা আমার বলা উচিত ছিল না। সে-সব

অপরাধ নিজগুণে মার্জনা করবেন······” ইত্যাদি আরো অনেক কিছু লিখে শেষে লিখেছিল: “আমার আড়ষ্টতার জন্যেও আমাকে দুষবেন না কারণ it is easier for a leopard to change his spots than it is for me to come out of the shell of my reserve in a mixed company”.

বলেছি ডাক্তার ধর্মবীর ছিলেন দারুণ দেশভক্ত, কিন্তু বলা হয়নি যে, তিনি আর্যসমাজী মতেই মেমকে গৃহিণী পদে বরণ করেন। এ-সম্বন্ধে তাঁর একটি রসিকতা আজও মনে আছে, বলি।

একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি মেম বিয়ে করলেন কী দুঃখে? তাতে তিনি উত্তর দেন: “ভাই, তুম লোগ তো বিবিকো মেম বনাতে হো আন কর—ময় ক্যা কিয়া জো মেমকো বিবি বনা লিয়া?” মিসেস ধর্মবীর এ-রসিকতাটি শুনে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়তেন। “অমন নির্মল মিষ্ট হাসি আমি এদেশে বড় বেশি দেখিনি—” বলত সুভাষ প্রায়ই। আমি বলতাম: “তুমি এদেশবাসীর সঙ্গে মিশলে কবে শুনি যে দেখবে?” সুভাষ একটু চুপ ক'রে থেকে গম্ভীর মুখে বলত: “যখন আমাদের দেশ স্বাধীন হবে তখন মিশব—সমানে সমানে।”

আমি: তোমার কি মনে হয় এখন মিশতে গেলে—

সুভাষ: হ্যাঁ—ওরা খানিকটা পিঠ চাপড়ে মিশবে। (Patronise কথাটিই সে ঘড়ি ঘড়ি ব্যবহার করত এ সম্পর্কে)।

আমি: কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমি ইতিমধ্যেই এমন ইংরাজ বন্ধু পেয়েছি যিনি ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করেন।

সুভাষ: তোমার কথা আলাদা ভাই। তুমি যে দিতে পারো নিজেকে—গানে, গল্পে, আলাপে।

আমি: আর তুমি পারো না? বাঃ।

সুভাষ: বাঃ নয় ভাই। আমি হয়ত পারব একদিন—কিন্তু এখন এদেশের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে আমার বাধে। তাছাড়া সকলের স্বধর্ম এক নয়। তুমি যা পারো আমি তো তা পারি না।

আমি (হেসে): কেন এ-মিথ্যে কমপ্লিমেণ্ট সুভাষ, যখন বেশ জানো যে, তুমি যা পারো তা কোটিতে গোটিকও পারে না!

ওর সঙ্গে ধর্মবীর-ধামে আমাদের মধ্যে এই ধরনের উক্তি প্রত্যুক্তি হ'ত প্রায়ই। সময়ে সময়ে ডাক্তার ধর্মবীর তাতে যোগ দিতেন তাঁর প্রাণখোলা হাসি

নিয়ে। বলতেন, সুভাষের সঙ্গে সায় দিয়ে যে তিনিও ইংরাজদের "পৃষ্ঠপোষকী" বন্ধুত্বে বিশ্বাস করেন না, কেননা আমরা যতদিন না স্বাধীন হব ততদিন ওরা আমাদের কালচারের মধ্যে টুকিটাকি এক-আধটা মনোবৃত্তিকে সাবাস বললেও কিছুতেই মানতে পারবে না, সভ্যতায় আমরা ওদের সমকক্ষ। সুভাষ খুশি হয়ে আমাকে বলত বিজয়ী ভঙ্গিতে : "এবার ?"

আমি কোণঠাসা হয়েই উঠতাম রুখে, বলতাম : "এবার মানে ? ডাক্তার ধর্মবীর এদেশে অনেকদিন আছেন বলেই তাঁর অভিজ্ঞতা আমাকেও মেনে নিতে হবে নাকি প্রামাণ্য ব'লে ? না ভাই, ওতে আমি নেই। আমি যতই টলমান হই না কেন, এই এক জায়গায় আমি আত্মপ্রতিষ্ঠ যে, পরের মুখে ঝাল খেতে আমি নারাজ—তা সে-পর ডাক্তারই হোন বা—

ডাক্তার ধর্মবীর (হেসে) : দেশধ্বজই হোন, এই না ?

এই ধরনের তর্ক থেকে হাসি, হাসি থেকে গল্প, গল্প থেকে শেষে গানে শেষ হ'ত আমাদের আনন্দ-সহবাস। মিসেস ধর্মবীর গানে ছিলেন বিশেষ পটু—তাই গানের আসর তাঁর সহযোগে আরো জ'মে উঠত।

ডাক্তার ধর্মবীর ছিলেন শুধু যে নিরামিষাশী তাই নয়—তার উপর না সুরাপান, না নাচানাচি, না থিয়েটার-সিনেমা। কাজেই সুভাষের সঙ্গে তাঁর খুব বনত। না ব'নে পারে ? একজন আর্যসমাজী দেশধ্বজ, অন্যজন বিবেকানন্দপন্থী দেশনায়ক : ইংরাজি উপমায়—'যেন দস্তানার সঙ্গে হাতের মিতালি'।

আট

একদা সেখানে এক অন্ধ পাদ্রি এসে হাজির—একেবারে একা। ডাক্তার ধর্মবীর তাঁকে কি একটা অসুখে চিকিৎসা ক'রে নিরাময় করেন। ভদ্রলোক একবার একটা কলার খোসার উপর পদক্ষেপ করে পিছলে মেরুদণ্ডে বিষম আঘাত লেগে অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু কী প্রফুল্ল মানুষ ! আমাদের কাছে একদিন পিকুইক পেপার থেকে এক ভারি মজার কাহিনী আদ্যন্ত মুখস্থ আবৃত্তি করলেন নিজে হেসে ও সবাইকে হাসিয়ে। তার উপর কী আশ্চর্য স্বাবলম্বী ! একাই রাস্তাঘাটে চ'লে-ফিরে বেড়ান ! ডাক্তার ধর্মবীরের কাছে একদিন সুভাষ এ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে তিনি বলেন যে, অনেকেই বিলেতে এভাবে একাই ঘুরে বেড়ান অন্ধতা সত্ত্বেও। পথেঘাটে পুলিশ

বা পথিকরা তাঁদের ফুটপাথে উঠিয়ে দেয়, তারপর নানা মোড়ে নানা জন এসে মোড় পার ক'রে পথ ব'লে দেয়, কখনো বা হাত ধ'রে টেনে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেয়। শুনে আমি অবাক—সুভাষ তো মুগ্ধ! ভদ্রলোক বিদায় নিলে পর সুভাষ আমার দিকে চেয়ে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলল: "দেখ দিলীপ, দেখ—স্বাবলম্বী কাকে বলে একবার দেখ। এ জাত বড় হবে না তো হবে কে? তাই তো বলি তোমাকে ঘড়ি ঘড়ি এদের কাছে আমাদের অনেক কিছুই শিখবার আছে।"

ডাক্তার ধর্মবীর ইংরাজদের উপর আদৌ প্রসন্ন ছিলেন না, তাই টুকলেন: "বটে সুভাষ, কিন্তু আমার মন আজো খুঁৎ খুঁৎ করে ইংরাজদের কেউ বেশি গুণগান করলে। কারণ ওরা নানা বিষয়ে বড় একথা মেনে নিয়েও বলবই বলব যে, আমাদের পক্ষে ওদের ধরনধারনের বেশি নকল করতে যাওয়ায় বিপদ আছে। এই দেখ না কেন, এই সজ্জন অন্ধটিও শুধু যে মদ খাওয়ার সমর্থন করেন তাই নয়, আমি আমার বাড়িতে কাউকেই মদ পরিবেষণ করি না বলে আমাকে পিউরিটান ফ্যাডিস্ট বলে ঠাট্টা করতেও তাঁর বাধে না।"

আমি: ওঁদের চোখে হয়ত মদ খাওয়া একটুও খারাপ ঠেকে না—যেহেতু ওঁরা মাত্রা রেখে খেতে পারেন।

ডাক্তার ধর্মবীর (উদ্দীপ্ত): সবাই পারে নাকি? ইশ্! পথেঘাটে এখানে মাতলামি যে কত দেখেছি—সব জানা আছে হে!

আমি: ব্যতিক্রম দু-চারটে থাকবেই। It takes all sorts to make a world—বলে না?

ডাক্তার: ব্যতিক্রম? তুমি জানো কত পরিবার উচ্ছন্ন গেছে কর্তার মাতলামির জন্যে? জানো, এদেশেও একটা মস্ত আন্দোলন চলছে মদের বিপক্ষে?

আমি: তা না জানতে পারি, কিন্তু এখানে ভদ্রঘরে কর্তাকর্ত্রী ছেলেমেয়েরা কদাচ মাতাল হয় এও তো অস্বীকার করা চলে না। আমি তো আজ পর্যন্ত একটিও ভদ্রপরিবারে কাউকে মাতাল হতে দেখি নি এদেশে।

সুভাষ (বিরস কণ্ঠে): তা থেকে কী প্রমাণ হয় শুনি? যে, মদ খাওয়া ভালো?

আমি (হেসে): তোমরা দলে পুরু, কাজেই আমাকে হয়ত রণে ভঙ্গ দিতে হবে শেষটায়। তবু যদি বলি এ-শীতের দেশে মাত্রা রেখে সুরাপানে কিছু ভাগবত অশুদ্ধ হয় না, তাহলে কি সেটা খুবই কালাপাহাড়ি মন্তব্য হবে? না, এ আমার

উড়ো তর্ক নয়। সেদিন আমাদের শ্রদ্ধেয় বিদ্বান বন্ধু অমুকচন্দ্র মহাপাত্র বলছিলেন—মাতাল হওয়া মন্দ ব'লে যে পরিমিত মাত্রায় মদ খাওয়া মন্দ এ একটা যুক্তিই নয়। মহাপাত্র আরো বললেন যে, মাত্রা রেখে মদ খেতে জানলে শুধু যে অনিষ্ট হয় না তাই নয়, অনেক সময়েই নির্দোষ ফুর্তির আমদানি ক'রে বিরস মুহূর্তগুলিকে টপকে যাওয়া যায়। তিনি আরো এমন চোখা চোখা যুক্তিবাণ হানলেন যে, শেষটায় আমি তর্কে হেরে গেলাম—যদিও মুখে স্বীকার করিনি একথা।

সুভাষ (উদ্দীপ্ত): তোমার মহাপাত্র ঠাকুরকে আমি জানি হে জানি। খোঁজ নিলে দেখতে পাবে তিনি মাঝে মাঝে বেশ একটু বেচাল হন। না, শোনো দিলীপ। এ নিছক যুক্তির কথা নয়। বলে না—ইভ্‌ন দি ডেভিল ক্যান কোট স্ক্রিপচার্‌স্? এ হ'ল তাই। সংসারে কিসের স্বপক্ষে না চোখা চোখা যুক্তির বুকনি সাজানো যায় বলো তো? না, আমি কিছুতেই মানব না যে, আমরা পিউরিটান। আমরা শুধু চাই—এদের ভাষায়—কোদালকে কোদাল বলতে। তুমি কি দেখ নি স্বচক্ষে কেম্ব্রিজে অক্সফোর্ডে অমুক অমুক বিরাটধ্বজ কীভাবে মদ খেয়ে কেলেঙ্কারি করেছে? না না না। মদ কোনো দিক দিয়েই ভালো নয়—স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে তো নয়ই—আমোদের দিক দিয়েও নয়। ধ্যেৎ! এ কি একটা সভ্য আমোদ? —স্রেফ স্নায়বিক উত্তেজনা, অ্যানিম্যাল ডিলাইট—তার বেশি নয়। মদ খাওয়ার আমোদ যদি ভাল হয়, তবে গাঁজা আফিং কোকেন কী দোষ করল শুনি? ওসবেও কি আমোদ নেই বলবে? জুয়াখেলায়ও কি আমোদ নেই? কত লোক ফিবছর জুয়ায় সর্বস্বান্ত হয় জানো? বালজাকের একটি উপন্যাসের কথা তুমিই তো সেদিন বলছিলে—কীভাবে মণ্টে কার্লোতে মনাকোতে জুয়াড়িরা মজে রুলেৎ খেলে আমোদ করতে গিয়ে, মনে নেই? না দিলীপ, মানুষ সভ্য উপাধি পেতে পারে কেবল তখনই, যখন সে সভ্য আনন্দ চাইবে—মাতলামি ক'রে, গাঁজা খেয়ে, পাখি-খরগোস মেরে যে-আনন্দ সে হ'ল চাষাদের আনন্দ, বর্বরদের আনন্দ।

সুরাপান সম্বন্ধে তর্ক উঠলেই সুভাষ কীভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত, তার একটি নমুনা দিতেই এত কথার অবতারণা। আমি সময়ে সময়ে মুখে তর্ক করতাম বটে, কিন্তু তাই বলে ওর কথা অন্তরে মেনে নিতে আমার কোনদিনই বাধে নি। তাই তো আমি আপত্তি তুলি নি যখন দেশে ফেরবার আগে ও আমাকে তিনটি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়। বিলেতে আমাদের সেই অবিস্মরণীয় শেষ রাতটির কথা আমি

কোনোদিনও ভুলব না। আমাকে ও অনেকক্ষণ ধরে বলল ওর নানা স্বপ্নের কথা। শেষে বলল: "আমি জানি দিলীপ যে, আমাকে ওরা সহজে রেহাই দেবে না। এদেশের পুলিসরা আমার কিছু করতে না পারলেও তাদের কর্তারা ওদেশের পুলিসকে লিখে দিয়েছেই দিয়েছে আমার কী ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম কয়েক বৎসর হয়ত আমাকে জেলেই কাটাতে হবে—হয়ত……" বলতে বলতে ওর গলা ধ'রে এল……"হয়ত আমি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতেই পারব না, বম্বে নামামাত্র আমাকে ওরা বেআইনি আইনে পুলিপোলাও চালান দেবে। কিন্তু তোমাকে ব'লে রাখছি দিলীপ, আমি ভাঙলেও বেঁকব না।"

আমার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এল, বললাম: "কিন্তু ওরা তোমাকে পুলিপোলাও চালান দেবে বলছ কেন? গান্ধিজিকে তো দেয় নি?"

সুভাষ হেসে বলল: "গান্ধিজিকে ওরা জানে।…তোমাকে বলছি দিলীপ, ওরা ভয় করে না, অহিংসা সত্যাগ্রহ চরকাকে। ওরা ডরায় শুধু ঐ বোমারুদেরকে—যারা এক কথায় প্রাণ দিতে পারে—বাঘা যতীন, কানাই দত্ত, বারীন ঘোষ, যাদুগোপাল মুখুজ্জে, সাবরকর, কৃষ্ণ বর্মা, মাদাম কামা, শ্রীঅরবিন্দ…· এঁদের। আজ ওরা আমাদের যেটুকু অল্পস্বল্প রাশ ছেড়ে দিয়েছে সে এঁদেরই জন্যে। কিন্তু তোমাকে আমার একটি অনুরোধ আছে।"

আমি ওর হাতে হাত দিয়ে বললাম: "অনুরোধ বোলো না সুভাষ, বলো আদেশ।"

সুভাষ আমার দু-হাত ওর দু-হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: "আমি চাই তুমি জেলের বাইরে থেকে দেশের কাজে আমাদের সহযোগ করবে।"

আমি স্পৃষ্ট হয়ে বলেছিলাম: "সুভাষ, তুমি জানো তোমাকে আমি কী চোখে দেখেছি প্রথম থেকেই। তুমি আমাকে ডাকছ, আমি কি সাড়া না দিয়ে পারি? কেবল……আমারও একটা অনুরোধ আছে—আমি তোমার মতন সবল মেরুদণ্ড নিয়ে জন্মাই নি; ভাবি তো কত কী—কিন্তু কাজে করতে পারি না। তাই আমার অনুরোধ—আমি দুর্বল বোধ করলে তুমি আমাকে গ'ড়ে নিও, শক্তি দিও। তাহলে আমি পারবই পারব"…… ইত্যাদি।

সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত আরো কত কথাই যে ও বলেছিল—আহা, যদি কুঁড়েমি না করে তার একটা অনুলিপিও রাখতাম তাহলে আজ দেশবাসীর কাছে ফুটিয়ে তুলতে পারতাম ওর তরুণ মনের আশ্চর্য মহত্ত্ব ও অবিশ্রান্ত ঐকান্তিকতা।

কারণ ওর সে রাতের কথাগুলি ছিল আগুনের হল্‌কা, শুধু উৎপ্রেক্ষার ফুলঝুরি নয়। সবশেষে ও আমাকে দিয়ে তিনটি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়:

কখনো মদ ছোঁব না।

কখনো কোনো নাইট ক্লাবে যাব না।

কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে নাচব না।

ভগবানের কৃপায় এ-তিনটি প্রতিজ্ঞার একটিও আমি ভাঙি নি। ভাঙলে সুভাষের চোখে ছোট হতে হ'ত যে!

* * *

বিলেতে সুভাষের সম্বন্ধে কত স্মৃতিই যে মনের পটে আজো উৎকীর্ণ হয়ে আছে ......দু-একটি বিচ্ছিন্ন আবছা ছবিতে ফের রঙ ফলালে কেমন হয়? দেখিই না।

একদিন ওর ওখানে গিয়ে দেখি ও গিবনের বিরাট 'ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অব দি রোম্যান এম্পায়ার' পড়ছে। এ-দুর্ধর্ষ গ্রন্থটি কেম্ব্রিজ লাইব্রেরির গ্রন্থ-তালিকায় দেখেছিলাম বটে, কিন্তু একবার একটি খণ্ড দেখেই রেখে দিই "ও বাবা!" ব'লে। এ-হেন বিলিতি মহাভারত সুভাষ শুধু যে পড়ছে তাই নয়—কিনে পড়ছে। শুধু কি এই?—গারিবল্ডি, ম্যাটসিনি, মেটারনিখ, লেনিন, ক্রপটকিন প্রমুখ দেশ-ধ্বজদের বই। আমি ওকে বালজাক কি ডস্টয়েভস্কি কি টুর্গেনিভের নভেল দিলে ও বলত: "ওসব পরে পড়া যাবে হে, এখন কাজের বই পড়াই ভালো।"

* * *

আর একটি চিত্র। ওর ওখানে গিয়ে দেখি কয়েকটি আইরিশ ছাত্র। কেম্ব্রিজে তখন আইরিশরা মোটেই 'পপুলার' ছিল না। কিন্তু ও খুঁজে খুঁজে তাদের সঙ্গেই আলাপ করছে। তারা প্রস্থান করলে জিজ্ঞাসা করাতে ও চুপি চুপি বলল: "শিন্ ফিন হে! খবর নিচ্ছি। ওদের কাছে বিপ্লবের টেকনিক কত যে শিখবার আছে..." ইত্যাদি।

* * *

কয়েক বৎসর পরের আর একটি ছবি হঠাৎ মনে পড়ল, লিখি এখানেই।

তখন আমি বম্বেতে। হঠাৎ সুভাষের অভ্যুদয়। মহা হৈ-চৈ। কী? না সুভাষ বক্তৃতা দেবে। গেলাম বক্তৃতাসভায়। মা গো মা! কী কাণ্ড—সাড়ে পনরো আনা সভাসদ পাঞ্জাবী, শিখ, মুসলমান, পেশোয়ারী, মাড়োয়ারী...ইত্যাদি! বাঙালী

নেই বললেই হয়। সুভাষ ঝাড়া এক ঘণ্টা অনর্গল বক্তৃতা দিল চোস্ত হিন্দুস্থানিতে— আধা উর্দু, আধা হিন্দি। আমি তো থ! সুভাষ কী ক'রে রাতারাতি এমন দুর্দান্ত হিন্দুস্থানি রপ্ত করল! আজাদি, জিন্দাবাদ, মওত, তকদীর, মন্‌জিল, রৌশন, মুসীবৎ, নফরৎ···আরো সে কত গালভরা উর্দু কথা। ও এত কথা শিখল কোথায়? ওকে পরে জিজ্ঞাসা করতে ও হেসে বলেছিল: "কেন? জেলে। তোমার গুরুদেব কি বলেন নি যে, জেলই ছিল তাঁর সাধনপীঠ?"

এখানে লক্ষ্য করবার এইটুকু যে, ও শুধু যে দেশ সম্বন্ধে মনে-প্রাণে একান্তী ছিল তাই নয়, মনেপ্রাণে চেয়েছিল সে ঐকান্তিকতাকে কর্মের মধ্যে দিয়ে রূপ দিতে। দেশ দেশ ক'রে গলদশ্রু হওয়া খুব কঠিন কাজ নয়—উচ্ছ্বাসের ঠেলায় অশ্রুসিদ্ধ হতে পারে মানুষ সহজেই—কিন্তু কোন্ কোন্ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে আদর্শ দেশসেবক হওয়া যাবে তা নিয়ে মাথা বকাবার লোক দেশব্রতীদের মধ্যেও খুব কমই মেলে। সুভাষ ছিল স্বধর্মে দেশব্রতী, তাই পথসন্ধানে যে-আলোকই ওর কাছে বরণীয় ব'লে মনে হত তাকেই ও বরণ করত সর্বান্তঃকরণে, আর বরণ করার পরে দিনে দিনে সে-আলোয় নিজেকে তিলে তিলে গ'ড়ে তুলতে উঠে প'ড়ে লাগত অক্লান্ত উৎসাহে, উদগ্র তপস্যায়। এই তেজ ও নিষ্ঠা ছিল ওর চরিত্রের কবচকুণ্ডল।

আর কী পবিত্র! ওর মুখে বা ভাবভঙ্গিতে যে-সমাহিত গাম্ভীর্যের দীপ্তি নিত্যদীপ্যমান্ হয়ে পাঁচজনকে টানত সে-দীপ্তির মূলে ছিল ওর আবাল্য ব্রহ্মচর্য। শুধু যে কথাবার্তায় ও শ্লীল ছিল তাই নয়, ওর প্রতি ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠত চিত্তশুদ্ধির পাবন আভা। অনেকের মুখেই শুনেছি যে ওর কাছে খানিকক্ষণ ব'সে থাকার পরে তাঁরা নির্মল বোধ করতেন। এ-অভিজ্ঞতা আমার একবার নয়, বারবারই হয়েছে। দুর্বলতার মুহূর্তে ওর কাছে ছুটে এসে পেয়েছি ঈপ্সিত পাথেয়—মনের জোর। একটা দৃষ্টান্ত দিই; এটা নমুনা হিসেবেই গ্রহণীয়, কারণ এরকম ঘটনা মাঝে-মাঝেই ঘটত।

বলেছি, আমি রাজনীতির আখড়াকে সুনজরে দেখতাম না। কিন্তু সুভাষের জন্যে সময়ে সময়ে পরোক্ষভাবে রাজনীতির মধ্যেও নামতে হয়েছিল—আর শুধু নামা নয়—একেবারে রঙচঙে রঙ্গমঞ্চে! কী ভাবে বলি।

তখন আমি রামমোহন লাইব্রেরি, ওভারটুন হল প্রভৃতি নানা হলে চ্যারিটি কন্সার্ট দিয়ে টাকা তুলি। সুভাষ ধরল রাজবন্দীদের জন্যে কন্সার্ট দিতে হবে বড় স্কেলে—য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের রঙ্গমঞ্চে।

সুভাষের আদেশ : "জো হুকুম" ব'লে নেমে গেলাম। আমার সম্বলের মধ্যে কয়েকটি বালক বালিকা মাত্র। কিন্তু তিন চার হাজার টাকা তুলতে হলে আরো কিছু তোড়জোড় চাই তো। অগত্যা ধরলাম গিয়ে শিশির ভাদুড়িকে। তিনি পিতৃদেবের চন্দ্রগুপ্তের বিখ্যাত দৃশ্য ভিক্ষুকের সঙ্গে আলাপের সীনটি করলেন,. আমি সাজলাম ভিক্ষুক, এক বালককে "আত্রেয়ী" সাজিয়ে। থিয়েটারে নামা আমার এই প্রথম ও শেষ। অন্য কারুর অনুরোধে কখনই এতবড় দুঃসাহসিক কাজ করতাম না, কিন্তু সুভাষ সাম্‌নে বসে, ভয় কিসের ?

শুধু এইটুকু নয়, আরো আছে। "এ কি অগণন জলবালা পাথারে" ব'লে একটি সাগর-নৃত্যের গান বেঁধে ধরলাম কুমারী রেবা রায়কে। তিনি নাচলেন। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা ছাড়া সে সময়ে (১৯২৩।২৪-এ) কোনো গৃহস্থ মেয়েই প্রকাশ্যে স্টেজে নাচত না।

বিপুল উৎসাহ ! গেট-ক্র্যাশিং জনতা। চার হাজার টাকার উপর টিকিট বিক্রি। জয় ডেটেনিউয়ের জয় ! জয় সুভাষের জয় !

পরদিন কাগজে আমাকে মোক্ষম গালাগালি দিল—হিন্দুসমাজের কলঙ্ক ব'লে। ভদ্রঘরের মেয়েকে টেনে নাচানো—ধিক্‌ ! সুভাষের কাছে গেলাম একটু বিমর্ষ হয়েই। কারণ প্রকাশ্যভাবে খবরের কাগজে এত গালাগালি আর কখনো খাইনি। সুভাষ হেসে বলল : 'পথিকৃৎ যারা হয়, লোকনিন্দা তো তাদের অলঙ্কার !"

ব্যস্‌, প্রফুল্ল মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম : যার সুভাষ আছে তার নেই কী ?

* * *

আর একটি ছবি : সুভাষ ও আমি দু'তিনবার লণ্ডনে একসঙ্গে ছিলাম শ্রীশরৎকুমার দত্তের ফ্ল্যাটে—গোলডার্স গ্রীনে।

বড় মনোরম পল্লী : হ্যাম্পস্টেডের কাছেই। বিলেতের একটি অতি শান্ত, সুভদ্র পাড়া। শ্রীশরৎকুমার দত্ত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জর্মনিতে আটক পড়েন। ওখানে বুঝি কি টেকনোলজিক্যাল বিদ্যা শিখতে গিয়েছিলেন। জর্মন ভাষায় তাঁর বেশ দখল ছিল। তাঁর দুটি ছোট ছেলেমেয়ে তো জর্মনে বোলচাল দিত ঠিক জর্মনদের ম'তই। কচি বাঙালি শিশু দুটি বাপের সঙ্গে "Wissen Sie was ich meine" (আমি কী বলছি বুঝেছেন ? বা "Verzeihen Sie" (ক্ষমা করবেন) জাতীয় জর্মন বুকনির ফুলঝুরি কাটছে দেখে সুভাষ কী যে খুশি ! এই সময় থেকেই ও

জর্মন ভাষার দিকে ঝোঁকে (আমিও ঝুঁকি)। আরো ঝুঁকি শরৎবাবুর কাছে জর্মনদের হাজারো গুণপনার কথা শুনে। তাই তো প্রৌঢ় বয়সে ও জর্মন ভাষায় অবলীলাক্রমে দুর্দান্ত বক্তৃতা দিতে শিখেছিল। শরৎবাবুর সম্বন্ধে সুভাষের খুবই উঁচু ধারণা ছিল। তিনিও ওকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। শ্রীমতী দত্তও আমাদের স্নেহ করতেন ঠিক দিদির মতন। এ-দম্পতীর মধ্যে কী যে সুন্দর বনিবনাও ছিল—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। শ্রীমতী দত্তর গুণ ছিল অগুন্তি। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা, অতিথিদের আদরযত্ন, রান্নাবাড়া, সেলাই, গৃহকর্ম—কী না করতেন তিনি? তাঁদের ফ্ল্যাটে একটি চাকরানি পর্যন্ত ছিল না, শ্রীমতী দত্ত যাকে বলে গৃহস্থালির জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব একাই সমাপন করতেন। আমি তাঁকে বলতাম: আপনাকে দেখে মনে পড়ে ছেলেবেলাকার একটি ছড়া: "দু'খানি হাতেই করি কত কাজ—পারে না যা দশভুজা!" তিনি খুব হাসতেন আমার মুখে এ-ধরনের ছড়া শুনে।

শরৎবাবু জর্মনিতে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পাঁচ বৎসর আটক পড়েছিলেন ও একটি জর্মন ফ্যাক্টরীর শীর্ষস্থানীয় হয়ে খুব সুনাম কিনেছিলেন। এজন্যে শ্রীমতী দত্তের গর্বের অবধি ছিল না। তার উপর শরৎবাবুর এমন একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপ ছিল যে, ভিড়ের মধ্যেও তিনি হারিয়ে যেতেন না—গড্ডালিকা প্রবাহের মধ্যে থেকেও নিরন্তরই নিজের বৈশিষ্ট্যের ঝাণ্ডা উড়িয়ে বেরিয়ে আসবার শক্তি ছিল যেন তাঁর সহজাত। সুভাষ তাঁর নানা মন্তব্য, মতামত ও উপদেশ খুব মন দিয়েই শুনত। তাছাড়া শরৎবাবু আসর জমাতেও পারতেন তাঁর গল্পালাপের চটকে। সুভাষ ও আমি সময়ে সময়ে খুব হাসতাম তাঁর রসিকতা শুনে। সুভাষ যখন হাসত তখন তার গম্ভীরানন মুহূর্তে এমনই রূপান্তরিত হ'ত যে, মনে হ'ত ঠিক যেন একটি ছোট শিশু হেসে গড়িয়ে পড়ছে। আমার বিলেতের বন্ধুদের মধ্যে একজনকেও দেখি নি যার হাসি সুভাষের হাসির মিষ্টতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারত। কেম্ব্রিজে সুভাষকে যারা অতিগম্ভীর বা অরসিক নাম দিয়ে উচ্চাঙ্গের হাসি হাসত, তাদের জন্যে আমার দুঃখ হ'ত সত্যিই: সুভাষকে তো কাছ থেকে জানবার চেনবার সৌভাগ্য হয়নি বেচারিদের! একথা সত্যি যে, সুভাষ বাজে হাসিঠাট্টায়, কি পরচর্চায় কালক্ষেপ করতে চিরদিনই নারাজ ছিল। কিন্তু উৎকৃষ্ট রসিকতায়, সরস গল্পালাপে ও হাস্য-কৌতুকের স্রোতে বেপরোয়া হয়ে গা ভাসিয়ে চলতে ও কোনদিনই পেছপাও হ'ত না। ওকে কেউ অরসিক বললে ও আমাকে ঠিকই বলত: "আরে! সরস কথা

বললে তবে না রসিক হবার প্রশ্ন ওঠে। যারা হাসাতে চেষ্টা ক'রে কেবল লোক হাসায় মাত্র, তাদের রসিকতার পণ্ডশ্রমে হাসাটাই কি অরসিকতার লক্ষণ নয়?" বলেই বলত: "দেখ তো শরৎবাবুকে—তাঁর কথায় কেউ না হেসে থাকতে পারে?"

এ হেন রসিকচূড়ামণির দু-একটা রসিকতার নমুনা দিলামই বা। একটু ভূমিকা করতে হবে কিন্তু।

শরৎবাবুর মেয়ে রমা খুব বুদ্ধিমতী ও চটপটে ছিল। পরে সে এলাহাবাদে আই এস সি-তে রসায়নে ২০০'র মধ্যে ২০০ পেয়ে ডাফ বৃত্তিধারিণী হয়ে ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে বলে: "আপনাকেও হারিয়েছি"—কারণ ক্ষিতীশ ১৯১৫ সালে রসায়নে ২০০'র মধ্যে ১৯৯ পেয়ে ডাফ পেয়েছিল।

কিন্তু রমার ছোট ভাই—তাকে আমরা "খোকা" ব'লে ডাকতাম—আদৌ বুদ্ধিমান্ ছিল না। শরৎবাবু বলতেন: "খোকার আমার মাথায় সবই আছে, কেবল মস্তিষ্কটি বাদ।" ব'লেই বলতেন সুভাষকে ও আমাকে: "একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করেছ কি? দিনদুনিয়ায় এমন কোন বাপ জন্মায়নি যে বলে না: আমার কুলতিলকের কী বুদ্ধি! আমি সময়ে সময়ে ভাবি সুভাষ যে তাহলে জগতে এত বোকা এল কোত্থেকে?—হা হা হা!"

আমি হেসে বলেছিলাম: "আপনার কথা শুনে মনে পড়ে যায় আমার গিরিশ মেশোর কথা। তিনি বলতেন: 'দেখ মণ্টু, জগতে প্রতি মানুষই ভাবে, আমার মতন বুদ্ধিমান্ আর জন্মায়নি। কেবল আমার বেলা'—ব'লে নিজের বুকে হাত দিয়ে—'এ-জাঁকটা সত্যি।" শরৎবাবু এ-পাল্টা রসিকতাটি খুব উপভোগ করেছিলেন—সুভাষের তো কথাই নেই।

আর একদিন শরৎবাবু আমাকে বললেন: "আহা দিলীপ, তোমার "রাঙা জবা কে দিল তোর" গানটি শুনিয়ে তুমি যে আমাকে কী ফ্যাসাদে ফেলেছ—জানো না!"

আমি: কী রকম?

শরৎবাবু: আর কী রকম?—যেখানে যাই "রাঙা জবা"র তান পিছু নেয়। শেষটা থাকতে না পেরে আমিও তান ছাড়ি—অবশ্য বাথরুমে: "রা—ঙা জবা—আ-আ রে—কে—এ—এ দিলো—ও—ও রে তোর পায়ে—এ—এ মুঠো—ও ও মুঠো রে—" তারপরেই মেজাজ গরম হয়ে ওঠে, বলি: "দূর ঘোড়ার ডিম। আমার নিজেরি ভালো লাগছে না—তা অপরের ভালো লাগবে কোত্থেকে?" হা হা হা!

বিলেতে একটা দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়: নানা ভারতীয় সুসন্তান তাদের ল্যাণ্ড-লেডির মেয়ে নিয়ে মশগুল। শ্রীশরৎ দত্ত প্রায়ই বলতেন: "এর মূলে শুধু যে শ্বেতচর্মের মোহ লুকিয়ে আছে তা নয়, আছে এক ধরনের ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স। ভাবখানা যেন সাক্ষাৎ মেমকে হাত করেছি!" বলেছি, ভারতীয় ছাত্রদের এ-ধরনের মতিগতি দেখে সুভাষের দুঃখের সীমা ছিল না। আমার সঙ্গে এ নিয়ে প্রায়ই তর্ক বাধত কারণ আমার মনে হত—এসব ক্ষেত্রে সমাজের চেয়ে প্রেম বড়। শরৎবাবু টুকতেন: "কিন্তু যাকে প্রেম বলছ, সে যদি প্রেম না হয়ে মোহ হয়?" আমি বলতাম: "কিন্তু কোন্‌টা প্রেম আর কোন্‌টা মোহ চিনবার উপায় কি? এখানে তো দুষ্মন্তের দেওয়া আংটি নেই যে, সন্ধানী অভিজ্ঞানের এজাহারে চিনে নেবে শকুন্তলাকে?" ব'লেই বলতাম হেসে: "আর সেখানেও দেখুন গোল—সাক্ষাৎ শকুন্তলাকে নিয়েও। কী? না, দুষ্মন্তেরও হল মতিভ্রম। তবে?"

সুভাষ: "তবে" মানে? তুমি কি বলতে চাও যে, যাকে তাকে শকুন্তলা বলে গলায় মালা দেওয়া হোক?"

আমি (হেসে): সুভাষ ভাই, তুমি আর যে বিষয়েই কথা কও সশ্রদ্ধে শুনব, কিন্তু কারা শকুন্তলা দময়ন্তী, অনুসূয়া আর কারা উর্বশী, মেনকা, রম্ভা এ সঙিন মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ভার নিন—যারা জেনানালোকের জহুরি। তুমি আমি এখনো ডাঁশা আছি ভাই; কাজেই না পাকা পর্যন্ত বোধ হয় চুপ করে থাকাই ভালো।

সুভাষ (উদ্দীপ্ত হয়ে): কক্ষনো না। চোখের সামনে দেখছি এদের কীর্তি, আর চুপ করে থাকব? কী বলেন আপনি শরৎবাবু? মেম বিবাহ করা কি আপনি ভালো বলেন?

শরৎবাবু (এড়িয়ে গিয়ে): সার রজার ডি কভার্লির রায় মনে পড়ে সুভাষ: much can be said on both sides.

সুভাষ (মৃদু হেসে): আপনি ফের ঠাট্টা ধরলেন।"

শরৎবাবু (গাম্ভীর্যের ভান করে): মোটেই না। কারণ আমার মনে হয় মেমবিবাহ সাধারণত দূষ্য হলেও কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রশস্য হতেও পারে।

সুভাষ (হদিস না পেয়ে): যথা?

শরৎবাবু (মুচকি হেসে): যেমন ধরো সেই লোকটির বেলায়—তাকে সাধুবাদ না দিয়ে পারা যায় কি?—যে বলেছিল: আমি মেম বিয়ে করেছি কেন জানিস? শুধু সাহেবদের শালা বলতে—হা হা হা!

কিন্তু রসিকতা রেখে গম্ভীর প্রসঙ্গে আসি।

শরৎবাবুকে সুভাষ উপাধি দিয়েছিল: "গভীরদর্শী।" আমি তাঁর জীবন-দর্শনের কাছে একদিক দিয়ে ঋণী আছি। বলি।

আমি যখন এল. এল. বি. ও ব্যারিস্টারী পড়ছি, তখন তিনি একদিন এক ঢিলে দু-পাখি মেরেছিলেন। বলেছিলেন: "দিলীপ, সুভাষকে ভালোবাসো খুব ভালো কথা, কিন্তু ভালোবাসারও দায়িত্ব আছে; যাকে ভালোবাসবে তার মতন হতে চেষ্টা করতে হয়। তুমি সঙ্গীত নিয়েছ বেশ করেছ, কিন্তু এখনো দু-নৌকায় পা কেন? আইন রেখেছ কেন? সঙ্গীতেই জীবন নিয়োগ করো। `বার্ন ইওর বোটস্, বার্ন ইওর বোটস্—যেন সুভাষ করেছে।

কথাটা আমার বুকে তীর হয়ে বিঁধেছিল।

সুভাষ ও আমি পাশাপাশি খাটে শুতাম একই ঘরে। সুভাষ রাতে আমাকে বিমর্ষ দেখে এক আঁচড়ে এঁচে নিল ব্যাপারটা। বলল: "শরৎবাবুর কথাকে অত সীরিয়াসলি নাই নিলে দিলীপ!"

আমি আর থাকতে পারলাম না, বললাম: "সুভাষ! আমাকে প্রতিপদেই তুমি বাঁচাতে চাও—খুব ভাল কথা। কিন্তু শরৎবাবু তো মিথ্যে বলেন নি ভাই—সীরিয়াসলি না নিয়ে করি কী? ভেবেচিন্তে চলার নাম বিচক্ষণতা হতে পারে কিন্তু আদর্শবাদী চিরদিন ঝাঁপই দেয়—'নৌকা পুড়িয়ে'।"

এর পরেই আমার লণ্ডনে দেখা হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাউথ কেনসিংটনে ১৯২১ সালে। তিনিও আমাকে বলেন এই কথাই যে, সঙ্গীতকে একান্ত ক'রে বরণ না করলে আমাদের দেশে গানের প্রচারে ও সংস্কারে আমি বিশেষ কিছুই করতে পারব না।

ভেবেচিন্তে অবশেষে সুভাষকে ধরি: "তুমি কী বলো? বলতেই হবে।"

সুভাষ অগত্যা বলে: "আমি তো ভাই সঙ্গীতের কিছুই বুঝি না। তবে একথা বলতে পারি যে, গতানুগতিক পথে যারা চলে, তারা দেশকে এগিয়ে দেয় না। তাই তোমার আদর্শে যে আমার সায় আছে, তা কি আর বলতে হবে—যখন এটুকু আমি জানি ও মানি যে, সঙ্গীতকে জীবনের একটি মহৎ আদর্শ ব'লে বরণ করা চলে?"

পর পর শ্রীশরৎ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ তিন তিন উপদেষ্টার কাছে একই উপদেশ পাবার পরে স্থির করলাম যে, আর দুনৌকায় পা নয়—"নৌকা পুড়িয়ে" ঝাঁপ না দিলে আর মান থাকে না। এ-ত্রয়ীর মধ্যে শরৎবাবুর কথাটাই আমার মনে সবচেয়ে বিঁধেছিল : যে কাউকে ভালবাসার দায়িত্ব আছে। তবে আমার প্রকৃতি চিরদিনই কেমন যেন চলমান—কাজেই পথের প্রতি মোড়ে এসেই যেন গালে হাত দিয়ে ভাবতে শুরু করে দেয়—এবার কোন্ দিক? উত্তর না দক্ষিণ—পূর্ব না পশ্চিম? আর যেই ভাবি সেই দেখি প্রতি দিকেরই একটি বিশেষ নিজস্ব টান আছে। কাজেই প্রতি চৌমাথায় আসতে না আসতে থম্‌কে যাই। এই দিগ্বিদিক সঙ্কটের লগ্নেই মহৎ বন্ধু ও বিচক্ষণ উপদেষ্টারা আঁধার পথে আলো ধরেন—ঠিক পথটি চিনিয়ে দিতে না পারলেও শেখাতে পারেন—কেমন ক'রে দেখতে হয়, চিনতে হয়। যাঁরা আমাকে এই দিক দিয়ে চলার পথে গন্তব্যের দিশা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে শরৎবাবুর ঋণ ইতিপূর্বে কোথাও স্বীকার করা হয় নি। তাই আজ প্রথম স্বীকার করে এত তৃপ্তি পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার দুটি চরণ উদ্ধৃত ক'রে এ-প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানি তাঁদের সকলেরি তর্পণে—

যারা আমার সাঁঝ সকালের গানের দীপে
জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের
সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা......

রবীন্দ্রনাথ একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। সমাজে আমরা কত শত লোকেরই সংস্পর্শে আসি। প্রত্যেকের কাছেই কিছু না কিছু পাই। কিন্তু আলোর পাথেয় পাই শুধু তাদেরি কাছে—যারা নিজেদের হৃদয়ের পরশ দিয়ে আমাদের জীবনের আলো-ছায়ার লীলাকে উস্কে দিয়ে যায়। আমার জীবনে এঁদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই শ্রীশরৎকুমার দত্ত। আজো ভুলতে পারি না তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চোখের জ্যোতি, দরদী মুখের হাসি, সর্বোপরি ধুলোবালির জীবনের কেন্দ্রে থেকেও মনে রাখা :

যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ ভাই,
পেলেও পাইতে পারো লুকানো রতন।

• • •

এম্‌নি আর একজন আমাদের জীবনপথে এসেছিলেন সুভাষকে ও আমাকে তাঁর স্নেহরসে সমৃদ্ধ ক'রে রেখে যেতে। তাঁর নাম মিসেস মেবেল পালিত।

তাঁর কথা বলেছি আমার বাল্যস্মৃতিতে। ইনি বিখ্যাত লোকেন কাকার বিধবা স্ত্রী—মেমসাহেব।

মেম বিবাহ করার বিরুদ্ধে অনেকের গভীর প্রেজুডিস আছে। আমারও হয়ত থাকত, যদি শৈশবে মিসেস পালিতের ও যৌবনে মিসেস ধর্মবীরের স্নেহ না পেতাম। মানুষের স্নেহ তার মতামতকে নিত্যনিয়তই প্রভাবিত করে—কে না জানে? কিন্তু প্রভাবিত করা এক—রূপান্তরিত করা আর। বিলেতে আমার সময়ে সময়ে সত্যিই মনে হ'ত যে, হয়ত এই দুটি ইংরেজ মনোরমার স্নেহ-সংস্পর্শে না এলে ইংরেজ নারীর সম্বন্ধে অনেক ধারণা আজও আমার মনে কাঁটার মতন খচ খচ করে বিঁধত। যথা, ধরুন: ওদের মধ্যে বিলাস-প্রবৃত্তি বেশি প্রবল বা মাতৃস্নেহ নেই বা পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকার কোন আন্তর তাগিদ দেখা যায় না····· ইত্যাদি।

একথা মানি যে, ভারতীয় মা-র মধ্যে সন্তান-বাৎসল্য সচরাচর য়ুরোপীয় মা-র চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু তাই ব'লে বলা যায় না যে, অনুকূল গৃহজীবনের পরিবেশে লালিত হলে তাঁরা ঠিক ভারতীয় জননীর মতনই স্নেহময়ী ও সুচরিতা হয়ে উঠতে পারেন না। যদি মিসেস পালিতের ছবিটা আঁকতে পারি- ঠিক যেমনটি তাঁকে দেখেছি তেমনি রঙে রসে ভাবে অনুভাবে—তাহলে হয়ত আমার বক্তব্যটা একটু পরিষ্কার হবে।

মিসেস পালিতকে আমি দেশেই—গয়াতে, আন্টি বলতাম। লোকেন কাকা তাঁর জন্যেই লণ্ডনে গোলডার্স গ্রীনে একটি দোতলা বাড়ি তৈরি করেন। তাঁর লোকান্তরের পরে আন্টি এই সুন্দর আনন্দনিলয়েই নীড় বাঁধেন। উপরের তলায় তিনি থাকতেন তিন-চারটি ঘর নিয়ে, নিচের তলা দিতেন ভাড়া। যে সময়ের কথা বলছি—১৯২১ সালে— সে সময়ে দত্ত পরিবার ছিলেন আন্টির ভাড়াটে।

কিন্তু না, ভাড়াটে বলতে যা বোঝায়, তা নয়। এ যেন দুটি পরিবার মিতালি বন্ধনে বদ্ধ হয়ে মিলে-মিশে রয়ে গেছে একই পান্থশালায়—পরম আনন্দে। ওঁদের রান্নাঘর আলাদা ছিল বটে, কিন্তু কখনো আন্টি নিচের তলায় নেমে এসে খাওয়ার পূর্বে বা পরে আসর জমাতেন, কখনো বা আমরা যেতাম সদলবলে উপরে তাঁর

ড্রয়িং-রুমে আড্ডা দিতে। খাওয়া দাওয়াও হ'ত প্রায় একত্রে—ভিড়ের মধ্যেই বলব —বিশেষ সুভাষ আসার পরে। কারণ সুভাষ ইতিমধ্যে আই. সি. এস. ছেড়ে দিয়ে এত নাম কিনেছিল যে, লণ্ডনে বহু ভারতীয় তরুণ-তরুণী ওর সঙ্গে মহবৎ করতে আসত। সুভাষ সকলের সঙ্গে প্রথম প্রথম মিশতে পারত না, একথা বলেছি ইতিপূর্বে। কিন্তু দত্ত পরিবারের ও আন্টির স্নেহ-পরিচর্যায় ওর যেন যাকে বলে আইস ওয়াজ ব্রোক্‌ন্—কিনা বাইরের বাধা কেটে গিয়ে ও হয়ে উঠল ঘরোয়া। কখনো আমাদের সঙ্গে আন্টির ফ্ল্যাটে খাওয়া-দাওয়ার পর ডিশ ধুত তাঁর সঙ্গে—শ্রীমতী দত্তও যোগ দিতেন। কখনো নিচের তলায় ঐ একই গৃহকর্মে ধুম লেগে যেত, যাতে আন্টি এসে যোগ দিতেন।

আন্টি স্বভাবে ছিলেন যাকে বলে অত্যন্ত মিশুক—গ্রেগেরিয়াস : অর্থাৎ লোকজনের সঙ্গ না পেলে স্রেফ মিইয়ে যেতেন। তাই সময়ে সময়ে ধরতেন আমাদের ওঁর আতিথ্যেও কিছুদিন ক'রে থাকতে হবে—শ্রীমতী দত্ত একা কেন আমাদের একচেটে ক'রে নেবেন ?

সুভাষকে তিনি ভালোবেসেছিলেন প্রথম দিকে আমার জন্যেই বটে, কিন্তু পরে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন আমাকে : "আমার সত্যি মনে হয় দিলীপ যে আমার দুটি ছেলে সুভাষ ও দিলীপ। কিন্তু ওকে আমি প্রথম দিকে ভুল বুঝেছিলাম। ভেবেছিলাম বুঝি ও দারুণ ইংরেজবিদ্বেষী। কিন্তু ও যে স্বভাবে এত উদার ও মহৎ—আমি সত্যিই ভাবতে পারি নি। ও এখানকার নানা দুঃসহ বক্তার মতন সংকীর্ণ নয় তো—যদিও ও আই. সি এস ছেড়ে দিয়েছে শুনে প্রথমে আমি খুশি হতে পারি নি কিছুতেই। কারণ ইংরেজরা তো ভারতের শত্রু নয় দিলীপ, তারা সত্যিই চায় তোমরা স্বরাজ পাও—কিন্তু এখনো তোমরা তো শাসন করতে শেখোনি" ..... ইত্যাদি ইত্যাদি মামুলি যুক্তি। সুভাষ অন্য কোন মেম সাহেবের মুখে এ ধরনের কথা শুনলে রেগে আগুন হয়ে বলতই বলত—"যত সব ফিরিঙ্গি যুক্তি", কিন্তু স্নেহ হৃদয়কে নরম করার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টির কঠোরতাও আসে কোমল হয়ে। কাজেই আন্টির স্নেহ পেতে না পেতে তার চোখে জেগে উঠেছিল এক দরদী দৃষ্টি, যার আলোয় সে তাঁকে দেখতে শিখেছিল এক নতুন দৃষ্টি দিয়ে, সমীহ করতে শিখেছিল তাঁর নিঃসন্তান মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-বুভুক্ষার দিকটা তথা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য যার গুণে তিনি ভারতীর ছাত্রদেরকে এত সহজে আপন করে নিতে পারতেন। সুভাষ কতবারই যে আমাকে বলেছে : "মিসেস পালিত যেন স্বধর্মে মা হয়ে জন্মেছেন,

তাই ভালই হয়েছে যে ওঁর নিজের সন্তান হয় নি। নৈলে হয়ত সবাইকেই এমন অপত্যনির্বিশেষে কাছে টানতে পারতেন না।"

কথাটা সুভাষ মিথ্যা বলে নি। কারণ মিসেস পালিত মনে মনে স্বজাতির বিশেষ পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও নিত্যই নানা ভারতীয় ছাত্রছাত্রীকে কাছে টানতেন তাঁর অপূর্ব মাতৃস্নেহের চরিতার্থতা খুঁজতেই বটে। এর একটা বড় চমৎকার দৃষ্টান্ত দেবিকারাণী। সে আজ একজন ভারতবিখ্যাতা চিত্রতারকা, কিন্তু ১৯২১ সালে কে তাকে চিনত? তার পিতা সার্জন জেনারেল মন্মথ চৌধুরী ও মা লীলা দেবী তাকে বিলেতের এক বোর্ডিংএ ভর্তি করে দিয়েছিলেন। লীলা দেবী ছিলেন ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, মন্মথ চৌধুরী শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর সহোদর। লীলা দেবী শিশুসঙ্গের ভক্ত ছিলেন না—মাতৃস্নেহ বলতে আমরা যা বুঝি, তা তাঁর ছিল না আদৌ। কাজেই দেবিকার একটি মস্ত স্নেহতৃষ্ণা মিটেছিল তার এই নিঃসন্তানা "আন্টির" স্নেহে—যিনি তাকে প্রায়ই নিজের কাছে এনে রাখতেন পরম আদরে। দেবিকার বয়স তখন দশ এগার বৎসর, কিন্তু সুবুদ্ধি ও কথাবার্তার জৌলুষে সে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এমন কি সুভাষ-যে-সুভাষ সেও দেবিকার সহজ সুন্দর ধরনধারনে তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল—যদিও সে দেবিকাকে আবাল্য খাস-বিলিতি শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল না। আমাকে মাঝে মাঝেই একান্তে বলত: "দেবিকার জন্যে ভারি দুঃখ হয় দিলীপ! এই বয়স থেকেই পেকে উঠবে এ দেশের মেমসাহেবি হালচালে!"

আমি: কিন্তু আমার মনে হয় না ও এদেশের হালচাল রপ্ত করার ফলে সত্যি সত্যি মেমসাহেব ব'নে যাবে। ও দেখছে তো আন্টিকে স্বচক্ষে।

সুভাষ: মিসেস পালিতের স্নেহ ও পাচ্ছে, এ খুবই ভালো কথা বৈকি। কিন্তু তবু ওর নিজের মা যে থেকেও নেই—

আমি: কেন? লীলা মাসিমা স্বভাবে মা না হলেও দেবিকাকে স্নেহ করেন না, এমন তো নয়।

সুভাষ: কী পাগলের মতন কথা বলছ দিলীপ? মা-র স্নেহ বলতে কি বোঝায়—মেয়েকে দূরে দূরে রেখে শুধু তার মেমসাহেবি শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া? শিশুর কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস হল মার স্নেহসঙ্গ, পরিচর্যা। অর্থাৎ যা ও মিসেস পালিতের কাছে পাচ্ছে তাই ওর পাওয়া উচিত ছিল সব আগে লীলা দেবীর কাছে।

লীলা দেবীকে সুভাষ কোনদিনই সুনজরে দেখতে পারে নি। যদিও ঠিক সেই জন্যেই ও আন্টির আরো গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিল। বলত: "উনি মেম হয়েও ভারতের আত্মার বেশি কাছে দেবিকার বাপ মা-র চেয়ে।"

দশ

এসময়ে আমাদের দুজনের বয়স তেইশ চব্বিশ, মিসেস ধর্মবীরের বয়স ত্রিশ বত্রিশ, মিসেস পালিতের—পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন। কাজেই একথা বললে হয়ত ভুল বলা হবে না যে, এঁদের মধ্যে একজন আমাদের কাছে ধরা দিয়েছিলেন দিদির রূপ ধ'রে, অপরা এসেছিলেন মাতৃস্থানীয়া হয়ে।

সুভাষের মধ্যে একটা আত্মসমাহিত পৌরুষ প্রায় সকলেরই চোখে পড়ত যার দীপ্তি জুগিয়েছিল ওর অটুট ব্রহ্মচর্যের ওজস। এহেন মানুষের স্বভাব নয় মেয়েদের কাছে কোনো কিছুর জন্যে হাতপাতা। আমি এমন ইঙ্গিত করছি না অবশ্য যে, সুভাষ মেয়েদের অবজ্ঞার চোখে দেখত। কেমন করে দেখবে—যার মা ছিলেন অমন মহীয়সী? তাঁর একটি কথা আমি কোনোদিনও ভুলব না। সুভাষ যখন বর্মায় আই-এন-এ সৈন্যদল গড়ে তুলে ইম্ফলে এসে হানা দেয়, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন, সে জাপানী সৈন্যের সহায়তায় ভারতকে স্বাধীন ক'রে প্রেসিডেন্ট হয়ে বসবে। তাই সে-সময়ে সুভাষের মাকে তাঁর মৃত্যুশয্যায় একজন সান্ত্বনা দিতে দিতে বলেন: "মা, আপনি তো আজ রাজমাতা, আপনার ভাবনা কী?" তাতে তিনি ত্রস্ত হয়ে বলেন: "চুপ চুপ, অমন কথা বলে না। আমি কোনোদিন স্বপ্নেও এমন কামনা করি নি যে, সুভাষ আমার রাজা হোক। সে চিরদিনই দেশসেবাকে তার জীবনের ব্রত ব'লে বরণ করেছে। আমিও চাই, সে যেন শুধু দেশের সেবক হয়ে দেশের কাজে জীবন দিতে পারে—তার রাজপদ আমি মোটেই কামনা করি না।"

এমন জননীর সুসন্তান কেমন ক'রে নারীকে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা করবে? না, সুভাষ যে মেয়েদের আন্তরিক শ্রদ্ধা করত আমার এ এজাহারে তাঁরা সবাই সায় দেবেন যাঁরা তার একান্ত কাছে আসতে পেরেছিলেন।

কিন্তু তবু বলব, সুভাষ ছিল স্বভাবে শুধু যে ষোলো আনা তেজস্বী পুরুষ তাই নয়—তার উপর সাড়ে পনর আনা আদর্শবাদী সাধক। এই জাতের মানুষের

মন নারীঘটিত রোমান্সে রঙিয়ে উঠতে স্বতঃই বাধা পায়। মেয়েদের তারা শ্রদ্ধা করতে পারে, ভক্তি করতে পারে, এমন কি পূজা করতেও পারে—কিন্তু পারে না তাদের কাছে ধরা দিতে—যেমন পারে তারা যারা স্বভাবে সংসারী বা শিল্পী বা কবিপ্রাণ।

কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই সুভাষ বিলেতে এই দুটি ইংরাজ মহিলার কাছে নিজেকে এত ঋণী মনে করত। তাঁরাই যে ওকে সর্বপ্রথম আপন ক'রে নিয়েছিলেন তাঁদের সহজ নির্মল স্নেহের টানে—তাই না ও পেয়েছিল ইংলণ্ডে নারীহৃদয়ের পবিত্র তাপস্পর্শ যা আবহমানকাল মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সরস রেখেছে, সৃষ্টির রসদ জুগিয়েছে—কর্মে, শিল্পে, ধর্মে, ত্যাগে, তপস্যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কত লেখাতেই না নারীর এ-পরম দানের ঋণ স্বীকার করেছেন কৃতজ্ঞ আনন্দে। মনে পড়ে তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা :

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব মুকুট ; পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর········· ··
হাত ধ'রে মোরে তুমি
ল'য়ে গেছ সৌন্দর্যের সে-নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান্
অক্ষয়যৌবনময় দেবতা সমান
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী ; সেথা মোর সভাসদ
রবিচন্দ্রতারা, পরি' নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নব নব গান
নব অর্থভরা, চিরসম্পদ সমান
সর্ব চরাচর।

আমাকে তিনি বলেছিলেন একবার—যেকথা আমার Among the Great এ লিখেছি : জৈবজগতে যেমন পুরুষের বীজ অলক্ষ্যে থেকে ভ্রূণকে সৃষ্টি করে, মানস ও অন্তর জগতে তেমনি নারীর প্রেরণাই পুরুষকে শিল্পে কর্মে ত্যাগে ধর্মে সৃষ্টির খোরাক যোগায়। এই গভীর তত্ত্বটিরই ইঙ্গিত নিহিত আছে আমাদের আর্য

বাণীতে যে, নারী পুরুষের শক্তি : যথা, রাধার উদ্দেশে কৃষ্ণের বিখ্যাত উক্তি—যা আমি নানা তর্কালোচনায় মাঝে মাঝেই সুভাষের কাছে উদ্ধৃত করতাম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকে।

অহং পুমান্ ত্বং প্রকৃতির্ন
স্রষ্টাহং ত্বয়া বিনা।
যথা নালং কুলালশ্চ ঘটং
কর্তুং মৃদা বিনা॥

অর্থাৎ আমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি। তুমি বিনা আমি কিছুই সৃষ্টি করতে পারি না যেমন কুমোর ঘট গড়তে পারে না মাটি বিনা।

এখানে ব'লে রাখা ভালো যে, সুভাষের সঙ্গে আমার এ-ধরনের আলোচনা হত দেশে ফেরার অনেক পরে—যখন আমরা দুজনেই মধ্যবয়স্ক। ইংলণ্ডে, বলেছি, সুভাষ নারীপ্রসঙ্গ উঠলেই পাশ কাটিয়ে যেত। তাছাড়া, সে-সময়ে ওর কাছে এ-প্রশ্ন যে আদৌ ওঠেইনি, আলোচনা শুরু হবে কোন্ তাগিদে ? ওর মন নরনারীর গভীর আদান-প্রদানের প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করে প্রথম দেশবন্ধু দাশের সংস্পর্শে এসে। দেশবন্ধু ওকে রেহাই দিতেন না, নানাদিক থেকে নরনারীর গভীর সহযোগ ও সাহচর্য প্রসঙ্গের আলোচনা করতেন। আমার যোগে দীক্ষা নেবার ঠিক আগে ও আমাকে একদিন বলে যে, জেলে ও বৈষ্ণব কবিতা ও তন্ত্র প'ড়ে নরনারীর প্রেম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়েছে। কথাটা ও বলবামাত্র আমি হেসে উঠেছিলাম যে, এ-সম্বন্ধে পুঁথি প'ড়ে কিছু জানা সম্ভব নয়। এই সময়ে সুভাষ অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সংস্পর্শে আসে। (তাঁকে আমি এখন থেকে শরৎদা নামেই অভিহিত করব।) শরৎদার নানা গল্প উপন্যাসে নারীচরিত্রের নানা মতিগতি দেখে ও সময়ে সময়ে নিশ্চয়ই একটু বিহ্বল মতন হয়ে পড়ত, কিন্তু শরৎদার 'পরে ওর এমনই গভীর শ্রদ্ধা ছিল যে, এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে ও ভুলেও তর্ক করত না। তাই "তন্ত্র ও বৈষ্ণব কবিতা পড়ে সুভাষ রাতারাতি প্রেমের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়েছে" ওর এই কথা যখন একদিন ওর সামনেই শরৎদার কাছে বলি তখন শরৎদা তাঁর অভ্যস্ত ঢঙে চোখ দুটি মিটমিট করে খিলখিলিয়ে হেসে বলেন : "সুভাষ, এ হ'ল হাতেকলমের ব্যাপার ভাই, পুঁথি পড়ার কর্ম নয়।" সুভাষের মুখ সেদিন লাল হয়ে উঠেছিল এ-ঠাট্টায়। পরে শরৎদা চলে গেলে আমাকে বলে : "তুমি ভারি দুষ্টু—কেন ওভাবে আমাকে অপ্রস্তুত করলে ?" আমি হেসে বললাম :

"যাতে তুমি এ-বিষয়ে একটু সচেতন হও—ইংরাজিতে এই ধরনের মন্তব্যকে 'নাইভ' বলে, জানো না কি?" ও একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিল: "তোমার একথা সত্যি যে, এ বিষয়ে আমার কোনো অপরোক্ষ অভিজ্ঞতাই নেই। কিন্তু তা ব'লে শরৎবাবুর একথা সত্যি নয় যে, হাতে-কলমে না করলে কোনো কিছুর সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। সব জ্ঞানই প্রথমে আসে পরোক্ষভাবে—অপরোক্ষ অনুভূতি আসে সবশেষে আর তখনই মানুষ পরোক্ষ জ্ঞানকে যাচিয়ে নিয়ে সত্যিকার অভিজ্ঞ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তোমার সঙ্গে এ-আলোচনা আমি একটু সময় পেলে করব কোনোদিন—কারণ আমার যে-ছবিটি তুমি মনে মনে ছকে রেখেছ আমি ঠিক তা নই।"

দুর্ভাগ্যক্রমে এ-আলোচনার অবসর আমাদের মধ্যে হয়নি। কেননা, ১৯২৮ সালের পরে আমার পণ্ডিচেরি থেকে কলকাতায় বড় বেশি আসা হ'ত না ব'লে আমাদের মধ্যে বেশি দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব ছিল না। ১৯৩৭ সালের পরে অবশ্য বহুবারই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু তখন এ-আলোচনায় না ছিল আমার উৎসাহ না ছিল ওর অবসর। তাই পরিণত বয়সে নরনারীর পারস্পরিক আদান-প্রদান সম্বন্ধে সুভাষের ভাবধারার খবর দিতে আমি অক্ষম।

আমি সুভাষকে প্রথম থেকেই চিনেছিলাম স্বধর্মে বীর সাধক ও স্বভাবে ব্রহ্মচারী বলে। এ-জাতের মানুষ প্রায়ই একলা থাকার ফলে হয়ে ওঠে স্বাবলম্বী তথা নিঃসঙ্গবৃত্তি। সহজ মানুষ (normal) বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি—অর্থাৎ যে-ছাঁচে সাড়ে পনরো আনা মানুষ ঢালাই হয়েছে—তাদের সঙ্গে এ জাতের মানুষের একটা মূলগত তফাৎ থাকেই থাকে। তফাৎটার বহিঃপ্রকাশ ইন্দ্রিয়গম্য হ'লেও তার নিদানের দিশা পুরোপুরি যুক্তিগম্য নয়। তাই একের মাপকাঠিতে অপরকে মাপা চলে না। একথা সুভাষও স্বীকার করত—বিশেষ ক'রে ওর কর্মজীবনে, তাই ও কথায় কথায় বলত যে, দেশের ডাক যে শুনেছে ঘরের ডাকে কান দিলে সে স্বধর্মভ্রষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথের বলাকার শেষ কবিতাটি ওর অত্যন্ত প্রিয় ছিল এইজন্যেই, প্রায়ই উদ্ধৃত করত সংযত উচ্ছ্বাসে:

ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।

পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ

স্বামীজির Song of the Sannyasin থেকে ও প্রায়ই উদ্ধৃত করত একটি চরণ: "Have thou no home, what home can hold thee, friend?" এক কথায় ও দেশকে ভালোবেসে অনিকেত নিঃসঙ্গতাকে খানিকটা সন্ন্যাসীর মতনই —অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছিল—অন্ধভাবে নয়, খোলা চোখেই, কারণ ও জানত গৃহহারা হওয়ার দুঃখ সহজ দুঃখ নয়, কিন্তু আশৈশবই যে ও জপ করছিল অভীঃ-মন্ত্র, তাই দেশের জন্যে ঘরছাড়া সর্বহারা হবার দুঃখকেও ও অকুতোভয়েই বরণ ক'রে নিয়েছিল ওর অন্তরের দুর্নিবার তাগিদে। যাকে জীবনদেবতা প্রথম থেকেই দুর্গম পথের তীর্থযাত্রী ক'রে গড়েন সে সহজ পথের পথিক হবে কেমন ক'রে? বীর্য, শৌর্য তথা দুঃসাহসকে ও ভালবাসত সর্বান্তঃকরণে, কারণ ওর নিয়তি ওকে ঢালাই করেছিলেন দুঃসাহসীর ছাঁচে। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নেতা Danton-এর মতন সুভাষেরও জীবনের একটি মহামন্ত্র ছিল: "Audace, audace, toujours l'audace!" প্রিন্স ক্রপটকিনের Memoirs of a Revolutionist ছিল ওর একটি অত্যন্ত প্রিয় বই। প্রায়ই বলত আমাকে: "তিনি সত্যিই ছিলেন a giant among men তাই না পেরেছিলেন দেশের জন্যেই দেশছাড়া হতে!" তখন কে জানত যে নিয়তি ওকেও এই পথের জন্যেই চিহ্নিত করে রেখেছিলেন?

বাইরের লোক জানত না যে ও স্বভাবে উদাসী, অসংসারী: কিন্তু ও নিজে জানত। তাই ও একবার লিখেছিল একটি অটোগ্রাফের খাতায়—বিঠলনগরে ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮ সালে—সে-অঙ্গীকারটি ছিল তার আত্মার একটি রক্তস্বাক্ষর:

"There is nothing that lures me more than a life of adventure away from the beaten track and in search of the unknown. In this life there may be suffering, but there is joy as well; there may be hours of darkness but there are also hours of dawn. To this path I call my countrymen."

অর্থাৎ, "আমাকে সবচেয়ে বেশি টানে দুঃসাহসের জীবন—গতানুগতিকের সহজ পথ ছেড়ে অজানার অচিনের দুরভিসার। এ-হেন জীবনে দুঃখ থাকতে পারে

কিন্তু আনন্দও আছে; রাত্রির আঁধার আছে; কিন্তু উষার আলোও আছে। এই পথের দিকেই আমি আমার দেশবাসীদের ডাক দিতে চাই—এসো।"

আমি এ সূত্রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাইছি এই কথাটি যে সুভাষ আবাল্য বেশ ভালো ক'রেই জানত যে সে গড়পড়তাদের একজন নয়, তাকে নিজের পথ কেটে নিজের লক্ষ্যপথে চলতেই হবে, সে অভিসারে যত দুঃখই সইতে হোক না কেন। তাই না ও আঠার বৎসর বয়সেই ওর এক বন্ধুকে একটি পত্রে লিখেছিল: আমার জীবনে এমন একটি উদ্দেশ্য আছে যাহা বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট। আমার জীবন বিধাতার সেই উদ্দেশ্য সার্থক করবার জন্য, সুতরাং গতানুগতিক জীবনযাত্রা আমার জন্য নহে।"

একটু আগেই বলেছি প্রতিভা আত্মসচেতন না হয়েই পারে না। তাই সুভাষ যে তার জীবনবাণী সম্বন্ধে সচেতন হবে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় পাই, তিনি জানতেন বিধাতা তাঁকে কোন্ শান্ত শিব সুন্দরের পথে সার্থক করে তুলতে চেয়েছেন, তাই না লিখেছিলেন অকুণ্ঠেই:

জানি আমি, মোর কাব্য
ভালোবেসেছেন মোর বিধি—
ফিরে যে পেলেন তিনি দ্বিগুণ
আপন-দেওয়া নিধি।
ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন
নিঃশব্দ পদচারে
বাঁশির উত্তর তাঁর আমার বাঁশিতে শুনিবারে।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও—তাঁর কথা বলবার সময় এলো—ঠিক্ তেমনি জানতেন বরাবরই যে, তাঁর প্রতিভার উৎসমুখ তাঁর মধ্যে পাষাণ-চাপা আছে, একবার খুললে তার সুধাধারায় কেউ পারবে না স্নিগ্ধ তৃপ্ত মুগ্ধ না হতে। আমাকে একথা প্রায়ই বলতেন, চিঠিতেও নানা লোককে লিখেছিলেন। যেমন একটা চিঠিতে লিখেছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে: "আমার চেয়ে ভালো নভেল কিম্বা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না। যখন এই কথাটা মনে জ্ঞানে সত্য ব'লে মনে হবে—সেইদিন আমাকে গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো। তার পূর্বে নয়।"

এ-কথাটাকে এত ক'রে ফলিয়ে বলছি আরো এই জন্যে যে সুভাষের অনেক সমালোচক তাকে অহঙ্কারী ও অটোক্র্যাটিক বলে তার উপর অবিচার করেছেন। তাঁরা যদি বলতেন ওর আদর্শের পথে যারা হানা দিত তাদের সম্বন্ধে ও অসহিষ্ণু ছিল তাহলে মেনে নিতে পারি, কেন না ক্ষুদ্রচিত্তদের বিরুদ্ধে এ-অসহিষ্ণুতাকে খুব দোষের বলে আমি মনে করি না। কেন করি না বলি সংক্ষেপে।

সংসারে যারা গড়পড়তা গতানুগতিক হয়ে আসে তাদের চলার পথে দুঃখ থাকলেও বাধা খুব বেশি প্রকট হয়ে ওঠে না যেমন ওঠে তাদের পথে যারা সুভাষের মতন স্বভাবে দুঃসাহসী, দুর্গমপন্থী। এ-শ্রেণীর মানুষ মহাপ্রাণ হয় ব'লেই পণ নেয়: মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। কাজেই যখন তারা দেখে যে, তাদের মন্ত্রসিদ্ধির পথ আগলে দাঁড়িয়েছে তারা, যাদের সম্বন্ধে চলতি প্রবচনে বলে: "ভালো করতে পারি না পারি মন্দ করতে তো পারি—আমায় কী দিবি তা বল্?—" তখন তারা সইতে পারে না এ-ঈর্ষার গ্লানি, নীচতার বিদ্রোহ, মিথ্যার দাপট।

কিন্তু ঈর্ষা নীচতা মিথ্যা এদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে মানুষকে খানিকটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তেই হয়, কেননা সব মহৎ বিকাশই দুর্লভ বলে সংসারে মহৎ আশা মহৎ স্বপ্নের শরিক হবার লোক খুব বেশি মেলে না। আমি তাই সুভাষকে প্রায়ই বলতাম যে, ধর্মের প্রেরণায় জাতির ও সমাজের সংস্কার সাধনের ব্রত নিয়ে ভারতের শাশ্বত অমৃত বাণীর পতাকাবাহী হওয়াই তার উচিত ছিল, চলা উচিত ছিল বিবেকানন্দের পথে—হীন রাজনীতির পথে নয়। উত্তরে সুভাষ বলত ঐ একই কথা: "তা'হলে যে রাজনীতির অঙ্গন শেয়াল কুকুর শকুনির ভাগাড় হয়ে দাঁড়াবে।"

এ-প্রাচীন সমস্যার কোন আশু সমাধান করবার দুরন্ত উৎসাহে এ-প্রসঙ্গ পাড়িনি আমি। স্মৃতিচারণের স্বধর্মও নয় এ-ধরনের সমস্যা সমাধান। আমি এ-সূত্রে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে সুভাষ বিলক্ষণ জানত যে, তার আদর্শের বিরোধীদের সঙ্গে লড়তে তাকে অনেক কিছুই সইতে হবে। শরৎদাকে দেশবন্ধু একবার বলেছিলেন (সুভাষের মুখেই প্রথম শুনি একথা) যে, দেশকে স্বাধীন করতে তাঁকে ইংরেজের সঙ্গে যত না লড়তে হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি লড়তে হয়েছে তাঁর দেশবাসীর সঙ্গে। সুভাষের বেলাও ঠিক তাই ঘটেছিল। ফলে জনকল্লোলের মধ্যেও সে হয়ে পড়েছিল খানিকটা একলা ও অসহায়। বারান্তরে একদিনের কথা বলব—যার স্মৃতি আমার মনে কতদিনই যে খচ খচ করে বেজেছে—বিশেষ সুভাষের সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বিদেশে বিভুঁয়ে অকালমৃত্যুর পরে।

বলেছি, ১৯৩৭ সালে আমি পণ্ডিচেরির যোগাশ্রম থেকে বাংলা দেশে ফিরে আসি দু' তিন মাসের জন্যে। কলকাতায় আত্মীয়-স্বজনের স্নেহনীড়ে ফিরে যেন এক নতুন গভীর আনন্দের স্বাদ মিলল আবার। বিশেষ করে সুভাষ ও শরৎদার দাক্ষিণ্যে। সুভাষ মাঝে মাঝেই আমার এখানে হাজির হ'ত—কখনো শরৎদাকে সঙ্গে ক'রে, কখনো একা। ওকে প্রায়ই কর্মক্লান্ত দেখে আমি গানবাজনার আসরে ওকে ডাক দিতাম শরৎদার সঙ্গে। দুজনে একত্রে এলে আসর খুব জ'মে উঠত—গানে গল্পে হাস্যে। একদিন ব্যারাকপুরে আমার বোন মায়ার ওখানে সুভাষকে আমরা অভিনন্দন দেই। সে-সভায় আমি ও আমার কন্যোপমা ছাত্রী উমা বসু গান করেছিলাম ও অমলা নন্দী (এখন অমলা শঙ্কর) নেচেছিলেন। আনন্দমেলা ভাঙলে আমি দাদামহাশয়ের মোটরে না ফিরে সুভাষের মোটরেই কলকাতা ফিরি, কারণ সুভাষ আমায় বলল—কথা আছে।

কিন্তু মোটর দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়েছে অথচ সুভাষ সমানই নিশ্চুপ।

আমি (অবশেষে): কী হয়েছে সুভাষ? এত অন্যমনস্ক?

সুভাস (চমকে আমার দিকে তাকিয়ে): বলব একটা কথা?

আমি: কী?

সুভাষ (আমার বাহুমূলে হাত রেখে): দিলীপ তোমাকে একটা অনুরোধ করতে চাই, রাখবে?

আমি: কী?

সুভাষ: আশ্রমের অজ্ঞাতবাসে ফিরে যেয়ো না এখন। তোমাকে আমার বড় দরকার।

আমি (সবিস্ময়ে): সুভাষ! তুমি কী বলছ? আমাকে তোমার দরকার? আমাকে! তুমি হলে দেশের একজন মস্ত নেতা—কত তোমার সহায় সম্বল। আর আমি তো একজন অকেজো স্বপনী মাত্র—তুমিইতো বলো ঘড়ি ঘড়ি ঠাট্টা ক'রে। তাছাড়া কলকাতায় থাকলেও কবারই বা তোমার সঙ্গে দেখা হয় বলো?

সুভাষ (আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে): বেশি দেখা নাই বা হ'ল। তুমি জানো না আমাকে কিসের মধ্যে থাকতে হয়—কপট, চক্রী ও ধাপ্পাবাজরাই আমাকে ঘিরে থাকে বেশির ভাগ। তুমি কলকাতায় থাকলে আর কিছু না হোক, মনে আমার

এই ভরসাটুকু থাকবে যে আমার কাছাকাছি একজন মানুষ অন্তত আছে, যার কাছে গিয়ে আমি মনের সব কথাই খুলে বলতে পারি।

ওর এই একটা কথা আমার মনকে যে কীভাবে নাড়া দিয়েছিল ব'লে বোঝাতে পারব না কিছুতেই। তাই শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হই যে, মানুষ যতই বীর ও স্বাবলম্বী হোক না কেন, মহৎ হ'তে হ'লেই তাকে নিঃসঙ্গতার গভীর দুঃখকে বরণ ক'রে নিতে হবেই। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর ছন্দোময়ী ভাষায়ঃ

Whoever is too great must lonely live,
Adored, he walks in mighty solitude.
Vain is his labour to create his kins,
His only comrade is the Strength within,

অর্থাৎ—

মহত্ত্বে মহিমময় যেই হোক—বিনিঃসঙ্গ রবে,
সর্বপূজ্য হয়ে তবু রবে মহাবিজনবিলাসী ;
আপনার সহধর্মী গড়িতে সে বৃথা চায় ভবে
শুধু এক সাথী তার—অন্তঃশক্তি গহননিবাসী।

এ-চতুষ্পদীটি সুভাসের সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে খাটে।

সুভাষের সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই বলবার আছেঃ তার নানা গুণের, নানা শক্তির, কর্মপ্রতিভার, চরিত্রের অচলপ্রতিষ্ঠতার—আরো কতো কী। কিন্তু এ-স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্য নয় তার জীবনী লেখা। আমি চেয়েছি তার মহত্ত্বকে আমি যে-চোখে দেখেছি সেই দৃষ্টিভঙ্গিটি ফোটাতে—তর্পণের সহজ আনন্দেই বলব।

শেষে শুধু একটি কথা জানাতে চাই। কথাটি নিতান্ত ব্যক্তিগত হ'লেও স্মৃতিচারণে ব্যক্তিগত কথার অবতারণা অন্তত অপ্রাসঙ্গিক নয়। তাই বলি নিঃসঙ্কোচেই।

কথাটা—বা প্রশ্নটা এই যে, সুভাষের কাছ থেকে আমি আমার জীবনে সব চেয়ে বড় যে-দানটি পেয়েছি তার কী নাম দেওয়া যায়? যে-কোনো মহাজনের চরিত্রের নানা দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহীতা ভিন্ন ভিন্ন রসদ পায়, কে না জানে? আমি ওর কাছে পেয়েছি অনেক সম্পদ, প্রাণশক্তি, স্বপ্নবৈভব—যার কিছু হদিশ দেবার চেষ্টা করেছি এ-স্মৃতিচারণে। কিন্তু আমার কাছে ওর সবচেয়ে বড় দান—ওর পবিত্র চরিত্রের একান্ত সন্ন্যাসী প্রভা যাকে আমি দিব্য প্রভাই নাম দিতে চাই।

সুভাষকে আমি কিছুতেই শুধু মহৎ কর্মী বা দেশভক্ত উপাধি দিতে পারি না। সে মহৎ কর্মী, মহৎ বন্ধু, মহৎ দেশভক্ত, মহৎ স্বপনী—সবই সত্য। কিন্তু আমার চোখে তার মহত্তম রূপ হ'ল তার অন্তরাত্মার অধ্যাত্ম জ্যোতি। তাই আমি কিছুতেই মোহিতলাল মজুমদারের মতাবলম্বীদের কথায় সায় দিতে পারি না যে, দেশের নেতাজি এই উপাধিই তার সর্বোচ্চ উপাধি। কারণ আমি আশৈশব বিশ্বাস ক'রে এসেছি যে, মানুষের সবচেয়ে বড় আদর্শ ধর্মব্রতী হওয়া এবং কোনোদিনই বিশ্বাস করতে পারিনি যে, রাজনীতির কুরুক্ষেত্রে পুণ্যতম ধর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব।

সুভাষ আমার কাছে বরেণ্য এজন্যে নয় যে, সে স্বভাবে ছিল বীর ও কর্মিষ্ঠ, এজন্যেও নয় যে সে আমাদের দেশবাসীর চোখে ত্যাগের মহৎ প্রেরণার প্রতীক হয়ে ফুটে উঠেছিল, এমন কি এজন্যেও নয় যে তার সৈন্য গঠনের ফলে ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে অসন্তোষ চারিয়ে যাওয়ার দরুণই ইংরাজ কর্তৃপক্ষ স্থির করেন যে ভারতকে স্বাধীনতা না দিলেই নয়। একথা বলছি এই জন্যে যে, অনেকে মনে করেন যে, ভারতের স্বাধীনতা শুধু মহাত্মা গান্ধিরই দান। আমি বলতে চাই সুভাষের বিদ্রোহ ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে সংক্রামক হয়ে না উঠলে শুধু মহাত্মা গান্ধির নিরীহ সত্যাগ্রহে ভয় পেয়ে ইংরাজ বলত না তখনই.(পিতৃদেবের ভাষায় অনুষ্টুপ ছন্দে)।

> উঠিবে উঠিবে এরা ঠেকানো বড় দুষ্কর।
> বুঝি বা এখন শ্রেয়ঃ মানে মানে পলায়ন।

তাই সুভাষকে ভারতের রাজনৈতিক মুক্তিসাধকদের অন্যতম ব'লে তাকে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েও বলব—এইই তার ব্যক্তিরূপের শ্রেষ্ঠ কীর্তি নয়। অর্থাৎ সে দেশের মুক্তি-সেনানীদের মধ্যে একজন পুরোধা হ'লেও তার সবচেয়ে বড় দান এ-রাজনৈতিক আখড়ায় নয়। সুভাষকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বরেণ্যতম মনে করি এই জন্যে যে, রাজনীতির আখড়ায় এযুগে ভারতের যত মহাজন অবতীর্ণ হয়েছেন তাদের মধ্যে এক শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া সুভাষের অধ্যাত্ম সত্তাই ভারতের আত্মার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ—ভারতের অধ্যাত্ম সত্তার অন্তরের রূপ তার শিবনেত্রে যেভাবে ফুটে উঠেছিল রাজনৈতিকদের মধ্যে আর কারুর নেত্রেই ভারতের সে রূপটি ফুটে ওঠে নি।

এইখানেই তার ব্যক্তিরূপ উত্তীর্ণ হয়েছিল ভারতের আত্মিক দৃষ্টির পরম শিখরলোকে; তাই সে বলেছিল তার যৌবনেই (আশ্বিন ১৩৩৩, তরুণের স্বপ্ন):

"ভারতের একটা বাণী আছে যেটা জগৎসভায় শোনাতে হবে।...তাই ভারতের মনীষিগণ কত তমোময় যুগের মধ্যেও নির্নিমেষ নয়নে ভারতের জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। · ভারতের এই মিশনে যার বিশ্বাস আছে সেই ভারতবাসীই শুধু বেঁচে আছে।...দেশান্তরে কারাবাসে যখন মাসের পর মাস কাটিয়েছি তখন প্রায়ই এই প্রশ্ন আমার মনে উঠত: 'কিসের উদ্দীপনায় আমরা কারাবাসের চাপে ভগ্নপৃষ্ঠ না হয়ে আরো শক্তিমান্ হ'য়ে উঠছি।' নিজের অন্তরে উত্তর পেতাম: 'ভারতের একটা গৌরবময় ঐতিহ্য আছে, সেই ভবিষ্যৎ-ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির এই ইতিহাস আমরা রচনা করছি এবং করব।" এ-বিশ্বাস তার শেষ জীবনে আরো ভাস্বর ও গভীর হ'য়ে উঠেছিল- বিদেশে দুঃখবরণের ভূমিকায়। তাই সে তার শেষ জীবনে টোকিয়োতে ঘোষণা করেছিল যে, ভারতের সনাতন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভিৎ-এ এক নব ধর্মবীর জাতির গঠনই তার জীবনসাধনার পরম লক্ষ্য। আর এ-স্বপ্ন তার তৃতীয় নয়নে মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল এই জন্যেই যে মৃন্ময়ী ভারতমাতার মধ্যে চিরচিন্ময়ীকে দেখবার ধ্যানদৃষ্টি ছিল তার সহজাত। তাই আমরণ ছিল সে শক্তিসাধক—কৈশোরেও গঙ্গাজলে নেমে আবৃত্তি করত স্বামী বিবেকানন্দের Kali the Mother—

Who dares misery, loves
And hugs the form of Death,
Dances in Destruction's dance,
To him the Mother comes.
নির্ভয়ে যে বরি' যন্ত্রণায়
প্রেমে করে মৃত্যু আলিঙ্গন,
নাচে মহাকাল-নৃত্য সাথে
তারে করে জননী বরণ।

সুভাষ যখন ১৯৪১এ নিয়তির করাল ভ্রূকুটি উপেক্ষা ক'রে কাবুল হয়ে একাই অকুতোভয়ে "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার" * অতিক্রম করতে উদ্যত হয় দেশমাতার মুক্তিসাধনার ব্রত বরণ ক'রে, যখন দেশে চারিদিকে নিরাশা ও জগতে বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল গর্জনে বিশ্বমন উদ্‌ভ্রান্ত, তখনও যে সে অভীঃ মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ

* কাজির এই গানটি আমরা প্রায়ই গাইতাম চ্যারিটি কন্সার্টে—আরো এইজন্যে যে গানটি ছিল সুভাষের একটি অতি প্রিয় গান।

করেছিল সে মহাকালারই কৃপায়, যাঁর সে নিত্য উপাসক ছিল বরাবরই। (শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ আমাকে বলেন ১৯৫০ সালে যে, সুভাষ মান্দালয়েও রোজ কালীর ধ্যান করত)।

সুভাষের মহাপ্রয়াণের পরে কলকাতায় আমার দেখা হয় তার সহযাত্রী হবিবুর রহমানের সঙ্গে। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে সুভাষ তার শেষ নিশ্বাসের সময় উচ্চারণ করেছিল শুধু একটি কথা: "মা!"

একথা আমি অবিশ্বাস করি নি। কারণ, বলেছি, সুভাষকে আমি দেশভক্ত ও মহৎ ব'লে বরাবরই গভীর শ্রদ্ধা ক'রে এলেও চিরদিন মনে মনে প্রণাম ক'রে এসেছি কেবল সেই বরেণ্য বীরোত্তমকে যে মহাকালীর কৃপায়ই অভীঃ-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে জীবন সাধনায় তিলে তিলে সে মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করার রক্তস্বাক্ষর রেখে গেছে তার অন্তিম মুহূর্তের পরম শরণাগতির সাক্ষ্যে। তার এই রূপটির কথা মনে ক'রেই আমি তার তর্পণে মহাজাতি-সদনে গেয়েছিলাম:

"মন্ত্র সাধন শরীর পাতন"—জপি' যে-প্রাণোচ্ছল
চাহিল দেশের মুক্তিব্রত যাপিতে অমিতবল,
সুখের দুলাল যে-দুরভিসারী
হ'ল দুঃখের, ত্যাগের পূজারী,
"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য"—গাহিয়া অচঞ্চল:
সে-তোমারে করি প্রণাম হে মহামহিম, অমিতবল!

দেখেছি আমরা কান্তি যাহার—বিকচ ইন্দীবর,
শুনেছি যাহার যৌবনবাণী—বৈরাগ-সুন্দর,
অমিতাভ তেজে বরি' যে পাবক,
লভিল উপাধি—'দেশের নায়ক',
মন্থি' মরণসিন্ধু ছানিল অমরণ-শতদল:
সে-তোমারে করি প্রণাম হে অপরাজেয় অমিতবল!

বারো

সুভাষের সম্বন্ধে যখন এত কথাই লিখলাম* তখন আরো একটু লিখতে হবে, বিশেষ করে তার বিরুদ্ধে কয়েকটি দুর্নামের প্রতিবাদে। আমি প্রথম থেকেই বলেছি যে আমার মন চিরদিনই অস্বস্তি বোধ ক'রে এসেছে তার মতন আধ্যাত্মিক আধারকে রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে নামতে দেখে। তার সঙ্গে আমার প্রায়ই তর্ক বাধত প্রধানত এই নিয়ে যে সে বলত: রাজনীতিতে বিবেকী দেশভক্তরা না ঢুকলে দেশসেবা সুসমাহিত হবে না কোনো দিনও—আমি বলতাম: মানুষ তার জীবনের সর্বোচ্চ বিকাশ করলে তবেই শ্রেষ্ঠ দেশসেবা হবে। বলেছি, আমরা পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরোপুরি সমর্থন করতে না পারা সত্বেও শ্রদ্ধা করতাম বরাবরই। তবু একথা আমি সুভাষকে প্রায়ই বলতাম যে রাজনীতির পিছুটান বড় সর্বনেশে কেন না দলাদলি ছাড়া রাজনীতি হয় না আর মহৎ মানুষ স্বভাবতঃই দলাদলি করতে বাধ্য হ'লে খানিকটা আত্মগ্লানি বোধ না ক'রেই পারে না। এই দলাদলি সুভাষকেও করতে হয়েছিল—যার ফলে সময়ে সময়ে তার সর্বোচ্চ আদর্শকে খানিকটা পাশ কাটিয়ে যেতেই সে বাধ্য হয়েছিল—সে মানুষ তো—তাই ভুলভ্রান্তি করেছিলও একাধিক। কিন্তু মতিভ্রম বা বিচারের ভুল—errors of judgment—আর মিথ্যাচার দুষ্প্রবৃত্তি এক কোঠায় পড়ে না। সুভাষ তার ছোট বড় নানা ভুলচুক সত্বেও শেষ পর্যন্ত সত্যাশ্রয়ী ছিল ও দেশৈকান্তব্রত ছিল, যাই করুক না কেন দেশের হিতৈষণাই ছিল তার মূল প্রেরণা। কলকাতায় আমার হবিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি সুভাষের সহযাত্রী ছিলেন যখন সুভাষের বিমান তাইহোকু-তে ১৮ই আগষ্টে [১৯৪৫] ধ্বসে পড়ে। তিনি আমাকে বলেন যে সুভাষ বিষম আহত হ'য়েও জ্বলন্ত বিমান থেকে বাইরে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু তার মাথায় এমনই গুরুতর আঘাত লেগেছিল যে তার পরেই সে মূর্ছা যায়। হাঁসপাতালে সুভাষের শেষবার যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন সে হবিবুর রহমানকে বলে: "হবিব! আমার ডাক এসেছে। সারা জীবন আমি আমার দেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করেছি, শেষে প্রাণ পর্যন্ত দিতে হ'ল। তুমি গিয়ে শুধু আমার দেশবাসীকে বোলো—যেন তারা স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ ক'রে চলে—ভারত স্বাধীন হবেই—অদূর ভবিষ্যতে।"*

* সুভাষের সেক্রেটারি এস এ আইয়র Unto Him A Witness ব'লে একটি চমৎকার জীবনী লিখেছেন, তাতে হবিবুর রহমানের রিপোর্ট থেকে সুভাষের এই অন্তিম বাণী উদ্ধৃত করেছি—১১৪ পৃষ্ঠা। মৃত্যু শিয়রে জেনেও সে দেশের ছাড়া আর কোনো কথা ভাবেনি—কেবল শেষ মুহূর্তে বলেছিল "মা!"

মানুষকে বিচার করা চলে না এমন কথা আমি নিশ্চয়ই বলতে চাই না। মহত্ত্বের মূল্য নির্ণয় করতে হ'লেও বিচারবুদ্ধিকে সজাগ রাখা চাই বৈ কি, কিন্তু সেই সঙ্গে আরো একটু বলতেই হবে: যে, যে-মানুষের জুড়ি এ জগতে কোটিতে গোটিক হয় তাকে বিচার করতে হ'লে একটু সাবধানে ও সসম্ভ্রমে করাই ভালো।

একথা কেন বলছি বোঝাতে হ'লে একটু ভূমিকা করতে হবে। কিছুদিন আগে সাইপ্রাস থেকে Hugh Toye ব'লে এক মিলিটারি সাহেব আমাকে লেখেন যে সুভাষ সম্বন্ধে তিনি একটি বই লিখছেন—তাতে আমার লেখা The Subhas I Knew বইটি থেকে নানা উদ্ধৃতি দিতে চান। এ বইটি সম্প্রতি বেরিয়েছে ইংলণ্ডে, নাম—The Springing Tiger. সাহেব আমাকে লিখেছেন [২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯] "I am today posting you a copy of THE SPRINGING TIGER with acknowledgement of your help and in particular the help of your book, THE SUBHAS I KNEW. I hope you will enjoy reading it and that you will find it not an inadequate portrait of your old friend"

এতে টোয় সাহেব সুভাষের গুণাবলি স্বীকার করা সত্ত্বেও তাকে যারা কাছ থেকে দেখেছিল জেনেছিল চিনেছিল তারা কেউ খুশি হবেন ব'লে মনে হয় না কেন না সুভাষের চরিত্রের মূলগত মহত্ত্ব ত্যাগ ঐকান্তিকতা ও পবিত্রতাকে সাহেব শুধু যে ঠিক চোখে দেখতে পারেন নি তাই নয় তাকে অহংকৃত ও ইংরেজবিদ্বেষী বলেছেন গা-জোয়ারি ঢঙে।

অহংকার যিনি সম্পূর্ণ জয় করেছেন তাঁর নাম জীবন্মুক্ত। সুভাষ জীবন্মুক্ত ছিল না, কাজেই অহংকার তার নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সাহেব তার যে ছবি এঁকেছেন তাথেকে তাকে যাঁরা জানতেন না তাঁদের মনে হবেই হবে যে সে ছিল আসলে দাম্ভিক শক্তিকামী দলপতি যে ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়েছিল মদমত্ত হয়ে। এ-ধারণা যাঁদের কাছে সত্য মনে হয় তাঁরা সাহেবকে বাহবা দিতে পারেন, কিন্তু যাঁরা সুভাষকে চিনতেন তাঁরা বলবেনই বলবেন যে সাহেব সুভাষের প্রতি ঘোর অবিচার করেছেন এই জন্যে যে বৃটিশদের বেয়াদবিকে সে বেয়াদবি ব'লেই সাজা দিতে চেয়েছিল।

মানুষ প্রায়ই মানুষের প্রতি অবিচার ক'রে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ একবার আমাকে লিখেছিলেন যে তিনি নিজেও তাঁর বহু সমালোচকের হাতে এত বেশি

দণ্ডিত হয়েছেন সেই সব অপরাধের জন্যে যা তিনি করেন নি যে, মানুষের বিচারের দ্বার' তিনি আদৌ প্রভাবিত হ'তে চান না। গুরুদেবের সমালোচকদের এ-সমালোচনা যে সত্য ভুক্তভোগী মাত্রেই স্বীকার করবেন—যাঁরা জানেন মানুষ কত সহজে অপরের কাছে তাই প্রতিপন্ন হয় যা সে নয়।

কিন্তু আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছে সাহেবের এই যুক্তিতে যে সুভাষ যে স্বভাবে উদ্ধত ও দাম্ভিক ছিল তার একটি মস্ত প্রমাণ—সে গান্ধিজিকেও মানে নি। পড়তে পড়তে আমার হাসি এসেছিল রামপ্রসাদী ঢঙে :

দিন দুনিয়া এমনি বটে

সব ছাড়ে যে সবার তরে তার ভাগ্যেও কুযশ রটে!

আর এখানে কুযশের হেতু কি? না মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে মতান্তর। সাহেবি স্বভাব বিচিত্র বৈ কি : নৈলে যে-গান্ধিজির নাম শুনলেও এক সময়ে সাড়ে পনর আনা ইংরাজ অগ্নিশর্মা হ'য়ে উঠত, যা তা বলে হাসাহাসি করত সেই গান্ধিজি আজ তাদের কাছে হয়ে উঠলেন এমনই অভ্রান্ত মানুষ যাঁর সঙ্গে মতানৈক্য হ'লেও সেটা হয়ে দাঁড়ায় দাম্ভিকতা! আমার স্পষ্ট মনে আছে দেশবন্ধু যে দেশবন্ধু—যিনি গান্ধিজিকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করতেন তিনিও চৌরিচৌরার সামান্য রক্তপাতের দরুণ গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করাতে আফশোষে অধীর হ'য়ে উঠেছিলেন, বলেছিলেন গান্ধিজির এই ভুল চালের জন্যে ভারতের স্বাধীনতার দিন পেছিয়ে গেল। শ্রীঅরবিন্দ ও তিলকের মতন সুভাষও কোনোদিনই অহিংস আন্দোলনকে মনে প্রাণে অঙ্গীকার করেনি, কাজেই তার পক্ষে এসম্বন্ধে গান্ধিজির নানা মূলসূত্র গ্রহণ করলেই সেটা হ'ত মিথ্যাচার। অপি চ, আমি ইতিপূর্বে দেখিয়েছি গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন ফলপ্রসূ হয়েছিল প্রধানত দুটি কারণে : এক, বিপ্লবীদের বোমার ভয় ইংরেজদের মনে বরাবরই ছিল, তারা মহা দুর্ভাবনায় প'ড়ে গিয়েছিল কখন কী হয়—ফের আর এক সিপাহি বিদ্রোহ হ'লে না জানি কী হবে ইত্যাদি জল্পনা কল্পনায় তাদের মনে মহা আতঙ্ক হয়েছিল ঠিক যখন সুভাষ মালয়ে আই এন এ সৈন্যদল গঠন ক'রে ইমফালে হানা দেয়। ইম্‌ফালে সুভাষের সৈন্য জয়লাভ করল ব'লে—এই দুশ্চিন্তায় আমাদের দেশে ইংরেজদের সে সময়ে রাত্রে আতঙ্কে ঘুম হ'ত না। তার পরই দিল্লিতে বিখ্যাত আই এন এর বিচারে শাহনওয়াজ, ধিলন, সাইগল প্রমুখ সেনানায়কদের প্রতি সহানুভূতির দরুণ ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ জেগে ওঠে। এ বিদ্রোহিতা যে দেখতে দেখতে কী ভাবে ব্যাপক হ'য়ে উঠেছিল

সে ইতিহাস সবাই জানেন, কাজেই তা নিয়ে তর্কবিতণ্ডার অবতারণা বাহুল্য। আমি এ-প্রসঙ্গের উল্লেখ করলাম শুধু এই জন্যে যে নব মহাযুদ্ধের পর যখন চার্চিল সদাপটে ঘোষণা করেন: "I have not come to preside over the liquidation of the British Empire", তখন শুধু যে অলক্ষ্যে বিধাতা হেসে-ছিলেন তাই নয়, সুভাষও হেসে বলেছিল: "চলো দিল্লি।"

যুদ্ধের ফলাফল চিরদিনই অনিশ্চিত। নিশ্চিত হারব জেনেও বড় কেউ যুদ্ধ করে না। সুভাষ ও আরো অনেক রণনায়ক সে যুগে ভাবতেন সুভাষ জাপানের সাহায্যে ভারতে হানা দিল ব'লে। দুঃখের বিষয় জাপানীরা তাকে সে-সাহায্য করতে পারে নি যা করবে ব'লে তারা কথা দিয়েছিল। যদি সুভাষ সে-সাহায্য পেত তবে ভারতের স্বাধীনতা লাভ হ'ত হয়ত অন্য উপায়ে। হয়ত বলছি এই জন্যে যে, এ সম্বন্ধে কেউই জোর করে কিছু বলতে পারে না। সুভাষ যদি সে সময়ে ইম্ফাল অধিকার করত—প্রায় করেছিল একথা ইংরাজরাও মানেন—তাহ'লে সুভাষের সামরিক প্রতিভা হিউ টোয় সাহেবের চোখে সম্পূর্ণ অন্য রঙে প্রতিভাত হ'ত, তিনি বলতেন না তাকে দাম্ভিক কি হঠকারী। তবে ইংরাজ সমালোচকদের আমি খুব দোষও দিই না। কারণ ইংরাজ স্বভাবে সাবধানী, জর্মন বা জাপানীদের মতন রোখালো নয়, কি আমেরিকা বা রুশদের মতন জাঁকালো নয়। তারা খানিকক্ষণ সঘনে তর্জন গর্জন করে বটে, কিন্তু যখন দেখে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তখন বলে "ব্যস্ ভাই তুমভি মিলিটারি, হমভি মিলিটারি।" তাই তো আজকের দিনে গান্ধিজির জয়ধ্বনি বেজে উঠেছে বিলেতের সেই সব সাহেবেরই মুখে যারা একদিন সঘনে হাততালি দিয়েছিল যখন চার্চিল গান্ধিজিকে "উলঙ্গ ফকির" বলে ঘোষণা করেছিলেন প্রকাশ্য পার্লামেণ্টে।

সুভাষ গান্ধিজিকে শ্রদ্ধা করত না একথা সত্য নয়। তবে একথা সত্য যে বিখ্যাত ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধিজি সদলবলে ওর উপর ঘোর অবিচার করার দরুণ ও তাঁর উপর খানিকটা বিরূপ হয়েছিল—শুধু সুভাষ নয় বহু চিন্তাশীল বাঙালিই গান্ধিজির অবিচারে আহত হয়েছিলেন। তবুও স্বভাবে মহৎ মানুষের মতনই নিজের ব্যক্তিগত ক্ষোভ ভুলে সে রেঙ্গুন থেকে রেডিও বার্তায় মহাত্মাজিকে যে দীর্ঘ আবেদন জানায় তার ছত্রে ছত্রে ওর দেশের পরাধীনতার জন্যে গভীর বেদনার সঙ্গে ফুটে উঠেছে মহাত্মাজির প্রতি শ্রদ্ধা। এ রেডিও বার্তা শুনে সে-সময়ে বহু ভারতীয়ই চোখের জল ফেলেছিল সুভাষের গভীর আন্তরিকতায় বিচলিত হয়ে। আইয়ার-এর

Unto Him A Witness বইটির শেষে তিনি সুভাষের মর্মস্পর্শী ভাষণটি ছেপেছেন —তাথেকে একটু উদ্ধৃত করি :

(আমাদের দেশে সুভাষের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে অনেকেই সে সময়ে সুভাষকে 'রণছোড়' ব'লে ব্যঙ্গ করেছিলেন—বাহাদুরি আছে বটে তাঁদের সৎসাহসের—যে-সুভাষ দেশের জন্যে শুধু যে দেশত্যাগী হ'ল তাই নয়, অকালে প্রাণ হারালো বিদেশে বিভুঁয়ে—তাকে রণছোড় বলা ! সুভাষ এ-দুর্নামের প্রতিবাদে ওর ভাষণে মহাত্মাজির কাছে যা পেশ করেছিল তার মাত্র দুটি প্যারাগ্রাফের অনুবাদ দিচ্ছি এখানে)

"ভারতবর্ষ থেকে এযাবৎ যে ভাবে আমি আমার কাজ ক'রে এসেছিলাম সেভাবে কাজ ক'রে চলা আমার পক্ষে খুবই সহজ ছিল। যতদিন মহাযুদ্ধ স্থায়ী হয় ততদিন আমাদের দেশের কোনো জেলে কাল কাটানোও আমার পক্ষে কঠিন ছিল না—বা কাটালে আমার কোনো ক্ষতিই হ'ত না। আমার দেশবাসীদের ঔদার্য ও প্রীতির দৌলতে আমি দেশে থাকতেই পেয়েছিলাম সর্বোচ্চ সম্মান। আমি একটি পার্টিও গ'ড়ে তুলেছিলাম যার সভ্যরা ছিল আমার বিশ্বস্ত সহকর্মী।

"এরূপ ক্ষেত্রে বিদেশে গিয়ে এক সাংঘাতিক অসাধ্য-সাধনে ব্রতী হ'য়ে আমি যে শুধু আমার ভবিষ্যৎ বিপন্ন করেছি তাই নয়, আমার পার্টির ভবিষ্যৎকেও বিপন্ন করেছি। যদি বাইরের সাহায্য না পেয়ে দেশের স্বাধীনতা পাবার আশা আমার কাছে দুরাশা মনে না হ'ত তাহ'লে দেশের সংকটলগ্নে আমি কখনই দেশছাড়া হতাম না। যদি আমার জীবদ্দশায় বর্তমান যুদ্ধের মতন স্বর্ণসুযোগ আর একবার আসা সম্ভব হ'ত তাহ'লেও দেশ ছেড়ে আমি অজানার অভিসারে পাড়ি দিতাম না।······

মহাত্মাজি ! আপনাকে আমি এবং আমার সহকর্মীরা সবাই নিশ্চয় করে জানাতে চাই যে আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে মনে করি আমাদের জাতির সেবক। আমরা আমাদের দুঃখ বেদনা ও সর্বত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ চাই শুধু একটি জিনিষ—আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা।···যে-উদ্দীপনা আমাদের রক্তে আজ জেগে উঠেছে সে বলে যে স্বাধীন ভারতে ঝাড়ুদার হওয়াও ইংরেজের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হওয়ার চেয়ে বেশি সম্মানজনক।

"ভারতের স্বাধীনতার জন্যে শেষ যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা ভারতের মাটিতে মহাতেজে যুদ্ধ করছে এবং বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এগিয়ে চলেছে—ধীরে ধীরে।

"আমাদের জাতির জনয়িতা! ভারতের স্বাধীনতার জন্যে এই ধর্মযুদ্ধে আমরা আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি। জয়হিন্দ!"

("Father of the nation! In this holy war for India's liberation we ask for your blessings and good wishes. Jai Hind!)

টোয় সাহেব সম্ভবত সুভাষের এই মনোভাবকে ইংরাজ-বিদ্বেষ বলেছেন যে স্বাধীন ভারতে ঝাড়ুদার হওয়াও ভালো কিন্তু ইংরাজের অধীনে রাজপদও গ্লানিকর। কিন্তু তবু তিনিও সুভাষের চারিত্রশক্তির অপ্রতিপাদ্য মহত্ত্বের তর্পণে লিখেছেন—ইম্ফালের যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের পরাজয়ের পরে একটি বর্ণনায়:

"সুভাষ বসু.মিটাং নদী পর্যন্ত শেষ দশ মাইল পায়ে হেঁটেই গিয়েছিলেন···প্রতি বিশ্রামস্থলেই সবার সাথী হ'য়ে কতজন ফিরল মাথা গুনে ঠিক করা, দুর্বল ও ক্লান্তদের তদারক করা, ফেরির নির্দেশ দেওয়া, নিজ হাতে যান-বাহনের ব্যবস্থা করা—সবই করছিলেন তিনি অক্লান্ত ভাবে। তাঁর সঙ্গীরা যখন হেঁটে চলত তখন তিনিও ঘোড়ায় না চ'ড়ে তাদের সঙ্গে সমানে হেঁটেই চলতেন, বলতেন তোমরা কি ভাবো আমি বর্মার বা-মাও না কি যে, আমার সঙ্গীদের ছেড়ে আগে নিজের প্রাণ বাঁচাতে ছুটব?" আইয়ারও তাঁর Unto Him A Witness-এ লিখেছেন যে, সুভাষ ইম্ফালে নিজের জন্যে আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করতে দিত না বা সাধারণ সৈনিকেরা যা খেত তার বেশি গ্রহণ করত না। সাধে কি তার সম্বন্ধে শাহ্ নওয়াজ বলেছিলেন "যেদিন থেকে আমি তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলাম সেদিন থেকেই আমি তাঁর দ্বারা আশ্চর্যভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম। আজও আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি না তাঁর মধ্যেকার মানুষ, সৈনিক ও রাজনৈতিক কী ভাবে অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে ছিল। ঘরের মধ্যে তাঁর মধ্যেকার মানুষটিই সবচেয়ে বড় মনে হ'ত, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মধ্যেকার সৈনিক ব্যক্তি-রূপটি ভাস্বর মহিমায় প্রতিভাত হ'ত, সভাসমিতিতে তাঁর প্রোজ্জ্বল রাজনৈতিক রূপই আমাদের সবাইকে গভীর ভাবে মুগ্ধ করত।"

হিউ টোয় সাহেবের বই অনেকেই পড়বেন ও তিনি সাহেব ব'লে হয়ত অনেকেই এই সত্যটি ভুলে যাবেন যে তিনি সুভাষকে একটিবারও চোখে দেখেন নি। কাজেই —আমি বলতে চাই—সুভাষের নানা ব্যক্তিগত মহিমা ও অবিশ্বাস্য তেজস্বিতাকে তিনি সে-দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারেন নি—যে-দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখেছিল শাহনওয়াজ, সাইগল, ধীলন, এ সি চ্যাটার্জি আরো কত গুণগ্রাহী। আমার চিরদিনই মনে হয়েছে একটা কথা : যে কোনো মানুষের মহত্ত্বের যথার্থ পরিমাপ করা কঠিন হ'য়ে ওঠে তাকে নানা দৈনন্দিন ও ছোটখাট ঘটনার মধ্যে দিয়ে না জানলে। তাই সুভাষকে আমি প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে নানা পরিবেশে দেখে তার মহত্ত্ব সম্বন্ধে যে-ধারণা করেছি তার মূল্য টোয় সাহেবের ধারণার চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করি। এ-ধারণার সারমর্ম দিতে পারি এই ব'লে যে মানুষ মাত্রেরই ভুল ভ্রান্তি হ'তে বাধ্য একথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে, সুভাষের সঙ্গে সংস্পর্শে আসতে না আসতে সব আগে মনে হয় এই কথাটিই যে, এমন শুদ্ধ মহৎ আধার এ-ক্ষুদ্রতামলিন জগতে বেশি জন্মায় না। তার এই মহত্ত্বের পরিচয় পেয়েই রোলাঁ তাকে লিখেছিলেন তার Indian Struggle পড়ে : "It is an indispensable work for the history of the Indian Movement. In it you show the best qualities of the historian's lucidity and high equity of mind. Rarely it happens that a man of action as you are is apt to judge without party spirit."

এহেন মহৎ মানুষকে মহৎ ব'লে চিনতে না পারলে মহত্ত্বের ক্ষতি হয় না, ক্ষতি হয় শুধু তার, যে-অন্ধ আলোকে আলো ব'লে চিনতে পারল না অন্ধতার জন্যে। তাই সুভাষের মহত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত ক'রে এ-প্রসঙ্গের ইতি করি। তিনি লিখেছিলেন সুভাষকে :

"কর্তব্য ক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে; কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম ক'রে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি ক'রে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য ব'লে

মানোনি। তোমার এই চারিত্রশক্তিকেই বাংলা দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।"

স্মৃতিচারণের এলাকা একটু ছাড়িয়ে গেছি। কিন্তু সুভাষ ছিল সেই শ্রেণীর মানুষ যার সম্বন্ধে বলতে সুরু করলে থামা কঠিন হয়। তাই ঝোঁকের মাথায় স্মৃতিচারণের সীমা লংঘন করেছি এজন্যে দুঃখ করব না। বরং বলব যে এহেন মানুষের সম্বন্ধে অধিকন্তু ন দোষায় নীতিই প্রযোজ্য।

কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই এ-দুঃখ আমার কোনো দিনই যায় নি—যাবেও না—যে, তার মতন আধার বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ না ক'রে রাজনীতির পঙ্কিল পথে পা বাড়ালো, আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে নবজাতি গঠনের চিরন্তন আদর্শ ছেড়ে এমন সামরিক সাধনায় ওর বিরল প্রাণশক্তিকে বলি দিল যে-সাধনা ওর পক্ষে খানিকটা পরধর্মই বলব। একথা যুক্তিতর্ক দিয়ে খাড়া করা সম্ভব নয়, কিন্তু যাঁরাই ওকে একটু কাছ থেকে দেখেছিলেন তাঁদের অনেকের মনেই একযোগে এই কথা মনে হয়েছে—আর একবার নয়, বারবারই—যে সুভাষের সহজাত ঐকান্তিক নিষ্ঠা, চরিত্রবল ও আত্মিক শক্তি যদি রাজনৈতিক বিপ্লবের পথে না গিয়ে ধর্মের সংগঠনে আত্মনিয়োগ করত তাহলে ভারত ও বিশেষ ক'রে বাংলাদেশ ওর কাছ থেকে পেত সেই চিরন্তনের নিত্যপ্রেরণা যা আজও ভারতের আত্মাকে ধারণ ক'রে আছে। একথা ও নিজেও মনে মনে জানত, কিন্তু আমাদের দেশের দুর্গতির মূল হেতু রাজনৈতিক পরাধীনতা এই ধারণা বিংশ শতকে আমাদের জাতীয় মনে চারিয়ে গিয়েছিল ব'লে ও ওর প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরেই ওর আত্মিক শক্তিকে চালিয়েছিল রাজনীতির উত্তেজনার পথে, ভুলে গিয়ে যে যুগে যুগে দেশসেবা বা জনহিতও সাধিত হয়েছে সবচেয়ে সেই সব বিরল মহাত্মাদের দ্বারা যাঁদের আত্মার প্রার্থনা হয়ে এসেছে: "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—ভগবান আমাদের বুদ্ধিকে শুভের সঙ্গে সংযুক্ত করুন"—যাঁরা আবহমানকাল ব'লে এসেছেন (বিবেকানন্দের ভাষায়—বীরবাণী):

দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নিশিখা করি' আলিঙ্গন
হে প্রেমিক, স্বার্থ মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে করো বিসর্জন।
ভিক্ষুকের কবে বলো সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও—থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়
মন প্রাণ শরীর অর্পণ করো বন্ধু এ-সবার পায়।

বিবেকানন্দের এ-কবিতাটিও সুভাষের অতি প্রিয় ছিল। যাঁরা ভগবানকে উপলব্ধি করবার জন্যে সাধনা করেছেন তাঁদের সাধনার ফলে যে যুগে যুগে মানুষ সবচেয়ে বেশি পেয়েছে জ্ঞানের আলো, পথের পাথেয়, তৃষ্ণার জল, প্রাণের বীর্য—একথা সুভাষ নিজে অন্তরে গভীর ভাবেই অনুভব করেছিল। কিন্তু তবু সে তার অন্তরের সেরা ডাককে উপেক্ষা ক'রে যে-পথ নিয়েছিল সে-পথের ডাককে দেশের জন্যে বরণ ক'রে নিলেও তার মনে শেষ পর্যন্ত সংশয় ছিল সেই পথই ওর স্বধর্ম কি না। এ-সংশয় ওর একাধিক ব্যক্তিগত পত্রে ফুটে উঠেছে—তার মধ্যে দু একটি আমাকেই লেখা—পরে উদ্ধৃত করছি। এখানে শুধু এইটুকু ব'লে স্মৃতিচারণেই ফিরে আসি, বলি—ওর মধ্যে দেখেছিলাম ভক্তি করবার কী অসামান্য প্রতিভা, যার জন্যে আমার আজো মনে হয় ও স্বধর্মে ছিল ধর্মধারকই বটে, রণনায়ক নয়। ওর ভক্তির কথা তুললাম সব শেষে কেন না অধ্যাত্মপথের পরমতম বিকাশ ভক্তিতে ব'লে ভক্তি করবার শক্তি যার সহজাত তাকে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু ব'লে সনাক্ত করলে ভুল হবে না।—অবশ্য আমি এখানে বলছি সেই ভক্তির কথা যার প্রথম বিকাশ প্রাণের টানে, শেষ সার্থকতা আত্মদানে।

যে-মহাপ্রাণ মানুষকে সুভাষ তার গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিল বললেই হয়—যাঁকে ও দেবতার মতনই ভক্তি করত তাঁর নাম সবাই জানেন: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে ভারতীয় লোকনায়কদের মধ্যে তিলকের পরেই স্থান দিয়েছিলেন। তাই তাঁর সঙ্গে সুভাষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কিছু আভাষ দিয়েই আজ সুভাষতর্পণের সমাপ্তি টানব যুক্তিবাদ গবেষণা রেখে।

দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার আলাপ হয় তাঁর জীবনের শেষ কয় বৎসরে—১৯২৩এ আরম্ভ, ১৯২৫এ শেষ। মাঝে মাঝে সভাসমিতিতে দেখা হ'ত, কখনো বা সুভাষের সঙ্গে গিয়ে তাঁকে গানও শোনাতাম—তিনি আমার মুখে ভক্তির গান শুনতে বড় ভালোবাসতেন, বিশেষ ক'রে দুটি গান: গিরিশচন্দ্রের "রাঙা জবা কে দিল তোর পায় মুঠো মুঠো", আর পিতৃদেবের "ও কে গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়।"

একবার আমাদের থিয়েটার রোডের বাড়িতে তিনি পদার্পণ করেছিলেন—গানের আসরে। সে যে কী আনন্দের দিন ভুলবার নয়। মনে আছে সবাই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল যখন সৌম্য মহাজন আর এক সভা সাঙ্গ ক'রে প্রায় আধঘণ্টা দেরি ক'রে আমাদের সভায় উপস্থিত হলেন সুভাষের সঙ্গে। তারপর সে কী আনন্দ—গানের পর গান—গান শুনতে তিনি ক্লান্ত হ'তেন না।

একবার আমাকে সুভাষকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে বললেন তারকেশ্বরের কি একটা আন্দোলনে গান ক'রে কিছু টাকা তুলে দিতে হবে। রাজনৈতিক কাজে নামবার আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু একে সুভাষের অনুরোধ তার উপর দেশবন্ধুর আদেশ—রাজি না হ'য়ে করি কী? কিন্তু মনের সব অস্বস্তিই কেটে গেল যেই তিনি এলেন সভায়। দেশবন্ধু আসছেন শুনে লোকে লোকারণ্য—টিকিটের চতুর্গুণ দাম দিয়েও শ্রোতারা দাঁড়িয়ে ছিল কাতারে কাতারে। সেদিন বুঝেছিলাম সবপ্রথম-বাঙালি কেন দিয়েছিল তাঁকে "দেশবন্ধু" উপাধি।

কোনো সভায় গান ক'রে অত আনন্দ পাই নি এর আগে। মহাপ্রাণ মানুষের প্রভাব বুঝি এম্নিই: সবাইকেই মনে হ'ল অন্তরঙ্গ—দেশবন্ধুর বান্ধবতার ছোঁয়াচে। তাই গান ধ'রে দিলাম অতুলপ্রসাদের বিখ্যাত,

সবারে বাস রে ভালো (নৈলে) মনের কালো ঘুচবে না রে!,
আছে তোর যাহা ভালো—ফুলের মতন দে সবারে।
ক'রে তুই আপন আপন হারালি যা ছিল আপন
এবার তোর ভরা আপণ বিলিয়ে দে মন, যারে তারে।

গানটি গাইবার পরে সুভাষ আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিল: "ঠিক গানই গেয়েছো দিলীপ, কেন না এ-বাণী অতুলপ্রসাদের কবিমনের ততটা নয় যতটা দেশবন্ধুর প্রেমিক মনের।"

সবশেষে দেশবন্ধুকে সুভাষ ধরল কিছু বলতেই হবে। দেশবন্ধু মঞ্চে উঠে অনেক কিছুই বলেছিলেন। সব কথা মনে নেই তবে এইটুকু মনে আছে যে তিনি সবাইকে খুব হাসিয়েছিলেন তাঁর একসময়ে গান শেখার রোখ চাপার ইতিহাসে। বললেন: "গান শিখতামই শিখতাম কিন্তু পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকল বলেই শেখা হ'ল না, নৈলে আজ আমি গান গেয়ে দিলীপকে কানা ক'রে দিতাম।"

তাঁর সঙ্গে আরো একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশবার সুযোগ পাই পাটনার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার পি, আর দাশ-এর বাড়িতে। সেখানে তাঁকে একটু নিরিবিলি পেয়ে ও তাঁর সঙ্গে বিশেষ ক'রে কাব্য ও গানের আলোচনা করে সে যে কী গভীর আনন্দ পেয়েছিলাম কী বলব? সেখানে তাঁর মুখেও শুনি "ডাকাতে ক্লাবের" কথা—যাঁর সভ্যদের কীর্তিকলাপের কথা ইতিপূর্বে বলেছি।

একদিন (পাটনায়) কথায় কথায় বললেন: "দিলীপ, তুমি তোমার বাবার

ভক্তির গান, স্বদেশী গান, প্রেমের গান তো শোনালে, কিন্তু তাঁর হাসির গান? গাও না কোথাও?"

আমি: গাই। কোন্‌টি শুনতে চান!

দেশবন্ধু: প্রথম যখন বিয়ে হ'ল ভাবলাম বাহা বাহারে—গানটি জানো?

আমি "জানি" ব'লেই সলজ্জে গানটি গাইলাম। শেষ স্তবকে ছিল:

দেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে হ'লে আরো পরিচয়
উর্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয়।
বরং শেষে মাথার রতন লেপ্‌টে রইলেন আঠার মতন
বিফল চেষ্টা বিফল যতন স্বর্গ হ'তে হ'ল পতন
রচেছিলাম যাহারে।

এক শ্রদ্ধেয়া মহিলা ছিলেন সে সভায় বললেন: "আহা, ও-বেচারিকে দিয়ে এ গান গাওয়ানো কেন?"

দেশবন্ধু হো হো করে হেসে বললেন: "বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া যে, ভুলছেন কেন! জের টেনে চলতে হবে না? বাঃ!" ব'লেই চোখ মিট মিট করে: "কিন্তু এই শেষের দিকটায় দিলীপ তুমি তাঁর মতন গাইতে পারলে না।—তবে এ জন্যে তোমাকে দোষ দিচ্ছি ভেবো না, কেন না এ-গানে ভাব জমে না ভুক্তভোগী না হ'লে।"

বৈষ্ণব পদাবলী ও ভক্তিরস নিয়েও একদিন আলোচনা হয়েছিল—তবে তিনি কী বলেছিলেন মনে নেই। কেবল এইটুকু মনে আছে যে পিতৃদেবের "মন্দ্র" গ্রন্থের "নবদ্বীপ" কবিতাটির তিনি উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করেছিলেন এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রতিভার সম্বন্ধে বলতে বলতে বেশ একটু উজিয়ে উঠেছিলেন।

যতদূর মনে পড়ে তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয় কলকাতায় যখন শ্রীপল্টু কর মহাশয়ের বাড়িতে এসে তিনি ছিলেন কিছুদিন। বাসন্তী দেবী আমাকে সেখানে ডাকতেন মাঝে মাঝে গান শোনাতে—সম্ভবতঃ ১৯২৫ এর গোড়ায়, কি ১৯২৪ এর শেষের দিকে। তখন দেশবন্ধু অসুস্থ। তবু সে কী প্রাণখোলা হাসি! এত টাকার বিলাস জাঁকজমক ছেড়ে পরের বাড়িতে "ক্ষণিকের অতিথি", তবু কী সৌম্য নির্ভাবনা—take no thought for the morrow নীতির জীবন্ত প্রসন্ন বিগ্রহ যেন। একদিন কথায় কথায় বলছিলেন "জানো দিলীপ, লোকে বলছে আমি নাকি আবার ভিতরে ভিতরে প্র্যাকটিস করবার মৎলব আঁটছি।" ব'লেই হেসে: "আমি

বলি—আচ্ছা দুদিন ধৈর্য ধ'রে দেখই না আমি ফের প্র্যাকটিস করি কি না—করলে চুটিয়ে বদনাম কোরো না হে—বদনাম রটানো তো আর পালাচ্ছে না। কলঙ্ক গায়ে না লাগলে কলঙ্কিনী নাম রটালে টিটিক্কার হবে কেন বলো দেখি? বোঝো না কেন?" ব'লেই ফের সে কী হাসি!

এর পরেই তাঁর দার্জিলিঙে বিশ্রাম নিতে যাওয়ার কথা ডাক্তারের তদারকে। আমাকে একদিন বললেন: "দিলীপ, আমি কেবল রাজনৈতিক নই, আমি কবি ও রসিক দুইই। তাই তোমার সঙ্গে কাব্য নিয়ে ধর্ম নিয়ে আরো অনেক কিছু নিয়েই আলোচনা করতে চাই। কিন্তু কলকাতায় সময় পাই না। তাই বলি কি, তুমি এক কাজ করো: দার্জিলিঙে এসো—আমার কাছেই থাকবে—দুদিন বেশ আসর জমানো যাবে। কেমন?

আমি উৎফুল্ল হ'য়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম: "এ তো আমার পরম সৌভাগ্য—যাব বৈ কি?

কিন্তু গ্রহের ফেরে কুক্ষণে গেলাম শিলঙে। সেখানেও দিতে হল এক চ্যারিটি কন্সার্ট। কন্সার্ট সেরে দার্জিলিং রওনা হব হব করছি—সে কী উল্লাস—ভাবছি দেশবন্ধুর অতিথি হব—আমি ভাগ্যবান্ বৈ কি, নৈলে এত সব মহাপ্রাণ মানুষের স্নেহাশিস পাই?—এমন সময়ে হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত—খবর এল দেশবন্ধু করেছেন মহাপ্রয়াণ। তারপর মনে পড়ে কলকাতায় যেদিন ট্রেণে তাঁর পুণ্যদেহ আনা হল সেদিন বাংলার আবালবৃদ্ধ-বনিতার অর্ঘ্য—কলকাতার রাস্তাঘাটে আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে সুরু করলাম নগরকীর্তন—দেশবন্ধু-তর্পণ গীতি:

এসেছিলে তুমি হে দেশবন্ধু তোমার অপার প্রাণ
করিতে নিয়োগ সবার সেবায়, ওগো চির মহীয়ান্
রাখিনি আমরা হে বীর তোমার মহামহিমার মান
তবু তুমি দিয়ে গেছ আমাদের তোমার শ্রেষ্ঠ দান।

মনে পড়ে সে-সময়ে বাংলার দুর্গতির কথা। সুভাষ ১৯২৪ সালে ২৫শে অক্টোবরে দ্বিতীয়বার জেলে যায়—ছাড়া পায় ১৬ই মে ১৯২৭এ। তাই বাংলাদেশের তখন ঘোর দুর্দিন—অনাথ অবস্থা। মনে আছে—শরৎদা প্রায়ই গাঢ় কণ্ঠে বলতেন: "আমাদের একমাত্র আশা সুভাষ। বাঙালি চেয়ে আছে মান্দালয়ের দিকে।" কেবল মনে হয় দেশবন্ধুর কথা যিনি বলতেন: আমার শ্রেষ্ঠ ধন সুভাষকে দিয়েছি, অপেক্ষা করো, তিনি তোমাদের সবই দেবেন।" আমি তাঁকে বলতাম আর্দ্র কণ্ঠে:

"সত্যি কথা। কেবল আমার কী মনে হয় জানেন? এরই নাম গুরুবাদ—মনে পড়ে পরমহংসদেবও তাঁর বিপুল তপঃশক্তি স্বামীজির মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে ঠিক এম্‌নি সুরেই বলেছিলেন 'তোকে আমার সব দিয়ে আজ আমি ফকির হ'লাম।" শরৎদা গুরুবাদী ছিলেন না কিন্তু একথা স্বীকার করতে তাঁর কোনদিনই বাধেনি যে সুভাষ দেশবন্ধুর কাছ থেকে বলবীর্য দৃষ্টিশক্তি পেয়েছিল তার ভক্তিরই ছোঁয়াচে। আমি একথা বলছি না অবশ্য যে দেশবন্ধু সুভাষের আধ্যাত্মিক দীক্ষাগুরু ছিলেন, কিন্তু একথা বলতে আমার মনে একটুও কুণ্ঠা বাজে না যে গুরুবাদ সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি সুভাষ অর্জন করেছিল দেশবন্ধুকে পূজা করতে শিখেই বটে। মানুষকে ভক্তি করাই হ'ল ভগবদ্‌ভক্তির শিক্ষানবিশি। বাইবেলে পড়েছিলাম যে-মানুষ তার নিজের ভাইকে ভালোবাসতে পারে নি যাকে সে চাক্ষুষ করেছে সে কেমন করে ভগবানকে ভালোবাসতে শিখবে যাঁকে সে কস্মিন্‌কালেও দেখে নি? বস্তুত দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষের গভীর সম্বন্ধ দেখে সে-সময়ে আমার মনে প্রায়ই একটি অনেকদিনের-চাপা আক্ষেপ জেগে উঠত: কবে আমারও লাভ হবে এমন একটি আশ্রয়? সময়ে সময়ে দেশবন্ধুর দেশসেবার ডাকে সাড়া দেবার ইচ্ছাও যে জাগত না তা বলব না, কেন না রাজনীতির একটা হৈ চৈ-এর দিক আছে যাতে আমাদের প্রাণশক্তি সহজেই সাড়া দেয়, কিন্তু যখন দেখতাম পার্টির জন্যে দেশবন্ধুকেও এমন অনেক কাজ করতে হ'ত যাতে তাঁর নিজের মনও সায় দিত না, তখন পেছিয়ে যেতাম।

কিন্তু তবু তাঁকে দেখলেও কেমন যেন ভক্তি আসত সহজেই। সুভাষকে একদিন একথা বলায় সে বলেছিল: "ভাই, দেশবন্ধুর কাছে কত যে শিখেছি—কী বলব? শুধু দেশের কাজ নয়—যাকে তুমি রাজনীতি বলো তাও নয়—শিখেছি কী জানো? শিখেছি ভক্তির মর্ম। তাই তোমাকে বলছি যে তাঁর সঙ্গে সংস্পর্শে এসে তবেই প্রথম বুঝি রবীন্দ্রনাথের 'বৈষ্ণব কবিতা'-র মর্ম—ব'লেই থেমে:

দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে—আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

এ আমার উচ্ছ্বাসী কথা নয়, কারণ সুভাষ দেশবন্ধুকে শুধু যে দেবতার মতনই ভক্তি করত তাই নয়, তাঁকে সর্বান্তঃকরণে বরণ করেছিল তার দেশপূজার মন্ত্রদাতা ব'লে। তাঁর লোকান্তরের পরেই সে মান্দালয় জেল থেকে ২৫-এ জুন ১৯২৫ তারিখে

যে-দীর্ঘ পত্র লেখে তার থেকে খানিকটা অনুবাদ দিই একথা প্রমাণ করতে (মূল ইংরাজি পত্রটি আমার The Subhas I Knew বইটিতে ছাপা হয়েছে):

"তুমি জানো আজকের দিনে কিসে আমার মন আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। আমার বিশ্বাস আমাদের সকলেরই আজ একই চিন্তা: মহাপ্রাণ দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণ।

"তাঁর বিয়োগব্যথায় আমি মুহ্যমান্ হ'য়ে পড়েছি। আজ স্মৃতির জগতে আমি এ-মহাপ্রাণ মানুষটির এত কাছে আছি যে তাঁর মহৎ গুণাবলীর কথা বিশ্লেষণ ক'রে ফলিয়ে তোলার চেষ্টা করা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আশা করি পরে কোনো দিন আমি তাঁর মহত্ত্বের যে-চকিত দর্শন লাভ করেছিলাম তার কিছু আভাস অন্তত জগৎকে দিতে পারব: এমন আভাস—যা আমি পেয়েছিলাম তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে, যদিও তিনি সেকথা আদৌ জানতেন না। আমার মতন আরো অনেকে নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা সত্বেও ভরসা ক'রে লিখতে পারছেন না—পাছে মুখর প্রশংসায় তাঁর লোকোত্তর মহিমাকে ছোট ক'রে ফেলা হয়।

"তুমি লিখেছ, দুঃখ বেদনার শেষ অবদান যন্ত্রণা নয়। এ কথায় আমার পূর্ণ সায় আছে। কিন্তু তবু জীবনে এমন অনেক শোকাবহ ঘটনা ঘটে—যেমন দেশবন্ধুর অকালমৃত্যু—যাকে আমি বরণ করে নিতে অক্ষম। আমি ঋষিও নই, ভক্তও নই, তাই বড় গলা ক'রে বলতে পারিনা যে সর্ববিধ যন্ত্রণাই আমার কাছে বরণীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন আমাকে বারবারই ভাবিয়ে তুলেছে যে, এমন দুর্ভাগাও দেখা যায় না কি (যদিও হয়ত তারা ভাগ্যবান্—কে বলতে পারে?) যারা নিয়তির ভ্রূকুটিই স'য়ে এসেছে পদে পদে? কিন্তু এই শোচনীয় দুঃখাধিক্যের তর্ক রেখে বোধ হয় বলা চলে যে দুঃখের পেয়ালা নিঃশেষে পান করাই যদি কারুর কারুর ভবিতব্য হয় তাহ'লেও খানিকটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতেই তাকে বরণ ক'রে নেওয়া ভালো।

"১৯২২ সালে যখন আমি জেলে যাই তখন দেশবন্ধুর সঙ্গে এক কুঠরিতেই থাকতাম। আমাদের জেলে একটি কয়েদী আমাদের উঠানে কাজ করত। দেশবন্ধুর স্নেহশীল হৃদয় তাকে বরণ ক'রে নিয়েছিল যদিও সে ছিল দাগী আসামী—এর আগে আটবার জেল খেটেছিল। তা সত্বেও সে অজান্তে দেশবন্ধুর প্রতি ঝোঁকে ও ক্রমশঃ তাঁকে প্রভুর মতন ভালোবেসে ফেলে। যখন তাঁর কারামুক্তি হয় তখন তিনি তাঁর এই নবলব্ধ ভক্তটিকে বলেন যে সে জেল থেকে বেরুবামাত্র তার দুষ্কৃতির সহচরদের

ছায়া না মাড়িয়ে যেন সোজা তাঁর কাছে চ'লে আসে। সর্বহারা মানুষটি রাজি হয় ও পরে সে-প্রতিশ্রুতি পালন করে! তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে, যে-মানুষ চিরদিন ছিল দুর্বৃত্ত নরাধম সে সেই থেকে আমাদের মহান্ নেতার আশ্রয়েই আছে, এবং যদিও সময়ে সময়ে সে আজও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তবু মূলতঃ সে সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেছে ও আর পাঁচজনদের মতনই নিরীহ জীবন যাপন করছে। আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে দেশবন্ধুর বিয়োগব্যথা যাদেরকে সবচেয়ে বেশি বেজেছে তাদের মধ্যে সে অন্যতম। কেউ কেউ বলে—মহৎ মানুষের মহত্ত্ব সব চয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে তাঁর ছোট ছোট আচরণে, দৈনন্দিন ঘটনায়। এ-মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে গেলেও দেশবন্ধুকে মহাত্মা বলতেই হবে—যদি তাঁর বিপুল দেশসেবার কথা বাদও দেওয়া যায়।"

এর উত্তরে সুভাষকে আমি আমার গভীর সমবেদনা জানিয়ে এক দীর্ঘ পত্র লিখতেই সে আমাকে ফের লেখে মান্দালয় জেল থেকেই (৯ই অক্টোবর ১৯২৫):

"দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তুমি যা যা লিখেছ ঠিকই।···আমি তাঁকে আমার হৃদয়ের সভক্তি প্রেম ও গভীর আনুগত্য দিয়ে বরণ করেছিলাম শুধু এই জন্যেই নয় যে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমি তাঁর অনুগামী ছিলাম, এই জন্যেও বটে যে, আমি তাঁকে খানিকটা জানতে চিনতে পেরেছিলাম তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে। একসময়ে আমরা জেলে ছিলাম একাদিক্রমে আট মাস—তার মধ্যে দুমাস আবার কাটিয়েছিলাম একই কুঠরিতে। এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলেই আমি তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়েছিলাম।"

সুভাষ এই ভাবে নানাসময়েই আমার সঙ্গে নানা অন্তরঙ্গ আলোচনা করত কখনো মুখোমুখি, কখনো বা পত্রের মাধ্যমে। দিনে দিনে তার সঙ্গে এ-সব আলোচনার ফলে আমার কৈশোরের এ-ধারণা আরো দৃঢ় হয় যে তার মহত্ত্বের পরিমাপ করা মোটেই সহজ নয়, কেন না, সে শুধু কর্মবীর ও দেশনেতাই ছিল না, ছিল উচ্চবিকশিত ধ্যানী, ভক্ত প্রেমিক—যে দেশকে বরণ করেছিল অন্তরের গভীর ধ্যানদৃষ্টি দিয়ে, মহত্ত্বকে বরণ করেছিল হৃদয়ের উচ্ছল ভক্তি দিয়ে, সর্বোপরি ত্যাগকে বরণ করেছিল তার জন্ম-উদাসী প্রাণের নিবিড় প্রেম দিয়ে। তার নেতাজিরূপের মহিমার কাছে সবাই মাথা নিচু করেছে কিন্তু তার এই ধ্যানী ও ভক্তের রূপ সম্বন্ধে খুব কমই আলোচনা হয়েছে। তাই আমি তার একটি ইংরাজি চিঠির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করতে চাই। এ-চিঠিটি সে আমাকে লিখেছিল ভিয়েনা প্রয়াণের পথে জাহাজ থেকে—যখন আমি তাকে আমার এক অপেরা গায়িকা হাঙ্গেরিয়ান

বান্ধবীর সঙ্গে লৈপিক পরিচয় ঘটিয়ে দিই। তিনি পরে লিখেছিলেন: "সুভাষ যেমন মহৎ তেমনি সরল—আমার চিঠি পেয়ে কী আনন্দ যে করে···ইত্যাদি। ভিয়েনা থেকে সুভাষ লিখেছিল যে তার অসুখে: "She had been an angel to me." যাক—

সুভাষ আমাকে জাহাজ থেকে যে-চিঠিটি লেখে সেটি আমার "অনামী"-র দ্বিতীয় সংস্করণে ছাপা হয়েছে ব'লে সবটা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই, শুধু তৃতীয় প্যারাগ্রাফটুকুর অনুবাদ দিচ্ছি—যাতে ফুটেছে ওর ধ্যানী ও ভক্তের রূপ। ও লিখেছিল: [৫ই মার্চ, ১৯৫৩]:

"তোমার একটি পত্রে তুমি শিব ও শক্তি সম্বন্ধে আমার মনোভাব জানাতে চেয়েছিলে। বলতে কি, আমার মন কখনো ঝোঁকে এদিকে কখনো ওদিকে—তাই দুর্গা কালী শিব কৃষ্ণ কাকে যে বরণ করব ভেবে পাই না। আমি অবশ্য জানি যে খতিয়ে সবই অভেদ—একমেবাদ্বিতীয়ম্—কিন্তু তবু কার্যক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই ভগবানের কোনো একটি বিশেষ ভাবরূপের অনুরাগী না হ'য়েই পারি না। আমি লক্ষ্য করেছি যে আমার মনের নানা ভাবাবেশে আমি কখনো বরণ করি শিবকে, কখনো কালী বা দুর্গাকে, কখনো কৃষ্ণকে। এঁদের মধ্যে আবার কখনো চাই শিবকে, কখনো শক্তিকে। শিবের পরম যোগিরূপ আমার কী যে মন টানে! হয়েছে কি জানো? সম্প্রতি—গত চার পাঁচ বৎসর হ'ল—মন্ত্রশক্তিতে আমার বিশ্বাস এসেছে—মানে, আমার মনে হয় এক একটি মন্ত্রের এক একটি নিবিড় শক্তি আছে। ইতিপূর্বে আমি যুক্তিবাদীদের মতনই মনে করতাম যে মন্ত্র নিছক প্রতীক মাত্র—শুধু আমাদের মনকে সংহত করবার সহায়তা করে। কিন্তু তন্ত্রদর্শন প'ড়ে আমার প্রত্যয় এসেছে যে একটি বীজমন্ত্রের মধ্যে নিহিত থাকে এক একটি সহজ শক্তি—আর প্রতি আধারই এক একটি বিশেষ মন্ত্রের অধিকারী। সেই থেকে আমি ভেবে সারা—আমার আধার কোন্ মন্ত্রের অধিকারী? কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি কেন না আমার মন, ঐ যে বললাম, কখনো রঙিয়ে ওঠে শৈবের রঙে, কখনো শাক্তের, কখনো বা বৈষ্ণবের। আমার মনে হয় এইখানেই গুরু আমাদের পরম দিশারি হ'তে পারেন কেন না সদ্‌গুরু আমাদের জানেন আমাদের নিজেদের চেয়ে বেশি, তিনিই নির্দেশ দিতে পারেন কে কোন্ মন্ত্র জপ করবে, বা কোন্ পূজারীতি অবলম্বন করবে।"

শ্রীঅরবিন্দ সুভাষের এ-চিঠিটি পড়ে আমাকে লেখেন যে উচ্চবিকশিত মানুষ

মাত্রেরই চরিত্রের নানাদিক থাকেই, তাই তার মধ্যে নানা দৈবরূপের স্বতন্ত্র টান গ'ড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক।

সুভাষের জীবন একটু গভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে মনে না হ'য়েই পারে না যে ওর উচ্চবিকাশ হয়েছিল এই জন্যেই যে গ্রহিষ্ণুতা ছিল ওর অসামান্য। তাই নিরন্তর শ্রান্তিহীন কর্মব্রতী হওয়া সত্বেও ওর চিত্তের স্বকীয় অনুসন্ধিৎসা ওকে নিয়তই ঠেলত পরম আত্মজিজ্ঞাসার দিকে। নৈলে ওর মতন দীপ্ত স্বাতন্ত্র্যবাদী কিছুতেই গুরুবাদের প্রাণের কথাটি এমন সহজে ধরতে পারত না যে গুরু শিষ্যকে তার নিজের চেয়ে বেশি জানেন ও চেনেন। কিন্তু এ গভীর দৃষ্টির—উপনিষদের ভাষায় 'ব্যাবৃত্ত-চক্ষুর'—উন্মেষ হয় না বহির্মুখী রাজনৈতিকদের, কেননা তাঁদের স্বধর্মই হ'ল আলাদা। তাই সুভাষকে স্বভাবে অধ্যাত্মবাদী তথা ধর্মপ্রাণ বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না। আর যে স্বভাবে আত্মসন্ধানী ও অন্তর্মুখী তার সঙ্গে সেই সব চলতি অগভীরদর্শী দেশনায়কদের তুলনাই হ'তে পারেনা যাঁরা ভারতের আত্মার খবর রাখেন না কি যাঁরা মনে প্রাণে বুদ্ধিবাদী ব'লে মনে করেন যে শুধু সমাজসংস্কার ও বৈজ্ঞানিক চর্চার ফলেই ভারতের সরাসর চতুর্বর্গ লাভ হবে।

কিন্তু আত্মসমর্পণ বা গুরুবাদের মর্মজ্ঞ হওয়া সত্বেও সুভাষ কেনোদিনই পরতন্ত্র ছিল না। তাই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের অনেক সস্তা বুলিই তাকে প্রতিহত করত—আমাদের সাধকদের গতানুগতিকতা, তামসিকতা, স্বাধীনচিন্তার দৈন্য আরো কত কী। আমি এই দিক দিয়ে ওর সংস্পর্শে কম লাভ করিনি—বিশেষ ক'রে যখন পণ্ডিচেরি আশ্রমে আমি গুরুবাদের নানা গোঁড়ামিকে তার স্বরূপে দেখতে শিখিনি—যে-গোঁড়ামি ভাবে যে "গুরু গুরু" করলেই পরমার্থ লাভ অবধারিত। পণ্ডিচেরি আশ্রমে এমন কথাও শুনেছি কোনো কোনো বুদ্ধিমান সাধকের মুখে যে আমরা গুরুর চরণে শুধু দণ্ডবৎ করতে পারলেই রাতারাতি অতিমানসের নাগাল পেয়ে অতিমানব ব'নে যাব—সেকেলে জপ তপ ধ্যান ধারণা ওসব আমাদের মতন এ-যুগের বরপুত্রদের জন্যে নয়—ওসব নিয়ে মাথা বকাক সেই সব মামুলিপন্থী গড়পড়তা সাধক যাদের গুরুও গড়পড়তা ব'লে জানে না—কেমন ক'রে সুপ্রামেণ্টাল যোগে সরাসর সুপারম্যান হ'তে হয়···ইত্যাদি। এ-ধরণের কথা যখন আমি প্রথম শুনি তখন ভাবি—হবেও বা। কিন্তু সুভাষকে আমাদের আশ্রমের এ-জাতীয় তপস্যাবিমুখ গুরুবাদীদের কথা লিখতে না লিখতে ও আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে সত্যিকার বন্ধুর কাজ করেছিল। ও লিখেছিল [৯ই অক্টোবর, ১৯২৫—মান্দালয় জেল]:

"তুমি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যা লিখেছ তার সবটা না হলেও বেশির ভাগই আমি মানি। তিনি ধ্যানী—আর আমার মনে হয়—স্বামী বিবেকানন্দর চেয়েও গভীর, যদিও স্বামীজির 'পরে আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। আমিও তোমার কথায় সায় দেই যে, 'নীরব ভাবনা, কর্মবিহীন বিজন সাধনা' সময়ে সময়ে দরকার হয়—এমন কি দীর্ঘকালের জন্যেও। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, সমাজের বা দেশের জীবনস্রোত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে মানুষের কর্মের দিকটা পঙ্গু হ'য়ে যেতে পারে, আর তার প্রতিভার একপেশে বিকাশের ফলে সে সমাজ-বিচ্ছিন্ন অতিমানুষের মতন উদ্ভট কিছু-একটা হ'য়ে উঠতে পারে। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন দু'চারজন প্রকৃত সাধকের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু বেশির ভাগ লোকের পক্ষে কর্ম বা লোকহিতই হবে সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। নানা কারণে আমাদের জাতির কর্মের দিকটা শূন্য হয়ে এসেছে, তাই এখন আমাদের দরকার রাজোগুণের 'double dose'; সাধক বা তাদের শিষ্যদের মধ্যে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে ইচ্ছা ও কর্মশক্তি যদি অসাড় না হয়ে যায়, তা হ'লে নির্জনে ধ্যান তারা যতদিন ইচ্ছে করুক, আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব না। কিন্তু আমরা যেন 'sicklied over with the pale cast of thought' না হ'য়ে পড়ি। কোনো কোনো মহাসাধক হয়ত সর্ববিধ তামসিক প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারেন—কিন্তু তাঁর চেলারা? গুরুর সাধনপদ্ধতি কি সজ্ঞানে না হোক অজ্ঞানে তাদের কোন অনিষ্ট করবে না?"

এ চিঠি পেয়ে আমার মনে প্রথম দিকে একটু আঘাত লেগেছিল বৈ কি, কিন্তু সুভাষের অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও আন্তরিকতায় আমার শ্রদ্ধা গভীর ছিল ব'লে আমি সময়ে দেখতে পেয়েছিলাম যে গুরুবাদের যথার্থ রূপটি অনিন্দনীয় হ'লেও আমাদের জাতীয় তামসিকতার অলক্ষ্য প্ররোচনায় কার্যক্ষেত্রে সে নানা সূক্ষ্ম ও জটিল কারণে অনেক সময়েই ধামাধরা চেলা-বাদে পরিণত হয়। এইখানে আত্মমনস্ক সুভাষ এ-যুগের নেতাদের মধ্যে ছিল অদ্বিতীয়—স্বামী বিবেকানন্দের একমাত্র বাণীবাহ ও উত্তরসাধক যিনি বলেছিলেন জলদনির্ঘোষে [ভাববার কথা - বর্তমান সমস্যা।]:

"দেখিতেছ না যে সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল! যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর

সমস্ত দোষারোপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত চর্বণে, এবং সর্বোপরি, গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে-দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?" কিম্বা তাঁর আর একটি বাণী যা সুভাষ প্রায়ই উদ্ধৃত করত: "Worship your Guru, but do not obey him blindly; love him heart and soul but think for yourself. No blind belief can save you." [Inspired Talks—১৬৪ পৃষ্ঠা]

এর পাশাপাশি উদ্ধৃত করি ১৯২১ সালে চব্বিশ বৎসরের যুবক সুভাষের অকুতোভয় "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—ডাক:

"আমি আপনাদের আহ্বান করিতেছি বাংলার আনন্দ-উৎসবের মধ্যে নয়, সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, বিত্তবানের শান্তির মধ্যে নয়: আমি আপনাদের আহ্বান করিতেছি—দুঃখ দারিদ্র্য নির্যাতনের মধ্যে; অভাব, অজ্ঞানতা, অবসাদের মধ্যে; অশান্তি, অবিচার, অনাচারের মধ্যে—সবার উপরে, মনুষ্যত্বের পদে পদে লাঞ্ছনার মধ্যে।"

এ কি সত্যি রাজনৈতিক নেতার বাণী, না ভারতের আত্মার? মানি, সুভাষ বিবেকানন্দের আত্মার আত্মীয় তথা পতাকাবাহী হ'য়েও কার্যক্ষেত্রে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেনি। আমার মনে একটা গভীর আক্ষেপ হ'ত বরাবরই একথা লিখেছি নানা সূত্রেই। সময়ে সময়ে আমার এমন কথাও মনে হয়েছে বৈ কি যে সুভাষ রণনায়ক না হ'য়ে ধর্মধারক হ'লে আজ সে দেশে হয়ত দ্বিতীয় বিবেকানন্দের মতন দুর্গতদের মানুষ ক'রে তুলত তার মহৎ চরিত্রের সংস্পর্শে। কিন্তু ঐ সঙ্গে একথাও মনে হয়েছে সময়ে সময়ে—(বিশেষ ক'রে সুভাষের আই-এন-এ সৈন্যদল গঠন করার ফলে যার জন্যে দেশের স্বাধীনতার দিন দশ বৎসর এগিয়ে এসেছিল ব'লে মনে করার কারণ আছে)—যে হয়ত এইই ছিল ওর আত্মার স্বধর্ম না হোক প্রাণশক্তির সহজ পরিণতির পথ—বলে না—"ক্যা জানে কৌন ভেখসে নারায়ণ মিল্ জায়?" শ্রীঅরবিন্দের কাছে শুনেছিলাম যে একটা মহত্তর আলো যখন মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে তখন সে চলে খানিকটা অদৃশ্য দেবতার হাতের খেলার পুতুল হ'য়ে—খানিকটা যেন মুগ্ধাবেশে। ভারতের বিপ্লবীদের মধ্যে প্রথম দিকে এই ভাবেই প্রাণ দিতে ছুটেছিলেন বহু আত্মবলিদানব্রতী মহাপ্রাণ। তাঁদের মধ্যে কারুর কারুর কাছে শুনেছি যে অগ্নিযুগে যখন তাঁরা "আগে চল্ আগে চল্ ভাই"-এর বহ্নিবাঁশরীর ঘরছাড়া ডাক শুনে উধাও হ'তেন তখন সত্যিই তাঁরা জানতেন না কোথায় চলেছেন কিসের

টানে কোন্ সিদ্ধির পথে। শুধু জানতেন—বাঁশি যে শোনে তার উধাও না হ'য়েই উপায় নেই। সুভাষ যখন সাতসমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে ইম্‌ফালে হানা দেয় তখন চম্‌কে উঠে এই কথাই মনে হয়েছিল যে ও সর্ববিধ বাধার বাঁধ ভেঙে বীর্যের বন্যাবেগে এভাবে অচিন দূরভিসারে ছুটেছিল শুধু এইজন্যেই যে দেশমাতৃকার মধ্যে ও চাক্ষুষ করেছিল জগন্মাতার মহিমময়ী মূর্তি। নৈলে কি ও "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার" লঙ্ঘন ক'রে "রাত্রিনিশীথে" ভারত থেকে কাবুল, কাবুল থেকে বার্লিন, বার্লিন থেকে ইতালি, ইতালি থেকে মালয় জাপান বর্মা হ'য়ে শেষে মণিপুরে হানা দিতে পারত বৃটিশসিংহকে ভয়ে কাঁপিয়ে তুলে? মনে হয় ওকে দিয়ে একটা মস্ত দুঃসাহসী শৌর্যের আদর্শ আমাদের ঘুমন্ত চোখের সামনে ধরতে চেয়েই বিধাতা ওকে গড়েছিলেন জন্ম-অশান্ত ক'রে। ও যদি গড়পড়তা রাজনৈতিক হ'ত তা'হলে ওর স্বধর্ম কী সে-বিষয়ে সহজেই একটা কাটাছাঁটা সিদ্ধান্তে পৌঁছন যেত। কিন্তু যে-মানুষ শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের ভাষায়—"কেবল একটা ব্যক্তি নয়, কোনো একটা প্রচারক মাত্র নয়—যাহার সমগ্র জীবন দেহ মন আত্মা একটা অখণ্ড সত্যের পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি"—তার স্বধর্ম স্বভাব স্বরূপ সম্বন্ধে সংজ্ঞানির্ণয় সুসাধ্য নয়।

একথা অকুতোভয়েই বলা যায় যে তবু সুভাষ যে বহু দুঃখবরণ ক'রে পদে পদে হাজারো বাধাবিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে ওর নিয়তিনির্দিষ্ট সত্যসন্ধানে ছুটেছিল প্রাণকে পর্যন্ত বাজি রেখে—তার মূলে ছিল ওর অন্তরের এই আলোক-প্রত্যয় যে ওর আন্তরিকতা ছিল নির্ভেজাল।

তাইতো ওর একটা অতি প্রিয় মন্ত্র ছিল শেক্সপীয়রের:

To thine own self be true
And it must follow as the night the day:
Thou canst not then be false to any man.

এ আমার কল্পনামাত্র নয়। সুভাষও ঠিক এই কথাই লিখেছিল ওর পূর্বোদ্ধৃত মান্দালয়ের পত্রের শেষে:

"আমি একথা মানি যে, আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ করবার চেষ্টা পেতে হবে। নিজের মধ্যে যা সর্বোৎকৃষ্ট, তার দানই হচ্ছে প্রকৃত সেবা। আমাদের অন্তরপ্রকৃতি, আমাদের স্বধর্ম যখন সার্থকতা লাভ করে, তখনই আমরা যথার্থ সেবার অধিকারী হই। এমার্সনের কথায় বলতে গেলে, নিজের ভিতর থেকেই আমাদের গ'ড়ে উঠতে হবে; তাতে আমরা সকলেই যে এক পথের পথিক

হব এমন কোনো কথা নেই, যদিও একই আদর্শ হয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। শিল্পীর সাধনা কর্মযোগীর সাধনা থেকে ভিন্ন, তপস্বীর যে-সাধনা বিদ্যার্থীর সে-সাধনা নয়; কিন্তু আমার মনে হয় সবাইকার আদর্শ প্রায় একই। গোলাকার ব্যক্তিকে চতুষ্কোণ গর্তের মধ্যে পুরতে আর যেই চা'ক না কেন, আমি কখনই চাইনে। নিজের প্রতি সত্য হ'লে বিশ্বমানবের প্রতি কেউ অসত্য হ'তে পারে না। তাই আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্রকৃতিই দেখিয়ে দেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে, তা'হলে অচিরেই সমগ্র জাতির মধ্যে নব-জীবনের স্ফুরণ হয়। সাধনার অবস্থায় হয়ত মানুষকে এমন ভাবে জীবন যাপন করতে হয় যাতে তাকে বাইরে থেকে স্বার্থপর বা আত্মসর্বস্ব মনে হ'তে পারে। কিন্তু সে-অবস্থাতে মানুষ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে, বাইরের লোকের মতামতের দ্বারা নয়। সাধনার ফল যখন প্রকাশিত হবে তখনই লোকে স্থায়ী বিচার করবে; সুতরাং আত্মবিকাশের সত্যপথ যদি অবলম্বন করা হ'য়ে থাকে, তা'হলে লোকমত উপেক্ষা করা যেতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তোমার সঙ্গে আমার মতের যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তা নয়।"

এই আত্মবিকাশের চিন্তা যার কাছে সত্য, তার ভয় কোথায়? নিজেকে যে ফাঁকি দেয় না সে কি কখনো অপরকে ফাঁকি দিতে পারে? আমাদের এ-তামসিক দেশের আবহাওয়ায় সুভাষ এসেছিল যেন জাগৃতির নিত্যসিদ্ধ পুরোহিত হ'য়ে। ওর সঙ্গে ১৯৩৭ সালে আমার একটি দীর্ঘ কথালাপের বিবৃতি আমি দিয়েছি The Subhas I Knew বইটিতে। তার শেষের অংশটুকু থেকে একটি উদ্ধৃতির সংক্ষিপ্তসার দিয়ে এ-তর্পণের সমাপ্তি টানি—গঙ্গাপূজা হোক গঙ্গাজলে: *

সুভাষ বলল: "জেলে আমি অনেক কিছুই শিখেছি দিলীপ, বিশেষ ক'রে আমার নিজের সম্বন্ধে। কারণ তুমিও নিশ্চয়ই জানো যে বাইরের জগতের দুয়ার রুদ্ধ হ'লে আমাদের অন্তরে একটা নতুন জগতের দুয়ার খুলে যায়। কিন্তু তুমি নির্জনবাস বরণ করেছিলে স্বেচ্ছায়—আশ্রমে, আমাকে বরণ করতে হয়েছিল অনিচ্ছায়—জেলে। কাজেই আমাকে পদে পদে লড়তে হয়েছে এই বাধ্য হ'য়ে বিজনবাসী হওয়ার জন্যে। কিন্তু তা'হলেও এই পথেই আমার নিয়তির বিধানে ভগৎ-

* বলা বাহুল্য এ-অনুলিপি তার মুখের কথার হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়—তাছাড়া আমার নিজের ভাষায় বলা। তবে এ বিষয়ে সে নানা সময়ে নানাভাবেই ফুটিয়ে তুলত তার নানা স্বপ্ন স্বপ্ন সত্যজিজ্ঞাসা। তাই ভাষা আমার হ'লেও বক্তব্যটুকু তারই একথা বলতে পারি অকুতোভয়েই।

বশ্যতার [resignation] মন্ত্রদীক্ষা হয়, আমি শিখি—দীনতা কাকে বলে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বাইরে থেকে দেখলে এ-বশ্যতাকে দুঃখময় মনে হলেও কার্যতঃ আমি খুব বেশি লাভ করি—নিজেকে এই দুঃখের আলোয় আবিষ্কার ক'রে। তুমি খানিক আগে বলছিলে—তুমি আত্মসমর্পণ কাকে বলে জানতে পেরেছ অনেক দুঃখ পেয়ে তবে। আমি বলতে পারি না সে কথা। তবে আমার ক্ষেত্রে হয়ত প্রশ্নটাই ওঠে না, যেহেতু আমাকে চিরদিন লড়তে হয়েছে আমার মধ্যেকার এক আন্তর বিদ্রোহের সঙ্গে—যে আমাকে কখনো দুদণ্ডও স্বস্তি দেয়নি। তাই তো আমি জেলের আবহে প্রতিবারই অসুখে পড়েছি—স্বাস্থ্যরক্ষার বহু চেষ্টা সত্বেও। কিন্তু উপায় কি? আমি অশান্ত হ'য়ে উঠতাম জেলে আসতে না আসতে—সময় যে ব'য়ে যায়—যায় বলত মন, আর ব্যথায় পড়তাম আমি মুহ্যমান্ হ'য়ে।"

সুভাষ চিন্তিত মুখে ব'লে চলে: "আমার স্বাস্থ্য ক্রমশই ভেঙে পড়তে চায়। কিন্তু আমি করি কী? আমার তো এমন কোনো গুরু নেই যিনি আমাকে পথের নির্দেশ দেবেন। অগত্যা আমি নিজেকে নিরীক্ষা করতে সুরু করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন নতুন ক'রে আবিষ্কার করলাম যে পথচলার সবচেয়ে বড় দিশারি হচ্ছে বাইরে অপরের সম্বন্ধে তিতিক্ষা—charity, আর অন্তরে বিনম্রতার সাধনা—humility। এরা উভয়ে আমার যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে অপরকে রুক্ষ হ'য়ে বিচারের নাম অবিচার, কেননা আমরা সবাই কম বেশি অন্ধ ও অজ্ঞান—কাজেই দুর্বল ও অসহায়। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি আরো একটা আশ্চর্য আবিষ্কার করলাম: যে, আমরা খতিয়ে কত দুর্বল উপলব্ধি করতে না করতে বল এসে যায়।

"প্রতি উপলব্ধির সঙ্গেই আসে পরিবর্তন। আমার মধ্যে এই পরিবর্তনের পরে আমি কৃতসংকল্প হলাম যে আমাকে সব আগে নিজের কাছে খাঁটি হ'তে হবে,—'to thine ownself be true' মন্ত্র জপ ক'রে। এর মানে কি! না, আমি নিজের প্রতি কাজকে তেম্নি ভাবে ওজন ক'রে ক'ষে দেখব যেমন ভাবে দেখি আর সবার কাজকে। সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখতে পেলাম যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্বন্ধে শুধু যে আমাকে সহিষ্ণু—lenient—হ'তে হবে তাই নয়, তাদেরকে ভালবাসতে হবে।"

সুভাষ থেমে ঈষৎ করুণ হেসে ব'লে চলল: "তোমাকে আশা করি বলতে হবে না যে আমি হাড়ে হাড়ে জানতাম যে, কর্তব্য কী তার দিশা পাওয়া আর সে কর্তব্য পালন করা এক জিনিস নয়—ঠিক যেমন কোনো কিছু কামনা করা আর তাকে হাতে পাওয়া এক জিনিস নয়।...আমার কৈশোরে আমি পড়েছিলাম বুদ্ধের বিখ্যাত

বাণী যে, সবাইকে তেম্‌নি ভালোবাসতে হবে যেমন বাসে মা তার একটিমাত্র সন্তানকে। বেশ মনে আছে—যখন এ-কথা প্রথম পড়ি তখন আনন্দে আমি যেন হাওয়ায় উড়ে চলতাম—মাটিতে পা পড়ে না অবস্থা! কিন্তু হ'লে হবে কি, সংসারকে যতই দেখতে বুঝতে চিনতে শিখি ঠিক কি সেই অনুপাতেই ভালোবাসবার শক্তি আসে ক'মে—মানে অবশ্য যে-ভালোবাসার কথা বুদ্ধ বলেছিলেন।"

সুভাষের মুখে ফের আত্মমনস্ক হাসি ফুটে ওঠে: "কিন্তু দিলীপ, জীবনের সঙ্গে পরিচয় গভীর হ'তে না হ'তে আমরা পদে পদেই ঠেকে শিখি না কি যে, কোনো বড় উপলব্ধির পথই কুসুমাস্তৃত নয়! তুমি গুরুবাদের পথ বেছে নিয়েছিলে। আমি অকপটেই স্বীকার করছি যে অনেকদিন ধ'রেই আমার মনের সংশয় কাটেনি—তুমি ঠিক পথে চলছ—না ভুল। কিন্তু আট বৎসর বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হ'তে না হ'তে আমার সব সংশয় কেটে গেছে। গাছকে যদি তার ফল দিয়ে বিচার করতে হয়—আর এর চেয়ে গভীর বিচার আর কীই বা হ'তে পারে?—তাহলে কিছুতেই বলা চলে না যে তুমি আলেয়ার পিছনে ছুটেছিলে। পথ চলায় আমি যদি সহিষ্ণু ও তিতিক্ষাশীল হ'তে শিখে থাকি তাহলে তুমি কী শিখেছ—বলব খোলাখুলি? আচ্ছা শোনো।"

একটু থেমে সুভাষ ব'লে চলল ফের একটানা: "সেদিন অনেক রাত অবধি তুমি আমার কাছে না রেখে ঢেকেই বললে তোমার নানা অগ্নিপরীক্ষার কথা, দোলার কথা, দুর্বলতার কথা। আমি খুব মন দিয়েই শুনছিলাম—ক'ষে দেখছিলাম—ওজন করছিলাম তোমার প্রতি কথার নিহিতার্থ। তুমি ঘটা ক'রেই বললে তোমার নানা সংশয়ের কথা, দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা, নিরাশার কথা—এমন কি তোমার নানা প্রবর্ধমান অবিশ্বাসের—cynicism-এর—কথাও তুমি বললে খোলাখুলিই। কিন্তু একটিবারও তুমি তোমার গুরু কি ইষ্টের সম্বন্ধে এমন কোনো কথা বলোনি যাকে বলতে পারি disloyalty: তাই তুমি যতই বলো না কেন, আমাকে তুমি একটুও বিশ্বাস করাতে পারোনি যে তুমি বিশ্বাসে প্রত্যয়ে দেউলে—একটিবারও তুমি আক্ষেপ করোনি সংসারে নানা ভাবে সফল হবার সুযোগ ছেড়ে দিয়েছিলে ব'লে। এর পরে আমি কেমন ক'রে তোমার নিজের সম্বন্ধে এ-রায়ে বিশ্বাস করি বলো যে তুমি স্বভাবে সন্দিগ্ধ—sceptic! না, তোমাকে বেশি বিব্রত করতে চাই না—অন্য প্রসঙ্গ পাড়ছি এখুনি—কেবল একটা কথা বলি। কিছুদিন আগে কোথায় পড়েছিলাম কবি য়েট্‌স্‌এর একটি চমৎকার উক্তি: যে, ভগবান মানুষকে অনেক কিছুই বর দিতে পারেন বটে,

কিন্তু মানুষ তাঁকে দিতে পারে একটি মাত্র উপহার: বিশ্বাস। আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম কথাটি প'ড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল যে খৃষ্ট সাধারণ মানুষকে—Scribe ও Pharisee দেরকে বিশ্বাসে দীন ব'লে দেগে দিয়ে তাদের প'রে একটুও অবিচার করেননি। এ-যুগের মানুষ সম্বন্ধে তাঁর এ-ভর্ৎসনা কি আরো বেশি খাটে না? এক কথায় সংসারে সবচেয়ে বড় পাথেয় হ'ল বিশ্বাস। তাই দিলীপ, আমার মনে সময়ে সময়ে প্রশ্ন জাগে: আমি আমার প্রতিপক্ষকে সত্যি সত্যি ভালোবাসতে পারব এ-বিশ্বাস আমার সত্যি আছে তো? কিন্তু—" ব'লে ও ফের একটু থেমে বলল—"যে-পথেই চলি না কেন হার না মেনে শেষ পর্যন্ত চলা কঠিন না হ'য়েই পারে না। নয় কি?"

সুভাষের একটি অত্যন্ত প্রিয় বই ছিল নিবেদিতার "The Master As I saw Him" বিলেতে সে প্রায়ই উদ্ধৃত করত এ-বইটিতে স্বামীজির নানা মতামত। এদের মধ্যে একটি উক্তি ছিল ওর বিশেষ প্রিয়। নিবেদিতা লিখেছেন:

"To the Swami it was only natural to say in answer to an enquirer, "Had I lived in Palestine, in the days of Jesus of Nazareth, I would have washed His feet, not with my tears but with my heart's blood.' [২৮ পৃষ্ঠা]

এর পরেও সুভাষকে "চিরন্তনের তীর্থযাত্রী" উপাধি দিলে কি খুব ভুল হবে?

চোদ্দ

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী ওরফে বীরবল এ-যুগের মানুষের কাছে অর্ধ-বিস্মৃত, কিন্তু ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগে তিনি আমাদের তরুণদের মনে তাঁর "সবুজপত্রে"র মর্মরে যে বিচিত্র হিল্লোল জাগাতেন, আমরা আজও ভুলতে পারিনি—আমরা মানে যাঁরা সে-যুগে তাঁর অনুরাগী পার্ষদ, সভাসদ বা বন্ধুরূপে তাঁর নিকট-সংস্পর্শে এসেছিলাম। কীভাবে ও কেমন করে—বলি।

১৯১৫ সালে, আই-এস-সি পাশ করার পরেই আমি প্রথম তাঁর নিমন্ত্রণ পেয়ে বালিগঞ্জে তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যচক্রে যোগ দিই। বেশ মনে আছে, প্রথম যেদিন তাঁর ওখানে গিয়ে নানা খ্যাতনামা সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ সুরু করি সেদিন

মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল শুধু "বড় হয়েছি" ব'লে নয়, বঙ্গবাণীর হবু সেবকদের দলে ভর্তি হয়েছি ব'লেও বটে।

"সবুজপত্রে"র যুগকে বাঙলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় যুগ বললে বেশি বলা হবে না—যার স্থান বঙ্গদর্শন, সাধনা ও ভারতীর পরেই। প্রমথবাবু প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক না হওয়া সত্ত্বেও এ-যুগের সাহিত্য-শিল্পীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন শুধু তাঁর সাহিত্যিক রস-পরিষদের শক্তির দৌলতে নয়, তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, আভিজাত্য, রসজ্ঞতা ও স্নেহশীলতার জোরেও বটে। তাঁর সাহিত্য-রসচক্রে নিমন্ত্রণ পেলে সে-যুগে কি নবীন কি প্রবীণ উভয় শ্রেণীর সাহিত্যিকরাই হৃষ্ট হয়ে উঠতেন। এর দুটি কারণ ছিল: এক, তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র ছিলেন; দুই, তিনি তাঁর অনুরাগিবৃন্দকে কাছে টেনে তাদের আত্মপ্রকাশের প্রেরণাকে উস্কে দিতে পারতেন—যাকে বলে ড্রয়িং আউট। তাই শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসোমনাথ মৈত্র, শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক, শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত, শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব প্রমুখ নানা সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক তাঁর কাব্যকুঞ্জে মধুকরের মতনই এসে আনন্দগুঞ্জন জুড়ে দিতেন। সে-আসরে যাঁরাই যেতেন পুলকিত হয়ে ফিরতেন আরো তাঁর গৃহলক্ষ্মী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর আতিথ্যে—যিনি চা-যোগের সঙ্গে প্রায়ই পিয়ানো বাজিয়ে গান গেয়ে সবাইকে উল্লসিত করে তুলতেন। ফলে আমরা তাঁর ওখানে গিয়ে আসর জমিয়ে দেখতে দেখতে তাঁর অনুরাগীদের দলে সাগ্রহে নাম লেখাতাম এবং দুদিন যেতে না যেতে "অনুরাগীর" চেয়েও ঘনিষ্ঠ পদবী অর্জন করতাম, যার সাহেবি নাম—"ফ্যান"।

এ-আসরে গিয়ে আমার ভবিষ্যৎ সাহিত্যিক জীবনের পাথেয় পেয়েছিলাম নানাভাবেই। সেসব কথা ফেনিয়ে বলার দরকার দেখি না, কেবল দুজন সাহিত্যিকের নাম করতেই হবে যাঁরা আমাকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিলেন: শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। এঁরা উত্তরকালে বাঙলা সাহিত্যে স্বনামধন্য হয়ে ওঠেন।

কিন্তু সবুজচক্রে যিনি আমার কিশোর চিত্ত একদিনেই জয় করে নিয়েছিলেন, তাঁর কথাই আজ বলব সব আগে।

তাঁর নাম আজ সবাই জানেন; কেননা আজ তিনি বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানিকদের মধ্যে একজন: ডাক্তার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, এফ. আর. এস, পদার্থ-বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক। কিন্তু সে-সময়ে তিনি তরুণ অধ্যাপক মাত্র।

যেদিন আমি এ অপরূপ মানুষটির দেখা পাই সেদিনটি আমার কাছে চিরস্মরণীয় থাকবে। আজ পর্যন্ত এক সুভাষ ছাড়া আর কোনো বন্ধুই আমার চিত্তকে সত্যেনের মতন অধিকার করতে পারে নি। যদিও বন্ধু হিসেবে আমার কাছে সুভাষ হয়ে উঠেছিল হিরো-ই বলব, তবু সত্যেনের কাছেও আমি জীবনে কম পাথেয় পাইনি—বিশেষ করে চিন্তা, সংস্কৃতি ও স্বাধীন চিন্তার রাজ্যে।

শুনেছি সত্যেনের আবিষ্কৃত পরমাণুর নাম হয়েছে 'বোসন' এবং নানা বৈজ্ঞানিক তাঁদের গবেষণায় নাকি সত্যেনের আবিষ্কারের জের টেনে চলেছেন। মনে আছে একদা বন্ধুবর মেঘনাদ সাহা ওর এই বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিসটিকস্ প্রসঙ্গে আমার কাছে কথায় কথায় দুঃখ করেন: "সত্যেন ইচ্ছে করলেই এফ. আর এস. পেতে পারত এই আবিষ্কারটিকে নিজে আর একটু তদন্ত করলে।" আর একজন মনীষী বলেছিলেন: "সত্যেন একটুও তদ্বির করে না যে নামটামের জন্যে—অত এলাভোলা হলে কি চলে এ-জগতে?" আইনস্টাইন স্বয়ং সত্যেনের থীসিস-এর অনুবাদ করেছিলেন, তার পাদটীকায় ছিল—বহু বৎসর পরে পড়ি অবশ্য—আইনস্টাইন সত্যেনের আবিষ্কারকে অভিনন্দিত করেছিলেন "wichtigen Fortschritt" (অর্থাৎ important advance) ব'লে।

অবশ্য ১৯১৫ সালে যখন সত্যেনের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় তখন সে বোস-আইনস্টান থীসিস লেখে নি, বলাই বাহুল্য। নাই বা লিখল—সে সত্যেন তো! ছাত্রমহলে সে যুগে তার যে কী নামডাক ছিল, সে কী বলব? শুনেছিলাম এম. এস. সি-তে নাকি সে রেকর্ড নম্বর পেয়েছিল—শতকরা নব্বইয়েরও বেশি। ভাবতেও আমার বুক দশ হাত হয়ে উঠত—এ-হেন মনীষী কি না আমার গান শোনে সোৎসাহে, আমাকে ভালবাসে আন্তরিক, আমার সঙ্গ চায় সাগ্রহে! কিন্তু না—বলি যথাপর্যায়েই।

আমি তখনো গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতা কোন কিছুই লিখিটিখি নি, শুধু গান গেয়েই বাজিমাৎ ক'রে চলি। আর সে কি সোজা গান? সভা-সমিতি ড্রয়িং-রুম, বিবাহ-আসরে পরিণয়-সঙ্গীত ("সুখে থেকো আর সুখী কোরো সবে" বর্গীয় গান), উপনয়ন সঙ্গীত, অন্নপ্রাশন সঙ্গীত, কনফারেন্স সঙ্গীত কি নয়—কেবল শ্রাদ্ধ-সঙ্গীত বাদ। উত্তরকালে শ্রাদ্ধেও গান গেয়েছি; কিন্তু সে-যুগে খেয়াল, ঠুংরি, গজল, প্রেম-সঙ্গীত, স্বদেশী সঙ্গীত ও ভজনই ছিল আমার উপজীব্য। গান শিখছি তখন রকমারি কালো-য়াতের কাছে—সুবিধে পেলেই ছুটি ওস্তাদ বাইজির খোঁজে—সাত সমুদ্র তের নদীর

পারে না হোক, সারা ভারতে চক্র দিয়ে। তখন আমি দুর্দম্য তরুণ, ঠেকায় কে? কোথায় না গেছি গান শুনতে ও শিখতে? কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়র, পাটনা, ভাগলপুর, ইন্দোর, জয়পুর, আজমীঢ়, উদয়পুর, রামপুর, মোরাদাবাদ, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, মহীশূর, বেরিলি, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা······ইত্যাদি। কবে কোথায় গেছি বলতে পারব না—তবে একটু বলতে পারি যে, সত্যেনের সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন আমি ঠিক ডাঁশা সঙ্গীতার্থী নই, বেশ পাকা ওস্তাদিপন্থী। তাই মনে আছে শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যকুঞ্জে যখন তিনি আমাকে সত্যেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন এই ব'লে যে "সত্যেন শুধু বৈজ্ঞানিক নয়, গানের রীতিমত সমজদার"—তখন আমি আনন্দে শিউরে উঠে ধরেছিলাম মালকোষ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে শেখা—বন ঘন মুরলিয়া বাজে রী। ঐ একটিই হিন্দি মালকোষ তখন জানতাম, কাজেই বলতে পারি—সত্যনিষ্ঠ হয়েই—যে ঐ গানটিই গেয়েছিলাম এক টেবিল হারমোনিয়ম বাজিয়ে।

বাল্যস্মৃতিতে বলেছি, আমি শিশুকাল থেকে সহজেই তানবাজি ক'রে নাম কিনেছিলাম। কলেজে ঢুকবার আগে ওস্তাদি গানে তালিম নিয়ে সে-তানবাজি হয়ে ওঠে চরকি-বাজির কাছাকাছি—আমি চাইতাম বিশেষ করে বাঙালী শ্রোতাদের কাছে হিন্দুস্থানি সুরের ঐশ্বর্য জাহির করতে। ফলে গীতজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ ছিল না যে আমার কণ্ঠস্বর শুনলে তাঁদের মনে হ'ত রবীন্দ্রনাথের—

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা—
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি ;
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর—
সাতটি যেন পোষা পাখি।

শুধু তাই নয়, আমি সত্যিই সদর্পে চাইতাম :

আপনি গড়ি' তোলে বিপদজাল—
আপনি কাটি দেয় তাহা,
সভার লোক শুনে অবাক মানে—
সঘনে বলে বাহা বাহা!

নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা কার না থাকে? তাই আমার যদি গীতিকুশলী হওয়ার জন্যে অহঙ্কার এসে থাকে তবে সহৃদয় প্রবীণেরা বর্ণনায় সদয় হেসে ক্ষমা করবেন—আরো এই কথাটি সমঝে যে সে-সময়ে "নবীন যুবাদের" মধ্যে আদৌ ওস্তাদি

সঙ্গীতের চল ছিল না। আমার পরের যুগে আমি চম্‌কে উঠছিলাম ভীষ্মদেবের তান-প্রতিভায়। কিন্তু সে-যুগে সুভদ্র সমাজে ভীষ্মদেবের মতন কোন অসামান্য ওস্তাদি-পন্থী কিশোর অভ্যুদিত হন নি। তখন দিলীপ রায় ওস্তাদি জাঁকজমকের রাজ্যে বাঙলাদেশে প্রায় একমেবাদ্বিতীয়ম্—অন্তত উচ্চশিক্ষিত ও বিদগ্ধ সমাজে। কাজেই এ হেন আমি সত্যেনকে চম্‌কে দেবার জন্যে যে সদর্পে জাহির করতে চাইব :

শাণিত তরবারি গলাটি যেন—
নাচিয়া ফিরে দশদিকে,
কখন কোথা যায় না পাই দিশা—
বিজলী হেন ঝিকিমিকে।

এ শুধু আমার অহম্ এর আত্মস্তুতি নয়—বড় বড় সঙ্গীত-রসিকরাও পরে আমাকে তারিফ করে করে আমার মস্তকটি যথাবিধি ভক্ষণ করেছিলেন। ফলে আমি প্রমথবাবুর সাহিত্যকুঞ্জে সেদিন দারুণ দাপাদপি করলাম। "সাতটি সুর" নিয়ে নয়, মালকোষের পাঁচটি পর্দা নিয়ে। সে সময়ে আমার গলা খুবই হাল্কা ছিল—যেদিকে চাইতাম বেঁক নিত একটুও চিড় না খেয়ে।

গান শেষ হতেই—স্পষ্ট মনে আছে—সত্যেন বলল : "কাছে আসুন, আপনার সঙ্গে ভাব করি।"

মন আমার গর্বে প্রায় "জয় বীর উন্নত তব শির" বলত নিশ্চয়ই—কেবল কাজি তখনো বিদ্রোহী কবিতাটি লেখেন নি বলেই পারে নি—সাক্ষাৎ সত্যেন বোস যেচে আলাপ করতে ডাকছে—যে মেধাবী ছাত্রমহলে উজ্জ্বলতম কোহিনূর! এ-যুগের অনেকে হয়ত কল্পনাই করতে পারবেন না, সে-যুগে আমরা সত্যেনের নাম শুনলেও সম্ভ্রমে ভাবোচ্ছ্বাসে কী রকম রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতাম। তার উপরে আমি চিরদিনই স্বভাবে "হিরো-ওয়র্শিপর"। দেখতে দেখতে সত্যেন হয়ে উঠল মেধাবী ছাত্রচূড়ামণিদেরও চূড়ামণি—দি ব্রাইটেস্ট অব দি ব্রাইট যাকে বলে। সুভাষকে বাদ দিলে—কারণ সুভাষ আমার কাছে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরবী—সত্যেনের মতন এমন অপরূপ মানুষ সে-সময়ে আমার চোখে পড়ে নি ; একটি উর্দু গজলের ভাষায় :

য়ুঁ তো ক্যা ক্যা নজর নহীঁ আতা
কোঈ তুম্‌সা নজর নহীঁ আতা
ভুবনে কী আছে—নয়ন দেখতে যা না পায়।
শুধু তোমার মতন কারেও দেখল না হেথায়!

সত্যিই সে সময় আমার আশ্চর্য লাগত ভাবতে যে, সত্যেন কেমন ক'রে আমার বন্ধু হ'ল! সুভাষের সঙ্গে বন্ধুত্ব বোঝা যায়—তার সঙ্গে পড়ি এক ক্লাসে, দেখা হয় প্রায় রোজই—বলতে গেলে সে ও আমি সে-সময়ে পাশাপাশি চলেছি একই রঙিন কল্পনার উধাও তরণীতে—তার উপর সুভাষ ছিল সে-সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের উজ্জ্বলতম রত্ন, তার উপর থাকতও কাছেই। সত্যেন থাকত অনেক দূরে—তার উপর ছাত্রও নয়—তরুণ অধ্যাপক—যোগসূত্র কোথায়? কিন্তু নিয়তি মিলন ঘটান অনেক সময়েই বিনি-সুতোর মালার বন্ধুবরণে—কাজেই বাইরের দিক দিয়ে তার ও আমার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান থাকা সত্বেও সে আমাকে দুদিনেই এমন আপন ক'রে নিয়েছিল যে, আজো ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়! কারণ আমি যতই বুদ্ধির অহঙ্কার করি না কেন, সত্যেন যে বুদ্ধিতে আমার চেয়ে অনেক বড় এটুকু স্বীকার করতে আমার বাধত না। বাধবার কথাও নয়, যেহেতু তার বুদ্ধির বল্লম নিয়ে সে কাউকেই খোঁচা দিত না। মুখে তার এমন একটা শান্ত কমনীয়তা মাখা থাকত যে, সে সুভাষের মতন সুপুরুষ না হলেও তাকে দেখলে কেউই আকৃষ্ট না হয়ে পারত না। "সবুজচক্রে" সে বেশি কথা বলত না বটে, কিন্তু সবাই খুশি হত যখনি সে স্নিগ্ধ হেসে এর ওর তার সঙ্গে জুড়ে দিত, সবাই মন দিয়ে শুনত যখন যে কোনো প্রসঙ্গে সে কোনো মন্তব্য করত। সবচেয়ে সহজিয়া ছিল সে আলাপ করার আখড়ায়। বেশ মনে আছে—আমাকে ডেকেই সে দেখতে দেখতে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' বলা শুরু করল। বিদায় নেবার সময় বলল: "২২ নম্বর ঈশ্বর মিল লেন—কেমন? আসবে তো?"

"আসব না? বাঃ।"

এর পরে দুদিন যেতে না যেতে সত্যেন আমাকে তুই বলা সুরু করে দিল—এমনই সহজে যে আমার মনে হ'ত তার সঙ্গে পরিচয় বহুদিনের। আমাদের বন্ধু-মণ্ডলীর মধ্যে কেবল ধূর্জটি সত্যেনের এই ভঙ্গিটি খানিকটা মক্‌শ ক'রে নিয়েছিল—এই দেখতে দেখতে সদ্য-পরিচিতকে তুই-তোকারি করা। বলা বাহুল্য এ পারে কেবল সেই যে আপনি পারে—তালিম নিয়ে ঘনিষ্ঠ হবার এ-ওস্তাদি অর্জন করা যায় না। ধূর্জটিও পারত সেও ভাব করতে ওস্তাদ ছিল ব'লে।

আরও একটা দৃষ্টান্ত দেই সত্যেনের এই আশ্চর্য সহজিয়া ছন্দের! মেলামেশায় আমিও বড় একটা কেওকেটা ছিলাম না, শুধু এদেশেই নয়, ওদেশেও যেখানেই গিয়েছি বন্ধুত্ব পাতিয়ে এসেছি—আর এমন স্বভাবের মানুষের সাথে যার জীবনাদর্শের সঙ্গে আমার জীবনাদর্শের সম্বন্ধ প্রায় অহিনকুলেরই বলব। কিন্তু সব মেনেও

সত্যের খাতিরে আমি বলতে বাধ্য যে সত্যেনের কাছে নানাভাবেই দীক্ষা পেয়েছি মেলামেশার অন্তরঙ্গ মন্ত্রে : তার টেকনিক থেকেও বেশ কিছু শিখেছি—কী ভাবে অচেনাকে আপন ক'রে নিতে হয়। সে প্রায়ই বলত একটা কথা মনে আছে—তার ভাষায়ই বলতে চেষ্টা করি :

"আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষায় অনেক ত্রুটি আছে রে ভাই। কিন্তু বল্ তো, স্কুল কলেজের সবচেয়ে বড় দান কী ?"

আমি : তুমিই বলো না।

সত্যেন : রকমারি সহপাঠীদের সংস্পর্শে আসা। অন্তত আমার ছাত্রজীবনের সবচেয়ে বড় লাভ বই পত্র অধ্যাপকদের লেকচার নয়—সতীর্থদের সঙ্গে নিত্যনতুন প্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিয়েই আমি পথচলার সবচেয়ে বেশি পাথেয় পেয়েছি। যারা শুধু পড়াশুনায় ভালো ছেলে তারা তথ্যের বা জ্ঞানের কোঠায় হয়ত সবই পেতে পারে, কিন্তু পায় না বহুর অমূল্য সংস্পর্শের মনজাগানিয়া দান। আমাদের তরুণ মন সত্যি জেগে ওঠার জন্যে এই সখ্যের অপেক্ষা রাখে বিশেষ করে কৈশোরে ও যৌবনে।

কথাটা কিছু নতুন নয় ; হয়ত অনেকে বলতে পারেন : "এ এমন কী বাণী যা টুকে রাখবার ম'ত ? কিন্তু সত্যেনের গভীর তৃপ্তিদায়ক বন্ধুত্ব ও অনাড়ম্বর অন্তরঙ্গতার মধুর স্বাদ যে মানুষ পেয়েছে সে সেই মধুস্বাদের রসভাষ্যে একথার নিহিতার্থটুকু খুঁজে পাবেই পাবে, বুঝতে পারবেই পারবে মেলামেশার মধ্যে দিয়ে সে অনেক কিছু আহরণ করত ব'লেই পারত অনেক কিছু দান করতে। কিন্তু এ-দান ও গ্রহণ কেবল তাকেই সবচেয়ে সমৃদ্ধ করে যার স্বভাব নিতে ও দিতে পারে সহজিয়া ছন্দে। একটা উদাহরণ দিই আমার বক্তব্যটিকে ফলাও করে তুলতে : প্রকৃতিকে কে না ভালোবাসে ? নদী পাহাড় লতা পাতা মেঘ জ্যোৎস্না গ্রহ তারা আকাশ কার চোখকে না মুগ্ধ করে ? কিন্তু ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়ের প্রতি তন্তু নিসর্গশোভা থেকে যে-অফুরন্ত রস টেনে নিত—যার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে-প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে

লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে বরষে বরষে···
সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়িতে আজি করিছে নর্তন—

সে-ভাবে প্রকৃতিতে আত্মসাৎ করতে পারে কোটি কোটির মধ্যে কয়জন? একই অনুভব নানাভাবে নানা লোকের কাছে আসে, কিন্তু যার কাছে কোনো বিচিত্র অনুভব ধরা দেয় তার গভীরতম স্বাদ নিয়ে—তাকে বলব না সে-ভাবের বিশেষজ্ঞ, দরদী, জহুরি? সত্যেনের মনে মানুষের সৌহার্দ্য এমন এক অপরূপ রঙে রঙিন ও রসে রসাল হয়ে জানান দিত যে আমি আমার কৈশোরে ও যৌবনে বরাবরই তাকে মনে মনে প্রণাম করে বলেছি: "এ তুমিই পারো ভাই আমি পারি না।" এর একটা কারণ আমার মন এক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল বরাবরই। মানুষ আমার কাছে প্রিয় হলেও আরাধ্য বা উপাস্য হয় নি কোনোদিনই। আমি বরাবরই নানাদেশের মানুষকে কাছে টেনে নিয়েছি, তার স্নেহপ্রীতির ডাকে অকুণ্ঠেই ধরা দিয়েছি একটিবারও বিদেশীকে তার বৈদেশিকতার জন্যে সন্দেহের চোখে না দেখে—কিন্তু অনুক্ষণই কে যেন আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে: "সাবধান! এতে শেষরক্ষা হবে না। মানুষকে যদি সত্যি আপন করতে চাও তবে সব আগে ভগবানকে আপন ক'রে পেতে হবে। কেন না তাঁকে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসতে না পারলে মানুষকে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসতে আর যেই পারুক না কেন—তুমি পারবে না, কেন না তোমার স্বধর্ম বিশ্বমানব মহিমাকীর্তন নয়—ভগবদ্‌ভক্তিই বটে।"

ঝোঁকের মাথায় একটু অবান্তরের অবতারণা করে ফেললাম হয়ত। কিন্তু সহৃদয় পাঠকরা পুরোপুরি সহৃদয় হলে হয়ত এহেন অনাধুনিক কথা শুনে বিরূপ হবেন না এই সেকেলে মানুষটির প্রতি, যে এখনো বিশ্বাস করে যে মানবপ্রেমকে মানুষের মধ্যে দিয়ে আংশিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হলেও পুরোপুরি উপলব্ধি করতে হলে সব আগে তাঁকে জানতে হবে যাঁর নাম "বিশ্বকর্মা দেব" যিনি "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" আমার "দি কুম্ভ"* বইটিতে আমি উদ্ধৃত ক'রেছি—সক্রেটিসকে একজন বলেছিলেন: তুমি মানুষকে বুঝতে চাইছ? কিন্তু ভগবানকে না জেনে কে কবে মানুষকে বুঝেছে, জেনেছে, চিনেছে?" একথা আমার কোনদিনই অনাদরণীয়

* The Kumbha—India's Ageless Festival.

জনশ্রুতি মনে হয় নি : বরং আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে মানুষের গভীরতম সত্য হল তার আত্মিক সত্য যার অন্য নাম পারমার্থিক সত্য। তাই যখনই জীবকে মিলতে দেখেছি সৌভ্রাত্রযজ্ঞে তখনই আমার মন বলেছে এ-যজ্ঞে শিবকেই প্রধান পুরোহিত না করলে সে হয়ে দাঁড়াবে দক্ষযজ্ঞ।

কিন্তু আমার কৈশোর ও যৌবনের চঞ্চলতার লগ্নে আমি একথাকে স্বীকার করলেও ঠিক অঙ্গীকার ক'রে নিতে পারিনি সর্বান্তঃকরণে। কারণ সে-সময়ে অন্তর গহনে প্রায় সব ভাগবত সত্যকেই খানিকটা দুরধিগম্য মনে হ'ত ব'লে ভগবানকে আমার মন বরণ ক'রে নিলেও প্রাণ মানুষের সংস্পর্শে দুলে উঠে ভুলে যেত যে জীব যতদিন শিবকে পেয়ে দিব্যদৃষ্টি অর্জন না করে ততদিন জীবের মধ্যে সে কিছুতেই শিবকে দেখতে পায় না, আর এ-দিব্যদর্শন বিনা সর্বজীবে প্রেম আসা অসম্ভব।

কিন্তু সত্যেনের মধ্যে এ ধরনের কোন দ্বন্দ্ব ছিল না ব'লে ও স্নেহের প্রীতির আনন্দমেলায় নিজেকে উজাড় ক'রেই বিলিয়ে দিতে পারত। সত্যি কী সহজেই না ও আত্মীয়তা করত! শুধু আত্মীয়দের সঙ্গেই নয়, অনাত্মীয়দের সঙ্গেও বটে। এর একটা দৃষ্টান্ত দেই—আমার মেজমামিমার সঙ্গে সত্যেনের স্নেহ সম্বন্ধ। সত্যেন থিয়েটার রোডে আসতে না আসতেই তাঁকে "মামিমা!—কই? চা কই?—কোথায় আপনি? আহা, কাজ থাক্ এদিকে আসুন—গল্প করি—" এই ধরনের সম্ভাষণে তাঁর চিত্ত জয় ক'রে নিল; তিনি আমাকে বলতেন: "তোর বন্ধু সুভাষ চমৎকার ছেলে বটে, কিন্তু সত্যেন একেবারে অপরূপ।"

আমি (তটস্থ)। সুভাষও অপরূপ, মামিমা!

মামিমা: তুই সময় সময় কেমন যেন—ইয়ে হয়ে দাঁড়াস। সুভাষ যে অসাধারণ কে না মানবে? কিন্তু সত্যেন যেভাবে পরকে আপন করে নিতে পারে—

আমি: সুভাষও পারে। তার কত বন্ধু—

মামিমা: যাঃ, তোর সঙ্গে কথাই কইব না। তুই বুঝেও বুঝতে চাচ্ছিস না আমি কী বলতে চাইছি। এই যে সত্যেন থিয়েটার রোডে আসতে না আসতে আমাদের সবাইকে মামা মামিমা মাসিমা ডেকে আপন করে নিল, সুভাষ পেরেছে?

মামিমা সত্যিই সত্যেন বলতে অজ্ঞান ছিলেন। আমার যত বন্ধু থিয়েটার রোডে আসতেন—আর আমার বন্ধু ছিল কি একটা?—তাদের মধ্যে মামিমা সবচেয়ে স্নেহ করতেন সত্যেনকে, তার পরেই ধূর্জটিকে। সুভাষকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন বেশি,—স্নেহ করতে যেন তেমন সাহস পাননি। উত্তরকালে সুভাষ যখন নেতাজী হয়ে

দাঁড়ায় তখন মামিমা বলতেন বটে : "খুব বন্ধু করেছিলি মন্টুবাবু! গান্ধিজির চেয়েও বড়—আহা, কবে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে রে!" কিন্তু এ হ'ল স্তব, স্নেহ নয়, সত্যেনকে তিনি স্নেহ করতেন অকুণ্ঠেই। সত্যেন স্বভাবের মতন চাপা প্রকৃতির মানুষ ছিল না, আড়াল এটিকেট কেতা কানুন না মেনে স্নেহের রাজ্যে প্রীতির এলাকায় ও যেন উড়ে এসে জুড়ে বসত—veni, vidi, vici ঢঙে।*

সত্যেনের সূত্রে মেজমামিমার কথা এসে গেল ভালোই হ'ল, কারণ আগে থাকতেই ঠিক ক'রে রেখেছিলাম যে, স্মৃতিচারণে এই মাতৃকল্পা স্নেহময়ীর তর্পণ আমাকে করতেই হবে। থিয়েটার রোডে আমাকে অনেক আত্মীয়াই স্নেহ করলেও এমন প্রাণ ঢেলে কেউ আমাকে ভালোবাসেনি, আমার হাজারো ঝক্কি বৎসরের পর বৎসর আর কেউ এমন সাগ্রহ স্নেহে বইতে পারত না। বলতে কি, আমার থিয়েটার রোডের জীবনে আমাকে ধারণ করেছিলেন সব আগে দুজন : মেজমামা ও মেজমামিমা। মেজমামার কথা ইতিপূর্বে বলেছি। এবার বলি মেজমামিমার কথা—খানিকটা প্যারেন্থেসিসের ঢঙে—তারপরে ফের সত্যেনের প্রসঙ্গে ফিরে এসে খেই ধরব।

পনরো

মেজমামিমা বড় মামিমার মতনই গরিবের ঘরের মেয়ে। নাম অমিয়া, ডাক নাম মন্দা। অনেকগুলি ভাইয়ের মধ্যে এক বোন। ফুটফুটে মেয়ে, কাজেই খুব আদুরে ছিলেন বিধবা মার। তবু গরিব তো, ধনীগৃহের গৃহিণী হওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু হ'ল কি, আমার এক মাসিমার মৃগী রোগ ছিল। ঘটকালি ক'রে স্থির হ'ল মেজমামিমার ভাই বিয়ে করবেন আমার মাসিমাকে, মেজমামা বিয়ে করবেন দরিদ্রকন্যাকে। মেজমামা আশ্চর্য মানুষ, একেলে হয়েও সেকেলে। মেয়ে না দেখেই বিয়ে করতে রাজি! দাদামহাশয় বললেন : "দেখে আয় মেয়ে। আমাদের পছন্দ হ'লেও, বিয়ে যে করবে তারও তো পছন্দ হওয়া চাই।" কিন্তু মেজমামার 'ভদ্রলোকের এক কথা' : "আপনি নিজে দেখে পছন্দ করেছেন বাবা, তারপরে আমার পছন্দের প্রশ্নই আসে না।" পরে তিনি মেজমামিমাকে চটুল সুরে বলেছিলেন, বাসরঘরে

* আমি এলাম, আমি দেখলাম, আমি সব কিনে নিলাম।

(মেজমামিমার কাছেই শোনা—তিনি সব কথা আমাকে গলগল ক'রে না ব'লে থাকতে পারতেন না): "তোমাকে না দেখেই বিয়ে করব ধনুর্ভঙ্গ পণ তো নিলাম—কিন্তু তার পরে জানো না তো আমার অবস্থা! তোমার বড়দাদাটি যেদিন আমার বোনকে দেখতে এলেন, তাঁকে দেখেই আমার চক্ষুস্থির: এ আলকাতরা দেবের বোন কয়লা দেবী না হয়ে যায় না—হা হতোস্মি! করেছি কী জাঁক ক'রে বীরত্ব করতে গিয়ে!"

ব'লে মেজমামিমার সে কী হাসি! আহা, অমন উচ্ছল হাসি থিয়েটার রোডে আর কাউকে হাসতে শুনিনি। কখনো কখনো সকালবেলা উঠেই তাঁর কলহাস্য শুনতাম পাশের ঘর থেকে। আমি শুতাম তাঁর পাশের ঘরে, আর মনে হ'ত ঝর্নার কথা। সত্যি বলছি, এ অত্যুক্তি নয়। অমন মিষ্টি হাসি আমি জীবনে বেশি শুনিনি মেয়েদের মধ্যে—সাহেবি উপমা সিল্‌ভার লাফ্‌টার মনে পড়ে যেত।

শুধু তাই নয়। ফুটফুটে মেয়ে বৈ কি—অক্ষরে অক্ষরে। তের চোদ্দ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় মেজমামার সঙ্গে। আমি তাঁকে দেখেই মুগ্ধ হই। কী সুন্দর মেয়ে! আর শুধু প্রচ্ছদটুকুই সুন্দর নয়, অন্তরের স্নেহ দয়া পবিত্রতা তাঁর মুখকে আরো যেন কমনীয় ক'রে তুলেছিল। কারুর দুঃখ কষ্টের কথা শুনলেই তাঁর চোখ ছলছল ক'রে উঠত, বিশেষ ক'রে দুর্ভাগা সর্বহারাদের দুঃখ কষ্ট দেখলে তিনি সইতে পারতেন না। গোপনে কত দুঃস্থকেই যে সাহায্য করতেন—জানতাম কেবল আমি। কারণ আমাকে তিনি কোনো কথাই না জানিয়ে থাকতে পারতেন না। মাতৃস্থানীয়া মামিমা তথা খেলার সাথী তথা বান্ধবী—এরকম অঘটন হিন্দু পরিবারে বেশি ঘটে ব'লে মনে হয় না, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সত্যিই ঘটেছিল। তাঁর স্নেহ-কোমল পবিত্র হৃদয়টির সম্বন্ধে কত কথাই লেখবার আছে, কিন্তু আজ কেবল একটি ঘটনার কথাই বলব।

দাদাঠাকুর শরৎ পণ্ডিতের কথা বাংলা দেশে অনেকেই জানেন। এমন তেজস্বী রসিক কোনো দেশেই বেশি জন্মায় না। বিশেষ ক'রে দরিদ্র ব্রাহ্মণের পরিবেশে। তাঁর আশ্চর্য জীবনের সম্বন্ধে যাঁরা নানা রসাল খবর পেতে চান তাঁরা আমার প্রাক্তন বন্ধু শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের "দাদাঠাকুর" বইটি পড়তে পারেন। এ-মানুষটি মুখে মুখে চমৎকার সরস ছড়া কাটতে পারতেন। সভায় মজলিশে দাদাঠাকুর থাকলে রসের হিল্লোল বইত অশ্রান্তধারে। য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে

আমার এক চ্যারিটি কন্সার্টে তিনি একবার তাঁর বিখ্যাত "কলকাতার ভুল" গানটি গেয়ে আসর জমিয়েছিলেন। গানটির তিনটি শ্লোক মাত্র উদ্ধৃত করি :

মরি   হায়রে, কলকাতা কেবল ভুলে ভরা!
ভাবি   কলুটোলায় কলু আছে, আছে তাদের ঘানি :
দেখি,   কলুর বদল বস্তি সেথা করে তেল আমদানি!
আমি   মুর্গিহাটায় টুক ক'রে যাই কিনতে ভাই রামপাখি :
দেখি,   সারি সারি স্টেশনারি, আসল জিনিস ফাঁকি!
আমি   ভেবেছিলাম রাধাবাজার শ্যামবাজারের বাঁয়ে :
দেখি,   শ্যাম গিয়েছেন বহুৎ দূরে রাধার মানের দায়ে!

এ-গানটি গাইবার সময়ে স্টেজেরই একজন তাঁকে বললেন : "সবই হ'ল কেবল থিয়েটার রোডটি বাদ দিলেন কেন?" দাদাঠাকুর এক সেকেণ্ড চুপ ক'রে থেকে ধরলেন সেই বিরাট সভায় :

আমি   দেখি থিয়েটার রোডে নেই থিয়েটার তো হায়!
তবে   থিয়েটারের সাধ মেটালো দিলীপকুমার রায়।

শুনে শ্রোতাদের সে কী হাসি। মেজমামিমা তো মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে প্রায় দমবন্ধ হবার জো!

গান শেষ হ'লে তিনি গিয়ে দাদাঠাকুরকে প্রণাম ক'রে আমাকে ফিসফিস ক'রে বললেন : "ওঁকে আমাদের ওখানে একদিন নিয়ে আয় না।" আমি দাদাঠাকুরকে বলতেই সদাশিব মানুষটি এক গাল হেসে বললেন মামিমাকে : "কাঙালকে কি শাকের ক্ষেত দেখায় মা?"

এলেন পরদিন। মামিমা তাঁকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়ালেন। শেষে চিনিপাতা দই পরিবেষণ ক'রে সলজ্জে : "দইটুকু ভাত দিয়ে মেখে খাবেন দাদাঠাকুর, ফেলবেন না", বলতেই দাদাঠাকুর হেসে জবাব দিলেন : "খাব বৈ কি মা, দইভাত আমার দৈবাৎ জোটে।"

মেজমামিমার চোখে জল চিকচিক ক'রে উঠল; কোনোমতে অশ্রুগোপন ক'রে দাদাঠাকুরকে খাওয়ালেন। তিনি চ'লে যাবার পর আমাকে বললেন : "বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে বাবা এমন কথা শুনলে। ওঁকে আর একদিন ডাকিস। আজ কিছুই তেমন খাওয়াতে পারিনি!"

মেজমামাও ছিলেন স্বভাবে পরোপকারী, তাই মামিমা দুঃস্থদেরকে সাহায্য

করলে কখনো আপত্তি করতেন না। স্ত্রীকে তিনি শুধু গভীর স্নেহ নয়, সত্যিই শ্রদ্ধা করতেন। এমন সুখী দম্পতী আমি জীবনে বেশি দেখিনি। মেজমামা ছিলেন রসিক। গাইতেও পারতেন। মাঝে মাঝেই পিতৃদেবের হাসির গান গুনগুন ক'রে গেয়ে মামিমাকে খ্যাপাতেন:

আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই,
আর তোমরা বসিয়া খাও।
আমরা দুপুরে আফিসে ঘামিয়া মরি,
আর তোমরা নিদ্রা যাও।

মেজমামিমা কিন্তু তাঁর খ্যাপানোতে খেপতেন না, হেসেই খুন হতেন। মেজ-মামা তাঁকে ঠাট্টা করলে তিনি ঢিলটি খেয়ে পাটকেল ফিরিয়ে দিতেন বটে, কিন্তু মেজমামার অসাক্ষাতে আমাকে অনেকদিনই বলতে বলতে চোখ মুছেছেন: "আমি বোধহয় আর জন্মে অনেক তপস্যা করেছিলেন বাবা, তাই পেয়েছি এমন শিবতুল্য স্বামী।" জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি স্বামীর সেবা করেছেন নিজে হাতে কুটনো কেটে—যার কোনো দরকারই ছিল না, কেননা, ধনিগৃহে চাকর বাকরের অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু স্বামিসেবা তাঁর কাছে ছিল জীবনসাধনার সামিল। অথচ তিনি সর্বদাই এত হাসিখুশি থাকতেন যে, কেউ টের পেত না তাঁর হৃদয়ের তল—দয়ামায়ার দিশা।

ভাবতে গেলে আশ্চর্য লাগে আজো। আমার চেয়ে বয়সে ছ মাসের ছোট—বিয়ের পর সত্যিই থিয়েটার রোডের ছাদে আমি আমার মাসিদের ও ছোটমামা নরেনকে নিয়ে কতদিনই না তাঁর সঙ্গে লুকোচুরি, কানামাছি খেলেছি, মধুপুরে খোলা মাঠে দৌড়াদৌড়ি, হেঁটে ক্ষীণধারা নদী পার, পিকনিক, গান বাজনা, তর্কাতর্কি, হাসাহাসি, গান গল্প—কী নয়? আমার নানা আনন্দমেলায়ই এই কলোচ্ছলা আনন্দময়ী ছিলেন একজন প্রধান যোগানদার। কিন্তু তবু এই একরত্তি মেয়েই দুদিনে হয়ে দাঁড়ালেন মাতৃকল্পা, বলা শুরু করলেন "মণ্টুবাবা!"—যেন আমাকে তিনি আশৈশব হাতে ক'রে মানুষ করেছেন! শুধু তাই নয়—কিমাশ্চর্যমতঃ-পরম্?—আমি যে আমি—এত বিজ্ঞ অকালপক্ব তার্কিক—দেখতে দেখতে তাঁকে মার স্থানে বসিয়ে তাঁর আশীর্বাদ বরণ ক'রে নেওয়া শুরু করলাম গম্ভীরভাবে, না হেসে! পরে সারা বিশ্ব ঘুরে এই কথাই আমার মনে হয়েছে যে, এ-ধরনের অঘটন ঘটতে পারে কেবল আমাদের দেশে—ওদেশে পনরো বছরের কোনো মেয়ের মনে সমবয়সী

ভাগনের প্রতি এমন সহজ মাতৃস্নেহ জাগতেই পারে না। কোনো সুন্দরী জন্ম-অনাত্মীয়ার সঙ্গে যে এমন অনাবিল মধুর স্নেহসম্বন্ধ গ'ড়ে উঠতে পারে—যার মূল ও পাল্টা ছন্দ মাতৃস্নেহ ও সন্তানভাব—এ আমি মেজমামিমাকে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না।

শুধু মাতৃস্নেহই নয়—তিনি ছিলেন আমার দরদী, ব্যথার ব্যথী, শুভার্থিনী, সর্বোপরি আমার স্নেহময়ী অভিভাবিকা, ধাত্রী পরিবেষিকা। আমার হাজারো ঝক্কি বইতেন তিনি যে কী হাসিমুখে—যে মনে হ'ত ঝক্কি বইতেই তাঁর আনন্দ। "মণ্টু বাবা যে ভুলো—ওকে আমি না দেখাশুনো করলে ওর গতি কী হবে?" বলতেন তিনি প্রায়ই স্নেহসজল কণ্ঠে। "ভুলো" বলতে মনে পড়ল, কত সময়ে কত বিপদেই না তাঁকে পড়তে হয়েছে আমার জন্যে! কতবারই এমন ঘটেছে যে, দু' তিনজন বন্ধুকে দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ ক'রে ভুলে গেছি মামিমাকে বলতে, বন্ধুরা আসতে চোখ কপালে তুলে দৌড়ে এসে বলেছি: "কী সর্বনাশ, মামিমা! ঐ দেখ, বলতে ভুলে গেছি—আজ সকালে সত্যেন, ধূর্জটি, নীরেনকে এখানে খেতে নিমন্ত্রণ করেছি।"

বেলা তখন দুপুর। মামিমা একটুও বিরক্ত না হয়ে শুধু গালে হাত দিয়ে বললেন: "মা গো মা! কী ছেলে তুমি বাবা বলো তো! এখন আমি ওদের কী খেতে দিই? যা হোক, ভোগো—কর্মফল। ব'সে থাকো দেড়টা পর্যন্ত পেটে কিল মেরে।" ব'লেই বেরিয়ে এসে বন্ধুদের কাছে, এসে: "তোমাদের বন্ধুটি তোমাদের কখনো নিমন্ত্রণ করলে আমাকে জানিও কিন্তু, নৈলে ফের এই অবস্থা হবে। বোসো এখন, আমি লুচি ভাজি।"

যে-কথা সেই কাজ। মামিমা বসলেন সব কাজ ছেড়ে লুচি ভাজতে, চাকরকে পাঠালেন বাজারে দই রাবড়ি মিষ্টান্ন আনতে, সরকার ছুটলেন সাইক্লে চপ কাটলেট আনতে। সত্যি সত্যি দেড়টা বাজেনি, একটার মধ্যেই পাত পড়ল অন্নপূর্ণার দাক্ষিণ্যে। বন্ধুরা চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয়ের সদ্ব্যবহার করে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে আড় হলেন। এরকম পরিস্থিতি থিয়েটার রোডে প্রায়ই হ'ত। মুশকিল ঘটাতে আমি, আসান করতে মামিমা।

উল্টো ভুলও ঘটত। একবার ভারি মজা হয়েছিল। দুতিন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছি খেতে, মামিমা ডাকলেন: "এসো বাবা! খাওয়ার জায়গা হয়েছে।" খেতে বসেছি, এমন সময়ে সুভাষের এক ভাইপো এসে হাজির। "এ কী দিলীপবাবু!

আপনি খাচ্ছেন? ওদিকে রাঙাকাকা যে আপনার জন্যে বসে। আরো অনেকে এসেছেন আপনার গান শোনাবারও কথা ছিল—খাওয়ার আগে!"

শুনে মামিমার সে কী হাসি! এর পরে আমার আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে বোধহয় এমন কেউ ছিল না যার কাছে তিনি আমার এ-কীর্তির কথা ফলাও ক'রে না বলেছেন। কেউ এলেই: "জানো সত্যেন, জানো নীরেন, জানো ধূর্জটি মণ্টুবাবুর কাণ্ড······" ব'লে ব্যাখ্যা জুড়ে দিতেন যতিহীন হাসির সঙ্গতে।

আমি অন্যমনস্ক ছিলাম ব'লে মামিমা এক চাকর রেখেছিলেন আমার একটু আধটু দেখাশুনো করতে। নাম শম্ভু। অমন আশ্চর্য চাকর আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। জাতে উড়িয়া, কিন্তু বাংলা বলত চমৎকার। সে এসেছিল মেজ-মামার চাকর হয়েই, আমার দুটি ঘর তার ঝাঁট দেওয়ার কথা মাত্র। কিন্তু তার মন হঠাৎ আমার দিকে এমনিই ঝুঁকল যে, দুদিন যেতে না যেতে সে শুধু যে আমাকে রাজার হালে রাখত তাই নয়, আমার টাকাকড়ি, বইপত্র, খাওয়া-দাওয়া সব কিছুরই তদারক করতে লেগে গেল। আমার টেবিলের একটা খোলা ড্রয়ারে আমার টাকা থাকত, আমি বেরিয়ে গেলেই সে ড্রয়ারটা চাবি দিয়ে রাখত পাছে অন্য কোনো চাকর কি দাসী চুরি করে। শুধু তাই? আমি বাড়ি না থাকলে আমার কোনো বন্ধুবান্ধব এলে শুধু চা-যোগই নয়, জলযোগ না করিয়ে ছাড়বে না। বাজারের খাবার নয়, নিজে চমৎকার রাঁধতে পারত—চপ, কাটলেট, লুচি, আলুর দম রেঁধে করবে অতিথিসেবা। আমার কয়েকটি বন্ধু মাঝে মাঝে আমার কাছে টাকা নিতেন ধার হিসেবেই, কিন্তু নিয়ে শোধ দিতে ভুলে যেতেন। কিন্তু শম্ভু কি ভুলবার পাত্র? আমাকে থেকে থেকে যেন সরলভাবেই মনে করিয়ে দেবে—অমুক সেদিন ত্রিশ টাকা ধার নিয়েছেন, অমুক পঞ্চাশ, অমুক দশ······। সে নিজেও থাকত এমন ফিটফাট পরিষ্কার ধুতি পাঞ্জাবি প'রে যে, তাকে আমার কোনো কোনো রসিক বন্ধু শম্ভুবাবু ব'লে ডাকতেন। সে একটুও বিচলিত না হয়ে ফিক ক'রে হেসে যথোচিত খাতির ক'রে চা খাবেন কিনা জিজ্ঞাসা ক'রে প্রস্থান করত। মেজমামা ও মেজমামিমা দুজনেই তাকে স্নেহ করতেন আরো সে আমার দেখাশুনো করত ব'লে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সে হয়ে উঠল উদ্ধত, এমন কি মেজমামিমা তাকে কোনো হুকুম করলেও তামিল করত না, সাফ ব'লে দিত: "আমি পারব না, আমি আপনাদের চাকর নই, মণ্টুবাবুর চাকর।" কিন্তু মেজমামিমার এম্‌নিই গঙ্গাজলের ম'ত স্বভাব ছিল যে, রাগ করা দূরে থাক, বাড়ির অন্য কেউ রাগ করলে তাকেও তুতিয়ে পাতিয়ে

ঠাণ্ডা করতেন, বলতেন: "আহা, ও মণ্টুবাবাকে ভালোবাসে রে—অমন চাকর এ-ঘোর কলিতে হয় না। ওকে কেউ কিছু বোলো না। মণ্টুবাবা যে ভুলো ও-রকম একটা চাকর তার দরকার। অনেকেই তাকে ঠকাতে চায়, কেবল শম্ভু আছে ব'লেই পারে না······" ইত্যাদি।

জহুরিই জহর চেনে: ভালো যে সত্যি বেসেছে সেই বোঝে ভালোবাসার মর্ম।

কিন্তু মজার কথাটা এই যে, যে-চাকর তাঁকে অসম্মান করত "আমি মণ্টুবাবুর চাকর" বলে সে মাস মাইনে ও বকশিশ পেত আমার কাছ থেকে নয়—তাঁরই কাছ থেকে। চাকরের কাছে বার বার অপমানিত হয়ে সহ্য ক'রেও তাকে বাহাল রাখা পরের ছেলের প্রতি স্নেহের খাতিরে—এমন অদ্ভুত স্নেহ আর কেউ দেখেছেন কিনা জানি না, তবে আমি আর দেখি নি এই ষাট বৎসরেও।

মেজমামিমার শুধু এক খেদ ছিল: "মণ্টুবাবা রাঙা বৌ আনল না।" এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন পুরো দস্তুর পাকা গিন্নী। তাই দিদিমা ও মামিমাদের সঙ্গে আমার বিবাহ নিয়ে নানা চক্রান্তেই তিনি শুধু যে যোগ দিতেন তাই নয়—ছিলেন একজন প্রধান উদ্যোগিনী—রিং লীডার। একবার হ'ল কি, আসামের এক রাজমন্ত্রীর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের দুরন্ত প্রস্তাব এল। এরকম ঘটত গড়ে প্রতি তিন চার মাস অন্তর। আমি যথা পূর্বং তথা পরং—ঘাড় নেড়ে স্রেফ ডিসমিস। মামিমা নাছোড়-বান্দা: "ওরে, মেয়েটিকে একবার চোখে দেখেই আয় না, বিয়ে নাই করলি!"

ভগবৎ-বিশ্বাসে আমি সেকেলে হলেও বিবাহ-সংক্রান্ত শুভবুদ্ধিতে ছিলাম পুরোদস্তুর একেলে, তাই এ-ধরনের কথা শুনলে ভারি রেগে যেতাম। বলতাম: "তোমাদের মেয়েদের সব ভালো মামিমা, কেবল আত্মসম্মান জ্ঞান নেই—মেয়ে দেখব মানে? মেয়ে কি গরু না ঘোড়া যে দেখতে গেলাম, পছন্দ হ'লে ঘরে আনলাম, নৈলে বরখাস্ত! ধিক্!

মামিমা (অম্লানবদনে): আচ্ছা তাই সই বাবা, তাই সই। তবু দেখে আয়, লক্ষ্মীটি!

আমি রেগে "না" ব'লেই বেরিয়ে যেতাম বাড়ি থেকে। কিন্তু বলে না ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে? একদা মামিমা সব ঠিকঠাক ক'রে তবে আমার কাছে এসে ফাঁস করলেন তাঁর কীর্তি। বললেন: "ও মণ্টুবাবু! আজ বিকেলে চায়ের সময়ে বাড়ি থাকিস্, বুঝলি?"

আমি (তটস্থ): কেন শুনি?

মেজমামিমা : সেই পরমাসুন্দরী ডানাকাটা পরীটিকে চা-য়ে নিমন্ত্রণ করেছি। (ফিক্ করে হেসে) : কেমন জব্দ! এবার তো আর মেয়ে দেখতে কোথাও যাওয়া নয়। সে নিজে আসবে চা খেতে—তাকে বলা হয়নি তোর সঙ্গে সম্বন্ধের কথা। লক্ষ্মী মণ্টু বাবা আমার! মেয়েটিকে একবারটি দেখ্। দেখলে আর চোখ ফেরাতে পারবি না।

আমি (কৌতূহলী অথচ কুণ্ঠিত) : সেটা কি ভালো হবে—যখন আমি এখন বিবাহ করব না ঠিক করেছি?

মামিমা (কাঁদো-কাঁদো) : অমন করিস নে বাবা! তুই যে ব্রাহ্মদেরও হার মানালি। মেয়েদের সঙ্গে ছেলেরা কি এক আসরে চা খায় না? এতেও দোষ! ধন্যি ছেলে তুই—পান থেকে চুনটি খসলেও কুরুক্ষেত্তর!—আমার মাথা খা, বাবা! লক্ষ্মীটি, না করিস নে। সে আজ ঠিক সাড়ে চারটেয় আসবে। আমরা বলেছি, তুই গান শোনাবি। আরো অনেকে আসছে। টি-পার্টিতে গান, এ তো কতই হয়।

আমি : হয়—কিন্তু তার পিছনে বিয়ের ছায়া থম্‌কে থাকে না।

কিন্তু মামিমাও নাছোড়বান্দা, পিঠে হাত বুলিয়ে, কাকুতি মিনতি ক'রে শেষে আঁচলে চোখ মুছে স্নেহের অভিমানে বললেন : "আমার শাস্তি হবে না তো হবে কার? যে সব জেনেশুনেও ভুলে যায় যে, যম জামাই ভাগনা তিন হয় না আপনা।" আমি আর পারলাম না—বললাম : "আচ্ছা মামিমা, আমি থাকব টি-পার্টিতে, তুমি চোখের জল ফেলো না।"

সেদিন আমার জীবনের একটি অবিস্মরণীয় দিন। কেন, বলছি।

দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে বেশ খুশি হয়েই শুলাম। এ-মেয়েটির অসামান্য রূপের খ্যাতি রবীন্দ্রনাথের "রাজকন্যা বিম্ববতী"র মতনই ছড়িয়ে পড়েছিল। তার বিবাহের পরে যখন তাকে আমি দেখি তখন মনে হয়েছিল বৈ কি যে, ঠাকুরই বাঁচিয়ে দিয়েছেন—তাকে সেদিন দেখলে হয়ত সত্যিই ডুবতাম। কিন্তু যা বলছিলাম :

বিছানায় শুয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়তে শুরু করলাম—হঠাৎ চোখে পড়ল—ভাবের ঘরে চুরি করলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। অমনি বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি মারল : আমি তো ঠিক এই অপরাধই করতে যাচ্ছি—এ তো সত্যি চা পার্টি নয়—মেয়ে দেখাই বটে! এভাবে আমি নিজেকে ঠকাতে পারি কিন্তু ঠাকুর তো ঠকবেন না। সুভাষই বা শুনলে কী বলবে? জীবনে নানা সংকটেই এইভাবে সুভাষ আমাকে মনের জোর দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হ'ল, সুভাষ ক্রমাগত

বলত—আগুন নিয়ে খেলা ভালো না। অথচ আমি তো এই আগুন নিয়েই খেলা করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আমি তো সুভাষ নই—যদি মেয়েটির অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে আমার মন দুর্বল হয়ে যায়—তখন? কিন্তু অমনি মনে হ'ল: পরমহংসদেব বলতেন, সত্যে আঁট না থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, আমি যে মামিমাকে কথা দিয়েছি—থাকব! ব'লে নিজেকে বোঝালাম, আমি মেয়ে দেখছি—কেবল কথা দিয়ে কথা রাখতেই। কিন্তু একটু পরে বুকের মধ্যে এমন অস্বস্তি জমাট হয়ে উঠল যে, আমার অস্বীকার করার আর উপায়ই রইল না যে, আমি রূপের লোভে মেয়েটিকে দেখতে উদ্যত হয়েছি। অথচ মুশকিল—বলও পাচ্ছি না—কী করি? ভাবতে ভাবতে আমার মন যেন কালো হয়ে এল, আমি উঠে ঠাকুরের ছবির সামনে কাতর হয়ে প্রার্থনা করতে শুরু করলাম: "ঠাকুর, আমি বড় দুর্বল বোধ করছি……ওদিকে কথা দিয়েছি……" ইত্যাদি।

ডাকতে ডাকতে চোখে জল। অমনি—কী আশ্চর্য: মনে বল এসে গেল! একেলে বুদ্ধিমান যুক্তিবাদীরা নিশ্চয়ই বিজ্ঞ হেসে বলবেন: "প্রার্থনায় অঘটন? ও আকাশকুসুম—হয় না!" কিন্তু তাঁদের অজ্ঞ হাসির বিজ্ঞ রায়ে আমি হাসি আরো উঁচু পর্দায়। মনে পড়ে টেনিসনের বিখ্যাত কবিতা: More things are wrought by prayer than the world dreams of."

একথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি আমি যে জানি, তাই তো না মেনে পারি না, আর মানতে হয়েছে চোখের জলে—কেন, কীভাবে হয়ত কোনোদিন লিখব—অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করাতে নয় যে, ভগবান্ ডাকলে সাড়া দেন—বিশ্বাসীদের জন্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কিঞ্চিৎ দস্তাবেজ রেখে যেতে। কিন্তু সে অন্য কথা, যা বলছিলাম।

ডাকতে ডাকতে মনে বল এল বটে, কিন্তু কুণ্ঠার রেশ একটু রয়েই গেল যে, মামিমাকে কথা দিয়ে সত্যরক্ষা না করলে মিথ্যাচার হবে নাকি? অমনি কে যেন কানে কানে বলল: "না—কারণ বড় সত্যের জন্যে ছোট সত্যকে ছাড়ার নাম মিথ্যাচার নয় বরং সেই হ'ল খাঁটি সত্যবরণ।" সঙ্গে সঙ্গে সব দ্বিধা অন্তর্দ্বন্দ্ব উবে গেল মুহূর্তে—সূর্যোদয়ে কুয়াশার ম'ত—এক গভীর কৃতজ্ঞতায় মন নীল নিটোল হয়ে উঠল: ঠাকুর ডাকলে সাড়া দেন না কে বলে? আমি তৎক্ষণাৎ উঠে একটি কাগজে লিখলাম: "মামিমা, কিছু মনে কোরো না লক্ষ্মীটি। মুখে তোমাকে বলতে পারলাম না কেননা অন্তরে এখনও দুর্বল বোধ করছি, তুমি ফের চোখের জলে

উপরোধ করলে হয়ত টাল সামলাতে পারব না……"এই ধরনের কয়েকটি ছত্র লিখে দরোয়ানের হাতে দিয়ে বললাম: "মা-জিকো দেনা।" দরোয়ান একটু আশ্চর্য হয়ে মুখের দিকে চাইতেই চম্পট। ক্যামাক স্ট্রীটের মোড় অবধি হনহন ক'রে হেঁটে এক ট্যাক্সি নিয়ে বললাম: "চলো—বিডন স্ট্রীট।"

বিডন স্ট্রীট পেরিয়েই ঈশ্বর মিলের লেন। ট্যাক্সি থেকে নেমে হাজির সোজা সত্যেনের ঘরে।

ঠিক দুপুরে আমাকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে সত্যেন তো অবাক: "কী রে? এমন অসময়ে?" আমি তো বলার জন্যে আকুলি বিকুলি করছি—সত্যেনের কাছে আত্মকাহিনী খুঁটিয়ে বলার আনন্দময় অভিজ্ঞতা—সে কি ভুলবার? কন্‌ফেশনের মধ্যে দিয়ে চিত্তগ্লানি কীভাবে কাটে আমি প্রথম শিখি যে এই দরদীটিরই মাধ্যমে। অথ ব'লে চললাম—যা যা ঘটেছিল।

সত্যেন শুনে হেসেই অস্থির: "যঃ পলায়তি স জীবতি? হাঃ হাঃ হাঃ।"

এ-বিকৃতির মধ্যে কল্পনার রঙের ছোপ একটু আধটু নিশ্চয়ই লেগেছে কিন্তু তা ব'লে কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি ইচ্ছে ক'রে কিছু বানিয়ে লিখেছি। আমি আজো পিছন দিকে তাকালে স্পষ্ট দেখতে পাই সেদিনকার আশ্চর্য অভিজ্ঞতা—সংকটে প'ড়ে প্রার্থনা করতে না করতে সংকটমোচন সত্যেনের! এ-ব্যাপারটি মনে আছে কিনা কেমন ক'রে বলব—হয়ত নেই—এক্ষেত্রে তার গায়ে তো আর আঁচ লাগেনি— তাই সে ভুলে গিয়ে থাকতেও পারে। কিন্তু যার প্রাণ নিয়ে টানাটানি সে ভুলবে কেমন ক'রে?

এরকম ঘটনা আরো হ'ত। একবার সুভাষের ওখানে গিয়েছিলাম ঠিক এইরকমই আর একটি সংকটে—যেকথা ইতিপূর্বে বলেছি। মামিমা মাসিমারা চক্রান্ত ক'রে মাঝে মাঝে বিবাহযোগ্যা কিশোরীকে নিমন্ত্রণ করতেন থিয়েটার রোডে, আর আমি দিতাম চম্পট।

শেষে মামিমাও হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন: "আমার একমাত্র ভরসা এখন কিনি জানিস?"

আমি (হেসে): মধুসূদন?

মামিমা: না। প্রমথবাবু।

আমি (সবিস্ময়ে): প্রমথ চৌধুরী? মামিমা আমার চেয়েও বিস্মিত হলেন, বললেন: "তুই কি বলতে চাস যে, তুই জানিস না?"

আমি : কী ?

মামিমা : যে প্রমথবাবু ঠাকুরবাড়ির প্রজাপতি—ঘটক গো ঘটক, না আরো খুলে বলতে হবে ? তাঁর ওখানে তোকে ও আরো সব চিরকুমারকে এত ঘন ঘন নেমন্তন্ন করেন কেন শুনি ?

আমি সত্যিই আকাশ থেকে পড়লাম—বিশ্বাস না ক'রে মামিমাকে ধমকে বললাম : "মামিমা ! তোমাদের মেয়েদের অনেক কিছুই ভালো কেবল এই সন্দেহ বাতিকটা বাদ।"

উত্তরে মামিমা আমাকে যা বললেন আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—সব বলার দরকার নেই, কেবল তার মর্মটুকু এই যে, প্রমথবাবুর সাহিত্যকুঞ্জে ঠাকুরবাড়ির অনেক কুমারীরই বিয়ের ফুল ফুটেছে গত কয় বৎসরে। মামিমার সঙ্গে তর্ক বাধাব কি ? এক এক ক'রে সন্ত তিন চারটি ফুল ফোটার অপ্রতিবাদ্য "ডেটা" দিয়ে তিনি আমাকে নাজেহাল ক'রে ছাড়লেন। হার মেনে শেষটায় হেসে বললাম : "মামিমা ! এই তোমাকে আমি কিনা ভেবেছিলাম—সরলা বালা ? তোমার পেটে পেটে এত ?"

মামিমা (পিঠ পিঠ) : আর তুমিও কিছু কম যাও না বাবা ! ডুবে ডুবে জল খাও। যেন দেখ নি—প্রমথবাবুর রসচক্রে দিনের পর দিন যেসব সরলা বালা উঁকি ঝুঁকি মারেন তাঁরা আর যারই গন্ধে আসুন না কেন সাহিত্যের গন্ধে মুগ্ধ হয়ে এসে গুনগুন শুরু করেন না।

আমি মামিমার বক্রোক্তিটি অবশ্য একটু রং-চং দিয়ে বললাম, কিন্তু মামিমা ঠাট্টা ক'রে যা বলেছিলেন ও হাতে হাতে উদাহরণ দিয়ে আমাকে নির্বাক করেছিলেন তার মোদ্দা কথাটা যে ছিল এইই—একথা হলপ করে বলতে পারি।

মামিমার ব্যঙ্গ কিন্তু হয়েছিল লক্ষ্যভেদী। ফলে আমি অতঃপর প্রমথবাবুর ওখানে যাওয়া কমিয়ে দিলাম—খানিকটা বাধ্য হয়েই বলব, কেননা একের পর এক তিন তিনটি সম্বন্ধ এল ঠাকুরবাড়ি থেকে। দিদিমা সেকেলে গিন্নী পুরোদস্তুর হিন্দু, বললেন : "ওদের দিকে ঘেঁষিস নি মণ্টু। ওরা হ'ল পিরিলি—আমরা হিঁদু—দা কুমড়ো বুঝলি। তাছাড়া, তুই পিরিলি বিয়ে করবি কী দুঃখে ? তোর ভাবনা কি ? ঐ তো রয়েছে অমুক রাজমন্ত্রীর মেয়ে ডানাকাটা পরী, কিংবা আমার শ্রীরামপুরের সইয়ের মেয়ের মতন ফর্সা মেয়ে, কিংবা অমুক এঞ্জিনিয়ারের ফিটফাট মেয়ে—লাখ টাকা যৌতুক দেবে রে—আর সে মেয়ে ঘরকন্না করতেও জানে, ঘোড়ায় চড়তেও জানে…।"

ষোলো

সত্যেনের মধ্যে অনেক গুণই শুধু আমার নয়—আরো অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এদের মধ্যে একটি হ'ল তার অসামান্য ধৈর্য তথা ঔৎসুক্য। বন্ধুদের দৈনন্দিন জীবনের হাজারো খুঁটিনাটি ও সমস্যার কথা শুনতে সে কখনো বিরক্ত হ'ত না। তাই অনেকেই দেখতাম তার কাছে এসে ধর্না দিত সমাধান চেয়ে। এদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন প্রধান প্রষ্টা—প্রায় নচিকেতার কাছাকাছি: যখনই কোনো প্রশ্ন কি সমস্যা হাজিরি দিত সটান তার কাছে এসে দরবার করতাম। মনে আছে ব্যবহারিক রসায়নের আবহে মন অতিষ্ঠ হ'তে না হতে তার কাছে এসে অশ্রান্ত কাঁদুনি গাওয়া আর তার যথাসাধ্য অভয় দেওয়া—যখন আমি ভয় পেতাম, আমার গতি কী হবে বলে। এমন বন্ধুগত-প্রাণ মানুষ পিতৃদেবের পরে আর আমি দেখি নি। যাকেই একবার বন্ধু বলবে তারই খোঁজ নেবে যথাসাধ্য। আমার এক ধনী জমিদার বন্ধু পাকিস্তানের ফেরে পড়ে যখন বৃদ্ধবয়সে দেউলে হয়ে দিল্লিতে চাকরি নেন, সত্যেন খুঁজে খুঁজে তাঁর দীন ডেরায় গিয়ে হাজির। তখন দিল্লিতে সে রাজ্যসভার সভ্য, মস্ত লোক। কিন্তু তার কাছে ধনী-গরিব, বড়-ছোট ছিল না—বন্ধু হ'লেই হ'ল। এমনি কত বন্ধু বা ছাত্রকেই যে সে পড়াশুনোয় সাহায্য করত, অঙ্ক কষাতো, কখনো বা তার বাড়ি ব'য়ে গিয়ে—যেমন শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ। আমাকেও অঙ্কে সাহায্য করত, যখনই আমি চাইতাম। সময়ে সময়ে সত্যিই আমার খুব গর্ব হ'ত যে, এ হেন মনীষী বন্ধু আমার সুখ-দুঃখের কথা এত মন দিয়ে শোনে—তার অন্য কত জরুরি কাজ রেখে! শুধু তার স্নেহোৎসুক্যও নয়—স্নেহস্পর্শের দাম দেবে কে? আজও ভুলতে পারি না—পথ চলতে এক হাত দিয়ে আমার বা অন্য বন্ধুদের গলা জড়িয়ে গজেন্দ্রগতি। মনে পড়ে কত জায়গায় যাওয়া গল্পালাপ করতে—কখনো শিবপুরে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের ওখানে, কখনো বা শরৎদার ওখানে, কখনো থেকে থেকে কলকাতার বাইরে লম্বা পাড়ি দেওয়া নিছক ভ্রাম্যমাণ হ'তে—সর্বোপরি, একত্রে নানা ওস্তাদের গান শুনতে বাড়ি খোঁজা। একবার মাত্র আছে তাতে আমাতে ঢাকায় রেণুকা সেনগুপ্তার বাড়ি খোঁজা—যে পরে গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল—গেয়ে বঙ্গবিখ্যাতা হয়। পরে যখন তাকে গান শোনাতে গেলাম, প্রায়ই সত্যেন যেত তার কিন্নরী কণ্ঠ শুনতে। গানের সে একজন খাঁটি সমজদার ছিল—ভালো গান শুনবামাত্র এক আঁচড়েই ভালো ব'লে চিনে নিতে

পারত। গানের রসিক হ'তে চেয়ে সে এস্রাজ বাজাতে শিখেছিল। শুধু এখানেই আমি বিজ্ঞভাবে তাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিয়ে মনে মনে যা একটু গর্ববোধ করতে পারতাম। কিন্তু কেবল এই একটি ক্ষেত্রেই—আর সব ক্ষেত্রেই তার নির্দেশ, সমালোচনা, তারিফ থেকে আমি অপর্যাপ্ত লাভ করতাম। তার সাহিত্যিক মতামতে আমার এমনই শ্রদ্ধা ছিল যে তাকে ফরাসী নাটক-নভেল পড়তে দেখে আমি গ্রাণ্ড হোটেলের এক ফরাসী মহিলার কাছে দারুণ গ্রীষ্মেও মোজা প'রে ফরাসী ভাষা শিখতে লেগে গেলাম। দেখে সত্যেন খুব হাসত, কিন্তু সে-যুগে (১৯১৬-১৭ সালে) কি মেমসাহেবের কাছে মোজা পায়ে না দিয়ে কেউ ফরাসী ভাষায় তালিম নেবার কথা ভাবতে পারত?

ফরাসী ভাষা শেখার প্রসঙ্গে প্রমথবাবুর কথার ফের একটু অবতারণা না করলেই নয়। কারণ সে-যুগে তাঁর ফরাসী ভাষাপ্রীতির ছোঁয়াচ আরও অনেক তরুণ মনেই লেগেছিল যার মধ্যে সম্ভবত সত্যেন ছিল একজন—আমি তো বটেই।

প্রথম কথাটা এই যে, প্রমথবাবু আমাদের মতন কিশোর ও তরুণ অনেকের কাছেই হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন খানিকটা কন্টিনেন্টাল কালচারের প্রতীক। কিন্তু আমাদের দেশ তো—একদল লোক উঠে প'ড়ে লেগে গেল প্রতিপন্ন করতে যে সুকুমার বৈদগ্ধ্যের ঝিকিমিকি-লোকে তিনি চিকচিক করলেও সোনা নন। অর্থাৎ ফরাসী ভাষা তিনি ভালো জানতেন না—বলল তারা মুচকি হেসে।

একথা সত্য কিনা কী ক'রে বলব, কারণ আমি সে সময়ে এ-ভাষায় প্রথম পাঠও নিই নি। কিন্তু এটুকু বলতে পারি সত্যের অপলাপ না ক'রে যে, ফরাসী ভাষা তিনি সত্যিই ভালবাসতেন। নইলে তাঁর ফরাসী প্রীতির ছোঁয়াচে আমাদের অনেকেরই উৎসুক মন রাতারাতি রঙিন হয়ে উঠতে পারত না কখনই।

কিন্তু প্রমথবাবুর গুণ-মূল্য নির্ণয়ে এহো বাহ্য। মানে তিনি আমাদের ফরাসী কালচারে মন্ত্রদীক্ষা দিন বা না দিন, বাংলা ভাষার প্রাণশক্তি ও ভবিষ্যৎ প্রগতি সম্বন্ধে অনেক দামী দিশাই দিয়েছিলেন। তাঁর রচনার মধ্যে কোনো আশ্চর্য প্রতিভার নবপ্রভা ঝিলিক দিয়ে না উঠলেও তাঁর ভাষার প্রসাদগুণে আমাদের তরুণ মন উৎফুল্ল না হয়ে পারত না। সত্যেনও তাঁর ভাষার মুন্সিয়ানার সুখ্যাতি করত, সায় দিতেন বিখ্যাত ভাবুক শ্রীঅতুল গুপ্ত। এর পরেও প্রমথবাবুর কৃতিত্ব সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করি কেমন ক'রে—বিশেষ যখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রমথবাবুর সবুজপত্রে মৌখিক

ক্রিয়াপদের আবহে তাঁর অপরূপ "ঘরে বাইরে" সৃষ্টি ক'রে মৌখিক ভাষা সম্বন্ধে আমাদের মন থেকে সব সংশয় ঘুচিয়ে দিলেন প্রমথবাবুকে পূর্ণ সমর্থন করে? আজও মনে পড়ে সবুজপত্রকে তাঁর সার্টিফিকেট দেওয়া প্রতিভার পরম নৈশ্চিত্যের সুরে :

"সবুজপত্র বাংলা ভাষার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেল।......এর পূর্বে সাহিত্যে চল্‌তি ভাষার প্রবেশ যে একেবারে ছিল না তা নয়। কিন্তু সে ছিল খিড়কির অন্দর মহলে।......একবার যেমনি একে আত্মপ্রকাশের অবকাশ দেওয়া গেছে অমনি আপন সহজ প্রাণশক্তির জোরেই সমস্ত বাঁধা আল ডিঙিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে আপন দখল নিয়ে কেবলি এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার কারণ এটা জবর দখল নয়, এই দখলের দলিল ছিল তার নিজের স্বভাবের মধ্যেই। ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত বেড়া তুলে দখল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।"

এ-যুগে এ-ধরনের কথায় বোধহয় কেউই আপত্তি করবেন না, কেন না মৌখিক হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ ও ঘরোয়া ইডিয়ম এখন বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকদের কাছেও সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু সে-যুগে এই গোড়াকার কথাটা স্বীকার করাতেও প্রমথবাবুকে কম বেগ পেতে হয়নি। তাই এখন প্রমথবাবুর কথ্য ভাষার ওকালতি আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধের মতন মনে হলেও তাঁর তর্পণে এ-প্রশস্তি তাঁকে আমাদের দিতেই হবে যে সেযুগে অগ্রাহ্যকে অকাট্য দাঁড় করাতে তাঁকে অনেক লড়তে, অনেক নিন্দা সইতে হয়েছিল—অনেকেই তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল যখন তিনি তার জোরালো ভঙ্গিতে লিখেছিলেন : "আমরা যদি সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ না হয়ে ঘরের ভাষার উপরেই নির্ভর করি তাহলে আমাদের লেখার চাল স্বচ্ছন্দ হবে এবং আমাদের ঘরের লোকেদের সঙ্গে মনোভাবের আদানপ্রদানটাও সহজ হয়ে আসবে।"

একথার উল্লেখ করলাম শুধু প্রমথবাবুকে তাঁর প্রাপ্য প্রশস্তির অর্ঘ্য দিয়ে তাঁর প্রাপ্য সৎসাহসের জয়গান করতেই নয়, সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিচারণী ভঙ্গিতে তাঁকে আমার প্রণাম জানাতে যে তাঁর নির্দেশে বাংলা ভাষার যে ভঙ্গি আমি যৌবনেই অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছিলাম উত্তরকালে কখনও সেজন্যে অনুতাপ করতে হয়নি। স্মৃতিচারণে কোনও সাহিত্যিক থিওরি বা ভাষা-রীতির সমর্থন করতে গিয়ে বেশি তর্ক ফাঁদতে গেলে স্মৃতিচারণের স্বধর্ম লঙ্ঘন করা হবে, তাই এ বিষয়ে ইতি করি শুধু এইটুকু ব'লে যে, সে-যুগে প্রমথবাবু যে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক না হ'য়েও তরুণ মহলে গভীর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন তার কারণ তিনি ভাষায় বর্তমান যুগধর্মের স্বভাবধারার ভবিষ্যৎ-গতি ঠিকই ধরেছিলেন তাঁর ঐকান্তিক সাধনালব্ধ কোনো গভীর

ইনট্যুশনের আলোয়ই বলব, নৈলে রবীন্দ্রনাথ-যে-রবীন্দ্রনাথ তিনিও চল্লিশ বৎসরের অভ্যস্ত ভাষার ইডিয়ম ছেড়ে রাতারাতি মৌখিক ভাষার দিকে মোড় নিতেন না বরাবরের জন্যে। এর পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষার যে-দীপ্তি দিনে দিনে একটানা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতরই হ'য়ে উঠেছিল তার জন্যে প্রমথবাবুর সাহিত্যনিষ্ঠা ও সৎসাহসের কাছে কিছুটা ঋণ স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রে মৌখিক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন অনেক আগেই বটে, কিন্তু তবু একথা না মেনেই উপায় নেই যে, তিনি খানিকটা প্রমথবাবুর যুক্তিতে সায় দিয়েছিলেন ব'লেই সেই যে সবুজপত্রে সাধু ভাষাকে পিছনে ফেলে কথ্য ক্রিয়াপদের পথে চলা শুরু করলেন—আর একটিবারও ফিরে চান নি তাঁর শেষদিন পর্যন্ত।

এ-সম্বন্ধে সত্যেনের সঙ্গে আমার কোনও দিন খোলাখুলি আলোচনা হয়নি। আমরা সবাই ধ'রে নিয়েছিলাম যে এবিষয়ে সে প্রমথবাবুরই তরফে। কিন্তু তার মধ্যে একটা অনাসক্ত নির্বিরোধী ভাব আমাদের সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করত, কারণ আমরা দেখতাম সে পারৎপক্ষে কাউকে আঘাত করতে চাইত না। প্রমথবাবুর সঙ্গে সে যে কখনই তর্ক করত না তা নয়, ধূর্জটির সঙ্গে সেও মাঝে তাঁর সঙ্গে বাদপ্রতিবাদ করত বৈকি, কিন্তু উদ্ধতভাবে কদাচ নয়। কারণ তাঁকে সে যে শুধু সমীহ করত তাই নয়—সত্যিই ভালো বেসেছিল। শুধু সে বলি কেন?—আমরাও যে ভালবেসেছিলাম তাঁকে। নৈলে আমরা তাঁর সবুজচক্রে অত ঘন ঘন যাবই বা কেন? প্রথম দিকে আমরা অনেকে তাঁকে প্রতিভাধর মনে ক'রে ভুল করেছিলাম বটে—বিশেষ ক'রে তাঁর "চারইয়ারি কথা" প'ড়ে—কিন্তু তারপর আমরা তাঁর কাছে যেতাম তাঁর প্রতিভার আকর্ষণে নয়—তাঁর ব্যক্তিরূপের টানেই বটে।

কিন্তু তবু মেজমামিমার সাবধান-বাণীর পরে আমাকে একটু সাবধান হ'তে হয়েছিল বৈকি। আমি আর তেমন প্রতি সপ্তাহে আসি না দেখে প্রমথবাবু মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন তেম্নিই সাদরে, কিন্তু আমার না-যাওয়ার আরও একটা অছিলা আদিগায়ক শিবঠাকুর ঠিক কি এই সময়েই জুগিয়ে দিলেন: আমি জেঁকে খেয়াল শেখা শুরু করলাম শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, টপ্পা রামকথক মহাশয়ের কাছে, ঠুংরি যথাপর্যায়ে গৌরীশঙ্কর মিশ্র, জমিরুদ্দিন, দৌলতরাম, সোনি ও হাফেজ আলির কাছে। এর পরে লক্ষ্ণৌয়ের কাছে অচ্ছন বাই, কাশীর মোতিবাই ও এলাহাবাদের জানকী বাইয়ের কাছেও তালিম নিয়েছিলাম। —যদিও কবে ও কোন্ পর্যায়ে বলতে হ'লে ভাবতে হবে। মরুকগে, সত্যেনের কথায় ফিরে আসি।

প্রমথবাবুর ওখানে হাজিরি দেওয়া কমানোর ফলে কিন্তু সত্যেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা একতিলও কমে নি। কারণ মেজমামিমার কল্যাণে আমি প্রায়ই নানা বন্ধুবান্ধবকে থিয়েটার রোডের বাড়িতে ডাকতাম আমার সঙ্গীতচক্রে তথা গল্পগুজবের আসরে। এদের মধ্যে সুভাষের পরে সত্যেনই ছিল আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার পরে ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় ও নীরেন রায়। কিন্তু এখন সত্যেনের কথাই বলি।

সত্যেনের কাছে ভক্তি ধর্ম ধ্যান ধারণার কোনো প্রেরণা পাই নি অবশ্য, কিন্তু তার সত্যনিষ্ঠা আমার এত মন টানত যে সে যে ধর্মার্থী বা আস্তিক নয়, একথা আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারতাম না। সে মাঝে-মাঝেই আমাকে স্নিগ্ধ ব্যঙ্গের সুরে হেসে বলত বটে: "আমার মতন নাস্তিকের দিকে তুই ঝুঁকলি কী ক'রে বল্‌তো!" কিন্তু আমি এটুকু বুঝতাম যে সত্যেন সহজে ধরা দেয় না, তাই টুকতাম: "তুমি কখনোই নাস্তিক নও। সত্যি নাস্তিক হ'লে তোমার আমার মধ্যে একটা ব্যবধান আসতই আসত।" একথা আজও আমি বিশ্বাস করি আরো এইজন্যে যে মুখে নিজেকে নাস্তিক বললেও সত্যেন তার চিঠিপত্রে বরাবরই ভাগবত সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধাই প্রকাশ করত—যে-কথা একটু পরেই প্রতীয়মান হবে। সেদিনও সে লিখেছে: "তোমার সাধনায় যেন তুমি সিদ্ধিলাভ করো।"

কিন্তু চিঠিপত্রে অন্য সুর ধরলে হবে কি, কথাবার্তায় ধর্মের আলোচনায় সে সহজে বেশি কিছু বলতে চাইত না। আমার মনে হয়, তার প্রধান আপত্তি ছিল ধর্মের নামে ভড়ঙে—বা আপ্তবাক্যের নজিরে ভারতের আধ্যাত্মিকতা জাহির করায়। এসম্পর্কে একদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। কবি যতীন্দ্রমোহন বাকচি সেদিন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের বাড়িতে আমার একটি শ্যামাসঙ্গীত শুনে বলেন যে, এই মাতৃভাবের উপাসনায় ভারত অতুলনীয়। শুনবামাত্র সত্যেন হঠাৎ রুখে উঠে তর্ক জুড়ে দিল ও যতীন্দ্রবাবুকে চোখা চোখা যুক্তি দিয়ে এমন কোণঠাসা করল যে তিনি রীতিমত রেগে উঠলেন। যুক্তিগুলি আমার মনে নেই, কেবল এইটুকু মনে আছে যে, সত্যেনের প্রতিপাদ্য ছিল—আমরা পরম ধার্মিক, আর য়ুরোপীয়রা বস্তুতান্ত্রিক—এ-ধরনের সস্তা বুকনি কেটে যারা সহজেই আত্মপ্রসন্ন হয়ে ওঠে তাদের আধ্যাত্মিক প্রগতির চেয়ে নৈতিক দুর্গতিই বেশি হয়ে থাকে। সত্যেন স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের কোনো তুলনামূলক সমালোচনা উঠলেই সদাপটে তর্ক জুড়ে দিত—কিন্তু তর্কের জন্যেই নয়, বুঝতে চেয়ে যে তুলনাটি সত্য হিসেবে গ্রহণীয় কি না। ওর মোদ্দা কথাটা ছিল সর্বগ্রাহ্যই বটে: অর্থাৎ পোপের ভাষায়—

To observations that ourselves we make
We grow more partial for the observer's sake

অর্থাৎ

যা-ই কেন না বলি রে ভাই, জয়ধ্বনি তারি
বক্তারি খাতিরে করি—না ক'রে কি পারি?

ওর মন ছিল সত্যাশ্রয়ী, তাই ও জানত এই "আমি" ঠাকুরের রকমারি ফিচেল ফন্দি, জাল জুয়াচুরি—যার ফেরে পড়ে আমরা আত্মপ্রসাদকে অহরহ বাহবা দিতে উজিয়ে উঠি। জাতীয়তার জয়গান হ'ল এই ফন্দিবাজ 'আমি'-র আর এক ফিকির যাতে ক'রে জাতির নাম দিয়ে 'আমি' খোরাক পায়। সত্যেন মাঝে মাঝেই বলত ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে: "একটা বুলি সত্য হয় কখন জানিস তো?—যখন অনেকে কোরাসে সে-বুলি কপচায় বারবার ও তারস্বরে।" আসলে জাতীয়তার গুণগানে আত্মপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠার বিপদ সম্বন্ধে ও অবোধদের মতন অন্ধ ছিল না ব'লেই পদে পদে সতর্ক হ'তে চাইত আত্মপ্রসন্নতার নষ্টামি সম্বন্ধে। ওর এই গভীর ও অটল সত্যনিষ্ঠা আমাকে বরাবরই শুধু যে উল্লসিত করেছে তাই নয়, সত্যনিষ্ঠার সমর্থনে ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চক্ষের নিমেষে পাকা যুক্তির অটল স্তম্ভ খাড়া করতে পারত বলে সে-সত্যনিষ্ঠা আমার চোখে হ'য়ে দাঁড়াত আরো মূল্যবান্।

কিন্তু তা ব'লে আমি কখনো একটি মস্ত ভুল করিনি—যা ওর কোনো কোনো বন্ধুকে করতে দেখেছি। যখন তাঁরা বলতেন যে, ওর ব্যক্তিরূপের প্রধান বনেদ তথা চরম চূড়া ওর অনন্যসাধারণ বুদ্ধি। আমাকে সত্যেন নিজেই একদিন এ-সম্বন্ধে চমৎকার নির্দেশ দেয়। আমি ওকে বলি আমার কোনো এক গভীর সংকটলগ্নে কাতর প্রার্থনার ফলে ঠিক হার মানবার মুখে জেতার কাহিনী। ব'লে সলজ্জে বলি: হয়ত একথা শুনে তুমি হাসবে; কারণ, বুদ্ধি দিয়ে আমি আমার এ-উপলব্ধিকে প্রমাণ করতে পারি না।" ও হেসে সস্নেহে আমার দুই কাঁধে দুই হাত রেখে বলল: "ভাই, বুদ্ধির দৌড় কার কত জানে বুদ্ধিমন্তরাই। আমি জানি কেবল একটি কথা: মানুষের সব চেয়ে বড় সম্পদ তথা পাথেয় তার বুদ্ধি নয়—আন্তরিকতা, সততা।" এ-সম্পর্কে ও আরো একটি কথা বলেছিল স্পষ্ট মনে আছে যদিও ওর মনে আছে কিনা জানি না। ও বলেছিল: "প্রার্থনায় আমিও বিশ্বাস করি।"

"কার কাছে?"

"নিজেরি কাছে।"

সম্ভবত এখানে "নিজেরি" বলতে ও বেদান্তিক আত্মা—self বোঝাতে চেয়েছিল যে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন।

অতঃপর ধর্মের প্রসঙ্গ উঠলে ও যখনই নিজেকে "নাস্তিক" বলত (আশ্চর্য—আমার পিতৃদেবও বলতেন!) তখনই আমি ওকে টুকতাম যে আন্তরিকতাকে জীবনের সবচেয়ে বড় দিশারি ব'লে যে-মানুষ জেনেছে, সে আর যাই হোক না কেন, শূন্যবাদী নাস্তিক হ'তে পারে না। ও এ-ধরনের প্রশস্তি শুনে যেন একটু খুশিই হ'ত ব'লে আমার মনে হ'ত, তবে এ আমার কল্পনাও হ'তে পারে। এবার ও যে নাস্তিক হ'তেই পারে না তার প্রমাণ প্রয়োগ করবার সময় এল: ওর নানা পত্র। কিন্তু তার আগে একটা কথা মনে পড়ছে, বললামই বা।

ঢাকায় একদিনের কথা মনে পড়ে—কথায় কথায়। বুদ্ধির প্রসঙ্গই উঠেছিল। আমি তুললাম রাসেলের কথা—যাঁকে আজো আমি গভীর শ্রদ্ধা করি তাঁর সত্যনিষ্ঠা, আশ্চর্য বুদ্ধি ও আন্তরিকতার জন্যে। ও বলল: "কী অত রাসেল রাসেল করিস—তিনি কিছু বুদ্ধ নন।" সেদিন চম্‌কে উঠেছিলাম এই কথা শুনে, কারণ এর আগে কোনোদিনও ওর মুখে কোনো যুগাবতারের গুণগান শুনি নি। তাই আমি ওর মুখের দিকে একটু আশ্চর্য হ'য়ে তাকাতেই ও বলল হেসে: "ঐ একটি লোককে বড় দেখতে ইচ্ছা করে।" বাস্—আর কোনো কথা নয়। ও ধর্ম সম্বন্ধে যেন মুখ ফস্‌কেই একথা ব'লে ফেলেছে এই ভঙ্গি ক'রে এ-প্রসঙ্গ চাপা দিল—কেন জানি না। যাক। বলি যা জানি—সেও কম নয়।

বলেছি, ওর চরিত্রের অনেক গুণই আমার মন টানত। তাদের মধ্যে একটি গুণের কথা আমি আজও সময়ে সময়ে অবাক হয়ে ভাবি: কখনো ভুলেও ও নিজের গুণগান করত না বা কোনো অছিলায়ই নিজের কীর্তিকলাপের কোনো খবর পর্যন্ত দিত না। আমি বলছি না ও মানস অহঙ্কারকে জয় করেছিল মহাসাধকদের ম'ত। পরমহংসদেব প্রায়ই বলতেন: "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।" অর্থাৎ যার আমি-বোধ (অহংতা) নিরাকৃত হয়েছে তারই উপাধি জীবন্মুক্ত। সে-অবস্থা লাভ হয় শুধু ভগবানের পূর্ণ শরণাগতিতে—আর কিছুতেই নয়। সত্যেন সম্ভবতঃ একথা বুঝত, তাই কাউকেই অহঙ্কারী অপবাদ দিয়ে খর্ব করতে চাইত না। আমাকে একটি পত্রে একবার লিখেছিল (২৮-৩-১৯৫৫): "আমরা কেউই শুকদেবের মত নিত্যশুদ্ধ নই ভাই, কাজেই সমালোচনার তীক্ষ্ণবাণ ছুড়তে আমার ইচ্ছা হয় না।"

কিন্তু মনের গহনে নিজের গুণ মনীষা প্রতিভার জন্যে সচেতনতা যে-শ্রেণীর

অহঙ্কার, লোকের কাছে স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে আত্মশ্লাঘা করাকে তো ঠিক সে-শ্রেণীর অহঙ্কার বলা যায় না। তাছাড়া এ-ধরনের জাহিরিপনা অশোভন ব'লেই বেশি প্রকট হ'লে মানুষ অস্বস্তি বোধ করে, মেলামেশার ছন্দের সরল ধারা ঘোরালো হ'য়ে আসে। সত্যেন এ-ধরনের অসার জাহিরিপনার ছায়াও মাড়াত না—তার স্বভাবের এমন একটা সহজ শালীনতা ছিল যে, ভুলেও কখনো কোনো ছলেই সে নিজের ধামা বাজাত না, কেউ কোনোদিনও ওর কাছে এলে টের পেত না ওর কী অগাধ পড়াশুনো, কত জ্ঞান, কী গভীর পর্যবেক্ষণশক্তি! আমার এক সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু শ্রীশিব নারায়ণ সেন আমাকে একদিন বলেছিলেন, কি এক সংস্কৃত বইয়ের বিপুল পাণ্ডুলিপি নিয়ে তিনি একদিন সত্যেনের কাছে যেতেই সে পাণ্ডুলিপিটি পড়বার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে ও দু-তিন দিনেই আদ্যন্ত প'ড়ে ফেরত দেয়। গভীর মনোনিবেশের শক্তি ও অফুরন্ত কৌতূহল—এই দুটি গুণ ছিল ওর প্রায় সহজাত—কর্ণের কবচকুণ্ডলের মত। এক বিখ্যাত লাটিন ভাবুক বলেছেন:

"Homo sum; humani nil a me alienum puto.*

একথা সত্যেনের মুখেও মানাত, কারণ কৌতূহলের ওর অন্ত ছিল না। একদিন ওর ওখানে গিয়ে দেখি চীনা হরফ নিয়ে পড়েছে, আঁকছে আর মুছছে। তিব্বতী ভাষাও বোধহয় ও শিখতে চেয়েছিল। সংস্কৃতজ্ঞদের সঙ্গে সংস্কৃত, ঐতিহাসিকদের সঙ্গে ইতিহাস, প্রত্নতাত্ত্বিকদের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব, গীতজ্ঞদের সঙ্গে সঙ্গীত, কবিদের সঙ্গে কাব্য—কোনো আলোচনাতেই ও পেছপাও হ'ত না। আরো আশ্চর্য এই যে, এসব আলোচনাতে ও শুধু ঔৎসুক্য প্রকাশ ক'রেই ক্ষান্ত হ'ত না, এমন সব মন্তব্য করত যে বিশেষজ্ঞরাও খুশি না হ'য়ে পারতেন না। অন্তত সঙ্গীত ও সাহিত্য নিয়ে আমি এবং ওর আরো নানা বন্ধু ওর সঙ্গে বহুবারই আলোচনা ক'রে বিশেষ লাভবান হয়েছি একথা হলপ ক'রে বলতে পারি।

ওর মন ছিল আশ্চর্য খোলা, এক ধর্ম আর সব কিছুর সম্বন্ধেই ঔৎসুক্যও ছিল ওর অফুরন্ত। যা কিছু অনুধাবন ক'রে জানা যায় ও জানতে চাইত। বেকন একটি বিখ্যাত চিঠিতে একবার লিখেছিলেন:

"I have taken all knowledge to be my province"—

* আমি মানুষ কাজেই মানুষ-সম্পর্কীয় কোনো কিছুর প্রতিই আমি উদাসীন হ'তে পারি না—Terence.

অর্থাৎ যেখানেই জানবার কিছু আছে পড়ে আমার এলাকার মধ্যে। এ-চিঠি সত্যেনও লিখতে পারত ওর উপলব্ধির স্বাক্ষরে।

কেবল ধর্ম নিয়ে ও বেশি আলোচনা করত না। হয়ত এইজন্যে যে ওর মনে একটি আবছা ভয় বা দ্বিধা ছিল যে ধর্ম সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে গেলে ওর চেপে-রাখা ধর্মপ্রবণতা ওকে দিয়ে অনেক কিছু বলিয়ে নেবে ঝোঁকের মাথায়। ও চাইত চিরদিন স্থিতধী থাকতে—বহু বৎসরের সংযমসাধনায় ধীমান্ হ'তে খানিকটা পেরেওছিল বৈকি! কিন্তু ধর্মসাধনার মধ্যে অনেক কিছু না বুঝে মেনে নিতে হয়—ধর্মের এই দাবি ও কোনো দিনই মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি ব'লে আমার মনে হয়। কেন মনে হয়—বলছি—অন্তত আমি যেভাবে ওকে বুঝেছি। যদি ওকে ঠিক বুঝতে না পেরে থাকি তাহ'লে ও নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে; কেননা ও প্রায়ই বলত একটি কথা: "আমরা নিজেদেরকেই বা কতটুকু বুঝি?"

সতেরো

১৯২৮ সালে যখন আমি আমার সাহিত্যিক-সাঙ্গীতিক জীবনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগে দীক্ষা পেতে পণ্ডিচেরি যাই ও সেখানে আট বৎসর প্রব্রজ্যা অবলম্বন করি, তখন সত্যেন কথাটি কয়নি—সম্ভবত: এইজন্যেই যে, বৈরাগ্য-সাধনে আমার মুক্তি-খোঁজায় ওর মন সায় দেয়নি। কিন্তু তাব'লে ও আমার পিছনে আমার নিন্দা করেনি—বরং আমার অন্য অনেক বিরূপ বন্ধুরা আমার কঠোর সমালোচনা করলে তাঁদের নিরস্তই করতে চাইত। বন্ধুর প্রতি 'লয়ালটি'তে ও বিশ্বাস করত—যে-গুণটি আমাদের দেশে বিরলই বলব।

অতঃপর যখন গুরুদেবের দেহান্তের পরে বিশ্বভ্রমণ সেরে পুনায় হরিকৃষ্ণ-মন্দির স্থাপনা ক'রে এক নতুন জীবনের পত্তন করি, তখন মাঝে মাঝে ওকে বড় বড় চিঠি লিখতাম নানা আশাভঙ্গের খবর দিয়ে—আর লিখতাম এমন অনেক কথা, যা আর কোনো বন্ধুকেই লিখি নি। ওকে লিখবার তাগিদ পেতাম শুধু ওর স্নেহশীলতার পরে আমার আস্থা ছিল ব'লেই নয়—এজন্যেও বটে যে, ও বরাবরই ব্যথা দিয়ে ব্যথা বুঝত—কাউকেই চড়াও হয়ে উপদেশ দিত না বা বিচার করতে ছুটত না। ফলে ত্রিশ বৎসর পরে আমাদের মধ্যে যেন এক নতুন সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে। এর পরে আমি দু-একবার কলকাতা গিয়েও ওকে বলি পণ্ডিচেরি আশ্রমের নানা কাহিনী ও

ধর্ম সম্বন্ধে আমার নানা নবলব্ধ অভিজ্ঞতা উপলব্ধি জল্পনা-কল্পনা। উত্তরে ও আমাকে থেকে থেকে ওর নানা মত ও মন্তব্য জানিয়ে চিঠি লিখত। সে-সব চিঠির মধ্যে ব্যক্তিগত সুরের মধ্যে দিয়েও প্রায়ই ফুটে উঠত ওর উদার মনের নানান্ ভাবধারার ছবি। তাই সে-সব চিঠির কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। (আমার অনেক প্রশ্ন বা খেদ ওর উত্তর থেকেই আন্দাজ করা যাবে।)

একটি পত্রে ও আমাকে লেখে—১০ জুন, ১৯৫২ :

"ভাই দিলীপ, তোমার চিঠি এসেছে।······তোমার 'শ্রীচৈতন্য' নাটকটি খুব উপভোগ করেছি।·· ···তোমার কাছ থেকে যাই পাই, আমার খুব আদরের।"···

"তোমার সঙ্গে পরিচয় তো আমার আজকের নয়, কবে থেকে যে শুরু হয়েছে ভাবতে গেলে মনের মধ্যে আবছায়া হয়ে আসে। এতদিনের অন্তরঙ্গতার মধ্যে আর ভুল বোঝার অবকাশ কোথায় বলো? তাছাড়া সারাজীবন তুমি যে-পথে যে-সত্যের সন্ধান করে বেড়াচ্ছ, আমার কাছে তা অজানা হলেও তোমার সত্য-সন্ধিৎসু মনকে তো আমি অবজ্ঞা করতে পারি না।

"মানুষের মনের সব দরজার খবর কি সকলে পায়?···যে পথে তোমার মনের মধ্যে সঙ্গীতের সুরসুন্দরীরা আসা-যাওয়া করেন, তা তো আমার কাছে চিরকাল গোপন রহস্যই রয়ে গেল।

"ঐকান্তিক সাধনার প্রসাদে তুমি যে সিদ্ধির পথে এগবে, এ আমি বিশ্বাস করি। এদেশের বাতাসে ও ধূলিকণায় মিশে আছে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির স্মৃতি। মরমী খবর সব সময়েই এদেশের মনকে অদ্ভুতভাবে দোলা দেয়। অবশ্য সকলে তো অধিকারী নয় ভাই, তাই অনেক ক্ষেত্রেই দোলন হয় ক্ষণস্থায়ী।

"কেবল একটা কথা মনে হয়—যা স্পষ্ট, তা আজ নির্লজ্জভাবেই প্রকট হয়েছে সারা পৃথিবীতে। এর উত্তাপে বাংলাদেশের ভাগীরথীর মত তার গোপন প্রাণশক্তির উৎস আজ অন্তর্হিত হতে বসেছে—নববিধানের তাণ্ডবে কি জীবন-দেবতার ধ্যানভঙ্গ হবে না?

"এদিকে জীবন তো শেষ সীমায় এসে ঠেকেছে, নৈরাশ্যে ভ'রে গিয়েছে মন, অথচ হার স্বীকার করার সাহসও খুঁজে পাচ্ছি না। এমনি সময়ে হঠাৎ তোমার চিঠি অজানা রাজ্যের সুগন্ধ নিয়ে এল। তোমার অভিজ্ঞতা তাই দুর্বোধ্য ঠেকলেও হয়ত তার মধ্যেই খুঁজে পাব আশার বাণী, কে জানে?

"তুমি জন্মদিনে কলকাতায় আসবে আশা ছিল অনেকেরই। মুখে যা বলা

যায়, কলমের মুখে প্রকাশ করা শক্ত হয় অনেক সময়েই। তাই দেখা হলে হয়ত মনের আদানপ্রদান হ'ত বেশি। আশা করি, আমেরিকা থেকে ফেরবার পথে কলকাতায় নামবে। তোমার চিঠির আশা করে রইলাম। ইতি—সত্যেন।"

আর-একটি চিঠি (২৬শে জুন, ১৯৫২)

"ভাই দিলীপ,

যেসব অপূর্ব অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা লিখেছ, আমার কাছে সম্পূর্ণ অজানা।···তোমার অন্তরের যে-খবর স্নেহবশে আমাকে পাঠিয়েছ, পেয়ে আমার মন অপূর্ব ভাবরসে ভরে উঠেছে—সুবুদ্ধির নিকট তা যাচাই করা চলে না।

"তোমার পথের শেষ কোথায় জানি না, তবে মাঝ রাস্তার এই সব অনুভূতির রাজ্য ছাড়িয়ে হয়ত তোমাকে আরো অনেকদূর এগিয়ে যেতে হবে। অপ্রত্যাশিত বিভূতির আকর্ষণে জড়িয়ে পড়লে হয়ত অনেকটাই বাকি থেকে যাবে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছতে। উপনিষদের নির্দেশ 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' হয়ত এর বেলাতেই প্রযোজ্য।

"তুমি আমেরিকা যাবে শুনে আহ্লাদ হচ্ছে। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই হবে তোমার। পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছি। জড়-প্রকৃতির উপর মানুষ সার্বভৌম হয়েছে, তবু সে আজো সুখী হয়নি—বরং হিংসার গরলে প্রায় সমস্ত মানব-সভ্যতাই বিনষ্ট হতে চলেছে। আমেরিকার জনমত কি—কে জানে? অর্থ যে অনেক সময়েই অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়ায়, একথা এই পরিবেশে প্রযোজ্য ব'লেই মনে হচ্ছে।

"ফিরবার পথে যদি কলকাতায় আসো তো আনন্দ হবে অপূর্ব—তোমার ডায়ারির পাতা দুই বন্ধুতে উল্টে-পাল্টে পড়ব।···ইতি স্নেহমুগ্ধ সত্যেন।"

(এই লোক নিজেকে নাস্তিক বলে সবার কাছে দাখিল করতে চাইত!)

ওর এর পরের পত্রটির ভূমিকা হিসেবে কিছু বলতে হবে।

আমেরিকা থেকে ফিরে কলকাতা গিয়ে একদিন সকালে ইন্দিরাকে নিয়ে আমি যাই সত্যেনের বালিগঞ্জের বাসায়। গিয়ে বসতে না বসতে আমার মামাতো ভাই বিখ্যাত ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার এসে হাজির। আমাকে দেখে নামমাত্র প্রণাম ক'রে ও সত্যেনের দিকে ফিরে ওর টেবিলে হাজার দেড়েক টাকা রেখে বলল: "তোমার চীন যাবার টাকা যোগাড় করেছি সত্যেনদা, আর তোমার নিস্তার নেই—যেতেই হবে তোমাকে।"

সত্যেন (অবাক হয়ে) : সেকীরে? চীন! বলিস কী?

জ্ঞানেন্দ্র : বাঃ! তুমি যে বললে সেদিন যাবে?

সত্যেন : যাব কখন বললাম? বলেছিলাম যেতে পারি।

জ্ঞানেন্দ্র : তাই সই, এখন যাও—যখন কথা দিয়েছ।

সত্যেন (একগাল হেসে) : বাঃ, যেতে পারি বলার মানে কথা দেওয়া? এ কি তোর ডাক্তারি অভিধানের ভাষ্য নাকি?

জ্ঞানেন্দ্র (সানুনয়ে) : অমত কোরো না সত্যেনদা, যাও ভাই, লক্ষ্মীটি!

সত্যেন : না ভাই, এখন যাওয়া অসম্ভব—অনেক সাংসারিক কারণ আছে। তাছাড়া আমাকে ওখানে পাঠাতে চাচ্ছিস কেন বল্ দেখি?

জ্ঞানেন্দ্র : আরে, গিয়ে একবার তুমি দেখেই এস না ভাই!

সত্যেন : কী দেখে আসব শুনি?

জ্ঞানেন্দ্র : ওরা কী করছে ভিতরে ভিতরে।

সত্যেন : মাত্র এক হপ্তায় তার হদিশ পাব কী ক'রে? না শোন্ জ্ঞেনু, আজকাল যাঁরা সাত দিনের জন্যে বিদেশে গিয়ে সেখানকার বিশেষজ্ঞ হয়ে ফিরে এসেই লেকচার দিতে শুরু করেন, তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধ নেই আমার। ওদের ভাষা জানি না, মেজাজ জানি না, কিছুই জানি না—গিয়ে কী দেখে আসব মাথামুণ্ডু? দু-চারটে সভায় এর ওর তার সঙ্গে দেখা হবে এই তো! এতে ক'রে কি একটা দেশের নাড়ীনক্ষত্র জানা যায়?

জ্ঞানেন্দ্র (মরীয়া হয়ে) : তোমায় দেখলে ওদেরও তো কিছু লাভ হতে পারে তোমার প্রভাবে?

সত্যেন (হো-হো করে হেসে) : ওরে ভাই, নিজের আত্মীয়স্বজনের কিম্বা বন্ধুদেরই বা কার কতটুকু লাভ হয়েছে আমার প্রভাবে বলতে পারিস?

জ্ঞানেন্দ্র (ক্ষুণ্ণ) : তবে যাবে বললে কেন? আমি পাথেয় যোগাড় করে আনলাম—

সত্যেন (সস্নেহে তার পিঠে চাপড় মেরে) : আর কাউকে পাঠা ভাই যে দেখতে না দেখতে বক্তা হয়ে ফিরবে। রাগ করিস নে, লক্ষ্মীটি। তাছাড়া বললামই তো এক্ষুনি যে আমি যাব বলিনি একবারো—বলেছিলাম : যেতে পারি। এখন দেখছি যে, যেতে পারি নে।

রিপোর্টটুকুতে বিশেষ ভুল থাকবার কথা নয়, কারণ কথাগুলি ছিল সাদামাটা

তার উপর কৌতুকজনক—আর কে না জানে কৌতুককর কথা সহজে ভোলা যায় না? ইন্দিরা তো সত্যেনের কথা শুনে হেসেই খুন। সত্যেন শুধু হাসতেই নয় হাসাতেও পারত—বরাবরই।

কিন্তু সত্যেন হাসির মধ্যে দিয়ে যা বলেছিল, তার মধ্যে কান্নারও যে অনেক কিছুই ছিল, তা ইন্দিরার চোখ এড়ায় নি। তাই বাড়ি ফিরতেই ও বলল সোচ্ছ্বাসে: "জানো দাদা, আমি সময়ে সময়ে এর ওর তার কাছে এলে তাদের মধ্যেকার একটা স্পন্দন অনুভব করি? না—শুধু টেলিপ্যাথিই নয়—মানে শুধু তাদের মনের চিন্তার খবর পাওয়া নয়—এ-স্পন্দন যখন পাই তাদের মধ্যে অনেক কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাই—যেমন দেখতে পাই নিজের মধ্যে। সত্যেনদার প্রতি কথার মধ্যেই পেলাম সেই স্পন্দন, আর কিসের স্পন্দন জানো? একটা মস্ত মানুষের—Great man যাকে বলে। এক ডোরাস্বামী ও নেতাজী ছাড়া আর কোনো মানুষের সংস্পর্শে এ-স্পন্দন আমি অনুভব করিনি। আর দেখলাম কী বলব? দেখলাম—মনে-প্রাণে সাদা, সত্যনিষ্ঠ—বিরল আধার।" (ইন্দিরা কথাগুলি বলেছিল ইংরেজিতে)।

এখানে একটু থেমে ভাষ্য করতে হবে: ইন্দিরা পণ্ডিচেরি এসে আমার কাছে কৃষ্ণমন্ত্র নিতে না নিতে ওর মধ্যে নানা শক্তির স্ফুরণ হয়, যথা টেলিপ্যাথি, দূরদর্শন, ভাবী ঘটনার খবর পাওয়া……ইত্যাদি। এসব-তাতে ও এতই অস্বস্তি বোধ করত যে, আমি ওর অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দকে এক দীর্ঘ পত্র লিখি। তাতে গুরুদেবকে জানাই যে, ইন্দিরা এসব বিভূতি আদৌ চায় না, চায় শুধু ভক্তি, তাই ও চায় এসব দর্শনাদির উপদ্রব থেকে মুক্তি পেতে—গুরুদেব এ বিষয়ে ওকে কোনো নির্দেশ দিতে পারেন কি?

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লেখেন (১৪-৩-১৯৪৯):

"Dilip, such powers need not be a source of trouble, they can even be helpful to a degree; for these may well give one who has acquired mastery over her own nature the knowledge of the thoughts and feelings around her and she can then help guide and change what has to be changed in their minds so that they can become more effective for the divine work."

শ্রীঅরবিন্দের এ-ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হয়েছিল আমাদের পুনায় আসার পরে—

যখন ইন্দিরার কয়েকটি শিষ্য ও শিষ্যা লাভ হয়। তখন ও প্রায়ই দেখতে পেত কার ভিতরে কখন কোন্ শক্তির খেলা চলছে—ও সেই অনুসারে তাদের নির্দেশ দিত সাধনার ও কর্তব্যের—কিন্তু সে অন্য কথা।

সত্যেনের ভিতরটা ওর অন্তর্নেত্রের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছিল কেন আমি জানি, কিন্তু সে নিয়ে গবেষণা স্মৃতিচারণে অবান্তর হবে ব'লে এখানে শুধু বলতে চাই যে, আমি বহুবারই দেখেছি যে, ইন্দিরার এই সব অতীন্দ্রিয় দর্শন ও উপলব্ধি কক্ষনো ভুল হত না—বিশেষ ক'রে কে কেমন মানুষ সে-সম্বন্ধে।

এসব চিন্তা ও ইচ্ছা করলেই যে জানতে পারত তা নয়। ও বলত প্রায়ই খোলাখুলি যে, এসব দর্শন আপনা থেকেই প্রকট হ'ত একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। একটা মাত্র উদাহরণ দেই—সত্যেনেরই সম্পর্কে। সত্যেন যখন আমায় প্রথম লেখে যে, শান্তিনিকেতনের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হয়েছে, তখন ইন্দিরা ওর চিঠিটা হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রে একটু চোখ বুজে থেকে বলেছিল, "সত্যেনদা শান্তিনিকেতনে না গেলেই ভালো করতেন—অনেক দুঃখ পাবেন সেখানে।" ওর কথা যে অক্ষরে-অক্ষরে ফলেছিল—সবাই জানেন। যাক, যা বলছিলাম।

সত্যেনকে আমি পুনায় ফিরে ইন্দিরার এই জাতীয় নানা অভিজ্ঞতা উপলব্ধির কিছু তথ্য (data) পাঠাই—ওর ঠিকানা বদল হয়েছে হয়ত ভেবে সে-চিঠি পাঠাই আমার এক অধ্যাপক বন্ধু শ্রীনীরেন রায়ের কাছে। উত্তরে সত্যেন আমাকে লেখে (২৮-৩-১৯৫৫):

"ভাই দিলীপ, নীরেনের কাছে যে-চিঠি লিখেছ পড়েছি। তোমার সুন্দর ফটোটিও পৌঁছেছে। পুনায় নতুন পরিবেশের মধ্যে তুমি কেমন দিন কাটাচ্ছ দেখতে ইচ্ছে করে খুব। তবে সুবিধা হয় না নানা কারণে, সংসার তো টেনে চলেছি, তার ঝঞ্ঝাট অনেক। কাজেই যা চাওয়া যায় তা সব সময় হাতের মধ্যে এসে পৌঁছয় না। তবে এবার হয়ত গ্রীষ্মের ছুটিতে একটা সুযোগ মিলতে পারে। মে-জুন মাসে তুমি কোথায় থাকবে?

"মধ্যে মধ্যে মনে হয়, এ-জীবনটা এলোমেলো খোঁজাখুঁজিতেই কাটলো—নানাভাবে ঠেকে শিখতে হয়েছে অনেক কিছু, তাই মনে হয়, এই জ্ঞানের উদয় অল্প বয়সে হলে হয়ত অন্যরকম হতো জীবনের গতি ও অকিঞ্চিৎকর হলেও হয়ত শাশ্বতের ভাণ্ডারে মনোমত নিজের সঞ্চয় জমা দেওয়া যেত কিছু। তবে দেশ-কাল অতিক্রম করা বড় শক্ত, এইটেই জীবনের বহু নৈরাশ্যের মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা।

"তোমার বহু বৎসরের সাধনার কিছু ফল পেয়েছ জেনে ভারি আনন্দ হচ্ছে। তোমার সান্নিধ্য পাবার সুযোগ জীবনের একটা মস্ত দান ব'লে মনে করি। যৌবনে এক সময়ে কতদিন একত্রে কেটেছে, বন্ধুরা মিলে কত না কুতর্কের মধ্যে দিন কাটিয়েছি রহস্যের গ্রন্থিভেদের চেষ্টায়। তোমার পথে তুমি চলেছ, ত্যাগ করতে পারো তুমি আদর্শের আকর্ষণে—কাজেই ক্রমে ক্রমে পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে স'রে এসেছি। তবু যে-স্নেহস্নিগ্ধ বন্ধুত্বের সংস্পর্শ একদা মিলেছিল, তাতেই এখনো মন ভিজে ও ভ'রে আছে।

"বিচারশক্তি খাটিয়ে বন্ধুকে কেউ বিচার করে না, কারণ জীবনের হেঁয়ালির সদুত্তর নেই। যেভাবে চলেছ, কালস্রোতে তোমার পুঁজি উজাড় করে দিয়ে যাচ্ছ, তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোনো ঐশী ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে কিনা, কে জানে? কাজেই যখন সময়ে সময়ে শুনতাম, তোমার কোনো কোনো বন্ধুর নির্দয় অবিচারের জন্য তুমি কষ্ট পাও, তখন দুঃখ পেতাম। আমরা তো কেউই শুকদেবের মত নিত্যশুদ্ধ নই, কাজেই সমালোচনার তীক্ষ্ণবাণ ছুড়তে আমার ইচ্ছা হয় না।

"ভালো মন্দর অতীতে যা আছে, প্রত্যেক জীবের যন্ত্রণার মধ্যে যে-লীলার প্রকাশ, তার অনুভূতি তোমার এসেছে ব'লে আমার মনে হয়, কাজেই সাময়িক-ভাবে নানা লোকে যে তোমাকে ভুল বুঝতে পারে তাতে আশা করি তোমার মনে আর কষ্টের রেখাপাত হয় না।

"হ্যালডেন একবার বলেছিলেন—ভারতীয় আমরা না কি বড় নরম জীব, কোনো জিনিসকে যথার্থ নিরীখ ক'রে যাচিয়ে দেখতে চাই না। হয়ত এ সত্য। তবে আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে প্রাণী হিসেবে তফাৎ খুব বেশি নেই। কাজেই ঢিল-ছোড়াছুড়ি আর জজিয়তির ভান করার দরকার কি? জীবন এমনি বিচিত্র যে তাই নিয়েই মশগুল থাকা চলে।

"ইন্দিরা দেবীকে আমার সবহুমান সম্ভাষণ জানিও, আমার প্রতি তাঁর যে মনোভাব, তার যোগ্য হয়ত আমি নই, কারণ মনের অগোচর তো পাপ নেই ভাই—তবু জীবনে যে সত্যকেই আদর্শ ক'রেছি সেটা ঠিকই। কাজেই চ্যুতি হ'লেও বলতে হয়: 'অনেক সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য হয়নি'। তোমাকে অনেক বাজে কথা লিখলাম। আশা করি, কুশলে আছ। তোমার সাধনা উত্তরোত্তর জয়যুক্ত হউক, এই আন্তরিক প্রার্থনা ক'রে এইখানেই শেষ করছি। ইতি—তোমার একান্ত স্নেহাধীন সত্যেন।"

এর পরে ওকে আমি আমার নিজের সাধনার অন্দরমহলের কথা কিছু লিখেছিলাম—তার গোড়াকার কথা ছিল এই যে, খৃষ্টদেবের কথা যে সত্যি—(যে চাইলে পাওয়া যায়—who seeketh findeth) একথা আমি পুনার মন্দিরে, বিশেষ করে ইন্দিরার মাধ্যমে অতিপ্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছি—যার ফলে মনে নিটোল হয়ে উঠেছে স্থায়ী শান্তি ও ঠাকুরের অজস্র কৃপার জন্যে গভীর কৃতজ্ঞতা। একথা লিখে আমার মনে একটু ভয় হয়েছিল পাছে সত্যেন আমাদের এজাহার অবিশ্বাস ক'রে গড়পড়তা বৈজ্ঞানিকের ম'ত সরাসরি রায় দেয় যে, এসবই মনের ভুল বা জনশ্রুতির 'পরে অন্ধ আস্থা মাত্র। আমার অকপট আত্মকাহিনী কথনের উত্তরে ও শান্তিনিকেতন থেকে যে-চিঠি লেখে, তাতে আশ্বস্ত হই, নতুন করে প্রমাণ পেয়ে যে সত্যেন স্বভাবে ঠিক বিশ্বাসী না হলেও দুরন্ত সংশয়ীও নয়। ও লেখে (২-৪-১৯৫৮) :

"সৃষ্টির রহস্য তো আমরা কেউই ভেদ করতে পারি নি ভাই। তাছাড়া সাধকের সাধনার ধন কিভাবে তার কাছে পৌঁছয়—ক'জন মানুষই বা লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছে বলো? তোমার উপলব্ধি অনুভূতির নানা ছবি তাই একান্ত প্রিয় ঠেকছে আমার কাছে। আরো ভালো লাগছে ভাবতে যে, এখনও তুমি আমাকে তোমার মনের কথা এত খোলাখুলি জানিয়ে বড় বড় চিঠি লেখো।

"অবশ্য আমার এ-ভালো লাগার মধ্যে অনেকখানি অহমিকা মিশিয়ে আছে, কাজেই তোমাকে আমার উচ্ছ্বাস জানিয়ে আর বিব্রত করব না। তুমি হয়ত যে-পথে এগিয়ে চলেছ সেখানে সব কিছুর সত্যস্বরূপ এমনি আপনা আপনিই চোখে ভেসে ওঠে কথার অপেক্ষা না রেখে।······খুব ইচ্ছে হয় পুনায় গিয়ে তোমাদের আশ্রমে দু-চারদিন কাটিয়ে আসি······আজ কলকাতা যাচ্ছি, নীরেনের সঙ্গে অনেকদিন বাদে দেখা হবে ও সেও হয়ত তোমার চিঠি প'ড়ে শোনাবে। ইন্দিরা দেবীকে আমার সবহুমান শ্রদ্ধা নিবেদন কোরো। তোমার বন্ধু স্যর্ পল ডিউক্স্ যদি শান্তিনিকেতনে আসেন তো আমরা সাদরেই অভ্যর্থনা করব। ইতি। স্নেহার্থী সত্যেন।"

উৎসাহ পেয়ে আমি ওকে আর একটি চিঠিতে লিখি ইন্দিরার কয়েকটি অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি সম্বন্ধে কয়েকটি আশ্চর্য তথ্য। এর মধ্যে একটি হ'ল ওর মনে থেকে থেকে একটা ভবিষ্যৎদৃষ্টি মতন জেগে ওঠে যার ফলে ও স্পষ্ট দেখতে পায় অমুকের ভাগ্যে কী ঘটবে অদূর ভবিষ্যতে। (যথা আমাদের এক বন্ধুর অসুখ থেকে সেরে ওঠার সময়ে আমরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি খুশি হ'য়ে বললেন—

"সেরে উঠেছি এবার।" ইন্দিরা বেরিয়ে এসেই বলল ক্লিষ্ট কণ্ঠে: "দুচারদিনের মধ্যেই ফের পড়বেন—আহা বেচারি!" কয়েক দিনের মধ্যেই খবর এল বন্ধুর হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে।) সত্যেনকে লিখেছিলাম যে ইন্দিরা ওর শান্তিনিকেতনে কাজ নেওয়ার জন্যে দুঃখিত, প্রায়ই বলে: "সত্যেনদা খুবই ঘা খাবেন। উত্তরে ও লেখে শান্তিনিকেতন থেকে (১৩-৪-৫৮)।

"মেয়েদের হয়ত একটা তৃতীয় নেত্র আছে, কাজেই অনেক সময়ে তাঁরা যা যা ধরতে পারেন আমাদের মতন মানুষের সহজ বুদ্ধিতে আসে না। কেউ কেউ আমার শান্তিনিকেতনে উপাচার্য হ'য়ে আসায় খুশি হন নি। যাহোক এখানে কিছু একটা গ'ড়ে তোলবার চেষ্টাতেই আপাতত মেতে আছি। অবশ্য সবই তাঁর ইচ্ছা—এই মনোভাব অনেক ঠেকে সকলেরই সমঝাতে হচ্ছে এ-দেশে। আমার পক্ষে তার ব্যতিক্রম নেই।

"নিজেকে খুঁজে পেয়েছ, তাই শান্তিও তোমার করায়ত্ত হয়েছে। বরাবরই খুঁজেছ নানা ভাবে। অনেক কথাই মনে পড়ছে আজ। আমার অবিশ্বাসী বস্তু-তান্ত্রিকতায় তুমি যে একদা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে চোখের জল ফেলেছিলে সে-কথাও আবছা আবছা মনে পড়ছে। এতদিনে যে তোমার সকল খোঁজ সফল হয়েছে তাইতেই আমার আনন্দ। বিজ্ঞানীর চোখে জগতটা চিরকালই বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে—কৌতূহলকে চিরঞ্জীবী রাখাই তার পরম কাম্য। এ-মনোভাবকে আশা করি তুমি নিছক পাষণ্ডীপনা ভাববে না।

"তোমার আমার কিম্বা বহুসহস্র সাধকের হয়ত এমন অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে যাদের প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তবু বহু লক্ষ বহু কোটি জীবের মধ্যে দিয়ে যে-প্রকাশ চলেছে তার মধ্যেই সে যুক্তি ও ন্যায়ের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করছে। বুদ্ধির উন্মেষ ও তার প্রভাব যা আজ চারদিকে ছড়িয়ে আছে—তার মধ্যেও তোমার কাছে সেই অন্তর্যামীর ইচ্ছা প্রকট হচ্ছে মনে হয় কি? অবশ্য যার কৃষ্ণ মিলেছে তার আর তর্কের প্রয়োজন কি? সে যে-নিধি পেয়েছে সকলকে বিতরণ করতেই চাইবে—তার মধ্যেই তো তার সার্থকতা। অন্যসকলের পক্ষে হয়ত বৃথাই গেল এ-জীবন—জনার্দনের এ-পক্ষপাতের জন্য কেইবা তাঁর জবাবদিহি চাইবে? ইন্দিরাকে বোলো এবার সুযোগ পেলেই ছুটে যাবো—এবার মনে মনে একটা মতলব এঁটেছি—ছোট মেয়ের পরীক্ষা শেষ হ'লেই একটা সুযোগ হবে পুনা যাবার।

"তোমাকে যে ক'টি পাতা ফেরত দেবার কথা এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। নীরেন এইখানে নেই।—আমার ঘরে কাগজের বোঝা বেড়েই চলেছে, তার তলায় হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

"আমরা গরমে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছি। জানলা-দরজায় খস্‌খস্ টাঙিয়ে সকাল থেকে জল দিয়ে ভিজাচ্ছি। পুনা বোধহয় এই সময়ে খুব মনোরম হবে। বর্ষা সেখানে খুব সকালেই নামে শুনেছি।

মধ্যে মধ্যে চিঠি পেলে বেশ ভালো লাগে। নিঃসঙ্গ জীবনের সাথী হ'য়ে দাঁড়ায়।

ভালবাসা জেনো। ইন্দিরাদিদিকেও ভাগ দিও। ইতি—

সত্যেন"

এর পরে খবর পাই শান্তিনিকেতনে কয়েকজন লোক সত্যেনের বিরুদ্ধে দলাদলি ক'রে ওকে অপদস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ব্যথিত হয়ে ওকে আমি লিখি যে যারা ওর মহত্ত্ব ও ঔদার্যের কদর্থ করে তাদের জন্যেই দুঃখ হয়, আর মনে পড়ে বিবেকানন্দের কথা: যে, আমরা অত্যন্ত বেশি পরশ্রীকাতর হয়ে পড়েছি বলেই ভগবানের করুণা আর আমাদের অন্তরে পৌঁছোবার পথ পায় না। লিখে শেষে ওকে অনুরোধ করি পুনায় এসে একটু জিরুতে। লিখি—বহু ভক্ত ও ভক্তিমতী ভজন শুনতে আসেন—সাড়ে পনের আনাই অবাঙালি তাই দলাদলি কম, আনন্দ বেশি, ঠাকুরের প্রসাদে শান্তিও দিন দিন গভীর হচ্ছে।

হবি তো হ—ঠিক এই সময়েই ও পেল এফ. আর..এস উপাধি, সঙ্গে সঙ্গে হ'ল পদার্থবিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক মোটা মাইনেয়—নিছক গবেষণাই যাঁর কাজ। সানন্দে ওকে ফের লিখলাম যে, ঘরোয়া প্রবচনে যাকে বলে শত্রুর মুখে ছাই পড়া, এ হল তাই—বিধাতার করুণায় জ্ঞানী পেলেন মণি, আর ছাই লাভ হ'ল ওর নীচ নিন্দুকদের। শেষে লিখেছিলাম এই ধরনের একটি কথা: "তোমার মতন কর্মব্যস্ত মানুষের পক্ষে আমার মতন সুদূর-প্রবাসীর কথা হয়ত মনে থাকবার কথা নয়, কিন্তু আমি তোমার কাছে কত কী পেয়েছি ভাবতে আজো মন ভ'রে ওঠে।"

উত্তরে ও ১লা অক্টোবর ১৯৫৮ তারিখে লেখে এক দীর্ঘ চিঠি, তা থেকে কিছু উদ্ধৃত করি:

"ভাই দিলীপ, তোমাদের স্নেহ কি ভোলা যায়? সব সময়েই তোমার কত স্মৃতিই যে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে কি বলব? আর মনে হয় যে, তুমি যে-পথ

ধরেছ সেই-ই তোমার পথ। ভগবানের করুণা মিলেছে তাতেই ভরপুর হয়ে ভক্ত ও ভক্তিমতীদেরকে আনন্দ পরিবেষণ ক'রে চলো—গানে গানে মাতিয়ে দাও সবাইকে। এরি নাম তো সাধক-জীবন। তুমি স্রষ্টা ও শিল্পী—এইই তোমার আসল রূপ। তার প্রেরণা আসে যে-উৎস থেকে তারই সন্ধান পেয়েছ এতদিনে, তাই ঘোরাঘুরি ও খুঁজে বেড়ানোর বিরাম হয়েছে।

"আমারও ঘোরার বিরাম হ'ল হয়ত। পাঁচ বৎসরের জন্যে জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে মনে একটা আত্মপ্রসাদ জেগেছে—যাক্, এতদিনে দেশমাতা রেহাই দিয়েছেন, নিজের কাজ নিয়েই এবার মেতে থাকতে পারবো। তবে মুক্তি এল যখন তখন মনীষা অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। আর চোখের জ্যোতিও ক্ষীণ এখন! তবু তো ডাক শুনতেই হবে।

"মুখে এক মনে আর এই দেখে দেখে বিষিয়ে ছিল মন, তবে সহজেই সে-ভাব কাটিয়ে উঠেছি এখন। যে যেভাবে পারে, সেইভাবেই চ'লে মনকে ভোলাবার চেষ্টা করছে, আদর্শ ঐতিহ্য ইত্যাদি বড় বড় কথা ব'লে। তবে কথার বেসাতি তো বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে হিট্‌লারী যুগের পর, তারই ছোট ঢেউ এখানে পাড় ভাঙছে।

"মাঝে মাঝে খবর পেলে মন ভ'রে ওঠে। তোমার লেখা বই আসে, তোমার স্বাক্ষরও থাকে—তাই দেখেই জেগে ওঠে পুরানো দিনের কথা—

"পুরোনো সে দিনের কথা—সে কি ভোলা যায়?"

ইতি—স্নেহধন্য

সত্যেন"

১লা জানুয়ারী সত্যেন জন্মেছিল, ১৮৯৪ সালে। তাই ১৯৫৮-র ডিসেম্বরে লিখি ওকে অভিনন্দনের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যে, ও কত লোককে কত কী দিয়েছে জানি না, তবে আমি কত পেয়েছি জানি। শেষে লিখি: মন্দির তো গ'ড়ে উঠল—এখন কীভাবে চলবে কে জানে? উত্তরে ও লেখে—৫ জানুয়ারী, ১৯৫৯:

"তোমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা নিয়ে নতুন বর্ষ আরম্ভ হ'ল। দেখতে দেখতে বৃদ্ধত্বে পৌঁছে গেলাম—পুরোনো বন্ধুরাও অনেকে চলে গেছেন পরপারে—তাই মধ্যে মধ্যে খুব নিঃসঙ্গ মনে হয়। সংসারের বোঝা প্রথামত টেনেই চলেছি, নিষ্কৃতি কবে আসবে জানি না।

"২২শে জানুয়ারীতে অনেকেই হয়ত তাঁদের শুভেচ্ছা পাঠাবেন তোমার জন্মদিনে—এই পুরোনো বন্ধুর আন্তরিক শুভকামনা তাদের মধ্যে পৌঁছবে।

"দেনা-পাওনার কথা আলোচনা না হওয়াই ভাল—কারণ তাহ'লে আমার ঋণের অঙ্কই বড় দাঁড়াবে। তোমার নব-মন্দিরের ছবি পেয়েছি। বেশ বাড়ি হয়েছে। বহু ভক্ত ও ভক্তিমতী আসেন ভজন শুনে আনন্দ ও শান্তি পেতে, আসবেনই তো। তোমার মধ্যে দিয়ে যাঁর ইচ্ছা ফুটে উঠছে, তিনিই তোমাকে হাত ধ'রে চালিয়ে নেবেন।

ইতি—স্নেহার্থী সত্যেন।"

এ চিঠিগুলি উদ্ধৃত করার ছুটি উদ্দেশ্য আছে: একটি ব্যক্তিগত—সত্যেনের স্নেহশীল হৃদয়টির ছবি আঁকা, অন্যটি একটু গুরুগম্ভীর, তাই একটু ভূমিকা করতে হবে ব্যাখ্যার আগে।

উচ্চবিকশিত মানুষ মাত্রেরই মধ্যে একাধিক ভাবধারা বয়ে চলে—কোনোটি দৃশ্যমান, কোনোটি অন্তঃশীলা। সত্যেনের বহু বন্ধু—তারা সবাই ওকে শ্রদ্ধা করে একজন অসামান্য ধীমান্ ও বৈজ্ঞানিক ব'লে। শ্রীনীরেন রায় ২৭-৫-৫৯-এ লেনিনগ্রাদ থেকে একটি চিঠিতে ওর সম্বন্ধে যা লিখেছে, উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না—আরো এই সত্যটির উপর জোর দিতে যে মানুষ যেখানে আসল জায়গায় খাঁটি হয় সেখানে তার শত্রুরা নানা অকথা কুকথা বললেও তার মধ্যে যে আগুনের পরশমণি থাকে, সে অনেককেই ছুঁয়ে ছুঁয়ে খানিকটা না খানিকটা বদ্‌লে দিয়েই যায়। নীরেন তীক্ষ্ণধী ও স্নেহশীল মানুষ, সত্যেনের বিশেষ অনুরাগী বরাবরই। লিখছে: "ছেলেবেলা থেকে তাকে আমি দেবতার মত ভক্তি করায় অভ্যস্ত। তাকে সমালোচনা করার ধৃষ্টতা আমার এখনও নেই। বরং বলতে পারি যে, বর্তমানে আমি যে জীবনদর্শনে উপনীত হয়েছি, তার মূলে আছে তারই প্রেরণা। তবে তার দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা, উদার জীবনাদর্শ, নিঃস্বার্থ ভালবাসা এই সবই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে বেশি, কারণ তার বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক প্রতিভার মর্মজ্ঞ হওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমি সাধারণ মানুষ, কিন্তু আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তার ম'ত প্রতিভাকে কাছ থেকে দেখার।"

এ-চিঠিটি হঠাৎ উদ্ধৃত করলাম শুধু ব্যক্তিগতভাবে সত্যেনের গুণগানে দোয়ার জুটিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেই নয়, করলাম এই জন্যেও বটে যে, সংসারে যখন ব্যাপক নিষ্ঠুরতা ও মিথ্যাচারে আমাদের মধ্যেকার আদর্শবাদীটির স্বপ্নভঙ্গ মতন হয়, তখন সে একটি গভীর সত্যের পরিচয় পেয়ে খানিকটা সান্ত্বনা পায়ই পায় যে, সংসারে মহৎ মানুষ বিরল হলেও চিরজীবী আর জীবনে যা কিছু মহার্ঘ তা-ই বিরল। এই জন্যেই দেখা যায় যে, আবহমানকাল জগতে নানা নীতিপাঠ সত্ত্বেও গড়পড়তারা

চায় না,' যা চায় মুষ্টিমেয় কয়েকটি মহৎ মানুষ। ফলে যুগে যুগে সব দেশেই গড়পড়তারা প্রায়ই ভুল বুঝে এসেছে এই মুষ্টিমেয়দেরকে। বাইবেলে এই সত্যটির কথাই বলেছেন সেণ্ট জন যে, "আলো অন্ধকারের বুকে জ্বললেও অন্ধকার তাকে বুঝতে পারে না।"

আধ্যাত্মিক জগতে এর ভাষ্য হল এই যে, গড়পড়তারা (পরমহংসদেবের ভাষায়) গোলমালের মধ্যে যে-মাল আছে, তাকে ছেড়ে শুধু গোলকে নিয়েই ম'জে থেকে শেষ পর্যন্ত অতৃপ্তই থেকে যায়, আর মালের খবর পান সেই বিরল সন্ধানীরা যাঁরা ঢেউয়ে ঢেউয়ে গা ভাসিয়ে চলতে রাজি না হয়ে ডুবুরি হতে চান লক্ষ্মীর সঙ্গে অমৃতভাণ্ড করায়ত্ত করতে। এই ডুবুরি হবার নামই ভক্তের ভক্তিসাধনা, জ্ঞানীর জ্ঞানোৎসুক্য, আত্মসন্ধানীর তত্ত্বজিজ্ঞাসা যার ডাকে যুগে যুগে সাড়া দিয়ে এসেছেন সেই পরম পুরুষ যাঁকে দেখলে জীব হয় শিব, যাঁকে জানলে আর জানবার কিছু বাকি থাকে না, যাঁকে লাভ করলে আর কোন লাভকে লাভই মনে হয় না। পক্ষান্তরে এই পরম প্রাপ্তির জন্যে যাদের কোন মাথাব্যথাই নেই, রূপের ওপারে আসীন অরূপরতনের ঘরছাড়া বাঁশির ডাকে যারা কানই দেয় না, তারা এখনো "যাহা চায় তাহা ভুল করে চায় যাহা পায় তাহা চায় না"—তাদের এখনো চোখ ফোটে নি।

সতোন সপরিহাসে "নাস্তিক" ব'লে নিজের পরিচয় দিতে চাইলেও তাকে আমি কোনদিনই এই বহির্মুখী অন্ধদের একজন ব'লে মনে করতে পারিনি। কেন পারিনি তার পুরোপুরি কারণ দর্শানো সহজ নয়, তবু বলতে চেষ্টা করি—আমার নিজের দৃষ্টিপ্রদীপের আলোয় ওকে আমি কী চোখে দেখে এসেছি। এ-দেখায় ভুল কিছু থাকবেই থাকবে—মানুষ যখন নিজেকেই পুরোপুরি চিনতে পারে না, তখন অপরকে নির্ভুল জানবে, চিনবে কেমন করে। তবু স্নেহ গভীর হলে একটা অন্তর্দৃষ্টি হয়, একথাও তো সমান সত্য। তাই বলি কেন ও আমাকে এত আকৃষ্ট করেছিল প্রথম থেকেই।

বলেছি—আমি ওকে ভালবেসেছিলাম প্রধানত তিনটি কারণে। ওর অসামান্য স্নেহশক্তির জন্যে; ওর দৃঢ়মূল সত্যনিষ্ঠার জন্যে; ওর বহুমুখী অনুসন্ধিৎসার জন্যে। কিন্তু এ-তিনটি দৃশ্যমান কারণ ছাড়া আরো একটি কারণ আছে, যার জন্যে ওকে আমি বহুবারই মনে মনে সাধুবাদ দিয়েছি: ওর আত্মমনস্কতা—যার প্রসাদে ও সবার মধ্যে থেকেও খানিকটা যেন সর্ববিচ্ছিন্ন হয়ে চলতে পারত। এই প্রবৃত্তিটির পরম বিকাশেই মানুষ অনাসক্ত হতে পারে। তাই আমার আশা হয় যে, ও এই অনাসক্তির

আলোয় ক্রমশ ওর মনের বিষাদ কাটিয়ে উঠতে পারবে। ওর মনের বিষাদের মধ্যেও কিন্তু একটি অনির্ণেয় মাধুর্য আছে, যার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, যদিও নমুনা দেওয়া চলে। তাই এ-অধ্যায়ের ইতি করি ওর শেষ চিঠি থেকে কিছু উদ্ধৃত ক'রে। এপ্রিল মাসে ও হঠাৎ পুনায় আসে আমাদের আশ্রমে একদিনের জন্যে। ওর কথা শুনে এবং ওর মুখ বিষণ্ণ দেখে আমি মনে দুঃখ পেয়ে ওকে আমার সহানুভূতি জানিয়ে একটি দীর্ঘ পত্র লিখি। উত্তরে ও লেখে (৬ই মে, ১৯৫৯):

"ভাই দিলীপ,

তোমার চিঠি পেয়েছি।······আমার নিজের কাছে সবচেয়ে বেশি আশার কথা এই যে, খুব বেশি চিন্তিত হতে হবে না। নিজেরও মেয়াদ শেষ হ'ল, দলের নেতা হবার অভিলাষ নেই। ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে সবই, এর মধ্যে ঠিক যেটুকুতে আনন্দ পাই তাই নিয়েই থাকি। বন্ধুদের দেখেই আনন্দ, তারা কি করছে তার বিচার করতে চাই না। নীরেন নিজের অভিলাষ মেটাতে চেষ্টা করছে। ভাষার টানই বোধ হয় তার বেশি ছিল মস্কো যাত্রার পিছনে। আগের দিনে তার যে উৎসাহ ছিল, তা বোধ হয় এখন কিছু নিভে এসেছে।

ইন্দিরা দেবীকে আমার সবহুমান নমস্কার জানিও। তাঁকে পুনায় দেখে বেশ আত্মসমাহিত মনে হয়েছিল। সকল বন্ধুকে নমস্কার জানাই।

ইতি—স্নেহার্থী সত্যেন।"

এর উত্তরে আমি ওকে ফের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ক'রে শেষে লিখি যে, ইন্দিরার খুব উচ্চ অবস্থা হলেও ওকে মন্দিরে দুবেলা রাঁধতে তথা বহুলোকের ভার বইতে হয়, তাই ভাবনা আসে—এত চাপ ওর দুর্বল শরীর শেষ পর্যন্ত সইতে পারবে কি না। শেষে ওর জন্যেও উদ্বেগ জানাই। এর উত্তরে ও লেখে মে মাসে:

"দিলীপ,

আমার জন্যে দুঃখ কোরো না। আমার সত্যিই কিছু আশা নেই—শুধু যে কাজ মাথায় তুলে নিয়েছি, সেটা যেন কিছু করতে পারি। বিজ্ঞানীর মনে যে উচ্চ আশা থাকে তা সে প্রকাশ করে না সহজে। তবু সে চায় যে, শেষ অবধি যেন নাম থাকে কোন কাজের সঙ্গে জড়িয়ে, যেটা মানুষ সমবেত হয়ে গড়ে তুলতে চাইছে।

"তুমি অনেক সাধুসঙ্গ করেছ ভাই, কাজেই তোমার কাছে গিয়ে আনন্দ হয়—তার মধ্যে ঈর্ষার লেশও নেই। পরিপূর্ণভাবে সহস্রধারে তোমার মনের

পাপড়ি খুলছে দেখেই আনন্দ। আপনার জন্যে তুলে নিজে গেলাসজাত করার দুর্মতি ছিল না কখনোই। মাঝে মাঝে পুরুষকারের অহমিকা মনে জেগে ওঠে, কিন্তু সে উৎসাহ নিবাত-নিষ্কম্প শিখার মত মনকে নিরন্তর তাতিয়ে রাখে না— এই হল গণ্ডগোল। একে কিন্তু নিরাশার কথা ব'লে বন্ধুর জন্যে ভেবো না। তার নিষ্ক্রমণের সিংহদ্বার আর বেশি দূরে নেই। পুনার সংসারের ঝামেলার জন্যে অন্য লোককে ধরো। ইন্দিরাকে সে যে ভাবের মধ্যে ডুবে থাকতে চায়, তার সুযোগ দেওয়াই দরকার। তোমাদের আনন্দস্রোত ওখানে আশা করি আগের ম'ত অবিরলই বইছে।

"তুমি যেখানেই থাকো সব সময়েই খবর জানবার জন্যে মন ব্যস্ত হয়। পাপপুণ্য, উপলব্ধি, সাধনা, সব কিছু ছাড়িয়ে একটা অহৈতুকী টান আছে তোমার দিকে।

ইতি

স্নেহার্থী সত্যেন"

আঠারো

১৯১৯ সালের মাঝামাঝি আমি বিলেত রওনা হই একথা লিখেছি। বিলেত যাওয়ার আগের জীবন-অধ্যায়ে ১৯১৩ থেকে ছয় বৎসরকালকে ধরা যেতে পারে আমার কৈশোরকাল। তার মানে এ নয় যে, যৌবনের "সুখশীতল মলয়ানিল" এ-অধ্যায়ে আমার গায়ে লাগে নি। বস্তুত কৈশোরের যে ঠিক কোথায় শেষ আর যৌবনের কোথায় আরম্ভ—তার কোনো নিশ্চিত সীমারেখা টানা ভার। আমি কেবল এইটুকু বলতে পারি যে, যৌবনের দুরন্তপনা আমি দেশে থাকতে বিশেষ অনুভব করি নি। তাই ইতিপূর্বে লিখেছি যে, কেউ কেউ আগে পাকে, কেউ কেউ পরে। আমি দেশে থাকতে "অকালপক্ক" দুর্নাম কিনলেও সে হল অতিবুদ্ধির ফাজলামি, যৌবনের পাকামি বলতে যা বোঝায়, তার অনুভব এদেশে হয় নি। অর্থাৎ বিলেতে পৌঁছবার আগে আমি সত্যিই টের পাই নি—দেশে আমি সাহিত্য সঙ্গীত ও বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে কতখানি মশগুল ছিলাম। কৈশোরে অনেক ছেলে খেলাধুলো নিয়েও এমনিই মশগুল থাকে ব'লে খবর পায় না যে "বসন্ত জাগ্রত দ্বারে"। বিলেতের নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়ে তবে একথা আমার উপলব্ধির কিনারায় আসে।

কিন্তু ১৯১৯-এর জুলাই মাসে বিলেতে পৌঁছতে না পৌঁছতে প্রথম দিকে এমনিই দিশহোরা হয়ে পড়েছিলাম যে, যৌবনের সমস্যার সঙ্গে মুখোমুখি হবার ফুরসৎ-ই পাইনি—বিস্ময়ই আমার মনের সাড়ে পনর আনা অংশ জুড়ে বসল। চারদিকে যা দেখি তাতেই বিস্ময়ানন্দে মন ছেয়ে যায়—কেবলই মনে পড়ে কবি এডগার আলেন পো-র উক্তি—"ইট ইজ এ হ্যাপিনেস টু ওয়াণ্ডার!"—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। বলতে কি, বিস্ময় যে মানুষের মনকে এতটা পেয়ে বসতে পারে—এর আগে ভাবতেও পারি নি। মনে আছে সে-সময়ে বিদেশে যা-ই দেখতাম, পুলক জাগাত রোমে রোমে। দেশছাড়া হ'য়ে জাহাজে আমি মনমরা হ'য়ে পড়েছিলাম—কেবলই জলের মরুভূমির দিকে তাকাই আর মনে হয় যেন বুকের মধ্যেকার মরু-ভূমিরই প্রতিচ্ছবি। জাহাজে একটি বন্ধুও হয় নি—এক মাতাল আইরিশ সাহেব, ছাড়া—যে আমার ক্যাবিনে শুত। ভারতীয় একটিও ছিল না যার কাছে কাঁদুনি গাইতে পারি। কেবল দুটি সাত আট বৎসরের ইংরেজ মেয়ে আমার কাছে আসত ও অনর্গল গল্প ক'রে আমার আদর কাড়ত। তারাই ছিল এ-মরুপন্থীর একমাত্র সরোবর-সান্ত্বনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য যখন আসে, একলা আসে না—বলেছেন কবি শেক্সপীয়র। তাই একদিন হঠাৎ তারা আমাকে পাশ কাটিয়ে গেল শুধু ব'লে: "মা বলেছে—নেটিভদের সঙ্গে মেলামেশা করা ভালো নয়।"

মনে আছে সেদিন প্রথম কল্পনায় এসেছিল লক্ষ্মণের শক্তিশেলের কথা। উচ্ছ্বাসী মানুষ সব কিছুকেই বাড়িয়ে না দেখলে কি তার "উচ্ছ্বাসী" কলঙ্ক রটত?

কাজেই জুলাই মাসের প্রথমে যখন প্লিমাথে জাহাজ ভিড়ল, তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। টিকিট করা ছিল কলকাতা থেকে লণ্ডন-টিলবরি। তাই আর দু'দিন অপেক্ষা করলে সোজা লণ্ডন পৌঁছিয়ে দু-একজন পূর্ব পরিচিতের দেখা পেতে পারতাম, কিন্তু আমি "দুর্জন সংসর্গ" ছেড়ে এমন "সাধু সঙ্গের" জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলাম যারা আমাকে নেটিভ বলবে না। দুর্গা ব'লে ঘোর বিভুঁয়েই নেমে প'ড়ে ধরলাম লণ্ডনের উধাও ট্রেন।

বিলেতে ইংরাজ বন্ধু পেতে আমার কিছু দেরি হয়েছিল, কিন্তু লণ্ডনে পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, যখন দেখা হল এক চেনা বাঙালির সঙ্গে তার নাম দেওয়া যাক শৌখিনবাবু—আমার চেয়ে বয়সে বছর চার পাঁচ বড়। দেশে থাকতে আমাকে সত্যিই পছন্দ করতেন। তিনি এমন কিছু আমার আত্মার আত্মীয় ছিলেন না, তবু বিলেতে তাঁকে পেয়ে মনে হ'ল যেন হাতে চাঁদ এল। মন যখন খুব তৃষিত থাকে,

তখন শাদা জলকেও মনে হয় লাল পানি। সুতরাং এই অল্প-চেনা শৌখিনবাবুকেও যে আমি সাগ্রহে বন্ধু বলে বরণ করে নেব, এ আর বিচিত্র কি?

কিন্তু বন্ধু তিনি ছিলেন না। আমাকে কেবল বোঝাতেন ভালো স্যুট-এর কথা এবং মুরুব্বিয়ানা সুরে করতেন হাজারো চমকপ্রদ কাহিনীর গল্পগাছা। দেখতে দেখতে আমাকে নাবালক পেয়ে তিনি উল্লসিত হয়ে এগিয়ে এলেন আমার দিশারি তথা অছি হয়ে—আমাকে নিয়ে যাওয়া শুরু করলেন থিয়েটারে, মিউজিক হলে, কার্নিভালে, হিপোড্রামে, উইম্বলডনে। নাইট ক্লাবেও নিয়ে যেতেন যদি আমার ড্রেস স্যুট থাকত। কিন্তু দেশে সুভাষের পুণ্য সংস্পর্শে স্বাদেশিকতার উগ্রমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কোন্ মুখে বিলেতে আসতে না আসতে ধুতি-চাদর ছেড়ে একেবারে পুরোদস্তুর "বিলিতি বাঁদর" সাজি? আমার হাতে অবশ্য প্রচুর টাকা ছিল—মেজমামা জমা ক'রে দিয়েছিলেন লয়েডস্ ব্যাঙ্কে। আমি খরচও করতাম দু'হাতে—কিন্তু বই কিনেই বেশি—তার পরে বন্ধুবান্ধবদের খাইয়ে ও তাদের থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে। বেশভূষায় আমি উদাসীনই ছিলাম খানিকটা—আরো সত্যেনের প্রভাবে যে চুল আঁচড়াতেও ভুলে যেত। শৌখিনবাবু তবু নাছোড়বান্দা। শেষে কী করি একটা সাদামাটা নীল স্যুট তৈরি করলাম—কিন্তু ড্রেস স্যুট—নৈব নৈব চ। সাড়ে তিন বৎসর বিলেতে আমি দু-তিনটি স্যুটেই চালিয়ে দিয়েছিলাম, একথা বললে সত্যের একটুও অপলাপ হবে না। কাজে কাজেই নাইট ক্লাবেও আমার যাওয়া হয় নি। তাছাড়া তখন নাইট ক্লাব বলতে কী বোঝায় সত্যিই জানতাম না। শৌখিনবাবু যে-বর্ণনা দিলেন শুনে একটু অবাকই হলাম; কারণ অনেক ইংরেজি নভেল পড়া থাকলেও নাইট ক্লাবের বর্ণনা কোন নভেলে পড়ি নি তখন পর্যন্ত। তাই ওঁর কাছে নাইট ক্লাবের বর্ণনা শুনে ঔৎসুক্য জাগা সত্ত্বেও কেমন যেন ভয় খেয়ে গেলাম, মাঝে মাঝে ড্রেস স্যুট তৈরি করিয়ে সে হররার রসাতলে যেতে ইচ্ছে হ'লেই মনে পড়ত সুভাষের কথা: "আগুন নিয়ে খেলা ভালো নয়।" তাছাড়া দুদিন বাদেই সুভাষ এল ব'লে—তার চিন্তায়ই তখন আমার মন ভ'রে আছে কানায় কানায়—নাইট ক্লাবের হাতছানির সাধ্য কতটুকু? একটু উস্কে দিয়ে প্রলোভনের চিন্তাচরেরা মানল হার।

ঠিক এই সময়ে লণ্ডনে আমার মিলল প্রথম বন্ধু—তাই বলি তার কথা।

তার নাম রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার সঙ্গে আমার খানিকটা কুটুম্বিতার সম্পর্কও ছিল—এইভাবে: আমার বোন মায়ার বিবাহ হয়েছিল স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ভবশঙ্করের সঙ্গে। রবি ছিল স্যর সুরেন্দ্রনাথের নাতজামাই।

স্তর সুরেন্দ্রনাথ ও ভবশঙ্কর আমার বিলেত যাত্রার আগেই লণ্ডনে এসে প'ড়ে রবিকে বলেছিলেন আমার একটু দেখাশুনো করতে। ১৯১৮ সালে আই সি এস পাশ করে রবি সে-সময়ে লণ্ডনে সুখাসীন। তার সঙ্গে দেখা হ'তেই আমি ভরসা পেয়ে গেলাম, কেননা সে আমাকে প্রথম থেকে ভালবেসেই এগিয়ে এসেছিল। তার সঙ্গে আমার আরো ভাব হয়ে গেল দেখতে দেখতে, কেননা সে সুভাষকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করত। সে-ই আমাকে কেম্ব্রিজে নিয়ে গিয়ে নানা কলেজে চেষ্টা ক'রে শেষে বন্ধুবর শ্রীঅমিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগে ভর্তি করে দেয় ফিট্‌জ উইলিয়াম হলে—যেখানে কয়েক মাস পরে সুভাষও এসে যোগ দেয়।

রবিকে আমি দেখতে দেখতে ভালবেসে ফেলেছিলাম আরো এই জন্যে যে, তাকে আমি এক আঁচড়েই চিনে নিয়েছিলাম আমার একজন অভিজ্ঞ সুহৃৎ তথা যথার্থ শুভার্থী ব'লে। তাই তার সঙ্গে নানা বিষয়ে আমার মতানৈক্য হ'লেও তার অনেক সুচিন্তিত মন্তব্যই গ্রহণীয় বলে বরণ করতে আমার বাধে নি—বিশেষ ক'রে ইংরাজ মেয়েদের চালচলন সম্বন্ধে। সে আমাকে ঘড়ি ঘড়ি নানা সূত্রে নানা ভারতীয়ের কীর্তিকলাপ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তার নিপুণ বিশ্লেষণে আমাকে বুঝিয়ে দিত—কেন আমাদের অনেক ভালো ছেলেও বিলেতে এসে অতি নিম্নশ্রেণীর শ্বেতাঙ্গিনীর মোহে প'ড়ে মাথা ঠিক রাখতে পারেন না ও কোন্ ইনফিরিয়রিটি কম-প্লেক্সের পাকে প'ড়ে অমলা না হোক ধবলার টানে ধীরে ধীরে অধঃপাতে যান। তার কাছে এই জাতীয় ললনাদের ছলনার নানা রোমহর্ষক কাহিনী শুনতে শুনতে প্রথম প্রথম আমার সত্যিই মনে হ'ত যে, ও বাড়িয়ে বলছে; কিন্তু নানা সূত্রে এদের কীর্তিকলাপের কিছু-কিঞ্চিৎ চাক্ষুষ করার পরে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, এ বিষয়ে সে ছিল নির্মোহ সত্যদ্রষ্টাই বটে। কিন্তু এ-চৈতন্য আমার একদিনে হয় নি, হয়েছিল ধীরে ধীরে, দিনে দিনে, এক এক ক'রে নানা সরল স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পরে। ফলে আমি যখন বেদনা বোধ করতাম রবি সস্নেহে হেসে আমার কাঁধে চাপড় দিয়ে বলত: "তুমি আজো অত্যন্ত ছেলেমানুষ আছ দিলীপ, কিছু মনে কোরো না।" আমি এতে রাগ করতাম; কিন্তু যখন বিলিতি মেয়েদের নানা অভাবনীয় মতিগতি দেখে সত্যি সত্যিই হতবুদ্ধি হ'য়ে যেতাম তখন মানতে হ'ত বৈকি যে, রবি বাড়িয়ে বলে নি। তবে বার বার এ-জাতীয় ড্রামার চমকে চোখ-ফোটার পরে শনৈঃ শনৈঃ আমার কেমন যেন অবিশ্বাস এসে যায় তথাকথিত রোমান্সে—যাকে বই প'ড়ে মনে হত অতি উপাদেয়। কীভাবে

আমার চোখ ফোটে তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি একটু পরেই রীতিম'ত নাটকীয় ঘটনার অবতারণা ক'রে, কিন্তু তার আগে রবির সম্বন্ধে আর একটু ব'লে নিই।

সুভাষ লণ্ডনে এসে পৌঁছবার আগে আমি সবচেয়ে বেশি সময় কাটাতাম রবির স্নেহসঙ্গে। কত রাতের পর রাত প্রশস্ত বিছানায় শুয়ে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলেছে রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত—যতক্ষণ না ঘুমে আমাদের চোখ জড়িয়ে এসেছে। তার পর আবার সকালে উঠেই প্রাতরাশের টেবিলে জের টেনে চলা গত রাতের কথালাপের। নির্বান্ধব দেশে হঠাৎ বন্ধু পেয়ে কী আনন্দ যে পেলাম সে ব'লে বোঝাতে পারব না! মহানন্দের আর একটা কারণ—রবি বিলিতি সভ্যতাকে সত্যিই ভালোবেসেছিল ব'লে ইংরাজ-চরিত্র সম্বন্ধে তার খানিকটা অন্তর্দৃষ্টিও জেগেছিল বলব। কিন্তু জাগলে হবে কি, বিলিতি সভ্যতা যে ভারতীয় সভ্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তার এই সাহেবি মতে আমি কিছুতেই সায় দিতে পারতাম না। কেবল তার একটি কথা আমাকে সত্যিই ভাবিয়ে দিয়েছিল, সে প্রায়ই বলত: "একটু চোখ চেয়ে দেখতে শেখ দিলীপ, এরা সভ্যতার নানা টেকনিককে আবিষ্কার ক'রে কীভাবে এগিয়ে গেছে। তাই তো বলি এদের কাছ থেকে এই এগিয়ে যাওয়ার পদ্ধতিটা আমাদের আয়ত্ত করাই চাই। গতানুগতিকতায় সর্বনাশ।"

আমি টুকতাম: "কিন্তু তাই ব'লে অনুকরণ?"

রবি বলত রেগে: "এসব বুলি ছাড়ো। অনুকরণ আবার কী? দেশলাই যে জাত প্রথম আবিষ্কার করেছিল সে-জাত কিছু শিলমোহর করে সে-আবিষ্কারের পেটেন্ট স্বত্ব নেয় নি। মানুষ যেখানেই প্রগতির মুখে যা-কিছু উপলব্ধি করেছে সে উপলব্ধির শরিক হয়েছে সব দেশের মানুষ। গ্রীকরা তাদের সভ্যতায় যা যা আবিষ্কার করেছিল তার জের টেনেই না রোম থেকে ফ্রান্স, ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড, ইংলণ্ড থেকে আমেরিকা বড় হয়ে উঠেছে। তুমি আজ হ্রদের মাঝে একটি ঢিল ফেললে একটি বিন্দু পরিমাণ স্থানে, কিন্তু সেই আঘাত বৃত্তাকারে ছড়াতে ছড়াতে শেষকালে কোথায় যে ঠেকবে বলতে পারো আগে থেকে?"

রবির এই কথাটি আমি আজো ভুলি নি। এমনিতর আরো অনেক ভাববার কথাই ও গুছিয়ে বলত, যা আমার আজ মনে নেই।

না থাকুক, তার কাছে ঋণ আমার অবশ্য-স্বীকার্য—তার সঙ্গে নানা বিষয়ে মতে না মেলা সত্ত্বেও। বস্তুত, তার সংস্পর্শে এসে আমি একটা পুরোনো সত্য যেন আবার নতুন করে উপলব্ধি করি: যে স্নেহ-প্রীতি যেখানে স্বতঃ-উৎসারিত সেখানে মতানৈক্যে

খুব বেশি যায় আসে না। তার উপর সে-সময়ে আমার দেশহারা বন্ধুবিধুর অবস্থা, কেবলই মনে পড়ত বেকনের একটি প্রবন্ধের উক্তি :

"A crowd is not a company, and faces are but a gallery of pictures, and talk but a tinkling cymbal when there is no love."

রবিই আমাকে সবপ্রথম সুদূর বিদেশে সহজ প্রীতির ডাকে কাছে টেনে নিয়ে ভরসা দেয়, নির্দেশ দেয়, চোখ খুলে দেয় তার গভীরতর অভিজ্ঞতার আলোকপাতে। লণ্ডনের অনেক কিছুই আমাকে চমকে দিত বটে দিনের পর দিন : নানা থিয়েটার, মিউজিক হল, কনসার্ট, কিউ গার্ডেন, রিজেণ্ট পার্ক, হাম্পস্টেড হীথ্, হ্যাম্পটন কোর্ট, বৃটিশ ম্যুসিয়ম, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, পিকাডিলি, উইম্বল্‌ডন—সর্বোপরি লণ্ডনের টিউব ট্রেন যার প্রতি উল্লাসে আমার মনে হ'ত যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের জিন দেখিয়ে চলেছে অঘটনের পর অঘটন—কিন্তু এ-সব চমক তো স্নায়বিক—কাজেই আসতেও যেমন যেতেও তেম্‌নি—ওতে কি আর স্নেহবুভুক্ষুর মন ভরে ?

আমি জোর করে বলতে পারি না, তবে আমার মনে হয় আমার উদ্‌ভ্রান্ত অসহায় অবস্থা দেখেই রবির মন বলে উঠেছিল "আহা"! নৈলে সে হয়ত নানা সময়ে তার পড়াশুনো ও কাজকর্ম রেখে আমাকে তার স্নেহসঙ্গ দিয়ে সাবধান ক'রে দিত না, নানা বিষয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত না—কত রকম জাত-জালিয়াৎ লণ্ডনে সভ্য-ভব্য বেশ প'রে ঘুরে বেড়ায়। তাছাড়া নানাভাবে আমার রক্ষণাবেক্ষণ করতে করতে তার যেন আরো মায়া প'ড়ে গিয়েছিল আমার 'পরে, তাই বলত প্রায়ই ইংরাজি প্রবচনের বাঙলা তর্জমা ক'রে : "মনে রেখো যে, সংসারে যা চকচক করে, তা-ই সোনা নয়।" সে সময়ে ঠিক এম্‌নি একটি দিশারিরই আমার দরকার ছিল। এ-ও আমার জীবনের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা—যা বারবারই ঘটেছে—নানা বিধুর অসহায় লগ্নেই এগিয়ে এসেছেন নানা অভিভাবক ওরফে রক্ষাকর্তা—একের পর এক, যাকে ভগবানেরই করুণা ব'লে চিনতে আমাকে কোনদিনই বেগ পেতে হয় নি।

এবার বলি ড্রামাটির কথা। নামগুলি গোপন রাখতেই হবে, কারণ সহজেই অনুমেয়।

এ-নাটকের লব-কুশী তিনজন : নায়িকা—ইংরাজবালা, নায়ক—দুটি বাঙালি যুবক :যথাক্রমে নাম দেই ডোরা দেবী, গম্ভীরবাবু ও শৌখিনবাবু—যার কথা একটু বলেছি।

ঘটনাটি কিছু নতুন নয়—সেই চিরকেলে ত্রিকোণ—একটি মেয়েকে নিয়ে দুদিকে

দুজনের টানাটানি। কিন্তু পরিস্থিতিটি গ'ড়ে উঠেছিল একটু চমকপ্রদ ভঙ্গিতেই বলব। ফেনিয়ে বলতে সাধ যায়; কিন্তু কাহিনী মামুলি ব'লে বাক্‌সংযম করাই ভাল।

গম্ভীরবাবুর গাম্ভীর্যের সীমা ছিল না। রবি তাকে নিয়ে খুবই হাসাহাসি করত। গম্ভীরবাবু অসামান্য ভারিক্কি হওয়া সত্ত্বেও তাকে একটু সমীহই করতেন— আই সি এস তো, সমীহ না ক'রে উপায় কি? কিন্তু আমাকে তিনি ভারিক্কি চালে নানা উপদেশ দিতেন বিলিতি কেতা সম্বন্ধে। ওদিকে মুখফোঁড় রবি কচাকচ কেটে দিত তার সব রায়কেই—"ডোন্‌ট টক থ্রু ইওর হ্যাট" ব'লে। গম্ভীরবাবু ধমক খেয়ে আরো গম্ভীর হয়ে যেতেন, কিন্তু আমাকে নিরীহ দেখে চাইতেন তার কবল থেকে মুক্ত ক'রে নিজের করায়ত্ত করতে। কিন্তু এবার বিষ্কম্ভক থেকে নাট্যলোকে অবতরণ করবার সময় এল।

একদিন ক্রমওয়েল রোডে ভারতীয় আবাসে আমার গান হ'ল। শৌখিনবাবু যথাবিধি সজোরে হাততালি দিলেন। সভা শেষ হ'লে ভবশঙ্কর তাঁকে নিমন্ত্রণ করল তাদের এজওয়ার রোডের সুরম্য ফ্ল্যাটে।

শৌখিনবাবু সাক্ষাৎ স্যর সুরেন্দ্রনাথের পুত্রের নিমন্ত্রণ পেয়ে আরো প্রসাধন ক'রে ড্রেস স্যুট প'রে এসে হাজির। গম্ভীর- বাবুও ছিলেন সেখানে। দুজনের দেখা—যার ফল হ'ল সুদূরপ্রসারী। তিনি নিমন্ত্রণ করলেন আমাকে ও শৌখিনবাবুকে। বললেন: "আমি আছি এক চমৎকার গ্রামে—লণ্ডন থেকে দশ-বারো মাইল। আসুন না সেখানে একদিন। আমার ল্যাণ্ডলেডি চমৎকার রাঁধেন।" আমি যাব ব'লে ধন্যবাদ দিয়ে শুধালাম: "লণ্ডন ছেড়ে গ্রামে থাকেন কেন?" তিনি আরো গম্ভীর হয়ে বললেন: "নিরালা কি না—পড়াশুনোর সুবিধে।" কিন্তু রবিকে এসে বলতেই সে হেসে বলল: "জানি হে সেখানকার কাণ্ড। ও পড়াশুনো কিচ্ছু করে না। থাকে সেখানে শুধু ডোরার জন্যে।"

(বলা বাহুল্য ডোরা ব'লে যাকে ডাকছি তার আসল নাম ছিল অন্য।) ডোরা গম্ভীরবাবুর বৃদ্ধা ল্যাণ্ডলেডির মেয়ে। অতি-তরুণী, অতি-চপলা, অতি-প্রফুল্লা—সবই অতি, কেবল সৌন্দর্যে নয়। না, সে মোটেই সুন্দরী ছিল না। তবে যৌবনের জৌলুষে অনেককেই টানবার আর্টে সিদ্ধি-লাভ করেছিল। এসব কথা রবির কাছেই শুনেছিলাম নাট্যরঙ্গটি ঘোরালো হয়ে ওঠার পরে।

হ'ল কি, আমি একবার সেই গ্রামে গম্ভীরবাবুর আতিথ্য স্বীকার ক'রে ডাক

দিলাম রবিকে। সেও এসে রইল কিছুদিন আমাদের সঙ্গে। বৃন্ধা কী যে খুশি! আরো খুশি ডোরা। রবিকে সে বড়ই পছন্দ করেছিল। কিন্তু রবি তার দিকে ফিরেও তাকাত না। সে ছিল চরিত্রবান পুরুষ—তাছাড়া ডোরার না ছিল বুদ্ধির সম্পদ, না রূপের চটক। "শুধু মাংসের আকর্ষণ আমার জন্যে নয় দিলীপ," বলত রবি প্রায়ই হেসে। ইংরেজি নানা ইডিয়মও এইভাবে তর্জনা ক'রে ও আমাকে খুব হাসাত। "নির্বোধের নন্দনে আছে"—living in fool's paradise—বলত হেসে শৌখিনবাবুর সম্বন্ধে। কবরের মতন কালো—গ্লুমি অ্যাজ দি গ্রেভ—গম্ভীরবাবুর সম্বন্ধে। পালকের মতন ফুরফুরে—লাইট অ্যাজ এ ফেদার, ডোরা সম্বন্ধে, ইত্যাদি। আরো কত বুকনি যে সে মুখে মুখে বানাত—মনে নেই। যা হোক গল্পটা শুরু করি, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল বছরখানেক ধ'রে—ধাপে ধাপে। শুরু হয়েছিল খানিকটা রঙিন রঙেই বটে, কিন্তু শেষ হ'ল সঙিন ঢঙে।

গম্ভীরবাবুর নিমন্ত্রণে আমি ও রবি যখন গ্রামে গিয়েছিলাম, তখন শৌখিনবাবু আমাকে অশৌখিন দেখে কৃপাপরবশ হয়ে সেখানে মাঝে মাঝেই আসতেন ও বিলিতি কেতাদুরস্ত হ'তে হয় কী ক'রে সে সম্বন্ধে রাজা-উজির মারতেন। ডোরা তাঁর ফিটফাট ধরনধারন দেখে খুব খুশি। খুশিতেই খুশি জাগে: দেখতে দেখতে তিনি তাকে এখানে ওখানে থিয়েটার বায়স্কোপে নিয়ে যাওয়া শুরু করলেন।

শৌখিনবাবুকে গম্ভীরবাবু প্রথম থেকেই নেকনজরে দেখেন নি, এখন ডোরাকে তাঁর দিকে ঝুঁকতে দেখে তিনি একেবারে রেগে টং। রাগ থেকে জন্মাল রোখ—গম্ভীরবাবু ভুলে গেলেন গাম্ভীর্য—এগিয়ে এলেন ডোরার চোখে বড় হ'তে। ডোরা তাঁর মন টানলেও মেয়েদের সঙ্গে দহরম মহরমে তিনি ছিলেন একটু অ-তৎপর। তাই ডোরাকে নিয়ে কোথাও যাওয়ার তাঁর সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। কিন্তু বিদ্যুতেই বিদ্যুৎ জাগে—শৌখিনবাবুর অভ্যুদয় হতে না হতে 'শক্' খেয়ে তিনি হয়ে উঠলেন শুধু সচকিত নয়—দুঃসাহসী। ফল যা হবার—রীতিম'ত নাটক উঠল ঘনিয়ে: সেই চিরকেলে রেষারেষি। ডোরাও তো এই চায়—মনের সাধে টোপের পর টোপ ফেলে উভয়কে খেলাতে থাকে। ফলে ইনি ডোরাকে থিয়েটারে দশ শিলিং-এর আসনে নিয়ে যান তো উনি পনের শিলিং-এর আসনে। অতঃপর নিলামে ডাক চড়ে: ইনি এক গিনির আসনে তো উনি দেড় গিনির। এইভাবে ব্যাপারটা ঘোরালো হতে হতে শেষকালে রেষারেষি থেকে দাঁড়াল মারামারি—"শুম্ভ-নিশুম্ভের

যুদ্ধ - নারদ নারদ !”—বলত রবি হেসে—কেবল ললনাটি “এনি থিং বাট তিলোত্তমা ! কিন্তু দিলীপ, মাংসের আকর্ষণ যখন পেয়ে বসে তখন উদ্‌ভ্রান্তের হয় ‘ঝড়ে যে কোন বন্দর’ অবস্থা বুঝলে না ?” (Any port in a storm)

এই সূত্রে আমি প্রথম টের পাই যে, আমি কি রকম আনাড়ি ছিলাম এসব বিষয়ে। নানা সময়ে সত্যিই যেন থ হয়ে যেতাম এই রূপহীনা পাড়াগেঁয়ে মেয়েটিকে নিয়ে দুজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের শুধু পাগলামিতে নয়—কুশ্রী কাণ্ডকারখানায়। না, শুধু কুশ্রীই নয়—যাকে বলে অবিশ্বাস্য—আরো এই জন্যে যে শৌখিনবাবুর অভ্যুদয়ের আগে গম্ভীরবাবু ছিলেন নীরব দুন্দুভি, শৌখিনবাবুর অভ্যাগমের পরে রৈ রৈ ক'রে উঠলেন—“যুদ্ধং দেহি”। নানা সীন হ'ত যখন তখন। বৃদ্ধা তো ভয়ে সারা। কিন্তু ডোরার মুখে হাসি ধরে না—উঠল উজিয়ে। না উঠবে কেন ? এ তাকে দেয় হাতঘড়ি তো ও তাকে দেয় রেশমি শাল। এ নিয়ে যায় হিপোড্রোমে তো ও নিয়ে যায় কার্নিভালে। এ নিয়ে যায় কাবারে-র নাচঘরে, তো ও ডাক দেয় সাভয় হোটেলের ডিনারে। শেষে দুজনেই ফতুর হবার জো—এর ওর কাছে টাকা ধার করে।

শেষে একদিন হ'ল কি, দুজনেই ডোরাকে করল বিবাহ প্রস্তাব। সত্যি, এ চাক্ষুষ দেখা, এ পর্যন্ত হলপ করে বলতে পারি—যদিও তার পরে কী হ'ল জানি না শুধু এইটুকু ছাড়া যে ডোরা রেগে অস্থির শুনে যে শৌখিনবাবু বিবাহিত ও গম্ভীরবাবু দেউলে। রাগের মাথায় সব ফাঁস হয়ে গেল—

ডোরা বলল, ওকে দুজনেই মিথ্যা বলেছিল—যে ওরা দুজনেই অবিবাহিত তথা সম্পত্তিপন্ন। আমি রবিকে শুধালাম—গম্ভীরবাবু না হয় ডোরার পাণিপ্রার্থী হতে পারেন, কিন্তু শৌখিনবাবু বিবাহিত হয়ে কী ক'রে ইংরাজবালাকে ঘরনী করতে চাইলেন ? উত্তরে রবি যা বলেছিল সহজেই অনুমেয়। যা হোক্, ব্যাপারটা সবচেয়ে ড্রামাটিক হয়ে দাঁড়াল যখন একদিন আমাদের সামনে ডোরা রেগে কেঁদেই ফেলল—শৌখিনবাবু ওকে ফ্লার্ট বলেছেন ব'লে। রবি পরে হেসে বলেছিল : “দেখ কাণ্ড ভাই, কোদালকে কোদাল বললে এদেশে সে হয়ে ওঠে অশ্রুনদী।”

ঘটনাটি রীতিমত নাটকীয় হ'লেও কিন্তু ঠিক অঘটনের পর্যায়ে পড়ে না—বিশেষত ওদেশে। কিন্তু সে-সময়ে আমাদের দেশে এ-ধরনের কাণ্ড ঘটতেই পারত না, তাই আমার সত্যিই ধাঁধা লাগত দেখেশুনে—মনে হ'ত এও কি সম্ভব ? আমি এ-জাতীয় প্রশ্নের সূত্রে শুধু আঁকতে চেয়েছি আমার সে-সময়কার মনের ছবি—যে-

মন ধীরে ধীরে তার নানা অনুভূতি উপলব্ধির পাপড়ি খুলছিল বিলেতের যৌবন-পরিবেশে। আমি আমার বাল্যস্মৃতিতে বিশদ ক'রেই চিত্রিত করেছি কী ভাবে আমি গড়ে উঠেছিলাম পিতৃদেবের সাহিত্য,সঙ্গীত ও হাস্যরসের পবিত্র আবহাওয়ায়। লিখেছি—কী ভাবে আমি অবিমিশ্র পুরুষালি আবহে মানুষ হয়েছিলাম। পিতৃদেবের লোকান্তরের পরে আমি বলতে গেলে শুধু আমার মাসি ও মামিমাদের সঙ্গেই মিশতাম—দু-একটি ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরা আসত বটে থিয়েটার রোডে—(কারণ স্মরণীয়—হিন্দু মেয়েরা সে-সময়ে ছিল পর্দানশীন)—কিন্তু তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবার না ছিল আমার সময়, না সুযোগ। আমার সাড়ে পনর আনা সময় কাটত—গান শেখায়, সুভাষ, সত্যেন, ধূর্জটি প্রমুখ প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশায় ও পড়াশুনায়। ফলে সত্যিই আমি যৌবনে পা দিলেও তার জলতরঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হবার ফুরসৎই পাই নি। এজন্যে অনেকেই আমাকে 'ছেলেমানুষ' বলতেন আর আমি রাগ করতাম—ঠিক যেমন করতাম রবির উপরে যখন সে ডোরা-জাতীয় মেয়েদের মনস্তত্ত্ব বোঝাতে বোঝাতে আমার অকৃত্রিম বিস্ময়ে বিস্মিত হয়ে সকৌতুকে বলত:"তোমাকে ভালোবাসি আরো এইজন্যেই দিলীপ যে তুমি সাবালক হয়েও এমন সরল—আন্‌সফিস্টিকেটেড—থাকতে পেরেছ।' আমি মুখ ভার করে বলতাম: "যাও যাও! সরল যে বোকারই উপনাম এটুকুও আমি জানি না নাকি?"

উনিশ

বিলেতে—মানে ইংলণ্ডে ছিলাম প্রায় দু বৎসর। এর মধ্যে প্রায় দেড়বৎসর কাটিয়েছি কেম্ব্রিজে, বাকি সময়টা কখনো লণ্ডনে, কখনো নানা রম্যস্থানে, কখনো পারিসে, সুইজর্লণ্ডে, হলাণ্ডে, রাইন উপত্যকায়। তৃতীয় বৎসরে যাই বার্লিনে গান ও জর্মন ভাষা শিখতে। তারপরে লুসানো, ভিয়েনা, প্রাগ, বুদাপেস্ত প্রভৃতি নানা শহরে নিমন্ত্রিত হয়ে গান গেয়ে ও গানের সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি ১৯২২-এর শেষে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর য়ুরোপে ভ্রাম্যমান্ হয়ে। আমি ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে বসিনি তাই কবে কোথায় গিয়ে কী কী দৃশ্য দেখেছি তার ঘটা ক'রে বর্ণনা দেবার দরকার দেখি না, কারণ আমার স্মৃতিচারণের মুখ্য উদ্দেশ্য তো ঠিক আত্মজীবনী লেখা নয়—আমি চেয়েছি শুধু আমার অন্তর্জীবনের বিকাশ ধারাটিকে নিয়ে একটু রোমন্থন করতে। এই সূত্রে অবান্তর কথা এখানে ওখানে হয়ত এসে

গেছে, পরেও এসে যাবে—যাক, কেবল নীরস না হ'লেই হ'ল। অবশ্য আমার কাছে যা সরস—যথা ধর্ম—অন্যের কাছে যে তা কষ্টপাঠ্য হতে পারে একথা আমার অগোচর নেই। কিন্তু তার কোনো উপায় নেই, কারণ আমার কাছে সব চেয়ে সরস আখ্যান হল আঁধারে যে মনের জন্ম তার আলোর পানে উধাও হবার ইতিহাস—কী ভাবে আমার গ্রহিষ্ণু প্রাণমন দৈনন্দিনিক জীবন থেকে চিরন্তনের পাথেয় জুটিয়ে নিয়ে ঠেকে, ঠ'কে, শিখতে শিখতে, হোঁচট খেতে খেতেই আরো বলীয়ান্ হয়ে উঠেছে। আমি বরাবরই বিশ্বাস ক'রে এসেছি যে, বাইরের জীবনের কথাকাহিনী বর্ণনীয় কেবল ততক্ষণ অবধি যতক্ষণ তার মধ্যে দিয়ে মনের প্রাণের ঊর্ধ্ব অভীপ্সার ছবি রঙিয়ে ওঠে, চিকিয়ে ওঠে, ঝল্‌কে ওঠে। তাই আমার বৈলাতিকী জীবনযাত্রার কেবল সেই অঙ্ক বা গর্ভাঙ্কগুলিই লোকচক্ষুর পাদপ্রদীপের সামনে ধরতে চাই যারা আভাস দেবে আমার আন্তর ক্রমবিকাশের। চমকপ্রদ ঘটনাবলীর বৈচিত্র্যবর্ণনা পণ্ডশ্রম—এমন কথা বলছি না, কিন্তু আমার স্মৃতিচারণের উপজীব্য নয়। যার যা ধর্ম। আমার ধর্ম কী খুঁজতে বুঝতে চিনতে আমাকে বেগ পেতে হয়েছে কৈ কি, অনেক সময়েই হয়েছে ঠিকে ভুল, কিন্তু যখন চোখে প্রায় সব কিছুই ঝাপসা দেখেছি তখনো একটি মহাপুরুষ আমার আঁধার পথে বাতি ধরেছেন: তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ নন, শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার প্রবাসজীবনে যখন নানা চিন্তা, নানা ভ্রান্তদিশা, নানা প্রলোভন এসে আমার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করেছে আমার কেবলই মনে পড়েছে তিনজনের মুখ, শ্রী-ম, রাখাল মহারাজ ও শ্রীমা সারদামণি। যখনই মনে অশান্তির বাদলে চলার পথে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে তখনই মনে পড়েছে এঁদের কথা যে আমি ভাগ্যবান্ বলেই এত অল্প বয়সে পেয়েছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপা। মনে পড়েছে—বিশেষ ক'রেই রাখাল মহারাজের দুটি স্মারক বাণী: স্মরণ মননই যোগ, এবং ভুললে চলবে না যে আমাকে ঠাকুরের কৃপার যোগ্য হতে হবে।

প্রায় সাড়ে তিন বৎসর য়ুরোপে মেলামেশা করেছি অজস্র লোকের সঙ্গে—(গায়ককে বোধহয় সবচেয়ে বেশি মিশতে বাধ্য হ'তে হয় রকমারি মানুষের সঙ্গে)—মেলামেশায় আনন্দও পেয়েছি অফুরন্ত, দিনের পর দিন রবিশশিতারা ব'য়ে এনেছে উল্লাসের কাঁপন, প্রতি নিশ্বাসে বুক ভ'রে উঠেছে পুলকে, গীতি ও প্রীতির উচ্ছ্বাস-শিহরণে রোমে রোমে জেগে উঠেছে ঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা যে আমাকে তিনি শুনিয়েছেন তাঁর ঘরছাড়া বাঁশি, ভরসা দিয়ে—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" নইলে কি

এত প্রলোভনের মধ্যে এক আধবার হোঁচট খেলেও অক্ষতদেহে দেশে ফিরতে পারতাম? রাখাল মহারাজ মিথ্যা বলতে পারেন কখনো? ঠাকুরের কৃপাই আমাকে বর্মের মত ঘিরে রেখেছিল। তাই প্রায় প্রতি রাতেই শোবার আগে পরমহংসদেবের বাঁধানো চারভাগ কথামৃত পড়তাম। এ-বইটি আমার আজো আছে, এখনো পড়ি, বারবার পড়ি—যখনই মনে সংশয় কি দ্বন্দ্ব আসে, আর মন হয় উর্ধ্বমুখী। এইভাবে আজ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়েছি কম ক'রেও অন্তত পঞ্চাশ ষাটবার।

কিন্তু এ-উচ্ছ্বাস থাক। ঠাকুরের কৃপার কথা পরে আরো লিখতে হবে—কেবল লিখব দৃষ্টান্ত দিয়ে তবে, নইলে হয়ত অনেকে মৃদু হাসবেন, "হায় রে বিশ্বাস—the old old story!"—ব'লে। তবে সবচেয়ে সুন্দর সত্যই তো সবচেয়ে পুরোনো—প্রতি সকালে নিশার বুক চিরে উষার আলো, পঙ্কের বুকে ছেয়ে পঙ্কজের হাসি। কবির ছন্দ গুণীর সুরবিলাস, বন্ধুর প্রীতি—সর্বোপরি মহত্ত্বের ছোঁয়াছে প্রাণে সব ছাড়বার উচ্চাশা জেগে ওঠা—এদের মধ্যে কোন্‌টি সনাতন নয়? অথচ আশ্চর্য এই যে, আজো মনে হয়—এ সবই চিরনবীন!

কিন্তু তবু প্রতি পথই আলো-আঁধারী, প্রতি হৃদয়েই দুটো উল্টো টানের দ্বৈরথযুদ্ধ, প্রতি আশার ওপিঠেই নিরাশা, হর্ষের ওপিঠে বিষাদ, সুখের ওপিঠে অবসাদ—এও তো না মেনে পারি না। সব পেয়েছির দেশে আমাদের শুধু যে জন্ম হয়নি তাই নয়। সব পেয়েছির দেশে জন্মালে আমরা হারাতাম জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ—বড়র জন্যে ছোটকে ছাড়ার দুর্নিবার অভীপ্সা।

বিলেতে এইসব কথা আমার নিরন্তরই মনে হ'ত। কিন্তু তবু বিলেতের আবহাওয়ায় আমার বৈরাগ্যপ্রবণতা একটু একটু করে ইহলৌকিকতার দিকেই মোড় নিয়েছিল বলব—যার ফলে আমার দৃষ্টিভঙ্গি একটু একটু ক'রে বদলে গিয়েছিল বৈকি। যতই কেন না "বৈরাগ্যমেবাভয়ং" জপ করি—য়ুরোপের প্রাণশক্তির ঝলকানি ও অজস্রতা আমাকে সময়ে সময়ে সত্যিই উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলত। মন শুধাত: এত শক্তি এরা পেল কোথা থেকে, আর কেনই বা এরা চলেছে সমাপ্তিহীন, যতিহীন ছন্দে—নির্লক্ষ্য অর্থহীন গতির জয়ধ্বনি ক'রে?

ফল যা হবার: আমাকে খানিকটা পেয়ে বসল এদের গতির নেশা, প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য,শক্তির জাহিরিপনা। শাশ্বত স্থিতির, নিবৃত্তির, বৈরাগ্যের বাণী—যা আমাকে ছেলেবেলায় অনুপ্রাণিত করেছিল ভগবদ্‌-ভক্তির রসাবেশে—আমার অন্তর

থেকে একটু একটু ক'রে দূরে স'রে গেল। স্থভাষের মুখে প্রায়ই শুনতাম ওর প্রিয় কবি টেনিসনের বাণী—আমার মনকে একটু একটু করে আবিষ্ট ক রে তুলল :

Ring out the old, ring in the new,
Ring happy bells accross the snow !
The year is going, let him go,
Ring out the false, ring in the true !

বাজাও শঙ্খ অতীতে বিদায় দিয়ে—অনাগতে বন্দি',
বাজাও শঙ্খ পরমানন্দে হিমানীর বুক ছেয়ে !'
যায় পুরাতন বর্ষ—যাক:না। শঙ্খ উঠুক গেয়ে !
মিথ্যামরণ-ঘোষণা—স্থচির সত্যেরে অভিনন্দি'।

স্থভাষ এ-লাইন কয়টি ভালবাসত আরো এইজন্ত যে, সে চাইত যেন আমরা গতানুগতিক তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতা ব'লে ভুল না করি। একথা আগে ফলিয়েই বলেছি, তবু স্থভাষের কথা তুললাম এই জন্তে যে য়ুরোপের দুর্দম্য প্রাণশক্তির স্পন্দন ও সর্বান্তঃকরণেই বরণ করেছিল। আমার মধ্যে দ্বিধা ছিল, তাই আমি য়ুরোপের গতিসর্বস্ব ইহলৌকিকতাকে বরণ করতে ইচ্ছা হ'লেও ভয় পেতাম—পাছে ভারতের স্থিতপ্রজ্ঞ পারমার্থিকতাকে হারিয়ে বসি। আমার মনে কেবলই থেকে থেকে বেজে উঠত : "যা লোকয়দ্বসাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী" অর্থাৎ তাকেই বলি মানুষের পরম বুদ্ধি যা ইহলোক ও পরলোক উভয়কেই করায়ত্ত করতে পারে। কিন্তু ইহসর্বস্ব জীবনের জয়গানেরও একটা মাদকতা আছে যা ধীরে ধীরে মনকে মোহাবিষ্ট করে। তাই আমি একটু একটু ক'রে প'ড়ে গেলাম দোটানায়। আমার মনের মূলে কে বৈরাগ্য গেঁথেছিল তার শিকড়, যে স্থখের পরে দুঃখ আসতে না আসতে নিজেকে জানান দিত, বলত : "যা দুদিনের তাকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন ?" মনে পড়ত পরমহংসদেবের কথা : "সংসারে ভোগ করবে কি—সে যে আমড়া, শুধু আঁটি আর চামড়া"—অমনি উল্টোদিকে আমাকে টানত এ-যুগের বিশ্বমানবতার বাণী, ভোগবাদের জল্পনা, ইন্দ্রিয় স্থখের কল্পনা, কবিত্বের মুরলীমঞ্জীর, কর্মবাদের মাদকতা …আরো কত কী আকর্ষণ। টানাটানিতে কখনো এ জিৎত, কখনো বা ও।

কিন্তু আমাদের মন স্বভাবে কানপাৎলা, তাই ক্রমাগত শুনতে শুনতে টলে বৈ কি। আমিও টললাম। একে জনসংঘের পিছুটান, তার উপর যৌবন-জলতরঙ্গ। বৈরাগ্য অন্তত তখনকার ম'ত হার মানল। আমি স্থির করলাম—স্মরণ মনন রাখব,

কোনো ছলেই অশুচি অশুভের দিকে ঝুঁকব না, কিন্তু কর্মও চাই, কীর্তিও চাই। নিজেকে বোঝালাম যে, বিশ্বের প্রাণশক্তির সঙ্গে আমাদের প্রতি ব্যক্তিগত প্রাণের যে-নাড়ীর-যোগ আছে সে-সূত্র কেটে দিলে মিইয়ে পড়ব। মনকে বোঝালাম—গীতায় ঠাকুরও বলেছেন "কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ"—নৈষ্কর্ম্যের চেয়ে কর্ম বড়। এর ফল কী হ'ল ও কীভাবে—বলি—মনে হয় কাহিনী নীরস হবে না। প্রথমে বলি ইংলণ্ডের কথা—তারপরের কথা যথাস্থানে।

১৯১৯ থেকে ১৯২১-এর জুন অবধি ইংলণ্ডে ছিলাম এত আনন্দে যে কী বলব? প্রাণশক্তিকে প্রবৃত্তির বাজারে দিলদরিয়া হয়ে খাটালে যৌবনে সে মুনাফা দেয় শতধারে। সব চেয়ে বেশি লাভের অঙ্কপাত হয় উৎসাহের তরুণ তহবিলে। ফলে এ দু-বৎসর আমি সোৎসাহে ইংলণ্ডের নানাস্থানে ঘুরেছি, বহু লোকের সংস্পর্শে এসেছি, অজস্র আনন্দ পেয়েছি, অগুন্তি গান গেয়েছি, বিস্তর বই পড়েছি এবং শিখেছি একটি ভাষা—ফরাসি। ভাষা শেখার উৎসাহ আমার খুব বেশি ছিল। জীবনে সবচেয়ে আমি লাভ করেছি সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষা থেকে। তারপর বাংলা ও সবশেষে ফরাসি ও জর্মন ভাষা থেকে। ইতালিয়ান ভাষাও একটু শিখেছিলাম কিন্তু সে সামান্য। তাই এখানে আমি বলব শুধু ফরাসি ভাষার কথা।

এ-সুন্দর ভাষাটিতে কথা বলবার উৎসাহ আমার উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে প্রথম রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯২০ সালে জুলাই মাসে। কেম্‌ব্রিজে গণিত ট্রাইপস প্রথম পার্ট পাশ ক'রে ছুটি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে—সুইজর্লণ্ডের শুনেক গ্রামে। ছবির মতন গ্রামটি! চোখ জুড়িয়ে গেল। কিন্তু রোলাঁর সঙ্গে দেখা হ'তেই ব'সে পড়লাম। কারণ ফরাসি ভাষা শিখেছিলাম বটে কিন্তু সে পথে ঘাটে কাজ চালাবার মতন শেখা, সাহিত্যিক কথাবার্তা [illegible] মতন নয়। তবে রোলাঁর কথা কিছু কিছু বুঝতাম ও ইংরিজিতে যা যা বলতেন সেসব তাঁর বিদুষী সহোদরা মাদলিন তর্জমা ক'রে ক'রে তাঁকে বুঝিয়ে দিতেন। কোনোমতে কাজ চ'লে যেত বটে, কিন্তু মনে ভারি দুঃখ হ'ত; কেন ফরাসি ভাষাটা আর একটু মন দিয়ে শিখলাম না ছাই! সুভাষ ঠিকই বলত—কত বাজে লোকের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করেছি! যদি ফরাসি ভাষাটা নিয়ে উঠে প'ড়ে লাগতাম!...

কিন্তু "যে-মাটিতে পড়ে লোকে ওঠে তাই ধ'রে"—বলে না? আমিও রুখে উঠলাম। শিখতেই হবে ফরাসি ভাষা। পারিসে রইলাম কয়েক সপ্তাহ জুল ব্লক

নামধারী ফরাসি প্রফেসারের বাড়িতে, তারপর এক ফরাসি রাজপুরুষের আতিথ্যে। ফরাসি ভাষায় কথা বলতে একটু একটু ক'রে মুখ ফুটতে লাগল, শুনতে শুনতে ফরাসি ভাষার নানা ঝঙ্কার ও সন্ধি (liaison) আয়ত্ত হ'ল ; কিন্তু তখন রুখে উঠেছি তো—ঠিক করলাম নাল্লে সুখমস্তি—আরো বলা অভ্যাস করতে হবে।

খৃষ্টদেব মিথ্যা বলেন নি—সত্যি চাইলে জোটেই জোটে। আমারও জুটে গেল চমৎকার অধ্যাপিকা—এক আট বৎসরের মেয়ে জান (Jane) ইংরাজিতে যাকে জেন বলে। আর মিলল.লণ্ডনেই। কী চমৎকার। কারণ য়ুরোপে আমার সবচেয়ে প্রিয় শহর ছিল লণ্ডন।

মঁসিয়ে এর্ম্‌ লণ্ডনের কোন এক কলেজে ফরাসি ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মাদাম এর্ম্‌ আর আট বৎসরের মেয়ে জান। বুদ্ধি-উজ্জল চোখে স্নেহ-দৃষ্টি, সুন্দর লাল ঠোঁটে মিষ্টি হাসি, সবার উপর—চপল রসনায় অনর্গল বাগ্মিতা। আমার তো হাতে চাঁদ এসে গেল। সে একাই ব'লে চলে তার কত যে সুখ দুঃখের কাহিনী, আট বৎসরের মেয়ে হ'লে কী হয়—আলাপে যে সে সাক্ষাৎ বাগ্‌বাদিনী—আমি তার সঙ্গে পাল্লা দেব কোথেকে? কিন্তু সে মুখ ছোটায় একতরফা, যাকে বলে অহৈতুকী কলভাষিনী—আমি শুনি বা না শুনি একটুও যায় আসে না স্বাবলম্বিনীর। ফলে মাসখানেকের মধ্যে আমার এত ফরাসি ভাষা শোনা হ'ল যে, দেখি কি, কানও তৈরি হয়ে গেছে আর ঐ সঙ্গে বলাও রপ্ত হয়ে গেছে—শুনতে শুনতেই। মাদাম এর্ম্‌ ভারি খুশি আমার উন্নতি দেখে। এই স্নেহময়ীকে আমি ভুলব না। আমার এক অসুখের সময় তিনি যে আমার কী অক্লান্ত সেবা করেছিলেন—কিছুতেই নার্সিং হোমে যেতে দেন নি। আমার বিছানার পাশে ব'সে তাঁর কত দুঃখের কথাই যে বলতেন—ভালোবেসে কীভাবে ঘর ছাড়েন, ধনীর কন্যা হয়ে কীভাবে প্রেমিকের জন্যে দুঃখ পান, কলঙ্কবরণ করেন............ইত্যাদি। সে এক বিচিত্র নাটকীয় কাহিনী। শুনতে শুনতে ভাবতাম সগর্বে: "এবার রবির কাছে গিয়ে চাল মারতে পারব বটে। বা বা বা!" কিন্তু সে অন্য কথা।

জান ছিল তাঁর নয়নতারা। কিন্তু তিনি তাকে শাসন করতেন খুবই। সে আমার কোলে ব'সে যখন অনর্গল ব'কে চলত, ধমকাতেন: "এবার ওঠ্, দুষ্টু মেয়ে! —মসিয়ে রোয়ার কষ্ট হয় না বুঝি?" জান পিঠ পিঠ উত্তর দিত: "দূর! মসিয়ে রোয়া তোমার মতন দুর্বল নাকি? আর আমি তো ছেলেমানুষ—হাল্কা।"

অনাবিল হাসি গল্প স্নেহ প্রীতির আবহে কাটল মাসখানেক। মাঝে মাঝে

সুভাষ সেখানে আসত। তার সঙ্গে একটি ছবি তুলি জান মাঝে দাঁড়িয়ে। ছবিটি আমার The Subhash I Knew বইটিতে ছাপা হয়েছে। সুভাষকে দেখে মাদাম এর্হ্ মুগ্ধ। কিন্তু মুশকিল—তিনি একটুও ইংরাজি জানতেন না। আমি বাহাদুরি দেখাতে হলাম দোভাষী। সুভাষকে তিনি লাঞ্চে ডাকলেন। সুভাষ আমার ফরাসি ভাষায় দ্রুত উন্নতি দেখে চমৎকৃত! সে কী আনন্দ আমার—যাকে এ-যাবৎ কেবল আমিই একতরফা তারিফ করে এসেছি অবাক হয়ে—সে কিনা আজ আমাকে তারিফ করছে সবিস্ময়ে! থ্রিল যাকে বলে! কিন্তু সুভাষ এর পরে আরো ছেঁকে ধরল: "এই-ই তো চাই দিলীপ, কেবল এবার জর্মন ভাষা শেখো।"

আমি ওকে বললাম: "ভাই, আমি ফরাসি ভাষা শিখতে এত কষ্ট করেছি শুধু সামনের বছরে রোলাঁর সঙ্গে আলাপ করব ব'লে। তোমার জর্মন ভাষা বড় কটমট, ফরাসি ভাষার মতন শ্রুতিমধুর নয়।" কিন্তু সুভাষ কি ছাড়বার পাত্র? কেবল বলবে—জর্মন ভাষা শেখো গানে তো ওরাই সবার বড়। এ-যুক্তি দিলেই হার মেনে বলতে হত বৈ কি: "আরো শিখব।" এর কিছু পরে জর্মন ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে বসেছিলাম সত্যিই, কিন্তু সত্যি শেখা শুরু করি বার্লিনে পৌঁছবার পরে—১৯২১ সালে। সে কথা বলব যথস্থানে। আজ বলি রোলাঁর ও তার পরে রাসেলের কথা। কারণ আমার য়ুরোপীয় জীবনের সব চেয়ে বড় লাভ এই দুটি মানুষের সঙ্গে প্রীতির বন্ধন তথা তাঁদের বলিষ্ঠ ও গভীর ভাবধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

আমার মনে হয়েছে বরাবরই যে মানুষ জীবনে সব চেয়ে বেশি লাভ করে যখন মহৎ মানুষের সঙ্গে সত্যিকার স্নেহসম্বন্ধ গড়ে ওঠে। স্নেহ সর্বত্রই তৃপ্তি দেয়, পাথেয় দেয়—সত্য, কিন্তু মহৎ মানুষের কাছেই মানুষ পায় চিরন্তনের দিশা—প্রেমের পথনির্দেশ—যার পরম পরিণতি "মহাপুরুষ সংশ্রয়ে"। ফরাসি ভাষার কথা একটু ফলাও করে বললাম ফরাসি ভাষায় আমি পণ্ডিত এমন মিথ্যা জাঁক করতে নয়—যে-কোনো ভাষা ভালো করে শেখা যে কত কঠিন তা প্রথম টের পেয়েছিলাম যখন শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞানশলাকায় চোখফোটার পরে প্রথম দেখতে পাই যে ইংরাজি ভাষায় যেটুকু দখল নিয়ে আমরা প্রায়ই বড়াই করি—সে স্রেফ ছেলেমানুষি। কোনো ভাষার অন্ধি সন্ধি জানলে তবেই বলা যায় যে, সে-ভাষা আয়ত্তে এসেছে—তার আগে নয়। বহু সাধনার ফলে ইংরাজি ভাষায় সামান্য একটু দখল হওয়ার পরে তবে একথা বুঝবার মতন করে বুঝতে পারি—তাও শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে। কাজেই ফরাসি ভাষায় জ্ঞান ছিল যে আমার সামান্যই এ কি আর বলতে হবে? তবু একথা বললে

সত্যের অপলাপ হবে না যে, ফরাসি ভাষায় আমি এক সময়ে বক্তৃতাও দিতে পারতাম। কিন্তু এ-পারারই বা দাম কতটুকু? এ-পারার ফলে আমার সবচেয়ে লাভ হল ১৯২২ সালে রোলাঁর সঙ্গে সামনা-সামনি কথাবার্তা চালাতে পারা ও সমস্ত বুঝতে পেরে তখনি তখনি টুকে রাখা। তবে এসব কথাই তীর্থংকরে লিখেছি ব'লে সে সবের পুনরাবৃত্তি করব না। আজ শুধু বলতে চাই রোলাঁর কাছে কী শিখেছিলাম যা আমার জীবনে চিরদিনই অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু সে-কথা বলবার আগে একটু পেছিয়ে যেতেই হবে—একটু বলতেই হবে আমার জীবনের চিরকেলে দোলার কথা। সাধে কি সুভাষ আমার নামকরণ করেছিল "সদাদোদুল্যমান!"

আমার মনটাকে নিয়ে অনেক নেড়েচেড়ে দেখে আমার মনে হয়েছে যে আমার মধ্যে ভালো গুণ কয়েকটি থাকলেও একটি মহাদোষ এই যে আমি অব্যবস্থিত-চিত্ত। না না—অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ংকরঃ—বলতে যা বোঝায় সে অব্যবস্থিতচিত্ত নয়। আমি বলতে চাইছি—আমি যে-কোনো বিষয়ে মন স্থির করতে বেগ পেতাম। বিলেতে সুভাষ এ নিয়ে আমাকে তাড়া দিত মাঝে মাঝেই "আজ এই কাল আর এক রূপ—তুমি কি বহুরূপী নাকি হে?" আমি করুণভাবে মাথা নেড়ে ছড়া কাটতাম:

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিতবেদন বুঝিতে পারে?
কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে!"

এ নিছক ঠাট্টা নয়—এর নাম করুণ হাসি। আমার মনে হয় মীরার গান "ঘায়েলকী গতি ঘায়েল জানে ঔর ন জানে কোঈ"—অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ইংরাজি ইডিয়মে একে বলে: The wearer alone knows where the shoe pinches.

তাই সুভাষের কাছে ধমক খেলে মনকে সান্ত্বনা দিতাম এই ব'লে যে স্বভাব-ঐকান্তিকের দল আমার মতন মানুষের ব্যথার ব্যথী হতেই পারে না, বুঝতেই পারে না কেন এহেন মানুষ—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়: All sides he sees and turns to every call

(চারিদিকে দৃষ্টি তার—প্রতি ডাকে দিতে চায় সাড়া)
He has no certafn light by which to walk
(নাই ধ্রুবলোক তার গতিপথে দিতে সুনির্দেশ)

কিন্তু তবু আমি হয়ত ছিলাম এ-শ্রেণীর চঞ্চল মানুষের চরম প্রতিনিধি। কেন

না আজ যখন ভাবি তখন নিজেই অবাক হই আমার (সুভাষের ভাষায়) "বহুরূপী রূপে।" দেশে থাকতে লোকেন কাকার আই সি এসী দীপ্তি দেখে মনে হয়েছিল আই সি এস না হলে জীবনই বৃথা। তারপর কেমব্রিজে এসে সুভাষের চাকরি ছাড়ার দৃষ্টান্তে ধিক্কৃত আই সি এস পড়া দিলাম ছেড়ে। অতঃপর কেম্ব্রিজের কয়েকটি অধ্যাপকের সঙ্গে সংস্পর্শে আসতে না আসতে মন উঠল গান গেয়ে : "এই-ই তো চাই ভোলা মন! প্রফেসর হওয়াই সবার সেরা—বিদ্যার এলাকায় থাক্—জ্ঞানাৎ পরতরং নহি!" অমনি ঠিক করলাম ট্রাইপস দুটো পার্ট পর পর পাশ ক'রে হবই হব প্রফেসর—র‍্যাংলার হয়ে। ছাত্রদের শেখাব বোঝাব এরই নাম তো নেশন-বিল্‌ডিং—গুরু শিষ্যের মতন সম্বন্ধ আর আছে? কিন্তু হায় রে নিয়তির পরিহাস! তারপরই দেখা-ডাক্তার ডি এন মল্লিকের সঙ্গে। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আমাদের পড়াতেন ডাইনামিক্‌স, বললেন মুচকি হেসে "দিলীপ, অমন বোকামি কোরো না। ছেলে ঠেঙানোর মতন দুর্ভোগ আর নেই হে নেই, আর আজকাল তারাই ঠেঙায় প্রফেসরদের, বুঝলে? তুমি ব্যারিস্টার হও। বুদ্ধি আছে, টাকা আছে, মুরুব্বি আত্মীয় আছে, লোকেন পালিত, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, এস পি সিংহ, আশু চৌধুরী তোমার পিতৃবন্ধু—তোমার ভাবনা কি? কম্পিটিশন? ওহে কম্পিটিশন নেই কোথায়? আর এ জেনো যে, প্রতিযোগিতা যতই হোক না কেন প্রতিভাকে কেউ ঠেকাতে পারে না।"

আর যাবে কোথা? আমি মিডল টেম্পল-এ আড়াই শো পাউণ্ড জমা দিয়ে উকিলি ডিনার খাওয়া শুরু করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলাম কেম্ব্রিজে এল এল বি পড়তে : দিলীপকুমার রায় এম এ, এল এল বি ক্যাণ্টাব, বার এট্ ল আ—মরি মরি—কী চোখ-জুড়ানো সারসার উপাধি-ভূষণ রে—ঠিক যেন "শিরে শিখিচূড়া গলে বনমালা, অধরে মধুর বাঁশি।"

এমন সময়ে শ্রীশরৎ দত্ত গর্জে উঠলেন : "সুভাষকে ভালোবাসলে তার মতন হওয়া চাই—ঝাঁপ দিতে হবে burning your boats!"—যে কথা বলেছি ইতিপূর্বে মনে বাজল—ঠিকই তো—"যে না করে ভয়—তারি জয় জয়!" অকুতোভয়ে ঝোঁকের মাথায় ব্যারিস্টারি পড়াও দিলাম ছেড়ে পঞ্চাশ পাউণ্ড দণ্ড দিয়ে (২৫০ পাউণ্ড জমা দিয়েছিলাম বার-এ, ফিরে পেলাম ২০০ পাউণ্ড!) অতঃপর এক ইংরাজ বন্ধুর পরামর্শে ঠিক করলাম চার্টার্ড অ্যাকাউণ্টাণ্ট হওয়াই পন্থা। ফের ৫০০ পাউণ্ড জমা দেব দেব এমন সময়ে হবি তো হ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এসে হাজির লণ্ডনে! তিনি বিষম

তিরস্কার করলেন—(কী বললেন পরে বলছি)—অমনি "ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা।" কে জানত পিতৃদেব এ-হাসির গানটি লিখেছিলেন তাঁরই কুলতিলকের কথা ভেবে! কিন্তু এখন করি কি? সঙ্গীত? না, আর কিছু? ভাবছি এমন সময়ে লণ্ডনে দেখা হল মহাত্মা গান্ধির প্রিয়বন্ধু পোলাকের সঙ্গে। মুগ্ধ হলাম তাঁর দীপ্ত ব্যক্তিরূপে তথা আদর্শবাদে। তিনি একদিন বক্তৃতা দিলেন গান্ধিজির সম্বন্ধে: সাউথ আফ্রিকায় দীন দরিদ্র শ্রমিকদের জন্যে তাঁর প্রাণপাত ক'রে আন্দোলন, মার খাওয়া, জেলে যাওয়া—কী নয়? আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম, তাঁকে বললাম শ্রমিকদের হয়ে আমিও লড়ব। "দীন দুঃখীর সেবা এই ই তো চাই"—বললেন পোলাক। সে সময়ে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু লণ্ডনে, তিনিও উৎসাহ দিয়ে চিঠি দিলেন পার্সী লেবর লীডার ওয়ডিয়া সাহেবের কাছে। জ্বলন্ত উৎসাহ নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম উপদেশ নিতে—কীভাবে শ্রমিকদের সেবা করা যায়। কিন্তু হায় রে, অভাগা যেখানে যায় সমুদ্র শুকায়ে যায়। তাঁর হাসিহীন মুখ ও রসহীন কণ্ঠস্বর আমার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি মারল—লেবর লীডরের এই পরিণতি! বাপরে! 'লেবর' আমার মাথায় থাক আমি 'নেবর' চাই আর কাউকে। অবেশেষ এক ফার্মারের সঙ্গে দেখা—প্রকাণ্ড ফার্মে। দেখে খুব ভালো লাগল—খোলা হাওয়া—উদার আলো—মাঠ বন বীথিকা এই-ই তো চাই প্রকৃতির সহবাস। ঠিক করলাম কেম্ব্রিজে ডিগ্রি নেব ইণ্টেন্সিভ-এগ্রিকালচারের। কিন্তু এক রবীন্দ্র-ভক্ত আমাকে ধম্‌কে মনে করিয়ে দিলেন "ঘরে বাইরে"তে নিখিলেশের কৃষি উৎসাহের কথা—সঙ্গে সঙ্গে মনে প'ড়ে গেল "জীবনস্মৃতি"তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আদর্শের টানে নানা ব্যবসা ফেঁদে ফতুর হওয়া। মন ফের দোলায়মান—কী করি কী করি? শেষে ঠিক করলাম বটে সঙ্গীত নেওয়াই পন্থা—কেবল মন খুঁত খুঁত করে: সঙ্গীত তো শখের জিনিস—আমাদের দীন দরিদ্র দেশে এ-রঙিন বিলাস কেন? সুভাষ চলল দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে—আর আমি কিনা শৌখিন গাইয়ে হয়েই জীবন কাটাব! ভাবতে ভাবতে কেমন যেন নিরাশা এসে গেল। মনে হল আমার মতন অস্থিরমতির পক্ষে কোন কিছুতেই লেগে থাকা সম্ভব হবে না—সুতরাং আমার সিদ্ধি নৈব নৈব চ—"মতি স্থির নাই যার—তারে কে দিশা দেখাতে হায় পারে?" জীবনের অনৈশ্চিত্যের এই ঘনায়মান অন্ধকারেই আমার দেখা রোলাঁর সঙ্গে—তিনিই প্রথম আমার অস্থির বিবেককে শান্ত করেন বুঝিয়ে যে গানের আদর্শ শৌখিন আদর্শ নয়—সঙ্গীতের আলো মানুষের বস্তুতান্ত্রিক জীবনে সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক—পরমানন্দের অভ্রান্ত দিশারি।

কুড়ি

রোলাঁ সম্বন্ধে আমি লিখেছি আমার তীর্থঙ্কর-এ ও অ্যামং দি গ্রেট-এ। তাঁর দৃঢ় অথচ সুকুমার ব্যক্তিরূপ আমার মনের 'পরে গভীর ছাপ ফেলেছিল। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "জাঁ ক্রিস্তফ" প'ড়েই আমি তাঁকে দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠি। পরে ফরাসি ভাষায় তাঁর Musiciens b'Aujourd'hui, Musicieus d'Autretois.

বীটোভন্ ও টলস্টয়ের জীবনী প'ড়ে এ-ঔৎসুক্য আরো গভীর হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে বড় লাভ—তাঁর ব্যক্তি-রূপের সংস্পর্শলব্ধ সাঙ্গীতিক প্রেরণা। বলতে কি, আমাদের সঙ্গীত আমাকে আশৈশব মুগ্ধ করলেও আমি রোলাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে না এলে হয়ত আমাদের সঙ্গীতের মহত্ত্ব সম্বন্ধে এত শীঘ্র পূর্ণ সচেতন হয় উঠতে পারতাম না। বলে না—বিদেশে যে না গেছে সে স্বদেশকে চেনে না? গ্যেটে আরো বলতেন যে, বিদেশী ভাষা না শিখলে কেউ কখনো তার মাতৃভাষার মহিমা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না। সঙ্গীতের দিক দিয়েও একথা খাটে, অর্থাৎ য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় হবার পরে তবে আরো বুঝতে পারা যায় কোথায় ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। স্মৃতিচারণে সাঙ্গীতিক গবেষণা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে ব'লে আমি এ-সম্পর্কে আজ এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হব যে, রোলাঁর আন্তরিক তারিফ পেয়ে আমার সাঙ্গীতিক চেতনার মধ্যে যেন একটা অভিনব স্পন্দন জেগেছিল। আমি কোনদিনো ভুলব না তাঁর প্রশস্তি আমার গাওয়া মালকোষ রাগ সম্বন্ধে। তাঁর উচ্ছ্বাসটি ছিল এত গভীর যে এ-প্রসঙ্গে কিছু বলা অবান্তর হবে না।

ফরাসীরা "জুর্নাল" অর্থাৎ দিনপঞ্জিকা লিখতে বড় ভালবাসে। তাতে দিনের পর দিন লিখে রাখে কার সঙ্গে কবে কোথায় দেখা হয়ে কী কথা হ'ল। যথা গঁকুর ভ্রাতৃযুগলের জুর্নাল, আমিয়েলের জুর্নাল, জুল রেনার-এর জুর্নাল—আরো কত আছে। রোলাঁ আমাকে বলেছিলেন তিনি নিয়মিত দিনপঞ্জিকা লিখে রাখছেন—প্রকাশ হবে তাঁর দেহান্তের পরে।

মাদাম রোলাঁ স্বামীর মরণোত্তর আশা পূর্ণ করেছেন—১৯৫১ সালে তাঁর আটাশ বৎসর ধরে লেখা দিনপঞ্জিকা ছাপিয়ে। এ-বৃহৎ ডায়েরিটি পড়তে পড়তে বিস্মিত হ'তে হয়: রোলাঁকে কত কষ্টই না করতে হয়েছিল এত শত খুঁটিনাটি লিখে রাখতে! জগতের কোথা থেকে কোথা থেকে না দর্শনার্থী আসত তাঁর সঙ্গে

আলাপ করতে! তিনি যেন সুইজর্লণ্ডের একটি আকাশমিনারে আসীন হয়ে পাখির মতনই বিশ্বলীলার খবর নিতেন রকমারি মানুষের মাধ্যমে। এতে কে কবে কার সম্বন্ধে কী বলেছিল সব খুঁটিয়ে বর্ণনা করেছেন তিনি! দিনের পর দিন রাতের পর রাত লিপিবদ্ধ ক'রে চলেছেন কার কি রকম চেহারা, কি রকম কথা বলার ভঙ্গি, কাকে দেখে মনে হয়েছিল দাম্ভিক, কাকে মূর্খ, কে কার সম্বন্ধে কী অকথা কুকথা বলেছিল—সবই তিনি তেম্নি সযত্নে টুকে রেখেছেন যেমন সযত্নে শিষ্য টুকে রাখে গুরুর কথামৃত। সময়ে সময়ে মনে হয় ফরাসি মনীষীদের মন বোধ হয় বিধাতা গড়েছিলেন তুচ্ছতা-বিলাস অধ্যবসায় প্রভাবে কী কীর্তি করতে পারে তার একটা আশ্চর্য দৃষ্টান্ত জুগিয়ে জগৎজনকে থ ক'রে দিতে। এ যেন খানিকটা আহরণকারীর (collector-এর) মনোভাব—যে বাছবিচার করে না কী আহরণ করছে—আহরণের আনন্দেই আত্মহারা, কৃতকৃতার্থ! ফরাসী দেশে লাইবেল নেই ব'লেই বোধ হয় ফরাসী মন এভাবে গ'ড়ে উঠতে পেরেছে।

কিন্তু সাময়িক বিলাস ক্ষণায়ু হলেও কিছুদিন রসের জোগান দিতে পারে—সাময়িক রস তাজা থাকলে স্বাদু হতে পারে কে না জানে? তাই দিনপঞ্জিকাটি পড়তে মোটের উপর ভালোই লাগে। এতে আমার সম্বন্ধেও নানা মন্তব্য করেছেন তিনি—আমার নিন্দাও করেছেন বৈকি, যদিও প্রশংসাই আছে বেশি—ভাগ্যবশে। কিন্তু যা বলছিলাম।

আমি একদিন মালকোষে একটি গান গেয়েছিলাম তাঁর কাছে: "রাঙা কমল রাঙা করে রাঙা কমল রাঙা পায়"···এর সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য লিখেছেন ১৮৭ পৃষ্ঠায়—

"11 nous chante deux poe´mes. de son invention, qui ont du charme. Puis, un admirable chant ancien a´ Kali, qui remonte au XIe sie´cle, ou au dela´, et qui est saisissant ; un deroulement de passion, qui supplie, se lamente, s'irrite, retombe, du soprano aux notes basses, qui semble dix fois finir, et toujours avec un redoublement d'extase exigeante." এর ভাবানুবাদ :—

"দিলীপকুমার আমাকে দুটি সুন্দর গান শোনালেন—শুনলে অভিভূত হ'তে হয় বৈকি। গানটির সুরবিহার থেকে ঝ'রে পড়ছে উন্মাদনা, মিনতি, করুণা—মনকে চম্‌কে দেয়। কখনো কণ্ঠ তার সপ্তক থেকে অবতরণ করে মন্দ্র সপ্তকে তার

পরেই আবার ফিরে আরোহণ করে পুলকোচ্ছ্বাসের স্তরে।" কুড়ি পৃষ্ঠায় লিখছেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে (২০শে এপ্রিল ১৯২১) :

11 nous chante deux de ses me'lodies···Elles sont tre's nettement dessin'ees et ryhthme'es, assez proche de nos melodies europeennes, pas tre's interessantes en somme, mais facile a` retenir et a` transmettre d'une fac,on populaire. (Je croirais volontiers que Tagore est peu originale en musique, et que la vraie musique "orthodoxe" de I'Inde—telle que Dilip Kumar Roy me l' a fait connaitre I' an dernier a beaucoup plus grande valeur.) এর অনুবাদ :—

"তিনি তাঁর দুটি গান গেয়ে আমাদের শোনালেন। সুর দুটি অতি পরিষ্কার-ভাবে গ্রথিত ও ছন্দিত, আমাদের য়ুরোপীয় সুরের আমেজ আসে—বিশেষ চিত্তাকর্ষক নয়, কিন্তু মনে রাখা বা লোকপ্রিয় ভঙ্গিতে গাওয়া সহজ। (আমার মনে হয় বৈকি যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত তেমন মৌলিক নয়, এও মনে হয় যে, ভারতের 'নিজস্ব' সঙ্গীত—যা গত বৎসরে দিলীপকুমার আমাদের শুনিয়েছিলেন—তার সাঙ্গীতিক মূল্য অনেক বেশি।")

ভারতীয় রাগসঙ্গীতের মহিমা সম্পর্কে তিনি আরো অনেক কথাই আমার কাছে বলেছিলেন। একটি বিষয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোনদিনই একমত হতে পারি নি—যে জন্যে অনেকেই আমার 'পরে রাগ করেছেন—যে, আমাদের গানের কাঠামোকে য়ুরোপীয় গানের মতন অনড়, অচল ক'রলে আমাদের সাঙ্গীতিক শ্রীবৃদ্ধি হবে। আমি বরাবরই এই মত পোষণ ক'রে এসেছি যে, আমাদের গানে সুরকে নিয়ে খেলানোর অবকাশ না থাকলে (যার আমি নাম দিয়েছি সুরবিহার —ইম্‌প্রোভিসেশন) তার বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবেই যাবে। এও আমি কবিকে বলতাম যে, সুরবিহারহীন গান শুনে য়ুরোপীয়রা বলবেনই বলবেন : "এ আর নতুন কী ? এ তো আমাদের গানেও আছে—অনড় অচল মেলডির কাঠামো। তোমাদের গানে নতুন কী আছে তাই জানতে চাই।" দ্রষ্টব্য—রোলাঁ রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে ঠিক এই মন্তব্যই দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আমার সঙ্গে তিনি এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সায় দিয়েছিলেন—(তীর্থংকর ২২পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) যে, সুরবিহারের অবকাশ না থাকলে আমাদের সঙ্গীতের একটি প্রধান গৌরবই লুপ্ত হবে। এছাড়া তিনি তাঁর

নানা আলাপে তথা পত্রে খুব জোরালো সুরেই আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন যে, য়ুরোপে আমাদের সঙ্গীতের আদর হবেই হবে—কেবল ছড়িয়ে দেওয়ার অপেক্ষা। আমাদের সঙ্গীতের নানা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি নিপুণ ভঙ্গিতে যে-সব ব্যাখ্যা করতেন, তা থেকে আমি সত্যিই আমাদের সঙ্গীতের অনুপম মহিমাকে যেন নতুন চোখে দেখতে শিখেছিলাম। কিন্তু সে-বিবরণ আমার তীর্থংকরে লেখা হয়েছে ব'লে আমি আজ শুধু বলব তাঁর কাছ থেকে আমি ঠিক কী লাভ করেছিলাম।

সবাই জানেন যে, রোলাঁ আকৈশোর আর্টকে ভালবেসেছিলেন ফরাসীদের মতনই মনে-প্রাণে। এ সম্বন্ধে তাঁর তরুণ মনের জল্পনা-কল্পনা তিনি টলস্টয়কে লিখেছিলেন একটি সুদীর্ঘ পত্রে ; উত্তরে টলস্টয় তাঁকে একটি স্নেহপূর্ণ পত্র লিখে-ছিলেন—যে কথা আমি তীর্থংকরে লিখেছি ! রোলাঁ আমাকে টলস্টয়ের নিজের হাতে লেখা লিপিটি দেখিয়েছিলেন একাধিকবার। অতঃপর এ-সম্পর্কে তিনি নিজে আমাকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েই থামব। উদ্ধৃতিটি তীর্থংকরে দেওয়া সত্ত্বেও ফের উদ্ধৃত করতে যাচ্ছি, কেননা এ লাইন ক'টির মধ্য দিয়ে বড় চমৎকার ফুটে উঠেছে তাঁর একটি গভীর আন্তর অনুভূতি। এ অনুভবের এজাহার আজকের দিনের মানুষের কাছে কম নয়—আরো এই জন্যে যে এ-যুগের মানুষ সচরাচর মানস যুক্তিতর্ককে প্রায় দেবতার বেদীতে বসিয়ে প্রণামী দেওয়াকে মনে ক'রে থাকে পরমপুরুষার্থ। যুক্তির ব্যবহারিক মূল্য কেউই অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতেই হবে যে, যুক্তি আমাদের পথচলায় আলো দেখায় খানিকদূর পর্যন্ত, তার পরে গভীরতর পথের দিশারি যে হতে পারে তার নাম মানস যুক্তির সতর্কতা নয়—আন্তর অনুভবের এজাহার। তাই রোলাঁর প্রাণোপলব্ধ এই সত্যটি আমার হৃদয়ের তারে এক অপূর্ব অনুরণন তুলেছিল যার স্মৃতি আমি আজো ভুলতে পারি নি। রোলাঁ আমাকে লিখেছিলেন (তীর্থংকরে পুরো চিঠিটি প্রথমেই ছাপা হয়েছে) :

"খাঁটি শিল্পীর জীবন আত্মাভিমানী সুখের সাধনা এমন কথা আমার কোনো-দিনই মনে হয় নি। আমি যে জানি—য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সবাই বেদনাসম্ভূত—hommes de douleur…………টলস্টয় আমাকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তাতে বলেছিলেন যে, খাঁটি শিল্পীর সঙ্গে মেকি শিল্পীর তফাৎ এইখানেই—'Qu'ils doivent sacrifier à leur foi, à leur art leur bonheur(terrestre' অর্থাৎ শিল্পীরা যেন তাদের বিশ্বাসের জন্যে, তাদের শিল্পের জন্যে ছাড়তে পারে তাদের ঐহিক

সুখশান্তি।" বীটোভনের একটি উক্তি তিনি উদ্ধৃত করেছেন: "Musik ist hoehere offenbarung als alle weisheit und philosophie"

অর্থাৎ সঙ্গীত সব প্রজ্ঞা ও দর্শনের চেয়ে বেশি পারে সত্যের দীপ্ত প্রকাশ সাধন করতে। জর্মনরা এ-উক্তিটি প্রায়ই উদ্ধৃত ক'রে থাকে।

কথাটা কিছু নতুন নয়, কিন্তু যে মানুষ কোনো সত্যকে তার সমস্ত জীবন দিয়ে বরণ করেছে, তার মুখে সে-সত্যের অঙ্গীকার মানায়ও বেশি, অপরের জীবনে সক্রিয় হয়ও বেশি। এইজন্যেই রোলাঁ যখন সঙ্গীতের মহিমা সম্বন্ধে উজিয়ে উঠতেন, তখন আমার তরুণ অন্তরও সে-উচ্ছ্বাসের রঙে রঙিয়ে উঠত। সঙ্গীতকে তিনি সর্বান্তঃকরণে ভালোবেসেছিলেন ব'লেই আমি আজো ভুলতে পারি নি তাঁর প্রেমের উৎসাহ: "সঙ্গীতে সৃষ্টি করবার যে-সহজ শক্তি নিয়ে তুমি জন্মেছ তাকে স্ফুরিত হতে দেবার মহাগৌরবকে যেন তুমি প্রত্যাখান না করো।" তাঁর সঙ্গীত-প্রশস্তির প্রতি প্রস্বনেই ঝরত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উজ্জ্বল আদর্শবাদ। তাই আমার মনে হয় যে, যখন আমি সঙ্গীতব্রত গ্রহণ ক'রেও ফের সংশয়ের ফেরে পড়েছিলাম, তখন তাঁর স্নেহোৎসাহ না পেলে হয়ত শেষ পর্যন্ত সঙ্গীতকেই বরণ ক'রে খালি হাতে দেশে ফিরতে পারতাম না।

কিন্তু না—রোলাঁর তর্পণ পূর্ণ করতে হ'লে আরো একটু বলতে হবে—কারণ তাঁর কাছে আমার ঋণ শুধু সঙ্গীতেই নয়, জীবন সম্বন্ধে তাঁর গভীর আদর্শবাদও আমাকে কম অনুপ্রাণিত করে নি। তাঁর বিশ্ববিশ্রুত উপন্যাস জঁ। ক্রিস্তফ-এ "Tout est bien qui exalte la vie.,"* "son but n'était pas le succès: son but c'était la foi" † কিম্বা "pour comprendre les autres il ne faut que les aimer"‡

আমি যতবারই পড়েছি প্রাণ আমার দুলে উঠেছে।

তাঁর লেখা নানা শিল্পীর জীবনচরিত থেকেও আমি কম লাভ করি নি। কেবল সত্যের খাতিরে আমি সদুঃখে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মহিমা তিনি ঠিক ধরতে পারেন নি— কেননা তাঁদের তিনি নিজের মনের মতন করেই গ'ড়ে নিয়েছিলেন। ভারতীয় শুদ্ধসাত্ত্বিক তথা মরমিয়া সাধনার মর্মগ্রাহী হওয়া তাঁর ম'ত জন্ম-অশান্ত বুদ্ধিবাদীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি ছিলেন সর্বান্তঃকরণে য়ুরোপীয়—ইহলৌকিক শিল্পী, মস্ত শিল্পী—মানি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত দার্শনিক না,

* যাই কিছু জীবনকে মহনীয় করে তাই ক্ষেমঙ্কর। † সাফল্য নয়—বিশ্বাসই ছিল তার লক্ষ্য ‡ অপরকে বুঝতে হলে তাকে শুধু ভালোবাসতে হবে।

কবি না, যাঁর অন্তরে অতীন্দ্রিয় মিস্টিক অনুভূতি বাস্তবের মতনই কায়া পরিগ্রহ করত : এককথায় তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে প্রবৃত্তিমার্গী, তাই নিবৃত্তিকে মনে করতেন ভ্রান্তদর্শী।

জীবনের কর্মব্যূহে তিনি ঢুকতে জানতেন—বেরুতে নয়। তাঁর একটি বইয়ের শিরোনামা ছিল "আমি বিশ্রাম করব না"। বিরতি যে সাত্ত্বিকও হতে পারে, মুক্তি যে ভুক্তিরই উল্টোপিঠ এ-তত্ত্ব বুঝবার অধিকারী তিনি ছিলেন না, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মূল্যায়নে তিনি অক্ষম ছিলেন স্বভাবের গোড়াকার গড়নে। রোলাঁ বড়-জোর একটু আভাস পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের কর্মী ও বাণীবাহ (মিশনরি) রূপের—কিন্তু সাত্ত্বিক ত্যাগী ও বৈরাগী দার্শনিক রূপের কোন হদিশই পায় নি রোলাঁর রাজসিক মনের চঞ্চল দৃষ্টি।

কিন্তু তাঁর কাছে যা পাই নি, তা দিয়ে তাঁর মহিমাকে মাপা চলে না, তাঁর কাছে কী পেয়েছি সেইটুকু দিয়েই তাঁকে বিচার করতে হবে—নইলে তাঁর প্রতি অবিচার হবে। আমি তবুও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর প্রশস্তির উল্লেখ করলাম শুধু একটি কারণে : আমরা এই দুই মহাপুরুষের সম্বন্ধে তাঁর নানা মতামত নিয়ে একটু বেশি অশোভন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে থাকি—খানিকটা যেন য়ুরোপীয় বুদ্ধিজীবীর সার্টিফিকেটের জোরে আমাদের তত্ত্বজ্ঞদের গৌরব বাড়াতে—কিম্বা যেমন আমরা ধর্মের সত্যাসত্য সম্বন্ধে সমর্থন চাই বিজ্ঞানের দিক্‌পালদের কাছ থেকে। এ-ভুল বুদ্ধিবাদীরা করেন করুন, কিন্তু যাঁরা অধ্যাত্মপথের পথিক তাঁদের যেন এই আত্মপ্রত্যয় কোনদিন ম্লান না হয় যে সংসারে সবচেয়ে বড় তত্ত্ব হ'ল ভাগবত তত্ত্ব, সুতরাং ভাগবত সাধক যেন বিজ্ঞান বা শিল্পসাধকের কাছে সুপারিশপত্রের জন্যে ভুলেও হাত না পাতেন। শিল্প সম্বন্ধে রায় দিন শিল্পী, বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিজ্ঞানী, সাহিত্য সম্বন্ধে সাহিত্যিক, অর্থনীতি সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রবিৎ—কেবল যোগী ও ধার্মিকের সম্বন্ধে রায় যেন দেন শুধু তাঁরাই যাঁরা যোগের ও ধর্মের মর্মজ্ঞ। এবার বলি বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কথা।

আমার য়ুরোপে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল এই মহামতিকে—যেমন ভারতে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল শ্রীঅরবিন্দকে। আমার রাসেল-ভক্তির দরুণ আমাকে অনেকেই ভুল বুঝেছিলেন—কেবল সি পি রামস্বামী বা সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মতন দু-একজন মনীষী ছাড়া। রামস্বামী আমার 'অ্যামং দি গ্রেট' প'ড়ে আমাকে এক উচ্ছ্বসিত পত্র লেখেন, তাতে এক জায়গায় লিখেছিলেন (অনুবাদ দিচ্ছি) :

"অনেকেই আপনাকে দূষতে পারেন আপনি আস্তিক গুরুর শিষ্য হয়ে নাস্তিক

রাসেলকে কেমন ক'রে এত ভক্তি করতে পারলেন বলে। কিন্তু আমি আপনার মনের এই আশ্চর্য ঔদার্যের জন্যেই আপনাকে বেশি ক'রে সাধুবাদ দিই।"

আমার পরের জীবনে আমার অনেক বন্ধুই আমাকে বিদ্রূপ করতেন—"নাস্তিককে ভালবেসে বুঝি দিলীপ দেবদ্রোহী হয়ে দাঁড়ায় বা"! কিন্তু আমি এ বিষয়ে ছিলাম একান্ত নিঃসংশয়—কেননা শ্রীঅরবিন্দকে যে মনে-প্রাণে গুরু বলে বরণ করেছে, সে যে রাসেলের নাস্তিক্যবাদের মোহে দ-য় মজতেই পারে না এ আমি নিশ্চয় ক'রে জানতাম। তবে বলাই বাহুল্য যে, ধর্মকে নিয়ে রাসেলের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীরন্দাজিতে আমার মর্মভেদ করা দূরে থাকুক, চর্মভেদও করে নি। তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নানা চিঠিতে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর গভীর ব্যাখ্যায়—কেন রাসেল ভাগবত সত্যের বিচারে পদে পদে ভ্রম-প্রমাদে পড়েছেন—অর্থাৎ এ বিষয়ে অপরোক্ষ অনুভব উপলব্ধি না থাকার দরুণ। সমাজ, রাষ্ট্র, ঐহিক শিক্ষা রাজনীতি, যুক্তিবাদ প্রভৃতি নানা রাজ্যেই রাসেলের নির্দেশে আমার মন সায় দিয়ে এসেছে পুরোপুরি। তাঁর বুদ্ধির আশ্চর্য দীপ্তিতে আমি অভিভূত হয়েছি বারবারই। কিন্তু পরমতীর্থপথে তাঁকে দিশারি করব আমি কেমন করে শ্রীঅরবিন্দকে গুরুবরণ করার পরে?

কিন্তু তবু তাঁকে আমি সত্যিই ভালো-বেসেছিলাম তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের জন্যে। উপায় কি? উর্দুতে একটি শের (শ্লোক) আছে:

ইস্ক পর জোর নহীঁ বো আতিশ গালিব:
কে জলায়ে ন লগে ঔর বুঝায়ে না বুঝে।

অর্থাৎ

অতি বিচিত্র প্রেমের আগুন:
জ্বলে না যখন জ্বালানো দায়।
আবার: সে জ্ব'লে উঠিলে—দারুণ
সে-শিখা কে পারে নিভাতে হায়?

রাসেলের লেখা যেদিন কেম্ব্রিজে প্রথম পড়ি—Principles of Social Reconstruction—সেইদিন থেকেই তাঁকে ভালোবেসেছি, এবং তাঁর দুতিনটি দার্শনিক ও গাণিতিক বই ছাড়া সব বইই আদ্যন্ত পড়েছি তেম্‌নি সাগ্রহে যেমন সাগ্রহে পড়েছি আরো অনেক মনীষীর রচনা। হয়ত একথা সত্য যে, রাসেলকে এতটা ভালোবাসা আমার উচিত হয় নি, কারণ তিনি যে শুধু ধর্মজ্ঞ নন তাই নয়, ধর্মের

মহাধারকদের নিয়েও প্রগল্‌ভ হাসাহাসি করেছেন তাঁর অনেক লেখাতেই। একথাও সত্য যে তিনি বুদ্ধিদৃপ্ত ও অত্যন্ত রোখালো মানুষ; যে-আত্মসমাহিতি বিনা গভীরতম আধ্যাত্মিক সত্যের আভাসও পাওয়া যায় না, সে স্থিতপ্রজ্ঞতা তাঁর নেই, তিনিও তো রোলাঁর মতনই কর্মবাদী, প্রবৃত্তিমার্গী ও রাজসিক। এমন কি, এমন কথা বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে, রাসেল অন্য বুদ্ধিবাদীদের চেয়েও বুদ্ধির স্তাবক—তাই মেনেও মানতে চান না যে, বুদ্ধি গভীরতম সত্যের পরশ পেতেই পারে না। কিন্তু সব মেনেও গাইব ঐ একই সাফাই: যাকে ভালবেসে গভীর আনন্দ পেয়েছি, তাকে ইচ্ছে করলেই বলা যায় না—"বাড়ি যাও, তোমার সঙ্গে আড়ি।" এখানে আরো একটা কথা বলব: অনেকে ভাবেন রাসেলের বুদ্ধির একদেশদর্শিতা সম্বন্ধে আমি অন্ধ। তা হ'তেই পারে না। কারণ আশৈশব আমি বুদ্ধির রাজ্যেই বাস ক'রে এসেছি, যুক্তিকেই মানস অনুমোদনের খাজনা দিয়ে। কাজেই বুদ্ধির এলাকায় যদি যথার্থ তৃপ্তি পেতাম তবে তো আজো তাকেই সর্বেসর্বা ক'রে চলতাম আমার আর সব বুদ্ধিবাদী বন্ধুদের মতনই। চলিনি—সেইটেই কি সবচেয়ে বড় প্রমাণ নয় যে, আমি বুদ্ধিকে জীবনের অন্তিম দিশারি মনে করি না? করব কেমন ক'রে? বিশ্বাসের সঙ্গে যে বাল্যকালেই প্রাণের মালা বদল করেছি? বহু উদ্ধৃতিতে প্রবচনটির ধার ক্ষয়ে গেলেও পুনরুক্তি না ক'রে করি কী, যে, যে-মন্ত্রটিকে আমি জীবনের সবচেয়ে বড় মন্ত্র বলে সারাজীবনই মেনে এসেছি সেটি হ'ল "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।" বুদ্ধি ও বিজ্ঞান ঐহিকতার ভিৎ গাঁথে। এ ভিৎ পাকা ক'রেই গাঁথা দরকার—নৈলে দাঁড়াব কোথায়? মানি। কিন্তু তাই ব'লে কেমন ক'রে বলব যে, মাটিতে দাঁড়াতে পারাই পরম-পুরুষার্থ—আকাশে ওড়াটা বাহুল্য? গীতায় বলেছে—জীবনবৃক্ষের মূল ঊর্ধ্ব-লোকে ব'লে তার খবর দিতে পারে না পৃথ্বীচারী বুদ্ধি তর্ক যুক্তি, পারে শুধু নভোমার্গী বিশ্বাস ভক্তি ধ্যান। রাসেল এদেরই মানেন না—কাজেই তিনি যে কোনো অধ্যাত্মজিজ্ঞাসুর আন্তর দিশারি হ'তেই পারেন না এ বিষয়ে সন্দেহ কি? না, রাসেল আমার আত্মার আত্মীয় নন, যেমন আত্মীয় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দ। অথচ তবু সত্যকে অস্বীকার ক'রে মিথ্যাবাদী হবার আত্মগ্লানিকে অঙ্গীকার করব কেমন ক'রে—যখন সত্য এই যে, রাসেলের লেখা পড়লে আজো আমার মন দুলে ওঠে—তাঁর নানা গভীর চিন্তা ও গবেষণা আমার নিজের সত্যসন্ধানবৃত্তিকে উস্কে দেয়! বস্তুত তাঁর কাছে চিন্তার খোরাক অজস্র পেয়েছি এবং এখনো পাই ব'লেই আমি তাঁকে ভক্তি

না ক'রে পারি না। অনেকে বলেন, রাসেল বারবারই মত বদ্‌লেছেন, কাজেই চিন্তা-জগতের দিক্‌পালদের মধ্যে তাঁকে স্থান দেওয়া চলে না। একথা আমার শুধু যে অশ্রদ্ধেয় মনে হয় তাই নয়, আমার জীবনে আমি নিজেও বার বার জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে মত ও পথ বদ্‌লাতে বাধ্য হয়ে শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, মানুষ যথার্থ আন্তরিক হলে তার সত্যসন্ধানে পদে পদেই এক সত্যকে বিদায় দিয়ে তবেই গভীরতর সত্যের দিশা পায়। শ্রীঅরবিন্দের একটি উক্তি আমার অনস্বীকার্য বলেই মনে হয় যে, ভুলভ্রান্তির সিঁড়ি দিয়েই সত্যসাধক অভ্রান্তির ব্রহ্মলোকে পৌঁছয়। এইজন্যেই বুঝি আপ্তবাক্যে আছে মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। তাই রাসেল যে নানা সময়ে তাঁর নানা ধারণাকে ভুল ব'লে চিনতে পারা মাত্রই তাকে ভুল ব'লে স্বীকার করেছেন, এতে তাঁর প্রতি ভক্তি আমার বেড়েছে বৈ কমে নি।

কিন্তু তাই ব'লে মানতে পারি না যে, তাঁর ঐহিক সত্যনির্ধারণের গোড়াপত্তন কাঁচা ছিল। পদে পদেই আমরা বহু বহু আলোকবাণীই পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে—আজ পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে: তাঁর সত্যনিষ্ঠা, মানবপ্রেম, ঔদার্য, জ্ঞানোৎসাহ, শিল্পপ্রীতি, নির্লোভ মন……কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলব?

য়ুরোপের এ-যুগের মনীষীদের মতে নির্লোভের এমন বাণীবাহ বেশি দেখা যায় না—মনে প'ড়ে যায় উপনিষদের "মা গৃধঃ"। তাঁর আর একটি বাণী: "বোলো না স্বৈরাচারী একনায়কদের সু'রে যে, আমি যে-পথের পথিক তার পরিপন্থীর মুণ্ডপাত করবার আমার জন্মগত অধিকার আছে এই যুক্তিতে যে, আর সবাই ভ্রান্ত হতে পারে কেবল আমি অভ্রান্তিতে অচলপ্রতিষ্ঠ।" কিন্তু এ-ছাড়া আরো কত শুভনীতিরই না দীক্ষা নিয়েছেন তিনি তাঁর আজীবন সত্যসাধনায়—আত্ম-আবিষ্কারে: মানুষ সার্থক হয় সৃষ্টিশীল প্রবৃত্তিকে বরণ করলে, দুঃখ পায় হাতিয়ে নেবার প্রবৃত্তিকে আমল দিলে; আমাদের পরম লক্ষ্যের দিশা দেয় শুভ বুদ্ধি, শুভ বাসনা; যুক্তি শুধু দেখাতে পারে—সে-বাসনা চরিতার্থ হবে কোন পথে চললে; যতরকম দুষ্প্রবৃত্তি আমাদেরকে জান্তে বা অজান্তে ধ্বংসপথের যাত্রী করে তাদের মধ্যে সেরা দানব হ'ল নিষ্ঠুরতা হিংস্রতাই বটে; আমরা আজো সরল ও নিরভিমান হ'তে শিখি নি ব'লেই দেখেও দেখিনা যে ক্রূর মনোবৃত্তির কাঁটাবনে আমরা কী ভাবে পথ হারিয়ে বসেছি; মানুষের জীবনে সৌন্দর্যপ্রীতি, সরল আনন্দবিলাস, বিশ্বপরিচিতির ঔৎসুক্য ও মানবপ্রেম এই চারটি মূল মন্ত্রকে বরণ করলে তবেই জীবন সার্থক হয়;

শুভবুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান যে-প্রেমকে চালায় তাকে বিপাকে পড়তে হয় না—এইরকম আরো কত মহৎ নীতিরই না তিনি উদ্গাতা!

কিন্তু রাসেল বহুগুণে গুণবান্ হলেও আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করে তাঁর যে-গুণটি সে হ'ল তাঁর নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা। গভীরতম সত্য যে অন্তর্যামী ভগবান্, এ-মন্ত্রের দ্রষ্টা তিনি আজো হতে পারেন নি বটে, কিন্তু যাকে সত্য ব'লে চিনেছেন তাকেই মনের প্রাণের উপাস্য বলে অভিনন্দন করতে তিনি কখনো এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেন নি। মানি—সবার চেয়ে বড় জ্ঞান হ'ল ব্রহ্মজ্ঞান, সবার চেয়ে বড় প্রেম ভগবৎ প্রেম, সবার চেয়ে বড় সত্য ভগবৎ-কৃপা—পরাৎপরের এ-পরম বিশ্বতন্ত্রে তিনি কান দিতে পারেন নি অবোধ বুদ্ধির জল্পনায় দিশাহারা হওয়ার দরুনই। কিন্তু সমাজে যে-মানবিক পরার্থনিষ্ঠাকে, পরমত-সহিষ্ণুতাকে, সৎসাহসকে স্বাধীন চিন্তাকে—সর্বোপরি অনিষ্ঠুর সার্বভৌম মানবপ্রীতিকে তিনি চিরদিন সর্ববরেণ্য ব'লে অক্লান্ত উৎসাহে প্রচার ক'রে এসেছেন, তার জন্যে প্রতি বিশ্বমানবতাবাদী তথা অধ্যাত্মবাদীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতাই কি তাঁর প্রাপ্য নয়?

কিন্তু তাঁর আর একটি আশ্চর্য প্রতিভার জন্যেও তাঁকে আমি কম ভালোবাসিনি: তাঁর আশ্চর্য অফুরন্ত রসিকতা। মনে আছে রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে বলে-ছিলেন যে, রাসেলের মতন রসিক তিনি দুটি দেখেন নি। আমার নিজের মনে হয় যে, অবিমিশ্র রসিকতায় বার্নার্ড শ ও পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলাল রাসেলের চেয়ে কম ছিলেন না। কিন্তু এ-বিষয়ে রুচিভেদে নানা মানুষের মধ্যে মতভেদ হলেও একথা সবাই আজকের দিনে মানতে বাধ্য যে, রাসেলের রসিকতার উৎস বার্ধক্যের মরু-পথেও এতটুকু নিস্তেজ হয় নি—এমন কিছুই নেই যা নিয়ে দারুণ দুর্দিনেও তিনি হাসতে না পেরেছেন। গুরুগম্ভীর নীতিবাদীরা হাসিকে ছেবলামি নাম দিয়ে জাতে ঠেলতে পারেন—ঠেলেও থাকেন প্রায়ই—কিন্তু হাসতে না-পারাটা যে খতিয়ে চরিত্রের অবিকাশই সূচনা করে এ-সম্বন্ধে যথার্থ ভাবুকদের মধ্যে মতানৈক্য নেই। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একবার লিখেছিলেন, যখন আমি তাঁর সঙ্গে প্রগলভতা করার পরে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলাম: "Don't worry. For there is laughter in the Kingdom of Heaven though there may be no marriage there* এ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের একটি চমৎকার মন্তব্য আছে তাঁর একটি বইয়ে:

*বাইবেলের একটি বাণীকে বদলে শ্রীঅরবিন্দ এইভাবে লিখেছিলেন তাঁর অনন্যতন্ত্র ভঙ্গিতে—আমার Sri Aurobindo Come To me দ্রষ্টব্য

"Laughter was given by the Gods to man and it was one of their choicest gifts……He who cannot laugh, he whose devotions are too serious for the healing waves of laughter, had better look out: there are breakers ahead!"

অর্থাৎ দেবগণ মানুষকে হাসির বরদান দিয়েছেন—যার জুড়ি মেলা ভার। যে-মানুষ হাসতে ভুলে গিয়ে মেঘলা মুখে ব'সে থেকে কৃতকৃত্য হতে চায় তার অবস্থা সঙিন—ভরাডুবি হ'ল ব'লে।

তাই হাসিকে হেসে উড়িয়ে দেওয়ায় বিপদ সমূহ। কিন্তু স্থানাভাব—তাই রাসেলের সুহাস্যের দুটি মাত্র উদাহরণ দিয়েই মধুরেণ সমাপয়েৎ করব।

কিছুদিন আগে রাসেল লিখেছেন একটি অপূর্ব স্মৃতিচারণ তাঁর অতুলনীয় সরস ভঙ্গিতে। (এমন আশ্চর্য সরস ইংরাজী গদ্যই বা বার্নার্ড শ' ছাড়া আর কে লিখতে পেরেছে এ-যুগে?) বইটির নাম 'পোর্ট্রেটস্ ফ্রম মেমারি।' এতে একটি নিবন্ধ আছে—হোপ্‌স: রিয়েলাইজড্ এ্যাণ্ড ডিস-অ্যাপয়েণ্টেড। এতে রাসেল আশৈশব কোন্ কোন্ প্রভাবের আবহে গড়ে উঠেছিলেন তার চমৎকার বর্ণনা দিয়ে শেষে লিখেছেন—কোনো কোনো দিকে ইংলণ্ডে সভ্যতার প্রগতি হয়েছে বৈকি—যথা, মেয়েরা ভোট দেবার ক্ষমতা পেয়েছে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে জবাই না ক'রে সাম্যতান্ত্রিক মতবাদ খানিকটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শ্রমিকদের অবস্থার প্রচুর উন্নতি হয়েছে, মানুষের মৃত্যুর হার অনেক কমেছে—সব জড়িয়ে অন্তত ইংলণ্ডে মানুষ আজ আগেকার চেয়ে বেশি সুখী বৈকি। কিন্তু তার পরেই লিখছেন:

"হায় রে, বিশ্বসভ্যতার রঙ্গমঞ্চে দেখি একেবারে বিপরীত ছবি: রুশ জারদের যে একচ্ছত্র স্বৈরাচারে (ডেসপোটিসম্) প্রগতি-পন্থীদের আতঙ্ক হ'ত তার স্থলে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এক ঢের বেশি প্রবল ও নিষ্ঠুর স্বৈরাচার। অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য—যা আগে ছিল পশ্চাৎপন্থী—আজ দাঁড়িয়েছে মস্কোর হুকুমবরদার (অর্থাৎ পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি) চীন হয়ে উঠছে এক দারুণ হুহুঙ্কারী রণশক্তি। আমেরিকা—যা পঞ্চাশ বৎসর আগে ছিল লিবারালদের স্বর্গরাজ্য—আজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে উল্টো—যদিও হয়ত শেষ পর্যন্ত আমেরিকা সামলে নিতেও পারে। সর্বোপরি, দিনদুনিয়ার উপরে গর্জন করছে আণবিক যুদ্ধের মহাভয়।"

এ-হেন পরিস্থিতিতে—লিখছেন তিনি—তাঁর মনোগহনে দুটি স্বর নিরন্তরই

কলহ করে: একটি হ'ল লেখকের আশাশীল মন যে বলে—রাষ্ট্রসমস্যা নিয়ে প্রাণপণ লেখার প্রয়োজন আছে—সবাইকে সহিষ্ণু ভঙ্গিতে বোঝানো দরকার, যুক্তি দিয়ে দেখানো দরকার—কোন্ পথে মানুষের মুক্তি, কোন পথে ধ্বংস। আর একটি হ'ল নিরাশার অবিশ্বাসের ব্যঙ্গহাস্য রাসেল যার নামকরণ করেছেন—ডেভিল্স্ অ্যাডভোকেট—শয়তানের উকিল: সে বলে সর্বনেশে বিদ্রূপের সুরে (৪৯ পৃষ্ঠা):

"হে রাসেল, তুমি দেখতে পাচ্ছ না কি যে, জগতে যা যা ঘটছে কিছুই তোমার তোয়াক্কা রাখছে না? বিশ্বমানব আজ বাঁচবে না মরবে নির্ভর করছে ক্রুশেভ, মাওৎসেটুং ও মিস্টার জন ফস্টার ডালেসের খুশখেয়ালের উপর। এঁরা যদি বলেন মরো, আমরা মরব, যদি বলেন বাঁচো আমরা বাঁচব। এঁরা কেউই তোমার বই পড়েন না—আর পড়লেও বলবেন তুমি অর্বাচীন। হয়েছে কি, তুমি পেছিয়ে পড়েছ ঠাকুর, তাই এখনো মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে মিথ্যে মাথা বকাচ্ছ।"

লিখে শেষ রাসেল মন্তব্য করছেন: "হয়ত শয়তানের উকিল বলেছেন ঠিকই, কিম্বা হয়ত ভুল। হয়ত স্বৈরাচারী হাকিমেরা (ডিক্টেটার) দেখতে যত দুর্দান্ত আসলে তত নন। হয়ত খতিয়ে লোকমতে তাঁরা টলতেও পারেন—অন্তত খানিকটা। হয়ত বইটই লেখা লোকমত গ'ড়ে তোলার সহায়তা করতেও পারে—কে বলতে পারে? এইসব ভেবে-চিন্তে আমি এখনো সমানে বই লিখে চলেছি নিরুৎসাহী দুঃখবাদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ সত্ত্বেও, যদিও এতে ক'রে কোন সত্যিকার সুফল ফলছে কি না বলতে পারি না।"

মানুষ অনেক কিছুই পারে, কিন্তু অপরের দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝতে পারে না সহজে। রাসেল এই পারার বড় পক্ষপাতী। এই কারণেই তিনি এত বেশি সংশয়ের ওকালতি করেন। বলেন যে, আমরা যদি সংসারের নানা বিষয়ে একটু কম নিশ্চিত হ'তাম তবে জগতে অনেক গাজোয়ারি নিষ্ঠুরতা লোপ পেত। খাঁটি ধার্মিকদের সম্বন্ধে একথা সত্য না হলেও (কেন না খাঁটি ধার্মিকরা কখনো অপরের উপর চড়াও হন না—মন্ত্রগুপ্তি বিশ্বাস ক'রে যথাসম্ভব নিরালায় আত্মশোধনের পথেই চ'লে থাকেন)। সংসারের সাড়ে পনের আনা রাজনৈতিক দলপতি তথা নিষ্করুণ একনায়কদের সম্বন্ধেই একথা খাটে না কি সাড়ে ষোলো আনা? আমার মন বলে—খাটে। তাই রাসেলের এ-দীক্ষাও আমি সাদরেই বরণ ক'রে নিয়েছি।

কিন্তু সবার উপরে—আবার বলি—তাঁকে আমি বহুবারই প্রণাম করেছি

তাঁর অলোক-সামান্য সত্যব্রত ও শুভৈষী চরিত্রের জন্যে। এমন সত্যাশ্রয়ী ভাবুক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পথিকৃৎ এ মিথ্যামুখর বিপথগামী যুগে খুব কমই দেখা যায়—বিশেষ ক'রে চিন্তাশীল প্রতিভাধরদের মধ্যে। সত্যপরতা সম্বন্ধে তাঁর একটি ভারি মজার রসিকতা উদ্ধৃত করেই রাসেল-পর্বের সমাপ্তি টানব।

রাসেলের এক বন্ধু ছিলেন জি ঈ মূর। রাসেল তাঁকে এক সময়ে সমীহ করতেন শুধু প্রতিভাধর বলে নয়, পরম সত্যনিষ্ঠ ব'লে। এঁর সম্বন্ধে রাসেল লিখছেন (৬৮ পৃঃ):

" 'মূর-এর ছিল এক অনুপম পবিত্রতা। আমি মাত্র একটিবার তাকে দিয়ে মিথ্যা বলিয়েছিলাম—তাও ফন্দি এঁটে। হল কি, একদিন আমি তাঁকে এমনিই জিজ্ঞাসা করে বসলাম: 'মূর! তুমি কি সর্বদাই সত্য কথা ব'লে থাকো?' সে জবাব দিল: 'না।' আমার ধ্রুব বিশ্বাস—মূর সারাজীবনে কেবল এই একটিমাত্র মিথ্যা কথা বলেছে।"

স্মৃতিচারণে হয়ত অ-স্মৃতির কথা কিছু এসে গেল। কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল—আরো এই জন্য যে, রাসেলকে কেন ভালবেসেছি, সেকথা খানিকটা ফলিয়ে না বললে আমার রাসেল-ভক্তির পাশাপাশি গুরুভক্তির চিত্রটি ঠিক ফুটত না—আমার মতে।

একুশ

সুভাষের ইংলণ্ডে একটিমাত্র ইংরাজ বন্ধু লাভ হয়েছিল খানিকটা আমার জন্যেই। মানে তাকে আমি একরকম জোর ক'রেই নিয়ে যাই "লী-অন্-সী" ব'লে একটি মনোরম সমুদ্রতীরে। লণ্ডনের কাছে একটি বন্দর আছে সাউথ-এণ্ড—উচ্চারণ সাদেণ্ড—লী-অন-সী থেকে মাইলখানেক হবে। সেখানে হার্টফোর্ড ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিস্টার বেট্‌স্ একটি অতি মনোরম নিলয়ে বাস করতেন—স্ত্রী দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে। তাঁকে আমার কী যে ভালো লেগে গেল—কী বলব। দেশে ইঙ্গভারতীয়দের দুঃশীলতা দেখে দেখে সময়ে সময়ে আমার সত্যিই মনে হ'ত যে, বিদেশীর সঙ্গে লেন-দেনে ওরা বুঝি সদাসচেষ্ট থাকে উন্নাসিক হবার—যাকে বলে স্নব্। তাই মিঃ বেট্‌স্‌কে দেখে মন যেন আরো বেশি উজিয়ে উঠল। এর আগে আই-সি-এস আণ্ডার্সন সাহেবের সঙ্গে কেম্ব্রিজে আলাপ হয়েছিল—কিন্তু তাঁকে

আমার ভালো লাগলেও তিনি ইংরাজদের জন্মগত শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে প্রায়ই চাল মারতেন ব'লে সুভাষ মাঝে মাঝেই আমাকে ধমকাত: "কেন যাও ওঁর অ্যাট হোম-এ? জানো না উনি ছিলেন আমাদের দেশে আই-সি-এস দের বড়কর্তা? এঁরা কি কখনো আমাদের সত্যি সম্মান করতে পারেন মনে করো? না দিলীপ, যতদিন আমরা স্বাধীন না হব, ইংরাজরা আমাদের মধ্যে ভালো কিছুই দেখতে পাবে না।" একথা পরে শ্রীঅরবিন্দের মুখে শুনি আরো গভীর ভাষায়: ভারতের স্বাধীন হওয়া আরো দরকার এইজন্যে যে, আমরা স্বাধীন না হলে ভারতের আত্মার বাণীকে এরা হেসে উড়িয়ে দেবেই দেবে—দাসজাতির আবার আত্মা কী—এই ব'লে। কথাটা কিছু নতুন নয়—পিতৃদেবের মুখেও তো শুনেছিলাম বাল্যকালেই। রবীন্দ্রনাথেরও কোন্ একটি প্রবন্ধে পড়েছিলাম এই ধরনের কথা। তাছাড়া সে-সময়ে আমাদের দেশে অসহযোগ জ্বলে উঠেছে—আরো জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর—যার জন্যে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজদের তিরস্কার ক'রে তাঁর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। ফলে কেম্ব্রিজেও দেখতাম—ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরাজ ছাত্ররা বড় একটা মিশতে চাইত না। সুভাষ বলত কথায় কথায়: "যতদিন না আমরা স্বাধীন হব দিলীপ, ততদিন এরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে সমান সমানভাবে মিশবে না—আর যতদিন ওরা পিঠ চাপড়ে মিশবে—আওয়ার্সনের মতন—ততদিন আমিও ওদের ছায়া মাড়াচ্ছি না।"

কাজেই মন আমার একেবারেই প্রস্তুত ছিল না মিঃ বেট্সের মতন পদস্থ ইংরাজের সদাচরণের জন্যে। কিন্তু শুধু সদাচরণই নয়—তিনি যেন নিরন্তরই সজাগভাবে চাইতেন তাঁর দেশবাসীদের দুরাচরণের প্রায়শ্চিত্ত করতে। তাই ছুটিতে ভারতীয় ছাত্রদের প্রায়ই তার ওখানে ডাকতেন। প্রথমবার আমি অতিথি হই "পেইং গেস্ট" হয়ে, দ্বিতীয়বার—সম্মানিত অতিথি। তৃতীয়বার মনোরম শহর সেভেন-ওক্স্ এ তাঁর অতিথি হই—১৯২৭ সালে যখন দ্বিতীয়বার বিলেত যাই।

মহোল্লাসে সুভাষকে ধ'রে নিয়ে গেলাম। তাঁকে দেখে যেমন সুভাষও মুগ্ধ—তিনিও তেমনি সুভাষকে দেখে উচ্ছ্বসিত। বলতেন আমাকে প্রায়ই যে, এ-মেকির হট্টযুগে এমন খাঁটি মাল যেন স্বচক্ষে দেখলেও বিশ্বাস হতে চায় না—মন অবাক্ হয় যে, এমন নিখাদ সোনার দেখাও মিলতে পারে এ-গিল্টির যুগে।

মিঃ বেট্স্কে আমি কোনোদিন ভুলব না আরো এইজন্যে যে, তিনি আমাদের কাছে এসেছিলেন যেমন গ্রীষ্মের তপ্তমাটির কাছে আসে প্রথম বর্ষার ধারা।

বিলেতের ইংরাজ ছাত্রদের উদ্ধত ভারত-বিমুখতায় আমাদের সকলেরি মন উঠেছিল বিষিয়ে। কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড য়ুনিয়নে প্রায়ই বক্তৃতা হ'ত—ভারতবাসী স্বরাজ্যের যোগ্য নয়, ইংরাজরাই তাদের হাতে ধ'রে শেখাচ্ছে সভ্যতা কাকে বলে…ইত্যাদি। আমি যদিও সুভাষের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হ'তে পারিনি যে, ইংরাজদের সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রের না মেশাই ভালো, কিন্তু মিশতে চাইলেই কি মেশা যায়? ওরা আমাদের মনে মনে দুষছে আমরা অকৃতজ্ঞ বলে, আমরাও ওদের শাপ দিচ্ছি ভারতের রক্তশোষক ব'লে—এ-ভূমিকায় মনের মিলের ফুল ফুটবে কেমন ক'রে? মিসেস ধর্মবীরের সঙ্গে দেখা হয়ে আরাম পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু তিনি তো আধা-ভারতীয় —হিন্দু মতেই বিবাহ করেছিলেন, ভারতীয় স্বামীর মাধ্যমে ভারতকে ভলোবেসে। তাই তাঁর সৌহার্দ্য খাঁটি হওয়া সত্বেও সুভাষের কথা নামঞ্জুর হয় না যে, পরাধীন জাতির সঙ্গে শাসক জাতির সৌহার্দ্য অসম্ভব। মিঃ বেট্‌স্‌ই প্রথম একথার অকাট্য প্রতিবাদ হয়ে এসে আমাদের কাছে হাজিরি দিলেন! তাঁর সঙ্গে দিনের পর দিন কত হাসি তর্ক গল্প আলোচনাই জ'মে উঠত যে! সৌহার্দ্য যাকে বলে।

আর শুধু সৌহার্দ্যই তো নয়—তাঁর কাছে শিখবারও ছিল যে প্রচুর। কত গুণই যে ছিল এই মানুষটির! তবে তাঁর কথা আমি বলেছি আমার "ভাবি এক হয় আর" উপন্যাসটিতে, তাই সেসবের পুনরুক্তি না ক'রে শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখি যে, তাঁর সম্বন্ধে যা যা লিখেছি তার সাড়ে পনের আনা না হোক্, অন্তত চোদ্দ আনা সত্যি।

আমার মন চিরটাকাল না ভেবেচিন্তেই অপরের প্রভাব সাগ্রহে বরণ ক'রে নেয়—একথা বলেছি বহুবারই। তাই মিঃ বেট্‌সের প্রভাবে প'ড়ে হ'ল আমার আর এক অভাবনীয় পরিণতি—আমি ঠিক করলাম, পাঁচশো পাউণ্ড জমা দিয়ে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট আপিসে ভর্তি হয়ে দেশে ফিরে প্রচুর টাকা রোজগার ক'রে সঙ্গীতের একটি আকাডেমি প্রতিষ্ঠা করব।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর: হবি তো হ, ঠিক এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ এলেন লণ্ডনে। খবর পেয়ে আমি মাঝে মাঝেই ছুটতাম তাঁর সঙ্গ পেতে। তিনি থাকতেন সাউথ কেনসিংটনে একটি সুন্দর ফ্ল্যাটে। কলকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল শরৎদার সূত্রে একথা ইতিপূর্বে বলেছি। কিন্তু যথার্থ ঘনিষ্ঠতার বনেদ গাঁথা হয় প্রথম বিলেতে—শুধু তাঁর ডেরায়ই নয়, নানা ইংরাজ মনীষীর বাড়িতেও বটে। তাঁর মাধ্যমেই আমার আলাপ হয় রথেনস্টাইন, য়েট্‌স, নিকোলাস রোরিখ

প্রমুখ শিল্পী কবি মনীষীদের সঙ্গে। তাঁরা কবির সঙ্গে যখন কথাবার্তা কইতেন শুনতে শুনতে আমি পুলকিত হয়ে উঠতাম। কী সম্মানই না তাঁরা করতেন ভারতের এই অপরূপ সংস্কৃতি-দূতকে! রবার্ট লিণ্ড তাঁকে দেখে পরে একবার লিখেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে handsome না ব'লে বলা উচিত beautiful, তিনি Y. Y. উপনামে প্রতি সপ্তাহে একটি ক'রে রসাল প্রবন্ধ লিখতেন "নেশন" সাপ্তাহিকীতে, তাঁর কয়েকটি রসিকতা আমি আমার খাতায় টুকে রেখেছিলাম, যথা:

"Nothing could be more absurd, however, than to regard a belief in ghosts as absurd."

প্রসঙ্গটা যখন উঠল তখন কিছু লিখিই না কেন এ-সম্পর্কে স্মৃতিচারণী ভঙ্গিতে। ব্যাপারটা এই যে, এই সময়ে আমি ইংলণ্ডে রকমারি ভৌতিক কাণ্ড নিয়ে মহোৎসাহে চর্চা করা শুরু করেছি। উচ্ছ্বাসী স্বভাব তো, যা-ই মন টানত সাড়া দিতাম সোৎসাহে। সাইকিক রিসার্চ সোসাইটির লেখাপড়া শুরু করলাম তো খোঁজ খোঁজ কোথায় কী বইপত্র আছে! মহোৎসাহে কেম্ব্রিজ লাইব্রেরিতে গিয়ে সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স-এর ডকুমেণ্টারি প্যাম্ফলেট, সার উইলিয়াম ব্যারেট, সার অলিভার লজ, মায়ার্স আরো অনেক খ্যাতনামা ভূতজ্ঞদের বই প'ড়ে ফেললাম। এমন কি, পারিসে গিয়েই এক নামজাদা সাইকিক-এর সঙ্গে আলাপ করলাম—ভূতের ফটো উঠল আমারই এক ছবিতে, আরো কত কী! দেখেশুনে শেষে ঠিক করলাম, রবার্ট লিণ্ড ঠিকই বলেছেন—আমরা নানা কুসংস্কারে ভরা ব'লেই দেখেও দেখি না যে, ভূত মানাকে কুসংস্কার বলাটা গাজোয়ারি, সুতরাং এও আর এক কুসংস্কার। তাছাড়া, জ্ঞানের রাজ্যে অস্পৃশ্য ব'লে কিছু আছে এমন কথা মানলে বিজ্ঞানের আদিম প্রেরণাকেই নামঞ্জুর করতে হয়।

এখানে একটি কথা ব'লে রাখি—নৈলে কেউ কেউ আমাকে হয়ত ভুল বুঝতেও পারেন। কথাটা এই যে, অধ্যাত্মতত্ত্ব (spirituality) ও নেপথ্যতত্ত্ব (occultism) সমার্থক নয়। প্রথমটির বেসাতি সাক্ষাৎ ভগবানের সঙ্গে, দ্বিতীয়টি ভগবান্ ও জীবের মধ্যে নানা অদৃশ্য জগৎ আছে তাদের সঙ্গে। যোগীদের মধ্যে কখনো কখনো নানান্ অলৌকিক বিভূতির আবির্ভাব হয়, এইসব নেপথ্য শক্তির সংস্পর্শে আবার কখনো কখনো নানা শুভঙ্কর দিব্যশক্তিরো আবির্ভাব হয় ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রসাদে। তাই বড় যোগীরা অনেক সময়েই নেপথ্যতাত্ত্বিক হওয়ার সমর্থন করেন—জীবনের উপর কাজ করতে, যথা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Life Divine-এ

লিখেছেন যে, আধ্যাত্মিক মানুষকে পূর্ণায়ত হ'তে হ'লে তাঁর অন্তরলোককে সমৃদ্ধ করতে হবে মূলত চারটি পথের খবর রেখে : ধর্ম, নেপথ্যতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। তাঁর ভাষায় :

"There are four main lines which nature has followed in her attempt to open up the inner being: religion, occultism, spiritual thought and an inner spiritual experience."

এখানে তাঁর ভাবধারার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, তার দরকারও নেই—যাঁরা অন্বেষু তাঁরা Life Divine-এর The Evolution of the Spiritual Man অধ্যায়টি সহজেই আদ্যন্ত প'ড়ে যা কিছু জানার আছে জেনে নিতে পারবেন। আমি নিজে এ বিষয়ে কিছু খোশখবর রাখি বটে, কিন্তু সেসব লেখার এখনো সময় হয়নি যদিও কিছু খবর দেবার লোভ সংবরণ করতে পারিনি ব'লে "অঘটন আজো ঘটে" প্রকাশ ক'রে ফেলেছি। এখানে ব'লে রাখি এ বইটির প্রধান উপজীব্য নেপথ্যতত্ত্ব নয়—সাক্ষাৎ ভগবানের প্রসাদ, করুণা, ভক্তের সঙ্গে আদানপ্রদান। যাক গে, এ সম্বন্ধে পরে আরো বিশদ ক'রে লিখতেই হবে ব'লে শুধু এই গৌরচন্দ্রিকাটি গেয়েই থামি—পালাগান শুরু হ'বে যথাকালে। এখন রবীন্দ্রনাথের হারানো খেইয়ে ফিরে আসি।

আমি এই সময়ে খানিকটা মন স্থির ক'রেই ফেলেছিলাম যে, আমার কুষ্ঠিতে সন্ন্যাসী হবার স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী থাকলেও মামুলি সন্ন্যাসী হওয়া আমার চলবে না কিছুতেই—কারণ একে আমার স্বভাবে কর্মের তাগিদ প্রচণ্ড, তার উপর প্রাণলোকে উচ্চাশা এসে হাজিরি দিয়েছে যে জগতে কীর্তিপ্রতিষ্ঠ হ'তেই হবে। আর ঠিক কিনা এই সময়ে দেখা এমন এক মহা-কীর্তিমানের সঙ্গে—দীনদুনিয়ায় যাঁর কীর্তির জুড়ি মেলা ভার! (রোলাঁ ও রাসেলের সঙ্গে তো তখনো দেখা হয়নি) তাঁর বহুমুখী কীর্তি, ব্যক্তিরূপ, প্রতিভাদীপ্ত মুখ, কথার ভঙ্গি—সবই আমার যেন চোখ খুলে দিল, মন উঠল গান গেয়ে: এই-ই তো চাই—এরি তো নাম সার্থকতা! পরে রোলাঁ আমাকে একটি পত্রে কবির সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "Quelle harmonie!"—কী সুষমা!

সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শ্রীঅরবিন্দের "দিব্যজীবন"-এ আছে :

"All problems in life are essentially problems of harmony."

সত্যিই তো—মনে হ'ল আমার—সব বাধা জয় ক'রে যে ফুলের মতন ফুটে

উঠতে পারে তারি তো নাম সার্থক জীবন! রবীন্দ্রনাথকে দেশের পরিবেশে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর রূপে, মধুর কণ্ঠে, মৃদু রসিকতায়। কিন্তু বিলেতে তাঁকে গৌরবে অচলপ্রতিষ্ঠ দেখলাম যার তার মাঝে তো নয়—বড় বড় মনীষী গুণী তার্কিকদের সভায়। কী আত্মমর্যাদা জ্ঞানই ছিল তাঁর! কোথাও কি পান থেকে কোনোদিন চুনটি খসেছে!

আত্মমর্যাদার কথা বলতে একদিনের কথা মনে প'ড়ে গেল। আমি সেদিন তাঁর ওখানে সাউথ কেনসিংটনে ব'সে তাঁর সঙ্গে গল্প করছি এমন সময়ে কয়েকটি ভারতীয় ছেলে এল দরবার করতে। কী? না, জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজার বারোশো নিরস্ত্র নরনারী জেনারেল ডায়ারের গুলিতে মরেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভায় তাঁকে সভাপতি হতে হবে। রবীন্দ্রনাথের গৌর আনন লাল হয়ে উঠল বিরক্তিতে। তিনি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন: "তোমাদের কি লজ্জা করে না একটুও? জালিয়ানওয়ালাবাগে আমরা পশুর মত মার খেয়েছি—হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে অনেকে প্রাণ বাঁচিয়েছিল—এই কথা এখানে হাটে বাজারে প্রচার করতে চাও?—আমাদের চরম অপমানের কথা ঘোষণা করবে বড় গলা করে? ভাবো কি এ-ধরনের আন্দোলনে সুফল ফলবে? ফলতে পারে কখনো? এরা শুনে বলবে: যারা এহেন পাশবিক অত্যাচার মুখ বুঁজে সয়—হামাগুড়ি দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে কোনোমতে প্রাণ বাঁচায় তারা অমানুষ—কাজেই তাদের জন্তুর মতন গুলি করা ঠিকই হয়েছে। যাও তোমরা—দেশের গ্লানি ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতেই যদি কোমর বেঁধে থাকো তবে সে-ঢাকীদের মধ্যে আমাকে ভর্তি করবার মিথ্যে চেষ্টা কোরো না।"

কবির ক্রুদ্ধ রাঙা মুখ আজও মনে পড়ে। এত তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা তাঁর মুখে কখনো শুনিনি। ওরা চ'লে যাবার পরে আমাকে বললেন: "দিলীপ, পেট্রিয়ট হ'লে কি জাঁক ক'রে বোকা বনতেই হবে? আমরা এ-স্বাধীন দেশে এসেও কি আমাদের জাতীয় অগৌরব লজ্জা হীনতা ভীরুতা প্রচার ক'রে এদের আদর কাড়তে ছুটব? এ হয় কখনো? এরা আর যাই পারুক না কেন, কাপুরুষকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না—নিশ্চয় জেনো। এখানে এসে যদি ভারতের কথা বলতে হয় তবে আমরা যেন কেবল সেই সেই গুণ, সেই সেই সম্পদ, সেই সেই সাধনার কথাই বলি যাদের দৌলতে ভারত বড় হয়েছিল—যেমন বিবেকানন্দ বলেছিলেন। তাই তো তিনি এদের শ্রদ্ধাও পেয়েছিলেন। তিনি এদের এসে ডাক দিয়েছিলেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'

ব'লে—কাঁছনি গান নি আমাদের হাজারো ছুর্দশার কথা জানিয়ে। আমার মনে আছে নিবেদিতাকেও তিনি কীভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন ভারতের সত্যকীর্তির তত্ত্বে, তার কাছে একবারও বলেন নি—আমরা বড় আর্ত, বড় দীনহীন। বলতেন: 'ভারতের বড় দিকটার পানেই চোখ তুলে তাকাও—তার বাইরের দারিদ্র্যকেই বড় ক'রে দেখো না।' আমেরিকানদের সামনে এসে তিনি মাথা উঁচু ক'রেই বলেছিলেন ভারতের ধর্মতত্ত্বের কথা—যদি কেঁদে ভাসাতেন 'ছুটি ভিক্ষে দাও গো' ব'লে, তাহ'লে না পেতেন ভিক্ষা, না সমাদর।"

যাহোক এবার আমার নিজের কথা পাড়ি।

মনে আছে এ-ঘটনার পরেই তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়—আমি কী করব তাই নিয়ে। আমি তাঁকে বলি আমার 'সদা-দোহুল্যমান' মনকে নিয়ে বিপদে পড়ার কথা। তিনি সব শুনে হেসেই অস্থির। এত রকম ডাক শুনলে মতিভ্রান্ত না হয় কে—করেছিলেন এই ধরনের একটা ঠাট্টা। কিন্তু সে যাক। শেষটায় তাঁকে বললাম আমতা আমতা ক'রে বন্ধু বেট্সের কথা: চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট হ'লে না কি বিস্তর উপায় করা যায়—সেই টাকার সঙ্গে আমার নিজের আয় যা কিছু আছে সব জুড়ে এক সঙ্গীতের আকাডেমি গ'ড়ে তুলবার অভিপ্রায়। কবি শুনেই হেসে কুটি কুটি, বললেন: "বলো কি হে? শেষে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট—তুমি? পাঁচশো পাউণ্ড জমা দিয়ে articled হবে? দিলীপ! দিলীপ! You are the limit!"

তাঁর এ-ব্যঙ্গে লজ্জায় নিশ্চয় লালচে হয়ে উঠেছিলাম, কারণ তিনি আমার ছুরবস্থা দেখে ঠাট্টার সুর ছেড়ে তৎক্ষণাৎ ধরলেন স্নেহের সুর। (তিনি আমাকে মাঝে মাঝেই বলতেন: "মানুষকে ঠাট্টা ক'রে সে-ঠাট্টা নিজে উপভোগ করবার সময়ে কিন্তু দেখো—যাকে নিয়ে ঠাট্টা করছ সেও উপভোগ করছে কিনা। অর্থাৎ যাকে বলে laugh with him—not at him.") বললেন: "শোনো দিলীপ! তোমার সঙ্গে কলকাতায় বেশি দেখা হয়নি বটে, কিন্তু তোমার আমি খবর রাখি। তুমি গান-পাগল শুনে অবধি তোমাকে আরো স্নেহ ক'রে এসেছি প্রথম থেকেই। কিন্তু এত সদাদোহুল্যমান হলে তো বলতে পারবে না: 'শস্যং মে গৃহমাগতম্।' শরৎ-এর কাছে শুনেছি—তোমার বাবা তোমার জন্যে যথেষ্ট রেখে গেছেন, তার পরে তোমার মাতুল সে-সম্পত্তি খাটিয়ে নাকি চতুগুর্ণ ক'রে তুলেছেন। তাই তোমার নেই অন্নচিন্তা চমৎকারা। এহেন তুমি গানকে শুধু নেশাই রাখবে? পেশাও করবে

না? এইই যে তোমার স্বধর্ম তা-ও কি ভেবে-চিন্তে বুঝতে হবে? তুমি যে গানকে সত্যি ভালোবেসেছ—না জানে কে?"

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম: "গান ভালো না বাসে কে বলুন? কিন্তু শুধু গান ভালোবাসলেই তো হবে না—প্রতিভা ব'লেও কি কিছু নেই। আমি জানি আমার সুকণ্ঠ আছে, কিন্তু যদি ধরুন প্রতিভা—মানে স্বষ্টির প্রতিভা—না থাকে?"

কবি আমার কাঁধে স্নেহভরে হাত রেখে বললেন: "অত পরিণাম চিন্তা নাই করলে। আর ধরো যদি গানে স্বষ্টির প্রতিভা তোমার নাই থাকে—তাহ'লেই বা কী? গান গাওয়ায় সিদ্ধি তোমার মারে কে? এদেশেও কি গায়ক মাত্রেই কম্পোজার নাকি? না শোনো, অত সাত পাঁচ না ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়ো না হে। শরৎ-এর কাছে শুনেছি, তুমি নাকি কচি বয়স থেকে পুরো মহাভারত পড়েছ। তাহ'লে গীতায় পড়ো নি কি যে, মানুষের কর্মেই অধিকার—কর্মফলে নয়, তাছাড়া, সংসারে লক্ষ্যে যারা পৌঁছতে পারে না তারাও লক্ষ্যমুখে চলতে শুরু করলে সেই চলার সাধনার মধ্যে দিয়ে কি কিছুই পায় না পাথেয়? না না না। সর্বনাশ!—চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট! কিছুতেই না! তুমি চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট হয়ে কলম উঁচিয়ে টাকা আনা পাই হিসেব করছ এ আমি ভাবতেই পারি নে। তোমার ইংরাজ বন্ধু তোমাকে চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট হবার উপদেশ দিয়েছেন—গান কী বস্তু তিনি জানেন না ব'লে। হিসেবী হতে পারে তারাই—যারা গাইতে পারে না। গোনাগুন্তিতে টাকা হয় বটে, কিন্তু গান হয় না দিলীপ। তাছাড়া, ও-কাজে কী খাটুনি জানো না তো—ও সর্বনেশে হিসেবের কথাকে মনেও ঠাঁই দিও না হে, দিও না—কথা শোনো।"

এর পরেও মন আমার দুলেছিল ফের বার্লিনে বিখ্যাত মানব রায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে। তিনি বলশেভিকদের—বিশেষ ক'রে লেনিনের এম্নি গুণগানই করলেন যে, মনে হ'ল রাশিয়ায় যাই—দেখে আসি ওরা কী অপূর্ব নবমুক্তিরাজ্য গড়ছে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে পেলাম ওলগার দেখা—তার কথা বলবার এবার সময় এল। কিন্তু তার আগে আমায় কিছু ভূমিকা করতে হবে।

কবে কোন্ তারিখে ঠিক কোন্ ঘটনা ঘটেছিল নিশ্চয় ক'রে বলতে পারব না। তবে ভরসা এই যে, আমার স্মৃতিশক্তি সত্যিই আশ্চর্য রকম পটু ছিল ছেলেবেলা থেকেই। আমাকে যিনিই একটু কাছ থেকে দেখেছেন তিনিই একথার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমি বলবার চেষ্টা করি নি যা যা তিনি

বলেছিলেন—বলেছি ভাবটা—এবং নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে, সেখানে মনগড়া কোনো কথা লিখি নি। তাছাড়া তাঁর কথা মনে রাখা আমার পক্ষে খুব দুঃসাধ্য মনে হয়নি কোনোদিনই, কারণ শুধু এই নয় যে, তাঁর মতন প্রসন্ন বাংলা বলতে আমি আর কাউকে শুনি নি—এও বটে যে, তাঁর নানা কথা নিয়ে নানা লোকের সঙ্গেই আলোচনা করেছি সোৎসাহে—তাই মনে দাগ কেটে ব'সে গেছে। কিন্তু এবার আমার জীবনের ইংলণ্ড পর্বের সমাপ্তি টানি।

১৯২২ সালের জুলাইয়ে সুভাষ দেশে ফেরে, আমিও যাই বার্লিনে। একথা বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না যে, সুভাষের সঙ্গে যতদিন ইংলণ্ডে ছিলাম ততদিন আমার সাড়ে পনের আনা না হোক, বারো আনা মন সে-ই জুড়ে বসে ছিল। ফলে সে ইংলণ্ডে থাকতে আমি আর কোনো বন্ধু-বান্ধবীর দিকে চোখ তুলে তাকাবার পর্যন্ত ফুরসৎ পাই নি। কিন্তু এজন্যে আমার খেদ নেই একটুও—কারণ সে যে আমাকে দীক্ষা দিয়েছিল প্রেমের মন্ত্রের—যার চেয়ে বড় মন্ত্র আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাই নি। আমার উচ্ছ্বাস-আবেশ-উচ্ছল কৈশোর জীবনের সবচেয়ে বড় উপলব্ধি—ভাগবত ভক্তি, তার পরেই সুভাষের প্রতি ভালোবাসা। সে-ভালোবাসা যেন আমাকে নেশার মতন পেয়ে বসেছিল। আজো যেন সেই পুলকশিহরণের কথা স্পষ্ট মনে করতে পারি ও সে নেই ভাবতে মন ভার হ'য়ে ওঠে।

যাহোক, সুভাষ চ'লে যাওয়ার পর এক-দিকে যেমন শূন্যতা এসে মনকে ব্যথিয়ে তুলল, তেমনি অন্যদিকে ক্ষতিপূরণ এল—যৌবনের দীপ্ততর চোখে রোলাঁ রাসেল ও বহুজাতের য়ুরোপীয় নরনারীর মধ্যে—য়ুরোপের নিকট-পরিচয় পেয়ে—তবে ইংলণ্ডে নয়, কন্টিনেন্টে।

বাইশ

অভিধানে রয়েছে, কন্টিনেন্ট হ'ল ইংলণ্ড-বর্জিত য়ুরোপ। শব্দটির এ-ব্যঞ্জনা গ'ড়ে উঠেছিল কবে বলতে পারি না, তবে কন্টিনেন্টে ভ্রাম্যমান্ হ'লে বোঝা যায় কেন কন্টিনেন্টের মধ্যে ইংলণ্ড দ্বীপকে ধরা হয় না। ইংলণ্ডে গ'ড়ে উঠেছে এক দ্বীপাবদ্ধ (insular) মনোভাব। ডীন ইঞ্জ তাঁর বিখ্যাত Out-spoken Essays-এ লিখেছেন যে, বিদেশীকে পছন্দ করা ইংরাজ জাতের পক্ষে প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি। ওদিকে নিউটন আবিষ্কার করেছেন যে, ক্রিয়া আনে প্রতিক্রিয়া।

অথ, পরিণাম : ইংরাজ জাতকেও কন্টিনেন্টে কেউ পছন্দ করত না যদিও খাতির করত সবাই।

খাতির না ক'রে উপায়? এতটুকু ছোট্ট দ্বীপের মাত্র কয়েক কোটি মানুষ সারা বিশ্বে হানা দিল কারোর মানা না মেনে! আজ অবশ্য ইংলণ্ডের সে-বোলবোলা নেই—সে-রামও নেই, না সে অযোধ্যা। কিন্তু সে-সময়ে—প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও—ইংরাজের আস্ফালনের সীমা ছিল না :

Rule Britannia! Britannia rules the waves,
Britons never shall be slaves.

গানটি সারা ইংলণ্ডে ঝংকারিত হ'ত। কিন্তু এখন ব্রিটানিয়ার কোথায় সে গর্ব? ইংলণ্ড আজ কবি গ্রে-র কবিতাই মনে করিয়ে দেয় : The paths of glory lead but to the grave!

কত সত্যি কথা! অথচ এ-শতকের প্রথমদিকে—য়ুরোপের প্রাক্-হিটলার পর্বে—ইংলণ্ডের "মহিমা"—glory—দেখে কে ভাবতে পারত যে, মাত্র বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ড শুধু যে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্বশক্তি হয়ে দাঁড়াবে তাই নয়—"মহা-চলোর্মির রাণী" থাকবার গর্বও তার কাছে হয়ে দাঁড়াবে শুধু অতীতের স্মৃতি?

কিন্তু কন্টিনেন্টে—মানে ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইজর্লণ্ড ও হাঙ্গেরি—ঘুরে চল্লিশ বৎসর আগে এমন কথা আমার একবারও মনে হয়নি যে, বৃটানিয়া অদূর ভবিষ্যতে শুধু যে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থলশক্তিতে পরিণত হবেন অথবা সমুদ্ররাজ্ঞীর পদবীও খুইয়ে বসবেন নিয়তি-চক্রের আবর্তনে। য়ুরোপ বলতে সে-সময়ে আমাদের চোখে সব আগে ইংলণ্ডের ছবিই ভেসে উঠত—অন্তত আমাদের দেশে।

তাই তো চমকে উঠেছিলাম জর্মনদের সঙ্গে নিকট-পরিচয়ে। প্রতাপাদিত্য বিশেষণটি মনে উদয় হ'ত দেখে ওদের অক্লান্ত কর্মিষ্ঠতা, অফুরন্ত উদ্যম, অপরাজেয় বলিষ্ঠতা। যুদ্ধে ওরা তখন হেরে গেছে, তবু মনে মনে জপছে : Herrenvolk-এর মন্ত্র—মানে, প্রভুর জাতি। কিন্তু ওদের প্রতাপ দেখেও আমি তেমন অভিভূত হই নি যেমন হয়েছিলাম ওদের সঙ্গীতানুরাগ দেখে। সঙ্গীতকে যে কোনো জাতির আবালবৃদ্ধবনিতা এমন মনেপ্রাণে ভালবাসতে পারে এ আমি স্বচক্ষে না দেখলে ভাবতেই পারতাম না। বিশ্ববিশ্রুত জর্মন কণ্ডাকটর আর্থার নিকিশ একবার কুড়িটি সিম্ফনি কন্সার্ট দেন—প্রতি শনিবার একটি ক'রে। তিন মাস আগে সমস্ত টিকিট

ফুরিয়ে গেছে—season ticket—অর্থাৎ কুড়িটি টিকিটওয়ালা গোটা খাতা। আমি অতি কষ্টে এক বন্ধুর সাহায্যে মাত্র চারটি টিকিট সংগ্রহ করি চতুর্গুণ দাম দিয়ে। এছাড়া চেম্বার মিউসিক, পিয়ানো, বেহালা, কোরাস গান, অপেরা, গ্রাম্য সঙ্গীত, গির্জা সঙ্গীত, হাজারো ড্রইংরুম সালঁ-তে (salon) গায়ক-গায়িকার সমাদর—কাকে ছেড়ে কাকে ভজি! জর্মনিতে দু' তিন মাসের মধ্যেই যেন থ হয়ে গেলাম! "ইংরাজী সঙ্গীত" শুনে ওরা তো হেসেই খুন, বলে: ওরা কবিতা লিখুক যা পারে—সঙ্গীত আবার কেন·········ইত্যাদি। মনে পড়ত শ্রীশরৎ দত্তর কথা: গান শিখতে চাও তো যাও বার্লিনে। বৃটানিয়া চলোর্মিসম্রাজ্ঞী হ'তে পারেন কিন্তু সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী হ'ল জর্মনি।

আমি ফের উজিয়ে উঠলাম: এসে গেছি ঠিক জায়গায়ই তো—আমাকে আর পায় কে? Sternes Conservatorium-এর ডিরেক্টরের কাছে যেতেই তিনি য়ুকেলিউস ব'লে এক শিক্ষকের কাছে আমাকে পেশ করে দিলেন। ঐ সঙ্গে আর এক বেহালা শিক্ষকের কাছে শিখতাম বেহালা বাজানো। বেশি ঝুঁকলাম অবশ্য গান শেখার দিকেই। সপ্তাহে তিনদিন ক'রে কণ্ঠকলাবৎ-এর কাছে য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে কণ্ঠসাধনার তালিম নিতাম বহু মার্ক খরচ ক'রে। ভাগ্যে সে-সময়ে জর্মন মার্ক প'ড়ে গেছে—এক পাউণ্ডে আগে মিলত কুড়ি মার্ক, সে-সময়ে—দু হাজার। কাজেই জর্মনিতে ইংলণ্ডের সিকি খরচ ক'রেও থাকা যেত রাজার হালে। অপেরা কন্সার্টে শ্রেষ্ঠ দামী সীটে শুধু যে নিজে যেতাম তাই নয়—মাথায় পাগড়ি এঁটে বন্ধুবান্ধবীকে প্রায়ই নিয়ে যেতাম। ফলে নাম র'টে গেল Prinz Roy, একথার উল্লেখ করছি আমার কোনো রাজকীয় মহিমার ঢাক পেটাতে নয়—শুধু আমার এই উপলব্ধিটিকে পেশ করতে যে, জর্মনিতে সঙ্গীতোৎসাহী মান পায়। ইংলণ্ডে আমার কণ্ঠ শুনে ক'জনই বা উজিয়ে উঠেছিলেন? কিন্তু জর্মনিতে কয়েকটি সালঁতে গান করতে না করতে আমার সে কী প্রতিপত্তি! আনন্দে প্রায় "হৃদয় আমার ময়ূরের মতো নাচে রে" অবস্থা—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে।

আর সত্যিই এর প্রধান কারণ ছিল আমার কণ্ঠ। আরো কয়েকটি যোগাযোগও ছিল অবশ্য—আমার স্বাস্থ্য, মেলামেশার ক্ষমতা, অর্থস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি। কিন্তু কণ্ঠই ছিল আমার প্রধান সুপারিশ একথা বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না। জর্মনরা ইংরাজদের মতন চাপা-প্রকৃতির জাত নয়, কথায় কথায় উজিয়ে উঠে grossartig; fablehaft, wunderbar, kolossal জাতীয় উচ্ছ্বসিত বিশেষণ ব্যবহার ক'রে

থাকে। ইংরাজি ভাষাকে বলা হয় a language of understatement—বেশি উচ্ছ্বাস আবেগের ভার সে সয় না। জর্মনভাষায় মনপ্রাণের তরণী আবেগ-উচ্ছ্বাসের জোড়া পালে হু হু ক'রে চলে, বিশেষ করে সামাজিকতার খরস্রোতে। একথা এত ক'রে বলছি শুধু জানাতে যে, জর্মনিতে আমি সমাদর পেয়েছিলাম শুধু আমার কণ্ঠের প্রসাদে তাই নয়—স্বভাবে ওরা উচ্ছ্বাসী ব'লেও বটে। তাই আমার কণ্ঠের দৌলতকে বন্ধুত্বের বাজারে খাটিয়ে যখন আমি ওদের কাছ থেকে জয়ধ্বনির মুনাফা পেতাম তখন নিজেকে সময়ে সময়ে সাবধান ক'রে দিতে বাধ্য হ'তাম এই ব'লে যে, ওদের স্বস্তির মধ্যে ফেনাকে বাদ দিয়ে তবে পানীয়কে বরণ করতে হবে। নৈলে শুধু মাথাই গরম হবে—যার ফল শুভ নয়।

কিন্তু আবার যৌবনে বেশি সাবধানী হওয়াও সাজে না। তাই চললাম ওদের সমাদরের স্রোতে গা ভাসিয়ে—দেখতে দেখতে নানা সভায় গাওয়া শুরু করলাম—শুধু বাংলা হিন্দি গানই নয়—ইতালিয়ান, ফরাসি ও জর্মন গান। এক-আধটা রুশ গানও শিখেছিলাম রুষভাষা না জানা সত্বেও—সে-গানগুলি বিশেষ কাজে এসেছিল আমার বার্লিন-জীবনে।

এ-সম্পর্কে আমার একটা কথা মনে হয়েছে বারবারই। কথাটা এই যে, বিধাতা নানা মানুষকে নানা মূলধন দিয়ে চুপ ক'রে দেখেন কে তাকে কেমন ক'রে খাটায়। কাউকে দেন মস্তিষ্ক, কাউকে স্বাস্থ্য, কাউকে রূপ, কাউকে ধনসম্পদ, কাউকে চিত্তাকর্ষী লাবণ্য—charm: আমার মনে হ'ত আমাকে বিধাতা নানা মূলধনই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি যে-মূলধনটি খাটিয়ে বিশ্বমানবের বাজারে সবচেয়ে বেশি সমাদরের মুনফা কামিয়েছি সে আমার কণ্ঠই বটে। শৈশবে পিতৃদেবের মুখোজ্জ্বল করেছি এরি জোরে। কৈশোরে বহু বন্ধু ও অনুরাগীর প্রীতি পেয়েছি এরই দৌলতে। যৌবনে অপরিচয়ের দূরত্ব কাটিয়ে বিদেশে বিভুঁয়ে অঢেল শিল্পী তথা দরদী নরনারীর বরণমালা পেয়েছি এরি প্রসাদে, এমন কি বার্ধক্যেও পুণায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে এরি জোরে। এ সম্পর্কে আমার মনে পড়ে প্রায়ই রাণা প্রতাপসিংহের বিশ্বস্ত বাহন চৈতকের কথা—যে মুমূর্ষু হয়েও প্রভুকে ধারণ ক'রে এসেছিল হলদিঘাটে। তাই আমি আমার অনুরাগিবৃন্দকে আজও প্রায়ই বলি সপরিহাসে: "The old horse can still run": আমার দেহের নানা শক্তি ম্লান হয়ে এসেছে কিন্তু প্রভুভক্ত কণ্ঠ আজও পেন্সন চায় নি আরামের পিঁজরাপোলে ভুষি পেয়ে খুশি থাকতে। কিন্তু যা বলছিলাম।

আমার কণ্ঠের প্রসাদে জর্মনিতে দেখতে দেখতে শুধু যে সঙ্গীত-বিদ্‌দের অভিজাত-সভায় ছাড়পত্র পেলাম তাই নয়—জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু বান্ধবীও লাভ হ'ল যে কত! জর্মন তো বটেই, তাছাড়া পোল, সুইড, ডেন, তুর্কী—সর্বোপরি রুশ। এ আর এক বিচিত্র রোমান্স—জর্মনিতে আমার বন্ধুত্ব হ'ল সবচেয়ে বেশি রুশ নরনারীর সঙ্গে। জর্মনদের পরেই সঙ্গীত প্রতিভায় নাম-ডাক রুশ জাতের। নানা রুশ সুর আমাকে নিরন্তরই উতলা ক'রে তুলত। সে-সময়ে বার্লিনে রুশ গান, থিয়েটার, কন্সার্ট, কাবারে, রেস্তরাঁর ছড়াছড়ি। দু' তিন লক্ষেরও বেশি রুশ উদ্বাস্তুর বার্লিনে বসবাস। এঁদের মধ্যে অভিজাত রুশও ছিল, যদিও মধ্যবিত্তই বেশি। তাদের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা হ'ল—শুধু আনন্দের মহলেই নয়, আবেগের অন্তঃপুরেও বটে।

আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল এক রুশ যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'তে: নাম শাপিরো। সে ছিল বলশেভিক, কিন্তু আমি প্রথমদিকে সেকথা জানতাম না। তার সঙ্গে অনবরত কথা হ'ত ফরাসি ভাষায়। সে অপূর্ব ফরাসী ও জর্মন বলতে পারত। শিক্ষিত রুশরা প্রায়ই বহুভাষাবিৎ হয়। আমার বলশেভিক বন্ধুটি এর উপর আবার ছিলেন স্বধর্মে ভ্রমণোৎসাহী—নানা দেশ ঘুরে, নানা ভাষা ও ভাষীর সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে হয়ে উঠেছিলেন যাকে বলে কসমোপোলিটান, কিনা বিশ্বমানবিক। তবে যেহেতু তার কথা "ভাবি এক হয় আর"-এ বেশ ফলিয়েই বলছি সেহেতু এখানে শুধু এইটুকু বললেই চলবে যে, তাকে ভালোবেসেছিলাম আমি মনে প্রাণে। শুনেচি সে আজ মস্কোয় একজন বড় কর্মচারী, তবে দেশে ফিরে তার দু একটির বেশি চিঠি পাই নি। তার স্নেহকোমল মুখ ও বলিষ্ঠ আদর্শবাদ আমি আজও ভুলতে পার নি। যদিও আজ আমার কেবলই মনে একটা খেদ জাগে: "আহা, যদি সে বলশেভিক না হ'ত!" মানুষ যা চায় সবই কি পায়? আর পেলে হয়ত লাভের চেয়ে ক্ষতিই হ'ত বেশি—কে জানে? থাকগে।

বার্লিনে আমার মন ফের দুলে ওঠে এই বন্ধুটিরই জন্যে। সে ছিল এক হোয়াইট রুশ ডাক্তারের একমাত্র পুত্র। ডাক্তার লণ্ডনে প্রচুর টাকা করেছিলেন। বলশেভিকদের উপর তাঁর ছিল হাড়ের রাগ। কিন্তু নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে—তাঁর একমাত্র কুলতিলক হ'ল কিনা সর্বান্তরিক বলশেভিক! পিতা তাকে ভয় দেখালেন, ত্যাজ্যপুত্র করলেন। সে অচল অটল। বার্লিনে রুশ কনস্যুলেটে উদয়াস্ত হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করত। বিবাহ করেছিল এক সুইস মেয়েকে কিন্তু তার সঙ্গে দেখা-শুনা

হ'ত খুবই কম : স্ত্রী সুইজর্লণ্ডে নার্স হয়ে জীবিকা অর্জন করে, স্বামী বার্লিনে বলশেভিক প্রপাগাণ্ডায় সর্বত্যাগী। তার মুখে তার দেশের জন্যে দুঃখের তপস্যা বরণ করার নানা কাহিনী শুনতে শুনতে সময়ে সময়ে আমার চোখে জল ভ'রে আসত, কিন্তু সে মৃদু হেসে বলত : "কিন্তু এজন্যে আজ আমার সত্যিই কোনো দুঃখ নেই ভাই, কারণ আমি যে জানি—এছাড়া জগতে আমাদের মন্ত্রসিদ্ধি হ'তে পারে না।" আমি যখন ১৯২২-এ লুগানো রওনা হই তখন তাকে ট্রেনভাড়া দিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কেননা সে ছিল সত্যিই দরিদ্র—যা মাইনে পেত তাতে সুইজর্লণ্ডের খরচের সংকুলান হয় না। দৈবদুর্বিপাকে তার আসা হয় নি। কিন্তু তার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা থাক, বলি এখানে আর একটু তার আদর্শের কথা যা আমাকে সে-সময়ে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তাকে দেখে প্রথম আমি বুঝি লেনিনকে রুষ জাতি কোথায় বসিয়েছে। লেনিনের মহত্ত্বের ডাকে সে কীভাবে সব ছেড়ে বেরিয়ে আসে আমাকে বলত দিনের পর দিন। শুনতে শুনতে একটু একটু ক'রে আমার মন তার উৎসাহের রঙে রঙিয়ে উঠল, আমার সত্যিই মনে হ'ল—রুশ জাত বুঝি এ-অবিচারভরা জগতে এসেছে সুবিচারে সাম্যের গোড়াপত্তন করতেই। তার কাছে শুনতাম, হাজার হাজার রুশ তরুণ তরুণী কত কষ্টই না সয়েছেন এই নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে। সে প্রায়ই বলত মনে আছে : "লেনিন বলেন : 'যতদিন জগতে সবাই অন্ন না পাবে ততদিন কাউকেই পরমান্ন পরিবেশন করা হবে না—personne n'aura de gateaux jusgu'a ce que tous soient servis du pain.' "

অন্য কারোর মুখে এ-ধরনের কথা শুনলে নিশ্চয়ই আমার অন্তর সাড়া দিত না। কিন্তু তাকে ভালবেসেছিলাম যে, তাই তার মুখে এ-ধরনের কথা শুনতে শুনতে তার আদর্শবাদের ছোঁয়াচ লাগল আমার প্রাণে, আমার মনে হ'ল : এমন মহাবাণীর উদ্‌গাতা লেনিন! এঁরি তো নাম তারক—saviour! ভুলে গেলাম যে, লেনিন নাস্তিক, ভুলে গেলাম শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—যে, ভগবানকে বাদ দিয়ে মানুষের যথার্থ হিতসাধন অসম্ভব।

হবি তো হ, এই সময়ে আমার কাছে এলেন এক ভারতীয় বিপ্লবী যুবক—মানব রায়। তিনি তাঁর এক চরকে দিয়ে জানালেন যে, আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। বিখ্যাত মানব রায়, ওরফে নরেন ভট্টাচার্য—সে-সময়ে মস্কোতে তাঁর বোল-বোলা। আমি মানব রায়ের সঙ্গে গুপ্ত-ভাবে দেখা করলাম—তাঁর চর খুবই

সঙ্গোপনে আমাকে নিয়ে গেলেন। নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ চিত্তচমৎকারী না জানে কে? গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বুক দুরু দুরু করছে—ভয়ে, কিন্তু তখন আমার মনে বলশেভিক বন্ধুর সাহসেরও কিছু ছোঁয়াচ লেগে থাকবে, কাজেই গেলাম দুর্গা ব'লে।

মানব রায়ের কথাবার্তার মধ্যে বুদ্ধির আশ্চর্য দীপ্তিতে অভিভূত হয়ে পড়লাম। তিনি আমাকে তাঁর নানা প্রবন্ধাদি দিলেন। তাঁর একটি বিখ্যাত বইও দিয়েছিলেন —India in Transition, বইটি পড়তে পড়তে অবাক হয়ে গেলাম: ইতিহাসকে এ-দৃষ্টিকোণ থেকে তো কই, কেউ দেখে নি এর আগে!

মানব রায়ের সঙ্গে দু' তিনদিন কথা হ'ল। তিনি তারপর আসল কথাটা ফাঁস করলেন: তিনি চান আমি বার্লিন থেকে সোজা মস্কো ঘুরে আসি। বললেন: "এসে দেখে যান—যা কখনো বিশ্বাস করতে পারেন নি তারই বনেদ গাঁথছে আজ সেখানে আপনারই মতন আদর্শবাদীরা। তারপর দেশে ফিরে আপনিও এই কাজে লাগবেন, গান গাইতে চান গান গাইবেন—সাম্যের সৌভ্রাত্র্যের নিরন্নের মুখে অন্ন যোগাবার গান······ইত্যাদি। (পরে তাঁর এ-মতের পরিবর্তন হয়েছিল।)

অবাধ্য মন ফের দুলে উঠল বৈ কি। ফিরে এসে শাপিরোকে বলতেই সে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলল: "আমিও এই কথাই বলতে চাইছিলাম ভাই, তুমি যদি যাও তবে আমিও সঙ্গ নেব—দেশে আমার কিছু কাজও আছে।"

এই সময়ে দিনের পর দিন তার কাছে শুনতাম ক্রপট্কিন, বাকুনিন, লেনিন, ট্রটস্কি—আরো কত খ্যাত ও অখ্যাতনামা রুশ বিপ্লবীদের কথা, যাঁরা বলতেন: জগৎজোড়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হ'তে না পারলে অত্যাচারীদের নির্মূল করা যাবে না। সে বলত প্রায়ই ফরাসী বিপ্লবের কথা, আবৃত্তি করত তার বাণী:

Allons enfants, de la patrie´
Le jour de gloire est arrive´
Contre nous de la tyrannie
L'e´tendard sanglant est leve´

দেশসন্তান! চল্ ভাই, আগে চল্!
দেখ্: এলো দিন মহিমময়, মহান্!
অরি আমাদের অত্যাচারীর দল
উড়ুক রক্ত বিদ্রোহের নিশান!

পরে ক্রমশঃ তার সঙ্গে মাঝে মাঝেই আমার ঘরে গাইতাম এই গানটি। গাইতে গাইতে তার পাণ্ডুর মুখে উঠত রঙিয়ে। সে দেখতে সুদর্শন ছিল না, কিন্তু সে-সময়ে তাকে আমার চোখে সত্যিই কী যে সুন্দর লাগত!

এ-উপলব্ধিটির উল্লেখ করছি একটি মহৎ সত্য পেশ করতে: প্রীতি যেখানে অন্তরের রসে সরস হয়ে ওঠে সেখানে এমন কি আদর্শের দুস্তর ব্যবধানও সময়ে সময়ে তেমন দুর্লঙ্ঘ্য মনে হয় না। প্রেম প্রীতি যে কেমন ক'রে এ অসাধ্য সাধন করে আজো তার তল পাই নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নজিরে শুধু এইটুকু মাত্র বলতে পারি যে, প্রেমের প্রতিভা স্বভাবে অঘটনঘটনপটীয়সী, তাই যখন হৃদয়ে প্রীতির অভ্যুদয় হয় তখন তার ইন্দ্রজালে অসম্ভবও সম্ভব হয়—শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর ভাষায়: তখন miracle is made the common rule, সে-পরম সুলগ্নে একজন আর একজনকে শুধু জানিয়ে দেয় তার প্রেমের প্রতি শিহরোচ্ছল চাহনিতে:

জানি না তো স্বপ্ন তোমার
কোন্ মোহানার পানে তোমায় টানে,
জানি শুধু—ভালোবাসি,
কেন বাসি—কেউ কি প্রিয়, জানে?

কিন্তু এ-ভালোবাসা আমাকে ধীরে ধীরে আমার নিজের আদর্শ থেকে ছিনিয়ে যেন তার আদর্শের দিকে টেনে নিয়ে চলল। আমি শাপিরোর মুখে নিরন্তর বলশেভিকদের নানা রঙিন স্বপ্নের কথা শুনতে শুনতে খানিকটা সেই রঙেই রঙিয়ে উঠলাম। আমার মনে মহা উৎসাহ জেগে উঠল, ভাবলাম মানব রায়কে লিখি যে, যাব দেখে আসতে—বলশেভিকরা কী নব সৃষ্টিকার্যে আত্মনিয়োগ করেছে, কেমন ক'রে যোগাচ্ছে নিরন্নের মুখে অন্ন, কীভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে ধনতান্ত্রিক অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রক্তনিশান ওড়াচ্ছে।

আজ ষাটের কোঠা পার হ'য়ে অনেক কিছু বেশি সাফ দেখতে পাই যা এই সময়ে—যৌবনের মাতাল নেশায়—ঝাপসা দেখতাম, কি ভুল দেখতাম। কিন্তু যৌবন-জলতরঙ্গের বহিরুচ্ছ্বাস এমনিই মোহময় যে সে ডুবিয়ে দেয় সব আন্তর গভীরকল্লোলের উদাত্ত আহ্বান—তাই মনে হ'ত না যে, যা দেখছি ভুল দেখছি কি ভুল শুনছি। মনে হ'ত কেবলই যে সব প্রগতির মূলেই বুঝি আছে নিষ্ঠুর বিদ্রোহের "আগে চল আগে চল ভাই" হুঙ্কার। এক গভীরায়মান নৈশ্চিত্য আমার মনকে এমনি পেয়ে বসল যে আমি দিনের পর দিন ভগবানকে একবারও স্মরণ করতাম

কিনা সন্দেহ। ইংলণ্ডে সুভাষের সংস্পর্শেও উৎসাহ বোধ করেছি বহুবার কিন্তু ভগবান্‌কে ভুলিনি। কারণ তার মধ্যেও এক দুর্দম বিদ্রোহী তাকে ঠেলত বটে সামনের দিকে, কিন্তু ভগবানের নোঙরছাড়া ক'রে নয়। আমার বলশেভিক বন্ধুটির সঙ্গে তার তুলনা করলে আজ স্পষ্ট দেখতে পাই একটি সত্য : যে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মন কিছুতেই পুরোপুরি নাস্তিক হ'তে পারে না ব'লে কোনো আদর্শের নামেই ষোল আনা নিষ্ঠুর হ'তে পারে না। তাছাড়া সুভাষ যতই বহির্মুখী কর্মের গুণগান করুক না কেন, তার অন্তরের গভীরে লুকিয়ে ছিল একটি মহান্ উদাসী যে তাকে চঞ্চলতম দুর্লগ্নেও ভুলতে দিত না শিব শক্তি কৃষ্ণকে—যে মায়ায় ঘোর কর্মাবর্তের মধ্যেও তাকে গীতা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে দেয়নি, কি ধ্যানভ্রষ্ট করেনি। আমার বলশেভিক বন্ধুর তো ওসব বালাই ছিল না—মানুষকে নিয়েই তার একান্ত কারবার, ধর্ম তার কাছে "opium of the soul"—বলত সে দৃঢ়কণ্ঠেই লেনিনের বেদবাক্য (?) উদ্ধৃত ক'রে। অথচ আশ্চর্য এই যে এ-সময়ে বলশেভিক আদর্শের মোহ আমার মনকে এম্‌নিই অধিকার ক'রে বসেছিল যে তার কালাপাহাড়ি মতামতও আর আমার দুঃসহ মনে হ'ত না—তার আরাধ্য সোনার হরিণকে মনে হ'ত না মায়ামৃগ। ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম তার সঙ্গে যাব একবার রুষদেশে—যা থাকে কপালে, দেখে আসি কী ভাবে ওরা সাম্যবাদের আশু প্রতিষ্ঠায় "এ-পীড়ন-পেষণ-অবিচার-ভরা" পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্যের প্রবর্তন করেছে।

আমার পক্ষে এর চেয়ে বড় পদস্খলন আর কী হ'তে পারে? যে চিরদিন বিশ্বাস করে এসেছে যে ভাগবত জীবনই সেরা জীবন ও ভগবানকে বাদ দিয়ে মানব-হিতসাধন আকাশ কুসুমের মতনই অলীক অসম্ভব—সে কিনা ভারতের আত্মার সনাতন বাণী ভুলে গেল :

যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি।
ব্যাপ্ত চর্মমেখলায় পেরেছে বেষ্টিতে কবে
কে কোথায় অসীম অম্বরে?
আরো অসম্ভব—মানবের দুঃখ করা দূর
না জানিয়া দেবদেবেশ্বরে।

কিন্তু মায়ার অঞ্জনে আলেয়াকে দেখায় তারা—আমি স্থির করলাম যাব রুষদেশে ও সেখানে রুষ ভাষা শিখে থাকব বেশ কিছুদিন। থেকে থেকে মনে

পড়ত রাখাল মহারাজের বাণী: "ঠাকুরের কৃপা যাকে ঘিরে আছে তার বিপদ হবে না"; কিন্তু সে সময়ে য়ুরোপের কর্মমোহ শক্তিবাদ আমাকে এমনই অন্ধপ্রায় করেছিল যে আমি যেন দেখেও দেখতে পেতাম না—আমি কোন আথান্তরের বিপথে পা দিয়েছি—সনাতন অধ্যাত্ম বাণী ছেড়ে কান পাতছি কোন্ সর্বনাশা ঐহিকতার মায়ামন্ত্রে।

এমন সময়ে এল ঠাকুরের কৃপা—দেখা হল ওলগা বিরুকফের (Olga Birukoff) সঙ্গে—অমনি পড়ল চোখের ঠুলি খ'সে। বলি—কেমন ক'রে ঘটল এ-অঘটন।

তেইশ

বার্লিনে আমি মাঝে মাঝে যেতাম একটি চমৎকার নিরামিষ রেস্তরাঁয়। সেখানেই প্রথম আমার দেখা হয় ওলগার সঙ্গে। জর্মনিতে আমার নামডাক হওয়ার ফলে আমি অনেক বদ্‌লে গিয়েছিলাম—লাজুক কিশোর হয়ে উঠেছিল আত্মবিশ্বাসী নওজোয়ান। কাজেই ওলগার সঙ্গে আলাপ জমাতে দেরি হয়নি—আরো এই জন্যে যে, সে যে রুষ তাকে দেখেই চিনেছিলাম এবং রুষরা খুব সহজেই আলাপ পরিচয় করে এ আমার জানা ছিল।

কোন্ অছিলায় আমি ওলগার সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়েছিলাম আমার মনে নেই—তবে এটুকু মনে আছে যে, তার মুখের শান্ত কমনীয়তা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল ব'লেই তার সঙ্গে পরিচয় করতে চেয়েছিলাম। বন্ধুত্ব পাতাবার ক্ষমতা আমার ছিল সহজাত, তার উপর ওলগা গান অত্যন্ত ভালোবাসিত; কাজেই আলাপ জমতে দেরি হয় নি। ভারতীয় গান শুনে সে সত্যিই মুগ্ধ হ'ত বলে আমার ওখানে তাকে মাঝে মাঝেই ডাকতাম ও পিয়ানো বাজিয়ে নানা গান শোনাতাম। তবে সে ভক্তিসঙ্গীত ছাড়া আর কোন গান শুনতে চাইত না। আমাদের ভজন গানগুলি তাকে আগে অনুবাদ ক'রে বুঝিয়ে তবে গাইতাম।

ক্রমশ গল্পালাপের মধ্যে দিয়ে পরিচয় পেলাম একটি আশ্চর্য পবিত্র হৃদয়ের। জর্মনিতে এর আগে আদর্শবাদিনী তরুণী, শিল্পী তরুণী, ত্বরিৎকর্মা তরুণীর দেখা পেয়েছিলাম যত্র-যত্র, কিন্তু সত্যিকার ধর্মপ্রাণা ব্রহ্মচারিণীর দেখা পেলাম এই প্রথম ও শেষ।

ওলগার পিতৃদেব পল বিরুকভ ছিলেন টলস্টয়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। টলস্টয় সম্বন্ধে তিনি একাধিক বই লিখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরে লুগালোতে দেখা হয় ও তাঁর মুখে টলস্টয়ের অনেক গল্প শুনে মুগ্ধ হই। বলতে কি, টলস্টয়কে আমি প্রথম দিকে ভালোবেসেছিলাম তাঁর "আনা করেনিনা" ও "রিসারেকশন" প'ড়ে। ওলগার সংস্পর্শে আসার পরে আমি পড়ি তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ, গল্প ও নাটক। ওলগা প্রায়ই দুঃখ করত যে, টলস্টয়কে শিল্পী ব'লে সমাদর করতে করতে লোকে ভুলে গেছে মহত্তর টলস্টয়কে যিনি ছিলেন ধর্মাত্মা, মহাত্মা, ঋষি। এ-সম্বন্ধে ওলগার শান্ত উচ্ছ্বাস শুনতে শুনতে তার রঙে আমার মন একটু একটু করে রঙিয়ে ওঠে। আমি বিশেষ চম্‌কে উঠি টলস্টয়ের "লাইট শাইনস্‌ ইন দি ডার্কনেস" বর্গীয় কয়েকটি ধর্মাত্মক নাটক, কয়েকটি ধর্মাত্মক গল্প এবং তাঁর "হোয়াট ইজ আর্ট" প'ড়ে। তাছাড়া ওলগার মুখে টলস্টয়ের ধর্মপ্রাণতার উচ্ছ্বসিত তর্পণ শুনতে শুনতে আমার চোখ যেন প্রথম দেখতে শেখে তাঁর আর্ষ রূপ, ভক্তি করতে শিখি সেই মহর্ষিকে, যিনি মহা-শিল্পী হয়েও বলতে কুণ্ঠিত হন নি যে, মানুষের সর্বোচ্চ সাধনা ধর্ম, শিল্প বা বিজ্ঞান নয়। তখন কে জানত যে, আমার দৃষ্টিভঙ্গিও ঠিক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মতনই বদলে যাবে গুরুদীক্ষায়! কিন্তু সে অন্য কথা: ওলগার প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

বলেছি ওলগা ছিল ধর্মপ্রাণা। কিন্তু এ-ধরনের বিশেষণে কতটুকুই বা বলা হয়? ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পরে ওর যে-রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছিল তার ছবি আঁকা সহজ নয়। ওদেশে সন্ন্যাসিনীরা তাদের মঠে খুবই একান্তে থাকে শুনেছিলাম। ওলগা ঠিক সেভাবে একান্তে থাকত না। বার্লিনে ও এসেছিল খৃস্ট ও মাদনার ছবি আঁকা শিখতে. কাজেই ওকে যেতে হ'ত নানা চিত্রালয়েই, আলাপ করতে হত নানা লোকের সঙ্গেই। ও খুব বেশি মিশুক না হলেও যখন গল্পালাপ করত তখন সহজেই প্রকাশ করত ওর মতামত, বলত ওর নানা অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভাল লাগত দেখে যে, ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষকে ও সর্বান্তঃকরণে ভালোবেসেছিল। ও বলত যে, ওর পিতৃদেবের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুনতে শুনতে ছেলেবেলায়ই তাঁকে ও ভক্তি করতে শিখেছিল। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব সম্বন্ধে ও বিশেষ কিছু জানত না। আমি ওকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলতাম তাঁর কথা।

শুনতে শুনতে সময়ে সময়ে বিস্ময়াবেগে ওর গাল দুটি প্রায়ই আপেলের মতন রাঙা হয়ে উঠত ও চোখে জল ভ'রে আসত। বলা বাহুল্য, পরমহংসদেবের সেইসব

বাণীতেই ও সর্বান্তঃকরণে সাড়া দিত যে-সব বাণীতে টলস্টয়ের সায় ছিল। যথা, পরমহংসদেবের "টাকা মাটি মাটি টাকা" উপলব্ধির কথা শুনবামাত্র ও বলেছিল: "ঠিক টলস্টয়ও বলতেন—অর্থই আনে অনর্থ।" কামিনী ত্যাগের কথা বলতে সঙ্কোচ আসতে ও সোৎসাহে বলেছিল: "এতে কুণ্ঠা কী? দেখছ না কি, আজকালকার মেয়েরা কোন্ উন্মার্গের পথে চলেছে এদেশে? টলস্টয় প্রায়ই বলতেন—ভগবানকে পেতে হলে সব আগে চাই ব্রহ্মচর্য।" তার কাছে প্রায়ই এ-ধরনের অপ্রত্যাশিত সাড়া পেয়ে এত চমৎকৃত হতাম যে, আজ মনে দুঃখ হয় কেন যে সে সময়কার ডায়ারি রাখিনি—রাখলে আজ স্মৃতিচারণে পরিবেষণ করতে পারতাম ওর কত মূল্যবান সরল বিশ্বাসের কথা, অহিংসার কথা, টলস্টয়ের প্রতি বাণীকে বেদবাক্য ব'লে বরণ ক'রে নেওয়ার কথা, আরো কত-কী! ও নিরামিষাশী হয়েছিল গুরুবাক্য মেনে চলতে, অতি সাদামাটা বেশে চলাফেরা করত, চুল বাঁধত টেনে, রুজ কি পাউডারের ধারপাশ দিয়েও যেত না—সব রকমেরই প্রসাধনকে বর্জন করেছিল নিষ্ঠুর হয়ে—এ-সম্পর্কে টলস্টয়ের বাণী শিরোধার্য করতেই বলব। একটি মালা ছিল—জপ করত খৃস্ট নাম। ধূমপান, মদ্যপান বিষবৎ বর্জন, অতি-সুস্বাদু কোন কিছুই মুখে দিত না—এককথায় পবিত্রতা, সংযম ও সন্ন্যাসের মূর্তিমতী প্রতিমা।

কিন্তু ওর নিষ্ঠা, সংযম ও পবিত্রতা আমাকে মুগ্ধ করলেও আমি সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম ওর সরলতায়। এমন সরলতা যে কোন উচ্চশিক্ষিতা পাশ্চাত্য শিল্পীর স্বভাবসিদ্ধ হ'তে পারে চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতে পারতাম না। কিন্তু এবার বলি, কীভাবে ও আমার কাছে হাজির হয়েছিল যেন দেবতারি দূতী হ'য়ে।

বলেছি—সে-সময়ে আমি ভগবানের কথা প্রায় ভুলে ব'সে জল্পনা কল্পনা করছি—রুষ দেশে গিয়ে দেখে আসব সেখানে কী নবরাজ্যের পত্তন করছে বলশেভিক আদর্শবাদী তরুণ তরুণীরা। ওলগার কাছে একদিন কথাটা পাড়তেই ও আশ্চর্য হয়ে সরল সুরেই জিজ্ঞাসা করল: "তোমার মুখে একথা?" আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতেই ও বলল: "তুমি কি মনে করো ভগবানকে যারা মানে না তারা মানুষের সত্যিকার হিতসাধন করতে পারে?"

কথাটা কিছু নতুন নয়। আমি নিজেও তো কতলোকের কাছেই বলেছি এই ধরনের কথা। কিন্তু তবুও ওলগার মুখে এমনধারা প্রশ্ন শুনে পড়লাম যেন অথই জলে। ও তারপর অনর্গল ব'লে চলে যখন যা ওর মনে হয়—একটুও রেখেঢেকে নয়, সম্পূর্ণ খোলাখুলি—যেন আমার সঙ্গে ওর কতদিনের আলাপ!

ওর সব কথা মনে নেই, কেবল ওর মূল বাণীটি তো ভুলবার নয়: পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সত্য ভগবান্, কাজেই সবচেয়ে বড় জীবন হ'ল ভাগবত জীবন। বলশেভিকরা ভগবান্‌কে বাদ দিয়ে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে—শাসনতন্ত্র বদ্‌লে, অসহিষ্ণুতাকে প্রশ্রয় দিয়ে। এ-পথে মানুষের মুক্তি নেই—বলেছেন স্বয়ং খৃষ্ট ও টলস্টয়। তবে? তবে কোন্ ভ্রান্তি-বিলাসের মোহে আমি নাস্তিকদের মায়ায় পড়ছি? আমি বললাম আমার বলশেভিক বন্ধুর কথা, তার ত্যাগের কথা, আদর্শের কথা। ওলগা আমার সঙ্গে তাকে মাঝে মাঝে সেই নিরামিষ রেস্তরাঁতে দেখত, তাকে ওর ভালোও লেগেছিল। কিন্তু ভগবান্‌কে বরখাস্ত ক'রে ভোগবাদের পথে মানুষের পরম মুক্তি হতে পারে একথায় ও কানে আঙুল দিত। বলত: "আমি বুঝি শুধু একটি আদর্শ দিলীপ: ভগবান যা চান তাই করা—হিংসা নয়—হিংসা নয়—প্রীতি, সৌভ্রাত্র, শান্তি। খৃস্টদেব কি বলেন নি:

Blessed are the peace-makers, for they shall be called the children of God. Blessed are the pure in heart, for they shall see God'—ব্যস্। মুক্তির এইই পথ। ওদের ফাঁপা বুলিতে কান দিও না। আর যদি কিছু মনে না করো তবে বলি: "নাস্তিকদের সঙ্গে বেশি মিশো না। ও হয় না: আস্তিকে নাস্তিকে গলাগলি—তেলে জলে মিশ খায় না।"

আমার নিজের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ছিল—এ হয়, কিন্তু ওর সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করতে মন চাইত না আরো এই জন্যে যে, ওর একরোখা সরল বিশ্বাসে আমি শুধু-যে মুগ্ধ হতাম তাই নয়, সত্যিই হিংসা হত ওর নিঃসংশয় বিশ্বাসশক্তিকে। তবে মনকে সান্ত্বনা দিতাম—এ পারে যে আপনি পারে, অর্থাৎ মেয়েরা।

অতঃপর যা হবার: শুরু হল এক বিচিত্র দ্বন্দ্ব: বলশেভিক বন্ধুটি টানে মানবহিতের আদর্শের দিকে। ধর্মপ্রাণা বান্ধবী বলে: "ও হয় না—নিষ্ঠুরতার সংঘবদ্ধ শক্তি দিয়ে মানুষের স্থায়ী হিতসাধন করা অসম্ভব। ভগবান্ করুণাময়, ক্ষমাময়; তিনিই আমাদের আদর্শ, তাই আমাদেরও হতে হবে ক্ষমাশীল, দয়াশীল। মনে নেই খৃস্টের কথা? যখন পিটার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'কতবার আমার ভাইকে ক্ষমা করব? সাতবার? খৃস্ট উত্তর দিয়েছিলেন 'সাতকে সত্তর দিয়ে গুণ কর'বে। বলশেভিকরা চলছে ঠিক উল্টোপথে—শাসিয়ে, সাজা দিয়ে, গায়ের জোরে ওরা চায় মানুষকে বদলাতে। এ হয় কখনো? ওরা বলে: "লক্ষ্য যদি শুভ হয় তাহলে উপায় মন্দ হলে আসে যায় না।" টলস্টয় বলতেন প্রতিবাদ

ক'রে যে খুব আসে যায়—কেননা মন্দ উপায়ের মধ্যে দিয়ে যে যায়, সে ক্রমশ এতই মন্দ হয়ে দাঁড়াবে যে, শুভ লক্ষ্যে আদৌ পৌঁছতেই পারবে না।"

ওর কাছেই হয় আমার বাইবেলের যথার্থ দীক্ষা। মানে, এর আগেও বাইবেল্ পড়েছিলাম, কিন্তু ওর মুখে বাইবেলের বাণী যেন স্পন্দমান হয়ে উঠত। জর্মনিতে আমি দু-তিনবার নিউ টেস্টামেণ্ট প'ড়ে ফেলি ওর সঙ্গে একত্রে। সে যে কী সুন্দর অভিজ্ঞতা—ওর সরল উচ্ছ্বাসের ঝঙ্কারে ওর মুখে শোনা খৃস্টের নানা বাণী—ওর পবিত্র মনের ঋজু শাস্ত্রভাষ্য—সর্বোপরি, ওর নিজের জীবনে এ-সব বাণীকে ফলিয়ে তোলার ঐকান্তিক সাধনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়!

এইভাবে ও আমাকে নিরস্ত করে রুষ দেশে যাওয়া থেকে। বলত: "আমিও ফিরতাম না, কিন্তু আমার বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন, তিনি বিদেশে টিঁকতে পাচ্ছেন না। তাছাড়া রুষদেশ আমার জন্মভূমি—আমাকে যেতেই হবে সেখানে ফিরে। কিন্তু তুমি সেখানে যাবে কী দুঃখে—বিশেষ এই অশান্তির সময়ে—কবে কী হয় কে বলতে পারে?"

আরো অনেক কথাই ও বলত, কিন্তু ভুলে গেছি। এখানে বললাম শুধু যে-কথাগুলি মনে গেঁথে আছে—আরো এই জন্যে যে বিশেষ ক'রে এই সময়ে আমি চম্‌কে উঠেছিলাম ওর নানা কথায় আমাদের ভাগবত বাণীর প্রতিধ্বনি শুনে।

এইভাবে যে কতবারই আমাকে ভগবান রক্ষা করেছেন কী বলব? বার বারই পদস্খলনের মুখে তিনি পাঠিয়েছেন কাউকে না কাউকে: রাখাল মহারাজ মিথ্যা বলেন নি—ঠাকুরের কৃপা আমাকে বর্মের মতন ঘিরে ছিল, নইলে কি আমি অক্ষত দেহে ফিরতে পারতাম? এ-সঙ্কট লগ্নে ওলগা না হানা দিলে আমি নিশ্চয়ই মস্কো যেতাম ও বলশেভিকদের সব বুলিই হয় ত বিশ্বাস ক'রে বসতাম। না, নিজের বল নয়, ঠাকুরের কৃপাই চিরদিন হয়ে এসেছে আমার পরম পাথেয়, প্রধান সম্বল।

হ্যাঁ, ওর কাছে আমি প্রায়ই গেয়ে শোনাতাম ওর একটি প্রিয় গান—অ্যাবাইড উইথ মি—বিশেষ করে একটি স্তবক। (অনুবাদ দেই · মূল গানটি "সাঙ্গীতিকী"তে দ্রষ্টব্য):

পলক আড়াল নয়, থেকো কাছে কাছে।
তুমি ছাড়া আর বলো কে আমার আছে?
তুফানে যে ধ্রুবতারা দিশা উদ্ভাসে?
আঁধারে আলোকে থেকো হে আমার পাশে।

এই গানটি বহু বৎসর পরে গাই আমার গীতি-শিষ্যা উমা বসুর মৃত্যুশয্যায়—সেও গেয়েছিল অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে, আমার সুরে সুর মিলিয়ে :

এসো কাছে যবে আঁখি মুদিব হে শেষে
দেখায়ো আকাশ কালো বুকে আলোরেশে
ধরাছায়া লীন—অধরার উষা আসে
জীবনে মরণে থেকো হে আমার পাশে।

আমাদের শাস্ত্রে আছে—ধর্ম বলে তাকে যে ধারণ করে, আর সত্যকার ধর্ম যেভাবে ধারণ করে সেভাবে কি কোনো নাস্তিক নীতি মানবাত্মাকে ধারণ করতে পারে, আশ্রয় দিতে পারে—নিরাশ্রয়তার গহন দুর্লগ্নে ?

এম্‌নিভাবে যতবারই দুঃখে-কষ্টে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে, শোকে-তাপে আমার বুক কালো হয়ে এসেছে, পেয়েছি তাঁর আশ্বাসের আলো-ভরসা, করুণার নিত্য পাথেয়। য়ুরোপে গিয়েছিলাম আস্তিক কৈশোরে। যৌবনের পদার্পণে এসেছিল—নাস্তিক না হোক, ভগবৎনিরপেক্ষ উৎসাহ, প্রাণশক্তির আত্মবিস্মৃতি। কিন্তু যে ঠাকুরের কাছে শরণ চায়, ঠাকুর কি তাঁকে ঠেলতে পারেন ? আমরা তাঁকে ভুলতে পারি, কিন্তু তাঁর কি ভুল হবার জো আছে ? কবে কোন্‌ সুদূর বাল্যকালে তাঁকে ডেকেছি চোখের জলে (৺অঘোর চক্রবর্তীর গান) :

সুনীল গগনে নীল আবরণে
আবরি রেখেছ বুঝি প্রাণধনে ?
খোলো আবরণ বারেক নয়নে
হেরি মন-প্রাণ জুড়াই রে !

অমনি তিনি পরম স্নেহে টুকে রেখেছেন তাঁর অন্তর্যামী করুণার দৈনন্দিন পঞ্জিকায়। পরে যখনই বিপন্ন হয়েছি, মনে ভরসার আলো নিভে এসেছে, তিনি এসে হাত ধরেছেন, মনে পড়ে গেছে গীতায় তাঁর ভরসা :

নেহাভিক্রমনাশোস্তি প্রত্যবায়ো না বিদ্যতে
যাকে রবীন্দ্রনাথ রূপ দিয়েছিলেন তাঁর গীতাঞ্জলির অপূর্ব ভজনে—
জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা !

যে-ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে
যে-নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা

কিন্তু এ-বাণী য়ুরোপের নয়। য়ুরোপের বাণী—ইহলৌকিকতা, কর্মে আসক্তি, উৎসাহে অনুরাগ, অশঙ্ক পরীক্ষা। এ-বাণী অসার বলি না—কেমন ক'রে বলব যখন ঋষি-গুরুর জ্ঞানদীক্ষায় জেনেছি যে, জগতে যাই ঘটুক না কেন, তাঁর পরম উদ্দেশ্যের দিকে মোড় নেবেই নেবে একদিন না এক-দিন। এরি তো নাম প্রকৃত আস্তিকতা—নাস্তিকতার ঘোর অনাচারও যাকে পারে না টলাতে। আমি অহমিকাবশে যত ভুল-ভ্রান্তিই ক'রে থাকি না কেন, বাসনার আলেয়াকে যতবারই সত্য বলে বরণ ক'রে থাকি না কেন, তিনি তো জানেন আমার ঠিকে-ভুল হয়েছে কোন্ মোহের মায়ায়? আর এ-ও তো তিনি জানেন যে, আমার বাইরের মন যতই কেন না য়ুরোপের ঝিকিমিকি লাবণ্যে ভুলুক আমার অন্তরাত্মা আশৈশব চেয়েছে ভাগবত জীবন। এই আন্তর ঐকান্তিকতারই আমি কাব্য-রূপ দিয়েছিলাম পনরো বৎসর পরে শ্রীঅরবিন্দের কাছে দীক্ষা পেয়ে। লিখেছিলাম আমার জীবনের একটি গভীর অঙ্গীকার "চেতনার রূপান্তর"-এ। তা থেকে কয়েকটি চরণ এখানে উদ্ধৃত করলে হয়ত আরো পরিষ্কার হবে আমার বক্তব্য :

··········গর্বসাধে

খোয়াই মা তীর্থপথে যদি তব প্রসাদ-পাথেয়,
অন্ধতায় যদি শ্রেয়ে করি' প্রত্যাখ্যান বরি প্রেয়,
অপরাধ নিও না মা! আমি যদি পড়ি বার বার—
তুমি থেকো হাত ধ'রে সন্তানের, মুছায়ো তাহার
ক্লান্ত অশ্রু নিরাশায়—যদি পথ প্রশ্নতমসায়
হারাই—নীলিমাদিশা অবহেলি' মৃগতৃষ্ণিকায়
করি মা বরণ—ধ্রুবতারা রেখো তোমার জ্বালায়ে,
ভ্রান্তির তুফানে তব অভ্রান্তির নিশান উড়ায়ে।
আমি যদি ভুলি ব্রত—তুমি মনে রেখো মা নিয়ত
শুধু বাহিরেরি অক্ষমতাবলে ভাঙি আমি ব্রত।

কোরো ক্ষমা জেনে—যদি তোমারে না সব ছেড়ে ডাকি
অন্তরমন্দিরে তবু অনিন্দ্য প্রতিমা তব জাগি'
বৈরাগী করেছে হৃদি। নিত্য নব বাসনায় বাঁধা
পড়ি পান্থ বিপথে হারায় পথ : তাই সুর সাধা
হ'য়েও হয় না কণ্ঠে।……তবু তুমি জানো মা জননী :
যত অভিমান, গ্লানি, অভিনয়, যশোজয়ধ্বনি
উদ্‌ভ্রান্ত করুক প্রাণ—এ-অন্তরে অন্তরযামিনী,
তুমি রাজো একেশ্বরী, জানি শুধু তোমারে তারিণী।

আমার "অনামী"-তে এ-দীর্ঘ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে দিয়ে কাব্যরস পরিবেষণ করতে পেরেছি কি না সেটা কাব্য-রসিকের বিচার্য, কিন্তু একথা বলতে পারি সত্যের অপলাপ না ক'রে যে, এর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে—আমার গভীর চেতনার একটি উজ্জ্বল এজাহার—যে জন্যে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে প্রায়ই বলতেন—তিনি নানা পত্রেই আমাকে লিখেছিলেন—যে আমি সব আগে ভাগবত সাধকই বটে—তাই নাস্তিক কাব্যে সঙ্গীতে সাহিত্যে সামাজিকতায় আমার অন্তরতম স্বরূপের পরমতম প্রকাশ হ'তেই পারে না—কাব্যে সাহিত্যে সঙ্গীতে যদি কোনো সহজাত প্রতিভা নিয়ে আমি এসেও থাকি, তাহ'লেও বলতেই হবে যে, ভগবান এ-সব শক্তি আমাকে দিয়েছিলেন আস্তিক সত্যকেই প্রকাশ করতে, ভগবৎনিরপেক্ষ শিল্পী কবি গায়ক হয়ে ফুটে উঠতে নয়। সঙ্গে সঙ্গে এই অঙ্গীকার আমি আজ করতে চাই যে, নানা নাস্তিক প্রভাবের জৌলুষে কখনো কখনো দিগ্‌ভ্রান্ত হ'লেও ঠাকুরের প্রসাদ আমাকে যেন জোর ক'রেই তাঁর পায়ে টেনে এনে জুগিয়ে এসেছে অফুরন্ত ভাগবতী প্রীতির পাথেয়, ভক্তির প্রেরণা, আন্তর উপলব্ধির সম্পদ। সে-বিচিত্র ইতিহাসের কথা হয়ত ফলিয়ে বলব কোনোদিন—যদি ঠাকুর দিন দেন—আমার যোগজীবনের কাহিনী পেশ ক'রে। এখন ফিরে আসি ঘটনার ঘটালোকে।

বার্লিনে এক বৎসর থেকে যখন স্থির করলাম মস্কো যাব না—য়ুরোপে ঘুরব আর একটু, ঠিক সেই সময়ে আবার মনের মধ্যে ঘনিয়ে এল অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে ডাক এলো ইণ্টারন্যাশনাল লীগ অব উইমেন ফর পিস অ্যাণ্ড ফ্রীডম থেকে। সুইজর্লণ্ডের ছবির মতন শহর লুগানোতে সপ্তাহকাল সভা বসবে, আমাকে সেখানে ভারতীয় রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হবে। নিমন্ত্রণ পেয়ে মন একটু আশ্বস্ত

হ'ল বৈ কি—আরো খবর পেয়ে যে সে সভায় বার্টরাণ্ড রাসেল, রোমাঁ রোলাঁ, জর্জ ডুহামেল, হারমান হেসে প্রমুখ মনীষীরা আসবেন। আমি ঠিক করলাম—লুগানো হয়ে ইতালি গিয়ে বৎসরখানেক ইতালিয়ান ভাষায় তথা গানে তালিম নেব।

বলেছি—এই সভাতেই আমার প্রথম দেখা হয় বার্টরাণ্ড রাসেলের সঙ্গে। তাঁর 'প্রবলেম অব চায়না' প'ড়ে আমি যখন মুগ্ধ হয়ে ভাবছি তাঁর উদার চীন-প্রীতির কথা, ঠিক সেই সময়েই আবার আমার হাতে এল তাঁর বিখ্যাত 'থিওরি অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস অব বলশেভিজম্' বইটি। এর আগে তাঁর 'রোডস্ টু ফ্রীডম্' প'ড়ে জেনেছিলাম যে, তিনি গিল্ড সোশ্যালিজমের পক্ষপাতী। বলশেভিজম্ সম্বন্ধে বইটি তিনি লেখেন রাশিয়া থেকে ফিরবার পরেই। এসম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে নানা কথা হয় কয়েক বৎসর পরে—কর্নওয়ালে—যে কথা "তীর্থংকরে" লিখেছি। তাই এখানে এই বইটির কথাই বলি।

রাসেলের একটি যুক্তি আমার কাছে সর্বতোভাবে গ্রহণীয় মনে হয়: যে, রাষ্ট্র একটা মহামহিম সর্বপ্রণম্য সত্তা নয়, রাষ্ট্র হ'ল অনেকগুলি মানুষের সমষ্টি; এই সমষ্টির সার্থকতার নিকষ হবে তার প্রতি মানুষের সুখ-শান্তি; কাজেই যে-রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ব্যষ্টির স্বাধীন চিন্তাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে সে ব্যবস্থায় শুধু যে ব্যষ্টির দুঃখ তাই নয়—সমষ্টিরও সর্বনাশ।

রাসেলের এ-মতের আজ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন হয়নি, আমার মনও শ্রীঅরবিন্দের কাছে গিয়ে অবধি আরো নিঃসংশয় হয়েছে এ-যুক্তিবাদের সত্যতা সম্বন্ধে। কারণ শ্রীঅরবিন্দও তাঁর নানা গ্রন্থে বলেছেন যে, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, অসহিষ্ণুতা মানুষকে যে-পথে চালাতে চায় সে-পথে মানুষের মুক্তি নৈব নৈব চ, এবং ব্যষ্টির মূলোচ্ছেদ ক'রে সমষ্টির হিতসাধন করার নাম আলেয়া-বিলাস, আকাশকুসুম—গোড়া কেটে আগায় জল।

এর পরেই আমার রাসেলের সঙ্গে দেখা হয় লুগানোতে। তাঁর দীপ্ত ব্যক্তিরূপ ও গভীর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে আমি তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলি—বিশেষ ক'রে বলশেভিজম্ সম্বন্ধে। তিনি নানা অকাট্য যুক্তি দিয়ে আমার সংশয় দূর করেন: তার সারমর্ম এই যে, প্রীতির মন্ত্রে মানুষ সহজে সাড়া দিতে পারে না ব'লেই বিদ্বেষ-মন্ত্রের দীক্ষা-দাতাদের জয়জয়কার রাতারাতি বিশ্বব্যাপী হয়ে ওঠে, (যথা মার্ক্স, হিটলার, স্টালিন, লেনিন)। একথা তিনি পরে লেখেন তাঁর 'পোর্ট্রেটস ফ্রম মেমারি' বইটিতে (৩৮ পৃঃ):

"All such fanaticisms have in a greater or less degree the defect which I found in the Moscow Marxists, namely, that their dynamic power is largely due to hate." তিনি আরো আমাকে বলেন যে মার্কস্ ফ্যানাটিক ছিলেন বলেই সত্যদ্রষ্টা হতে পারেন নি, তাই ধরতে পারেন নি যে, শুধু অর্থনৈতিক শক্তিরাই (ইকনমিক ফোর্সেস) ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করে না—যে-কথা তাঁর পরে বিশ্ববিশ্রুত মনীষী টয়েনবি ও সোরোকিন আরো বিশদ করে বুঝিয়েছেন তাঁদের গভীরতর ভাষ্যের আলোয়।

এ নিয়ে অশ্রান্ত তর্ক চালানো যায়—(কোন্ প্রতিপাদ্যকে নিয়ে না যায় ?)—চালাচ্ছেও মানুষ যন্ত্রসভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের দিন থেকে। এ-সম্পর্কে নতুন কোন কথা বলবার স্পর্ধাও আমার নেই—আমি শুধু একটি কথা ব'লেই এ-প্রসঙ্গের ইতি করব—যে-কথা বস্তুতান্ত্রিক অগভীর-দর্শীদের মুখে বড় একটা শোনা না গেলেও তত্ত্বদর্শীরা তাঁদের নিজের জীবনে সত্য ব'লে উপলব্ধি করে এসেছেন সভ্যতার আদি যুগ থেকে। কথাটা এই যে, যেহেতু প্রেমই ভগবানের আনন্দময় সত্তার পরম প্রকাশ, সেহেতু মানুষ যতদিন প্রেমকে বরণ করতে না শিখে শুধু হিংসানিষ্ঠ গোয়েন্দা ও শক্তিমদমত্ত অন্ধদের সহায়তায় স্বর্গ-রাজ্যের পত্তন করতে ছুটবে, ততদিন তার বিশ্বমৈত্রী সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে না, হতে পারে না। তবে একথা আমি য়ুরোপে আমার প্রথম যৌবনে ঠিক বুঝবার কিনারায় আসি নি, কেননা সে-সময়ে য়ুরোপের অসহিষ্ণু প্রাণশক্তির দুর্নিবার মায়ামোহে প'ড়ে আমি ভারতের চিরন্তন অধ্যাত্মবাদকে আমার মন থেকে খানিকটা দূরে সরিয়ে দিয়েছিলামই বলব। তাই ভুলে গিয়েছিলাম স্বামীজির মুখে ভারতের আত্মার সনাতন বাণী : "যদি জগতে এমন কোন দেশ থাকে, যাকে বলা যেতে পারে পুণ্যভূমি—তবে তার নাম ভারত……শুধু এখানকার প্রাণদায়ক পূতসলিলেই জগতের অন্য সব দেশের লক্ষ লক্ষ বস্তুবাদীর অন্তরের তপ্ত তৃষা মিটাতে পারে।" (স্বামীজির কলম্বোয় বক্তৃতা)

কিন্তু যে-সত্য একবার আমাদের অন্তরে জেগে উঠেছে তাকে আর ঘুম পাড়ানো যায় না—তাই য়ুরোপ থেকে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের মাটিতে ফিরতে নতুন ক'রে-জাগা বৈরাগ্যের অঞ্জনে দেখতে পেলাম মুক্তিনাথের হারিয়ে-যাওয়া পদচিহ্ন, শুনতে পেলাম তাঁর ডুবে-যাওয়া বাঁশির ডাক—সঙ্গে সঙ্গে দেখা হল মহা-ঋষি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে—তাঁর শ্রীমুখে শুনলাম ফের চিরন্তনের বাণী : যে, বাইরের তোড়জোড় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ সাধনের পথে দেহের সুখ বা বিলাসের

ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু মেলে না আত্মার শান্তি, ফোটে না শাশ্বত অমৃত সত্যের দিশা। সঙ্গে সঙ্গে মন ব'লে উঠল: এরি তো নাম ঋষি—তাঁর কবিতার মধ্যে নতুন করে শুনলাম উপনিষদের মন্ত্রস্পন্দন:

মানব সমূর্ধ্বে ধায় করি' দিব্য পর্ণ বিধূনন,
তাই তার মন দোলে সুগভীর অতৃপ্তি-দোলায়,
চিরন্তনের সে যে আনন্দদুলাল—তাই চায়
মর উপাদান ল'য়ে বিরচিতে অমর নন্দন।
উজ্জ্বলিতে ম্লান দেহ বর্ধমান আত্মার প্রভায়
ঝংকারিতে শ্রমক্লান্ত ধরণীতে স্বর্গের আহ্বান,
লভিতে অমৃতজন্ম মৃত্যু হ'তে করিয়া ব্যুত্থান,
হ'য়ে অনুস্যূত এক শাশ্বত ইচ্ছার সাধনায়।

শ্রীঅরবিন্দের In the Moonlight কবিতার শেষ দু'টি স্তবকের এ-অনুবাদ ক'রে সে-সময়ে যখন আমার মন ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভরপুর, ঠিক সেই সময়েই আমি পাই ওলগার একটি চিঠি ও ফটো, তার পিতা পল বিরুকভের সঙ্গে তোলা। আমি উত্তরে লিখি যে, আমিও মনে মনে শ্রীঅরবিন্দকে গুরুবরণ করেছি। তাঁর এ-কবিতাটি আমি টাইপ করে ওলগাকে মস্কোতে পাঠিয়েছিলাম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যে আমার জীবনের এক পরম দুর্লগ্নে সে এসেছিল আমাকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে—টলস্টয়কে গুরুবরণ করে আমাকে ফের মনে করিয়ে দিয়েছিল যে, আমিও স্বভাবে ভগবৎপ্রসাদার্থী গুরুবাদী—নাস্তিক রাষ্ট্রবিপ্লবী নই। সে আমাকে উত্তরে লিখেছিল—মাত্র কয়েকটি লাইন:

"তোমাকে দেখেই আমি চিনেছিলাম যে, তুমি নাস্তিক সমাজ-সংস্কারের পথে গেলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে; তাই তো তোমাকে এত ক'রে মানা করেছিলাম নাস্তিকদের সঙ্গে মিশতে। যারা ভগবানকে পোঁছে না, তারা চলুক তাদের নিজের পথে, আমরা যেন চলি আমাদের নিজের আত্মার নির্দিষ্ট পথে—হিংসার সঙ্গে, মিথ্যার সঙ্গে অসহযোগ ক'রে, মানবপ্রীতিকে, ভগবৎবিশ্বাসকে সর্বতোভাবে বরণ ক'রে।"

আজ ওলগা কোথায় আছে জানি না। তবে যেখানেই থাকুক না কেন, সে আমার কাছে চিরদিনই অবিস্মরণীয়া থাকবে।

শেষে বলি, আর একটিবার মাত্র তার খবর পেয়েছিলাম—বিচিত্রভাবে। আমার এক বন্ধু ছিলেন তাঁর পুরো নামটি মনে পড়ছে না। তিনি মহৎ মানুষ,

শ্রমিকদের জন্যে নানা আন্দোলন করে কয়েকবার জেলেও যান। একবার তিনি মস্কোতে গিয়েছিলেন—সে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা—সেখানে তাঁর দেখা হয় ওলগার সঙ্গে। কোথায় মনে নেই—সম্ভবতঃ টলস্টয় ম্যুজিয়মেই হবে। ওলগার পিতৃদেব সেখানকার কিউরেটার ছিলেন—ওলগাও বুঝি সেখানেই কাজ করত—বলেছিলেন বন্ধু। তিনি ওলগার সঙ্গে আলাপ ক'রে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যও কম হন নি, ওলগার টেবিলে আমার ফটো দেখে। তিনি আজ কোথায় আছেন জানি না। তবে তিনি যদি এ-লেখা পড়েন তাহলে আশা করি খুশি হবেন ভেবে যে, তিনি এই নির্মলা ভক্তিমতীর বার্তাবহ হয়ে এসে আমার স্মৃতিচারণের উপাদান জুগিয়েছিলেন—যে-কথা তিনি ভুলে গেলেও আমি ভুলব না।

চব্বিশ

সবাই জানেন সুইজর্লণ্ডের রাষ্ট্রভাষা একটি নয়—তিনটি: ফরাসি, জর্মন ও ইতালিয়ান। ১৯২০ ও ১৯২১এ আমি সুইজর্লণ্ডে যাই ফরাসি ও জর্মন অঞ্চলে। ১৯২২শে প্রথম জয়যাত্রা ইতালিয়ান অঞ্চলে—রম্যনগরী লুগানোয়। বার্লিনে থাকতে আমি এক অসামান্যা মহিলার সংস্পর্শে আসি। তাঁর নাম ফ্রাউ কির্সিংগার—Frau Kirsinger। আধা জর্মন আধা ফরাসি। যুদ্ধের আগে ছিলেন ক্রোরপতি। যুদ্ধের পর দেউলিয়া: চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ বলে না? বিধবা যৌবনে ছিলেন অসামান্যা রূপসী প্লাস বিদুষী। রূপ তাঁর কাজে এসেছিল সুদিনে। দুর্দিনে তাঁকে ধারণ করল—তাঁর বুদ্ধি ও বিদ্যা। প্রথম যুদ্ধের পরে জর্মন মার্কের পতন তথা পতিবিয়োগের ফলে তিনি দেউলে হন। বার্লিনের বিখ্যাত চৌরঙ্গি কুরফুর্শস্তেন্দাম শ্‌ত্রাসে (Kurfurstendam Strasse) তাঁর ত্রিতল প্রাসাদের দুটি তল ভাড়া দিয়ে ত্রিতলে তিনি সালঁ পার্টি দিতেন—যেখানে আমি বার্লিনের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকা শিল্পী কবির সঙ্গে পরিচিত হই। তবে তাঁর কথা আমার 'ভাবি এক হয় আর'-এ বিশদ করেই লিখেছি ব'লে এখানে শুধু এইটুকু ব'লেই থামব যে, এই অভিজাত মহিলাটির মাধ্যমেই আমি সর্বপ্রথম কন্টিনেণ্টাল আভিজাত্য তথা মনীষার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় পাই। তিনি তেরটি ভাষা জানতেন—রুষ ভাষা নিয়ে। দেউলে হবার পরে এই অক্লান্তা বিদুষী আশি বৎসর বয়সে অনেকগুলি ছাত্রছাত্রীকে নানা ভাষায় তালিম দিতেন—জীবিকা উপার্জন করতে। পরে আমি

তাঁর সঙ্গে একত্র ছিলাম কয়েক মাস—তাঁর অতিথি হয়ে। আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন, বলতেন Urenkel কিনা প্রপৌত্র। তাঁর কাছে আমি দুটি ভাষায় তালিম নিতাম: জর্মন ও ইতালিয়ান। ইতালিয়ানে বিশেষ এগুতে পারি নি, কারণ হ'ল following the line of least resistance অর্থাৎ তাঁর ওখানে তাঁর সঙ্গে বেশি কথাবার্তা কইতাম জর্মন ও ফরাসি ভাষায়। যাই হোক কিছু তো শিখেছিলাম ইতালিয়ান—তাতেই কাজ চলে গেল লুগানোতে আরো এই জন্যে যে, সুইসরা তিনটি ভাষা নিয়ে স্বচ্ছন্দে ছিনিমিনি খেলা করে: জর্মন ফরাসি ইতালিয়ান এবং এছাড়াও অনেকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংরাজি শেখা শুরু করেন। কাজেই লুগানোতে এসে আমার মন যেন খুশির পাখা মেলল—নানা লোকের সঙ্গে নানা ভাষায় কথা ব'লে মনে হল—আমিই বা কে যে আর রাজা রামকৃষ্ণই বা কে? (আমার মাতামহের একটি প্রিয়োক্তি।) আনন্দে ঠিক করলাম এবার বেশ কিছুদিন ইতালিতে বসবাস ক'রে ইতালিয়ান ভাষাতেও পোক্ত হয়ে উঠতে হবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর। লুগানোতে আমার নিয়তি আমাকে ঠেলল ভাষাশেখার দিকে নয়, আন্তর্জাতিকতার দিকে। সেখানে এসেছিলেন আন্তর্জাতিকতার প্রখ্যাত উদ্যোক্তারা অনেকেই: রোলাঁ, রাসেল, হার্মান হেসে, পল বিরুকফ, কেসলার, জর্জ দু হামেল, রেভারেণ্ড হোমস আরো কত কত মনীষী, যাঁদের নাম ভুলে গেছি। এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই লেকচার দিতেন ও লুগানোর শান্তিসভার সদস্যেরা সাগ্রহে টুকে নিতেন নবিদের উপদেশ ও কবিদের বাণী। এঁদের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল রাসেলকে—উত্তর-জীবনে যাঁর আশীর্বাদ পেয়েছিলাম নানা সূত্রে। কিন্তু এখন লুগানোর কথা শেষ ক'রে আমার প্রথম প্রবাস জীবনের অন্তিমপর্বে আসি। প্রথম বলছি এইজন্যে যে, এর পরে আরো দু দুবার আমি সাগর পেরিয়ে ভ্রাম্যমাণ হই।

সুইজর্লণ্ড দেশটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। য়ুরোপে যতগুলি ছোট ছোট স্বাধীন দেশ আছে, তাদের মধ্যে এদেশটির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আরো লক্ষ্যণীয়: কিনা এর আন্তর্জাতিকতা। বলেছি, সুইজর্লণ্ডের রাষ্ট্রভাষা তিনটি: ফরাসি, জর্মন ও ইতালিয়ান। সুতরাং প্রতি সুইসকে এ-তিনটি ভাষাই শিখতে হয়। ফলে এদেশের নাগরিকদের মনে আবাল্য আন্তর্জাতিকতার দিকে একটি সহজ প্রবণতা গ'ড়ে ওঠে ও তাঁদের মন উত্তরোত্তর উদার সহিষ্ণুতার দিকেই ঝোঁকে, আরো এই জন্যে যে নানা দেশের বিপ্লবীরা স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে এদেশে

আশ্রয় পান। সবাই জানেন, লেনিন তাঁর বলশেভিসমের প্রচার শুরু করেন এই দেশেই। কিন্তু ইতিহাস থাক, বলি যা বলবার জন্যে এত ভনিতা।

বার্লিনে সে সময়ে জর্মনদের "মরমে গুমরি মরিছে দাহনা শত"। হিটলারের অভ্যুদয় হয়নি বটে, কিন্তু ভার্সাই সন্ধির প্রতি ব্যাপক আক্রোশবশে হবু নাজিরা চাপা স্বরে গুণগান শুরু করেছে "নর্ডিক" আর্যজাতির যাদের নামকরণ করা হয়েছে Herrenvolk, কি না নায়ক জাতি। অর্থাৎ জর্মনরাই হল স্বধর্মে প্রভু নেশন, আর সব নেশন স্বধর্মে দাসই বটে। ফিখতে, নীটশে, হেগেল বর্গীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিই শনৈঃ শনৈঃ ওদের এ-সব মনোভাব গড়ে তুলেছিল। জর্মনিতে সে-সময়ে নিত্যই ছেলেমেয়েরা সঘনে গাইত ওদের জাতীয় সংগীত Deutschland ueber alles—জর্মনিই সবার উপরে।

এহেন আবহে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম ব'লেই আরো বেশি ঝুঁকেছিলাম রুশ বন্ধুবান্ধবীর দিকে—যদিও নাস্তিক্যের এ-বিপথকে স্বপথ ব'লে ভুল ক'রে গিয়ে যে-দ-য়ে মজতে ঝুঁকেছিলাম তা থেকে ওলগা আমাকে কীভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছিল সেকথা আগের অধ্যায়ে বলেছি।

লুগানোর মহামানবের সাগরতীরে না হোক সুন্দরের শ্রীক্ষেত্রে দেখা মিলল নানা জাতির নরনারীর সঙ্গে। শুধু দেখা নয়—দেখতে দেখতে তাঁরা আমাকে বরণ করে নিলেন হিন্দু সঙ্গীত তথা ভাবধারার অন্যতম প্রতিনিধিরূপে। আর একটি প্রতিনিধি ছিলেন আমার উদার বন্ধু ডাক্তার কালিদাস নাগ। আমরা দুজনেই লুগানোতে রাতারাতি সর্বপ্রিয় হয়ে উঠলাম। আমাকে নানা প্রদেশের অধিবাসীরা নিমন্ত্রণ করল—ভারতের সঙ্গীত ও ভাবধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে। অথ, আমাকে গান শেখা ছেড়ে দশচক্রে প'ড়ে ফের হতে হল ভ্রাম্যমাণ এবং এবার শুধু ভ্রাম্যমাণ দর্শক নয়—তার উপর বাগ্মী ভাষ্যকার। আমি ভিয়েনা, প্রাগ, বুদাপেস্ত প্রভৃতি নানা শহরে শুরু করলাম ভারতের মহিমা প্রচার করতে—গায়ক হয়ে দাঁড়াল বক্তা। এ-সূত্রে একটা লাভ হ'ল এই যে, আমি য়ুরোপের বিশাল রূপটিকে চিনবার সুযোগ পেলাম, শুধু ইংলণ্ডকে জানাই যে যথেষ্ট নয়, এই সত্যের পরিচয় পেলাম ইংলণ্ড থেকে খানিকটা দূরে এসে তবে।

নানা জায়গায় বক্তৃতা ও গান ক'রে বিদেশীদের মনে কতখানি জ্ঞান বিতরণ করেছিলাম বলতে পারিনে, কিন্তু একথা বলতে পারি যে, নিজে অনেক সম্পদ আহরণ করেছিলাম তাদের প্রীতির আলোয় তথা দরদের রসধারায়। আমার

প্রবাস জীবনের এই শেষ অধ্যায়ে য়ুরোপ আমার কাছে আর ভৌগোলিক তথ্য রইল না, হ'য়ে উঠল জীবন্ত সত্য। অতুলপ্রসাদের গানের ভাষায় :

আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে
বিশ্বঘরে পেতাম না ঠাঁই
স্বজন যদি হ'ত আপন
হ'ত না তো আপন সবাই।

কিন্তু উচ্ছ্বাস রেখে বলি আগে—বিশ্ব-ঘরে ঠাঁই পাওয়ার ফলে পর কী ভাবে আমার আপন হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের বাণী আমার মনে ছিল : বিদেশে কাঁদুনি গাওয়ার মতন প্রমাদ আর নেই। তাই আমি সদাসর্বদা সজাগভাবেই চেষ্টা করতাম বিদেশী ও বিদেশিনীর কাছে ভারতের সেইসব ঐশ্বর্যের কথা বলতে যা ওদের নেই—বিশেষ ক'রে আমাদের গান, সংস্কৃত ভাষা ও ধর্ম। এদের মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে যখনই আলাপ করতাম, কি বক্তৃতা দিতাম বেশি ঝুঁকতাম রাগ সঙ্গীতের দিকে—শুধু এই জন্মেই নয় যে, এ-হেন কণ্ঠসঙ্গীত ওদের কাছে অভাবনীয়—এজন্মেও বটে যে, রাগালাপ মূলত কথানিরপেক্ষ। মানে, বাংলা বাউল কীর্তন কি আধুনিক গান, হিন্দি ভজন কি উর্দু গজলের রস-গ্রহণ করতে হলে বাংলা হিন্দি উর্দু জানতে হয় তো—কাজেই এসব গান সম্বন্ধে ওদের বোঝাতে বেশি বেগ পেতে হ'ত—কাঁহাতক এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় অনুবাদ করা যায় গলদ্‌ঘর্ম হয়ে—কখনো জর্মনে কখনো ফরাসিতে! কিন্তু রাগ সঙ্গীতে স্বরগ্রাম পাখা মেলে চলেছে ভাষানিরপেক্ষ সুরবিহারের অবাধ অন্তরীক্ষে। ওরা সহজেই সাড়া দিত অবিমিশ্র সুরের আবেদনে, আমিও বেঁচে যেতাম ভাবের অনুবাদ করার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে।

আমার আলাপের দ্বিতীয় উপজীব্য ছিল সংস্কৃত ভাষা। ওদের কাছে আমি কতবার যে আমার আবেগ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সঘনে সংস্কৃতের নানা ছন্দ আবৃত্তি ক'রে আনন্দ পেয়েছি ও বিতরণ করেছি, তা বলতে পারি না। এ যে পারতাম তার একটি কারণ শৈশবেই পিতৃদেবের কাছে সংস্কৃত উচ্চারণে আমার হাতেখড়ি হয়েছিল। তার উপর জর্মনিতে কণ্ঠসাধনা ক'রে আমার কণ্ঠ এত সুডৌল হ'য়ে ওঠে যে ওরা আমার শুধু গানে নয়, আবৃত্তিতেও সাড়া দিত সানন্দেই। যাঁরা আমার 'বাল্যস্মৃতি' পড়েছেন তাঁরা খবর পেয়েছেন যে ভাষা-জগতে আমি 'জন্মভূমি গরীয়সী' ব'লে মনে করি এই দেবভাষাকেই। তার মানে নয় যে বাংলা ভাষা আমার তেমন

প্রিয় নয়। প্রথম শ্বাসের সঙ্গে যে-ভাষার স্মৃতি-বিজড়িত তার প্রাণদা বলদা শক্তিকে কে না সাদরে বরণ করবে? আমার বলবার কথা এই যে, আমার বালক হৃদয়ের 'প্রথম প্রেম—first love—ঘরোয়া বাংলা নয়, রোমান্টিক সংস্কৃত ভাষা। আমি স্বভাবে সব ভাষারি গুণগ্রাহী হ'লেও সংস্কৃতের ওজসে কল্লোলে ও বৈচিত্র্যে আমার হৃদয় সবচেয়ে বেশি সহজে সাড়া দেয় আজো। সংস্কৃতের চেয়ে মহত্তর ভাষা যে মানুষ আজ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারেনি, আমার এ-বালবিশ্বাসের মূল আজো একটুও শিথিল হয়নি। তাই যখন আধুনিক উন্মুখর নওজোয়ান ও সর্বজ্ঞ প্রগতি-পন্থীদের মুখে শুনি যে, এ-যুগে সংস্কৃত চর্চা পণ্ডশ্রম, মোক্ষলাভ হয় কেবল বিজ্ঞান-পূজায়—তখন মনের মধ্যে আমার গভীর বিষাদ ঘনিয়ে আসে। কারণ আমি ভারতের গভীর ভাবধারাকে সংস্কৃতের উৎসজ্যোতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার কথা ভাবতেও পারি না। কিছুতেই মনে করতে পারি না যে, আস্তিক আত্মবোধের নিত্যগোমুখী এই দেবভাষার সঙ্গে আমাদের যে নাড়ীর যোগ তাকে বিজ্ঞানের যুক্তি খড়্গে এক কোপে কাটলেই ভারত আধুনিকতার মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্রে পুনরুজ্জীবিত হবে। কিন্তু যা বলছিলাম।

আমার প্রথম য়ুরোপ প্রবাসের এই শেষাধ্যায়ে আমি বিদেশে যেন সংস্কৃত ভাষার মহিমা আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলাম বিদেশীর কাছে দেবভাষার নানা উদাত্ত ভাব ছন্দের রসে রসায়িত ক'রে পরিবেষণ করতে করতে—বিশেষ ক'রে তোটক, উপজাতি, বসন্ততিলক ও অনুষ্টুপের প্রসাদে। সঙ্গে সঙ্গে গাইতাম জয়দেবের সুললিত মাত্রাবৃত্ত, শংকরাচার্যের কল্লোলিত ভুজঙ্গপ্রয়াত, কালিদাসের মঞ্জুল মন্দাক্রান্তা, ভবভূতির শিখরিণী ও চণ্ডীর স্রগ্ধরা—'কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং...........' ইত্যাদি।

এছাড়া গল্পগুজবও চালাতাম বৈ কি—বলতাম মহাভারতের কথা, পঞ্চতন্ত্রের কথা, কালিদাসের কথা, ভবভূতির কথা—সর্বোপরি গীতার কথা। (রামায়ণ আমার কোনোদিনই মন টানেনি শুধু সীতা ও হনুমানের চরিত্র ছাড়া)।

গীতার প্রসঙ্গ এল ভালোই হ'ল। কেননা বলেছি—ওদের সঙ্গে আমি ধর্ম নিয়েই সবচেয়ে বেশি আলোচনা করতাম—গান বা ভাষা নিয়ে আলাপ কতক্ষণ চলে? গীতার বহু শ্লোক আমার কণ্ঠস্থ ছিল, কাজেই কৃষ্ণময় গীতাবাদের কথা মনের মতন করে গুছিয়ে বলা আমার পক্ষে কঠিন ছিল না। আমি বলছি না কিন্তু যে, ধর্ম সম্বন্ধে যা যা বলতাম ঠিকই বলতাম। নিশ্চয়ই বহু ভুলচুক হ'ত।

কিন্তু তাতে কী? ওরা আমার কাছে পেত তো আমার ভ্রান্তিবিলাস নয়—আমার আনন্দ উৎসাহের ছোঁয়াচে ধর্মেরই আনন্দ উৎসাহ। এ-অভিজ্ঞতা আমার বহুবারই হয়েছে যে, অপরকে আমরা শুধু যে প্রেমের চেয়ে বড় কোনো দান দিতে পারি না তাই নয়, আমাদের কথালাপের মধ্যে দিয়েও শুধু সেই আলাপেই তাদের মনের পরশ পেতে পারি, যে-আলাপে আমাদের মন সবচেয়ে রসিয়ে ওঠে উচ্ছ্বাসে আবেগে। তাই জন্মেই পুঁজি কম হওয়ার দরুণ আমাকে হাত খাটো করতে হ'ত না—উৎসাহের জাদু জোগাত অফুরন্ত আনন্দের উচ্ছলতা আর আমি নিরঙ্কুশ ব'লে চলতাম ভারতের রাগ-সঙ্গীতের অপরূপ বৈশিষ্ট্যের কথা, সংস্কৃতের অসামান্য গৌরবের কথা, সর্বোপরি ভারতের ধর্মবাণীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিমার কথা—যে-মহিমার রসদ জোগাতেন প্রধানত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সংসদ।

সেই সময়ে একটি জিনিস লক্ষ্য ক'রে মন আমার প্রায়ই উল্লসিত হ'ত। ভারতের ধর্মজীবনের বাণীতে ওদের বহু জিজ্ঞাসু নরনারীরই মন উঠত দুলে—শুধু স্বামীজির শক্তিবাদেই নয়, পরমহংসদেবেরই ভক্তিভাবেও বটে। অনেকেই আমার কাছে বলতেন আক্ষেপ ক'রে যে, য়ুরোপে ধর্ম ও বিশ্বাস মরন্ত ব'লেই ভারতের কথা শুনতে তাঁদের এত ভালো লাগে যেখানে ধর্ম এখনো জীবন্ত। এমন আক্ষেপও অনেকের মুখে শুনতাম যে, আধুনিক য়ুরোপের আরাধ্য আত্মা নয়—মস্তিষ্ক, তাই য়ুরোপে সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠা করা এত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেন না মনোজগতে মানুষে মানুষে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। যদি আন্তর ধর্মকে বনেদ করা হত, তবে মিলের ইমারত গড়া ঢের বেশি সুসাধ্য হ'ত—বলতেন তাঁরা।

আমার মন এ-ধরনের কথা শুনে পুলকিত হ'ত আরো এই জন্মে যে, এ-সূত্রে আমি যেন হৃতগৌরব নিরন্ন ভারতের অপরাজেয় আত্মার নতুন ক'রে পরিচয় পেতাম —যে-ভারত শত শত বৎসর পরাধীনতার গ্লানিভারে মুহ্যমান হওয়া সত্ত্বেও আজো জন্ম দিতে পারে এমন সব ধর্মাত্মা মহাপুরুষের—যাঁদের কাছাকাছি মহাত্মারও দেখা মেলে না পাশ্চাত্যের ইহসর্বস্ব, বস্তুবাদী আবহে। ওরা বলত: 'আমাদের শেষ ধর্মগুরু টলস্টয়—আর তিনিও আজ য়ুরোপে অনাদৃত। য়ুরোপের উপাস্য এখন তিন শ্রেণীর মানুষ: বড় শিল্পী, বড় বৈজ্ঞানিক ও বড় রাষ্ট্রপতি। আর এ-ত্রিমূর্তিই সর্বান্তঃকরণে ইহসর্বস্বতার বাণীবাহ তথা পারমার্থিকতার পরিপন্থী…ইত্যাদি।

উত্তরজীবনে যখন শ্রীঅরবিন্দের কাছে দৃষ্টিদীক্ষা লাভ করি, তখন বারবার মনে পড়ত এইসব য়ুরোপীয় বন্ধুবান্ধবীর কথা, যাঁরা ১৯২২ সালেই প্রায় নিরাশায়

অথৈ আঁধারে পড়েছিলেন—আজ তো সে-নিরাশা প্রায় হতাশায় দাঁড়িয়েছে। হতাশা কেন? বলি দৃষ্টান্ত দিয়ে।

লুসানোতে আমার গভীর বন্ধুত্ব হয় একটি বিচিত্র দম্পতীর সঙ্গে—ভ্লাদিয়া ও মার্থা। স্বামী চেক, স্ত্রী ফরাসি। স্বামী মধ্যবিত্ত, স্ত্রী অভিজাত—কাউণ্টেসের দুহিতা। স্বামী আদর্শবাদী, স্ত্রী চিন্তাশীলা। এ'দের জীবন এত বিচিত্র যে, খুলে বলতে গেলে টাল সামলানো শক্ত হ'বে। তাই যথাসম্ভব সংক্ষেপেই বলতে হবে।

ভ্লাদিয়া ছিল আবাল্য আদর্শবাদী—সাহসী। গত যুদ্ধে ও জর্মনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে বন্দী হয়ে মরতে মরতে বেঁচে যায়। সে অনেক কাহিনী। যুদ্ধের পরে চেকরা স্বাধীন হলে ভ্লাদিয়া বড় রাজপদ পায়। লেখার হাত ছিল—উপন্যাস লিখে নামও করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফের জর্মনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে বন্দী হয়। ফরাসি অভিজাত বিদুষীকে ঘরনী ক'রে ওর গৌরবের সীমা ছিল না। পরস্পরকে ওরা গভীরভাবেই ভালোবেসেছিল। মার্থা ভ্লাদিয়ার জন্যে বিলাসবৈভব ছেড়ে আসে এককথায়।

আমি প্রাগে ওদের অতিথি হয়ে সেখানে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিসে বিদ্বৎসমাজে যশস্বী হয়ে উঠি এবং বহু বন্ধুবান্ধবী লাভ করি, যাদের মধ্যে খ্যাতনামা ওরিয়েণ্টালিস্ট লেসনি (Lesny) ও উইণ্টারনিস (Winternizt) এর নাম করতে পারি অসঙ্কোচে —কারণ এঁরা দুজনেই আমাকে স্নেহ করেছিলেন। কিন্তু সে অন্য কথা।

পরে ভ্লাদিয়ার পদোন্নতি হওয়ার ফলে ও প্যারিসে আসে চেক কনসাল হয়ে। সেখানে আমি ফের ওদের অতিথি হই ১৯২৭ সালে—আমার দ্বিতীয় বিদেশ অভিযানে। ১৯২২শে ওদের সঙ্গে পরমানন্দে কাটাই য়ুরোপে ভ্রাম্যমাণ হয়ে। কথা ব'লে এত সুখ আমি জীবনে বড় বেশি পাইনি, আর এ-সুখের প্রধান কারণ—ওদের সঙ্গে আমার সবচেয়ে বেশি আলাপ আলোচনা হ'ত ভারতের ধর্ম ও মহাপুরুষদের নিয়ে। মার্থা ও ভ্লাদিয়া ধার্মিক বলতে যা বোঝায় তা ছিল না বটে, কিন্তু ধর্মে সত্যিই শ্রদ্ধাবান্ ছিল। ভ্লাদিয়ার সঙ্গে মার্থার তফাৎ ছিল প্রধানত এইখানে যে, ভ্লাদিয়া ছিল স্বভাবে বিশ্বাসী, মার্থা সংশয়ী। সংশয়ী—কিন্তু অবিশ্বাসী নয়। আমাকে ও প্রায়ই শোনাত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইবেলে খৃস্টের বাণী—ফরাসি ভাষায়। একে খৃস্টের বাণী তার উপরে কমনীয়া মার্থার রমণীয় উদাহরণ—কী ভালো যে আমার লাগত! ওলগার কাছে বাইবেলের প্রথম পাঠ নিয়ে আমার লাভ হয়েছিল কম নয়—কারণ আমি বাইবেলের নানা প্রসঙ্গে মার্থার সঙ্গে আলোচনা চালাতে পারতাম

সমান তালে। কিন্তু বাইবেল আমার ভালো লাগলেও আমার কাছে বেদবাক্য ছিল কৃষ্ণের গীতা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত। তাই আমিই বেশি বলতাম, শুনতাম কম, ওরা শুনত বেশি, বলত কম। হয়ত এর একটা কারণ—ওরা বুঝতে পেরেছিল যে, ভারতে ধর্ম নিয়ে চর্চা য়ুরোপের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে, তাই ধর্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যের ভারতের কাছ থেকে শোনবার আছে অনেক কিছুই। কারণ যাই হোক, ওদের সংস্পর্শে এসে আমি দেখতে দেখতে প্রায় বাগ্মী হ'য়ে উঠেছিলাম। ভ্লাদিমা মাঝে মাঝেই হেসে বলত, 'এই বয়সেই বক্তা, পরে না জানি কী দাঁড়াবে?' মার্থা মৃদু হেসে বলত :

"Je veux re´pondre pour Dilip :
me´nestrel plus messie."

অর্থাৎ আমি দিলীপের হয়ে বলছি, গায়ক তথা ধর্মপ্রচারক।' কিন্তু দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। তুলি আসল কথাটা।

বলেছি মার্থা বিশ্বাসী হ'লেও সংশয়কে শুভ ব'লেই মানত। তাই গীতার 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' কথায় ঘোর আপত্তি করত। বলত প্রায়ই যে সংশয়ের মধ্যে দিয়ে যে যায়নি, তার বিশ্বাস পাকাই হয়নি। ভ্লাদিমা আপত্তি ক'রে বলত, 'যাও যাও। সংশয় সর্বনেশে—বিশ্বাসেই মুক্তি—খৃস্টও কি বলেননি একথা? বলেননি—বিশ্বাসে পাহাড় টলানো যায়—জলে হাঁটা যায়?' মার্থা রাগ ক'রে বলত : 'রেখে দাও। খৃস্টের মুখে যে-বাণী প্রাণ জাগায়, তোমার আমার মুখে তা লোক হাসায়, মনে রেখো। তাছাড়া সে-যুগে যা সত্য ছিল, এ-যুগে তা অসত্য হ'তেও তো পারে।' এতে আমি টুকতাম এই ব'লে যে, সত্যের দুটো থাক আছে—আচারগত সত্য ও উপলব্ধিগম্য সত্য। প্রথমটার রকমফের হ'তে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়টা শাশ্বত। যেমন গীতার চতুর্বর্ণ—সে সময়ে ওটা সত্য ছিল, আজ আর নেই। কিন্তু কর্ম নিষ্কাম না হ'লে অশান্তি আসবেই আর 'অশান্তস্য কুতঃ সুখম' এ হ'ল শাশ্বত সত্য।" এই ধরনের সোৎসাহ কথা কাটাকাটি চলত আমাদের মধ্যে প্রায়ই। সে-আনন্দ কি ভুলবার—সখ্যের রাগে ধর্মের তান? কিন্তু এবার বলি য়ুরোপের নিরাশার কথা—যে জন্যে ওদের প্রসঙ্গ পাড়া।

মার্থা শিশুকালে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওর খৃস্টে বিশ্বাস না কমলেও ধর্ম সম্বন্ধে সংশয় আসে একটু একটু ক'রে। এর জন্যে ওর মনঃকষ্টের অবধি ছিল না, বলত আমাকে প্রায়ই : 'সময়ে সময়ে আমার মনে হয় দিলীপ যে ভ্লাদিমা

ভুল বলেনি—সংশয়কে প্রশ্রয় দিয়ে আমার যেন খুঁটি হারিয়ে যাবার জো হয়েছে। অথচ ওর মতন অতিবিশ্বাসী হ'তেও যে বাধে—করি কী?" এর উত্তরে আমি ওকে বিশ্বাসের স্বপক্ষে কিছু বলতে গেলেই ও করুণ ভাবে মাথা নেড়ে বলত যে, এসব কথায় ওর প্রাণ আর সাড়া দেয় না—বিশেষ ক'রে গত যুদ্ধের পর থেকে। বলত প্রায়ই—মনে আছে: 'আমরা ছেলেবেলায় ভাবতাম যুদ্ধবিগ্রহের দিন গত, * মানুষ আজ পুরোপুরি সভ্য না হ'লেও এতটা বুদ্ধি ধরে যে গায়ের জোর জাহির করতে লজ্জা পায়। কিন্তু আজ? যুদ্ধে শুধু যে লক্ষ লক্ষ লোক হতাহত হয়েছে তাই নয়, তার চতুর্গুণ লোক ভগবানেও বিশ্বাস হারিয়ে নাস্তিক্যের ঝাণ্ডা-ওড়ানো শুরু করেছে! তাই খৃস্ট দেবকল্প মহাপুরুষ ছিলেন মেনেও তাঁর বিশ্বাস-বন্দনায় দোয়ার দিতে পারি না আর। এই যদি হয় একটি মহাযুদ্ধের পরিণাম, তাহ'লে কল্পনা করো—আগামী মহত্তর যুদ্ধের ফল কী দাঁড়াবে! আজ মানুষের মনুষ্যত্ব-বিশ্বাসেই যে আগুন ধরেছে। আমার মনে আজ কেবলই এই দারুণ প্রশ্নটি হানা দেয়, দিলীপ যে, মানুষে বিশ্বাস হারালে ভগবানে বিশ্বাস টিঁকবে কি? এরি মধ্যে দেখ—কী হয়েছে আমাদের মধ্যে। আমরা আমাদের ছেলেবেলায় তবু বাইবেলে বিশ্বাস করতাম, কিন্তু এ-যুগের মানুষের যেন সে-খুঁটিও নেই আর। অন্তত বাইবেলের দৃষ্টি যে অভ্রান্ত একথা ভাবুকদের মধ্যেও আজ বড় একটা কেউ মানেন না। তবে? আমাদের সন্তানদের আমরা কী শিক্ষা দেব শুনি? কী মূল বিশ্বাস নিয়ে বাঁচবে আজ তারা? খৃস্টদেবের একটি কথা আজও সমান সত্য আছে ব'লে আমার মনে হয়, যাকে তুমি বলছ চিরসত্য, সেটি এই যে মানুষ শুধু অন্নজীবী নয়, বাঁচতে হলে তার ধর্ম ও জ্ঞানও চাই। কিন্তু আমরা কি সত্যি আজ একথা বিশ্বাস করি? কই, তার তো কোনো প্রমাণ পাই না। কারণ চর্মচক্ষে যা দেখি তা এই যে, জাতীয় ঐহিক সুখ প্রতিষ্ঠার

---

* চার্চিলের আত্মজীবনী My Early Life ও Stepan Zweigএর "The World of Yesterday পড়লে দেখা যায়—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে য়ুরোপের মনীষীরা কী'ভাবে একবাক্যে বলা শুরু করেছিলেন যে জগতে কোনো বড়গোছের যুদ্ধ হবার দিন গত—কাজেই মানুষের প্রগতি অবশ্যম্ভাবী। ত্সোয়াইগ সাহেবের বইটির প্রথম অধ্যায় থেকে একটু উদ্ধৃত করি: "সে সময়ে আমরা ভাবতাম যে, যেমন ডাইনি ও ভূত থাকতেই পারে না তেমনি য়ুরোপের মানুষের এমন বর্বর অধোগতি হ'তেই পারে না যার ফলে মহাযুদ্ধ আবার বাধতে পারে। আমাদের পিতৃকল্প অবিভাবকদের মন এ-বিশ্বাসে জারিয়ে ছিল যে সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক প্রীতি সূত্রে মানুষে মানুষে মিলন অবশ্যম্ভাবী। তাঁরা ভাবতেন সব জাতি ও বর্ণের মধ্যে ভেদ-সীমা ঘুচে গেল ব'লে, শান্তি ও নিরাপত্তা এলো ব'লে যার ফল উপভোগ করবে বিশ্বমানব।"........ হায়রে, আশা কুহকিনী!

জন্যে আমরা নরমেধ যজ্ঞ ক'রে সব সুখ শান্তিকে বিদায় দিতেও রাজি। অথচ মুখে বলি, আমরা একেশ্বরবাদী আলোকপন্থী, অন্য সব জাত পৌত্তলিক, কুসংস্কারে ভরা।' ব'লে হেসে বলত 'সাধে কি রাসেল সেদিন লুগানোতে বলেছিলেন ব্যঙ্গ ক'রে যে, বাইবেলের কেবল একটি অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করেন—শয়তান। আমাদের সত্যিই যে আজ শয়তান চালাচ্ছে—জর্মনি ফের সৈন্য ও শস্ত্র গ'ড়ে তুলছে—জানোই তো। বলছে—আগামী যুদ্ধে দেখিয়ে দেবে বড় কোন্ জাত—Herrenvolk."

পঁচিশ

মার্থা জর্মনির রণসজ্জা সম্বন্ধে ভুল বলেনি। ১৯২৭-এ যখন আমি দ্বিতীয়বার য়ুরোপে যাই তখনও দেখি, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সে ভয় ঢুকেছে—কবে কী হয়। কারণ তখনই ওরা খবর পেয়েছে—জর্মনী বহু সাবমেরিন তৈরি করছে। হিটলার "জর্মনি সবার বড় ও স্বভাবে জগদ্গুরু" মন্ত্র নিয়ে আসে এর কয়েক বৎসর পরেই। কিন্তু আমার মনের অবস্থা তখন বিচিত্র। সংসারে বৈরাগ্য ঠিক আসেনি অথচ য়ুরোপের উচ্ছল আমোদ-প্রমোদও কেমন যেন অন্তঃসারশূন্য মনে হয়। আমেরিকায় আমার নিমন্ত্রণ এসেছিল এডিসনের নবতন গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে। সে-সময়ে ভারতে আমার খুবই নামডাক, এডিসন কোম্পানির লোক বললে—ওরা চায় নানা বড় রেকর্ড করতে, ভরসা দিল প্রচুর দক্ষিণা পাব। কলকাতা থেকে আমার বন্ধুবান্ধব মহোল্লাসে মীটিং করে পুস্তিকায় নানা কবির প্রশস্তি ছাপিয়ে আমাকে বিলেতে পাঠায়। মীটিংয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বীরবল ও সুভাষ। য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের অনেক দোরই গেল ভেঙে—সে কী ভিড়! "রাঙা জবা—রাঙা জবা—গান"—কল্লোল উঠছে শ্রোতাদের মুখ থেকে।

কিন্তু হ'লে হবে কি, যশ পেয়ে দেখলাম যশে হৃদয়ের ফাঁক ভরে না। য়ুরোপে গিয়ে আরো শূন্য মনে হ'ল। ভাবলাম, এ-কোন্ আলেয়ার পিছনে ছুটেছি। যশ তো পেলাম—কিন্তু তাতে মন ভরল কই? টাকা? কী হবে টাকা নিয়ে?—আমার টাকার তো অভাব নেই। রাসেলের সঙ্গে কর্নওয়ালে দেখা ক'রে আলাপ করলাম চুটিয়ে। খুবই ভালো লাগল। কিন্তু ঐ তখনকার মতন। তারপরেই যে-তিমিরে সেই তিমিরে। রাসেলও আমেরিকা যাচ্ছিলেন, আমি তাঁরই জাহাজে প্রথম শ্রেণীতে বার্থ নিলাম। কিন্তু মহামতি রাসেলের সঙ্গে এক জাহাজে আমেরিকা

যাব ভাবতেও কই বুকের তার তো আর বেজে উঠল না! মনে ভারি ধিক্কার হ'ল— কী করছি আমি? স্বধর্ম ছেড়ে পরধর্ম বরণ?—কাঞ্চন ফেলে কাঁচের পিছনে ছোটবার উপমা মনে পড়ল। সে অনেক কাহিনী—বলব হয়ত একদিন—কিন্তু এখন না।

ঝোঁকালো মন তো—হঠাৎ কিছু দণ্ড দিয়ে জাহাজে নাম কাটিয়ে ফিরে এলাম আবার স্বদেশে। বছরখানেক পরে—১৯২৮-এ—শ্রীঅরবিন্দের চরণে আশ্রয় নিই। তারপর ঠিক পঁচিশ বৎসর বাদে গুরুদেবের দেহান্তের পর পণ্ডিচেরিতে আর তিষ্ঠুতে না পেরে আমেরিকা থেকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে সাত মাস বিশ্বভ্রমণ ক'রে দেশে ফিরে পুনায় মন্দির গড়ি। এবার (১৯৫৩ সালে) দেখলাম আমেরিকার প্রাণশক্তি যার কাছে য়ুরোপের প্রাণশক্তিও হার মেনেছে। কিন্তু দেখলাম না শান্তি, বিশ্বাস—সর্বোপরি ধর্মের কোন চিহ্ন। মার্থার কথা মনে হ'ত প্রায়ই আমেরিকায়ঃ "যেদিকে চলেছি আমরা থামব কোথায়—কোন্ অবিশ্বাসের ঘোর রসাতলে?"

সে অত্যুক্তি করে নি। কারণ আমেরিকায় যাই থাকুক না কেন, ধর্মের মহত্তম বিকাশে বিশ্বাস কোটিতে গোটিকেরও আছে কিনা বলা কঠিন! ধর্ম বলতে ওরা বোঝে ভগবানকে সেলাম ঠুকে ভোগের স্বৈরাচারে গা ভাসিয়ে চলা। পড়ছিলাম সেদিন একটি প্রবন্ধে ওদের বিলি গ্রেহাম নামে এক ডাকসাইটে ধর্মযাজকের কীর্তিকলাপ। এ মহান্ ধর্মধ্বজ কোথায় কবে রেডিওতে বাইবেলের ভাষণ দিয়েছেন আর কত লক্ষ লোক শুনেছে তারই বিবরণে প্রবন্ধটি ভরা। প্রবন্ধটির শেষে লেখক সোচ্ছ্বাসে লিখেছেন যে, আমেরিকায় ধর্ম যে এখনো জীবন্ত বিলি গ্রেহামই প্রমাণ করেছেন—ধন্য তাঁর বলিষ্ঠতা, জয় হোক তাঁর বাগ্মিতার…… ইত্যাদি।

প'ড়ে হাসব না কাঁদব ভেবে পাই নি। রেডিওতে কয় লক্ষ লোক খৃস্টমাহাত্ম্য বা খৃস্টানধর্মমহিমা শুনে জয়ধ্বনি করেছে সেই নিকষে অধ্যাত্ম সত্যের গৌরব যাচাই করার মনোবৃত্তি সূচনা করে কি ধর্মের মহান্ অভ্যুত্থানের না শোচনীয় অধঃপতনের? পাশ্চাত্যে আজ সত্যিই মহাত্মা জন্মায় না বা জন্মালেও কলকে পায় না। সেখানে আজ জয়জয়কার রাজশক্তির ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার—এমন কি কবি শিল্পীরও আর সে-প্রতিপত্তি নেই যা এক সময়ে ছিল। শনৈঃ শনৈঃ কোথায় চলেছে ওরা? ওদের কীর্তিকলাপের চোখধাঁধানো দিকটা বুঝি চোখকে পুরোপুরিই অন্ধ করে? অন্ধ ছাড়া আর কী বলব দিনের পর দিন চাক্ষুষ ক'রে—কী আত্মঘাতী মূঢ়তাকে ওরা বরণ করছে মুক্তিপথ ব'লে? অলডাস হাক্সলি মিথ্যা বলেন নি যে, ধর্ম ও ধার্মিকের লোপ হ'লে

মহতী বিনষ্টিঃ অবধারিত, কেন-না যোগী ঋষি মহাত্মারাই পৃথিবীর বিষহারী (disinfectant)। তিনি বলছেন যে, যুগে যুগে : "The mystics are channels through which a little knowledge of Reality filters down into our human universe of ignorance and illusion. A totally unmystical world would be a world totally blind and insane."

অর্থাৎ যোগী ঋষির মাধ্যমে পরম সত্যের কিছুটা চুঁইয়ে আসে আমাদের অজ্ঞান-বিলাসী, মায়াজীবী পৃথিবীতে। ধর্মহীন জগৎ সম্পূর্ণ অন্ধ ও পাগল।

তাহ'লে ভরসা কোথায়? কাকে ধ'রে দাঁড়াব? প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ—ব্যক্তিগতভাবে : ধর্মকে রক্ষা করলে সেও ধার্মিককে রক্ষা করবেই করবে—"ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ" কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর দেওয়াই মুশকিল। তবে ঠাকুরের কিছু প্রত্যক্ষ করুণা পেয়ে আজ এ-দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যাকে আর কেউ টলাতে পারবে না যে, "হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার"—আর সে-মাঝি হ'ল ভারতের আত্মা। এ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের একটি স্পন্দমান বাণী উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। ভারতের মহাঋষি বলছেন :

"God always keeps fcr himself a chosen country in which the Higher Knowledge is, through all chances and dangers, by the few or by the many, continually preserved and for the present, in this century at least, that country is India.

পাশ্চাত্যের কাছে আমাদের বহু ঋণ আমি অস্বীকার করি না। শ্রীঅরবিন্দ বারবারই নানা সূত্রে বলেছেন যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় আসন্ন এবং তার পরেই মানুষ রামরাজ্যের পত্তন করবে এ-জগতে। স্বামীজিও বলতেন, ওদের কাছে আমরা শিখব বিজ্ঞান ও সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার কৌশল (organisation) আর আমাদের কাছ থেকে ওরা শিখবে অধ্যাত্মতত্ত্ব। পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাণশক্তি, শিল্পকলা ও আরো অনেক কিছুর বাহন হয়ে জগতে ভাগবত লীলার একটি মস্ত দিক প্রকাশ করছে—বটেই তো। কিন্তু এসব মেনেও বলা যায়, যে-কথা উপনিষদে ঝংকৃত হয়েছিল চার পাঁচ হাজার বৎসর আগে : যে, ঐহিকতা মানুষকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারলেও অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করতে পারে না—কাজেই কী করবে মানুষ সে-ঐহিকতাকে নিয়ে যা তাকে অমৃত করবে না—'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?' এখানে একটু থেমে এ-শ্লোকটির একটু ভূমিকা করতেই হবে।

য়ুরোপে যখন আমি প্রথম যাই তখন শুধু, ঈশ, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ পড়েছিলাম। বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি সংস্করণ একবার দেখি—কার কাছে মনে নেই ; তবে মনে আছে তার বৃহৎ কলেবর দেখে ভয় পেয়ে আর ওদিকে ঘেঁষি নি। য়ুরোপে মার্থা ও ভ্লাদিয়ার সঙ্গে উপনিষদ সম্বন্ধে আলোচনা বড় একটা করতাম না—কারণ উপনিষদের মর্মজ্ঞ আমি তখনো হ'তে পারি নি ব'লে ওতে তেমন রস পেতাম না। ভগবান মানুষ হ'য়ে এসে কথা বলেছেন মহাভারতে, গীতায়, কথামৃতে—একথা ভাবতে আমার মনে এমনই শিহরণ জাগত যে, উপনিষদকে পাশ কাটিয়ে যেতে বাধে নি সে-সময়ে।

তাই চম্‌কে উঠি—যখন রোমে প্রথম অধ্যাপক ফর্মিকির (Formichi) কাছে বৃহদারণ্যকের কথা শুনি। এর আগে প্রাগে ভ্লাদিয়োর ওখানে আমি অধ্যাপক লেসনি (Lesny) ও উইন্‌টারনিট্‌জ (Winternitz) সাহেবের সঙ্গে উপনিষদের আপ্তবাক্য নিয়ে একটু আধটু আলোচনা করেছিলাম বটে, কিন্তু সে সামান্যই। তাছাড়া প্রাগে আমি গান গাইতেই ব্যস্ত—শাস্ত্র নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় ? কিন্তু ফর্মিকি সাহেব ছাড়লেন না কিছুতেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি আমাকে ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্নজালে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুললেন। তাঁর সঙ্গে বেশি আলাপ করার আমি সময় পাই নি, কিন্তু দু তিনদিনেই এ-জ্ঞানবৃদ্ধের ধর্মোৎসাহে তাঁকে চিনে নিয়েছিলাম খাঁটি জিজ্ঞাসু ব'লে। তিনিই আমাকে প্রথম বলেন যে খৃস্টের দর্শনের চেয়ে বৌদ্ধ দর্শন ঢের বড়—যেমন খৃস্টের ব্যক্তিরূপের চেয়ে বুদ্ধের ব্যক্তিরূপ ঢের বড়! সেই সময়ে তাঁর কাছে একটি কথা প্রথম শুনি, তাই মনে গেঁথে আছে। তিনি বলেছিলেন: "তবে প্রতি যুগেই যুগপ্রবর্তক হয়ে যিনি আসেন তিনি এমন বাণী দিতে পারেন না যে-বাণী সে-যুগের মানুষ বুঝতেই পারবে না। খৃস্টের সমসাময়িকরা ছিলেন বেশির ভাগ স্ক্রাইব ও ফারিসী (Scribes and Pharisees)। কিন্তু ভারতে বুদ্ধের সময়ে জিজ্ঞাসু পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ মিলত যত্র তত্র। ভারতের আবহই যে ছিল আলাদা। তাই খৃস্ট কেমন ক'রে বুদ্ধের মতন গভীর কথা বলবেন—কেমন ক'রে হবেন বুদ্ধের মতন নির্বিচল, শান্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ? তাঁকে প্রায়ই অগ্নিশর্মা হয়ে ধমকাতে হ'ত আশেপাশের লোককে, কেননা তাঁর শ্রোতাদের বেশির ভাগই যে ছিল অর্বাচীন, বুঝলে না? বুদ্ধের নির্বাণ তন্‌হা (তৃষ্ণা) প্রজ্ঞা বর্গীয় তত্ত্বকথা শুনলে তারা সবাই চম্পট দিতই দিত। তবে ভেব না যে, আমি খৃস্টের মহিমা অস্বীকার করছি। কিন্তু খৃস্টের কাছে খৃস্টানরা

অনেক কিছু পেলেও বুদ্ধের সমান তিনি ছিলেন না—না. জ্ঞানে, না ধ্যানে, না ব্যক্তিরূপে।"

কথাগুলি বললাম অবশ্য আমার নিজের ভাষায়, তবে মনে হয়, নিজের কল্পনার রং এতে একটু-আধটু লাগলেও বেশি লাগেনি আরো এইজন্যে যে, বুদ্ধ কোনদিনই আমার মন টানেন নি, খৃস্টকে আমি ঢের বেশি ভালোবেসেছিলাম। ফর্মিকির কথায় তাই মনে একটু ঘা লেগেছিল বৈ কি ভেবে যে, আমি বুঝি খৃস্টের সমজদার—ঐ স্ক্রাইব ফারিসী ধীবরদের মতন—বুদ্ধকে বরণ করবার যোগ্যতা আমার নেই। তার পরে বুদ্ধের সম্বন্ধে অনেক কিছুই পড়েছি। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ও আনন্দকুমার স্বামীর বুদ্ধতর্পণ। কিন্তু ঐ ভালো লাগা মাত্র, বুদ্ধের ধম্মপদের কোন বাণীতেই আমার হৃদয়ের তার বেজে ওঠে নি—মনে হয়েছে বড় শুষ্ক। তাছাড়া, গীতা ও উপনিষদ ছত্রে ছত্রে যে-স্পন্দমান ভাগবত-বারতা ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দীপ্ত এজাহার বহন ক'রে আনে বুদ্ধের ধম্মপদে তার কোনো আভাষই পাই নি। তবু পড়েছি মিলেরাপ্পা-প্রমুখ নানা বৌদ্ধ মহাত্মার জীবনী, তিব্বতের গুহ্য সাধনার কাহিনী, নানা বৌদ্ধ বাণীবাহের নির্বাণ-মহিমা প্রচারের কথা, কিন্তু মনে হয়েছে কেবলই একটি কথা "ঘ'ষে মেজে রূপ আর ধ'রে বেঁধে প্রেম"—এ হয় না, তাই সদুঃখেই বুদ্ধকে দূর থেকে দণ্ডবৎ ক'রে বলেছি: প্রভু, তুমি মহামহিমময় মানি, কিন্তু আমি কৃষ্ণ, খৃস্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ এঁদের নিয়েই থাকব, কিছু মনে কোরো না। কারণ, আমি চাই ভগবানের নরলীলা—এমন কি, অদ্বৈত জ্ঞানও চাই না—আমার মন পরমানন্দেই জপ করে:

পারমার্থিকমদ্বৈতং দ্বৈতং ভজনহেতবে।
তাদৃশী যদি ভক্তিঃ স্যাৎ সা তু মুক্তিশতাধিকা॥

অর্থাৎ

অদ্বৈতের পারমার্থিক সত্য জানি মহান্।
শুধু আমি চাই যেথা আনন্দে প্রেমময় ভগবান্
ভক্তের পূজা করেন গ্রহণ দ্বৈতের লীলামাঝে।
শত মুক্তিও চাই না—যদি সে ভক্তি হৃদয়ে রাজে।

তাই তোমাকে আমি ভক্তি করব প্রভু, কিন্তু দূরে থেকে, আর তুমি আমাকে আশীর্বাদ কোরো যেন আমি পাই সেই ইষ্টকে যাঁর জন্যে আমি আশৈশব তৃষিত।"

ফর্মিকি বুদ্ধ সম্বন্ধে নানা স্তবস্তুতি ক'রে আমাকে অপ্রস্তুত ক'রে দিয়েছিলেন ব'লেই আমি রুখে উঠে এত কথা ব'লে ফেললাম। লিখতে লিখতে মনে হয়েছিল—নাই লিখলাম এসব। কিন্তু পরে ভাবলাম, ক্ষতি কী? ক্ষমাময় বুদ্ধ তো আর রাগ করতে পারেন না—থাক না আমার সরল স্বীকৃতি যে, আমি চেষ্টা ক'রেও বুদ্ধের সমজদার হ'তে না পেরে তাঁকে দূর থেকে প্রণাম ক'রেই "স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়ঃ" মন্ত্র জপ করেছি। অথ, এসূত্রে আর একটি কথা ব'লে এ-প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানব।

কথাটা এই যে, বুদ্ধকে আমি মনেপ্রাণে বরণ করতে না পারলেও বিলেত থেকে ফিরে উপনিষদ বার বারই পড়েছি পরমানন্দে। আর উপনিষদ সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা জাগান প্রথমে এই ইতালিয়ান অধ্যাপক। তিনি বলতেন প্রায়ই যে, জগতে যত দর্শন আছে তার মধ্যে উপনিষদ ও গীতার কাছে কেউ নয়।

গীতা আমার চিরারাধ্য, কিন্তু উপনিষদ সম্বন্ধে সে-সময়ে খুব কমই জানতাম। ফর্মিকি সাহেবের উচ্ছ্বাসেই আমার তরুণ মনের তারে তাঁর উপনিষদ-প্রেম ঝংকৃত হয়ে ওঠে। কীভাবে তিনি তাঁর প্রেমের সংবাদ দিয়েছিলেন মনে নেই, তবে ভাবটা এই:

"ভারতবর্ষের আত্মার পরিচয় পেয়েই আমি প্রথম স্পষ্ট দেখতে পাই—য়ুরোপে আমরা কেন আজ পথভ্রষ্ট হয়েছি। আমরা যে সব ছেড়ে ভাগবত সাধনা করিনি যেমন ভারতবর্ষের মহাত্মারা করেছেন। তাই তো এমন মন্ত্র আমাদের কণ্ঠে বেজে ওঠে নি: 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্'—বা 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?' তবে তুমি তো পড়েছ এসব, তোমাকে আর কী বলব তোমাদের উপনিষদের কথা?"

আমি বিব্রত হ'য়ে বললাম: "বেদাহমেতং পড়েছি কিন্তু যেনাহং—কী বললেন?"

ফর্মিকি সাহেব বিস্ফারিত নেত্রে বললেন: "সে কি? বৃহদারণ্যক উপনিষদ পড়ো নি—অতুলনীয়, অতুলনীয়! মানুষ জ্ঞানের রাজ্যে এর উপরে যেতে পারে নি আজ পর্যন্ত।" আজো স্পষ্ট মনে পড়ে—যেন চোখে দেখতে পাই—বৃহদারণ্যক উপনিষদের কথা—"যেনাহং নামৃতা স্যাং" বলতে বলতে এ-বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর কীভাবে আবেগে গাঢ় হয়ে এসেছিল এবং আমি কী রকম লজ্জিত হয়েছিলাম যে, আমাদের এ-সম্পদের কোনো খবরই রাখি নি এতদিন! বলে না, প্রদীপের নিচেই সবচেয়ে

অন্ধকার? কিন্তু সে অন্য কথা—"যেনাহং নামৃত স্যাং" সম্বন্ধে ফর্মিকি কীভাবে আমাকে বুঝিয়েছিলেন—বলি।

অধ্যাপক শেল্‌ফ থেকে উপনিষদ খুলে প'ড়ে প'ড়ে আমাকে বোঝাতে লাগলেন: "যাজ্ঞবল্ক্য গার্হস্থ্য আশ্রম ছেড়ে অন্যত্র যাবার সময়ে বললেন তাঁর দুই স্ত্রীকে যে, তিনি যাচ্ছেন—সম্পত্তি তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে বাঁটোয়ারা ক'রে দিয়ে। তাতে মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করল: ঠাকুর, বুঝলাম তো সব—ধন-সম্পত্তির কথা। কিন্তু এসব ভোগ ক'রে আমি কি অমৃত হ'তে পারব? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন: না ধন হ'লে ধনীরা যেমন জীবন যাপন করে তুমিও ঠিক তেমনি ভাবে বাঁচবে সুখে খেয়ে প'রে। তাতে মৈত্রেয়ী বলল—আহা কী কথা, দিলীপ, আর ভাবো, বলল কে—না, একজন গৃহিণী যে আজীবন গৃহকে বরণ ক'রেই এসেছ। বলল: যাতে আমি অমৃত হ'তে পারব না তা নিয়ে আমার কী হবে?" বলতে বলতে মনে আছে বৃদ্ধের চোখে জল এসেছিল: "একবার ভাবো দিলীপ, ভাবো তোমাদের দেশের নারী এই কথা বলেছিল—এর পরে আর কী বলবার থাকতে পারে? শুধু বলি মহিমময় ভারতের চিরমহিমময়ীকে: নমস্কার নমস্কার—saluto! saluto!"

অধ্যাপক ফর্মিকিকে আমি কোনোদিনই ভুলতে পারব না—শুধু এইজন্যই নয় যে তিনি আমাকে চম্‌কে দিয়েছিলেন, ভারতের এক মহিমময়ী নারীর কথা ব'লে যাঁর সম্বন্ধে সে-সময়ে আমি কিছুই জানতাম না। ফর্মিকি আমার কাছে অবিস্মরণীয় থাকবেন এইজন্যে যে তাঁর কথা শুনে প্রথম আমি সচেতন হই ভারতের অধ্যাত্মবাণীর বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে। কারণ তাঁর আগে ভারতের আত্মার বাণীতে বহু নরনারীকে স্পৃষ্ট হ'তে দেখলেও দেখিনি এমন কোনো ভাবুক বিদ্বানকে যিনি য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবাণীর মর্মজ্ঞ হ'য়েও ভারতের আত্মাকে বরণ করেছিলেন তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সর্বশ্রেষ্ঠ দিশারি ব'লে। অবশ্য তাঁর আগে ম্যাক্সমূলারের শ্রীরামকৃষ্ণ স্তুতি পড়েছিলাম, কিন্তু বইয়ে পড়া এক, চোখে দেখা আর—Seeing is believing প্রবন্ধটির তাৎপর্য আমি উপলব্ধি করি প্রাচ্যকোবিদ (orientalist) অধ্যাপক ফর্মিকিকে দেখে।

এ-নমস্য বিদগ্ধ অধ্যাপক আজ বেঁচে আছেন কিনা জানিনা। কিন্তু থাকুন বা না থাকুন তাঁর ঋণ আমি কোনোদিন ভুলব না। কারণ য়ুরোপে অনেকের কাছেই আমি অনেক কিছু পেয়েছি একথা মেনেও বলব যে, ওদেশে বহু আলাপীর মধ্যে মাত্র দুটি মানুষ আমাকে দিয়েছেন ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রেরণা: ওলগা—টলস্টয়ের মন্ত্রদূতী হ'য়ে, আর অধ্যাপক ফর্মিকি—উপনিষদের বাণীবাহ হয়ে।

রোমে আমার আরো বৎসরখানেক থেকে ইতালিয়ান গান শেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এই সময়ে আমি প্রথম খানিকটা একলা পড়ি। কেন জানি না, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে আর তেমন ভালো লাগত না—সম্ভবত ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে মন একটু নেতিয়ে পড়েছিল। য়ুরোপে জীবন চলে নিত্য নতুন চমক আহরণ করতে করতে বটে, কিন্তু চমকও দৈনন্দিন হ'লে আর চমক থাকে না তো। দেখতাম দিনের পর দিন সেই একই অশ্রান্ত প্রাণের শোভাযাত্রা, সেই হোটেলে অগুন্তি ভোজ্যের অফুরন্ত আয়োজন, নরনারীর সেই অতৃপ্ত সঙ্গতৃষ্ণা, থিয়েটারে সিনেমায় সেই একই প্রাণিক উত্তেজনার রকমফের—সর্বোপরি সঙ্গহীন জনস্রোতে নিত্যনব উদ্দীপনা কুড়োতে কুড়োতে আবালবৃদ্ধবনিতার লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে চলা। মনে বৈরাগ্য জেগেছিল বললে বেশি বলা হবে, তবে এ নিশ্চয় যে, অবসাদের প্রথম ছায়া পড়েছিল আমার তরুণ উৎসাহের 'পরে। দেশে ফিরে গানের নবজাগ্রত উদ্দীপনায় কিছুদিনের জন্যে এ-অবসাদ অন্তর্হিত হয়ে বটে—কিন্তু ফের বৈরাগ্যের উদয় হয় শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে। সে-ইতিহাস বলবার সময় এখনো আসে নি—যদি ঠাকুর দিন দেন তো বলব। এখানে শুধু আর একটি কথা ব'লেই আমার য়ুরোপ জীবনের জয়যাত্রায় পূর্ণচ্ছেদ টানব।

কথাটা এই যে, য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি, শ্রেষ্ঠ বাণী, শ্রেষ্ঠ ভোগ, শ্রেষ্ঠ সঙ্গ সবই আমার ভাগ্যে লাভ হয়েছিল। আমি স্বভাবে অকৃতজ্ঞ নই, তাই সানন্দেই স্বীকার করব যে, য়ুরোপের কাছে থেকে অনেক কিছুই পেয়েছিলাম যা আমার অন্তর্জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু তবু বলব যে, য়ুরোপের আবহে আমি একটু একটু ক'রে অতিষ্ঠই হয়ে উঠেছিলাম। য়ুরোপ আমার মনে উচ্চাশা জাগিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, আমার প্রাণশক্তিকেও উদ্দীপিত করেছিল—য়ুরোপের কাব্যে, সঙ্গীতে, উপন্যাসে, গল্পে, প্রবন্ধে, আমোদ প্রমোদের অফুরন্ত বৈচিত্র্যে—কিন্তু কোনো কিছুতেই আমি স্থায়ী তৃপ্তি পাই নি, প্রতি চমকের পরেই এসেছে বিষাদের প্রতিক্রিয়া, মন প্রশ্ন করেছে: ততঃ কিম্? সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও জুগিয়েছে: চলো শুধু চলো—প্রতি অভিজ্ঞতা থেকে আনন্দ আহরণ ক'রে—কেননা জীবনে আনন্দই তো পরম পাথেয়, তারপরে আর কী থাকতে পারে?

কথাটা সত্য—যদি এ-আনন্দ সত্যিই সেই আনন্দ হয় উপনিষদ যে-আনন্দের জয়গান করেছে সর্বজীবের উদ্ভব ও আশ্রয় ব'লে। কিন্তু য়ুরোপে দেখতাম, প্রায়ই ওরা আনন্দ ও সুখকে সমার্থক মনে ক'রে থাকে। কিন্তু আমি যে বাল্যকালেই

সুরধামের ছাদে নিজে-হাতে-গড়া কুঠরিতে ব'সে ঠাকুরকে চোখের জলে ডাকতে ডাকতে পেয়েছিলাম আভাস এ-আনন্দের, তাই জেনেছিলাম যে, কোনো সুখ বা হর্ষই সে অহেতুক স্বয়ংসিদ্ধ আনন্দের দিশা দিতে পারে না। উত্তরকালে শ্রীঅরবিন্দ ও রমণ মহর্ষির সংস্পর্শে এসে যখন পরমা শান্তির উপলব্ধি হয় তখন দেখতে পাই যে, শুধু এই শান্তিই পড়ে সে-পরমানন্দের কোঠায়—সুখ না, ক্ষণপুলক না, উত্তেজনা না, আরাম না। কমলাকান্তের বিখ্যাত "মজলো আমার মন ভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে" গানটি বরাবরই ছিল আমার একটি অতি প্রিয় গান, আর এ-গানটির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় অন্তরা ছিল আমার কাছে ঃ

কমলাকান্তের মনে আশা পূরল এতদিনে,
সুখ দুখ সমান হ'ল আনন্দসাগর উথলে।

এ-গানটি গাইতে গাইতে কতবারই আনন্দে আমার চোখে জল এসেছে—যেম্‌নি আভাস পেয়েছে যে, সুখ দুখ সমান না হ'লে আনন্দের দেখা মেলে না।

কিন্তু য়ুরোপে সুখহিল্লোলে বহুবার দুললেও সে-আনন্দের আভাস একদিনও পাই নি—যে-আনন্দ শৈশবেই আমার সরল বালহৃদয়ের অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে এসেছিল। য়ুরোপে যা পেয়েছি পদে পদে, ঘুরতে ফিরতে, তার নাম করা কঠিন, তবে হয়ত প্রাণশক্তির উদ্দীপনা বা রক্তের উন্মাদনা বললে বিশেষ ভুল হবে না। কিন্তু এ-জাতীয় প্রেরণায় আর যাই থাকুক না কেন, প্রাণভরানো আনন্দ নেই, না শান্তি। তাই হয়ত য়ুরোপে এসে আমি প্রথম দিকে চমকবিমুগ্ধ হ'লেও দুদিন যেতে না যেতে আমার আনন্দতৃষিত অন্তরের মোহভঙ্গ হয়েছিল—ক্ষণায়ুকে চিরন্তন ব'লে ভুল করি নি আর। হয়ত বা বাল্যকালের ভক্তিবিলাসের আনন্দ-স্মৃতি আমার ঝোঁকালো মনের রাশ ক'ষে ধরেছিল—"এসব ক্ষণিক সুখের মায়া কাটাতেই হবে" ব'লে, কিংবা হয়ত এ-ও হ'তে পারে যে, য়ুরোপের ঐশ্বর্য প্রাণশক্তি চমক এসবই আমার মনকে সজাগ ক'রে দিয়েছিল একটু একটু ক'রে—যে, এপথে মিলবে না সেই অমৃত যা মৈত্রেয়ী চেয়েছিল। জানি না। তাছাড়া, সে-সময়কার মনের ছবি খানিকটা ঝাপ্‌সা হ'য়ে এসেছেও বটে। তাই এখানে শুধু যেটুকু স্পষ্ট মনে আছে ব'লেই ইতি করব ঃ অর্থাৎ, য়ুরোপ আমার মন টানলেও আমাকে মুগ্ধ কি আবিষ্ট করতে পারে নি। তাই য়ুরোপে সাড়ে তিন বৎসরে বহু সম্পদ আহরণ করা সত্ত্বেও আমার অতৃপ্তি-আতপ্ত মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল ভারতের মাটিতে জুড়োতে যাকে তাঁর কলম্বোর বিখ্যাত বক্তৃতায় স্বামিজী নাম দিয়েছিলেন পুণ্যভূমি,

বলেছিলেন : "এ জগতে যদি কোন দেশ থাকে যে গৌরব করতে পারে নিজেকে পুণ্যভূমি ব'লে…যেখানে প্রতি ভগবৎতীর্থপথিক পায় তার পরম ধাম, যে-দেশ অন্তর্মুখিতা ও অধ্যাত্মের ধাত্রী—তবে সে-দেশের নাম ভারতবর্ষ।"* তাছাড়া, য়ুরোপের নানা চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার দোলায় সুভাষকেও ছিলাম ভুলে—তার জন্যেও মন কেমন ক'রে উঠল। তবু হয়ত আরো কিছুদিন ইতালিয়ান গান ও ভাষা শিখতে রোমে থাকতাম যদি না ঠিক এই সময়েই আমার মেজমামা তার করতেন—আমার মাতামহের খুব অসুখ, তিনি আমাকে দেখতে চান।

আমি আর কালবিলম্ব না ক'রে ব্রিণ্ডিসি থেকে লয়েদ ত্রিয়েস্তীনোর ইতালিয়ান জাহাজে রওনা হ'য়ে বম্বে পৌঁছিলাম ১৯২২ সালের নভেম্বরে। ভারতের মাটির স্পর্শ পেতে না পেতে অবসাদ কেটে গেল, চোখে জল এল, মনে প'ড়ে গেল পিতৃদেবের অবিস্মরণীয় ভারতস্তোত্র :

ভারত আমার, ভারত আমার ! কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

ছাব্বিশ

১৯২২ সালে নভেম্বরে দেশে ফিরে কিছুদিন পরেই সুভাষের সঙ্গে দেখা। তাকে সব কথাই খুলে বললাম—কিছুই গোপন না করে। সে শুনে একটুও বিচলিত না হয়ে বলল : "ঠিকই করেছ ভাই, দেশের ছেলে দেশে ফিরে। এখন দেশকে দিয়ে চলো তুমি য়ুরোপে যা কিছু পেয়েছ, শিখেছ, জেনেছ। য়ুরোপে যাওয়া আর কী জন্যে বলো ?"…ইত্যাদি।

দেখলাম সুভাষের মন আরো অনেক বিকশিত হয়েছে এই দেড় বৎসরে। উত্তর বঙ্গের বন্যাপীড়িতদের সাহায্যে অমানুষিক খেটে ওর আরো নামডাক হয়। বাংলা দেশে তখন সবারই মুখে ওর নাম : "চিত্তরঞ্জনের মানসপুত্র"—বলত অনেকেই।

কিন্তু সুভাষ আমাকে "স্বাগতম্" জানালেও আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেকেই বিষম মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। এক জ্ঞানবৃদ্ধ বললেন : "বিলেত গিয়ে এত খরচ-পত্র ক'রে সাড়ে তিন বৎসর কাটিয়ে শুধু দু'তিনটে ফাজিল ভাষা শিখে এলি তুই ?"

* কলম্বোয় স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার অনুবাদ (জানুয়ারি ১৮৯৭)

আমি (ততোধিক ক্ষুণ্ণ) : ফাজিল ভাষা কেন ? গান—

জ্ঞানবৃদ্ধ (ভ্রূকুটি ক'রে) : ওসব উদ্ভট হুহুঙ্কারী গানের মাথামুণ্ডু কিছুই আমরা বুঝি না ছাই। তুই এখন কী করবি তাই বল।

আত্মীয়রা : কেন ? বিয়ে।

দিদিমা : তা বৈ কি। ওর ভাবনা কী ? পাশ তো তিন চারটে করেছে গা। বাঁচলাম—ও মেম বিয়ে করে আসে নি।

আমি (দিদিমার সঙ্গে চিরকেলে ঠাট্টার সুরে) : কেমন ক'রে জানলে নানি ?

মেজমামিমা (কলহাস্তে) : মা, হাসবেন না কারণ এ হ'ল কাঁদবারই কথা। জানেন, প্রভাতবাবুর একটি গল্পে আছে আপনার নাতির মতনই এক ধনুর্ধর মেম বউকে বিলেতে ফেলে চম্পট দিয়েছিল। কিন্তু মেমের সঙ্গে পারবে কেন ? একদিন সে ঠিকানা যোগাড় ক'রে হঠাৎ এসে হাজির—ঠিক যখন সে এক স্বদেশী কনেকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সোনার টোপর প'রে।

দিদিমা (সত্রাসে) : অমন অলুক্ষুণে কথা ঠাট্টা ক'রেও বলতে নেই বৌমা, মণ্টু আমার তেমন ছেলে নয় যে, মেম বিয়ে ক'রে আসবে।

আমি (হেসে) : এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে নানি ? তোমার যে ভাবনায় ঘুম হ'ত না আমি মেম বউ নিয়ে এলে তোমাকেই তাকে বরণ ক'রে ঘরে তুলতে হবে বলে ?

বিয়ে নিয়ে এই ধরনের ঠাট্টা তামাশা হাসাহাসি হ'ত প্রায়ই থিয়েটার রোডের মাতুলালয়ে। তাই একটা প্রগল্‌ভ নমুনা দিলাম।

কিন্তু ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়—বিলিতি ডিগ্রির অভাব আমাকে কাবু করবে কোত্থেকে ? শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমি দেখতে দেখতে জনপ্রিয় গায়ক হয়ে উঠলাম—বিশেষ ক'রে নানা সভায় কংগ্রেসে গান করে। বন্ধুদের আসরে গল্পালাপেও আমি অচিরে রসালাপী ব'লে সুপ্রতিষ্ঠ হলাম, আমাদের থিয়েটার রোডে দাদামহাশয়ের লোকান্তরের পর থেকে কর্ণধার হয়েছিলেন আমার মেজমামা, দিদিমা ছিলেন রসদদার। কিন্তু মেজমামা প্রকৃতপক্ষে কর্তা হলেও মেজমামিমা নিজেকে কর্ত্রী বলতেন না—দিদিমা থাকতে। থিয়েটার রোডে আত্মীয় আত্মীয়া আরো অনেক ছিলেন, তাঁরাও মোটের উপর আমাকে স্নেহই করতেন। না করবেন কেন ? আমি গান গেয়ে নানা মনীষী মহাত্মা দিকপালকে থিয়েটার রোডে ডাকতাম—সবাই পুলকিত হতেন তাঁদের শুভাগমে। মহাত্মা গান্ধি,

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বীরবল সুভাষ, সত্যেন, মেঘনাদ, ধূর্জটি আরো অনেক বাঙালি ও অবাঙালি মনীষী থিয়েটার রোডে এসে আমার আসর জমাতেন। এর পরে ক্রমশ ওস্তাদ বাইজি বাদক এঁরাও পদার্পণ করেছিলেন একের পর এক: যথা, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, আবদুল করিম, হাফেজ আলি খাঁ সোনি গয়ার বিখ্যাত এস্রাজী (নামটা মনে পড়ছে না) আরো কত গায়ক। কেসর বাই ও ভীষ্মদেব আসেন সবশেষে—১৯৩৭, ৩৮ সালে।

কিন্তু ওস্তাদরা ওস্তাদি দেখাতে অভ্যুদিত হবার আগেই আমি কলকাতায় নানা সভাসমিতিতে গান গেয়ে নাম ক'রে ফেলেছিলাম। ফুল্লমনে ভাবলাম—এ-ধরনের তানওয়ালা বাংলা গান, হিন্দি ভজন ও উর্দু গজল যখন এত লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছে তখন থেকে থেকে প্রকাশ্য গীতসভা বসালে মন্দ কি? কিন্তু সভা করি কোথায়—প্রকাশ্য হল মিললে তবে তো!

বাঞ্ছাকল্পতরু ফের বাঞ্ছা পূর্ণ করলেন: প্রেসিডেন্সী কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য আমার গান বিশেষ ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন সে সময়ে রামমোহন লাইব্রেরির হর্তা-কর্তা-বিধাতা—বললেন: "আমাদের হলে গাও না দিলীপ।"

কাঙালকে শাকের খেত দেখানোর ফল কে না জানে? আমি উজিয়ে উঠে শুধু একা নয়, আমার কয়েকটি নবলব্ধ বালকবালিকা ছাত্রী নিয়ে কলকাতার শ্রোতৃবৃন্দকে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য কন্সার্টিং নিবোধিত" বলতে বলতে মাসে দু'তিনটি করে আসর বসানো শুরু করলাম রামমোহন লাইব্রেরির রঙ্গমঞ্চে। আমার উদ্দেশ্য ছিল গান গেয়ে শিক্ষিত সমাজের একটু চিত্তরঞ্জন মাত্র। কিন্তু মুনফা লাভ হ'ল অভাবনীয়: কলকাতার সঙ্গীতরসিকরা দলে দলে আসতে লাগলেন—সে কী ভিড়? অনেকেই উঠলেন চমকে, কারণ সে-সময়ে কোনো পাবলিক হলে কেউ এভাবে অবিমিশ্র গানের আসর জমকায় নি সর্বসাধারণকে নিমন্ত্রণ ক'রে। হয়ত সেই অভিনবত্বের জন্যেই রামমোহন লাইব্রেরিতে লোক ভেঙে পড়ল। আর যাবে কোথা? আমার স্নেহময় অধ্যাপকের উর্বর মস্তিষ্কে গজালো একটি মনোহর আইডিয়া। তিনি বললেন: "যখন নির্মাশুল গানের আসরে স্থান সংকুলান হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল তখন একবার মাশুল চেয়ে দেখলে মন্দ কি?"

আমি (মাথা চুলকে): স্যর্!···টিকিট ক'রে কেউ কি গান শুনতে আসবে?

স্যর্ (অর্থাৎ শ্রীচারুচন্দ্র): যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ—পড়ো নি ইস্কুলে?

ভেবেচিন্তে স্যর্ ঠিক করলেন, চার আনার মাশুল ধরা যাক প্রতি টিকিটের। যদি আশানুরূপ জনসমাগম না হয় তবে ফের নির্মাশুল গানের আসরেই নামা যাবে পুনর্মূষিক হয়ে। টিকিট বিক্রির টাকা অবশ্য রামমোহন লাইব্রেরিতেই দেওয়া হবে —যাকে বলে চ্যারিটি কন্সার্ট আর কি।

কিন্তু টিকিট করতে হ'লে কিছুটা তোড়জোড় না করলে চলে না। একটু একটু ক'রে জুড়ে দেওয়া হ'ল আমার বালক বালিকা ছাত্র-ছাত্রীর একক, ডুয়েট ও কোরাস গান: দু' একটি খ্যাতনামা গায়িকার কীর্তন: আমার প্রাক্তন বন্ধু শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের হাসির গান, দু' একটি এমেচার রসিকের কমিক ক্যারিকেচার, কাজি নজরুলের প্রাণোন্মাদী স্বদেশী গান: শিকল পরা ছল, দুর্গম গিরি কান্তার মরু, জাতের নামে বজ্জাতি······ইত্যাদি। সবশেষে আমার গান: ভজন ঠুংরি স্বদেশী ইত্যাদি। (দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গানটি গাওয়া হয়েছিল কয়েক বছর পরে।)

চার আনার টিকিট কি? চার দুগুণে আট আনা পরে তার দু'গুণ এক টাকা, তার দু'গুণ দু' টাকার টিকিট, শেষে তিন টাকা—তবু প্রতিবারই ফুল হাউস। স্যরের মুখে একগাল হাসি: "দিলীপ, দেখালে বটে এক হাত!"

এ-কাহিনী এত ফলাও ক'রে বললাম নিজের কীর্তি প্রচার করতে নয়—কারণ এ কী-ই বা এমন কীর্তি যা নিয়ে জাঁক করা চলে? আমার সাঙ্গীতিক অভ্যুদয়ের সূচনা রামমোহন লাইব্রেরিতে হয় এইটুকু জানাতেই এ-ইতিহাসের অবতারণা। না, আরো একটু আছে।

১৯২২—২৩ সালে শুধু গান ক'রে চ্যারিটি কন্সার্ট কেউ করেনি বাংলা দেশে। রবীন্দ্রনাথ তাই তো আমাকে দিলাশা দিয়ে বলেছিলেন পরে: "নির্ভেজাল গান গেয়ে আমাদের দেশে চ্যারিটি কন্সার্ট ক'রে গানকে পৌঁছে দিলে তুমি সর্বসাধারণের কাছে। এই-ই তো চাই। কেবল যখন অগ্রণী হয়েছ আর পেছিও না—কে কী বলছে ভ্রূক্ষেপও না ক'রে নিজের পায়েই নিজের পথ কেটে চলো। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।"

কবিগুরুর সাশিস উৎসাহ ভুলবার জিনিস নয় তাই এখানে টুকে রাখলাম কাগজে কলমে। এর পরে তিনি আমাকে আরো উৎসাহ দিয়েছিলেন স্বয়ং রামমোহন লাইব্রেরিতে আমার গীতসভায় সভাপতিত্ব ক'রে তথা ভাষণ দিয়ে।

অতঃপর এ-জাতীয় চ্যারিটি কন্সার্ট আরো দিলাম অজস্র—একের পর এক। বৎসর দুয়ের মধ্যে অন্তত পনরো কুড়ি হাজার টাকা নানা সৎকার্যে পরিবেশন করা হয়েছিল। এতে আমার প্রতিষ্ঠা হ'ল বটে, কিন্তু দুর্নামও রটল কম নয়—বিশেষ ক'রে গানের আসরে ভদ্রকন্যার নৃত্য প্রবর্তন ক'রে। আজকের দিনে শোভনারা যত্র তত্র শুধু যে নিজেরা নাচছেন তাই নয়—নাচাচ্ছেন আরো কত শত লোককে অথচ কেউ কথাটি কইছে না, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমি গানের আসরে শ্রীমতী রেবা রায়ের নৃত্য প্রবর্তন করাতে আমার নামে নানা কাগজে একেবারে ঢিটিক্কার যাকে বলে। মহামনঃক্ষোভে বললাম সঘনে : "মন্বন্তরবিধায়ক মনুর বিধানের জয় হোক : ব্রাহ্মণ "অমৃতস্য চাকাংক্ষেদবমানস্য সর্বদা"—অর্থাৎ সদ্বিপ্র নিন্দা অপমানকে অমৃত মনে ক'রে আকাঙ্ক্ষা করবেন। আর আমি তো যে সে ব্রাহ্মণ নই—অদ্বৈত গোস্বামীর নীল রক্ত আমার এক ঠাকুরমার ধমনীতে বয়েছিল।

বিলেত থেকে ফিরে দেখতে দেখতে গানে এ-ভাবে ব্যাপক সাড়া পেয়ে কিন্তু আমার একটা ক্ষতিও হ'ল—যাকে মনু ঋষি নিশ্চয়ই অনুমোদন করতেন না, কেন না, তিনি উপরি-উল্লিখিত শ্লোকেই বলেছিলেন : "সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব"—কি না ব্রাহ্মণ সম্মান প্রশংসাকে নিত্য বিষবৎ জ্ঞান করবেন। এর ভাষা এই যে, নিজে গান গেয়ে ও নানা ছাত্রছাত্রীকে গাইয়ে নামডাক হ'তে না হ'তে আমি প্রশংসাকে বিষবৎ জ্ঞান করা দূরে থাকুক পরমানন্দে সর্বত্র হাততালি ও ফুলের মালা কুড়োতে লাগলাম। অথ, দেখতে দেখতে যশের কামনা আমাকে পেয়ে বসল —বৈরাগ্য এ-কামনার প্রবর্ধমান তোড়ের সামনে গেল ভেসে, মন আমার রঙিয়ে উঠল কীর্তিমান্ হবার উচ্চাশায়। ফলে ঠাকুরকে ভুলে না গেলেও আর সময় পেতাম না ডাকাডাকি করবার। বাল্যকালের দিলীপের সঙ্গে যৌবনকালের দিলীপের চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া ভার হ'য়ে উঠল, অথচ এমনই যশের মায়া যে, আমি স্রেফ ভুলে গেলাম শ্রীম-র কথা, রাখাল মহারাজের কথা, কুমারনাথের কথা, পরমহংসদেবের কথা। এগিয়ে চললাম তো চললামই একটানা—সবে-জাগা উচ্চাশার বানের মুখে ভক্তি প্রার্থনা ধ্যান জপ শুধু যে নিশ্চিহ্ন হয়ে ভেসে গেল তাই নয়, উচ্চাশার মোহে মনে আক্ষেপ পর্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এল, তাই এ-প্রশ্নও আসত না যে, পারমার্থিকতার নোঙর কেটে চলেছি কোন্ লক্ষ্যহীন তৃপ্তিহীন সামাজিকতার নিরুদ্দেশ যাত্রায়! ছেলেবেলায় কথামৃতের সুরে সুর মিলিয়ে যে-অঙ্গীকার করেছিলাম—ভগবানকে পাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য, সে-অঙ্গীকার থেকে

থেকে কানে বেজে উঠত বটে, কিন্তু অনাদৃত অর্ধবিস্মৃত স্মৃতির মতনই বলব। উচ্চাশার ও কীর্তিলাভের স্বাদ পেয়ে মনের মধ্যে এক বিচিত্র নেশা জেগে উঠল—জ্ঞানীরা মায়া শব্দটির উদ্ভাবন করেছিলেন কি সাধে ?

মন যেদিকে ঝোঁকে তার স্বপক্ষে যুক্তিও জোটে সহজেই। কাজেই আশ্চর্য কি যে আমি নিজেকে প্রবোধ দিলাম—গানাৎ পরতরং নহি ? এই সময়ে আলাপ হ'ল আর একজনের সঙ্গে, যাঁকে ভালোবেসে আমার গীতোচ্ছ্বাস আরো ফেঁপে উঠল বানের জলের মত। তাঁর নাম অতুলপ্রসাদ সেন—বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সুরকার-ত্রয়ীর অন্যতম ঃ দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের পরেই যাঁর স্থান। আমার সাঙ্গীতিক জীবনে অতুলদা আমাকে শুধু যে অজস্র উৎসাহ দিয়েছিলেন তাই নয়—জুগিয়েছিলেন প্রাণের তথা গানের অপর্যাপ্ত খোরাক। তাই তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতেই হবে।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন লখ্‌নৌয়ের শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার—সবাই জানেন। বহু টাকা উপায় করতেন। উর্দু বলতেন চমৎকার। অবাঙালীদের মধ্যেও তাঁর বন্ধুর অবধি ছিল না। যেমন উদার, যেমনি রসিক, তেমনি আতিথেয় ও বন্ধুবৎসল। লখ্‌নৌয়ের প্রবাসী বাঙালিদের তিনি ছিলেন সত্যিই মুকুটমণি।

এক সময়ে তিনি ছিলেন আমার পিতৃদেবের একজন প্রধান পার্ষদ, তাঁর সঙ্গে দিতেন হাসির গানে দোয়ার। কারণ হাসিতেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল বাঙলার রসিক সমাজে। তারপর বিবাহিত জীবনে অসুখী হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়। এজন্যে তাঁর কুণ্ঠার সীমা ছিল না। কিন্তু এই নিবিড় বেদনায় তাঁর গানের একটা গভীর দিক খুলে যায়। তিনি নিজের মনে গান বাঁধতেন ও সুর দিয়ে নিজেই গাইতেন। কীভাবে—তার বড় সুন্দর ছবি এঁকেছেন তাঁর একটি চমৎকার বাউল গানে ঃ

মিছে তুই ভাবিস মন !
(তুই) গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা আজীবন।
পাখিরা বনে বনে গাহে গান আপন মনে
(ওরে) নাই-বা যদি কেহ শোনে
(তুই) গেয়ে যা গান অকারণ।

স্বভাবে ছিলেন তিনি লাজুক ও সুকুমার অর্থাৎ রিফাইণ্ড। এত সুকুমার যে, তাঁর মধুর স্নেহের নানা পেলব পরশে আমার মনে প্রায়ই বিচিত্র ভাবোদয় হ'ত। এরকম অতি-সুকুমার মানুষ আমি জীবনে বেশি দেখিনি পুরুষদের মধ্যে। গড়নে

বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকৃতি হ'লেও স্বভাবে তিনি ছিলেন—ঐ যে বললাম, পেলব—ডেলিকেট। অথচ হাসিতে গল্পে তিনি উজিয়ে উঠতেন—যদিও শুধু অন্তরঙ্গ মহলে। বাইরে ছিলেন ফিটফাট সুভদ্র সুপুরুষ—স্বল্পভাষী ও সামান্য তোৎলা। এই ঈষৎ-তোৎলামি কিন্তু তাঁর বিকাশের পথে বাধা হয় নি, অনুকূলই হয়েছিল। এমন মধুর তোৎলামি সত্যি আর কখনো শুনি নি। তাঁর এই অর্ধস্ফুট উচ্চারণ শুনে অনেকেই মুগ্ধ হ'ত। বহু বৎসর বাদে ১৯৪৪ সালে বম্বেতে পাহাড়ী সান্যাল একদিন তাঁর এই ঈষৎ তোৎলামি ভঙ্গির অবিকল নকল ক'রে আমাকে আর্দ্র ক'রে তুলেছিলেন—মনে করিয়ে দিয়ে কী অপরূপ ভাবেই যে তিনি তাঁর স্নেহ জ্ঞাপন করতেন। "অমন নিত্য স্নেহ বেশি মেলে না এই অনিত্য জগতে"—বলত পাহাড়ীও।

বিলেত থেকে ফিরে আমি ১৯২৩ সালে যখন প্রথম লখনৌ যাই, তখন গানের সূত্রে অতুলদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল শুধু আমার নয়—ধূর্জটিরও বটে। ধূর্জটি (প্রসাদ মুখোপাধ্যায়) তখন লখ্‌নৌয়ের একজন নামজাদা অধ্যাপক ও উদীয়মান বুদ্ধিবাদী—ইনটেলেকচুয়াল। তাই এখানে একটু থেমে ওর কথা কিছু বলব। ভালোই হ'ল ওর প্রসঙ্গ এসে গেল—কারণ ওর কাছে আমার গভীর ঋণের কথা না বললে আমার স্মৃতিচারণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সবাই ওর মধ্যে একটি অনন্যতন্ত্র ব্যক্তিরূপের পরিচয় পেত: বুদ্ধিতে ক্ষুরধার, আলাপে রসাল, ব্যঙ্গে নিপুণ, হাসিতে দরাজ, আতিথ্যে দিলদরিয়া ও বন্ধুত্বে অটল এ-মানুষটির সত্যিই জুড়ি মেলা ভার ছিল। আমার কণ্ঠের তথা গানের ঢঙের ও ছিল বিশেষ অনুরাগী, তার উপর ও অত্যন্ত ভালোবাসত পিতৃদেবের গান—শুধু স্বদেশী গানই নয়—তাঁর নানা উৎকৃষ্ট প্রেমের গান, প্রকৃতির গান, নৃত্য-সঙ্গীত, কীর্তন, বাউল। বস্তুত তাঁকে ও বাঙলার শ্রেষ্ঠ সুরকারদের অন্যতম ব'লে বরণ ক'রে নিয়েছিল প্রথম থেকেই। তাই ওর সঙ্গে আমার স্নেহসম্বন্ধ বেশ পাকা হয়েই গ'ড়ে ওঠে—একাধিক মনের মিলের বনিয়াদের উপরে।

কিন্তু আমি ওর প্রতি সবচেয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলাম ওর অহেতুক প্রীতির টানে। ওর সে-নিটোল স্নেহের কথা মনে করতে আজও আমার মন ব্যথিয়ে ওঠে: এমন মানুষ কিনা গলক্ষতে—ক্যান্‌সারে—আজ ম্রিয়মান! যে-মানুষ চিরদিন দু'হাতে বিলিয়ে এসেছে প্রাণের উচ্ছলতা তার হাসিতে গল্পে গানে—সে কিনা আজ দেরাদুনে একলা ব'সে আঁছে চুপ ক'রে! ভাবতেও বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে। এ-শ্রেণীর প্রাণখোলা মানুষ কোনো দেশেই খুব বেশি জন্মায় না—যারা ঠিক

স্রষ্টা না হলেও স্রষ্টা শিল্পীর কাছে অপরিহার্য। চণ্ডীদাস এদের সেরা নাম দিয়েছেন রসিক, কিন্তু বলেছেন যে রসিক "কোটিতে গোটিক হয়।" প্রতি স্রষ্টা শিল্পীই যখন সৃষ্টি করেন তাঁর কল্পনা-নেত্রের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে কোনো না কোনো প্রিয় রসজ্ঞ বন্ধু, সমজদার গ্রহীতা। রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী ছিলেন প্রিয়নাথ সেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, জগদীশচন্দ্র বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। পিতৃদেবের—লোকেন্দ্রনাথ পালিত, বরদাচরণ মিত্র, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়····· আরো অনেকে। আমার গানের ক্রম-বিকাশের প্রথম দিকে আমি উৎসাহীরূপে পেয়েছিলাম শরৎদা, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও প্রমথ চৌধুরীকে, পরে কাজি নজরুল, ধূর্জটি, অতুলদা, রবীন্দ্র-নাথকে। ধূর্জটিকে প্রথম দিকে—মানে ১৯১৯এ বিলাতযাত্রার আগে—পাই নি, কেননা তখন ও ছিল বিশেষ ক'রে সাহিত্যিক সমজদার—বীরবলের প্রিয় পার্ষদদের অন্যতম। আমি বিলেত থেকে ফিরে সর্বত্র গাওয়া শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ওর সঙ্গে আর তত বেশি দেখাসাক্ষাৎ হ'ত না। তাছাড়া বয়সের সঙ্গে দুই বন্ধুর বিকাশ যদি হয় দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে তাহলেও কালাতিপাতে একটু একটু ক'রে দুজনের মধ্যে একটা আড়াল এসে যায়ই যায়, মনান্তর না হলেও মতান্তর খানিকটা বাদ সাধেই সাধে। ১৯২২ থেকে ১৯২৮ ও আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়। এ-বন্ধুত্বে ছেদ পড়ে ওর দোষে নয়—আমারই বৈরাগ্যের দরুণ। অর্থাৎ ১৯২৮-এ আমার পণ্ডিচেরি যাওয়ার পর থেকেই ওর সঙ্গে আমার খানিকটা ব্যবধান মতন আসে, প্রথমত আমার ধর্মজীবনের সঙ্গে ওর কোন দরদের যোগ ছিল না বলে, দ্বিতীয়ত এর পরে এই কয় বৎসরে আমার সঙ্গীত-জীবনের বিকাশে ধূর্জটির উৎসাহ, সমালোচনা ও দরদী প্রেরণা আমাকে চলার পথে আনন্দপাথেয় দিয়েছে অঢেল। শুধু আনন্দ নয়, আমার বন্ধুদের মধ্যে যে-দু'চারটি সঙ্গীত-কোবিদ আমাকে বাঙলার শুধু বিশিষ্ট গায়ক নয়—সুরকার ব'লেও বরণ করতে ভয় পায়নি, তাদের মধ্যে ধূর্জটি ছিল একজন প্রধান মালাকর। আজো মনে পড়ে আমার মুখে নিত্যনতুন খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি ও বাঙলা গান শুনে ওর উচ্ছ্বাস, আমার হলক তান, মিড়, গমক ও সূক্ষ্ম খোঁচ শুনে ওর মহোৎসাহে মাথা নাড়া। গানকে ও সত্যি ভালবেসেছিল, তাই আমার সঙ্গীতানুরাগের মর্মও ও বুঝত। কিন্তু শুধু সঙ্গীতেই নয়, ওর কাছে আমি আরো বেশি ঋণী ওর অম্লান স্নেহের জন্যে। ও বাইরে খানিকটা সিনিকের ভঙ্গি করলেও ওর ভিতরটা ছিল যেমন নরম তেম্নি আদর্শবাদী তথা বিবেকী। তাই যখন পণ্ডিচেরিতে ওকে আমার ধর্মজীবনের নানা

কাহিনী ব'লে সাড়া পেতাম না, তখন নিজেকে প্রবোধ দিতাম এই ব'লে যে, কোনো মানুষই জগতের কাছে পুরোপুরি পায় না, যা সে প্রত্যাশা করে। প্রিয় বন্ধুর কাছে কী পাথেয় পেয়েছি সেই স্বীকারেই তার দানের মর্যাদা দেওয়া হয়, কী পাই নি সে-বিচার অবান্তর।

এ-হেন ধূর্জটির সঙ্গেই আমি প্রথম যাই অতুলদার ওখানে চা-এর নিমন্ত্রণে। সেখানে গিয়ে প্রথম দেখা হয় রোনাল্ড নিক্সনের সঙ্গে, যে পরে তার গুরুর কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে ভারতের সাধুসমাজে। প্রথম দেখায়ই নিক্সনকে দেখে আমি গভীরভাবে আকৃষ্ট হই ও দুদিনে ভালোবেসে ফেলি।

বহু বৎসর বাদে আমি যখন পুনায় হরিকৃষ্ণ মন্দির ক'রে ভজন শুরু করি, তখন কৃষ্ণপ্রেম একটি চিঠিতে লেখে এই কথাই যে, ত্রিশ বৎসর আগে ও আমাকে দেখেই বরণ করে নিয়েছিল অন্তরঙ্গ বন্ধু ব'লে, কেননা যারা ঠাকুরকে ভালোবাসে তারাই তো আমাদের সবচেয়ে আপনার। এ-ধরনের উক্তি ধূর্জটির কাছ থেকে আশা করব কী ক'রে? ও তো ঠাকুরকে ভালোবাসে নি। ওর সঙ্গে আমার ঐক্য ঘটেছিল প্রথম সঙ্গীতের মাধ্যমে, তার পরে আনন্দের অন্তরঙ্গতায়। ধূর্জটি একটি চিঠিতে সেদিন লিখেছে আমাকে—১৯৫৯ সালে :

ভাই মণ্টু,

তোমার চিঠি ও "স্বর্ণগ্রন্থ" পেয়ে খুশি হয়েছি—এতই খুশি যে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি। কতদিনের সম্বন্ধ!—সেই বি-এ ক্লাস থেকে, নয় কি? আর অমন মনের তুলনা হয় না! ফুলের মতন শুভ্র ও সরল। এককালে কী অদ্ভুত গান গাইতে! ইচ্ছা হয় এখনো—ফের তোমার বাবার গান তোমার মুখে শুনি। আমি আজকাল বড় চিঠি আর লিখতে পারি না, ক্ষমা কোরো। তোমার কথা প্রায়ই মনে হয়। তোমার মতন প্রাণ আমি কোথাও দেখি নি।

আমার স্বাস্থ্য ভেঙেছে—জোড়াতাড়া দিয়ে আছি। তুমি কেমন আছ? তোমার মনে শান্তি এসেছে শুনে আনন্দ হ'ল। সত্যেনের কাছ থেকেও তাই শুনলাম।

ইতি—

ধূর্জটি

ধূর্জটি ও আমি অতুলদার গানকে বরণ করতে বোধ হয় সব আগে অগ্রণী হই—মানে সেই সময়ে যখন তাঁকে প্রথম শ্রেণীর সুরকার বলে কেউ চিনতে শেখেনি।

তাই ওর কথা ঠিক সময়েই এসে গেছে। ওর সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলবার ছিল, কিন্তু সে পরে হবে, এখন বলি অতুলদার কথাই।

সাতাশ

অতুলদা বয়সে আমার চেয়ে পনের কুড়ি বৎসর বড় হ'লেও তাঁকে আমি পিতৃবন্ধু হিসেবে কাকা বলতাম না। কারণ তাঁর মনটি পঞ্চাশেও ছিল কিশোরই বলব—বিশেষ ক'রে সৌকুমার্যে। যে-কোনো সভাসমিতিই তিনি এলে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, কিন্তু তিনি কখনো ভুলেও নিজেকে সামনে ধরতেন না। এরি তো নাম সৌকুমার্য। ধূর্জটির সঙ্গে লখনৌয়ে যেদিন প্রথম তাঁর ওখানে যাই সেদিন তিনি কী যে খুশি! উজিয়ে উঠে বলতে লাগলেন, পিতৃদেবের সঙ্গে এক সময়ে কী আনন্দেই না তাঁর দিন কাটত! মন ভিজে উঠল দেখতে দেখতে পূর্বরাগ ও প্রণয়ের যুগপৎ অভ্যুদয়ে। আমি যথাবিধি গান গাইলাম। তারপর অতুলদাকে অনুরোধ করলাম তাঁর নিজের দু' একটি গান শোনাতে। তিনি অতি কুণ্ঠিত হয়ে "না না" ক'রে শেষে গাইলেন তাঁর মিষ্ট গাঢ় কণ্ঠে—

পাগলা মনটারে তুই বাঁধ
কেনরে তুই যখন তখন পরিস প্রাণে ফাঁদ
শীতল বায়ে আসলে নিশি,
তুই কেন রে হোস উদাসী ?
(ওরে) নীলাকাশে অমন ক'রে হেসেই থাকে চাঁদ।

চল্‌তি ভৈরবী কিন্তু তাঁর গানের একটা বিশিষ্ট ঢং ছিল—বিশেষ ক'রে ঠুংরি ভঙ্গিম গানে। এর পরেই তিনি গাইলেন :

রুমক ঝুমক রুম ঝুম
নূপুর বাজে.........
বিরহী পরাণখানি সে-দুটি চরণ যাচে।

ধূর্জটি সমজদার তো—ব'লে উঠলো : "ইউরেকা! এরই তো নাম সৃষ্টি!

আমি সায় দিয়ে সোৎসাহে বললাম : শুধু সৃষ্টি নয়, বাংলা গানে এর আগে ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পার আমদানি হয়েছে—কেবল ঠুংরি বাকি ছিল। আপনিই তার এ-অভাব প্রথম পূর্ণ করলেন।"

এ-গানটি যে হিন্দি ঠুংরির পর্যায়ে পড়ে তার প্রমাণ হিসেবে একটি অঘটনের কথা বলি। অতুলদার গান তখন আমি খুব গেয়ে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ কলকাতায় শ্রীদামোদরদাস খান্না নিমন্ত্রণ করলেন কাশীর বিখ্যাত মোতিবাইয়ের গান শুনতে। এক বাগানবাড়িতে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ধরলাম আমাকে কিছু গান শেখাতেই হবে। তিনি বললেন: "আপনি আগে গান শোনান একটি।" আমি এই "রুমক ঝুমক রুম ঝুম" গানটি গাইতে তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন: "আমি আপনাকে শেখাতে পারি যদি আপনিও আমাকে এই গানটি শেখান।" আমি মহানন্দে রাজি হয়ে কলকাতায় তিনি যে-বাসায় ছিলেন—চিত্তরঞ্জন আভিনিউয়ে—যেতাম দিনের পর দিন। তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন অনেকগুলি ভজন। তার মধ্যে একটি ভৈরবী ভজন—আওত ব্রজ নন্দলাল ঐসী ছব বনিয়া—আমি আমার কয়েকটি ছাত্রছাত্রীকে শিখিয়ে চ্যারিটিতে গাওয়াই। আর একটি গান শিখিয়েছিলেন হংসকামিনী রাগে—লক্ষণগীত।

আমি তাঁকে শেখাই পিতৃদেবের একটি ভীমপলশ্রী খেয়াল—"এ জগতে আমি বড়ই একা" এবং অতুলদার এই খাম্বাজটি। আহা কী অপরূপই না গাইতেন এ পিককণ্ঠী বাইজি! একদিন আসর ক'রে আমার বন্ধুবান্ধবদের শোনালাম। ব্রাহ্ম সঙ্গীতানুরাগীও কয়েকজন লুকিয়ে এসেছিলেন তাঁর গান শুনতে। আমার মনে ছিল—অতুলদাকেও শোনাতেই হবে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, যোগাযোগ ঘটে নি ব'লে শোনানো হয়নি। কিন্তু এবার ফিরে হারানো খেই ধরি।

শিহরণটুকু অবিস্মরণীয় ব'লেই অতুলদার মুখে শোনা এ-গান দুটির কথা মনে আছে, বিশেষ ক'রে দ্বিতীয়টি—পিলু খাম্বাজ ঠুংরিতে বানানো। কিন্তু এ সম্বন্ধে লিখে কী বোঝাবো—হরফের মাধ্যমে তো নয়, কণ্ঠস্বরের মাধ্যমেই যে গানের স্ফূর্তি। তাই বেশি বলা বৃথা—খানিকটা পরমাসুন্দরীর সৌন্দর্য বর্ণনার পণ্ডশ্রমের ম'ত।

অতঃপর যা হবার তাই হ'ল—ভবিতব্য—কিনা আমি অতুলদাকে তথা তাঁর গানকে ভালোবেসে ফেললাম, শুরু ক'রে দিলাম তাঁর গানের প্রচার, আমার নানা কন্সার্টে গাওয়ানো আরম্ভ করলাম তাঁর নানা সুন্দর সুন্দর গান আমার ছাত্রছাত্রীকে দিয়ে। দেখতে দেখতে অতুলদার গান খুবই লোকপ্রিয় হয়ে উঠল। সে-সময়ে তাঁর গানের কিরকম আদর হয়েছিল সঙ্গীতরসিকরা কয়েক বৎসর আগেও বলতেন যথা সোমনাথ মৈত্র, উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, মেঘনাদ সাহা, পাহাড়ী সান্যাল, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অমিয়নাথ সান্যাল, রেণুকা দাশগুপ্ত আরো অনেকে। যাক্।

অতুলদার গান আমার কাছে ঠিক সময়েই এসেছিল, কেননা, সে-সময়ে আমি নানা ওস্তাদের ও বাইজির কাছে, বিশেষ ক'রে হিন্দি ঠুংরিতেই তালিম নিচ্ছিলাম। তাই বাংলায় ঠুংরির রস পরিবেশন ক'রে আমি নিখর্চায় নাম কিনলাম।

"নিখর্চায় নাম কিনলাম" বলাটা অবশ্য অত্যুক্তি, কারণ অতুলদার গান প্রচার করতে আমাকে কম খাটতে হয়নি, এমন কি স্বরলিপিও করতে হয়েছিল তাঁর অনেক গানের। আমার বলবার কথা শুধু এই যে সব জিনিসের মতন গানেরও এক একটা যুগ আসে। বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ধ্রুপদী ভঙ্গিতে গান বাঁধেন। তারপর দ্বিজেন্দ্রলাল বাঁধেন খেয়াল ও টপ্পাভঙ্গিম গান—যে কথা আমি তাঁর গান সম্বন্ধে নানা বক্তৃতায় বলতাম সে-সময়ে। এই সময়ে বাংলাদেশে খাঁটি হিন্দুস্থানি ঢঙের গান অনেক সঙ্গীতোৎসুকের মনকেই একটু একটু ক'রে রসিয়ে তুলছিল। ফলে বাঙালি সঙ্গীতরসিকরা ঠুংরির রস চাইছিলেন বাংলা গানে, কেননা হিন্দুস্থানি ঠুংরির নানা গানেরই কথা অতি কদর্য—গাওয়া হত : ভুরু কামান চোখ কাঠারি (কিনা নয়নবাণ), কোঁকড়া চুল, ইত্যাদি (বিখ্যাত ঠুংরি গায়ক শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয় গাইতেন একটি গান : "ননদিনী পান খায়ে মুখ লাল")—এক কথায় নিম্নশ্রেণীর শৃঙ্গার রসে ভরা। ভদ্র বাঙালি শ্রোতার আসরে এসব গান গাওয়া অসম্ভব, অথচ ঠুংরির পেলব আদিরসে আপত্তি করবে কে—অরসিক ছাড়া? এইরকম পরিস্থিতিতে হাজির হ'ল অতুলদার নানা ঠুংরি-ভঙ্গিম গান : রুমক ঝুমক রুম ঝুম, শ্রাবণ ঝুলতে, জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরানী, চাঁদিনি রাতে কে গো আসিলে, আমার বাগানে এত ফুল ·····কত বলব?

অতুলপ্রসাদ তাঁর এই শ্রেণীর বাংলা গানের মধ্যে দিয়ে যে হিন্দি ঠুংরির অনেক চমৎকার তান, মিড়, খোঁচের প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন তার কারণ তিনি সুরকারের প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন, নৈলে তাঁর গানের বাঙালি কাঠামোয় হিন্দি সুরকারুর চালচিত্র এমন সুন্দর করে সাজাতে পারতেন না কখনই। তাছাড়া, লখনৌয়ে বহু বৎসর থেকে সেখানকার সেরা ঠুংরির রস তাঁর কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছিল তো, তাই যে-রসে নিজে রসিয়ে উঠেছিলেন অপরকে সে-রসের রসিক ক'রে তুলতে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি। কী ভাবে লখনৌয়ের ঠুংরি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি স্মৃতিচারণী ঢঙেই।

বলেছি, বিলেত থেকে ফিরে আমি নানা ওস্তাদের ও বাইজির কাছে খেয়াল ও ঠুংরিতে তালিম নেওয়া শুরু করি। লখনৌয়ে অচ্ছন বাইয়ের কাছে পৌঁছই

অতুলদারই মাধ্যমে। হ'ল কি, লখনৌয়ে সেবার যেতেই অচ্ছন বাইয়ের গান শোনার সুযোগ হ'ল এক বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়িতে। বাইজীর দক্ষিণা অতুলদাই দিয়েছিলেন, কারণ সে-ভদ্রলোকের পক্ষে অত খরচ করা সম্ভব ছিল না। আমি অতুলদাকে ধরেছিলাম—অচ্ছন বাইয়ের গান না শুনলে মান থাকে না। অতুলদা হেসে বলেছিলেন : "কেবল দেখ দিলীপ, প্রাণ নিয়ে না টানাটানি হয়।"

বলতে মনে পড়ল এক মজার ঘটনা—যে-আসরে তাঁর গান হয় সে-আসরের আমিই ছিলাম কর্মকর্তা। কিন্তু ওমা, অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে দেখি, অনেকেই আতঙ্কে যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন : "বল কী দিলীপ? আমরা বাইনাচ দেখতে যাব?" আমি বললাম : "নাচ নয়, শুধু বৈঠকী গান।" তাঁরা তবু মাথা চুলকে বললেন : "তবু—বাই তো। মানে—বুঝলে না, আমাদের একটা ঠাট বজায় রাখতে হয় কিনা!" কী করি—বিষণ্ণ মুখে ফিরে গিয়ে অতুলদাকে সব বললাম। তিনি হেসেই কুটি কুটি, বললেন : "শুধু ঠাট নয় দিলীপ, ঠমকও আছে।"

যাহোক, সে-আসরে দু' একজন অধ্যাপক দুর্গা বলে এসে এক কোণে গলাবন্ধ জড়িয়ে জুজুবুড়ি হয়ে ব'সে গান শুনেছিলেন। এদের মধ্যে একজন পরে আমার কাছে এসে একদিন ফিসফিস ক'রে বললেন, "দিলীপ, আহা কী গানই শোনালে! শুনি, তুমি তাঁর ওখানে যাও গান শিখতে—আমাকে—মানে—ইয়ে—একদিন লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারো?"

এমনিই গাইতেন অচ্ছন বাই : অধ্যাপক যে অধ্যাপক সেও চায় লুকিয়ে গিয়ে শুনে আসতে—অতুলদার ভাষায়—প্রাণের মায়া ছেড়ে! যাক।

আমি অচ্ছন বাইয়ের অপরূপ চালে এতই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে অবিলম্বেই তাঁর কাছে দিনের পর দিন গিয়ে অনেকগুলি ঠুংরি শিখেছিলাম। সেকথা পরে বলছি। সেদিন সন্ধ্যায় এ-মহীয়সী গায়িকা কী গানই যে গাইলেন সমজদার শ্রোতা পেয়ে! কোনোদিন কি ভুলব তাঁর "মুকুটধারী কান্‌হ বাজায়ে বাঁসিয়া রে!" সে কত তান, কত মিড়, সুরকে নিয়ে কত আদর, কখনো অশ্রু কখনো আনন্দ······মনে হ'ল বুঝি সত্যিই মুকুটধারীর মুরলী শুনছি! অতুলদার চোখ আবেশে সজল হয়ে এল সাবাস দিতে দিতে। ধূর্জটি ও আমারো অবস্থা তথৈবচ। অতুলদার সঙ্গে দাদা পাতিয়েছিলাম কি সাধে? অমন খাঁটি সুরপ্রেমিক জীবনে কটাই বা দেখেছি? যাহোক বলি যা বলবার জন্যে এ-প্রসঙ্গের অবতারণা।

পরদিন সন্ধ্যায় অতুলদা আমাকে তাঁর সুরম্য ছাদে ডাকলেন। নিজের গান

শোনাতে তিনি সত্যিই লজ্জা পেতেন, তার উপর ঈষৎ তোৎলামি তাঁর সৌকুমার্যকে আরো মধুর ক'রে তুলত। বললেন লাজুক স্বরে: "দিলীপ……কৃ-কাল রাত্রে একটি গ্-গান বেঁধেছি। কৃ-কেমন হয়েছে কে জানে?"

আমি সোৎসাহে ধরলাম: "এক্ষুনি শিখিয়ে দাও।"

অতুলদা: আহা……শ্-শোনোই তো আগে……ত্-তারপর তো বিচার……

আমি (হেসে): না অতুলদা, তোমার গান যখন, তখন আগে ফাঁসি তারপর বিচার।

অতুলদা হো হো করে হেসে উঠলেন—সে প্রাণখোলা হাসি আজও কানে বাজে। পরে তাঁর সুকুমার লাজুক ভঙ্গিতে, সুমিষ্ট সুরেলা কণ্ঠে গাইলেন:

চাঁদিনি রাতে কে গো আসিলে।
উজল নয়নে কে গো হাসিলে!
মোহন সুরে ধীরে মধুরে
পরাণ বীণায় কে গো বাজিলে……

সেদিন সন্ধ্যায় ধূর্জটি আসতেই তাকে গেয়ে শোনালাম এ-গানটি নিজে নানা তানে মিড়ে সমৃদ্ধ করে। ধূর্জটি আনন্দে আত্মহারা, বলল হাততালি দিয়ে: "কী গানই বেঁধেছেন অতুলদা! উঃ!"

অতুলদা (সুকণ্ঠে): না না। হয়েছে কি—দ্-দিলীপ গাইছে তো। ম্-মানে—কৃ-কণ্ঠ—বুঝলে না?

কিন্তু তারিফের কথা অবান্তর। প্রাসঙ্গিক কথাটা হচ্ছে এই যে, এ-গানটি পরে বাংলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল এইজন্যেই যে, এর ঠুংরি চালে বাঙালি রসিক পেয়েছিল বাংলা কবিতার ভাব ও হিন্দি ঠুংরির সুর, দুইয়ের মনোহর সমন্বয়—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, অর্ধনারীশ্বর যুগলমিলনের রস। এই সঙ্গে আরো স্মরণীয়: অচ্ছন বাইয়ের নানা মর্মস্পর্শী মিড়, কম্পন ও সূক্ষ্ম কারুকাজ এ-গানটির মধ্যে সহজেই অনুপ্রবেশ করেছিল অতুলদার শিল্পিহৃদয়ের আনন্দের সহজ তাগিদে। তাই না চিরন্তনীর উজল নয়নের চাহনি সুরে বিগলিত হয়ে তাঁর প্রাণের বীণায় বেজে উঠেছিল। এর পরে আমার ও কাজি নজরুলের কয়েকটি সুর নিয়েও তিনি গান বেঁধেছিলেন কয়েকটি। এইজন্যেই বলছিলাম, তিনি এসেছিলেন বাংলা গানের সুর-উচ্ছলতার জোয়ারের দিনে তাঁর সুকুমার হৃদয়ের প্রেম নিয়ে, লাজুক মনের মাধুর্য

নিয়ে, সূক্ষ্ম আবেশের রং নিয়ে। এক কথায় তাঁর গান হিন্দি ঠুংরির নকল ছিল না বলেই বাঙালি তাঁর রসসৃষ্টিকে সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং ভবিষ্যতেও করবে যদি তাঁর গানের প্রাণের রসটি ঠিক ম'ত পরিবেশন করা যায়।

কিন্তু বলি, এই সূত্রে আমার এই সময়কার জীবনপটের আরো কিছু কাহিনী —কেন না তা থেকে সে-সময়ের সঙ্গীতআবহের কতকটা পরিচয় মিলবে।

রোলাঁর কথা আমি ভুলি নি, তাঁকে মাঝে মাঝেই সব খবর দিয়ে বড় বড় চিঠি লিখতাম। তিনিও খুশি হয়ে লিখতেন—চলো গানের অভিসারে। রবীন্দ্রনাথও দিতেন দিলাশা। সর্বোপরি, অবাঙালি তথা বাঙালির মধ্যে বহু অনুরাগী অনুরাগিণীর উৎসাহ ও প্রশংসমান দৃষ্টি আমাকে উদ্দীপিত করে তুলল। আমি সুভাষের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে, কলকাতায় একটি মস্ত সঙ্গীতসদন তৈরি করতেই হবে —মিউজিকাল আকাডেমি। ইতঃপূর্বে শ্রীমদনমোহন মালব্য আমাকে দু' তিনবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতের আসন (chair) গ্রহণ করতে, ও আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছিলাম যে, কলকাতায় আমাকে একটি সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, কাজেই……ইত্যাদি। বলতে ভুলেছি, রবীন্দ্রনাথও আমাকে সস্নেহে ডাক দিয়েছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনে। সেখানে যাওয়ার সাধও আমার খুবই ছিল—বিশেষ করে তাঁর দুর্লভ সঙ্গের লোভে, কিন্তু শুধু যে কলকাতা আমাকে পেয়ে বসেছিল তাই নয় আমার পরম শুভার্থী, আত্মীয় ও বন্ধুরা সবাই বাধা দিলেন। শরৎদা বললেন: "তুমি গেলে আমাদের গান শোনাবে কে?" সুভাষ বলল: "দেশের কাজে চ্যারিটি করে টাকা তুলবে কে?" অতুলদা ব্যস্তসমস্ত হয়ে লখনৌ থেকে রসিকতা করে পত্র লিখলেন: "বাংলা দেশে গান ছড়িয়ে দিতে হলে কলকাতাকেই তোমার সুয়োরানী করতে হবে।" পরে আমার সঙ্গে দেখা হতে তিনি বলেছিলেন: "দেখ দিলীপ, রবীন্দ্রনাথ বিরাট পুরুষ, কিন্তু জানো তো বড় গাছের আওতায় এমন কি চারাগাছও বাড়তে পায় না……" ইত্যাদি। এ সূত্রে বলি—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলাগানে গায়কের তানবিস্তারের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রায়ই আমার যে-দ্বন্দ্ব চলত সে-দ্বন্দ্বে অতুলদা ছিলেন আমার দিকেই। কিন্তু এ-নির্বিবাদী অজাতশত্রু মানুষটি কারোর মনেই আঘাত দিতে চাইতেন না, তাই আমাকে বলতেন: "রবিবাবুকে বোলো না কিন্তু দিলীপ, তুমি আবার যে মুখহলসা মানুষ— ভয়ে মরি।" আমাকে নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না—ঝোঁকের মাথায় আমি কখন কী করে বসি!

এই মানুষটির মধ্যে দেখেছিলাম আশ্চর্য পরকে আপন ক'রে নেওয়ার শক্তি। লখনৌতে তাঁর নিরুপম নিলয়ে তাঁর কত যে ভক্ত ও অনুরাগী তাঁর সান্ধ্য মজলিশের গালগল্পের মলয়ানিলে উজিয়ে উঠত সে একটা দেখবার জিনিস ছিল। কিন্তু গালগল্প ভালোবাসলেও তাঁর প্রাণের উপজীব্য ছিল—গান। তাঁর একটি সুন্দর গান তিনি জৌনপুরী তোড়িতে বসিয়ে আমাকে প্রায়ই শোনাতেন :

ওগো দুঃখ সুখের সাথী,
সঙ্গী দিন রাতি, সঙ্গীত মোর !
তুমি ভবমরুকান্তার মাঝে
শীতল শান্তির লোর।

তাঁর একটি সুবিখ্যাত গান সম্বন্ধে একটি বড় অপরূপ স্মৃতি মনে পড়ে। অতুলদার ও-গানটি আজও আমার কাছে তেমনি প্রিয়ই আছে—ভৈরবী ঠাটে বাঁধা :

কী আর চাহিব বলো হে মোর প্রিয় !
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।
যে পথে চালাবে নিজে
চলিব চাব না পিছে
তুমি যাহা ভালো বোঝো তাই করিও।
বলিব না—রেখো সুখে,
চাহো যদি রেখো দুখে
আমার ভাবনা প্রিয় তুমি ভাবিও।
দেখ সকলে আনিল মালা,
ভকতি চন্দন থালা,
আমার এ-শূন্য ডালা তুমি ভরিও।

একদিন অতুলদা কি-একটা কাজে বাইরে গেছেন। আমি তাঁর ঠাকুরঘরে একলা ব'সে এ-গানটি গাইতে গাইতে ভাবাবেশে চোখের জল রাখতে পারি নি। গানের শেষে উঠে দাঁড়াতেই দেখি—সামনেই অতুলদা—তাঁরও চোখে জল। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন গাঢ়কণ্ঠে : "জানো দিলীপ, এ-গানটি আমি বেঁধেছিলাম আমার জীবনের এক দারুণ দুঃখের সময়ে—যখন মনে হয়েছিল······যাক্ সে কথা আর একদিন বলব—" ব'লেই চোখের জল গোপন করতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। সেদিন আমি অতুলদাকে দেখতে শিখি এক নূতন দৃষ্টিতে। জীবনে দুঃখ পায় শতকরা

একশোজনই। কিন্তু কজন বেদনাকে বোধনায় রূপান্তরিত করিতে পারে অন্তঃশক্তির রসায়নে? গ্যেটে বলতেন প্রায়ই যে, গভীর দুঃখ পাওয়াও সার্থক যদি সে-দুঃখে একটি গানও ফুটে ওঠে আঁধারে তারার মত। কিন্তু একথা সাজে কবিরই মুখে। সাধারণ মানুষ দুঃখে হাহাকার ক'রেই মরে, এক কবিই দুঃখের দহনে ধূপের সৌরভ বিলাবার শক্তি ধরেন। অতুলদা ছিলেন কবি—তাই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন:

হৃদয়ের শব্দ শুনে
চমকি ভাবি মনে:
ঐ বুঝি এল বঁধু মৃদুল চরণে!
পরাণে লাগলে ব্যথা ভাবি বুঝি—আমায় ছুঁলে!
বঁধু আমার
আর কতকাল থাকব বসে দুয়ার খুলে
বঁধু আমার!

এর পরে অতুলদার সঙ্গে আমার স্নেহ-সম্বন্ধ নিবিড় হয়ে উঠল দুটি আনন্দের যোগাযোগে: এক আমি তাঁর গান সর্বত্র প্রচার করার ফলে তিনি গানের পর গান বাঁধতে আরম্ভ করলেন—একে বলতে পারি সাঙ্গীতিক লাভ। দুই: আমাদের গানের আনন্দ পেতে আমরা নানা অভিযান শুরু করলাম—কখনো মধুপুরে কখনো সুন্দরবনে স্টীমারে, কখনো বা শিমুলতলায় আমার বোন মায়ার সুরম্য ভিলায়। একে নাম দেওয়া যেতে পারে হার্দিক লাভ। দুয়ের যোগাযোগে গানে গানে আমরা যেন মাতাল হয়ে উঠতাম অতুলদা যোগ দিতে না দিতে। কিন্তু তাঁর গানের কথায় ফিরে আসি।

আমি দিনের পর দিন তাঁর কাছে তাঁর নানা গান শিখে তানবিস্তারে সমৃদ্ধ ক'রে শুধু যে বাংলার নানা শহরে গেয়ে বেড়াতাম তাই নয়, ঐ সঙ্গে নানা বক্তৃতা দিয়ে সঙ্গীতরসিকদের সোৎসাহে বোঝাতাম—অতুলদার সুরকার-বৈশিষ্ট্যটি কী। কিন্তু এ নিয়ে বহু লেখা লিখেছি, তাই আজ আর নতুন করে এ-গবেষণা করতে মন চায় না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে অতুলদার গানের সহজ সরল কথার আবেদন ঠুংরির সুরমাধুর্যের মাধ্যমে সত্যিই এক বিচিত্র রসাবেশের সৃষ্টি করত যাতে সঙ্গীতকোবিদরা সবাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আজ বাংলাদেশে দ্বিজেন্দ্রলালের বা অতুলপ্রসাদের গানের শুনি সে-আদর নেই শুধু রবীন্দ্র-সঙ্গীতেরই জয়জয়কার। আমিও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুরাগী। কিন্তু সুরকার হিসাবে আমি আজো দ্বিজেন্দ্রলাল

ও অতুলপ্রসাদেরই বেশি পক্ষপাতী। এ নিয়ে বেশি নাই বললাম—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত যাঁরা সত্যিই ভালোবাসেন তাঁদের মনে আঘাত লাগতে পারে, কাজ কি? তাই আমি তাঁকে পাশ কাটিয়ে শুধু অতুলদার সুরভঙ্গি ও কলাকারু সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কথা ব'লেই ক্ষান্ত হব।

আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে পিতৃদেব কি অতুলদার শ্রেষ্ঠ গান বাংলাদেশে আজকের দিনে খুব বেশি লোকপ্রিয় হবে না। তবে লোকপ্রিয়তাকে আমি কোনো শিল্পেরই একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ব'লে গ্রহণ করতে পারি নি। কোনো শিল্পের শ্রেষ্ঠ আবেদন কোথায় ও কোন্ পথে ফুটে ওঠে তার বিচার করতে হ'লে সব আগে বিচার করতে হবে "কার কাছে" ফুটে উঠছে, বিচারক কে? এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কাব্যের রস কোন্ নিকষে কষতে হবে এ নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বহু আলোচনার অন্তে আমি তাঁর মতে সায় দিতে বাধ্য হই—যেকথা তিনি আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন—যে: "Contemporary judgments we know to be unreliable there are only two judges whose joint verdict cannot easily be disputed : the World and Time, but the world's verdict is secure only when it is confirmed by Time—the verdict of posterity."

অর্থাৎ জনমত আর কাল এই দুই বিচারকের রায়ই প্রামাণ্য, এবং জনমতের রায় বলতে বোঝায় না তার আজকের রায়, বোঝায় অনাগত বিশ্বের লোকমতের পাকা রায়। রবীন্দ্রনাথও একথা বলতেন প্রায়ই নানা সূত্রে যে, সমসাময়িকদের বিচার নির্ভরযোগ্য নয়। আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন: "নিজের বিচারবুদ্ধি আমি অন্ধভাবে বিচার করি নে··· আমাদের ছুটির পরে যে আদালত বসবে তার উপরেই শেষ বিচারের ভার রইল। কিন্তু হায় রে, শেষ বিচারের দরবার শতাব্দীর কোন্ প্রান্তে বসবে তা কেউ বলতে পারিনে।" (তীর্থংকর, ১৯৯ পৃ:) মোদ্দা কথা, মানুষের রুচির তাপমান যন্ত্র বহু ওঠাপড়ার পর কালাতিপাতে খানিকটা থিতিয়ে না এলে কোনো কলাকারুর যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

তাই আমার মনে হয় যে, দ্বিজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্ত বা অতুলপ্রসাদের গানের সুরভঙ্গির বৈশিষ্ট্য আজ সাধারণের কাছে তেমন আদর না পেলেও আমাদের ক্ষুণ্ণ হবার কোনো কারণ নেই, যেহেতু কালের দরবারেই হবে শেষ বিচার—যাকে কেউ কাটতে পারবে না। এছাড়া আর সব বিচারই সাময়িক, কাজেই অপল্কা।

এইটুকু মাত্র বলে সংক্ষেপে দুকথায় বলি কেন অতুলদার শ্রেষ্ঠ গানকে আমি গানের দিক থেকে রসোত্তীর্ণ মনে করি।

এখানে একটু থেমে বলে নিই, গানের দিক থেকে রসোত্তীর্ণ বলতে কী বুঝেছি।

অতুলদার অনেক গানেই ছন্দের খুঁৎ আছে। উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য হবে—যে-কোনো ছন্দজ্ঞই তাঁর নানা মনোজ্ঞ গানেও ছন্দপতন ধরতে পারবেন। এরকম ছন্দের খুঁৎ রবীন্দ্রনাথেরও অনেক গানে আছে, দ্বিজেন্দ্রলাল রজনীকান্তেরও কোনো গানের মাত্রা সুরের টানে টেনে পড়তে হয়। কিন্তু তবু বলব যে অতুলদার ছন্দের কান রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্তের মতন অনুশীলিত ছিল না। মানে তাঁর অনেক গানে এমন সব ছন্দপতন আছে যাকে সহজেই নিখুঁৎ করা যেত এবং করলে সুরের জৌলুষ বাড়ত বৈ কমত না। এরূপ ক্ষেত্রে যে গানের ছন্দও নিখুঁৎ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এ নিয়ে বোধ করি রসিক সমাজে মতদ্বৈধ হবে না।

কিন্তু একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মানতেই হবে যে অতুলদার অনেক গানেই ছন্দের ফাঁক সুরে এমন অপরূপ ভাবে ভরাট করা হয়েছে যে ফাঁক রাখা অন্যায় হয় নি—যথা ধরা যাক তাঁর "শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।" রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গানের নজির দিচ্ছি আমার এ-ওকালতির স্বপক্ষে :

না না গো না কোরো না ভাবনা
যদি বা নিশি যায় যাব না যাব না ·· ··· ··

চিরকুমার সভায় এ-গানটি সুরে শোনবার সময় আমার মন আনন্দে উজিয়ে উঠেছিল—তাই বলছি এ-গানে ছন্দপতনকে খুঁৎ বললেই ভুল হবে। নৃতনাট্য চিত্রাঙ্গদার অধিকাংশ গানেই রবীন্দ্রনাথ এই ভাবেই সুরের জন্যে ফাঁক রেখেছেন তাঁর ছন্দে। আমি এ-গানগুলি সুরের সঙ্গতে শুনি নি, তবে মনে আছে রবীন্দ্রনাথ আমাকে প্রায়ই বলতেন যে কাব্যে ছন্দকে নিখুঁৎ করা চাইই বটে, কিন্তু গানের বেলায় সময়ে সময়ে সুরকে ছাড়া দেওয়ার জন্যে ছন্দের ফাঁক রাখলে অপরাধ হয় না।

একথা সশ্রদ্ধে মেনেও বলব যে অতুলদার অনেক গানের ছন্দে এরকম ফাঁক সমর্থনীয় হলেও তাঁর অনেক ছন্দে—তথা মিলে—কান ব্যাহত না হয়েই পারে না। কিন্তু এটুকু উল্টো গেয়ে ফিরে তাঁর গানের সাধুবাদে বলতে পারি অসঙ্কোচেই যে, তাঁর শ্রেষ্ঠ গানে মন যে গভীর আনন্দ পায় তার জন্যে সঙ্গীতরসিকদের কাছে তিনি চিরদিনই বাংলার একজন বড় কবি না হোন, সুরকার বলে আদরণীয় থাকবেনই থাকবেন।

অতুলপ্রসাদের সুরশৈলী সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া হবে পণ্ডশ্রম, কেননা যা কেবল কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে তার বৈয়াকরণিক ব্যাখ্যা করবে কে? তবে তাঁর গানের ভাবের সম্বন্ধে কিছু না বললেই নয়। সংক্ষেপেই বলব—শুধু এইজন্যেই নয় যে তাঁর গানের কাব্যরস সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমার নানা ভাষণে যথেষ্ট বলেছি, এজন্যেও বটে যে, স্মৃতিচারণের প্রধান উপজীব্য গবেষণা নয়—ছবি আঁকা। তাই বলি দু' কথায়—যা পারি।

তাঁর গানের একটি প্রধান গুণ—সবারই মন টানে: তাঁর সরল প্রকাশভঙ্গি: এত সরল যে, শুনতে না শুনতে সে-ভাবের মাধুর্য বুকের তারে বেজে ওঠে—যাকে ইংরাজিতে বলা চলে direct appeal. এ-সরলতায় তিনি চেষ্টা ক'রে পৌঁছন নি —পৌঁছেছেন না ভেবে চিন্তে—যা তাঁর প্রাণে বেজে উঠেছে তাকে ঠিক সেইভাবেই পরিবেষণ করেছেন উপমা উৎপ্রেক্ষা অনুপ্রাস অলঙ্কারকে পাশ কাটিয়ে। তাঁর গান শুনতে শুনতে মনে হয়, দৈনন্দিন ঘরকন্নার মধ্যে দিয়ে যেন একটি সরল উচ্ছ্বাসী কবি-হৃদয় নিজের মনের কথা ব'লে চলেছে তার আনন্দ বেদনা আশা নিরাশার পসরা নিয়ে। এই দৈনন্দিন সরলতা তাঁর কাব্যে গুনগুনিয়ে উঠেছে একটি মৃদু পেলব লিরিক রসে রসিয়ে। লিরিক-এর বাংলা প্রতিশব্দ—গীতিকাব্য। কিন্তু গানেরও নানা রূপ। অতুলপ্রসাদের গান চেয়েছে একান্ত ক'রে গানের ঘরোয়া রূপ, যার ভাব সরল, ছন্দ সরল, ভাষা সরল, ভূষণ সরল। তাঁর গানে নেই কল্লোল, ওজস্, ধ্বনিসমৃদ্ধি গঠন-চাতুরী। কিন্তু কোনো কবিরই কাব্যে কী নেই তা দিয়ে তার বিচার চলে না—কী আছে তাই দিয়েই তাকে কষতে হবে, নৈলে সে হবে অবিচার। এসব কথা বলছি তাঁর গানকে ছোট করতে নয়, কারণ যে-গান গান হয়ে উঠেছে, তাকে ছোট করে কার সাধ্য? ভাষা প্রকাশ-শক্তিতে পরম হয়ে ফুটে উঠল সাহিত্যে, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ কাব্যে, কাব্যের চরম অভিব্যক্তি গানে। তাই অতুলপ্রসাদের গান গান হয়ে উঠেছে বলবামাত্র তাকে সেরা শিরোপাই দেওয়া হচ্ছে—আরো এইজন্তে যে, সে-গানে আমরা পাই হৃদয়ের স্বতঃ-উৎসারিত আনন্দ বেদনা যার গতি নির্বাধ, ভাব সরল, রস মধুর, স্পর্শ স্নিগ্ধ। তাই তো তাঁর শ্রেষ্ঠ গানের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে কবির আপনভোলা আত্মপ্রকাশ—দার্শনিকের বুদ্ধিবৈভব নয়;

প্রার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনা—তত্ত্বজ্ঞানীর আপ্ত-বাক্য নয়। যথা (পুরো গানগুলির জন্যে অতুলপ্রসাদের "গীতিগুঞ্জ" দ্রষ্টব্য) :

যদি তোর হৃদযমুনা হোলো রে উছল রে ভোলা,
তবে তুই একূল ওকূল ভাসিয়ে দিয়ে চল-রে ভোলা!
যে আসে মনের সুখে
যে আসে ফুল্ল মুখে,
টেনে নে সবায় বুকে—তোর থাক না চোখে জল রে ভোলা!
জীবনের হাটে আসি'
বাজা তুই বাজা বাঁশি,
থাক না সেথা বেচাকেনার দারুণ কোলাহল রে ভোলা!......

কখনো তিনি শোনেন ডাক—কিন্তু ছুঁয়েও ধরতে পারেন না :

কে যেন আমারে বারে বারে চায়!
আমি তো চিনি নি তারে, সে চেনে আমায়।
যবে থাকি ঘুমঘোরে
কে দোরে আঘাত করে,
"কে তুমি"?—ব'লে ডাকিলে কে যেন পালায়।......

কখনো দুঃখের মাঝে পেয়েছেন ভরসা, তাই হয়েছেন অভয় :

বিধি, আর তো তোমারে নহি ডরি
আমি পেয়েছি অকূলে আজি তরী।
হানো যদি খর বাণ,
আমারো তো আছে গান,
আমি সমুখে রহিব তারে ধরি
যারে ব্যথা দিবে তুমি
তাহার নয়ন চুমি,
লব যতনে বেদনা তার হরি'।......

কখনো শুধু মধুর নিবেদনেই আশা কৃতার্থ :

বঁধু ধরো ধরো মালা পরো গলে,
ফিরে দিয়ো না বনকুসুম ব'লে।

কাঁটার ঘায়ে, রাঙা হাতে,
ফুল তুলেছি আঁধারে দুখ-রাতে,
তাহে গেঁথেছি বিজনে আঁখি জলে।.....

কখনো শুধু স্মরণ ক'রে ব্যথার বিলাসেই পরম তৃপ্তি :

তাহারে ভুলিব বলো কেমনে?
গাঁথা যে সে তব শত গানে যতনে।
কি হবে রুধিয়া দোর
ভাঙা যে হৃদয় তোর,
মানিবে না মনচোর বাহিরের বারণে।......

এই ধরনের কত উদাস করুণ গানেই যে তিনি সুরের আলোয় আনন্দ-বেদনার অপরূপ রস পরিবেষণ করেছেন—কিন্তু শুধু গানের পদাবলি উদ্ধৃত করে কী ক'রে ফোটাব সে-মাধুর্য—যা বহুকাল আগে ফোটাতাম আমার তরুণ মনের রঙিন আবেগে?

তাই গানে তাঁর আর একটি দানের কথা উল্লেখ ক'রেই আমি অতুলপ্রসাদের গীতি-মূল্যায়ন-পর্বের সমাপ্তি টানব: বলব তাঁর ভক্তির কথা।

ভক্তি বলতে আমি শুধু ভক্তিসূত্রের সংজ্ঞা দিচ্ছি না যে "পরানুরক্তিরীশ্বরে"। অনুরাগ তো বটেই, কিন্তু জীবনে এ-অনুরাগ সব আগে প্রকাশ পায় কিসে? না, পূজায়। অবশ্য মানবিক প্রেমের উচ্চতম বিকাশেও পূজার ভাব থাকবেই থাকবে, কিন্তু তাতে ঐ সঙ্গে আরো অনেক মিশেলও থাকে। ভগবদ্‌ভক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশে—কি না অহৈতুকী প্রীতিতে—পূজাই হয়ে ওঠে তার পরম ও চরম লক্ষ্য। ভারতের ভক্তিসাধকদের শ্রেষ্ঠ গানে এ কথার পরিচয় মিলবে ছত্রে ছত্রে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ গান সব দেশেই বিরল তাই খুব কম সাধন-সঙ্গীতেই ভক্তির সৌরভ মেলে লিরিক রসে জড়িয়ে। আমাদের আগেকার যুগে (generation) ভক্তির গানে ফুলের মতন ফুটে উঠছিলেন চারজন কবি: দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদ। এঁদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ সর্বকনিষ্ঠ তথা অনলংকৃত কবি। তাই তাঁর গানের ভাব ও ভাষা দুইই হিন্দুসুলভ ঘরোয়া ভক্তির মধুর উচ্ছলতা জাগায়—আরো এইজন্যে যে, তিনি গ'ড়ে উঠেছিলেন ইঙ্গবঙ্গ ব্রাহ্মদের আধুনিক আবহাওয়ায়। আমাকে এখানে ভুল বুঝবার সম্ভাবনা আছে ব'লে একটু টীকা

করি। ব্রাহ্মদের মধ্যে ভক্তি নেই একথা কেউই বলবেন না ; আমার "বাল্যস্মৃতিতে" আমি খাঁটি ভক্তিমান্ ব্রাহ্মদের প্রণাম জানিয়েছি, এখনো তাঁদের আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ভক্তি থাকলেও যে কবিত্ব ছিল না একথার প্রকৃষ্ট পরিচয় মিলবে ব্রহ্মসঙ্গীতের পাতা উল্টোলেই। রবীন্দ্রনাথের গানগুলি বাদ দিলে দেখা যাবে, প্রায় সাড়ে পনের আনা ব্রহ্মসঙ্গীতেই ভক্তি ফুটতে পায়নি গদ্যের গুরুগম্ভীর শাসানিতে। দৃষ্টান্ত দেওয়া বাহুল্য হবে, তাই কেবল একটিমাত্র পরিচায়ক (typical) ব্রহ্মসংগীতের চারটিমাত্র চরণ উদ্ধৃত করি যেটি ছেলেবেলা আমি গাইতাম সোৎসাহে :

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, প্রণমি চরণে তব
প্রেমভক্তিভরে শরণ লাগি
দুর্মতি দূর করি শুভমতি দাও হে,
এই বরদান ভগবান্, মাগি।

শুনতে না শুনতে মন ডরিয়ে ব'লে ওঠে নাকি : "বাবা গো!

হয়েছিল কি, সে-সময়ে এ-শ্রেণীর গানের রচয়িতারা প্রাণে ভক্তি অনুভব করলেও তাকে গানে প্রকাশ করবার কৌশলটি জানতেন না যার নাম আর্ট বা হৃদয়ের রসায়নসিদ্ধি। অতুলপ্রসাদ স্বভাবে কবি হওয়া সত্ত্বেও এ-সাহেবী ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার দরুণ প্রথমদিকে এ নীরস শৃঙ্খল ভারিক্কিয়ানার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান নি, তাই লিখেছিলেন এমন নিছক গদ্যাত্মক গান :

"ক্ষমিয়ো হে শিব, আর না কহিব
দুঃখ বিপদে ব্যর্থ জীবন মম।

মৃত্তিকা বলে মোরে : "ওরে মূঢ় নর,
হৃদয়-আঘাতে তব এত কেন ডর ?
দীর্ঘ মম বক্ষ যত, আঘাত যত খর,
শস্য সুফল তত ততই শ্যাম মনোরম।"........

কিংবা কুলীন ব্রহ্মসঙ্গীতের ধনুর্ধর টংকারে :

বিঘ্নহরণ সুখবিধায়ক নায়ক একচ্ছত্র বিশ্বেশ্বর ;

ধরণীধর জগপতি গুরু মহেশ
ঋদ্ধি সিদ্ধি বিধাতা, গুণীন্দ্র মহান-,
বিপদকলুষ হর কৃপানিধি বিধি
অসীম চির-অবিনাশ
দুখীজন-পিতা পাতা বন্ধু দীনেশ।"

গীতিগুঞ্জে এ-গানটি ছাপা না হ'লে বিশ্বাসই করতে পারতাম না যে, স্বভাব-গীতিকার অতুলপ্রসাদ এর রচয়িতা।

কিন্তু ঠিক এইজন্যেই তাঁর হৃদয়ের জয়ধ্বনি করা যায় আরো আশ্বস্ত হয়ে। কেননা, এই হৃদয়ের প্রেমের টানেই তিনি এ জাতীয় গুরুগম্ভীর ব্রাহ্ম স্কুলমাস্টারির হুমকি ছেড়ে চলতে শিখেছিলেন হিন্দুদের প্রাণোচ্ছলতার পথে। নৈলে তাঁর হৃদয়ে কখনই নামত না ভগবৎ-করুণার ধারা ভক্তির ঢল—তিনি প্রেমের ঠাকুরের পায়ে এমন ক'রে মাথা কুটতে পারতেন না :

শকতি নাই তোমায় ধরি,
হার মেনেছি হে শ্রীহরি,
দিয়ে খুলি' চোখের ঠুলি
দেখা দাও হে দুঃখহর!

অতুলপ্রসাদ স্বভাবে বড় অমায়িক ছিলেন, কাউকেই সহজে "না" বলতে পারতেন না। তাই দশচক্রে পড়ে তিনি অনেক সময়েই চলতেন, পরধর্মকে স্বধর্ম ভাবতে চেষ্টা ক'রে। পারেন নি—আর অমনি ফিরে এসেছেন গুটি গুটি নিজের এলাকায়—কি না গানে। লিবারেলদের পাল্লায় প'ড়ে নিষ্ফল ভাষণ দিয়েছেন ফাঁপা রাজনীতির অপলকা রঙ্গমঞ্চে—কিন্তু তার পরেই টের পেয়েছেন যে,এ তাঁর কাজ নয়—স্বদেশসঙ্গীত লেখাও তাই তাঁর ব্যর্থ হয়েছে, কেন না দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্তের মত দেশভক্তি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। ভক্তির দিকেই ছিল তাঁর হৃদয়ের সহজ তথা প্রবল টান। বলেছি, মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন সরল, উদার একরোখা—তর্ক, বিতণ্ডা, সংশয়, বিচার—এসবের তিনি ধার ধারতেন না। তাই যখনই জীবনে গভীর দুঃখ পেয়েছেন, শরণ চেয়েছেন দুঃখহারীর কাছে। গেয়ে উঠেছেন : "আমারো তো আছে গান"! তাঁর মুখে একটি গান আমার কী যে

ভালো লাগত !—গানটি দেশ রাগে তাঁর স্বকীয় সুকুমার ঢঙে রচিত। এ-গানটির ছন্দ সুরে শুনলে তবেই এর ত্রিমাত্রিক কদমের রস পুরোপুরি মিলবে। গানটি এই :

প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখি,
কেমনে বলো তাঁরে ডাকি,
কোন্ ভরসায় তাঁহারে মাগি ?
কুসুম ল'য়ে গন্ধ বরণ
নিতি নিতি যাঁরে করিছে বরণ
কোন-ফুলে বলো সে-পদ ঢাকি ?
নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে—যখন গাবে না পাখি,
কণ্টক দিব চরণে—যবে কুসুম মুদিবে আঁখি।
হেন পূজা যদি নাহি লাগে ভালো—
কেন তুমি মোরে করিলে কাঙাল ?
বলো হে হরি ! আর কতকাল
সুদিনের লাগি' রহিব জাগি' ?

এহেন ভক্তি যাঁর হৃদয়ে এমন সহজে ফুটে উঠেছে তাঁর সর্বোচ্চ উপাধি—"ভাগ্যবান্"। কারণ এ-সংসারে ভক্তের চেয়ে ভাগ্যবান্ কে ? অতুলদা ছিলেন স্বভাবে কবি ও স্বধর্মে ভক্ত তাই দুঃখ পেয়েও এমন সহজ স্বীকারে হিন্দু সাধকের সরল বিশ্বাসের অমল উচ্ছ্বাসে বলতে পেরেছিলেন :

তোমায় ঠাকুর, বলব নিঠুর কোন্ মুখে ?
শাসন তোমার যতই গুরু, ততই টেনে লও বুকে। ....
ভবের পথে শূন্য থালি,
বেড়াই ঘুরে দীন কাঙালী
দৈন্য আমার ঘুচবে যবে পাব দীনবন্ধুকে।

কিংবা

নীচুর কাছে নীচু হ'তে শিখলি না রে মন ?
সুখী জনের করিস সেবা দুখীর অযতন। (মূঢ় মন !)
লাগে নি যার পায়ে ধূলি, কী নিবি তার চরণধূলি ?
নয় রে সোনায়, বনের কাঠেই হয় রে চন্দন। (মূঢ় মন !)

কিংবা

সবারে বাসরে ভালো
(নইলে) মনের কালো ঘুচবে না রে!
আছে তোর যাহা ভালো ফুলের মতন দে সবারে
যারে তুই ভাবিস ফণী, তারো মাথায় আছে মণি,
বাজা তোর প্রেমের বাঁশি, ভবের বনে ভয় বা কারে?

এরকম মর্মস্পর্শী বহু গান তিনি বেঁধেছিলেন ভক্তির আবেশে। তাই তো তাঁকে আমি এত কাছে পেয়েছিলাম প্রাণের সহজ টানে। কারণ সংসারে যত গান আজ পর্যন্ত বাঁধা হয়েছে তাদের মধ্যে যুগে যুগে হৃদয়ের সবচেয়ে গভীর সুর বেজে উঠেছে ভক্তির গানে—বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে। তাই তো কৃষ্ণপ্রেম একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছিল :

"After all India is India!"

সত্যি কথা, তাই হাজার হাজার বাণীর ঘনঘোর তর্জন গর্জনের মাঝেও আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ সুরকার, শ্রেষ্ঠ বাউল, শ্রেষ্ঠ কীর্তনী চিরদিনই কান পেতে এসেছেন ঠাকুরের সেই ঘরছাড়া বাঁশির সুরে—যার জন্যে উদাস হয়ে বিলাত-ফেরত ব্রাহ্মকবি অতুলপ্রসাদও গেয়েছিলেন সরল হিন্দুর উচ্ছল আবেগে :

যদি যতই মরি ঘুরে তুমি ততই রবে দূরে
তবে কেন বাঁশির সুরে তব তরে শুধু ধাওয়াও?

কিন্তু এবার স্মৃতিচারণে ফিরে আসার সময় এল। কবি অতুলপ্রসাদের গান ও সুর সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হয়েছে, এবার কিছু বলি মানুষ অতুলদা সম্বন্ধে।

তিনি ছিলেন সেই জাতের মানুষ যারা বুদ্ধিকে মেনেও মানতে পারে না—হৃদয় এসে বাদ সাধে ব'লে। এইজন্যেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক হয়েও ব্রাহ্মদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন না। চলতি কেতা কানুন মেনে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। একথা বলছি না তিনি ভুল ভ্রান্তি করেন নি কখনো—যার জন্যে লোকে তাঁর 'পরে গভীর অবিচার করেছিল। আমাকে তিনি তাঁর জীবনের অনেক কথাই বলেছিলেন—কেন কখন কীভাবে তিনি ভ্রমে পড়েন। কিন্তু জগতে ভুল ভ্রান্তি হয়নি কার? অথচ তবু এমনিই বিচিত্র মানবচরিত্র যে, গড়পড়তা মানুষ অপরকে বিচার করার সময়ে অতি সহজেই

ভুলে যায় যে, সে নিজে কিছু অপাপবিদ্ধ অবতার নয়। অতুলদা ছিলেন স্পর্শকাতর মানুষ, তাই পাঁচজন যখন তাঁর ভুল ভ্রান্তির জন্মে তাঁকে কঠোরভাবে বিচার করত তখন তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে স'পে দিতেন তাঁর ঠাকুরের চরণে, গেয়ে :

সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া, তুমি তো আমার রহিবে
বহিবারে যদি না পারি এ-ভার তুমি তো বন্ধু বহিবে ॥
দুঃখেরে আমি ডরিব না আর, কণ্টক হোক কণ্ঠের হার,
জানি তুমি মোরে করিবে অমল, যতই অনলে দহিবে ॥

তিনি মিথ্যা বলেন নি, কারণ দুঃখ পেয়ে তিনি সত্যিই আরো মহৎ, আরো উদার-ধর্মী হয়ে উঠেছিলেন—যেজন্মে তাঁর অনুরাগী জুটেছিল অঢেল—শুধু বাঙালির মধ্যেই নয় সর্বপ্রদেশের সর্ববিধ মানুষের মধ্যেই। না জুটবে কেন? দানে মুক্তহস্ত, স্বভাবে সরল, ভাবাবেগে একরোখা, স্পর্শকাতর, সুরকার, বন্ধুবৎসল, বিদগ্ধ, সুরসিক·········গুণ কি ছিল তাঁর একটা? আমি প্রায়ই তাঁকে ডাকতাম "গুণধাম" ব'লে।

শেষে তাঁর রসিকতার কিছু পরিচয় দিয়ে এ-তর্পণের মধুরেণ সমাপয়েৎ করি।

পিতৃদেবের অট্টহাস্যের কথা বলেছি। অতুলদার হাসিও ছিল সেই জাতের। আমাদের এক রসিক আত্মীয় ছিলেন, তাঁকে আমরা ডাকতাম মণিমামা বলে : বিখ্যাত গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভাই। গল্প বলতে অমন রসিক মানুষ আমরা আর দেখি নি। সেবার শিমুলতলায় আমরা অতুলদাকে নিয়ে খুব গান-বাজনার আসর জমিয়েছি আমার বোন মায়ার বাড়িতে। আমার ভগিনীপতি শঙ্করও ছিল রসিক, বলল : "ডাক দাও মণিমামাকে।" ট্রেনভাড়া পাঠিয়ে তাঁকে টেনে আনা হ'ল ভাগলপুর থেকে। তাঁর রসিকতার দু-একটা নমুনা দেই—যা শুনে অতুলদা হাসতে হাসতে সত্যিই গড়িয়ে পড়তেন—মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠত। তার-পরই বলতেন—"উঃ এত হাসা আমার ভালো নয় দিলীপ—রক্তের চাপ বেশি কি না।"

কিন্তু মণিমামার রসনা একবার সঞ্চালিত হ'লে আমরা সবাই নিরুপায়—না হেসে পারব কে? মনে আছে পরে, একদিন ট্রেনে প্রশান্তর (মহলানবিশ) মতন রাশভারি মানুষেরও হেসে গড়িয়ে পড়া তাঁর গাল-গল্পে। পিতৃদেবেরও ঐ অবস্থা হ'ত সুরধামে। কিন্তু ভূমিকা রেখে গল্পে নামি।

মণিমামা একটু ভোজনবিলাসী ছিলেন, আর সবচেয়ে ভালবাসতেন নিষিদ্ধ পক্ষীর মাংস। যেদিন তিনি এলেন, শঙ্কর রামপক্ষী ফরমাস করল। মণিমামা সলজ্জে বললেন: "এ কী? শঙ্কর! এ যে দারুণ গুরু-পাক—ক্যারি!" কিন্তু না না করতে করতে তিনি খেয়ে ফেললেন অত্যধিক। পরদিন সকালে গানের আসরে বসতেই অতুলদা হেসে বললেন—"কী মণিবাবু! মুখ মেঘলা যে?"

মণিমামা: আর কেন অতুলবাবু! অকবির দুঃখ কবি কী বুঝবে? জঠর জ্বালাচ্ছে। হ্যাঁ—সকাল থেকে তিনবার—বুঝলেন না? কিন্তু আমার অসহায় অবস্থাটি একবার সমঝে দেখুন অতুলবাবু! আমি করি কী? আমার পেট হিন্দু, জিভ মুসলমান—অষ্টপ্রহর আমার দেহে দাঙ্গা বেধেই আছে······(করুণ হেসে) কিন্তু আমার পেটের কী পিটিফুল প্লাইট বলুন তো? ওরে অর্বাচীন! তোর কি এটুকু বুঝবার ম'তও ব্রেন নেই যে তোকে আমি সুবিধে পেলেই এত সরেস মাল দিই তোরই ভালোর জন্যে? তবু তুই-ই হলি কি না আমার সবচেয়ে বড় শত্তুর!

অথ অতুলদার অট্টহাস্য কল্পনীয়।

মণিমামা চমৎকার হার্মোনিয়ম বাজাতেন। গাইতেনও ভালো। সুরেনমামার কাছে শেখা গান। একদিন অতুলদা তাঁকে বললেন: "গান তো সুরেনবাবুর সেই মালকোষটি—আহা! সেই 'বন ঘন মুরলিয়া বাজি বাজি রে' কী গানই গান আপনার দাদা! লখ্‌নৌয়ের সেরা ওস্তাদরাও হার মানে তাঁর তানের কাছে।"

মণিমামা সহজে সুরেনমামার গান গাইতে চাইতেন না। কিন্তু অতুলদার উপরোধে গাইতে হ'ল। গাইলেন, কিন্তু জমল না।

অতুলদা: কিন্তু গান তো আজ তেমন ভালো হ'ল না মণিবাবু?

মণিমামা: ভালো হবে কোথকে অতুলবাবু? ভালো গান গাওয়া কি সোজা?

অথ অতুলদার পুনরট্টহাস্য।

এবার অতুলদার রসবোধের প্রসঙ্গ রেখে তাঁর রসিকতার দু' একটি নমুনা দিই।

অতুলদা বললেন: "তবে আমার গল্পও শুনুন মণিবাবু—যদিও আপনাকে টেক্কা দেওয়া অসম্ভব—তবু। (একটু থেমে হাসি চেপে) মনে করতেও হাসি পায়

মণিবাবু। সেবার আমার ওখানে এক গার্ডেন পার্টি দিয়েছি। এসেছেন গভর্নর সাহেব স্বয়ং। সেখানে ছিলেন এক বিখ্যাত তালুকদার। লখনৌয়ের তালুকদার, বুঝতেই পারেন। গভর্নর সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: শুনলাম এবার নাকি এ-অঞ্চলে প্লেগের বাড়াবাড়ি হয়েছে? তালুকদার সসম্ভ্রমে বললেন: "উঃ সে আর কী বলব সার? এমন প্লেগ আর কখনো হয়নি এ-অঞ্চলে— যারা এর আগে কখনো মরেনি তারাও এবছর পটল তুলছে (people who never died before are dying this year sir!)—হা হা হা।

মণিমামা: আমাদের এক বিহারী রাজাও অমনি বলেছিলেন এক গোরা সাহেবকে: you look fine sir, bloody। হো হো হো।

অতুলদা: আমাদের তালুকদাররাও বলতে পারেন এমন ইংরিজি। একদিন আমাদের কাউন্সিলে এক উপরওয়ালা সাহেব বললেন, গ্রামে জলকষ্ট নিবারণের জন্যে গভর্নমেন্ট দু' তিন লাখ টাকা দিতে পারবেন না। তাতে এক রগচটা তালুকদার গর্জে উঠলেন: "The Government can't sanction money? আরে! Whose money? Your father's money?" উঃ—কী বলব দিলীপ—ঠিক যে টোনে ওরা উর্দু বলে সেই টোনেই বলে ইংরেজি: আরে! কিসকা রুপয়া? তেরা বাপকা রুপয়া?............হা হা হা!

অতুলদা প্রায়ই গল্প করতেন বিখ্যাত বিপ্লবী ব্যারিস্টার পি. মিত্রের। বলতেন: "লণ্ডনে তখন আমরা এক ঘরে থাকি। একদিন আমরা শুনে এলাম এক মেমের গান All the way to Mandalay! পি. মিত্তির ঘরে ফিরেই ভাবাবেশে ধরলেন: All the way to Mandalay—স্বর লিপিতে রে রে রে রে রে রে—সা সা সা সা সা সা। তারপরই ধরলেন এক বাঙলা গান, দাশরথি রায়ের: ছিল বারি কক্ষে ক্রমে এল বক্ষে—ঠিক ঐ এক সুর রে রে রে রে রে রে—সা সা সা সা সা সা।

কিন্তু এ-রসিকতাটি সুরে না শুনলে তেমন মজা পাওয়া যাবে না। অতুলদার রসিকতার নমুনা আর দেব না, কেননা, তাঁর বলবার ভঙ্গিটার স্বরলিপি করতে না পারলে শুধু বক্তব্যের পেশ করা নিষ্ফল। তাই শুধু তাঁর আর একটি কাহিনী ক'রেই ইতি করব।

অতুলদা একদিন আমাকে ও ধূর্জটিকে বললেন: "তোমাদের কাছে বলেছি „ডাকাতে" ক্লাবের কথা। একটি ঘটনা মনে পড়ে। আমি ছিলাম সে-ক্লাবের সর্বকনিষ্ঠ

মেম্বর। একদিন গানের আসর দারুন জমেছে। আমি শেষে গাইলাম, যে-গানটি সেদিন তোমাকে শেখালাম”—ব’লেই ধ’রে দিলেন :

“আমার মনের ভগ্ন দুয়ারে সহসা তুমি কে গো, তুমি কে ?
নন্দন-আভা-বেষ্টিত তনু উজল নিজ আলোকে
তুমি কে গো, তুমি কে ?
একি প্রেমপ্রতিম অঙ্গ ! এ কি যৌবন-রূপ-রঙ্গ !
এ কি মন্দাকিনী-মন্দ-সলিল ভঙ্গ !
এ কি সহসা মম জীবন-বন পুষ্পিত তোমার নয়ন পলকে—
তুমি কে গো, তুমি কে ?”… ……

ব’লে থেমে : “তারপর কী হ’ল জানো ? রবিবাবু খুশি হয়ে মাথা নাড়লেন, দ্বিজু-বাবু হেসে বললেন : ‘জিতা রহো।’ আমার মন, একেবারে আহ্লাদে আটাস্তরখানা ! বুঝতেই পারছ—আমি তখন সবে গান বাঁধা শুরু করেছি—সেখানে গেয়েছিলাম ভয়ে ভয়ে—ভয় হবে না ? শ্রোতা কে ? স্বয়ং রবিবাবু, তোমার বাবা, লোকেন পালিত, সুরেশ সমাজপতি—সব দিকপাল তো। আমার তখন সবে গোঁফ উঠেছে—আমি অল্পবয়সেই ব্যারিস্টারি শুরু করি তো। আচ্ছা।

“এ হেন আমি—বুঝলে না !—উচ্ছল হ’য়ে উঠলাম সকলের প্রশংসা ও হাততালি পেয়ে। মনে হ’ল গানটি উতরেছে বটে। এমন সময়ে ঘরের ওদিকে বারান্দায় ব’সে ছিলেন নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়—ডাকলেন আমাকে হাতছানি দিয়ে। আমি দুরুদুরু বক্ষে গেলাম—নিশ্চয় তিনিও বাহবা দেবেন—আমাকে আর পায় কে ?

“আমি আসতেই তিনি আমার ঘাড় ধ’রে নিজে মুখের কাছে টেনে নিয়ে ফিস ফিস ক’রে বললেন : ‘কে র‍্যা ?’—ও হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ…………”

সে-প্রাণখোলা হাসি আজো কানে বাজে—মনের সব গুমট কেটে যেত তার দমকা হাওয়ায়।

শেষবার যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাঁর রক্তের চাপ খুব বেড়েছে। কিন্তু ঠিক তেমনিই প্রাণখোলা সদানন্দ মানুষ—কথায় কথায় হাসি। একদিন আমি বলেছিলাম : ডাক্তারে বলেছে আপনার অত জোরে হাসা ভালো নয়—রক্তের চাপ এত বেশি…………”

অতুলদা টুপ্ করে জবাব দিয়েছিলেন: দিলীপ, না হেসে বাঁচার দরকারই বা কী বলো তো? শুনবে—আজকাল আমি কী ভাবি? ভাবি—যেদিন আমাকে খাটে করে শ্মশানে নিয়ে যাবে সেদিনও আমি একটিবার হঠাৎ টুপ ক'রে উঠে ব'সে ফিক্ করে হেসে তবে চিতায় শয্যা নেব—তার আগে না।"

একথা বলবার এক্তিয়ার তাঁর ছিল; জীবনে সকলকে চিরদিন আনন্দই যে দিয়ে এসেছিলেন তিনি—বেদনা রেখেছিলেন নিজের অন্তর গহনে। তিনি প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন একটি ইংরাজি প্রবচন:

Laugh and the world laughs with you,
Weep and you weep alone.

হাসিলে তুমি—তোমার সাথে হাসিবে ভাই সবে,
কাঁদিলে—একা কাঁদিতে হায় হবে।

উনত্রিশ

স্মৃতিচারণ লেখা যখন শুরু করি, তখন ভেবেচিন্তে স্থির করেছিলাম যে, আমার সাঙ্গীতিক জীবনের সম্বন্ধে বেশি কিছু লিখব না। কারণ শুধু এই-ই নয় যে, এ সম্বন্ধে আমার নানা লেখায়ই বলেছি—কীভাবে আমার সাঙ্গীতিক জীবনের বিকাশ হয়: এও বটে যে, সঙ্গীতের ইতিহাস কথার মাধ্যমে পেশ করা যায় না, গেয়ে শোনাতে ও বোঝাতে হয়—যার অন্য নাম—লেকচার ডেমনস্ট্রেশন। এক সময়ে আমি এভাবে নানা বক্তৃতা দিতাম সারা ভারতে টহল মেরে—লোকে শুনতও সাগ্রহে, কেননা আমার গান আমার বক্তৃতার দৃষ্টান্ত হিসাবে খানিকটা ম্যাজিক লণ্ঠনের কাজ করত। কিন্তু পরে মন হল গানের প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দ-রসের সৃষ্টি করা, মনের কৌতূহল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা নয়। তাই গান সম্বন্ধে বক্তৃতা ভাষণাদি কমিয়ে দিলাম—এসব খানিকটা পণ্ডশ্রমই মনে ক'রে। মানুষ গান থেকে জীবনের পথচলায় আনন্দের পাথেয় সংগ্রহ করবে—এইখানেই গানের পরম ও চরম সার্থকতা। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে একথাটি আমাকে একবার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বেশ প্রাঞ্জল করে। এই পূজ্যপাদ মহামনীষীর কথা আমি আমার ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকা ও গীতশ্রীতে লিখেছি, তাই সেসব কথার পুনরাবৃত্তি না ক'রে শুধু এইটুকু ব'লেই

থামি যে, জগতে যতগুলি আশ্চর্য মানুষ দেখেছি ইনি তাঁদেরই দলে—গড়পড়তা মানুষের দলে নয়—যারা দিনগত পাপক্ষয় করে কোনমতে চলার-জন্যেই চলে, বাঁচার জন্যেই বাঁচে। সঙ্গীতকে ইনি ভালোবেসেছিলেন যেমন পূজারী ভালবাসে ইষ্টদেবকে। সারা জীবনের সঞ্চয়—অর্থে তথা সামর্থ্যে—ইনি নিবেদন করেছিলেন বীণাপাণির চরণে। ভারতে আজ সঙ্গীত-কনফারেন্সের অধিবেশনের পর অধিবেশন বসছে, তার অগ্রদূত ছিলেন এই মহাত্মা। লখ্‌নৌয়ে ১৯২৪-এ তিনি যে যুগপ্রবর্তক সঙ্গীত কনফারেন্স ডাকেন, তার কথা ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা'য় লিখেছি। ভারতে কোথায় কোন্ ওস্তাদ কোন্ গায়কী ঢং চালু করেছেন, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে খুঁজে খুঁজে তাদের কাজে লাগিয়েছেন—শিক্ষক তৈরি ক'রে, চাঁদা আদায় ক'রে, কলেজের পর কলেজ প্রতিষ্ঠা ক'রে। এ-বিষয়ে বেশি লেখার এখন আর প্রয়োজন নেই কেননা এ অক্লান্তকর্মী সঙ্গীতপ্রেমিক তথা রাগশাস্ত্রীর সঙ্গীতে দানের কথা শার্ঙ্গদেব প্রমুখ অনেক সঙ্গীতকোবিদই জানেন, যদিও যখন আমি এঁর সম্বন্ধে লেখা শুরু করি তখন বড় কেউই জানতেন না ব'লে আমাকে কম নিন্দা সইতে হয়নি নানা বিদ্বেষীর। যাক যা বলতে তাঁর প্রসঙ্গের অবতারণা :

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে দুর্গা রাগটির প্রবর্তন করেন পরম কৌশলে। সে-কাহিনী ইতিপূর্বে আমার "ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকায়" বেশ ফলিয়ে ও রসিয়েই বলেছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি : "দুর্গা রাগ আমরা সবাই শিখেছি, কিন্তু এ-রাগটির সুরকার আপনি জানতাম না তো—আপনিও তো কই কোথাও প্রকাশ্যে বলেন নি ?" তাতে পণ্ডিতজি হেসে উত্তর দেন : "দরকার কী ? সঙ্গীতে গানের তোশাখানায় একটা রাগের মণি বেশি সঞ্চিত হ'ল—এইটুকুই স্মরণীয়। সে-মণি কে কোথা থেকে এনেছিল কী হবে সে-ইতিহাসে ?"

আমি স্তম্ভিত হই একথা শুনে। স্রষ্টা সৃষ্টির আনন্দে সৃষ্টি করলেও তার সৃষ্টির পরে নিজের নামের শিলমোহর ছাপতে চায় সব দেশেই এইই তো শুনে এসেছি বরাবর। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে আমার একথার প্রতিবাদে আমাকে বলেন : "ভারতের ধারা অন্য। আমরা রস চাই, ইতিহাস না ; সৃষ্টি চাই, স্রষ্টাদের বংশতালিকা না। ভারতীয় সঙ্গীতে ভূপালী, ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, কেদারা কামোদ ইত্যাদি রাগ কে কবে রচনা করেছিল আমরা কোনোদিন মনে রাখিনি—তাই ব'লে এসেছি যে, শিব নারদ ব্রহ্মা বা ভরত মুনি এদের সৃষ্টিকর্তা।"

তারপরে ক্রমশ আমি বুঝি যে, একথা ধর্মের জগতেও সত্য। ধর্ম আমাদের

দেশে আজও জীবন্ত, ধারা তার অশেষ, গবেষণা অফুরন্ত : কিন্তু কোথায় কোন্ সাধনায় কোন্ গুরু কোন্ নবপদ্ধতির সৃষ্টি করেন কেউ জানে না, কোন মার্গ কার পায়ে-চলা-পথে প্রথম তৈরি হয়ে ওঠে কেউ খবর রাখে না। আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি এক সমৃদ্ধ যোগরাজ্য, ধর্মক্ষেত্র, যার তুলনা নেই এ-জগতে। এ-মহারাজ্যে কবে কোন দিক-পাল নব ঐশ্বর্য আহরণ করেছিলেন কার দীক্ষায় বা সহায়তায়—এ-পুণ্যক্ষেত্রে নানা-রকম সারের উদ্ভাবনা—নানারকম আশ্চর্য মন্ত্রতন্ত্র ধ্যানপদ্ধতির প্রবর্তক কে—এসব সাত সতের খবর নিয়ে কে মাথা ঘামায়? সম্পদ হাজিরি দিয়েছে, আমরা তাকে ভোগ করেছি, জানতে চাইনি কোনোদিনই কে এনে দিলো সে-সম্পদ, বা কে কোন্ সম্পদকে খাটিয়ে চতুর্গুণ করে তুলল। এক কথায়, ভারতীয় মন সৃষ্টিকে সমাদর করলেও সৃষ্টির ব্যাকরণ বা ইতিহাসকে—'এহ বাহ্য' বলেই অনাদর ক'রে এসেছে চিরদিন। তাই পণ্ডিতজির কথায় আমারও উৎসাহ কমে যায়; মনে হয়—সুর রচনায় নাম রেখে গিয়ে কী হবে? গান গেয়ে যাই, ফলদাতা ঠাকুর গীতার এ মহাবাণী শিরোধার্য ক'রে। তাই কার কাছে কবে কোন্ চালের গান শিখে কী লাভ করেছিলাম তার বর্ণনা সম্পূর্ণ নিরর্থক না হলেও সে নিয়ে বেশি খুঁটিয়ে আলোচনা কার কাজে আসবে? এইজন্যে গানের তীর্থযাত্রায় কবে কোন গীতমন্ত্রীর কাছে কী ভাবে দীক্ষা পেয়েছি তার ইতিহাস লিখে রাখিনি আমার উত্তর জীবনের দিন-পঞ্জিকায়।

কিন্তু হঠাৎ মনে হল: যখন এখানে নানা সূত্রে প্রসঙ্গত কোনো কোনো ওস্তাদ বা বাইজির নাম ক'রে ফেলেছি, তখন সঙ্গীতে কার কার কাছে কী পেয়েছি তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ রেখে যাওয়া মন্দ কি? ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে যে তথ্য লাভ হয়, তা থেকে কিছু হয়ত তত্ত্বেরও ছিটেফোঁটা মিলতে পারে। আর যদি নাও মেলে তবে কাহিনী সরস হ'লে রসের দিক দিয়েও কিঞ্চিৎ মুনফা হ'তে পারে তো। তাই সংক্ষেপে বলি আমার গীতি-শিক্ষার তথা ভজনদীক্ষার ইতিহাস।

ছেলেবেলায় আমার গানের প্রথম গুরু ছিলেন অবশ্যই পিতৃদেব। তিনি গান অত্যন্ত ভালোবাসতেন—বিশেষ কীর্তন ও হিন্দুস্থানি গান। তাই যেখানেই তিনি যান না কেন, ডাকতেন হিন্দুস্থানি ওস্তাদকে বা বাঙালি গায়ককে। আমাদের গয়ার বাড়িতে মনে পড়ে হনুমান দাশের ওস্তাদি গান, তাঁর সুযোগ্য পুত্র সোনির হার্মোনিয়ম বাজনা। অমন হার্মোনিয়াম বাজানো আমি আর শুনিনি। এমন কি ঠাকুর নবাবালির বাজনাও সোনির বাজনার সমকক্ষ নয়। সেখানে আর এক মস্ত এস্রাজির এস্রাজ শুনি, যাঁর নাম কিছুতেই মনে করতে পারছি না। হয়ত অমিয় সান্যাল

মহাশয় বলতে পারবেন। ইনি পরে থিয়েটার রোডেও বাজিয়েছিলেন এস্রাজ। সোনিও বাজিয়েছিলেন হার্মোনিয়াম থিয়েটার রোডে—আমার বহু বন্ধু এসে শুনেছিলেন। বিখ্যাত গায়ক অঘোর চক্রবর্তীর ধ্রুপদ গানও হ'ত—তাঁর অপূর্ব উদাত্ত কণ্ঠ আজও কানে বাজে। বিশ্বনাথ রাওয়ের ধ্রুপদ, সুরেন্দ্র-নাথ মজুমদারের খেয়াল, অন্ধ শরৎএর টপ্পা, দেবেন্দ্রলাল মজুমদারের শ্যামা-সঙ্গীত, আরো কত খ্যাত ও অখ্যাতনামা গায়কের গান নিরন্তরই আমার চারদিকে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করত। তার ফলে আমি গানে খানিকটা শ্রুতিধর মতনই হ'য়ে উঠি। মানে, অনেক সুরই কিছু কিছু মনে রাখতে পারতাম কিছুদিন ধ'রে। থিয়েটারের নানা নাটকেও যত সুর শুনতাম, বাড়ি এসে পিতৃদেবকে শোনাতাম—নানা গানের ধুয়াটুকু। পিতৃদেব আশ্চর্য হ'য়ে বন্ধুবান্ধবদের ডেকে শোনতেন, 'দেখ হে আমার কুলতিলকের কীর্তি!'

এর পরে যাঁর কাছ থেকে স্থায়ী ভাবে লাভ করি, তাঁর নাম সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। নাড়া বেঁধে তাঁর কাছে গান না শিখলেও আমার গানের দ্বিতীয় গুরু ছিলেন তিনিই। আমার রাঙা জ্যাঠামহাশয় হরেন্দ্রলালের শ্যালক ব'লে তাঁকে আমি সুরেনমামা ব'লে ডাকতাম আমার জ্যেঠতুত ভাই-বোনদের সুরে সুর মিলিয়ে। পিতৃদেব বলতেন প্রায়ই: 'আহা এমন ঢং সুরেনের—ও একেবারে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা। শিখে এ-ঢং গড়ে তোলেনি সুরেন—নিজে থেকেই ও ফুটে উঠেছে—আশপাশের জল-হাওয়া থেকে প্রাণের খোরাক টেনে—ফুলের মতন।'

সত্যি, এমন অপরূপ ঢং আমি জীবনে আর শুনিনি। কি হিন্দুস্থানী খেয়াল টপ্পা, কি ধ্রুপদ (যদিও ধ্রুপদ তিনি বেশি গাইতেন না শ্রোতারা তানকর্তবই বেশি চাইত ব'লে) কি কীর্তন কি বাংলা ভক্তি-সঙ্গীত যা গাইতেন তারি উপর তিনি রেখে যেতেন নিজের প্রতিভার আশ্চর্য ছাপ। সে-ঢঙে আর কাউকে আজ পর্যন্ত গাইতে শুনলাম না। কিন্তু তাঁর ঢং থেকে আমি পেয়েছিলাম অনেক সুষমার ইঙ্গিত, বিস্তারের সঙ্কেত। তাঁর অনেক হিন্দি তথা বাংলা গানই আমি গাইতাম নিজের ঢঙে বসিয়ে। কারণ তিনি বলতেন পিতৃদেবকে: 'দেখবেন দ্বিজুবাবু মণ্টু যেন কারুর নকল করতে না ছোটে, যেন নিজের পথ কেটে চলে—অপরের কাছে থেকে নেবে বই কি, কিন্তু নকল করতে নয়, হজম করতে। ওর বেশি শেখার দরকার নেই। শুনতে শুনতে শেখাই ভালো।' আশ্চর্য: অনেক বৎসর বাদে অবিকল এই কথাগুলিই পণ্ডিত ভাতখণ্ডে একদিন বলেছিলেন ধূর্জটিকে। কিন্তু একথায় আনন্দ

বা গৌরব নিতান্তই সস্তা, মাত্র অহমিকারই এতে শ্রীবৃদ্ধি, বিকাশের দুর্গতি। বেশি প্রশংসা পেয়ে আমার ক্ষতি হয়েছিল খুবই প্রথম দিকে। তাই না ঠাকুরকে ভুলতে বসেছিলাম .গানে যশস্বী হ'তে না হ'তে। তাঁর অপার করুণা, তাই গানের নোঙরও ছাড়িয়ে আমাকে ঠেলে দিল সোজা অকুল পাথারে—তাঁর চরণ-বন্দরের শেষ ধ্রুবদিশা দিতে। কিন্তু সে অন্য কথা।

সুরেনমামার কাছে উৎসাহ পেয়ে আমি খুব গলাবাজি আরম্ভ করলাম—বিশেষ ক'রে তাঁর শেখানো কয়েকটি গানে: যথা, রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো, সিন্ধু কাফি ; রাঙা কমল রাঙা করে—মালকোষ ; জাউঁ জাউঁ ঘন গরজে—দেশ ; নিবিড় আঁধারে মাগো—বাগেশ্রী ; বিফল জনম—ভৈরবী ; আমার মন ভুলালো যে—ভৈরবী ; শ্যাম-প্রেম-রসসায়রে আমি মীনের মতন ডুবে রইতাম—কীর্তন ; এই তো কানন গো—কীর্তন। আরো অনেক গান শিখেছিলাম। অবশ্য তাঁর মতন গাইব কেমন ক'রে? (মণিমামার পরিহাস স্মরণীয়: 'ভালো গান গাওয়া কি সোজা?') কিন্তু বাংলা গানে সুরবিহার-এর এই ইঙ্গিতটি আমি প্রথম তাঁর কাছেই পাই যে, বাংলা গানে ভাব বজায় রাখতে হ'লে কথার সঙ্গে মিশিয়ে তান দিতে .হবে। অর্থাৎ 'রাঙা জবা কে দিলো' ব'লে আ আ ক'রে তান দেওয়া নয়, দিলো-র ও-কে টেনেই তান দিতে হবে। আকারান্ত তান দিতে হ'লে দিতে হবে জবা-র শেষে কিম্বা মা-র শেষে। কিন্তু ঐ যে বললাম, এসব ক'রে দেখানোর জিনিস, ব'লে বোঝাবার নয় তাই এ-খুঁটিনাটি আঙ্গিকের বর্ণনা থাক।

সুরেনমামার কাছে আর একটি সত্যের দীক্ষা পেয়েছিলাম যে, ওস্তাদি গানেও কণ্ঠলাবণ্যের দাম খুব বেশি। তাই অত্যধিক সেধে কণ্ঠকে ভেঙে ফেলা আত্মহত্যারই সামিল। তানের সৌকর্য-সাধনার্থে এ-ভুল অনেক ওস্তাদেই ক'রে থাকেন—বলতেন তিনি প্রায়ই। আমার উত্তরজীবনে দেখে-ছিলাম আমার এক প্রিয় গায়ক এই ভুলই করেন লখ্‌নৌয়ে বিপর্যয় সেধে। তাঁর কণ্ঠ-স্বর ছিল অপূর্ব মধুর, কিন্তু লখ্‌নৌ থেকে তিনি যখন ফিরলেন—হা হতোস্মি—দেখলাম তাঁর কণ্ঠের সে-মাধুর্য লুপ্ত হয়েছে অত্যধিক সাধনায়। অর্থাৎ কোকিল-কণ্ঠ ম'রে ভূত হ'য়ে নবজন্ম নিয়েছে কালোয়াৎরূপে। আমি এ-ভুল করিনি সুরেনমামারই উপদেশে। তাঁর কাছে আরো আমি শিখি যে, কণ্ঠলাবণ্য বজায় রাখলে আট আনা শ্রম ক'রে যে সুরের আনন্দ বিলানো যায়, কণ্ঠ অমধুর হ'লে সে-আনন্দের সিকিও সৃষ্টি করা যায় না ষোলো আনা

পরিশ্রম ক'রেও। একথা বলছি গায়ের জোরে নয়—কণ্ঠলাবণ্যের অপরিসীম জাদু-শক্তি স্বচক্ষে দেখে তবে। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

স্মৃতিচারণী ভঙ্গিতেই লিখি যা মনে আসে। মনে পড়ে সুকণ্ঠের নানা স্মৃতি। কী ভাবে—বলি।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে কলকণ্ঠীদের কথা বলতে প্রায়ই বলতেন তিনটি বাইজির কথা: আগ্রার জোহরা বাই, বম্বের কেশর বাই ও কাশীর মোতি বাই। কেশর বাইয়ের গান সে-সময়ে শোনার সৌভাগ্য আমার হয় নি—তাঁর বাড়ি পর্যন্ত ধর্না দেওয়া সত্ত্বেও। জোহরা বাইয়ের গান গ্রামোফোনে বাজিয়ে বাজিয়ে কত রেকর্ড যে ক্ষইয়ে ফেলেছিলাম তার হিসেব দেওয়াও অসম্ভব। কী যে ইচ্ছা হ'ত সামনে ব'সে তাঁর গান শোনবার!—কিন্তু হা অদৃষ্ট, তিনি তখন ইহলোকে নেই। সুতরাং মাঝে মাঝেই ভাবতাম—কাশী গিয়ে মোতিবাইকে ধরি না কেন? এমন সময়ে হঠাৎ শ্রীদামোদর দাস খান্না আমাকে টেলিফোনে নিমন্ত্রণ করলেন জানিয়ে যে কলকাতার দমদমে কোন্ এক বাগানে কাশীর মোতিবাই গাইবেন অমুক দিন সন্ধ্যায়।

পুলকিত হয়ে বোদ্ধা বন্ধুবান্ধব কয়েকজনকে খবর দিলাম—তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত সুরজ্ঞ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল। আর কে কে ছিলেন মনে নেই। যাই হোক আমরা সদলবলে তো গেলাম মোতিবাইয়ের গান শুনতে দমদমের ঠিকানায়।

এমন মধুর কণ্ঠ জীবনে বেশি শুনিনি। বলতে কি ৺উমা বসু ছাড়া আর কোনো নারীকণ্ঠের অবিমিশ্র মাধুর্যে আজ পর্যন্ত আমি এত গভীর আনন্দ পাই নি। শুধু একটি সুরে দাঁড়ানো—আর মনে হয় যেন বাতাসও থম্‌কে গিয়ে মুগ্ধ হ'য়ে কান পেতে শুনছে! আমি আশৈশব মিষ্ট কণ্ঠের অনুরাগী—আবাল্য শুনে এসেছি সে কত যে অপরূপ কণ্ঠ!—আজকের দিনে সেরকম কণ্ঠ কই তো শুনতে পাই নে। এখানে একটু থেমে নাম করি কয়েকজনের যাঁদের কণ্ঠ আজো আমার কানে বাজে। প্রথম শুনি শ্রীঅঘোর চক্রবর্তীর আশ্চর্য ধ্রুপদী কণ্ঠ: যেমন প্রবল তেমনি ব্যঞ্জনাপূর্ণ আর তেমনি মধুর! সুকিয়া স্ট্রীটে শ্রীকৈলাস বসুর বাড়িতে তাঁর প্রায়ই গান হ'ত, পিতৃদেবের সঙ্গে শুনতে যেতাম। তখন আমি বালক কিন্তু মিষ্ট কণ্ঠে সাড়া দিতে শিখেছি সর্বান্তঃকরণে। একদিন ঘটল এক অঘটন। অঘোরবাবু রাশভারি লোক ছিলেন। পছন্দ করতেন না তাঁর পরে কেউ গায়। তাছাড়া তাঁর পরে গাইবার মতন বুকের পাটাও খুব কম গায়কেরই ছিল। তিনি ধ্রুপদ ধামারে অদ্ভুত বাঁট দুন চৌদুন করে যখন শোমে

ফিরে আসতেন শ্রোতারা রুদ্ধনিশ্বাসে শুনত, আমার বুকের মধ্যেও বিস্ময়ানন্দের ডমরু বেজে উঠত—তারপর যেই শোমে তারাবাজি ফাটত অমনি বইত উল্লাসের ফুলঝুরি "আ হা—হা—হা !" আজো মনে পড়ে পিতৃদেবের সেই হাত তুলে দ্রুম্ করে তাকিয়ায় শোমের তাল দেওয়া—আরো অনেক শ্রোতাই সে সময়ে ছিলেন ধ্রুপদী শোমের সুরের রাগের সমজদার। রেডিওতে আজকাল বোতাম টিপে গান শোনা হয়—এতে গানের সুরতালের খবর অনেক কিছুই হয়ত পাওয়া যায় কিন্তু সেই গায়ক ও শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে গ'ড়ে-ওঠা স্বতঃস্ফূর্ত দরদ ও প্রতীক্ষার আবহ মিলতেই পারে না—যার যোগাযোগ বিনা শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতানন্দ ফুটে উঠতেই পারে না। গায়ক বলেন সানন্দে: "আমি দিচ্ছি—দদামি।" শ্রোতা বলেন সকৃতজ্ঞে: "আমরা নিচ্ছি—গৃহ্নামি।"

এম্নি আসরে অঘোরবাবু আমাদের সবাইকে তো মাতিয়ে তুললেন। তারপর ডাক্তার কৈলাসবাবু ভদ্রতার খাতিরে আরো কয়েকজন নামজাদা ওস্তাদ গায়ককে বললেন: "একটা ধরুন না।"

কিন্তু যাকে বলেন সেই শিউরে ওঠে: "ক্ষেপেছেন কৈলাস বাবু? এর পরে?" এখন, পিতৃদেবের পাশে বসেছিলেন সুরেনমামা—রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—খ্যাতনামা সঙ্গীতকোবিদ রবীন্দ্রলাল রায়ের মামা। রবি আমার জেঠতুত ভাই সেই সুবাদে সুরেন মামাকে আমি মামা ডাকতাম। সুরেনমামার গাইবার ইচ্ছা ছিল প্রবল, তাই উৎসাহ পেতেই প্রাণের মায়া ছেড়ে ধ'রে দিলেন ধ্রুপদের পরে একেবারে খাস মাথুর কীর্তন—"এই তো কানন গো"! শুনতে শুনতে শ্রোতারা ভুলে গেলেন দূন চৌদূন আড়ি কুআড়ি তাল বাঁট—কেউ কেউ চোখ মুছতে শুরু করলেন অভিসারিকা "অভাগিনী রাধার" বেদনায়। গান শেষ হ'লে অঘোর বাবু যে অঘোর বাবু তিনিও মুগ্ধ হ'লেন। শুধু মুগ্ধ হওয়া নয়—তরুণ সুরেনমামার চিবুক ধ'রে আর্দ্র কণ্ঠে বললেন: "এমন গলা কোথায় পেলে বাবা?"

কণ্ঠের এম্নিই জাদু। সুরেনমামা তাই প্রায়ই বলতেন আমাকে যে অত্যধিক কসরতে কণ্ঠলাবণ্য নষ্ট করে ওস্তাদি নৈপুণ্যে রসসৃষ্টি করার মূল্য থাকলেও কণ্ঠ-লাবণ্য থাকলে সিকি পরিশ্রমে শ্রোতাদের যে-আনন্দ পরিবেশন করা যায় কণ্ঠলাবণ্য অভাবে সে-রসসৃষ্টি করতে চতুর্গুণ মেহনৎ করতে হয়। এখানে কালোয়াতি কলাকারু নিয়ে তর্ক উঠতে পারে অবশ্য—কোন্ প্রতিপাদ্যকে নিয়ে তর্ক না করা যায়—কেবল ওস্তাদি নৈপুণ্যের জয়গান ক'রেও একথা মানতেই হবে যে সুরেন

মামার উক্তিকে নামঞ্জুর করা প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি—যেহেতু যেখানেই বিধাতা লাবণ্য সৃষ্টি করেছেন সেখানেই তাঁর একটি পরম বিভূতির প্রকাশ হয়েছে—আর বিভূতির কাজই হ'ল অপরের চিত্ত জয় করা তার নিজস্ব শক্তিতে। রূপের ক্ষেত্রে এর প্রমাণ আমরা প্রত্যহই পাই, বলি : "সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র"। সুরেন মামার কথাটাই যেন অন্যভাবে কালিদাস পেশ করেছেন তাঁর শকুন্তলায় "কিং পুনর্ভূষণানাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্?" অর্থাৎ সুন্দর যে তার আর অলঙ্কারের প্রয়োজন কি?

বাংলাদেশে এম্‌নি আরো অনেক আশ্চর্য কণ্ঠ শুনেছিলাম আমার বাল্যকালে, যথা অন্ধ শরৎ, দেবেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, লালচাঁদ বড়াল, বিজয় লাহিড়ী, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, গণেশ দাস, রেবতী মোহন সেন, মন্মথনাথ দত্ত, বকুবাবু, আরো কত খ্যাত ও অখ্যাতনামা কলকণ্ঠ গায়কের দেখা পেতাম আমাদের মজলিশে। কিন্তু আধুনিক গায়কদের মধ্যে দেখি প্রায় কেউই চার পাঁচশো লোকের মধ্যেও মাইক্রোফোন বিনা গান গেয়ে জমাতে পারেন না। শেষ উদাত্ত কণ্ঠে শুনেছিলাম বছর পনের আগে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর। তাঁর পরে দরাজ কণ্ঠে বোলন্দ আওয়াজ বাংলাদেশে আর শুনিনি। কিন্তু এবারে ফিরে আসি মোতিবাইয়ের প্রসঙ্গে।

মোতিবাইয়ের গান শুনে মুগ্ধ হ'য়ে আমি তাঁকে ধরি আমাকে দু-একটি ভজন শেখাতে। সে সময়ে তিনি থাকতেন চিত্তরঞ্জন আভেনিউ-এ। সেখানে আমি যেতাম রোজ সকালে ও শিখেছিলাম তাঁর কাছে কয়েকটি ভজন ও দু-একটি রাগ—একটির নাম হংসকামিনী। আহা, কী গানই গাইতেন বাইসাহেবা! যখন গুন গুন ক'রে শেখাতেন আর আমি হার্মোনিয়মে তুলতাম তখনও মন তাঁর কণ্ঠমাধুর্যে রসিয়ে উঠে যেন আবিষ্ট হ'য়ে পড়ত। আজো মনে পড়ে অমিয়দার (অমিয় সান্যালের) সেই ভাবে ঢুলু ঢুলু চাহনি ও উচ্ছ্বসিত সাবাস। কিন্তু বাহবা দিয়ে সে-কণ্ঠকে কতটুকুই বা পুরস্কার দেওয়া যায়! মনে হ'ত আমার যে যদি আকবর বাদশা আজ থাকতেন তবে মোতিবাই পেতেন রাতারাতি মোতির মালা তাঁর পিককণ্ঠের জন্যে।

এহেন কণ্ঠে বাংলা গান শোনার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। আমিই তাঁকে শেখাই দুটি বাংলা গান—পিতৃদেবের "এ জগতে আমি বড়ই একা"—খেয়াল—ভীমপলশ্রীতে ও অতুলপ্রসাদ সেনের "বাদল ঝুম ঝুম বোলে"—বাংলা ঠুংরি—

পিলুখাম্বাজে। মনে আছে শেষ দিন তাঁরই ওখানে তাঁর গানের আসর—বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমি গিয়েছিলাম ফের সদলবলে, সঙ্গে ছিলেন খ্যাতনামা লেখক হিরণকুমার সান্ন্যাল—ব্রাহ্ম যুবক। কিন্তু মোতিবাইয়ের কণ্ঠে বাংলা সুরের মাধুর্যে তিনিও আহা আহা ক'রে উঠেছিলেন। এর পরেও কি কেউ কণ্ঠলাবণ্যের অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তির কথা অস্বীকার করিতে পারে ?

এই মোতিবাইয়ের সঙ্গেই দশ-বারো বৎসর বাদে আমার দেখা হয়—১৯৩৮ সালে। আমি কাশী গিয়েছিলাম আমার গীতিশিষ্যা ৺উমা বসুকে নিয়ে। উমাকে আমি বলতাম প্রায়ই : "তোমার কণ্ঠের সমকক্ষ মাত্র একটি কণ্ঠ আমি শুনেছি মেয়েদের মধ্যে—সে মোতিবাই।" উমার গানে প্রতিভা অসামান্যা হ'লেও আত্মপ্রত্যয়ে সে ছিল সামান্যাদের চেয়েও নিচে। তাই আমার মুখ চেপে ধরত এ-ধরনের কথা বললেই, বলত : *"কার সঙ্গে কার তুলনা ভাই, তুমি যে কী!"* *সে কী-র* উপর তার আশ্চর্য কণ্ঠের আশ্চর্য মিড় আজো কানে বাজে। যাই হোক এ-হেন উমা কাশী পৌঁছতেই আবদার ধরল মোতিবাইয়ের গান শোনাতেই হবে। কী করি ? খুঁজে খুঁজে গেলাম বাইজি মহলে কুলবালাকে নিয়ে—কুলীনদের আপত্তি সত্ত্বেও। মোতিবাই সাদরে আমাদের গান শোনালেন—শুধু হিন্দি গান নয় ; আমার শেখানো বাংলা গান দুটিও গাইলেন। তারপর আমি তাঁকে উমার কলকণ্ঠের কথা বলতেই তিনিও ধরলেন ওকে : "এক গান তো সুনানা।" উমা ভয়ে ভয়ে আমার কাছে শেখা "বুলবুল মন ফুল সুরে ভেসে" গানটি শোনালো। এ গানটি আমি "সোলাভে ও সোলাভে" ব'লে একটি রুষ গানের জর্মন সংস্করণের সুর ভেঙে রচনা করেছিলাম। সে-যুগে হিমাংশু দত্ত বর্গীয় সুরকারেরা এ-গানটির বন্দেশ খুব ভালো বাসতেন, বলতেন বাংলা গানে নব সুরভঙ্গি। এমন কি কোনো কোনো উন্নাসিক ক্রিটিকও এ গানটি শুনে সাবধানে মাথা নেড়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। ভাবটা : "এ কী ? দিলীপকুমার তো ভজন কীর্তন গায়, সুরের কী জানে ? তবু এহেন সুর রচনা করল কী ক'রে ?"

মোতিবাই গানটি শুনে উচ্ছ্বসিত—কী অপরূপ সুরভঙ্গি ! কী সুন্দর বন্দেশ ! —সর্বোপরি, "কী অপরূপ কণ্ঠ !" উমা তার নিজের কণ্ঠের অজস্র সুখ্যাতি শুনে কুণ্ঠায় অধোবদন হ'তে মোতিবাই মিষ্ট হেসে একটি কথা বলেছিলেন ভুলব না। বলতে ভুলে গেছি উমা তাঁর সামনে গাইতে কিছুতেই রাজি হয় নি, আমাকে ফিস ফিস ক'রে বলেছিল : "তুমি যে কী মণ্টুদা, মোতিবাইয়ের সামনে আমাকে গাইতে

বলা! ভয়ে মরি!" মোতিবাই জিজ্ঞাসা করায় আমি হেসে বলেছিলাম: "ভয় পাচ্ছে আপনার সাম্‌নে গাইতে।" মোতিবাই আগে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওর ভয় ভাঙাতে তবে উমা "বুলবুল" গানটি গায়। গানের শেষে মোতিবাই উমার কাঁধে হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন: "বুলবুল কভি পপীহাকো ডরতি হয়?"

জহুরীই জহর চেনে—বলে না? পাশাপাশি মনে পড়ে অঘোর চক্রবর্তীর মতন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধ্রুপদীর সুরেন মামাকে প্রশংসা। সাহেব পুরাণে বলে না—"History repeats itself?"

কণ্ঠলাবণ্যের প্রসঙ্গে আর একটি দৃষ্টান্ত হঠাৎ মনে এল। যদিও এ পুরা কাহিনী—আমার দিদিমার কাছে শোনা—তবু ঘটনাটি খানিকটা অঘটনের পর্যায়ে পড়ে ব'লেই বলতে আরো সাধ যায়। আমার দিদিমার ভাষায়ই বলি—একটু সাজিয়ে অবিশ্যি, নৈলে এ-যুগের পাঠকের মনঃপূত হবে না হয়ত।

(সাজিয়ে বলা মানে কিন্তু কল্পিত বর্ণনা নয়—দিদিমার মূল বক্তব্যটি ভুলবার নয় তো, তাই ভুল হবে কেমন ক'রে?)

"আমার দাদামশায় রামদাস গোস্বামী ছিলেন শ্রীরামপুরের এক ডাকসাইটে ধ্রুপদী জানিস? তোরা কীই বা গাস আজকাল—কেউ ভয় পায় না। দাদামশায়ের গান শুনে ঘুমন্ত ছেলেরা আঁৎকে উঠে মা-র বুক চেপে থর থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে দুধ খেত। আমরা চিকের মধ্যে থেকে শুনতাম তো—তবু বুক কেঁপে উঠত তাঁর দুন চৌদুন বাঁট শুনে। এমন বাজখাঁই আওয়াজ—যে সে কী বলব? কিন্তু আর একটা জিনিস আমাদের চোখে দেখা রে মণ্টু—চাক্ষুষ করা—আর একটুও বাড়িয়ে বলছিনে, বিশ্বাস কর। দাদামহাশয়ের একটি রক্ষিতা ছিল, নাম গুণমণি। সে-যুগে জমিদারদের রক্ষিতা রাখাই দস্তুর ছিল। আমরা প্রায়ই শুনতাম: 'তা পুরুষ মানুষ —মরদ—তার উপর জমিদার—রক্ষিতা না রাখলে মান থাকে কখনো?' সত্যি বলছি।

"কিন্তু হ'লে হবে কি, গিন্নি দিদিমার সে কী মনঃকষ্ট! দাদামশায়ের মুখে গুণমণির গুণগান শুনলে দিদিমা রাগ ক'রে গোসা-ঘরে চলে যেতেন। গুণমণি ছিল তাঁর চক্ষুশূল। সে থাকত দাদা-মহাশয়ের পাশের একটি মহলে তিনি-চারটি ঘর নিয়ে। আমরা গেলে খুব আদর ক'রে গান শোনাতো আর আমরা মুগ্ধ হ'য়ে শুনতাম। আহা সে কী গলা রে মণ্টু! কী তোদের বেদানা দাসী, মানদাসুন্দরী, গহরজান—গুণমণির গান শুনলে পাখিরাও ঘাড় নাড়তে ভুলে যেত। যেন মধু জমাট হয়ে গলায় দাঁড়িয়েছে রে।

আমি (হেসে): নানি! তুমি নাটক লিখলে বাবা বসে পড়তেন। ভাগ্যে লেখো নি!

দিদিমা: ভাবছিস বাড়িয়ে বলছি? না রে না। তবে শোন্ বলি তাঁর গলার জাদু। আমার দিদিমা না? বলেছি তিনি হিংসেয় জ'লেপুড়ে মরতেন। কিন্তু গুণমণি কীর্তন ধরলে তিনি গুটি গুটি এসে পাশে ব'সে শুনতেন আর চোখ মুছতেন। একেই বলি গলা রে, একেই বলি গলা। অমুক জান, তমুক বাঈ—ঝাঁটা মার্!'

সুরেনমামাও ছিলেন এমনি গাইয়ে! গুণমণিকে যদি উপাধি দেওয়া যায় কিন্নরী, তবে সুরেনমামাকে উপাধি দিতে হয় কিন্নর। তিনি নিজেও কণ্ঠস্বরের লাবণ্যে আত্মহারা হ'তেন। তাই পরীক্ষার সময়ে রাত্রে পালিয়ে, বাইজিদের গান শুনতেন। রাঙা জ্যাঠামহাশয়ের মুখে শুনেছি—ফলে তিনি পরীক্ষায় প্রথমবার ফেল করতে তাঁর পিতৃদেব তাঁকে খড়ম দিয়ে বেদম মারেন। পরের বার ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষায় প্রথম হন।

বড় বেশি হালকা গালগল্প হ'য়ে যাচ্ছে। গম্ভীর হই ঢের।

সুরেনমামার গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা ভুলতে পারবেন না তাঁর কণ্ঠলাবণ্যের জাদু। ভাগলপুরে ও অন্যত্র আমি দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছি তাঁর গান—তাঁর সঙ্গে হার্মোনিয়মে সঙ্গত ক'রে। আমার কান অত্যন্ত তৎপর ছিল ব'লে আমার সঙ্গতে সুরেনমামা খুব তুষ্ট হতেন—তিনি কোনো পর্দা গলায় তুলতে না তুলতে আমি বাজনায় সেটি টিপেছি। এইভাবে বাজনার সঙ্গত করার ফলে তাঁর অনেক মনোহর সুরভঙ্গিই আমার কণ্ঠায়ত্ত হয়—যদিও তাঁর সে অনুপম ঢং আমি আয়ত্ত করতে পারিনি। তবে তিনি বলতেন: 'তোমার এ ঢং তোমার নিজস্ব—একেই খাটিয়ে বাড়িয়ে তোলো মণ্টু—আমার ঢং নকল করতে যাবে কেন? আমি মিশ্রদের ঘরানা খেয়াল শিখতাম কিন্তু তাদের ঢং নকল করেছি কোনোদিন? কক্ষনো না—সাধ্যমত নিজের পথেই চলেছি—কারুর অনুকরণ না করে। তুমি বাপকা বেটা হও, বাবা—নিজের পথেই চোলো নিজের পায়ে নিজের কদমে।"

এর পরে আমি বিখ্যাত ওস্তাদ তথা বীণকার লছমীনারায়ণ মিশ্রের কাছে কিছুদিন শিখি—মিশ্রদের ঘরে সুরেনমামার ঢঙে তালিম পাব ব'লে। কিন্তু শিখতে গিয়ে দেখি মিশ্রদের মধ্যে বড় বড় ওস্তাদ থাকলেও তাদের গানের ঢং স্বতন্ত্র। দেখে তখন মানতে বাধ্য হই যে, সুরেনমামার ঢং তাঁর প্রতিভার নিজস্ব অবদান—কোনো ধারে-পাওয়া সম্পদ নয়।

বলা হয় নি—বরোদায় গিয়ে রাজ অতিথি হয়ে ফৈয়স খাঁর কাছে কয়েকটি খেয়াল শিখি ও মথুরায় গিয়ে চন্দন চৌবের কাছে কয়েকটি ধ্রুপদাঙ্গ ভজন।

কিন্তু সুরেন মামার কাছে বহুদিন ধ'রে গান শিখলেও গানে রীতিমত তালিম নেওয়া বলতে যা বোঝায় তা নেওয়া হয়নি—যদিও উপদেশ নিতাম নানা গায়ক-গায়িকার শৈলী তথা আঙ্গিক সম্বন্ধে। বাল্যস্মৃতিতে লিখেছি, গ্রামোফোন থেকে আমি অনেক গায়ক-গায়িকার গানই গলায় তুলেছিলাম। সুরেনমামা ও পিতৃদেব ভালোবাসতেন বিনোদিনীর, কৃষ্ণভামিনীর ও লালচাঁদ বড়ালের গান। লালচাঁদ বড়ালের একটি দেশ রাগে গান—"এ হো রাজা"—আমি অবিকল তুলি গলায়। এতে পিতৃদেবের গর্বের সীমা ছিল না, বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে ডেকে শোনাতেন আমার তান: "দেখো হে আমার কুলতিলকের কাণ্ড! সাক্ষাৎ লালচাঁদ বড়ালের তান গলায় তোলা……" ইত্যাদি। গ্রামোফোনের আরো অনেক গালগল্প করতে পারি, কিন্তু দরকার নেই। শুধু কয়েকজনের নাম করি যাঁদের গান ও তান থেকে আমি লাভ করেছিলাম:

লালচাঁদ বড়াল, বিনোদিনী, জোহরা বাঈ, জানকী বাঈ, মমতাজ জান, গহরজান, দেবেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্ধ শরৎ, অন্ধ নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, বেদানা দাসী, মানদাসুন্দরী, মুকুন্দচন্দ্র নন্দন, বিজয় লাহিড়ী, টপ্পাগায়ক রমজান খাঁ, বিশ্বনাথ রাও, আবদুল করিম, মৈজুদ্দীন খাঁ, রাধিকা গোস্বামী, বকুবাবু, নগেন্দ্রবালা, অমলা দাশ (দেশবন্ধুর ভগ্নী), পান্না দাসী (কীর্তনী) ইত্যাদি।

গ্রামোফোন ছিল আমার শুধু নিত্যসহচর নয়—ফ্রেণ্ড ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড, যাকে বলে—অক্ষরে অক্ষরে। এক-একটা রেকর্ড এত বাজাতাম যে কয়েক মাস পরেই আর বাজত না, তখন আবার কিনতে হ'ত—এমনই ছিল আমার উৎসাহ। গানেই আমার বার আনা সময় কাটত—নৈলে ক্লাসের পরীক্ষায় ঢের বেশি নাম করতে পারতাম। কিন্তু পড়াশুনোয় তেমন মন বসত না—বিশেষ নতুন কোন রেকর্ড এলে। আমি কোনোমতে ক্লাসের পড়া সেরেই ফিরতাম আসল কাজে—গ্রামোফোন চর্চায়। তা সত্ত্বেও আমি পড়াশুনোয় যে 'ভালো ছেলে'ই ছিলাম, এতে আমি ধরাকে সরা জ্ঞান করতাম। ভাবটা "যদি গানে গল্পে এত সময় না দিয়ে ভালো ছেলে হয়ে পড়াশুনো করতাম, তবে ভাবো—কী হতাম!" স্বভাবে যে-মানুষ অহঙ্কারী, তার আত্মপ্রসাদকে মারে কে? এই অহঙ্কার চূর্ণ হয়, প্রথম যখন বি-এস-সিতে ফেল হই রসায়নের ব্যবহারিক পরীক্ষায়। ঠাকুরের করুণা বলে তখন একে চিনতে পারিনি

বটে, কিন্তু পরে বারবারই দেখেছি যে, যখনই মাথা গরম হয়েছে, তাঁর করুণা এসে আমার আত্মাভিমানকে ধূলিসাৎ করেছে, আরগাইতে হয়েছে—সত্যিই চোখের জলে :

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

ম্যাট্রিকে প্রথম কুড়িজনের মধ্যে হয়ে দশ টাকার স্কলারশিপ পেয়ে খুশি হয়েই শুরু করলাম বকুবাবুর কাছে গান শিখতে। বকুবাবুর কথা বলেছি—বিখ্যাত অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল উপেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভ্রাতুষ্পুত্র।

আমার বকুবাবুর গান যে কী ভালো লাগত, কী বলব। গ্রামোফোন থেকে তাঁর ইয়াদ আতি হয়—খাম্বাজ; পরের কথা শুনে—সিন্ধু; কোন্ ছেলে তোর আমার মতন—রজনীকান্তের গান; পতিত পাবনী তারা গঙ্গে—কাফি; আরো অনেক গান গলায় তুলি, এমন কি তাঁর খাঁচার পাখি গেল উড়ে থুয়ে দুটো লম্বা ঠ্যাং-ও গাইতাম। উৎসাহ আমার উজিয়ে উঠলে কি আর রক্ষে আছে? আমি গানে ছিলাম সর্বভুক, বাছ-বিচার করতাম না—তাই নিম্নশ্রেণীর আদি রসাত্মক গানও গাইতাম মানে না বুঝে। যথা লালচাঁদ বড়ালের—

আমারে আসতে ব'লে এত অপমান করা!
মনে কি পড়ে না জাদু দুহাত দিয়ে পায়ে ধরা?

বা, তুমি কাদের কুলের বউ?
যমুনায় জল আনতে যাচ্ছ—নেই কো সঙ্গে কেউ?

কি বেদানা দাসীর—

তুমি যে পরের সোনা আগে তো ছিল না জানা,
জানলে পরে পরের সোনা দিতাম নাক কর্ণমূলে।
ভালোবেসে ভালো কাঁদালে!

গানে সর্বভুক হওয়ার ফলে আমার ক্ষতি হয়েছিল সমূহ—বিশেষ রুচির দিক থেকে। নইলে নিশ্চয়ই বাল্যকালে পিতৃদেবের ভালো ভালো গান আরও শিখে রাখতাম। আমি খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারতাম ব'লেই তাঁর শতাধিক গানের সুর মনে রেখেছিলাম। এ একটা কীর্তিই বলব, কেননা আমি লোকের কাছে গাইতাম এই সব বাজে গানই বেশি—ওস্তাদি তান হলেই আমি উৎফুল্ল—কথা

যেমনই হোক। সুরুচিতে নব দীক্ষা হয় পরে সুভাষের সংস্পর্শে এসে। তখনই এসব বাজে গান গাওয়া ছাড়ি তার 'ছি-ছি' শুনে। সে বলত : "আমার অবাক লাগে ভাবতে—ডি. এল. রায়ের ছেলে হয়েও তুমি তাঁর চমৎকার চমৎকার গান ছেড়ে কি ক'রে এই সব বাজে গ্রামোফোনের গান নিয়ে মেতে থাকো!" তার ভৎর্সনায় আমার চৈতন্য হয়—আমি এসব গান ছেড়ে ফিরি পিতৃদেবের গানের দিকে। ভাগ্যক্রমে আমার স্মরণশক্তির জোর ছিল, তাই তাঁর শতাধিক গান শুনে শুনেই শেখা হয়ে গিয়েছিল, নিজে বেশি না গাওয়া সত্ত্বেও। বিধাতার আর-এক করুণার দান—আমার এই স্মৃতিশক্তি। আমার শত্রুরাও আমাকে পরীক্ষা করতে এসে সদীর্ঘশ্বাসে বলতেন, দ্বিজবাবু নাই দিয়ে এমন ছেলেটার মাথা খেলেন! পড়াশুনোর নাম নেই —কেবল গান আর তর্ক আর ডেঁপোমি"......ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিদ্বৎসমাজে স্মরণশক্তির মূল্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমি নিজের জীবনে দু শ্রেণীর মনীষী দেখেছি : এক, লোকেন কাকা (পালিত)—কী যে অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি —কত কবিতা যে তিনি অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করতে পারতেন—নানা ভাষায় দ্রুত কথা বলতে পারতেন—"নজিরের জন্যে ওকে বই খুলতে হয় না তো, নিজের মাথায় টোকা দিলেই হয়—" পিতৃদেব প্রায়ই বলতেন হেসে। অন্য দিকে বিরাট প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ, যিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন যে, তাঁর স্মৃতিশক্তি আদৌ প্রখর নয়। বেশ মনে আছে, তিনি হেসে বলতেন : "বলব কি দিলীপ, সময়ে সময়ে এমন লজ্জায়ও পড়তে হয়েছে যে, দিনুর মুখে আমার নিজের গান শুনে চম্‌কে উঠে বলেছি—কার গান দিনু? বেশ লিখেছে তো!" (ব'লেই তাঁর সে কী স্নিগ্ধ ঈষৎ সলজ্জ হাসি—আহা, সে-হাসি কি ভুলবার?) কোনো কোনো মনীষীর লেখায় পড়েছি যে, স্মৃতিশক্তি হল স্বধর্মে কেরানী-ধর্মী—সস্তা ওর কৃতিত্ব—মনের শ্রেষ্ঠ শক্তিদের কোঠায় পড়ে না। অভিযোগটির মধ্যে কিছু সত্য থাকলেও আমার মনে হয়, স্মরণশক্তির প্রাখর্য অনেক মনীষীর প্রতিভার বিকাশেও প্রচুর সহায়তা করেছে, যথা : শ্রীঅরবিন্দ, অলডাস হাক্সলি, বার্টরাণ্ড রাসেল। তবে জীবন বিচিত্র, তাই এ বিষয়ে কোনো সাধারণ সূত্র দেওয়া চলে না।

মরুকগে, আমি নিজে ভেবেচিন্তে স্থির করেছি যে, ঠাকুর আমাকে যতগুলি মূল্যবান সম্পদ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আমার স্মৃতিশক্তি প্রধানদের মধ্যেই পড়ে। অন্তত আমি নিজে আমার স্মৃতিশক্তির কাছে চিরদিনই ঋণী থাকব—বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে, নানা সময়ে নানা মহাজনের উক্তি টুকে রেখে শুধু যে নিজেই গভীর

আনন্দ পেয়েছি তা নয়, বহু মহাজন-পন্থীকেই আনন্দ পরিবেষণ করেছি। তাই তো আমি না মেনে পারি না যে, সর্বভূক হওয়ার ফলে আমার শুধু ক্ষতিই হয়নি—লাভও হয়েছিল সমূহ—কেননা বহু গান ও বহু সুর মনে রাখার নিত্য-সাধনার ফলে আমার স্মৃতিশক্তির আরো উন্নতি হয়েছিল। সবাই জানেন—কোনো বৃত্তির অনুশীলন করলে তার তেজ বাড়ে। স্মরণশক্তির বেলায়ও একথা খাটে। আমি খুব চেষ্টা করতাম নানা গান ও সুর মনে রাখতে। বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যদি বলি যে হিন্দী উর্দু বাংলা মিলিয়ে আমি চার-পাঁচশো গান খাতা না দেখে গাইতে পারতাম যখন তখন—অতুলদা আমার স্মরণশক্তির এ-দৌড় দেখে খুশি হয়ে আমাকে 'শ্রুতিধর' ব'লে ডাকতেন সময়ে সময়ে। য়ুরোপে যখন প্রথম রোলাঁর সঙ্গে কথালাপের রিপোর্ট লিখতে বসি তখন আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে উঠি লক্ষ্য ক'রে যে তাঁর বার আনা কথা আমার মনে গেঁথে গেছে। কেম্ব্রিজে দাবা খেলায় নাম করি। খেলার পরে বাড়ি ফিরে বাজিটা ফের খেলে দেখতাম—কোথায় কোন চালে ভুল হয়েছিল। তারপর শ্রীঅরবিন্দের কাছে এসে তাঁর মহাভারতপ্রমাণ গ্রন্থগুলি পড়বার সময়েও ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিতাম যে, গুরুদেবের কোন্ স্মরণীয় উক্তি কোন্ বইয়ে পড়েছিলাম, অবলীলাক্রমেই রেফারেন্স দিতে পারতাম বন্ধুবান্ধবকে—যদিও এর একটি কুফল ফলেছিল এই যে, আমি বড় বড় উদ্ধৃতি দিয়ে মুরুব্বিয়ানা করতাম। এর পরে এ-মোহ কাটে বিষম আঘাত পেয়ে, যখন দেখি, এমনকি, ঋষি-কল্প গুরুবাক্য আওড়ালেও মনে শান্তি নামে না। তখনই লিখি অনামীতে আমার কবিতা: "কথা কথা কথা"—যে কবিতাটির অনেকেই মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করেছিলাম, ওর মধ্যে আমার মধ্যেকার দুটি সদ্‌বৃত্তি ফুটেছিল বলে: দীনতা ও জিজ্ঞাসুতা। কিন্তু বকুবাবুর কথায় ফিরে আসি।

বকুবাবুই গানে আমাকে প্রথম তালিম দেন নাড়া বেঁধে। এতে আমার আনন্দের অবধি ছিল না—এই প্রথম ওস্তাদ বনতে চললাম—শুঁয়োপোকার গায়ে প্রজাপতির পাখা উঠতে শুরু করল বুঝি! মহা উৎসাহে আমি তাঁর কাছে একের পর এক আদ্যন্ত ভুল হিন্দি গান শিখতে শুরু করলাম মানে না জেনে। একটি গান শুনে পরে সুরেশদা হেসে অস্থির—তাঁর কথা বলছি পরে—বললেন: "তন মন তু পয়দারুআ—এ কী রে!" এ-গানের অন্তরায় ছিল:

বিঁন দেখ নাহি পরত চায়েহু
কও কায়সে কাটি হা দিহু আর বিহু

সুরেশদা বললেন: "দিনু, আর বিনু দু ভাই বেশ বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তাদের কেটে ফেলবার জন্যে বকুবাবুর এ নিদারুণ রোখ চেপে গেল কেন রে?" ব'লে বললেন: এ-গানটির শুধু বাণী হবে:

তন মন তো পে ডারিয়াঁ।
বিন দেখ নহি পরত চয়েন
কহো কয়সে কটেঙ্গে দিন ঔর রয়েন।

অর্থাৎ তনু মন তোমাকে সঁপলাম—তোমার অদর্শনে আসে না শান্তি; কাটতে চায় না দিন ও রাত ·····" ইত্যাদি।

কিন্তু তখনো হিন্দিতে সুরেশদার অভ্যুদয় হয়নি তো—তাই আমি বকুবাবুর কাছে সানিধাপা সানিধাপা করে দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিতে ভুল হিন্দি বাণীর গানগুলি পরম ভক্তিভরে মনের আনন্দ-মন্দিরে সাজিয়ে পূজা ক'রে চলেছি। বকুবাবুর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মিষ্ট ছিল—তাই তিনি দেখতে দেখতে আমার মনের মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আজো আমি ভুলতে পারি নি কোমল গান্ধার খরজে তাঁর তারসপ্তকে পঞ্চমে স্থিতি। তাঁর টপ্পার দানাও ছিল চমৎকার। "ননদিনী বোলো নগরে ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণ কলঙ্কসাগরে"—দাশুরায়ের এ-গানটি তিনি চমৎকার গাইতেন—আমি এখনো গাই সময়ে সময়ে। বড় সুন্দর খাম্বাজ টপ্পাও শিখেছিলাম। তবে তিনি খেয়াল বেশি জানতেন না তাই মাসকয়েক তাঁর কাছে শিখে যাই দৌলতরামের কাছে।

এ-পালোয়ানটি আমাকে শেখালেন দুর্ধর্ষ সার্গম। একটি ভৈরোঁ খেয়ালও শিখিয়েছিলেন। সুরটি ছিল ভালো—কিন্তু সার্গমের চর্কিবাজিতে গানটি দম বন্ধ হয়ে মারা গেল। এত বেশি সার্গম ভালো লাগল না। তাছাড়া তিনি ছিলেন বড় কটুভাষী ও বিশ্বনিন্দুক। কোনো ওস্তাদই কিছু জানে না, ত্রিলোকে সবজান্তা ত্রিলোকী দৌলতরাম। তাই কিছুদিন পরেই বিরক্ত হয়ে বিদায় নিই। তবু মানতে হবে, সার্গম শিখে আমার কিছু উপকার হয়েছিল।

তারপর শিখি একজন সত্যিকার বড় গায়কের কাছে শোরীর টপ্পা। তিনি চন্দননগরের রাম কথক। বড় মধুর গাইতেন শোরীর টপ্পা। তাঁর কাছে ত্রিশ-চল্লিশটি টপ্পা শিখে আমি বিশেষ লাভ করি—আরো এইজন্যে যে, তানপুরার সঙ্গে প্রথম গাওয়া শুরু করি আমি তাঁর কাছেই। বলতে ভুলেছি—বিশ্বনাথ রাওয়ের কাছে আমার বোন মায়া গান শিখেছিল কিছুদিন। ঐ সঙ্গে আমিও শুনে শুনে শিখেছিলাম কয়েকটি রাগ। একটি রাগ—মধুমাদ সারং—"ধর্ম সংবর্ধিনী দনুজ সংমর্দিনী···"

আরো কয়েকটি ধ্রুপদ তথা তেলানা শিখেছিলাম মনে নেই। তবে লাভ :হল এই যে ধ্রুপদে প্রথম রস পাই তাঁর গান শুনে। গ্রামোফোনেও তাঁর রেকর্ড থেকে শিখে-ছিলাম কয়েকটি গান ও কিছু সার্গম।

এর পরে আমি কখন কার কাছে কী পর্যায়ে গান শিখি ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে মনে আছে, জমীরুদ্দিন খাঁর কাছে কিছুদিন শিখেছিলাম খেয়াল ও গৌরীশঙ্কর মিশ্রের কাছে ঠুংরি। মিশ্রজি ছিলেন বিখ্যাত সারঙ্গিয়া—সঙ্গত করতেন গহরজানের সঙ্গে। সুরেন মামার কাছে প্রায়ই শুনতাম যে, সারঙ্গিয়ারা সুরের অন্ধিসন্ধি জানে ও বাইজিদের শেখায়। এই কথা শুনে মহা উৎসাহে তাঁর শরণাপন্ন হই ও শিখি পর পর পনের কুড়িটি খেয়াল ও ঠুংরি—ঠুংরিই বেশি। লছমিপ্রসাদ মিশ্রের কাছেই কিছুদিন খেয়াল ও ঠুংরি শিখি।

কিন্তু এ-সব শিক্ষা খানিকটা গৌণই বলব। কারণ এঁদের কাছে গান শিখে কমবেশি লাভ করলেও এঁরা কেউই আমার কিশোর মনে তেমন ছাপ ফেলতে পারেন নি। আমার জীবনের একটি ল্যাণ্ডমার্ক হয়ে এসেছিলেন এক অবিস্মরণীয় সন্ন্যাসী, একটু আগে যাঁর নামোল্লেখ করেছি—সুরেশ দা। তাই এঁর কথা একটু ফলিয়েই বলতে হবে।

ইনি ছিলেন সন্ন্যাসী—বলেছি। কিন্তু এমন সন্ন্যাসী আমি আর দেখি নি—বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গে মেশার পরেও। যেমন সুপুরুষ তেমনি সুগায়ক, তেমনি মিশুক, তেমনি ফিটফাট সাজসজ্জা। গৈরিক রঙে রাঙানো চুড়িদার পাজামা ও পাঞ্জাবি পাগড়ি পরে যখন তিনি আসরে বসতেন তখন সভা উজ্জ্বল হয়ে উঠত। রূপেই তিনি অর্ধেক যুদ্ধ জয় ক'রে ফেলতেন। সত্যিকার পার্সনালিটি যাকে বলে। তার পর যখন কিন্নরবিনিন্দিত কণ্ঠে ভজন ধরতেন অপরূপ হার্মোনিয়ম সঙ্গতে—মনে হ'ত যেন আকাশ থেকে গন্ধর্বরা প্রসন্ন হয়ে পুষ্পবৃষ্টি শুরু করেছেন। তাঁর স্নেহ পেয়ে আমি সত্যিই নিজেকে ধন্য মনে ক'রে এসেছি চিরদিনই। তিনি আজ বেঁচে আছেন কিনা জানি না। তবে বছর কুড়ি আগে আকবর হায়দারির এক মেয়ের বাড়িতে যখন আমি গান করি—বম্বে শহরে—তখন সেখানে এক মুসলমান ভদ্রলোক আমার মুখে সুরেশদার শেখানো "তুনে ক্যা কিয়া মুঝে বতা তো সহি" গজলটি শুনে চমকে উঠে বলেন আমাকে যে, বৃন্দাবনের কাছে কোন্ এক জঙ্গলে একদিন তিনি এক সুপুরুষ সন্ন্যাসীকে এ-গানটি গাইতে শুনেছিলেন। তিনি একলা গাছ-তলায় ব'সে গাইছিলেন গানটি—শুনে মুসলমান শ্রোতাটি মুগ্ধ হয়ে আলাপ করেন ও

শোনেন তাঁর নাম—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী। আমি বলি—তিনিই আমার গুরু—ভজনের।

আমি যখন বি. এস-সি পড়ি তখন এই অপরূপ ব্রহ্মচারী কলকাতায় এসে এণ্টালিতে ও নানা মাড়োয়ারি বাড়িতে দিনের পর দিন আসর জমাতেন। শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ—সুরেশ মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম। কিন্তু বাঙালি শ্রোতারা তাঁকে এত ভালোবাসতেন যে, সুরেশদা ব'লেই ডাকতেন।

ইনি শুধু যে গানে গন্ধর্ব ছিলেন তাই নয়—তাঁর হিন্দি ও উর্দু গানের বাণী ছিল নিখুঁৎ অনবদ্য। বহু বৎসর বৃন্দাবনে থেকে হিন্দি উর্দু তিনি বলতে পারতেন মাতৃভাষার মতনই স্বচ্ছন্দে। ভাষা শিক্ষায় তাঁর একটা সহজপটুতা ছিল মনে হয়, কারণ গুজরাতি ভাষাও তিনি চমৎকার বলতে পারতেন। বাঙালীর মুখে এমন অনর্গল চোস্ত হিন্দি বা উর্দু খুব কমই শুনেছি। তাই তাঁর কাছে গানের তালিম নিয়ে আমার একটি মস্ত লাভ হয় এই যে, আমি শুদ্ধ বাণীতে হিন্দি ও উর্দু গান গাইতে শিখি। তিনি প্রায়ই ঠাট্টা করতেন বাঙালীদের হিন্দি উচ্চারণ ও হিন্দুস্থানীদের বাংলা উচ্চারণ নিয়ে। তাঁর কাছ থেকেই আমি শিখি বাইজিদের বাংলা গানের ক্যারিকেচার করতে :

নিমিসের দেখা জোদি (আরে হাঁ) পাই হে তুম্‌হারি
আঁখেতে মছাই জোতো (আরে হাঁ) বালাই তুম্‌হারি

...সুরেশদার ঠোঁট বেঁকিয়ে বাইজিদের নকলে এই ধরনের গান গাওয়া শুনে আমরা হেসে গড়িয়ে পড়তাম—"গুণেমণি ! দাসি তোবো পোয়" ছিল তাঁর একটি প্রিয় গান। কিন্তু এবার প্রগলভতা রেখে তাঁর গুণকীর্তনের কোঠায় আসি।

সুরেশদা যাই গাইতেন চমৎকার আসর জমিয়ে গাইতেন—তালে তালে হার্মোনিয়ম-সঙ্গতে একেবারে ; দিগ্বিজয়ী ভঙ্গিতে। তাঁর উর্দু হিন্দি ও বাংলা গান শুনে আমার মনে হ'ত যেন দেবদূত সশরীরে নেমে এসেছেন দেবতার খবর দিতে। দেখতে দেখতে তিনি আমাকে তাঁর ভজনে ও কীর্তনে আবিষ্ট ক'রে তুললেন, আর অমনি মনে মনে ফিরে এল আমার শৈশবের ভক্তি উচ্ছ্বাস যাকে মিথ্যে খেয়ালটপ্পার মোহে ভুলতে বসেছিলাম। তাঁর কাছে গিয়ে যখনই গান শিখতাম পুলকে আমার রোমাঞ্চ হ'ত। চোখে জল ভ'রে আসত তাঁর অপরূপ গজলভাঙা সুরে গাইতে :

কী গুণ বলো কী গুণ জানে হরি হে, তোমার বাঁশের বাঁশি।
এ কি সাধনা তার, কি মহিমা তোমার কেমনে ঢালে সে অমিয়রাশি !

আহা, এ গানটি কী অপূর্ব যে গাইতেন তিনি!—যখন তিনি গাইতেন শেষ অন্তরা :

হাসে বাঁশি নাথ তব সহচর
হরিতে সরলা অবলা অন্তর,
অবোধ পরাণ বোঝে না কো তাই
সকলি ত্যজিয়া ছুটিয়া আসি—

তখন সত্যিই বুকের মধ্যে আমার অশ্রুসাগর উঠত দুলে, মন হয়ে যেত উদাস—তখনকার মতন। কিন্তু সে অন্যকথা। গানের কথাই বলি, নৈলে শেষ করা দুর্ঘট হবে।

এ-গানটি তিনি বেঁধেছিলেন একটি উর্দু গজলের সুরে—যেটি পরে গ্রামোফোনে আমার হিন্দুস্থানি গানের মধ্যে সবচেয়ে লোকপ্রিয় গান হয়ে ওঠে। এ-গানটির বাণী শুদ্ধ ছিল ব'লে যেখানে সেখানে গেয়ে উর্দু-হিন্দিভাষীদের মন গলিয়েছি। গানটি গ্রামোফোনে অনেকেই শুনেছেন :

তুনে ক্যা কিয়া মুঝে বতাতো সহি
মেরা চৈন গয়া মেরি নিদ গঈ।

তাঁর কাছে আরো উর্দু গজল শিখেছিলাম কিন্তু সেগুলির মধ্যে কোনো বিশেষত্ব ছিল না। এছাড়া, তাঁর কাছে অনেকগুলি চমৎকার ভজন শিখি যদিও ইন্দিরার অতুলনীয় ভজনের পরে সে-সব ভজন গাইতে আর মন চায় না। বলে না : "ভালোর সবচেয়ে বড় শত্রু মন্দ নয়, সে হ'ল—আরো ভালো।"

কিন্তু তবু বলবই বলব যে, আমার জীবন ভজনের দিকে মোড় নেয় প্রথম সুরেশদার গান শুনেই। এখানেও আজ দেখতে পাই বিধাতার সেই করুণার অভ্যাগম—যে ওস্তাদি গানের সর্গরম পর্বের মোহলগ্নে এসে আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল :

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসংগঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্তনং হি
সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে॥

অর্থাৎ

নয়নের শেষ লক্ষ্য—তোমার দরশন,
তনুর স্বপ্ন—তোমার অঙ্গ-পরশন,
রসনা গাহিতে চায়—নামগুণকীর্তন,
দুর্লভ ভবে হেন ভাগবত মহাজন।

মনে করিয়ে দিয়েছিল বড় সময়েই, বলব। নৈলে হয়ত গানের সন্ধানে ঠিক পথটি খুঁজে পেতে আমার আরো দেরি হ'ত। দেরি হ'ত বলছি এই জন্যে যে, আমার জীবনে ভজন-লগ্ন আসতই আসত, কারণ আমি মুখে ওস্তাদিপন্থী হ'লেও অন্তরে ছিলাম তো ভজনপন্থীই বটে—কেবল তখনো আত্মপরিচয় হয় নি ব'লে রসনার শেষ লক্ষ্য যে হরিনামকীর্তন এই সত্যের সত্যটিকেই ভুলতে বসেছিলাম। কিন্তু ঠাকুর যাকে কৃপা করেন সে ঠাকুরকে ভুললেও তিনি তো আর তাকে ভোলেন না —তাই নানা সময়ে অপ্রত্যাশিত লগ্নে দুর্বাসা মুনির মতনই হানা দিয়ে চম্‌কে ডাক দিয়ে বলেন: "অয়মহং ভোঃ।" দুর্বাসার সঙ্গে ঠাকুরের তফাৎ কেবল এইখানে যে, আনমনা শকুন্তলা অতিথি-সৎকার না করলেও তিনি শাপ দেন না—মৃদু হেসে অদৃশ্য হন—ব'লে যে পরে আসবেন আবার—সময় হ'লে। আমার গানের বিকাশে এই সময়ে তিনি ঠিক এমনি ভাবে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিলেন—আমার তখনো ওস্তাদি গানের মোহ কাটেনি ব'লে। কিন্তু সুরেশদার মাধ্যমে ঠাকুর এ-সময়ে এসেছিলেন শুধু ভজন শেখাতেই নয়—মনে আর একটি ইঙ্গিত অঙ্কুর-রূপে বুনে রেখে যেতে যে, হিন্দি ভজনের সুরে বাংলা গান বাঁধলে বাংলা ভক্তিসঙ্গীতের সম্পদ বাড়বে। উত্তরজীবনে আমি ইন্দিরার প্রায় পাঁচশ হিন্দি ভজনের অনুবাদ করি খানিকটা এই পরম ইঙ্গিতকে স্মরণ ক'রেই বলব। মনে পড়ে তাঁর একটি গজলের সুর—(গজলটি আমি আজো গাইতে পারি—যদিও গাই না)—কী সুন্দর সুরটি, আহা! যখন তিনি গাইতেন তাঁর বিশুদ্ধ উর্দুতে—কান ও প্রাণ দুই-ই জুড়িয়ে যেত যেন। তবু বাঙালিদের মন খুঁৎ খুঁৎ করত এর সস্তা ভাবে। তাই একটি শ্লোক (শের) মাত্র উদ্ধৃত করি:

জফাজু বেমরোবৎ বেবফা না আশনা তুম হো
মগর ই তনী বুরায়ী পর ভী কিৎনী খোষনুমা তুম হো

অর্থাৎ

প্রেমিক তুমি নও, তুমি নও একান্ত হে নটবর !
ছলের দোষের নেই সীমা হায়, তবু তুমি কী সুন্দর !

কিন্তু এই সুরে বসিয়ে যখন তিনি গাইতেন :

নীলসলিলা লহরীলালা যমুনা তটিনী !
(ও তার) শ্যাম তটে শ্যামের বাঁশরী বাজিতে দিবাযামিনী ।
(ও তার) নীল গায়
দুলিত শ্যামের নীল ছায়,
(আর) নীলে নীলে নিখিল ধরণী হ'ত গো নীলবরণী !

তখন আমার মন উচ্ছল হয়ে উঠত যমুনার তটে সেই চিরন্তন মুরলীধরের ছবি কল্পনা ক'রে ! শুধু আমার নয়, অনেক ভক্তের প্রাণই রসিয়ে উঠত, চোখ ঝাপসা হয়ে আসত অশ্রু-আভাসে ।

সুরেশদার কাছে গান শিখতে গিয়ে যেন নতুন ক'রে দীক্ষা পেয়েছিলাম আমার শৈশবের প্রায় ভুলে-যাওয়া মুরলীমন্ত্রে—যে-বাঁশি আমার সরল শিশুহৃদয় শুনেছিল কিন্তু তার পরে আবার ভুলে গিয়েছিল কৈশোরে । কিন্তু ভুলতে কি কেউ পারে কিছু—বিশেষ করে নীল যমুনার বাঁশি ? সে-বাঁশির রঙে যে-মন একটিবারও রঙিয়ে উঠেছে তার সর্বনাশ হয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে—কেন-না, সে যে-মোহের টানেই বিপথে পা বাড়াক না কেন, মোহের আঁধার তার একদিন না একদিন কাটবেই কাটবে সেই হারিয়ে-যাওয়া বাঁশির আলোয় । এই-ই বুঝি ঠাকুরের লীলা—তাই ভাগবতে বার বার গোপীহিয়া কেঁদে বলেছে :

পতিসুতান্বয়-ভ্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলংঘ্য তেন্তচ্যুতাগতাঃ ।
গতিবিদন্তবোদ্‌গীতমোহিতাঃ কিতব ! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥

অর্থাৎ

প্রিয়-পরিজন-লাজকুলভয়-মান-অভিমান-বাধা
সব ভেসে যায় যবে বাঁশি তব শোনে নাথ, হিয়া রাধা !
শুধু হায় লীলা নিঠুর তোমার এ কী !
সব ছেড়ে যবে ধাই যমুনায়—দেখি :
মুরলীমোহন নাই নাই—হয় সার শুধু বৃথা কাঁদা :
বাজে কানে বাজে প্রাণে মুরলীর "আয় আয়" সুর সাধা ।

সুরেশদার কাছে শিখেছিলাম অনেকগুলি হিন্দি ভজন, কয়েকটি উর্দু গজল ও চার পাঁচটি বাংলা কীর্তন। উর্দু গজলগুলির মধ্যে একটিই (তুনে ক্যা কিয়া) আমার উত্তরজীবনে কাজে এসেছিল যখন আমি (শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগদীক্ষা নেওয়ার পরে) ভক্তিসঙ্গীত ছাড়া আর কোনো গানই গাইতাম না। পণ্ডিচেরিতে আট বছর কাটিয়ে ১৯৩৭-এ যখন কলকাতায় আসি তখন আমাকে অনেকেই গাইতে বলতেন আমার সাবেক কালের প্রাক্-যোগজীবনের—গজল ঠুংরি। কিন্তু আমি গাইতাম না বলে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হতেন। এ নিয়ে একবার পণ্ডিচেরিতেও তর্ক উঠেছিল—আমার এক বুদ্ধিমান বন্ধু 'আর্ট ফর আর্টস সেক' নীতিকে সমর্থন করে আমাকে বলেন যে, প্রেমের গান গাইতে না চাওয়া চেতনার অবনতিরই সূচনা করে। আমি শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর এ-অভিযোগের কথা জানালে গুরুদেব ২৭-৮-৩৩ তারিখে একটি চিঠিতে আমাকে লেখেন (অনুবাদ দিলাম): 'ম—যদি বলে থাকে যে আদি বা শৃঙ্গার রসের গান গাওয়া ছেড়ে দেওয়াটা তোমার সংকীর্ণতা বা অধোগতির সূচনা করে তাহলে আমাকে একটু ফাঁপরেই পড়তে হয় বৈকি। যদি কারুর রুচি বদল হওয়ার ফলে তার আর জ্যাজ সঙ্গীত ভালো না লাগে ও সে শুধু শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকারদের সঙ্গীতশৈলীই উপভোগ করে তা হ'লে বলবে কি—তার অধঃপতন হয়েছে? নিচের স্তরের থেকে উপরের স্তরের চিন্তা ভাব ও কলা কারুর আত্মপ্রকাশে উত্তীর্ণ হওয়াকে অধোগতি বলি কী ক'রে? আমি নিজে এক সময়ে প্রাণিক (vital) স্তরের প্রেমের-কবিতা লিখতাম কিন্তু, এখন আমি কেবল আত্মিক প্রেমের সম্বন্ধেই কবিতা লিখতে পারি—এ থেকে কি প্রমাণ হয় আমি সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছি, না বলব—আমি উচ্চতর চেতনায় অধিরূঢ় হয়েছি বলেই নিম্নতর প্রাণশক্তির প্রকাশে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতে পারি না? যারই চেতনার স্তর বদলায় তারই সম্বন্ধে একথা খাটে। যদি কেউ বয়স্ক হবার পরে তার ছেলেমানুষি খেলনায় আর আনন্দ না পায় তাহলে বলবে কি এর জন্যে দায়ী তার সঙ্কীর্ণতা বা অধঃপতন?" (মূল ইংরাজি চিঠিটি শ্রীঅরবিন্দের পত্রালীতে ছাপা হয়েছে।)

শ্রীঅরবিন্দের এ-চিঠিটি থেকে আমি কম আলো পাইনি, কেন-না তাঁর নির্দেশে আমার কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল একটি সনাতন উপলব্ধি: বৃন্দাবনের বাঁশির ডাক শুনে যে-মানুষ রাতারাতি সাবালক বনে গেছে তার আনন্দ সে নাবালক বুঝতে পারে না যে সে-বাঁশি আদৌ শোনেইনি। এজন্যেই অধ্যাত্ম সাধকের ও গড়পড়তা সংসারীর মধ্যে দেখতে দেখতে দুস্তর ব্যবধান গ'ড়ে ওঠে এবং

সংসারীরা বৈরাগীকে বেদরদী মনে ক'রে ভুল বোঝেন। গানের ক্ষেত্রেও এই কথা, অর্থাৎ ভজন কীর্তনের রসে যার মনপ্রাণ রঙিয়ে উঠেছে তার কাছে অভজন অকীর্তনের রং ফ্যাকাশে না লেগেই পারে না—পক্ষান্তরে ভজন কীর্তনে যে গড়পড়তা সঙ্গীতরসিক আদৌ রস পেতে শেখেনি তার কাছে মনে হয় ভজন কীর্তন উচ্চ সঙ্গীতই নয়। এ-প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল। আমার এক সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু আমাকে বলেছিলেন বিস্ফারিত নেত্রে: তুমি বলো কী দিলীপ? তুমি যোগী হয়ে এমনই অরসিক ব'নে গেলে যে নজরুলের 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী'-র মতন সরস গানকে জাতে ঠেলা করতে চাও!' আমার রুচি বদলের কাহিনীটা কোনোমতেই তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, ভজনকীর্তনকে তিনি গানই মনে করেন না, বলেন: এক আধটা ভজন মন্দ লাগে না, কিন্তু গানের রাজ্যে ওর দাম নেই বললেই হয়।' মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথিকা—প্যারাব্‌ল:

একদা এক শিষ্য পেলো একটি মণি পথের বাঁকে।
কুড়িয়ে নিয়ে ফিরতে ঘরে বলেন হেসে গুরু তাকে:
"বলছিলাম না সেদিন তোকে—যেমন আধার তেমনি বিচার,
যেমন পুঁজি যার—সে ধরে দর তেমনিই যা দেখে তার?
পারিসনি তুই এ-কথাটার নিহিতার্থ বুঝতে—না রে?
বুঝবি—যদি এই মণিটি যাচাই করতে যাস বাজারে।"

বেগুন বেচে মুদী। শিষ্য গেল প্রথম তার দোকানে।
মণি দেখে বলল মুদী: "ধ্যেৎ! এর দাম কে না জানে?
নয়টি বেগুন দিতে পারি এর বদলে।" শিষ্য বলে:
"দশটিই দিন পুরোপুরি।" মুদী বলে: "যাও না চ'লে!
কেন বকাও? কে না জানে—পাঁচটি বেগুন ঠিক দাম এটার—
দর দিয়েছি আমি বেশি।" শিষ্য হেসে শালওয়ালার
কাছে যেতে বলল সে: "এর বদলে ভাই দিতে পারি
শাল বড় জোর ছুটি।" শিষ্য গেল তখন জবর ভারি
এক জহুরির কাছে। দেখেই চমকে বলে সে: "এ কী রে?
লাখ টাকা নে—এক্ষুনি দে—ছাড়ব না তো—এ যে হীরে!"

কথাকয়টি বন্ধুকে বলিনি কারণ ভজনকীর্তনের ব্যাপারে তিনি যে বেগুন-ওয়ালার মতই অজ্ঞ ও অসমজদার এ-হেন দারুণ ইঙ্গিত করলে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে যেত। তাছাড়া আমার প্রকৃতি সত্যিই কোনো দিনও ঝগড়াটে ছিল না। তাই বন্ধুদের কাছে আঘাত পেলেও প্রত্যাঘাত করতাম না সহজে। মরুক গে, ফিরে আসি ইতিহাসের অধ্যায়ে।

বিলেতেও আমার নতুন নতুন গান শেখার উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি—আমি বিখ্যাত কবি শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অনেকগুলি রাগ ও ভজন শিখেছিলাম। হারীনের গলা চমৎকার খেলত, এমন কি আবদুল করিমের অনেক তানই সে হুবহু নকল করতে পারত। তার মুখে আবদুল করিমের গানের অপরূপ ঢং শুনেই আমি প্রথম আবদুল করিমের ভক্ত হয়ে উঠি ও সংকল্প করি—দেশে ফিরে তাঁর কাছে কিছুদিন খেয়ালের তালিম নিতেই হবে।

একত্রিশ

বিলেতে আমি সুরেশদার নানা ভজন ও গজল গেয়ে নাম করেছিলাম ছাত্র-সমাজে। কিন্তু আমি গজল গাইলেও বাজে গজল বড় একটা গাইতাম না—যে সব গজলের লক্ষ্য ভগবান্ শুধু সেই সব গজলই গাইতাম সাধ্যম'ত। দেশে ফিরেও আমি মূলত এই আদর্শের পথেই চলেছিলাম, মানে যদিও ঠুংরি গজল বর্গীয় গান গাইতাম নানা সভায়ই—কিন্তু সবাই স্বীকার করত যে আমার কণ্ঠ ও অন্তর সবচেয়ে ছাড়া পেত ভক্তিসঙ্গীতেই। এইজন্যেই অতুলদার ভক্তির গান আমি সাদরে বরণ ক'রে নিয়েছিলাম—যদিও তাঁর 'কে আবার বাজায় বাঁশি', 'বঁধুয়া নিঁদ নাহি আঁখিপাতে', 'কে তুমি বসি নদীকূলে একেলা' জাতীয় সেন্টিমেণ্টাল প্রেমের গানও কখনো কখনো উপরোধে প'ড়ে গাই'তাম—বিশেষ ক'রে আমার চ্যারিটি কন্সার্টে। গম্ভীরাত্মা নীতি-বাদীরা প্রশ্ন করতে পারেন: কখনো কখনোই বা গাইতাম কেন ভক্তিসঙ্গীতকে বরণ করার পরেও? উত্তর এই যে, জীবনে রুচি বদলালেও স্বভাব বদলাতে সময় লাগে—অতীতের অভ্যাস পেয়ে বসে মানুষকে—মরিয়া-না-মরে-রাম ঢঙেই দাবি করে তার চিরাভ্যস্ত খোরাক। ফলে এদোটানায় জাগত দোলা, অতৃপ্তি, অস্বস্তি—যার অশান্তি থেকে সে-সময়ে কিছুতেই অব্যাহতি পেতাম না। সবপ্রথম মুক্তির স্বাদ পাই—যখন শ্রীঅরবিন্দের চরণে আশ্রয় নিয়ে মনের জোর অর্জন করি ও পণ নিই যে ভক্তিসঙ্গীত

ছাড়া আর কোনো গানই গাইব না ভক্তিবিরাগী শিল্পী বন্ধুদের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও। গুরুদীক্ষায় কীভাবে শিল্পসাধনাকে অধ্যাত্মসাধনার কাজে লাগিয়েছিলাম সে-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার সময় এখনো আসেনি—জানি না কোনোদিন লেখা হয়ে উঠবে কিনা—কারণ আজ যে-মন আত্মকথা লেখার তাগিদ পাচ্ছে এমন হ'তে পারে বৈকি যে সে-মনের মতিগতি পরে একদম বদলে যাবে, মনে হবে—কী হবে লিখে? কিন্তু পরের কথা জানেন শুধু পরাৎপর আর কেউ নয়, তাই ও নিয়ে মিথ্যে মাথা বকিয়ে লাভ নেই, চলি যেপথে চলতে আজকের প্রাণ সহজ আনন্দে সাড়া দেয়—লিখে যাই কত ঘাটের জল খেয়ে কেমন করে পৌঁছেছি ঠাকুরের চরণে—কী ভাবে সাঙ্গীতিক যশঃস্পৃহা আদর্শবাদের মুখোশ পরে আমাকে নাকানিচোবানি খাইয়েছে—যদিও তা থেকেও যে তীর্থপথের পাথেয় কিছুই পাইনি এমন কথা বলব না।

যশঃস্পৃহা—ঠিক শব্দটিই এসে গেছে। কারণ বিলেত থেকে ফিরে যশস্বী হতে না হতে মোহ আমাকে পেয়ে বসল—আমি মহা দাপাদাপি শুরু করলাম আরো যশস্বী হ'তে চেয়ে। শুধু গানে নয়—সাহিত্যেও। কিন্তু পণ্ডিচেরি প্রবেশের আগে—অর্থাৎ ১৯২৩ থেকে ১৯২৮-এর মধ্যে—আমার সাঙ্গীতিক জীবনের মুখরতা এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে আমার সাহিত্যসৃষ্টির অর্ধস্ফুট আবেদন ডুবে গিয়েছিল আমার সঙ্গীতানুরাগীদের করতালিতে। আমি সে-করতালিতে উজিয়ে উঠে একের পর এক ওস্তাদ ও বাইজির কাছে গান শিখে বাহাদুর ওস্তাদ বলতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলাম—আরো ওস্তাদদেরও ওস্তাদ পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের উচ্ছ্বসিত তারিফ পেয়ে। তিনি একবার আমাকে 'নাইটিঙ্গেল অব্ বেঙ্গল' ব'লে আমার সঙ্গীতিপ্রতিভা সম্বন্ধে যে-তারিফ করেছিলেন আমি তাকে আমার প্রাপ্য (ডিউ) বলে গণ্য ক'রে হয়ে উঠতে চাইলাম তাই, যাতে আমার মন সায় দিত না: অর্থাৎ ধনুর্ধর ওস্তাদ। ফল যা হবার—কর্মফল এড়াবে কে?—বাহাদুরির আত্মাভিমানে আমার অন্তরের সরল উচ্ছল ভক্তিরস এল শুকিয়ে, অথচ তবু আমি দেখেও দেখতে চাইলাম না যে আমি চিরদিন যার বিরুদ্ধে লড়েছি—কি না প্রাণহীন কালোয়াতির কসরৎ—দৃপ্ত মোহে তাকেই বরণ করতে চাইছি—কাঞ্চন ছেড়ে কাঁচ কুড়োতে। তাই তো আমি ঠিক করলাম ভজনকীর্তন—ও তো হবেই, এখন ক'ষে শিখি ধ্রুপদ খেয়াল: লোকে যেন বলতে না পারে উচ্চসঙ্গীতের বনেদ আমার নেই। যে-কথা সেই কাজ: ধরলাম একেবার ধ্রুপদের মুকুটমণি শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীকে। তিনি তখন পাথুরিয়াঘাটায় থাকতেন।

এ-মহাগুরুর প্রসাদে আমি দেখতে দেখতে অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর ধ্রুপদ, ধামার ও চৌতাল শিখে পাখোয়াজে শুধু যে, নিখুঁৎ তালে গাইতে শিখেছিলাম তাই নয়—নানা দুন চৌদুন আড়ি কুয়াড়ির কসরৎ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে দিলাশা দিতাম 'বা রে আমি!' ব'লে। গোঁসাইজি আমার 'বাহাদুরি' দেখে বিস্মিত হয়ে বলতেন: 'ছেলেটির যদি মাথা গরম না হয়ে যায় তবে ও একজন বড় ধ্রুপদী হয়ে উঠবে।' কিন্তু হায়রে নিয়তির পরিহাস!—এই সাবধান বাক্যই আমার কাল হল—আমার মাথা একেবারে টগবগে হয়ে উঠল—আমি আরো ক'ষে কোমর বাঁধলাম শত্রুদের মুখে ছাই দিয়ে কুস্তিগির কালোয়াৎ বনতে।

আমার একটি মাত্র বাঁচোয়া ছিল: আমি অহঙ্কার করলেও শেখা যে দরকার এটুকু ভুলতাম না। তাই ধ্রুপদ শিখবার সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ করতে লাগলাম একজন বড় খেয়ালী ওস্তাদের।

খৃষ্টদেব মিথ্যা বলেননি—He who seeketh findeth—আমিও খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম একজন উঁচুদরের খেয়ালী গুরু: শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন চমৎকার গম্ভীর ও মনোহর খেয়ালের ঢং আমি বেশি শুনিনি। বামাচরণবাবুর গায়কী কৃতিত্ব বেশি ছিল না, কিন্তু শিক্ষকী কৃতিত্ব ছিল অসামান্য। তানালাপে তিনি সুরেনমামার বা আবদুল করিমের সমকক্ষ ছিলেন না, কিন্তু উদাত্ত খেয়ালের কুলীন চালে যে-ছবিটি তিনি ফুটিয়ে তুলতেন তাঁর মধুর ও গম্ভীর কণ্ঠে যে মুগ্ধ হ'তে হত—বিশেষ করে তাঁর হলক তানে। এত ভালো হলক তান আমি আর কোনো গুণীর কণ্ঠে শুনিনি যদিও সগমক তানে আল্লাবন্দে খাঁ ও বিদ্যুৎগতি তানে আবদুল করিম তাঁর চেয়ে অনেক বেশি রসসৃষ্টি করতে পরতেন।

বামাচরণবাবু যৌবনে ধ্রুপদ ও খেয়াল শিখতে পাড়ি দিতেন মেটেবুরুজে যখন লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত নবাব ওয়াজিদ আলি শা লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসিত হ'য়ে সেখানে বসবাস শুরু করেন। তাঁর সর্বপ্রধান সভাগায়ক আলিবক্স খাঁ ছিলেন এই উৎসাহী বাঙালী যুবকের একমাত্র গুরু! বিখ্যাত অঘোর চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর গুরুভাই। তবে অঘোর বাবু শিখতেন ধ্রুপদ, বামাচরণবাবু খেয়াল। তাঁর কাছে ওয়াজিদ আলি শার সভার আরো কয়েকটি ওস্তাদ ও বাইজির গল্প শুনতাম প্রায়ই মুগ্ধ হয়ে। সে সব বলার প্রয়োজন নেই—কেন না তার সঙ্গে আমার গীতসাধনার কোন সম্বন্ধই নেই। কেবল একটি কথা বলব।

বামাচরণবাবু আমাকে পুত্রাধিক স্নেহে খেয়াল শেখাতেন। কিন্তু কী যে

বকতেন দিনের পর দিন : "ছি ছি দিলীপ ; শেষে ঠুংরি ! তোমার এমন গলা—তুমি কি না ঠুংরি গাও ? সাত নকলে আসল খাস্তা ! তোমার মুখে হলক তান আমাকে মেটেবুরুজের খেয়ালের কথা মনে করিয়ে দেয়—এ-হেন তুমি কিনা বাইজির ঢং নকল করো ? ওদের কণ্ঠের মিহি তানে পারবে তুমি ওদের টেক্কা দিতে ? তুমি চলো তোমার পথে—অপরের পথে চলবার এ-দুর্মতি কেন ? দুটো সস্তা হাততালি পেতে ? ছি ছি ছি ! তোমার আশ্চর্য কণ্ঠ শুনি আর কপাল চাপড়াই —কণ্ঠে যার কিন্নর মগজে তার দুষ্টু সরস্বতী ভর করল কেন গো ব'লে।"...... এইভাবে তিনি আমাকে নিরন্তরই ধমকাতেন। কিন্তু সে স্নেহের মিষ্টি ভর্ৎসনা, তাতে তাপ নেই তো—তাই তাঁর ভর্ৎসনা শুনে আমার বন্ধুবান্ধব সবাই হতেন হেসে কুটিকুটি, আমিও হেসে সায় দিতাম। মনে আছে একদিন আমার গীতিশিষ্যা ৺উমা বসু তাঁর অশ্রান্ত বকুনি শুনে কী যে খুশী ! হাততালি দিয়ে বলেছিল : "তোমাকেও বকতে পারে এমন গাইয়ে আছে মন্টুদা ?"

তাঁর কাছে আমি পুরো দুটি বৎসর গান শিখেছিলাম। এর আগে বা পরে এতদিন ধ'রে কোনো ওস্তাদের কাছেই আমি গান শিখিনি কখনো—শেখা সম্ভব ছিল না বলেই। কারণ আমার তো শুধু গানের নেশা নয়—ছিল আরো অনেক নেশা : ভাবা-শেখার, পড়ার, ভ্রমণের, গুরু-খোঁজার, বাণীসংগ্রহের, মেলামেশার—সর্বোপরি—লেখার। এখানে একটি কথা বলবই বলব—যা থাকে কপালে। মানে সুধীবৃন্দ মৃদু হেসে মাথা নাড়লেও বলব কেন না এ বিশ্বাস আমার বহুদিনের। কথাটা এই যে, আমি নিজেকে খুব গভীরভাবে নিরীক্ষা তথা পরীক্ষা করে দেখেছি যে সাহিত্য আমার কাছে গানের থেকে একটুও কম প্রিয় নয়। বড় লেখকের লেখা প'ড়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তা বড় গায়কের গান-শুনে-পাওয়া আনন্দের চেয়ে এক তিলও কম নয়। এক্ষেত্রে আমার হয়ত রোঁলার সঙ্গে কিছু মিল আছে কারণ তিনিও শেষ পর্যন্ত কোনোদিনই জোর ক'রে বলতে পারেন নি—কাকে তিনি বেশি ভালোবেসেছিলেন—সাহিত্য না সঙ্গীত ? আমি আমার জীবনের প্রাক্-যোগপর্বে অবশ্য সঙ্গীতচর্চাতেই বেশি আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু ১৯২৮-এ শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগদীক্ষার পরে আমার সাহিত্য-অনুরাগ আমাকে বানের জলের মতন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে—দিনের পর দিন। পণ্ডিচেরিতে পঁচিশ বৎসর থেকে শ্রীঅরবিন্দের স্নেহোৎসাহে আমি দিনের পর দিন সাহিত্য-সাধনাতেই ডুবে থাকতাম বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু সে-বিকাশ পরে হ'লেও প্রাক্‌যোগপর্বেও আমি হৃদয়ে প্রবল টান অনুভব করতাম সাহিত্যের দিকে—বিশেষ ক'রে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পর থেকে। তাই বলছিলাম গানে আমার পক্ষে সে-সময়েও ঐকান্তিক হওয়া সম্ভব ছিল না। লেখায় না হোক পড়াশুনোয় আমার বহু সময় যেত—লিখতামও সময় পেলেই কিন্তু সময় বেশি পেতাম না বলে পণ্ডিচেরি-প্রয়াণের পূর্বে লেখার সাধনাকে বরণ করতে পারি নি তেমন ক'রে—যে-জন্যে শরৎদা আমাকে একাধিকবার তাঁর পত্রে ভর্ৎসনা করেছিলেন। এ-সময়ে আমি সাহিত্যসাধনায় উৎসাহ পেয়েছিলাম শুধু তাঁরই কাছে। আমার বন্ধুরা কেউই আমার সাহিত্যিক উচ্চাশাকে আমল দেন নি—অধিকাংশই স্বতঃসিদ্ধের মতন ধরে নিয়েছিলেন যে, আমি স্বধর্মে সাঙ্গীতিক মাত্র, সাহিত্যিক বা কবি নই। এতে আমি গভীর দুঃখ পেতাম ব'লেই শরৎদার কাছে কৃতজ্ঞতার আমার অবধি ছিল না। পরে মহাগুরু শ্রীঅরবিন্দের উৎসাহ পেয়ে আমার এ-দুঃখ ঘোচে। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। যা বলছিলাম বলি।

সঙ্গীতে যশঃস্পৃহা দেখতে দেখতে আমাকে উদ্দীপ্ত করে তুলল। ব্যাসদেবের নির্ঘোষ 'ন জাতু কামঃ কামানু উপভোগেন শ্যাম্যতি—হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভুয় এবাভিবর্ধতে'* মাঝে মাঝে আমার মনকে টুকলেও আমি আর গ্রাহ্যই করতাম না নিবৃত্তির নিষেধ—আরো এই জন্যে যে হবি তো হ—ঠিক এই সময়ে অবাঙালীদের মধ্যে আমার নাম হল গান্ধীজি, ভগবান দাস, যুগলকিশোর বিরলা, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, শিউপ্রসাদ মিশ্র, আম্বালাল সারাভাই প্রমুখ খ্যাতনামাদের সমাদরে। এতে আমি আরো মেতে উঠে লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ কাশী আগ্রা গোয়ালিয়র আমেদাবাদ দিল্লি দিল্লি সর্বত্র গান গেয়ে (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) চ'ষে বেড়াতে লাগলাম। তিনি এই সময়ে মাঝে মাঝে দেখা হলেই আমাকে সস্নেহ পরিহাসে বলতেন: তোমার বাবাও গান গেয়েছেন দিলীপ, আমিও বড় কম গাইনি, কিন্তু তোমার মত দাপাদাপি ক'রে ভূভারত চ'ষে বেড়াই নি।' কিন্তু তিনি আমার আর একটি সাথী উচ্চাশার কথা উল্লেখ করেন নি—গান শেখার। যেখানে বড় ওস্তাদের খোঁজ পেয়েছি গিয়ে দিয়েছি ধর্না। কিন্তু হায়রে, খুব কম ওস্তাদই শেখাতেন মন দিয়ে—যদিও দক্ষিণা

* নিরন্ত উপভোগে কবে হয় তৃপ্ত ভোগের বাসনা ?
আহুতি যতই দাও হুতাশনে তত জ্বলে ওঠে দাহনা।

নিতেন খুশি হয়েই। সময়ে সময়ে বহু অর্থ ব্যয় করেছি, মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দেই নমুনা হিসেবে: বরোদায় গেলাম ফৈয়স খাঁর কাছে গান শিখতে। কিন্তু প্রতিদিন তের টাকা ক'রে নিয়েও তিনি তিন দিনে একটির বেশি গান শেখাতে চান নি—যদিও আমার দিনে একটি ক'রে গান শেখার ক্ষমতা সত্যিই ছিল। কিন্তু সে-খেদ থাক—এখানে শুধু একটা ছক কেটে যাই—কার কার কাছে গান শিখেছিলাম।

একটা ভুল হয়ে গেছে—আমার একজন গানের গুরুর কথা বলা হয় নি যথাস্থানে। কিন্তু তাঁর কথা না বললে অকৃতজ্ঞতা হবে। তাই এ-অধ্যায় শেষ করার আগে তাঁর কথা একটু ব'লে নিই সংক্ষেপে।

তাঁর নাম শ্রীমন্মথনাথ দত্ত। ইতিপূর্বে এঁর নামোল্লেখ করেছি কিন্তু পরিচয় দেওয়া হয় নি পরিচয়টা দেবার ম'ত। ইনি ছিলেন বিখ্যাত অন্ধ গায়ক শ্রীনিকুঞ্জমোহন দত্তের ছোট ভাই। শ্রীনিকুঞ্জ দত্তের কয়েকটি গান আমি গ্রামোফোন থেকে তুলেছিলাম: "সম্পদে বিপদে যেন শ্রীপদে ভুলো না," "হৃদয় রাস মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে" ইত্যাদি। মন্মথবাবু দাদার মতন ওস্তাদ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর চেয়েও সুকণ্ঠ ছিলেন। অপিচ পিতৃদেবের তিনি ছিলেন পরম ভক্ত—পিতৃদেবের কাছ থেকে তাঁর একটি গান তিনি শিখেছিলেন ও গেয়ে নাম করেছিলেন: "মলয় আসিয়া ক'য়ে গেছে কানে—প্রিয়তম তুমি আসিবে।" এ-গানটি উত্তর জীবনে তাঁর কাছ থেকে শিখে আমি আমার যৌবনে যত্র তত্র গাইতাম। সে-যুগে আমার শ্রেষ্ঠ গান কয়টির মধ্যে এ-গানটি রসোত্তীর্ণ হয়েছিল ও লোকপ্রিয়তায় ছিল প্রায় "রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো"-র প্রতিস্পর্ধী। মন্মথ বাবু গান ধরতেন, কোমল গান্ধারকে মা ক'রে ও তার সপ্তকে পঞ্চম ধৈবতে দাঁড়াতেন অবলীলাক্রমে। মর্দানা গলায় এত উচ্চ পর্দায় সুরের জৌলুষ সহজে বর্তায় না, কিন্তু মন্মথবাবু সবাইকেই মোহিত করতেন এই উচ্চ পর্দায় স্থায়ী হবার ব্রহ্মাস্ত্রে।

কিন্তু তাঁর কাছ থেকে আমি সবচেয়ে বেশি লাভ করি বাংলা টপ্পা শিখে। ইতিপূর্বে সুরেন মামার কাছেও বাংলা রাগপ্রধান গান শিখেছিলাম—কিন্তু খেয়াল ঢঙেই বেশি, টপখেয়ালেও শিখেছিলাম যথা, নিধুবাবুর

নিতান্ত না রইতে পেরে দেখতে এলাম আপনি,
দেখ বা না দেখ আমায় দেখে যাবো মুখানি।
মনে করি আসিব না, এ মুখ আর দেখাব না,
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে কেন তাহা না জানি।

এসেছি দিব না ব্যথা, বলিব না কোনো কথা,
আড়াল থেকে বারেক দেখে চ'লে যাব অমনি।

কিন্তু এ-গানটি নিধুবাবুর টপ্পা হ'লেও সুরেনমামা বিশুদ্ধ টপ্পার ঢঙে গাইতেন না, গাইতেন টপখেয়ালের ঢঙে। ১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় একদিন অশীতিপর প্রাজ্ঞ শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপস্থিতিতে—(তিনি সুরেন-মামার গানের মহা ভক্ত ছিলেন) সর্বভুক সঙ্গীতোৎসাহী শার্ঙ্গদেবকে গেয়ে শুনিয়ে ছিলাম কী অপরূপ ঢঙে সুরেনমামা এ-ধরনের বাংলা গান গাইতেন খেয়াল ও টপ্পা মিশিয়ে।

কিন্তু বিশুদ্ধ বাংলা টপ্পা শিখেছিলাম আমি মাত্র দুজনের কাছে—বকুবাবু (দাশুরায়ের ননদিনী বোলো নগরে, কি নিধুবাবুর বিরহ জ্বালা সই আমি আর কত সই দিবানিশি প্রাণে প্রাণে ইত্যাদি) ও পরে মন্মথবাবুর কাছে। মন্মথবাবু বিশুদ্ধ টপ্পাকে আরো প্রাণকাড়া ঢঙে গাইতেন বিশেষ ক'রে তাঁর একটি খাম্বাজ টপ্পায়। গানটি আমার ভারি মধুর লাগত; মন্মথবাবু বলতেন: "দেখো, যদি প্রেমে প'ড়ে ঘা খাও তাহ'লে আরো মধুর লাগবে দিলীপ-এর তাৎপর্য বুঝে।" আমি লজ্জা পেতাম —(তখন আমি উদ্ভিন্ন কিশোর তো!)—কিন্তু তবু মানের দায়ে সদাপটেই বলতাম: "প্রেমে না পড়লেও বুঝি তাৎপর্য।" মন্মথবাবু হেসে বলতেন: "সে হয় না দিলীপ, কাঁটাবনের মধ্যে দিয়ে যাবার আগে রাধা বোঝেন নি অভিসারের বিষামৃত রস।" যাই হোক গানটি উদ্ধৃত করি তাহ'লে রসিক সুজন আঁচ পাবেন তর্কটা উঠেছিল কেন। গানটি কার বাঁধা জানি না, তবে মনে হয় মন্মথবাবু তাঁর দাদা শ্রীবরদা দত্তের নাম করেছিলেন। যাহোক গানটি এই (গানটি আমার এত প্রিয় ছিল যে একটি কথাও ভুলি নি)।

ভুলো না ভুলো না সরলা কিশোরী,
ভুলো না সজল জলধর রূপে:
বরষে সে ধারা বজ্র বুকে ধরি'।
শ্যামা সুহাসিনী প্রসূনমালিনী
দেখিলে লতিকা ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না:
চাহ যদি মূলে কালফণা তুলে
দেখিবে ভুজঙ্গী বসি' বিষধরী।
নির্মল নিথর নেহারি' নদীতে

ভেসো না বালিকা, ভেসো না ভেসো না :
উঠিবে তুফান হারাইবে প্রাণ
ভাঙিবে চুরিবে ডুবিবে তরী।

তিনি রজনীকান্তের কয়েকটি ভক্তি সঙ্গীতও গাইতেন তাঁর স্বকীয় টপ্পা ঢঙে— যেগুলি দুদিনেই আমি তাঁর কাছে থেকে শিখে নিয়েছিলাম ও প্রায়ই গাইতাম। এ-গানগুলি আমার কাছে তখনও যেমন প্রিয় ছিল আজো তেমনি প্রিয়ই আছে, যথা : "যদি মরমে লুকায়ে রবে," "কবে তৃষিত এ-মরু ছাড়িয়া যাইব," "আমায় পাগল করবে কবে" ইত্যাদি। মন্মথবাবু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, কিন্তু বকুবাবুর প্রতি আমার পক্ষপাত সইতে পারতেন না। তাই একটি আসরে বকুবাবুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে অবলীলাক্রমে দারুণ চড়া পর্দায় গলাবাজিতে "ফাটিয়ে দিলাম" ব'লে জাঁক ক'রে আমার দিকে চেয়ে হেসে জনান্তিকে বলেছিলেন : "হুঃ! বকুবাবুর সাধ্য কি!" গায়কদের মধ্যে রেষারেষির বহু দৃষ্টান্ত দেখেছি, কিন্তু কৃতি সুগায়কেরো অপরকে দাবিয়ে নিজের সুনামবৃদ্ধি করবার এ-শ্রেণীর ছেলেমানুষি আমার বেশি চোখে পড়ে নি। এই শ্রেণীর "পাল্লা দেওয়ার" প্রবৃত্তিকে আমি দমন করতে শিখি প্রথম তাঁর এ-দুর্বলতাটি দেখে—তাই এ-উদাহরণটি দিলাম।

এ-সূত্রে আমি মন্মথবাবুর গুণপনাকে খাটো করতে চাইছি না। কারণ আমি যে নিজেই ভুক্তভোগী, তাই জানি তো হাড়ে হাড়েই যে, কবি শিল্পী মাত্রেরই মধ্যে দুটো মানুষ পাশাপাশি ঘর করে : স্রষ্টা ও উচ্চাশী। প্রথমটা শেখায় বড় হ'তে, কিন্তু দ্বিতীয়টা প্রায়ই উচ্চাশার মোহে প'ড়ে সৃষ্টির আনন্দকে গৌণ মনে ক'রে দলাদলি ও রেষারেষিকে মুখ্য ভেবে ব'সে পথ হারায়। আমি মন্মথবাবুর কাছ থেকে তাঁর অজ্ঞাতেই শিখেছিলাম সৃষ্টিকেই বড় মনে ক'রে সজাগ থাকতে—যেন উচ্চাশা বা দেখানোপনার মোহ পাঁকে না ফেলে। তাই মন্মথবাবু আমাকে যে এই শিক্ষাটি দিয়েছিলেন বকুবাবুকে অপদস্থ করার অপচেষ্টায়, এজন্যে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব চিরদিনই।

এবার আমার আর কয়েকটি গীতিগুরুর নাম ক'রে এ-অধ্যায়ের ইতি করি :

গয়ার সোনি, গোয়ালিয়রের হাফেজ আলি, মিরজের আবদুল করিম বরোদার ফৈয়াস খাঁ, মথুরার চন্দন চৌবে, উদয়পুরের জিয়াউদ্দিন—জাফরুদ্দিনের পুত্র, ইন্দোরের কেশবরাও আপ্তে, জয়পুরের ফুলজি ভট্ট, বম্বের বালগন্ধর্ব, দিল্লির মজঃফর খাঁ, কাশীর মোতি বাই, এলাহাবাদের জানকী বাই, লক্ষ্ণৌয়ের আচ্ছন বাই। এ ছাড়া বরোদার

রাইহানা তায়েবজির কাছেও শিখেছিলাম কয়েকটি রাগ তথা ভজন। হ্যাঁ, ইন্দোরের সারঙ্গিয়া বুন্দু খাঁর এবং লক্ষ্ণৌয়ের রতনজনকরের কাছে অনেকগুলি গানেরই তালিম নিয়েছিলাম। লক্ষ্ণৌয়ে একটি স্মৃতি ভুলবার নয়। রতনজনকর ও আমি দিনের পর দিন যেতাম বিখ্যাত ঠুংরি সুরকার নবাব কদর পিয়ার পুত্র সুরুদ্দের মির্জার কাছে। ঠুংরি শিখে আমি সবচেয়ে লাভ করি এই নবাব পুত্রটির তথা অচ্ছন বাঈয়ের কাছে। ঠুংরির শ্রেষ্ঠ ঘরানা চাল শিখি এঁর কাছে ও গায়কী বন্দেশ শিখি অচ্ছন বাঈয়ের কাছে। এই বর্ষীয়সী অপরূপা আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। তাঁর বয়স তখন বাহান্ন তিপ্পান্ন, আমার সাতাশ আঠাশ। তিনি আমাকে বহু যত্ন নিয়ে শেখাতেন। তাঁর স্নেহ ও সদাশয়তার কথা আমি ভুলব না। আমি যে-গানই কেন-না ফরমাস করতাম, তিনি তৎক্ষণাৎ শোনাতেন অনেক সময়েই সারেঙ্গিওয়ালার সঙ্গতে। যে-গম্ভীরাত্মা অধ্যাপকটির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তাঁকে বাঈ সাহেবার গান শুনিয়েছিলাম এইভাবেই—আসর ক'রে শোনাতে চাইলে তিনি ভয়ে ও-মুখোই হতেন না। একথা বাঈ সাহেবার কাছে বিদায় নেবার দিন বলি হাসতে হাসতে। কিন্তু বাঈ সাহেবা না হেসে হঠাৎ এমন এক সুর ধরলেন যে, আমি শুধু যে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, তাই নয়—আমার মনের উপর তাঁর কথাগুলির ছাপ পড়েছিল গভীর-ভাবে। কেন—বললেই বোধগম্য হবে, কেননা তিনি দ্ব্যর্থক ভাষায় কথা বলেননি অতি মধুর মুসলমানি বাংলায় দিয়েছিলেন আমাকে সাবধান ক'রে। একটু নমুনা দেই তাঁর বাক্-ভঙ্গির :

"তোমাকে বাচ্চা, আমি নিজের লড়কার মতনই দেখেছি প্রথম থেকে। তোমার শকল্ দেখে আমার মায়া পড়েছিল। তোমার আওয়াজও আমার মন টেনেছিল—আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলাম যে, তুমি পারবে বাকায়দা শিখতে। কিন্তু একটি কথা তোমাকে বলি বাচ্চা, কিছু মনে কোরো না। তুমি যে-প্রফেসারটির ভয় পাওয়া নিয়ে মজাক্ করলে তাঁর ভয়ের বেশক্ কারণ ছিল জেনো। গান খোদার দান বটে বাচ্চা, কিন্তু গান শিখে কত নেক লড়কা যে জাহান্নমে গেছে তুমি বা প্রফেসর না জানলেও আমি জানি তো। তাই তোমাকে বলি—গানে তালিম নাও—কিন্তু বাইজিদের কাছে নয়। আমি তোমার মা-র মতন, আমার কাছে এলে তোমার কোন আফৎ হবে না। কিন্তু জওয়ানীর পথ বড় পিছল বাচ্চা, আরো এইজন্যে যে, তোমার শুধু রুপিয়াই নেই, আছে সুরৎ আর মীঠি আওয়াজ। তুমি জানো না বাচ্চা, তবায়ফ-দের হালচাল। তাদের মধ্যে ভালো অওরৎ একেবারেই

মেলে না, এমন কথা বলি না। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার না হ'লে খুবসুরৎ অওরৎরা প্রায়ই মরদদের গিরফতার করে—খাস করকে তোমার মতন শরীফ নওজোয়ানকে তারা নানা নাজ হাওভাওসে করতে চায় বেবশ—বুঝলে না? না না বাচ্চা, গুসসা কোরো না। তাছাড়া তুমি জানো না তবায়ফরা মীঠী আওয়াজ শুনলে অখ্‌সর কী রকম দিওয়ানি বনে যায়..........." ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, কথা-গুলি একটু সাজিয়ে বললাম ইচ্ছে ক'রেই—খানিকটা তাঁর সঙ্গে আমার কী ধরনের কথা হত তার একটা নমুনা দিতেও বটে। আমাকে তিনি আরো অনেক কথা বলেছিলেন—শুনেওছিলাম কিছু কিছু তিনি কত দুঃখ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে দুটি স্মৃতি আমার কাছে চিরদিনই অবিস্মরণীয় থাকবে: এক, তিনি পঙ্কের মধ্যে বাস ক'রেও পঙ্কিল হননি, ফুটে উঠেছিলেন পঙ্কজিনীর মতনই; দুই, আমি তাঁর কাছে যে-স্নেহ পেয়েছিলাম, তার মধ্যে সত্যিই মাতৃস্নেহের আমেজে আমার মন ভরে উঠেছিল। তিনি বাইজি হয়ে কীভাবে জীবনযাপন করেছিলেন, আমি আজো জানি না, জানতেও চাইনি কোনোদিন। কারণ আমার মনে তিনি এমন একটি অমল গৌরবের স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছিলেন তাঁর মিষ্ট অভ্যর্থনায়, কিন্নরী-কণ্ঠে ও (সর্বোপরি) মাতৃস্নেহের সহজ মর্যাদায় যে তাঁর ঋণ আমি কোনোদিনই শুধতে পারব না—আরো এইজন্যে যে, তাঁর সাবধান-বাক্য আমার মনকে স্পর্শ করেছিল—এর পরে আমি আর কোনো তবায়ফের কাছেই গানের তালিম নিইনি—এক বর্ষীয়সী মোতি বাঈয়ের কাছে ছাড়া।

বত্রিশ

আমার সাঙ্গীতিক জীবন সম্বন্ধে চেষ্টা ক'রেও এক অধ্যায়ে সব শেষ করতে পারলাম না। বলবার আরো অনেক কিছুই ছিল ইতিহাসের দিক দিয়ে' কিন্তু সে-সব হ'ল—যাকে সাহেবি ভাষায় বলে "টপিকাল"—গাল্পিক, অর্থাৎ দুদিনেই বাসি হ'য়ে যায়। স্মৃতিচারণ লেখা যখন শুরু করি তখন বার বার নিজেকে মনে করিয়ে দিতে হয়েছে: "মন! লোকের চিত্তরঞ্জন করতে ছুটো না চটুল রসের বেসাতি করে: যথাসাধ্য চেষ্টা করো সেই সব স্মৃতিরই ছবি আঁকতে যাদের উপজীব্য চিরন্তন। লোকে নেবে কি না নেবে—(আমার এক বন্ধুর ভাষায়) 'তোমার ভক্তসত্তা তোমার সাহিত্যিক সত্তাকে আচ্ছন্ন করছে কি না'—এসব হাবিজাবি দুর্ভাবনা নিয়ে মাথা

বকিয়ো না শুধু লিখে চলো যা লিখতে তোমার অন্তরে সত্যিকার সাড়া পাও। আমার গানের নানা-তালিম-নেওয়ার খুঁটিনাটি ইতিহাস লিখতে আমার মন সাড়া দেয় নি। তবু সংক্ষেপে এ-বিষয়ে কিছু লিখেছি শুধু একটু আভাস দিতে: ভক্তি-সাধনা যার তীর্থলক্ষ্য কলাকীর্তির ডাকে সাড়া দিলে তার চিত্তবিক্ষেপ হয় কীভাবে, তার প্রতিক্রিয়ায় কী ধরনের উদ্‌ভ্রান্তি এসে হানা দিয়ে তাকে বিপাকে ফেলে। তাই বলি—এ-প্রতিক্রিয়া এল কীভাবে।

গান শিখতে আমি শুরু করি খানিকটা অন্তরের প্রেরণায়ই বটে, কেন না, গান আমি ভালোবাসতাম চিরদিনই। কিন্তু গান শিখতে শিখতে যশঃস্পৃহা প্রবল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তর্জীবনের আবাল্য লক্ষ্য ভক্তি বিশ্বাস নিষ্ঠা একটু একটু ক'রে দূরে স'রে গেল। বহু লোকের—বিশেষ ক'রে গুণী ও সমজদারের—বাহবা পেয়ে আমি মেতে উঠলাম—গান নিয়ে তত নয় যত গানের সূত্রে-পাওয়া প্রবর্ধমান নামডাক নিয়ে। এজন্যে আমার সময়ে সময়ে যে চিত্তগ্লানি হ'ত না তা নয়, কিন্তু সকাম কর্মে শুধু তো বন্ধনই আনে না, সেই সঙ্গে আনে অন্ধতা যার ফলে মানুষ বন্ধনকে বন্ধন ব'লে চিনতেও বেগ পায়। এইজন্যেই কামনা-পূরণে খতিয়ে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি দাঁড়ায় জমাখরচের খাতায়। আমারও হ'ল লোকসান: ভক্তির সম্পদ শনৈঃ শনৈঃ ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে শেষে একদিন আবিষ্কার করলাম যে, যে-আধ্যাত্মিক মূলধন শৈশবে পেয়েছিলাম, যৌবনজলতরঙ্গকল্লোলে তার প্রায় সবটুকুই ভেসে গেছে। এই সময় আমাকে চিরন্তনের কথা মনে করিয়ে দেন দুটি মহৎ মানুষ: শ্রীকৃষ্ণপ্রেম—আমার বন্ধু তথা সতীর্থ—ও শ্রীঅরবিন্দ—আমার আশ্রয়দাতা তথা গুরু। কৃষ্ণপ্রেমের কথাই বলি আজ—গুরুদেবের কথা বলব পরে।

কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের কথা বলতে যাওয়ার এক মুশকিল আছে। ও স্বভাবে চাপা প্রকৃতির মানুষ, তাই সাধন জীবনের কথা বলতে শুধু যে ওর নিজের আপত্তি আছে তাই নয়, আমি বলতে গেলেও ও আমাকে পই পই ক'রে মানা ক'রে এসেছে বরাবরই। আমি শুনিনি, নিজের কথা লিখেছি অবাধে, ওর চিঠিপত্র ছাপিয়েছি সানন্দে, লোকের কাছে ওর কথা বলেছি সগৌরবে যে, কৃষ্ণ-প্রেমের মত পরম ভাগবতের দেখা পাওয়াও ভাগ্য। ও রাগ করেছে, ধমকেছে কত, কিন্তু আমি ওর নিষেধ মানি নি। শেষে ও লিখেছে: "আর কেউ হ'লে আমি তার মুখদর্শনও করতাম না, কিন্তু আমার মুশকিল হয়েছে এই যে, তোমার 'পরে কিছুতেই রাগ রাখতে পারি না।"

ও কেন আমার 'পরে রাগ করতে আমি বুঝতাম : সাধনার পথে নানা বাধাই রকমারি ছদ্মবেশে হানা দিয়ে মন ভুলিয়ে সাধককে বিপথে ঠেলে। এদের মধ্যে একটি মস্ত বাধা হ'ল—প্রতিষ্ঠার কামনা। তাই শাস্ত্রীরা বলেছেন—প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠার মতই বর্জনীয়। কিন্তু বললে হবে কি, আমার মন আবাল্য এই একটি পণে অটল ছিল যে, আমি পরের মুখে ঝাল খাব না,বা বাইরের নজির মেনে চলব না—যদি দেখি তাতে আমার মন সাড়া দিচ্ছে না। তাই অনেক ভেবেচিন্তে আমি শেষটায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে, স্বভাবের ঝোঁকের পথে চলাই ভালো—অন্তত যতক্ষণ না এ-চলার ফলে আমার অন্তর্জীবনের বিকাশ ব্যাহত হয়। পরমহংসদেবের বিখ্যাত উপমা আমার "অঘটন আজো ঘটে" বইটির ভূমিকায় উদ্ধৃত করেছি আমার আত্মকথনের সাফাই হিসেবে : যে, দু'রকম মানুষ আছে, এক যাঁরা কোথাও মিষ্টি আম খেলে মুখ মুছে চুপ করে থাকেন, আর এক যাঁরা কোনো বাগানে ভালো আম খেলে সবাইকেই খবর দিতে চান : "যাও হে অমুক বাগানের আম খেয়ে এসো—মিষ্টি যেন গুড়!" যাঁরা আম খেয়ে মৌনী হয়ে থাকেন তাঁদের শ্রদ্ধা করতে আমার বাধে না কেননা আমি জানি, এ হ'ল খতিয়ে স্বভাবের কথা, তাই এক-জনের কাছে যা বরণীয় আর একজনের কাছে তা বর্জনীয় হ'তে পারে বৈকি। কেবল আমি বহু ওঠা-পড়ার শিখেছি একটি পরম তত্ত্ব : যে, আমার স্বভাব ও স্বধর্ম আবিষ্কার করতে হবে নিজের অভিজ্ঞতারই এক্তাহারে—আপ্ত-বাক্যের নির্দেশে নয় নয় নয়। আপ্তবাক্য শ্রদ্ধেয়—বটেই তো, একশোবার—কিন্তু তা ব'লে অলংঘনীয় নয়। যাঁরা মনে করেন আপ্তবাক্য না মানলে শিষ্যের নরকে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাঁদের সশ্রদ্ধ নমস্কার ক'রেও আমি বলব : "যা আমার মনে হয় না তাকে আর কারুর নজিরেই অন্যায় ব'লে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়—আমি নিরুপায়।" আমার মন চির-দিনই গেটের ফাউস্টের একটি ভাগবত বাণীতে সাড়া দিয়ে এসেছে :

Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewuszt

অর্থাৎ

শুভমতি যে-অন্তর—আন্তর প্রেরণা মানি যদি
চলে আঁধারেও—তবু লভিবে সে সত্যপথদিশা।

একথা যদি সত্য না হয় তাহ'লে ভাগবত করুণাকেও সত্য ব'লে মানা চলে না। অবশ্য মানুষের ভুল ভ্রান্তি হবেই—সে হাজার "শুভমতি" হোক না কেন।

গেটের আর একটি উক্তিও আমার কাছে সমান অপ্রতিবাদ্য মনে হয়: Es irrt der Mensch so lang er strebt অর্থাৎ মানুষ যতদিন সাধনা করবে ততদিন সে ভুলভ্রান্তি করবেই করবে—সময়ে সময়ে বিপথে পা দেবেই দেবে। কিন্তু এমনিই ঠাকুরের করুণার লীলা যে, এই ভ্রান্তির আলোয়ও আমরা সত্য হ'তে গভীরতর সত্যের আভাষ পাই, বাধার মধ্যে দিয়েই বিকাশের নব দিশা পাই। অন্তত আমার মনে হয় এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই সত্যকে জানবার, চিনবার, নিজের স্বরূপের সঙ্গে মুখোমুখি হবার। তাই আমি অদ্যাবধি মন্ত্রগুপ্তির বাণীতে আস্থা রাখতে না পেরে আম খেয়ে আমের খবর সবাইকে ব'লে বেড়ানোকেই আমার স্বভাব ব'লে বরণ ক রে এসেছি, কোথাও কিছু নতুন তথ্য বা তত্ত্বের সন্ধান পেতে না পেতে পাঁচজনকে ব'লে এসেছি কী পেলাম, কেমন ক'রে পেলাম কোন্ অঘটনের মাধ্যমে। আমি যথাসাধ্য নিজেকে খুঁটিয়ে দেখেছি যে, এতে ক'রে আমার ক্ষতি তো হয়ই নি, বরং আনন্দের পুঁজিই দেখ-দেখ্ করতে করতে বেড়ে চলেছে। তাই তো পদে পদেই ঘোষণা করতে পেরেছি—অনেক তথাকথিত বন্ধুর ব্যঙ্গবিদ্রূপ সত্ত্বেও—যে ঠাকুর আছেন, তাঁর কৃপা অঘটন ঘটায় ভক্তকে বাঁচাতে, তাঁর বাঁশির ডাকে চললে বংশীধরের দিশা পাওয়া যায়—একটু একটু ক'রে মনের আঁধার কাটেই কাটে। এ আমার পুঁথিপড়া বুলি নয়—প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যে আমাকে প্রকাশের দিকে ঠেলেছে। তাই না ব'লে যে আমি থাকতে পারি নি, এতে আমার কোনোদিন চিত্তগ্লানি তো হয়ই নি —বরং চিত্তপ্রসাদই গভীরতর হয়েছে বলব: বারবারই মনে হয়েছে—গভীর কথা গভীর সুরে বললে কথক শাস্তি পায় এ-রটনা আর যার পক্ষেই সত্য হোক না কেন, আমার পক্ষে সত্য নয়। অন্য ভাষায়, আমি শুধু জিজ্ঞাসু বা সাধকই নই, যে পেয়ে সফল হ'তে চায়, আমি ঐ সঙ্গে শিল্পীও বটে, কর্মীও বটে, যে যা পায় তা পাঁচজনের সঙ্গে ভোগ ক'রে উজিয়ে উঠতে চায় গুহ্য কথাকে গুহ্য না রেখে। প্রকাশের এ-প্রবৃত্তি যার কাছে দুর্নিরোধ্য তথা বরণীয় ব'লে মনে হয় তাকে তারা সুনজরে দেখে না যারা প্রকাশ ক'রে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কৃষ্ণপ্রেম আমাকে প্রায়ই তিরস্কার ক'রে এসেছে বুঝতে না পেরে যে এ আমার স্বধর্ম, কাজেই এতে নিধন হ'লেও তাকেই আমাকে বরণ করতে হবে এই বিশ্বাসে যে, মরণের মধ্যে দিয়েই মুক্তি আমাকে ডাক দেবে যদি জীবনে না দেয়। এসব কথা সম্প্রতি যোগিবর মহামনস্বী শ্রীমৎ অনির্বাণকে খোলাখুলি লিখেছিলাম তাঁর অভিমত চেয়ে। তিনি আমাকে যা লিখেছেন আমার মন পুরোপুরিই নিয়েছে, তাই উদ্ধৃত করি।

শ্রীমৎ অনির্বাণ শিলং থেকে, ১৯ জুলাই ১৯৫৯ তারিখে লিখেছেন: "অনুভূতির কথা সাধারণ্যে বলার সম্বন্ধে দুরকম মতই তো আছে। আমার বিশ্বাস, যার যার স্বভাবের অনুসরণ করাই ভাল। আসল কথাটা হ'ল অহংকার না থাকে যেন। একটা কিছু পেয়েছি, দেখেছি যে-আনন্দ ধ'রে রাখতে পারছি না সবাইকে তার ভাগ দিতে চাইছি—আমার অহমিকাকে চরিতার্থ করবার জন্যে নয়, ঠাকুরের মহিমাকেই প্রসাদকেই হৃদয়ে হৃদয়ে জয়যুক্ত করবার জন্যে—এতে দোষ হবে কেন? ঠাকুর হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে নাম করতেন। লোকে বলত: "কেন বাপু? মনে মনে তাঁকে ডাকলে হয় না? তিনি জবাব দিয়েছিলেন: 'আমি তো শুধু আমার নিজের জন্যেই নাম করি না, যারা নাম করতে পারে না তাদের শোনাবার জন্যেও চেঁচিয়ে নাম করি যাতে আমরা সবাই ত'রে যাই। বগল টিপে নাচা আপনার স্বভাব নয় দু'হাত তুলে নাচায় দোষ কোথায়? যা করবেন আপনভোলা হ'য়ে মুক্তপ্রাণে করবেন। আজ তিনিই বলাচ্ছেন ব'লে বলছেন, যেদিন চুপ করিয়ে দেবেন মুখ থেকে একটি কথাও বেরুবে না, কিন্তু সমস্ত সত্তা থেকে আলো ঠিকরে পড়বে—যেমন ইন্দিরা দেবীর পড়ে। সেও তো প্রকাশ।"

আজ ষাটের কোঠা পেরিয়ে দেখতে পাই একটি অপ্রতিবাদ্য সত্য: যে কৃষ্ণপ্রেম সাধক হ'লেও তার চলার ছন্দের সঙ্গে আমার নিজের চলার, ছন্দের সর্বত্র মিল নেই, এবং যেখানে যেখানে অমিল সেখানে তাকে গভীর শ্রদ্ধা করতে পারি, কিন্তু অনুকরণ করতে গেলে আমাকে দ'য়ে মজতে হবে। তাই কৃষ্ণপ্রেমের আপত্তি সত্ত্বেও আমাকে বলতেই হবে ঢাক পিটিয়ে যে, সে একজন মহৎ সাধক। শ্রীমৎ অনির্বাণ ঠিকই বলেছেন: আজ ঠাকুর বলাচ্ছেন ব'লেই বলছি—যেদিন ঠাকুর চুপ করিয়ে .দবেন সেদিন সাধ্য কি আর কিছু বলি? তাই আজ অনন্থতপ্ত হয়েই খুশখেয়ালে ক'রে চলব কৃষ্ণপ্রেমের গুণগান—বলব যা প্রাণ চায়: কীভাবে ও আমাকে পথের পাথেয় জুগিয়েছে ওর স্নেহোপদেশে, যুক্তির সমর্থনে, জ্ঞানের আলোয় —সর্বোপরি, ওর পুণ্য ব্যক্তিরূপের দীপ্ত আকর্ষণে। আমার শুভার্থী বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই নানা সময়ে আমাকে দিয়েছেন অনেক কিছু আত্মবিকাশের পাথেয়, উৎসাহের প্রেরণা, দরদের বরমাল্য। কিন্তু কোনো বন্ধুর কাছেই আজ পর্যন্ত আমার প্রাণের পরম তীর্থপথে পাই নি যা পেয়েছি কৃষ্ণপ্রেমের কাছে। কেবল দু'জনের কাছে পেয়েছি আরো বেশি পথের পাথেয় তথা অভয়ের ভরসা: গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দ ও কন্যাশিষ্যা ইন্দিরা। শ্রীঅরবিন্দের কথা গত বিশ বৎসর ধ'রে বলেছি

নানা কথা। যদিও যা বলি নি তার তুলনায় যে-টুকু তর্পণ করেছি সেটুকু সামান্যই বলব। তবু, তাঁর মহিমার কিছু সংবাদ দিয়েছি আমার Sri Aurobindo Came to Me আত্মকথায়। বলব একদিন নিশ্চয়ই, কারণ ওঁর মধ্যে যে-মহাশক্তির অবতরণ চাক্ষুষ করেছি সে-এজাহারের কিছু অন্তত না রেখে গেলেই নয়—আরো এইজন্যে যে, আমি বিশ্বাস করি যে, সে-সব কথা শুনে অনেক অবিশ্বাসীর মনও বিশ্বাসের দিকে মোড় নেবে। অনেকে প্রশ্ন করেন—কবে লিখব ওঁর কথা। উত্তরে আমি বলি: "এখনো জানি না—তবে আশা করি, পুনায় ঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করার পরে আমাদের জীবন যে-সাধনার দিকে মোড় নিয়েছে তার একটা স্থায়ী পরিণতি লাভ হ'লে বলা সম্ভব হবে।" তাই আপাতত কৃষ্ণপ্রেমের কথা কিছু ব'লেই স্মৃতিচারণের যৌবনপর্ব শেষ করি—ইতিপাঠের সময়ও এসেছে বৈ কি।

কৃষ্ণপ্রেমের কথা আমি প্রথম লিখি আমার অনামীর প্রথম সংস্করণে—পত্রাধ্যায়ে, ওর অনেকগুলি চমৎকার পত্র ও গুরুদেবের মন্তব্য ছাপিয়ে। তার পর লিখি যথাক্রমে আমার তীর্থংকরে, Among the Great-এ, "আবার ভ্রাম্যমাণ"-এ ও সর্বশেষে Sri Aurobindo came to Me শীর্ষক স্মৃতিচারণে। তাই এখানে বেশি ফলিয়ে বলব না—কারণ এসব হাবি-জাবি কথা ও পড়বে না এ-ভরসা থাকলেও লোকমুখে ওর কাছে সাতখানা হয়ে পৌঁছবেই পৌঁছবে, সুতরাং মুখ সামলে কথা কওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

বলেছি, অতুলদার ওখানেই আমার প্রথম কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে দেখা হয় ও প্রথম দেখায়ই ওকে আমি ভালোবেসে ফেলি। সে-সময়ে ও ছিল লক্ষ্ণৌয়ে ইংরাজি ভাষার অধ্যাপক। মোটর সাইক্লে ও এমন দুরন্ত বেগে ছুটত—কখনো কখনো আমাকে ওর সাইডকারে নিয়ে—যে আমি ভয়েই মরি। আমার বড় অহংকার ছিল যে, আমি সহজে ভয় পাই না, কিন্তু ওর সঙ্গে নক্ষত্রবেগে লক্ষ্ণৌয়ের পথে বেঁক নিতে না নিতে বারবারই মনে হয়েছে বুঝি যবনিকাপতন হ'ল বা অপঘাতে! ও হাসত ওর নির্মল, নির্ভয় হাসি। কিন্তু আমার চোখে আসত শুধু দুর্ভাবনার অশ্রু—কী হয় কী হয়! বেঁচে যেতাম বারবারই আর মনে পড়ত মধুসূদনকে, যাঁকে ডাকতাম ওর সাইডকারে ব'সে: "প্রভু, দেখো কিন্তু—শেষটায় যেন ব্রহ্মদৈত্য বনতে না হয়!"

এ-প্রগলভ্‌তা করলাম একটি সাধু উদ্দেশ্যে—কৃষ্ণপ্রেমের এই বেপরোয়া স্বভাবটির কথা জানাতে। অতুলদা হেসে বলতেন: "হবে না কেন দিলীপ? মুখে

ও কৃষ্ণ কৃষ্ণ করলে কী হয়—রক্তে তো ও খৃশ্চান গোরাই বটে!" তাঁরও উদ্বেগের অবধি ছিল না পাছে আমার সাঙ্গীতিক লীলা সাঙ্গ হয় স্খলযানে ওর সহযোগী হয়ে! কিন্তু কীভাবে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গ'ড়ে ওঠে একটু বলি এবার।

তেত্রিশ

তখন শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধ্যায়। তিনি ছিলেন যোগিপুরুষ, যেমন সুদর্শন তেমনি জনপ্রিয়, তেমনি সর্বশ্রদ্ধেয়। আমার মুখে ভজন শুনতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী যশোদা দেবীও আমার ভজন শুনে চোখের জল ফেলতেন প্রায়ই। কৃষ্ণপ্রেম পরে এঁর কাছেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল। কিন্তু প্রথম যখন আমি জ্ঞানেন্দ্রবাবুর অতিথি হই তখনো ও দীক্ষা নেয় নি ব'লেই মনে হয়। "মনে হয়" বলছি এইজন্যে যে, ওর কাছে দীক্ষার কথা সে সময়ে শুনিনি।

লক্ষ্ণৌয়ে আমি ভাগাভাগি ক'রে থাকতাম—কখনো অতুলদার ওখানে, কখনো জ্ঞানেন্দ্রবাবুর রম্য নিকেতনে। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর ওখানে থাকতে ভাল লাগত এইজন্যেই যে, কৃষ্ণপ্রেমও থাকত তাঁর অতিথি হয়ে একটি মস্ত ঘরে। চারদিকে ছড়ানো বইয়ের মাঝে ওর অশ্রান্ত ধূমপান এবং এর ওর তার সঙ্গে নানা বিষয়ে উদীপ্ত তর্ক বিতণ্ডা আলোচনার স্মৃতি আজও আমার চিত্তপটে অক্ষয় ছবি হয়ে আঁকা আছে। কী চমৎকার যে লাগত আমার ওর দীপ্ত নির্মল বুদ্ধি-উজ্জ্বল মুখ! কানে যেন মধু বর্ষণ করত ওর খোলা হাসি আর স্নেহ-ভর্ৎসনা। এভাবে পদে পদে আমাকে আর কেউ কোনদিন ভর্ৎসনা করে নি আমার অবিশ্বাস ও সংশয় নিয়ে। অন্য কারুর পক্ষে অবশ্য সে ধরণের ভর্ৎসনা করা সম্ভবও ছিল না, কারণ আমার বন্ধুদের মধ্যে আর কারুর ছিল না ওর মতন আশ্চর্য বিশ্বাসের জোর। তাই তো আরো ওর জোরে জোর পেয়ে ওর তিরস্কারের মধ্যে দিয়ে আমার মনে নামত বিশ্বাস শ্রদ্ধা—আর সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তর শুধু যে কৃতজ্ঞতায় কোমল হয়ে আসত তাই নয়, বিস্মিত গৌরবে ভ'রে উঠত যে, এহেন মহাজ্ঞানী ও মহাবৈরাগী আমার মতন নিত্যসন্দিগ্ধকেও স্নেহ করে! না, শুধু গৌরবই নয়, ধর্ম সম্বন্ধে ওর নানা মতামতের মধ্যে দিয়ে এমনই এক আশ্চর্য দীপ্তি ফুটে উঠত যে, আমার অনেক অবিশ্বাসের অন্ধকারেও প্রত্যয়ের পূর্বরাগ দেখা দিত। যোগশক্তির সম্বন্ধে অনেক রটনাকেই আমি

সে সময়ে অজ্ঞ বুদ্ধিবাদীদের মতন "আষাঢ়ে গল্প" ব'লে হাসাহাসি করতাম—(তখনো তো আমি বরদাবাবু বা ইন্দিরার সংস্পর্শে আসি নি)—এতে ও ঘোর আপত্তি ক'রে টেবিলে ঘুঁষি মেরে আমাকে ধমকাত: "কেন তুমি সংশয়ীদের এজাহারকে এত বড় ক'রে দেখ দিলীপ? মনে নেই গীতার কথা—'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'? না দিলীপ, এসব সংশয়ী বন্ধুদের কথায় কান দিও না, মনে রেখো—তুমি মহাভাগ্যবান্ যে, জন্মেছ ভারতবর্ষে যেখানে কৃষ্ণ লীলা ক'রে গেছেন আর শুনেছ তাঁর বাঁশি শৈশবেই।"

বলেছি, ওর স্নেহ-তিরস্কার আমার কানে অত্যন্ত মিষ্টি লাগত। কিন্তু শুধু স্নেহের মাধুর্যেই নয়, ওর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিরূপের আন্তরিক ঘোষণার মধ্যে দিয়ে প্রায়ই জ্ব'লে উঠত এমন এক আশ্চর্য সহজ প্রত্যয়ের স্বর্ণচ্ছটা যার কোনো সংজ্ঞা দেওয়াও অসম্ভব। ওকে যাঁদেরই একটু কাছ থেকে জানার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরাই আমার একথায় সায় দেবেন।

হিন্দুধর্মের অনেক আচারকেই ও ওর বলিষ্ঠ ঢঙে সমর্থন করত এই যুক্তিতে যে, এ-সব আচারই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সহজ সোপান। এ নিয়ে ওর তর্ক বাধত বেশি ধূর্জটির সঙ্গেই, কারণ ধূর্জটি ছিল বুদ্ধিবাদী, কৃষ্ণপ্রেম বিশ্বাসবাদী। আরো দুচারজন অধ্যাপক ওর সঙ্গে লড়তে আসতেন আধুনিক যুক্তি ও বিজ্ঞানবাদের বল্লম উঁচিয়ে কিন্তু ওর সঙ্গে তর্করণে সবাই হার মেনে শেষটা দুহাত তুলে বলতেন কালিদাসের ছন্দে: "আর বাণ-বর্ষণ করো না, যথেষ্ট হয়েছে—ন খলু ন খলু বাণং............" ইত্যাদি।

পঁয়ত্রিশ বৎসরের বন্ধুত্ব। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ-বন্ধুত্ব-বন্ধন অনেক মতদ্বৈধ সত্ত্বেও আজো শিথিল হয় নি, বরং আরো দৃঢ়ই হয়েছে বলব। আমি জানি ও খুশি হ'ত যদি আমি মনে-প্রাণে শাস্ত্রবাদী ও আচারী হতাম। কিন্তু এ-ও জানি যে, আমার বাইরের চলার ছন্দ ওর চলার ছন্দের সঙ্গে সর্বত্র না মিললেও মনে মনে আমি আজও ওর কাছে তেমনি কৃতজ্ঞ আছি যেমন ছিলাম ত্রিশ বৎসর আগে। আর এ-কৃতজ্ঞতার মোটামুটি তিনটি কারণ আছে যা বলবার ম'ত।

প্রথম: কৃষ্ণপ্রেমই আমাকে সব আগে বলে যে, শ্রীঅরবিন্দ যোগসাধনা ক'রে এমন এক প্রজ্ঞার আলো পেয়েছেন যা বুদ্ধির নাগালের বাইরে—শুধু সাধনাতেই অর্জনীয়। বলে তাঁর Essays on the Gita পড়ত—যে-বইটি লক্ষ্ণৌয়ে সে ছাড়া আর কেউই পড়ে নি সে-সময়ে। এই বইটি প'ড়ে আমি এতই মুগ্ধ হই যে,

শ্রীঅরবিন্দকে লিখি তাঁর দর্শন চেয়ে। কিন্তু এসব কথাই আমার তীর্থংকর-এ লিখেছি তাই এখানে পুনরুক্তি করব না।

ওর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার দ্বিতীয় কারণ এই যে, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যখন কৃষ্ণপূজা ক'রে আমার গুরুভাইদের বিরাগভাজন হয়েছিলাম তাঁদের ঘোষণা মানতে না পেরে যে শ্রীঅরবিন্দ কৃষ্ণের চেয়েও বড়—তখন কেবল কৃষ্ণপ্রেমই আমাকে আশ্বাস দেয় সস্নেহে—লেখে ওর ১৭-১-১৯৪২ তারিখের দীর্ঘপত্রে (এখানে সে চিঠির শেষের দিকের কয়েক লাইনের অনুবাদ দিলাম :

"কৃষ্ণের দিকে চোখ রাখো, কৃষ্ণকে চিন্তা করো, কৃষ্ণের জন্যে কর্ম করো—বিশ্বাস করো তাহলে কৃষ্ণকে তুমি পাবেই পাবে, এমন কি যদি ধরণী তোমার পায়ের নিচে দ্বিধা হন তাহলেও। এই-ই হ'ল সত্যের সত্য যে, তিনি ছাড়া আর যা কিছু সবই ফাঁকি, একেবারে হাওয়া।

"অপিচ যারা বলে—তাদের যোগে কৃষ্ণের কোনো স্থান নেই—তারা অজ্ঞান ব'লেই এমন কথা উচ্চারণ করতে পারে। তারা যে জানেই না কৃষ্ণ কে—তাই না নিজেদের অজ্ঞানের বড়াই ক'রে বলতে সাহস পায়—কৃষ্ণ সেকেলে মামুলি। যেন যোগের ধর্ম নিত্যনূতন প্যারিসের ফ্যাশন প্রবর্তন করা !"*

আমার আজো আশ্চর্য লাগে ভাবতে—কৃষ্ণকে ও সত্যি কী ক'রে এমন ভালোবাসে। একবার ভারি মজা হয়েছিল। কৃষ্ণপ্রেম পণ্ডিচেরি থেকে ফেরে মাদ্রাজ হয়ে। সেখানে আমার এক বাঙালি বন্ধু ছিলেন—ও তাঁরই ওখানে ওঠে। সন্ধ্যায় তিনি ওকে স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিতে যান। সে কামরায় একটি ইংরেজ মহিলা গেরুয়া-তিলকধারী স্বদেশবাসীকে দেখে রেগেই আগুন। বন্ধুবর আমাকে হাসতে হাসতে বললেন : "সে যদি দেখতেন দিলীপদা—কী কাণ্ড! মেমসাহেব যেন ক্ষেপে গেলেন—বকতে লাগলেন নেটিভদের পুতুলপূজা কুসংস্কার আরো কত কিছুর আদ্যশ্রাদ্ধ ক'রে। শেষে কৃষ্ণপ্রেমকে বললেন : 'খৃষ্টের মতন মহাতারককে ছেড়ে কী পেয়েছ তুমি বলতে পারো?' কৃষ্ণপ্রেম হেসে বলল : "পারি। কৃষ্ণ।"

সত্যিই অবাক লাগে আমার এখনো। জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ব'লে আমার এক ডাক্তার বন্ধু ছিলেন লক্ষ্ণৌয়ে। তিনি কৃষ্ণপ্রেমকে আর আমাকে অত্যন্ত

* "As for those who say that seeking Krisna has no part in their Yoga—that is the ignorant talk of those who do not know who Krishna is and vainly plume themselves on their own vain ignorance of all that old stuff ! Paris fashions in Yoga !

স্নেহ করতেন। তিনি একদিন বলেছিলেন মনে আছে (তখন কৃষ্ণপ্রেম আলমোরায় দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে সাধনা করছে): "ভাবো দিলীপ, একবার ভাবো। দেখেছিলে তো তাকে : একেবারে খাস গোরা—লাল গোরা ; তোমার পিতৃদেবের ভাষায় 'শূকরগোমৃগমাংসে পুষ্ট, আছে রক্ষা হইলে রুষ্ট ?' মনে আছে তো ওর দুর্দান্ত মোটরসাইকেলে তোমার হৃৎকম্প ? ও ছিল আকাশমার্গী বৈমানিক এও মনে রেখো। এহেন পাক্কা সাহেব আজ কী করছে ? না কৃষ্ণ কৃষ্ণ। কী খাচ্ছে ? না, ভিক্ষান্ন। কোথায় আছে ? না বিদেশে বিভুঁয়ে—একলাটি—বৃদ্ধা গুরুদেবীর সঙ্গে। কী গাইছে ? না 'মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব—কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব ?' তবু লোকে বলে—অঘটনের যুগ গত।"

ওর সম্বন্ধে আরো কত কথাই যে মনে আসে, ভিড় ক'রে! কী ভালোই ও বাসত ভজন শুনতে—বিশেষ ক'রে আমার কৃষ্ণ-কীর্তন "বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম"। এ-গানটি সম্পর্কে একটি অবিস্মরণীয় অঘটনের কথা আজ বলব—যা এতদিন বলি নি ওরই ভয়ে।

১৯৪৩ সালের কথা। তখন আমি আলমোরাতে থাকি কৃষ্ণপ্রেমেরই পাশের ঘরে। ও তখন শুত ওর গুরুদেবীর ঘরে মাটিতে কম্বল বিছিয়ে। চব্বিশ ঘণ্টাই ওকে তাঁর দেখাশুনা করতে হ'ত, কেননা তখন তাঁর শরীর অত্যন্ত খারাপ—কৃষ্ণ-প্রেমকে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর কাছে কাছে থাকতে হ'ত। এমন গুরুসেবা করতেও কাউকে দেখি নি সে সময়ে—যদিও পরে দেখেছিলাম : ইন্দিরাকে। ও কোথাও যেত না, সব কাজ ফেলে এই গুরুসেবাকেই বরণ ক'রে নিয়েছিল ওর পরম সাধনা ব'লে। আমাকে প্রায়ই বলত যে, ভাগবতে কৃষ্ণের বাণী চিরন্তন সত্য যে—

ঐকান্তিক শিষ্য যবে করে তার আত্মনিবেদন
গুরুর সেবায়—তার জেনো আর নাহি নাহি প্রয়োজন
কৃচ্ছ্র তপস্যার—সর্বসিদ্ধি তার করতলগত।

গুরুসেবার কিছু তত্ত্ব অবশ্য আমি জানতাম—কারণ গুরুকে আমিও ভালো-বেসেছিলাম যদিও কৃষ্ণপ্রেমের মতন দৈনন্দিন গুরুসেবা করবার সুযোগ পাই নি—গুরু গ্রহবৈগুণ্যে পর্দানশীন হয়েছিলেন ব'লে। তবু গুরুর জন্যে সব ছাড়বার প্রেরণা পেয়েছিলাম আমি প্রথম কৃষ্ণপ্রেমেরি দৃষ্টান্তে। সব কথা বলতে গেলে এ-স্মৃতিচারণ অতিকায় হয়ে উঠবে, তাই সংক্ষেপেই বলতে হবে।

হয়েছিল কি, কৃষ্ণপ্রেম ১৯২৬ না ২৭শে অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে আলমোরা যায়

ওর গুরুর সঙ্গে। গুরুর কথায়ই ও চলত ফিরত। তিনি ওকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন তাই ও নিয়েছিল ; ওকে ভিক্ষান্নে জীবিকা-নির্বাহ করতে বলেছিলেন তাই ও দোরে দোরে ভিক্ষা শুরু করেছিল : কন্যা মোতিরানীকে ওর কাছে দীক্ষা নিতে বলেছিলেন—ও তাকে গ্রহণ করেছিল। এককথায় আত্মীয় স্বজন দেশ এমন কি মাতৃভাষায় কথা কওয়াও ও ছেড়ে দিয়েছিল গুরুর সান্নিধ্য পেতে। যশোদা মা ও মোতিরানীর সঙ্গে সচরাচর ও হিন্দিতে বা বাংলায় কথা বলত। হিন্দিতে ভাগবত পড়ত গুরুর সঙ্গে, বাংলায় চরিতামৃত পড়ত সম্ভবত মোতিরানীর সঙ্গে। কঠোপনিষদের ভাষ্য লিখেছিল শিষ্যার জন্যে। ও ছিল গুরুদেবী ও কন্যাশিষ্যা অন্ত প্রাণ।

এবার হারানো খেই ধরি, বলি অঘটনের কাহিনী।

চৌত্রিশ

কাহিনীটির মর্ম উপলব্ধি করা একটু হয়ত সহজ হবে যদি কৃষ্ণপ্রেমের মন্দিরটির একটি ছক দিই এখানে।

দুটি ঘরের মাঝে দরজা। সেখানে একটি চৌকাঠে ব'সে মোতিরানী কৃষ্ণ-প্রেমের সঙ্গে রোজ সন্ধ্যায় কীর্তন করত। সে এ-চৌকাঠে বসলে যশোদামার ঘর থেকে মন্দির কক্ষে পৌঁছতে হলে মন্দির পরিক্রমা করা ছাড়া উপায় নেই। তাঁর ছোট শয়নকক্ষে খাটে যশোদা মা অষ্টপ্রহর ব'সে বা শুয়ে থাকতেন—কারণ চলাফেরা করা ডাক্তারের মানা। আমি মিরতোলায় যে-কদিন ছিলাম প্রত্যহ সন্ধ্যায় কৃষ্ণপ্রেম ও মোতিরানীর সঙ্গে ব'সে ভজন ও আবৃত্তিতে যোগ দিতাম। সে-সময়ে মিরতোলার মন্দিরে কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে ছিল ওর আর এক উদাসী বন্ধু হরিদাস—পূর্বাশ্রমের নাম Alexander—লক্ষ্ণৌয়ের প্রাক্তন সার্জন। তাকে আমরা অ্যালেক ব'লেও ডাকতাম সময়ে সময়ে। যশোদা মা, মোতিরানী ও হরিদাস তিন-জনেই ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন মিরতোলায় এখন আছে মাত্র দু জন : কৃষ্ণপ্রেম ও তার ইংরেজ শিষ্য আশীষ। সে সময়ে আশীষ আসেনি।

প্রথম দিন ভজনের সময় কৃষ্ণপ্রেম গেয়েছিল বিখ্যাত কীর্তন "মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব।" মোতিরানীও যথাবিধি যোগ দিয়েছিল ভজনে তথা নাম কীর্তনে। যশোদা মা শুনেছিলেন তাঁর ঘর থেকে খাটে ব'সেই কারণ হরিদাস তাঁকে পই পই করে মানা করেছিল উঠতে কি চলাফেরা করতে। সে-সময়ে তিনি সত্যিই

অত্যন্ত অসুস্থ অথচ মুখে স্নিগ্ধ শান্ত হাসিটি লেগেই আছে একদিনও তাঁকে অনুযোগ করতে শুনি নি। তিনি বলেছিলেন আমাকে যে বুকের মধ্যে তিনি তাঁর ঠাকুরকে সর্বদাই দেখতে পান।

দ্বিতীয় দিন যথাবিধি ভজন শুরু করলাম। মোতিরানী মন্দিরের ঘরের বাঁ দিকের দরজার চৌকাঠে ব'সে—আজো যেন তাকে দেখতে পাই কল্পনাচক্ষে · মুখে সরল ভক্তি কমনীয় আভা প্রফুল্ল হাসির আলো! যশোদা মা তাঁর ঘরে চৌকাঠের ওপারে খাটে ব'সেই রোজ ভজন কীর্তন শুনতেন। আমি কৃষ্ণপ্রেমের অনুরোধে ধরলাম:

সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবি আজো পড়ে মনে মোর,
পড়ে যে কেবলি মনে।

গান গাইতে গাইতে চক্ষে ধারা ব'য়ে যায়, গেয়ে চলি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে:
ওরা হাসে সব, বলে:

"হায় রে মধুর স্বপন!"
বলে: "কৃষ্ণকাহিনী কল্পনা কবিকথন।"
ওরা হাসে……কলভাষে
ওরা জানে না—তাই হাসে।
ওরা জানে না—তাই মানে না,
আমি জানি—তাই মানি
আমি অন্তরে তোমার বাঁশরী শুনেছি
তাই বঁধু আমি জানি,
আমি বাদলে তোমায় জানি.
আমি কিরণে তোমায় জানি,
আমি বিরহে তোমায় জানি,
আমি মিলনে তোমায় জানি,
আমি হরষে তোমায় জানি,
আমি বেদনে তোমায় জানি,
আমি জীবনে তোমায় জানি,
আমি মরণে তোমায় জানি,

গানের সময় মন্দিরের হাওয়া যেন থমথমে হ'য়ে আসে···বুকের মধ্যে বান ডেকে যায়······

গান শেষ হ'তে কৃষ্ণপ্রেম সস্নেহে আমার দিকে .তাকায়। আমি চোখ মুছে ঠাকুরের বিগ্রহের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে।

হঠাৎ চমক ভাঙল হরিদাসের কণ্ঠস্বরে। সে কৃষ্ণপ্রেমকে বলল: "জানো, তোমরা যখন গান করছিলে মা সাম্‌নে খোলা জায়গায় এই ঠাণ্ডায় হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিগ্রহের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে?"

কৃষ্ণপ্রেম চম্‌কে ওঠে: "সে কি? তাঁর যে অসুখ······"

আমরা তৎক্ষণাৎ মোতিরানী যে চৌকাঠে ব'সে ছিল সেটি পেরিয়ে ফিরে এলাম যশোদা মার ঘরে। দেখি তিনি হাত জোড় ক'রে ব'সে।

তারপর তিনি বললেন ঠাকুরের অদ্ভুত আবির্ভাবের কাহিনী। তাঁর কথার প্রতি শব্দটি মনে আছে আজো। সে কি ভুলবার কথা? সাক্ষাৎ ঠাকুরের দর্শন!

যশোদা মা: আহা বাবা, দেখতে পেলে না?

আমি: দেখতে পেলাম না? কী মা?

যশোদা মা: ঠাকুর, বাবা, ঠাকুর! তিনি স্বয়ং এসেছিলেন যে—দেখতে পেলে না?

আমি (বিহ্বল হ'য়ে): না তো। (একটু বাদে) কখন এসেছিলেন মা?

যশোদা মা: শেষের দিকে—যখন তুমি আঁখর দিতে দিতে নিজেকে ভুলে গিয়েছিলে বাবা! আহা···ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন প্রথম আমার সামনে···তারপর ঐ চৌকাঠ ডিঙিয়ে মন্দিরে চ'লে গেলেন।···আমি তখন আর কেমন ক'রে ব'সে থাকি বলো? কাজেই উঠে বাঁ দিকের দোর দিয়ে বেরিয়ে ওদিক দিয়ে চক্র দিয়ে গিয়ে দেখি কি—ঠাকুর দাঁড়িয়ে···স্বয়ং ঠাকুর বাবা···আর মন্দিরের সামনে যখন পৌঁছলাম দেখি তখনো তোমার গান শুনছেন···তোমারি কাছে···অথচ তুমি দেখতে পাচ্ছ না হায় হায়! আমি ঠাকুরকে মনে মনে বললাম: 'ঠাকুর! আহা—তুমি নিজে এসে ওর গান শুনছ অথচ ও বেচারা দেখতে পাচ্ছে না!···ওকে চোখ দাও ঠাকুর··· দেখুক ও নয়ন ভ'রে···'"

সাধনা সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন, তাঁর নানা দর্শন সম্বন্ধেও প্রথম বললেন নানা অঘটনমূলক কাহিনী। কিন্তু সে-সব কথা "আমার ভ্রাম্যমাণ"-এ লিখেছি ব'লে পুনরুদ্ধৃত করলাম না।

ঠাকুর আমার গান শুনতে এসেছেন এর পরে আরো অনেকবার—ভাগ্যবতী ইন্দিরা দেখেছে তার ভাবনেত্রে। যশোদা মা-র কথা মনে পড়ে আজ প্রতিবারই যখনই ও আমার ভজনের সময়ে কখনো কখনো ঠাকুরকে দেখতে পায়। কখনো বা ঠাকুরকে ছোঁয়, আর অম্‌নি ওর হাত পা কণ্ঠ বুক থেকে নিঃসৃত চন্দনগন্ধে ঘর ছেয়ে যায়। এ বহুবার হয়েছে।

আশ্চর্য ব্যাপার—এটুকু লিখেছিলাম কাল বিকেলে ১৮-৬-৫৯ তারিখে। সন্ধ্যায় আমাদের মন্দিরের কক্ষে গাইলাম ইন্দিরারই একটি গান—ইকবার জো দরশন পাঁউ :

যদি একবার সখি পাই তার দরশন,
ভুলে জন্মান্তর-ব্যথা রাঙা পায়
লব লো তার শরণ।···ইত্যাদি

হঠাৎ ইন্দিরার গভীর সমাধি! তারপর চোখ চাইতে কিছুই দেখতে পায় না, লোকে প্রণাম করে—টেরও পায় না। আমি গাইতে গাইতেই হঠাৎ ওর অঙ্গ থেকে নিঃসৃত চন্দনগন্ধ পেয়েছিলাম। গানের শেষে সবাই প্রণাম করতে এসে দেখে পায়ের সুগন্ধ আরো বেশি নিবিড়। শুধু তাই নয়—যারই হাতে হাত ঘষে তারই হাতে চন্দন-সৌরভ পাওয়া যায়—কি বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী।

সকলে চলে গেলে বিহ্বলতা কাটলে বলল : "ঠাকুর এসেছিলেন—কী সুন্দর যে দাদা! ছোট্ট বালগোপাল! এসে বললেন, 'আমাকে পরিষ্কার ক'রে দাও।' এখানে ওখানে কাদাধুলো। পরিষ্কার ক'রে দিলাম।"

এইভাবে যখনই ঠাকুরের অংগ ও স্পর্শ করে অমনি ওর অঙ্গ থেকে প্রবল চন্দনগন্ধ নিঃসৃত হয়ে ঘর ছেয়ে যায়। একথা গোপন করতে একটুও ইচ্ছা করে না, ব'লে ফেলে কই, অনুতাপের লেশও তো জাগে না!—তা ছাড়া এ-অঘটন ঘটেছে বার বার বহু লোকের সামনে—গোপন রাখিই বা কেমন ক'রে?—অবশ্য অবিশ্বাসীরা কেউ কেউ অবিশ্বাস করে না কি আর? করে বৈ কি। কিন্তু তারা নামঞ্জুর করলই বা, বিশ্বাসীরা তো আনন্দে অধীর হল ভাবসমাধিতে ওর অঙ্গে চন্দনগন্ধ পেয়ে! তাই কেমন ক'রে বলি—ঠাকুর তাঁর নিজের অঙ্গসৌরভের কাহিনী গোপন রাখতেই চান? যদি চাইতেন তবে বহুলোকের সামনেই এ অঘটন বার বার ঘটাতেন কি?—তাই সাফাই রেখে ধরি ফের হারানো খেই।

কৃষ্ণপ্রেমের সম্বন্ধে কত কথাই যে বলতে সাধ যায়—কিন্তু ভয় ভয় করে—যদি

ও শেষটায় উত্যক্ত হয়ে সত্যিই আমাকে ত্যাজ্যবন্ধু করে—বলা তো যায় না। তাই ওর কথা বেশি না ব'লে যশোদা মার কথাই বলি, কারণ তাঁকে তো কোনো কথা দিই নি যে, তাঁর কথা কাক-পক্ষীকেও বলব না। কৃষ্ণপ্রেম এজন্যেও রাগ করতে পারে হয়ত—কিন্তু যদি করে তবে তাকে বলার পথ রইল: "বলেছি আমি তোমার গুরুর দর্শনের কথা—তিনি শুধু তোমার গুরুই তো নয়, আমিও যে তাঁর অপার স্নেহ পেয়েছিলাম ভাই। তাই জানি তাঁর ঠাকুর দর্শনের কথা লেখার জন্যে তিনি আমার 'পরে অপ্রসন্না হবেন না। তা হলে তুমিই বা রাগ করবে কেন?"

এবার বলি—কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার তৃতীয় কারণ। এ-কারণটির উল্লেখ করছি সব শেষে কেননা আমার জীবনের মোড় ফেরে খানিকটা ওরই জন্যে বৈ কি। কীভাবে—বলবার সময় এল।

বলেছি, লক্ষ্ণৌয়ে আমি প্রায়ই আসতাম ঘুরেফিরে। অতুলদা বলতেন হেসে: "আমার বাড়িই তোমার গানের হেডকোয়ার্টার হোক দিলীপ!"

সত্যিই আমার গীতিরাজ্যের রাজধানী দাঁড়িয়েছিল দুটি—কলকাতা ও লক্ষ্ণৌ। একদিকে অতুলদা অন্যদিকে কৃষ্ণপ্রেম—দু-দুটো প্রবল টানে আমাকে প্রায়ই টেনে আনত লক্ষ্ণৌয়ে।

কিন্তু ধীরে ধীরে কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাব ছাপিয়ে গেল অতুলদার প্রভাবকে। অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হল ফের। আমাকে সংসার গান সঙ্গীত আকাদেমি প্রভৃতির দিকে টানেন আমার অতুলদা প্রমুখ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব—বৈরাগ্যের দিকে টানে একা কৃষ্ণপ্রেম। বলে হেসে: "চিরদিনের তীর্থযাত্রী কী করবে ঐহিক সাফল্য নিয়ে—যা দুদিনের?" আমার সঙ্গীতকোবিদ শুভার্থীরা বলেন: "গানাৎ পরতরং•নহি।" কৃষ্ণপ্রেম হাসে: "বটে, কিন্তু সে কোন্ গান? যে-গানে শিল্পীরা হাততালি দেয় সেই গান—না যে-গানে ঠাকুর প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করেন সেই গান?" পরে ও একটি পত্রে লিখেছিল (২১শে জুন, ১৯৪৩—এখানে অনুবাদ দিলাম):

"তুমি লিখেছ তুমি গান গাইতে চাও কৃষ্ণকে নিবেদন ক'রে। খুব ভাল কথা। কিন্তু ঐ সঙ্গে এমন কথা লিখলে কেন যে এর ওর তার সামনেও গাওয়া তোমার কর্তব্য? কর্তব্য? মোটেই না। যদি কেউ নিজে থেকে গান শুনতে আসে আসুক। কিন্তু তুমি কেন তাদের কথা ভাববে? তুমি শুধু ঠাকুরকে গান শোনাবে—কেউ আসুক বা না আসুক। শ্রোতার কথা তুমি আদৌ ভাববে না, শুধু ভাববে ঠাকুরের কথা ও কিসে তিনি খুশি হবেন। তারপর তুমি তাঁকে যে-গান নিবেদন করবে, সে-

প্রসাদ অপরে উপভোগ করুক বা না করুক—তোমার কী? আমি যদি তুমি হতাম, তা হলে কী করতাম বলব? একা শুধু ঠাকুরকে গান শোনাতাম—অন্তত যতদিন না ঠাকুরের নামে তন্ময় হয়ে শ্রোতাদের উপস্থিতির কথা ভুলে যেতে পারি। আসল কথা হল তোমার কণ্ঠ কী চায়? কৃষ্ণের কাছে গান গেয়ে কৃতার্থ হতে—না লোকের বাহবা পেয়ে দিগ্বিজয় করতে?"

এই ধরনের কথা ও সে-সময়েও বলত অকুতোভয়ে। আর শুনতে শুনতে আমার মনে ফের জেগে উঠত ঘুমিয়ে-পড়া বৈরাগ্য। এইভাবে একটু একটু ক'রে আমার দৃষ্টি যেন ফের খুলে গেল, আমি দেখতে পেলাম—আমি গানের নাম ক'রে যশ কুড়োতেই চলেছি—এর নাম আত্মবঞ্চনা ছাড়া আর কী? সঙ্গে সঙ্গে কেমন ক'রে জানি না, মনে হল শ্রীঅরবিন্দের কথা, মনে বেজে উঠল—তাঁর একটি বিশেষ বাণী যে, ভাগবত সাধক "যাই করুক না করবে শুধু ভগবানের জন্যে—যজ্ঞ বা নিবেদনের ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনো আসক্তি বা বাসনাকে আমল না দিয়ে।"*

যজ্ঞ (Sacrifice) সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নানা অত্যুজ্জ্বল ও গভীর ভাষা আমাকে একটু একটু করে আবিষ্ট করে তুলতে না তুলতে আমি দেখতে পেলাম, আমি ভুল পথে চলেছি। তখন তাঁকে চিঠি লিখলাম ও তাঁর অনুমতি পেয়ে পণ্ডিচেরি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম ১৯২৪ সালে।

তাঁকে দেখেই বুকের রক্ত উঠল দুলে, মনে পড়ল উপনিষদের ঋষির কথা, যিনি বলেছিলেন:

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্-
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।"

অর্থাৎ আমি জানি তমসার পারে আসীন সেই আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে। তাঁকে জানলে তবেই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে—অমৃতলাভের অন্য পথ নেই।" (একথা পরে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলাম—কলকাতায়।)

* "He does works for the sake of the Divine only, as a pure sacrifice, without attachment or desire."

...Essays on the Gita—Chapter XII.

শ্লোকটি যখন প্রথম পড়ি, খুবই ভাল লেগেছিল বৈকি, কিন্তু বাণীটির নিহিতার্থ জীবন্ত জলন্ত হয়ে উঠল প্রথম শ্রীঅরবিন্দকে দেখে। মন আমার বলল : এঁকেই গুরু করতে হবে, এরই তো নাম ঋষি।

কিন্তু হায় রে, তিনি আমাকে দীক্ষা দিলেন না, বললেন—আমার সময় হয়নি। আমি বিমর্ষ হয়ে ফিরে এলাম কলকাতায়। কিন্তু যে-মানুষ পণ্ডিচেরি গিয়েছিল মহাপুরুষ দর্শনে, আর যে-মানুষ তাঁর দর্শনের পরে সংসারে ফিরে এল, তারা বাইরে দেখতে এক হলেও আসলে দুটি আলাদা মানুষই বলব। একথা বলতে ঠিক যে কী বুঝছি ব্যাখ্যা করে বোঝানো মুশকিল। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—শিল্পী দিলীপ-কুমারের মধ্যে গুরু-ঋষি-শক্তিতে জেগে উঠল ফের সেই সুপ্ত দুরাশা—যে চেয়েছিল শুধু কৃষ্ণকে—ধন মান যশ কাব্য গান শিল্প কিছুই নয়—যার ফলে সে বদ্‌লে গেল।

একই মানুষের মধ্যে নানান্ মানুষ থাকে অঙ্গাঙ্গী হয়ে—একথা পরে শ্রীঅরবিন্দের শ্রীমুখেই শুনি, কিন্তু সে-সময়ে জানতাম না। তাই বিপন্ন বোধ করলাম দেখে যে, আমি সংসার চাইও বটে, চাই না-ও বটে।

ফিরে এলাম কলকাতায় ১৯২৪ সালে গভীর বৈরাগ্য নিয়ে। কিছুদিন পরে কৃষ্ণপ্রেমের এক চিঠি পেয়ে চম্‌কে উঠলাম : ও সব ছেড়ে ওর গুরুর সঙ্গে চলে গেছে মিরতোলায়—অরণ্যে, সেখানে এক মন্দির স্থাপন ক'রে সাধনায় বসেছে। মনের মধ্যে ধিক্কার জেগে উঠল : আমি নিজেকে ভারতীয় বলে গৌরব করি, কথায় কথায় বলি ভারতে ধর্ম আজও জীবন্ত, কিন্তু বিলিতি গোরা হয়ে ও যা পারল খাস অদ্বৈত গোস্বামীর বংশধর হয়েও আমি তা পারলাম কই? মনে আমার তখন বৈরাগ্য ঢেউ তুলেছে, কিন্তু সে না জানি আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—এই ভয়ে আমি মোক্ষম মাটি কামড়ে প'ড়ে। সত্যিই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের গুরুগম্ভীর হাস্যহীন আবহাওয়ায় গিয়ে যোগসাধনা করতে ব'সে যাব ভাবতেও বুকের মধ্যে আতঙ্কের ডমরু বেজে উঠত। আমার কি এই-ই স্বধর্ম?—"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" মন্ত্র জপতে জপতে সংসারে হাসি অশ্রু, আনন্দ বেদনার অপরূপ দ্বৈতরাজ্য ছেড়ে 'নিস্তরঙ্গ একরস অদ্বৈত মঠে আশ্রয় নেওয়া? মনে পড়ত আমার কুষ্ঠির কথা—সন্ন্যাসী হওয়া আমার ললাটলিখন। কিন্তু একদিকে গৈরিকধারী হব ভাবতে আনন্দ, অন্যদিকে সংসার ছাড়ব ভাবতে ত্রাস—এ-দুই বিরোধী মনোবৃত্তির টানাহেঁচড়ায় আমার মীরার একটি গানের অবস্থা হল প্রায় : "দিবস ন ভুখ নীদ নহি রৈন"—অর্থাৎ দিনে নেই ক্ষুধা রাতে নেই নিদ্রা। এক কথায়, আমি উঠলাম অতিষ্ঠ হয়ে।

ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, শ্রীঅরবিন্দ যখন আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তখন সংসারে ব'সেই সাধনা শুরু করি। সংসারেও কি ভগবানকে পাওয়া যায় না? পরমহংসদেব বার বার বলেছেন—যায়। তবে? এত নিরাশার কী আছে?

এই সময়ে হঠাৎ অভেদানন্দ স্বামীর বক্তৃতা শুনে আকৃষ্ট হয়ে সোজা তাঁকে গিয়ে বললাম আমার বৈরাগ্যের কথা: আমাকে দীক্ষা দেবেন কি? তিনি রাজি হলেন।

এই সময়ে আমার একটি বন্ধু—ইনি পরে অরবিন্দ আশ্রমে প্রয়াণ করেন—আমাকে বললেন অভেদানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা নেওয়ার আগে তার এক যোগী বন্ধুর উপদেশ নিলে মন্দ কি? বন্ধুবর বললেন তিনি মস্ত যোগী, নাম বরদাচরণ মজুমদার—লালগোলার এক স্কুলের হেড মাস্টার। শুনলাম রাতে দশ বারো ঘণ্টা তিনি এক আসনে বসে ধ্যানস্থ থাকেন। মহা উৎসাহে বন্ধুর সঙ্গে ছুটলাম লালগোলায়। এই বরদাবাবুর কাছেই পরে কাজি নজরুল ইসলাম দীক্ষা নিয়েছিলেন ও শুনেছি দ্রুত উন্নতিও করেছিলেন। তারপর কেন কাজি পাগল হয়েছিলেন তাও জানি কিন্তু বলব না—আরো এই জন্যে যে তার সঙ্গে আমার অন্তর্জীবনের বিকাশের কোনো সম্বন্ধই নেই।

বরদাবাবুর কথা একটু ফলিয়ে না বললেই নয়। শুধু তাঁর কাছেই আমি সর্বপ্রথম যোগবিভূতির পরিচয় পাই ব'লেই নয়—মানুষটিকে দেখে আমার গভীর শ্রদ্ধা হয়েছিল ব'লেও বটে। পরে নানা বন্ধুর কাছে তাঁর নানা অলৌকিক শক্তির কথা শুনি। অনেক কথা বিশ্বাস করতে পারি নি সে-সময়ে। কিন্তু পরে এই সব শক্তির বিকাশ ইন্দিরার মধ্যেও প্রত্যক্ষ ক'রে আজ মনে হয় বরদাবাবুরও এসব যোগবিভূতি ছিল—যথা দূরদর্শন, পরের চিন্তার খবর পাওয়া ধ্যানে দেখতে পাওয়া কার কোন স্বধর্ম—ইত্যাদি। আমার একটি বন্ধুর কাছে পরে পণ্ডিচেরিতে শুনেছিলাম বরদাবাবুর একটি বিশেষ শক্তির কথা। অঘটনটি বলবার মত তাই বলি সংক্ষেপে।

বন্ধু আমাকে কথায় কথায় বলেন যে, বরদাবাবুর কাছে তিনি বিশেষ ঋণী। হয়েছিল কি—বন্ধুর ভাষায়ই বলি:

"আমার শিশুপুত্রের পেটের অসুখ। কিছুতেই সারে না। ছয়মাসের শিশু। ডাক্তারে বলে পেটে ফোড়া—অপারেশন না করলে বাঁচবার আশা নেই। ভয় পেয়ে সোজা গেলাম লালগোলায় বরদাবাবুর কাছে—যেমন আরো অনেকে যেতেন বিপন্ন হয়ে। তিনি শুনে আমাকে সামনে বসিয়ে ধ্যান শুরু করলেন। একটু বাদে

বললেন : 'তোমার ছেলের পেটে ফোড়া হয় নি ক্রিমি হয়েছে। অমুক হোমিও-প্যাথিক ঔষধ খাওয়াও সেরে যাবে।'

"আমার ধড়ে প্রাণ এল। কলকাতায় ফিরে ঔষধটি ছেলেকে খাওয়াতেই পরদিন দাস্তর সঙ্গে বহু ক্রিমি বেরিয়ে গেল। ছেলে বেঁচে গেল।"

আরো শুনেছিলাম—বরদাবাবুর মুখেই—যে পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের ঘরে শ্রীঅরবিন্দকে তিনি দেখেছেন নিজে লালগোলায় বসে। একে বলে ক্লেয়ারভয়ান্স—দূরদর্শন। ইন্দিরার মধ্যে এ-শক্তির প্রাত্যহিক ও প্রত্যক্ষ বিকাশ দেখি বহুবৎসর পরে; কিন্তু যেসময়ে এ-শক্তির কথা শুধু বইয়েই পড়তাম বলে পুরোপুরি বিশ্বাস হয় নি। এবার বিষ্কম্ভক থেকে নাট্যলোকে নামবার সময় হ'ল।

বন্ধুর সঙ্গে বরদাবাবুর কাছে যেতেই তিনি সাদরে বসালেন। সব শুনে আমাকে সামনে রেখে ধ্যানে বসলেন। খানিক বাদে বললেন একটু আশ্চর্য হয়েই : আপনি কেন অন্য গুরু করতে যাচ্ছেন? শ্রীঅরবিন্দই আপনার গুরু।

আমি (আশ্চর্য হয়ে): সে কি? তিনি তো আমাকে দীক্ষা দিতেই চাইলেন না।

বরদা (দৃঢ়স্বরে): তিনিই আপনার গুরু। আপনি ভাগ্যবান্। হিমালয়ের নিচে এতবড় যোগী আর নেই এখন।*

আমি (ঠাহর না পেয়ে): কিন্তু তিনি আমাকে বলেছেন আমার সময় হয় নি। আমি সব ছাড়তে পারি কিন্তু গান ছাড়তে পারি না বলবামাত্র বললেন এই কথা যে আমার জিজ্ঞাসা এখনো বুদ্ধির কোঠায়ই আছে, তাই আমাকে তিনি দীক্ষা দিতে পারেন না।

বরদাবাবু (হেসে): তবে শুনুন। তিনি আমাকে এই মাত্র ব'লে গেলেন—আপনার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে—ওকে মানা করো অন্য গুরু বরণ করতে, সময় হলেই আমি ডেকে নেব ওকে।

ঠিক এই কথাগুলিই বরদাবাবু বলেছিলেন, আমি সাজিয়ে বলছি না। এ তো ভুলবার কথা নয়, তাই ভুল হওয়া অসম্ভব, আরো এই জন্যে যে আমি বিস্ময়ের অথই জলে পড়ে তাঁকে স্রেফ অবিশ্বাসই করেছিলাম। তাঁকে এনে শ্রীঅরবিন্দ ব'লে গেছেন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে—একথা শুনে আমি প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে খানিক চুপ ক'রে থেকে শেষে বললাম : কিন্তু···

*"হিমালয়ের নিচে" কথাটি তিনি কেন বলেছিলেন তার কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

বরদাবাবু (মুচকে হেসে): বিশ্বাস হয় না, এই তো? আপনার খুব অপরাধ নেই। তবে যা বলেছি শুনুন, অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমি যে সত্যবাদী তার একটা প্রমাণ চান আপনি—এই না?

সত্যিই আমি ভাবছিলাম তাঁর সত্যপরায়ণতা সম্বন্ধে এবং প্রমাণের কথা। তাই অপ্রতিভ হয়ে চুপ ক'রে রইলাম। বরদাবাবু বললেন: "শুনুন তবে বলি আর একটু এবার হয়ত বিশ্বাস হবে। আপনার ডানদিকের তলপেটে কি হার্নিয়া আছে?"

আমি (অবাক হয়ে): আছে। টাগ অফ ওয়ার করতে রাপচার হয়। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন? যোগবলে?

বরদাবাবু: কতকটা, তবে ষোলো আনা নয়। কারণ শ্রীঅরবিন্দকে দেখলাম যোগবলে কিন্তু একথা জানলাম তাঁর মুখে শুনেই। তিনিই বললেন: "দিলীপ আমাকে লিখেছিল ওর হার্নিয়ার কথা। আমি ওকে লিখেছিলাম অপারেশন করাতে। অপারেশনের পরেই ওকে ডেকে নেব।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এর পরে আর অবিশ্বাসের পথ কই? শ্রীঅরবিন্দ আমাকে যে অবিকল ঐ কথাগুলিই লিখেছিলেন।

বরদাবাবুর মধ্যে এই যে যোগবিভূতি আমি চাক্ষুষ করেছিলাম তার ফল আমার মনে হয়েছিল সুদূরবিস্তীর্ণ—আরো এই জন্যে যে এ-অঘটনটির ভবিষ্যদ্বাণীও ফলেছিল দু-বৎসরের মধ্যেই—সে কাহিনী পরের অধ্যায়ে বলছি—এখানে বরদাবাবুর প্রসঙ্গটি শেষ করি।

বরদাবাবুর কথাবার্তার ভঙ্গি ছিল চমৎকার—গম্ভীর, সদয়, আত্মসমাহিত। তাইজন্যে তাঁর যোগবিভূতি আমাকে আরো অভিভূত করেছিল—সস্তা বোলচাল তিনি দিতেন না ব'লে। তাঁর কথা পরে আমি শ্রীঅরবিন্দকে লিখেছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে লিখেছিলেন যে যোগীদের যোগবিভূতি নানারকম থাকে। সে-আলোচনা এ-ক্ষেত্রে অবান্তর। আমি শুধু বলতে চাই যে যোগের রাজ্যে এই-ই আমার প্রথম অঘটনের—miracle-এর—অভিজ্ঞতা। এরকম অলৌকিক ঘটনা পণ্ডিচেরিতে আমি একটিও দেখি নি, দেখেছি শুধু ইন্দিরার মাধ্যমে—শ্রীঅরবিন্দের দেহান্তের পরে—আর দেখেছি মাসের পর মাস, দিনের পর দিন—যার ফলে আমার সব সংশয় ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু সে অন্যকথা। এবার শেষ অধ্যায়ে আসার সময় হল।

পঁয়ত্রিশ

বরদাবাবুর কাছে শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের সত্যতা সম্বন্ধে বুদ্ধিমন্তরা সন্দেহ করতে পারেন, বলতে পারেন যে, বরদাবাবু কোনো রকমে জেনে নিয়েছিলেন আমার হার্নিয়ার কথা। কিন্তু জানবেন কী করে? আমি তাঁর কাছে যাব কোনোদিন ভাবি নি, হঠাৎ গিয়ে হাজির হয়েছিলাম এক বন্ধুর অনুরোধে, যাকে আমি আভাস পর্যন্ত দিইনি—শ্রীঅরবিন্দ আমাকে এ সম্বন্ধে কী লিখেছিলেন। কথা উঠতে পারে, বরদাবাবু ধ্যানে জেনেছিলেন আমার রোগটা আছে। তা হলে মিথ্যা বললেন কেন? শ্রীঅরবিন্দের মহিমা কীর্তন করার কোনো আগ্রহই তাঁর থাকবার কথা নয় যেহেতু তিনি শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য ছিলেন না। তাছাড়া বরদাবাবু ছিলেন বেপরোয়া মানুষ যা মুখে আসত ব'লে ফেলাই ছিল তাঁর স্বভাব—কখনো কখনো কেউ প্রগল্‌ভতা করলে তাকে সাজা দিতে যোগবিভূতি দেখাতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। আমাকে বলেছিলেন, এক আত্মম্ভরী অধ্যাপক তাঁর সাম্‌নে যোগবিভূতিকে আষাঢ়ে গল্প ব'লে হাসাহাসি করাতে একঘর লোকের সাম্‌নে তিনি তাকে ভালোমানুষি সুরে প্রশ্ন করেছিলেন, অমুক জায়গায় তাঁর গুপ্ত রক্ষিতাটি তাঁকে ছেড়ে আর একজনকে রক্ষক করল কী দুঃখে—তিনি কি তাকে যথেষ্ট গহনাগাঁটি দিতেন না?

য়ুরোপে গত পঞ্চাশ বৎসর এই শ্রেণীর মনঃশক্তি নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে এবং গবেষকদের মধ্যে একাধিক খ্যাতনামা মনীষী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ-সব অতীন্দ্রিয় বোধ (extra-sensory perceptions) অপ্রতিপাদ্য সত্যের কোঠায় পড়ে। কিন্তু তবু আজও খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিকরা এজাতীয় অতীন্দ্রিয় দর্শনাদিকে পাশ কাটিয়ে যান যুক্তিবাদী বুদ্ধির মান বাঁচাতে। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্তিমান্ গবেষক রাইন সাহেব (J. B. Rhine) ১৯৩৭ সালে তাঁর বিশ্ববিশ্রুত Frontiers of the Mind বইটিতে এ-জাতীয় মনঃশক্তি নিয়ে তাঁর বহু গবেষণা প্রকাশ ক'রে বহু বুদ্ধিবাদীরই বিরাগভাজন হন। কিন্তু তার পরে এ-ত্রিশ বৎসরে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের মতের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, যার ফলে আজ য়ুরোপে খ্যাতনামা মনীষীদের অনেকে আবার বস্তুতান্ত্রিক বুদ্ধিবাদীদের বিদ্রূপ ক'রে শোধ তুলছেন এই ব'লে যে, অতীন্দ্রিয় বোধ যে ইন্দ্রিয়বোধের চেয়ে কম সত্য নয়, একথা অস্বীকার করা যায় এক গাজোয়ারি (dogmatic) মূঢ়তার মোহে। কিন্তু তবু গড্ডপড়তা মানুষ এ-ধরণের সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি হলে বলেন: "যেতে দাও"।

রাইন সাহেব এ-জাতীয় পলাতক মনোবৃত্তিকে নিয়ে খেদ ক'রে শেষ মন্তব্য দিচ্ছেন যে এসব অধুনাতন আবিষ্কারের মাধ্যমে "আমরা দৃঢ়মূল বস্তুতান্ত্রিকতার সম্ভব-অসম্ভবের ধারণাকে দীর্ণ করে মানুষের ব্যক্তিরূপের ভবিষ্যৎ চর্চার জন্যে সুদূরবিস্তীর্ণ নব-নব সমস্যার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছি"—যার ফলে—"বস্তুবিশ্বের সম্বন্ধে আমাদের ধারণায় স্থৈর্য আসতে পারে এবং আমাদের জীবনযাত্রার একটি মহত্তর ভিৎ গ'ড়ে উঠতে পারে।"*

মন্তব্যটি যে সুচিন্তিত, তার একটি প্রমাণ হাতে হাতেই দিতে পারি। বরদাবাবুকে ঠিক এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ অলৌকিক দর্শন দিয়ে আমাকে অন্য গুরু বরণ করতে বারণ করেছিলেন এইজন্যে যে আমার মধ্যে এ ধরণের অন্তর্দৃষ্টি তখনো জাগে নি। তাই এ-সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয় যে, বরদাবাবুর মাধ্যমে তিনি আমাকে আমার প্রার্থিত দেশনা (guidance) দিতেই তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে যাই হোক, বরদাবাবুর কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব—তাঁর অলৌকিক দর্শনের বলিষ্ঠ অভিঘাতে আমাকে তিনি শ্রীঅরবিন্দের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন ব'লে।

এ-প্রসঙ্গে আমার আর-একটি বক্তব্য আছে। সেটি এই যে, বরদাবাবুর কাছে শ্রীঅরবিন্দ এসেছিলেন ব'লেই তিনি আমাকে শ্রীঅরবিন্দের বাণী দেন—শ্রীঅরবিন্দের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিবশে নয়। একথার প্রমাণ এই যে শ্রীঅরবিন্দকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করলেও শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধ সমালোচনা করতেও তাঁর বাধত না। সেদিন ও পরে ১৯৩৮ সালে কলকাতায় তিনি আমাকে বেপরোয়া হয়েই বলেছিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দের সুপ্রামেণ্টাল দর্শন সত্যভিত্তি হলেও এ-সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করবেন না একটি বিশেষ কারণে। সে-কারণটি আমি আজ প্রকাশ করতে চাই না—কেবল বলব যে, ১৯৫০ সালে যখন শ্রীঅরবিন্দ হঠাৎ দেহরক্ষা করলেন, তখন আমার মনে পড়েছিল সর্বপ্রথম বরদাবাবুর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি—আর অনুতাপ এসেছিল তাঁর সত্যভাষণের জন্য রাগ করেছিলাম ব'লে। তাছাড়া বরদাবাবু যে শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করেছিলেন ব'লেই তাঁর বাণীবাহ হয়ে আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে সময় হ'লে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে ডেকে নেবেনই নেবেন, তাঁর এ-ভবিষ্যদ্বাণীটি

*"...We have broken through the speculative position of entrenched materialism and have opened up for the future study of personality a whole area of new problems ...that may bring balance into our conception of things and a better foundation for living"...Chapter XVII...New Frontiers of the Mind.

অক্ষরে অক্ষরে ফলেনি কি? আর শুধু ফলাই তো নয়, কী ভাবে ফলেছিল ভাবতে আজও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। সে-অবিশ্বাস্য তথা অকাট্য কাহিনী পেশ করবার আগে বরদাবাবুর প্রসঙ্গ শেষ ক'রে নিই।

বরদাবাবুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়—যখন বছর দশেক পরে পণ্ডিচেরি থেকে মাসকয়েকের জন্য কলকাতায় আসি। সেই সময়ে তিনি যখন আমাকে সস্নেহে আশীর্বাদ করেন, তখন আমি তাঁকে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করি, কবে আমি আমার ইষ্টের দর্শন পাব? তিনি হেসে বলেছিলেন ভুলতে পারিনি আরো এই জন্যে যে কথাটা শুনে আমি চম্‌কে উঠেছিলাম: "পাবে গো পাবে—তবে পণ্ডিচেরিতে নয়। এক মহীয়সী অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে। তিনি যখন তোমার শিষ্যা হয়ে এসে তোমার যত বাধার জঞ্জাল সাফ ক'রে দেবেন, তখনই তোমার হবে বস্তুলাভ—তার আগে নয়।" আমি খুশি হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি: "কিন্তু সে-সুদিন আসবে তো?" বরদাবাবু জবাব দেন: "এখনো অবিশ্বাস? আমি তোমাকে যা-যা বলেছিলাম ফলেনি কি?" আমি লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইতে তিনি বলেন: "না গো, অজ্ঞান জানে না বলেই অবিশ্বাস করে—এতে রাগ করে যে, সে জ্ঞানী নয়।"

এরও দশ বৎসর পরে ১৯৪৯ সালে যেদিন ইন্দিরা আমার কাছে এসে সত্যিই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নেয়, সেদিন আর একবার আমি বরদাবাবুর কথা স্মরণ ক'রে তাঁকে মনে মনে প্রণাম করেছিলাম—শুধু কৃতজ্ঞ-চিত্তেই নয়, বিস্মিত পুলকেও বটে। তার-পর (বরদাবাবুর ভাষায়) এ-মহীয়সী'-র মাধ্যমে যোগবিভূতির আরো যেসব খেলা দেখেছি, তাতে চোখের ঠুলি গেছে খ'সে, দেখতে পেয়েছি ঠাকুরের কৃপা কবিকল্পনা নয়, জাজ্জ্বল্যমান সত্য, অঘটনের যুগ গত নয়, ভক্তের জন্যে ভক্তবৎসল অনেক অঘটনই ঘটান তেম্‌নি করুণায়, স্নেহে, প্রেমে—যেমন ঘটাতেন তিনি পুরাকালে ভক্তের সংকটমোচন করতে। সে ইতিহাস হয়ত বলব কোনোদিন—এখন এ-প্রাক্‌যোগপর্বের সমাপ্তি টানার সময় এল।

বরদাবাবুর কাছ থেকে ফিরে আসার পরে প্রায়ই ইচ্ছা হত কৃষ্ণপ্রেমের কাছে ছুটে যেতে, কিন্তু সে ভিক্ষান্নে জীবিকানির্বাহ করছে সুদূর আলমোড়ায়—ভাবতেও ত্রস্ত হয়ে উঠতাম। ডাকতাম ঠাকুরকে: 'দেখো ঠাকুর, আমারও যেন এ-দশা না হয়।' কেবল মনে আমার অনুযোগ-অভিযোগ উঠত ফুলে ফুলে—কেন ঠাকুরকে পেতে হলে কাঁটাপথেই চলতে হবে প্রতি সাধককে? জটাধারণ, কৃচ্ছ্রসাধন, উপবাস, অখাদ্য-ভোজন, সৌন্দর্য-বিরাগ, কৌপীনবাদ—এসব কেন? সহজিয়া ছন্দে

আনন্দের কমনীয় আলোয় ভক্তির রমণীয় পথে কেন অমন মুক্তিমোহনকে মেলা অসম্ভব হয়ে উঠল? এ-প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি পরে দিনে দিনে বহু দুঃখের পরীক্ষায়—কিন্তু সে অন্য কথা—সাপ্নার কথা—হয়ত কোনোদিন বলব—ঠাকুরের ইচ্ছা হ'লে; কারণ আজ আর কিছু বুঝি না বুঝি, এটুকু বুঝবার কিনারায় এসেছি যে, ঘটার মত কিছু ঘটে কেবল ঠাকুরেরই ইচ্ছায়। আমাদের অজ্ঞান-উদ্বুদ্ধ স্বেচ্ছাবিহারের ফলে ঘটে শুধু দুর্ঘটনা।

বরদাবাবুর কাছে গিয়েছিলাম ঔৎসুক্য নিয়ে, তাঁর কাছ থেকে ফিরে এলাম শুধু ভরসা পেয়ে নয়, যোগশক্তিসম্বন্ধে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে। তা হলে তো যেসব অঘটনের কথা আমি এযাবৎ আষাঢ়ে গল্প ব'লে হেসে উড়িয়ে দিয়ে এসেছি, সে-সব সত্য-ভিত্তি হ'তেও পারে! কয়েক বৎসর পরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে দিনের পর দিন নানা পত্রে এ-সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার ফলে আমি কতকটা বুঝতে শিখি, কেন এসব যোগ-বিভূতিকে যোগীরা সাধকরা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে-আলোচনা এ-স্মৃতিচারণে অবান্তর ব'লে ঘটনার প্রকাশ্যলোকে ফিরে আসি ফের।

লালগোলা থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরে স্বামী অভেদানন্দের কাছে দীক্ষা নেওয়ার সঙ্কল্প ছেড়ে বরদাবাবুর কথা মেনে শ্রীঅরবিন্দের পথ চেয়ে রইলাম। ফের চেষ্টা করা শুরু করলাম ঠাকুরকে ডাকাডাকি করবার। কিন্তু হায়রে, ডাকব বললেই কি ডাকা যায়? যে-মন শৈশবের সরল বিশ্বাসে সুরধামের ছাদের কুঠুরিতে ব'সে কথামৃত প'ড়ে উজিয়ে উঠত, ঠাকুরকে সরল বিশ্বাসে "ভক্তি দাও" ব'লে চোখের জল ফেলত, সে তো আর নেই—সাধনায় মন বসাই কী করে? তাছাড়া সময়ই বা কই শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের? শুধু মাঝে মাঝে কান্ত কবির অপরূপ গান গাইতাম আকুল হয়ে:

আজ লক্ষ্যশূন্য লক্ষবাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
আমি জানি না কখন ডুবে যাব কোন্ অকূল গরল-পাথারে!
প্রভু, বিশ্ববিপদ হন্তা!
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা!
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এসো মোর মত্ত বাসনা গুছায়ে;
তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে।

কিন্তু কখনো কখনো ভক্তির আবেশে মনে ক্ষণিক শান্তি এলেও আমার

হাজারো স্বরচিত দায়িত্বের জগতে ফিরে আসতে না আসতে বৈরাগ্যের মধ্যে অনুরাগটুকু লুপ্ত হয়ে বেঁচে-বর্তে থাকত শুধু সবকিছুতে বিতৃষ্ণা।

এই সময়েই আমি বেঁধেছিলাম আমার একটি গান, যেটির ছন্দ-ভাব নিয়ে অতুলদা বাঁধেন, তাঁর বিখ্যাত—

'কত গান তো হ'ল গাওয়া—আর মিছে কেন গাওয়াও?
যদি দেখা নাহি দেবে—তবে মিছে কেন চাওয়াও?'

আমি গানটিতে নিজের এ-সময়কার হৃদয়ের যে-ছবি এঁকেছিলাম, সেটি পেশ করতে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করি:

যদি দিন না দেবে—তবে
এত ব্যথা কেন সওয়াও?
যদি নাথ, আশা না রবে—
মিছে বোঝা কেন বওয়াও?
যদি মেঘে রঙের মেলা
শুধু ক্ষণিক লীলা খেলা,
কেন রঙিয়ে ওঠে প্রাণ সে-রঙে
সকাল সন্ধ্যাবেলা।

এর পরের চরণগুলি 'অনামী'তে আছে—পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক আরো এইজন্যে যে, এ-বৈরাগ্য খানিকটা মামুলিই বলব। সংসারে যখনই আমাদের নানা আশা ও স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যায়—মন ব'লে ওঠে: 'চল নিজ নিকেতনে। এ-বৈরাগ্য পথ দেখায় তখনই, যখন ভগবানে অনুরাগ জাগিয়ে তোলে। 'বৈরাগ্যমেবাভয়ম্' বলতে ভর্তৃহরি বুঝেছিলেন এই ভগবদনুরাগী বৈরাগ্য—শুধু সংসারে বিতৃষ্ণা নয়।

তবু সত্যের খাতিরে না মেনে উপায় নেই যে, অন্তত প্রথম দিকে সংসারে খানিকটা বিরাগ না এলে ভগবানে-অনুরাগ মনের কোণে ঠাঁই পায় না। "বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—এ-বাণী সাজে তাঁরই মুখে, যাঁর মনে ভক্তি, প্রেম, নিষ্ঠা খানিকটা থিতিয়ে গেছে। অবোধ রাম, শ্যাম, যদু, মধু কথায় কথায় সন্ন্যাসী বৈরাগ্যকে নিয়ে যে-হাসাহাসি করে, সে শুধু অজ্ঞানের প্রগল্‌ভতা। বরদাবাবুর কাছ থেকে ফিরে এইটুকুই আমার সত্য লাভ হ'ল: বৈরাগ্যের মধ্যে যে ভগবৎ-করুণা নিহিত তার সঙ্গে যেন নতুন করে শুভদৃষ্টি হল নবলব্ধ বিষাদের অঞ্জনে।

কিন্তু বাইরে কেউ জানতে পারেনি। জানবে কোত্থেকে? আমি বললে তো জানবে! আমি যে বলতে চাইতাম না তা নয়, কিন্তু বিষণ্ণের কি মুখ ফোটে যদি সে জানে যে, তার বিষাদের কারণ শুনে সবাই হাসাহাসি করবে? আমার বন্ধুরা যে সবাই বেদরদী ছিলেন এমন ইঙ্গিত করছি না, আমি বলতে চাই শুধু এই কথা যে, প্রবল বৈরাগ্যের অনুভূতি যাদের হয়নি, তারা কখনই বুঝতে পারে না তার ফলে বৈরাগীর ঠিক কী দশা হয়। সংসারে আমার কেবল একটিমাত্র দরদী ছিল যে বুঝত: কৃষ্ণপ্রেম। কিন্তু হায় রে! তখন সে নাগালের বাইরে—গুরুর নির্দেশে সন্ন্যাস নিয়ে ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করছে। এ আর এক জ্বালা—তাকে চিঠি লিখেও যে একটু স্বস্তি পাব, তার পথও বন্ধ: ধরো যদি সে বলে—চলে এসো আলমোড়ায়, দু ভাইয়ে ভিক্ষা ক'রে ঠাকুরের প্রসাদে উজিয়ে উঠি! ঠাকুরের প্রসাদ আমার মাথায় থাকুক—ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করব ভাবতেও আমার বুকের মধ্যে রক্তের ভরসা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসত! সে যে কী অবস্থা জানে এক ভুক্তভোগী।

দুরন্ত মনঃকষ্টে একদিন সোজা বোলপুরে গিয়ে হাজির। কবি আমাকে গভীর স্নেহ করতেন, আমার মুখচোখের চেহারা দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, কী হয়েছে? আমি সব কথা খুলে বলবার ভরসা না পেয়ে এক ফন্দি আঁটলাম—কৃষ্ণপ্রেমের কথা উল্লেখ করে তাঁকে শোনালাম আমার একটি সবে-বাঁধা গান:

বলো লীলাময়, এ কী বঞ্চনা!
রূপে রঙে রসে কেন এ-ছলনা··· ইত্যাদি

গানটি ভালো হয়নি—কিন্তু গাইতে আমার ভালো লাগত। আমার মনের ছবিটি এতে ফুটে উঠেছিল ব'লে। গানটি গাইতে গাইতে আমার চোখে জল ভ'রে এল। আমি কোনোমতে অশ্রু গোপন করলাম।

কবি বিচক্ষণ দ্রষ্টা তো, এক আঁচড়ে বুঝে নিলেন। বললেন আশপাশের দু-চারজনকে একটু বাইরে যেতে। তারপর আমাকে কাছে ডেকে বসিয়ে, সস্নেহে, মৃদু স্বরে আমার কাঁধে হাত রেখে অনেকক্ষণ ধ'রে বোঝালেন। তাঁর ভাষা অবশ্য আমার মনে নেই, কিন্তু সান্ত্বনার সারমর্মটি তো ভুলবার নয়। বলি নিজের মতন ক'রে—রিপোর্টের যাথার্থ্য সম্বন্ধে হলপ ক'রে বলতে পারি শুধু একটি কথা: যে, ভাষা ও ভঙ্গি আমার হলেও যা তিনি বলেছিলেন, সেটুকু ভুল বুঝবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তিনি বলেছিলেন খতিয়ে একটি কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে: "রঙ রস রূপ এরা মায়া নয় বন্ধন নয়। অরূপ আবহমানকাল নিজেকে

এদের মধ্যে দিয়েই জানান দিয়াছেন। যে কষে বাঁধে তার নাম আসক্তি। তাই বর্জনীয় যে সে রূপ নয়, রূপের মোহ। কিন্তু মোহকে কাটাতে হবে ব'লে প্রাণের দোললীলাকেও পাশ কাটিয়ে নিস্তরঙ্গ নীরস শূন্যে মজতে চাইলে আমরা দেবতার দানের অমর্যাদা ক'রে শুধু যে অপরাধী হব তাই নয়—হব আত্মঘাতী।" ব'লে শেষে হঠাৎ বললেন: "আমার নৃত্যের তালে তালে নটরাজ গানটি শুনেছ কখনো?"

আমি বললাম: "শুধু শোনা নয়, ও-গানটি আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করে। বলতে কি, আপনার তিনটি গান আমার সবচেয়ে প্রিয়—আমি গেয়ে কী যে আনন্দ পাই—জীবনে যত পূজা হল না সারা, আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, আর এই গানটি: নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ।"

কবি প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন: "খুব ভালো কথা। কিন্তু এ-গান তিনটিতেই আমি কী বলতে চেয়েছি ভেবে দেখেছ কখনো?"

আমি সকুণ্ঠে বললাম: "দেখেছি—কিন্তু…"

কবি বাধা দিয়ে হেসে বললেন: "কিন্তু শুনলে আমার ভয় করে। তাই ভয় কাটাতে গান শোনাই শোনো—"

ব'লে তাঁর সুমধুর কণ্ঠে ধরলেন:

"নৃত্যের তালে তালে নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥
তোমার চরণপবন-পরশে, সরস্বতীর মানস-সরসে।
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
ঢেউ তুলে দাও, মাতিয়ে জাগাও অমলকমল গন্ধ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম।"

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম, হঠাৎ চমক ভাঙল, যখন কবি এইটুকু গেয়েই থেমে গেলেন, বললেন: "এই-ই হল মানুষের চিরদিনের কামনা, চিরদিনের সাধনা—মুক্তি চাইতে হবে দুরন্ত বাঁধন থেকে, জেগে উঠতে হবে ঝিমন্ত অজ্ঞান থেকে, কিন্তু সুর তাল ছন্দ নৃত্যকে অস্বীকার ক'রে নয়—অঙ্গীকার ক'রেই। আনন্দ মায়া নয়, আনন্দের আলো-হাওয়াই তো সৃষ্টি—আনন্দ মায়া হ'লে সৃষ্টি দাঁড়ায়? তাই তো আমাদের প্রাণ যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে চেয়েছে

শিবের নৃত্যকে মঙ্গলময় বলে বরণ করতে, গেয়েছে—(গুন গুন ক'রে)—তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম।"

সেদিন কবি অনেকক্ষণ ধরে এই কথাটির ভাষ্য করেছিলেন যে আমাদের মামুলি বৈরাগ্য নঙর্থক—সদর্থক বৈরাগ্যের প্রসূতি শুধু সেই দৃষ্টি যে দেখতে শিখেছে যে, ভগবানের লীলা না-র মধ্যে দিয়েই পৌছেছে হাঁ-তে। কবির দর্শন আমি জানতাম, কাজেই তাঁকে যে ভুল বুঝিনি, এ ধ্রুব।

মনের আঁধার কেটে গেল বৈকি—কিন্তু ঐ তখনকার মতন। এ-উপলব্ধি আমার একবার নয় বহুবারই হয়েছে: বিষাদ নিয়ে গিয়েছি কবির কাছে—তাঁর অমল স্নেহে, স্নিগ্ধ রসিকতায়, সর্বোপরি আনন্দদীপ্ত ব্যক্তিরূপের আলোয় মনের আঁধার কেটে গেছে। আজও মনে পড়ে তাঁর মুখের আশ্চর্য সৌম্যপ্রভা, যাকে কালজয়ী বললে অত্যুক্তি হয় না। মনে পড়ে বৎসরের পর বৎসর তাঁর বিকাশ চাক্ষুষ করে আনন্দের পাথেয় পাওয়া—ভরসা পাওয়া যে তবে সংসারের হাজারো ধুলো বালি কাদা কালির মধ্যে থেকেও আমাদের মৃন্ময় চেতনা চিন্ময়ের দিশা পেতে পারে। কবিকে আমি ভালোবেসেছিলাম সত্যিই—তাই হয়ত তাঁর মহিমার স্বরূপের কিছুটা চিনতে পেরেছিলাম আমার নাবালক দৃষ্টির শোকাবহ দৈন্য সত্ত্বেও।

কিন্তু তবু এটুকু বুঝতে আমার বেগ পেতে হয়নি যে, তাঁর স্বধর্ম আর আমার স্বধর্ম এক নয়। তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দের 'সিন্থেসিস অফ যোগ'-এর একটি কথা আমার অ-প্রতিবাদ্য মনে হ'ত সে-যুগেও: যে, প্রতি মানুষকেই খুঁজে বার করতে হবে তার জীবনের পূর্ণযোগকে। অর্থাৎ একজনের বিকাশের চরিতার্থতা যে-পথে, সে-পথ শুধু তারই—আর কারুর নয়। এককথায় সব মানুষের অন্তিম লক্ষ্য এক হ'লেও প্রতি মানুষকেই সে-লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে তার নিজের পথে, নিজের পায়ে, নিজের ছন্দে।

বোলপুর থেকে ফিরতে না ফিরতে আমার মন যে তিমিরে সেই তিমিরে। এমন কেন হ'ল সত্যিই ভেবে পেলাম না। শ্রীঅরবিন্দকে ১৯২৪ সালে বলেছিলাম বটে যে, আমি সব ছাড়তে রাজি কেবল গান ছাড়া। কিন্তু তাঁর ওখান থেকে ফিরে এসে দেখি যে, ক্রমশ গানও আমার কাছে বিস্বাদ না হোক্‌, অতৃপ্তিকর হয়ে উঠছে। শৈশবের বৈরাগ্য ফের আমাকে ছেঁকে ধরল। উত্তরকালে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একাধিকবার লিখেছিলেন যে, আমার বৈরাগ্যপ্রবণতার মূলে ছিল আমার জন্মান্তরের সংস্কার। বৈরাগ্য শ্রীঅরবিন্দ পুরোপুরি পছন্দ করতেন না, বলতেন তিনি অনাসক্তিরই

পক্ষপাতী, কিন্তু আমাকে লিখেছিলেন একটি পত্রে যে, বৈরাগ্য আমার ক্ষেত্রে প্রবল না হ'লে আমি কিছুতেই আমার নানা আসক্তির মায়া কাটাতে পারতাম না।

কিন্তু একথা তখন জানতাম না তো—তাই মনে মনে ভারি দুঃখ হ'ত এই ভেবে যে, বিধাতা আমাকে ভোগের জন্যে গ'ড়ে, অজস্র ভোগশক্তি দিয়ে এ কী নিষ্ঠুর ঠাট্টা করলেন—ভোগের ক্ষমতাকে রেখে রুচিকে কেড়ে নিয়ে? সে কত ওঠা-পড়া কত ভাবনা-চিন্তা, কত আগু-পাছু—একবার ভাবি যাই চ'লে পণ্ডিচেরি সব ছেড়ে, তার পরেই ভাবি—যদি সে গম্ভীর নীরস আবহে টিকতে না পারি? শ্রীঅরবিন্দের দীপ্ত ব্যক্তিরূপ আমার মন টানে। কিন্তু সেখানকার অধিকাংশ হাসিহীন গতানুগতিক গুরুবাদীর শুকনো মুখ চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে, আর বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে—আমিও হয়ত অম্‌নি শুকিয়ে যাব হাসতে গাইতে মিশতে ভুলে গিয়ে!

এই সময়ে ত্রিবন্দ্রম থেকে নিমন্ত্রণ এল এক মস্ত সঙ্গীত কনফারেন্সে সভাপতি হ'তে হবে। আনন্দ হ'ল, কিন্তু ক্ষণিক। যশের স্বাদ তো পেয়েছি, কিন্তু মন ভরছে কি? তবে? কেন এ-বিড়ম্বনা? কী হবে ত্রিবন্দ্রম সঙ্গীত-সভার সভাপতি হয়ে? কিন্তু তবু পারলাম না এ-মহৎ সম্মান প্রত্যাখ্যান করতে। রুচি নেই তবু লালসা আছে—এ যে কী বিশ্রী অবস্থা ব'লে বোঝানো যায় না—জানে কেবল ভুক্তভোগী।

ডিসেম্বরে (১৯২৮) ত্রিবন্দ্রমে সভাপতিত্ব করতে হবে। নভেম্বরের গোড়ায় গেলাম কাশী। আমার বড়মামা গঙ্গার কাছে এক বাড়ি কিনেছিলেন—দারুণ গলির মধ্যে। কিন্তু কাশী তো—তার উপরে গঙ্গা। সাগ্রহে গেলাম সেখানে।

সেখানে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সে ছিল গানের সমজদার—বিশেষ ঠুংরির। 'রইস' যাকে বলে। সে নিয়ে গেল বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বরী বাইয়ের কাছে। এ-বিখ্যাত বাইজীটি সে সময়ে বন্ধুর প্রতি আসক্তা, তাই বন্ধু যেতেই সাগ্রহে আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে গান শোনালেন।

মুগ্ধ হলাম, কিন্তু ঐ তখনকার মতন। সেখান থেকে বাড়ি ফিরতে না ফিরতে ফের মনের মধ্যে সেই দারুণ টনটনানি—সংসার ভালো লাগে না অথচ সন্ন্যাস নেবার কথা ভাবতেও ডরিয়ে উঠি! "জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে"……একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। তাহলে থাকব কী নিয়ে? দিন কাটবে কেমন ক'রে?

করুণার অঘটনের কথা বলেছি। এ আমার পুঁথিপড়া বুলি নয়, বারবারই দেখেছি—যখনই কাতর হয়ে ঠাকুরকে ডেকেছি, এসেছে সহায়, কেটেছে আঁধার

মিলেছে দিশা, জুটেছে পাথেয়! কাশীতে ঠাকুরকে কেঁদে ডেকেছিলাম: 'পথ দেখাও ব'লে।' ঠাকুর এলেন দেবদূত হয়ে।

তিনি—সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহদাশয় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ। সে-দিনটিও আমার জীবনে অবিস্মরণীয় থাকবে চিরকাল: ৫ই নভেম্বর ১৯২৮, সকাল সাড়ে নটা। কবিরাজ মহাশয় একঘর বইয়ের মধ্যে একা ব'সে। চোখের সে কী গভীর দৃষ্টি—শান্ত উজ্জ্বল অনাসক্ত! শুনেছিলাম, সারা ভারতে তাঁর মতন মহাপণ্ডিত দু-চারটির বেশি নেই। নিখিল শাস্ত্র তাঁর নখদর্পণে। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও পেলাম বৈকি—কত নজির, কত শ্লোক, কত কাহিনী! কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠল তাঁর অসামান্য ব্যক্তিরূপ—সৌম্য, অচঞ্চল, আত্মসমাহিত। তাঁকে বললাম সব কথাই খোলাখুলি। রবীন্দ্রনাথকে বলতে পারিনি, তিনি বৈরাগ্যবিমুখ জানতাম ব'লে। কিন্তু শুনেছিলাম কবিরাজ মহাশয় গৃহস্থাশ্রমে থেকেও যোগ-সাধনায় শিখরচারীদের সতীর্থ—তাছাড়া তাঁর স্নিগ্ধ সরল সম্ভাষণে মনের সব অশ্রুতারগুলিই একসঙ্গে বেজে উঠল যেন, নইলে হয়ত কিছুই বাদ-সাদ না দিয়ে বলতে পারতাম না সব কথা।

খুব মন দিয়ে শুনলেন তিনি। তারপরে বললেন অনেক কথা। সে-কথালাপের একটি রিপোর্ট তাঁকে পরে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু কবিরাজ মহাশয় কোনো উত্তর না দেওয়ায় প্রকাশ করিনি। আজ সেসব কথা ফলিয়ে বলার দরকার দেখি না শুধু বলব তিনি সবশেষে আমাকে যে-উপদেশ দিয়েছিলেন।

কবিরাজ মহাশয় বললেন: "আপনার গান শুনে প্রথম দিনই আপনাকে আমি চিনেছিলাম। তাই আপনার খবর রাখতাম। আপনাকে কী বলব—শুধু এই ছাড়া যে, আপনি মহাভাগ্যবান্। নইলে শুধু যে আপনার মনে এ-বৈরাগ্য স্থায়ী হতে পারত না তাই নয়—আপনি কখনোই পেতেন না শ্রীঅরবিন্দের মতন মহাগুরুর কৃপা।"

আমি ক্লিষ্টকণ্ঠে বললাম: "কিন্তু তিনি আমার গুরু, একথা বরদাবাবুর আশ্বাসেও যে আমার বিশ্বাস হয় না!"

কবিরাজ মহাশয় হেসে বললেন: "হবেই হবে—গুরুশক্তি আর-একটু প্রকট হ'লে। হ্যাঁ, আমি এ বিষয়ে জানি বলেই বলছি যে, গুরুশক্তির মতন মহাশক্তি আর নেই। ভগবান গুরুর মধ্যে দিয়েই সাধককে ডাক দেন—গুরুর মধ্যে দিয়েই পাইয়ে দেন, যা পাওয়ার। আচার্য শঙ্কর তাঁর বিবেকচূড়ামণিতে বলেছেন:

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দৈবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥

অর্থাৎ শুধু ভগবানের করুণায়ই এই তিনের যোগাযোগ হয়: মানব জন্ম, মুক্তির তৃষ্ণা ও মহাপুরুষের সংস্পর্শ। আপনার সম্বন্ধে আমার অনেক আশা। আপনাকে কেবল একটি কথা বলব: আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, শ্রীঅরবিন্দের যোগশক্তি ও গুরুশক্তি আপনার অন্তরে অলক্ষ্যে কাজ করছে। নইলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঠিক পর থেকেই আপনার মনে বৈরাগ্য এভাবে প্রবল হয়ে উঠত না। তাই আপনি এমন কথা মনেও ঠাঁই দেবেন না যে,আপনাকে এ-বৈরাগ্য বিপথে নিয়ে যাচ্ছে—বিশ্বাস করুন, এ অতি শুভ লক্ষণ: সাধনার দিকে মনকে ফেরাতে চেয়েই বৈরাগ্য আসে তাকে অনাসক্তির দীক্ষা দিতে; তাই আপনাকে শুধু আমি একটি অনুরোধ করতে চাই আজ: আপনি আর একটু নির্জনে থাকবার চেষ্টা করুন—লোকসঙ্গের মায়া কাটিয়ে। কারণ গুরুশক্তি খানিকটা সাধনার অপেক্ষা রাখে। গান করেন করুন—খুব ভালো কথা, কেবল কিছুদিন একলা একলা গান করা অভ্যাস করলে মন্দ কি? দেখবেন, একলা ঠাকুরকে গান শোনালে মনে শক্তি পাবেন, বিপদ কাটবে। কিন্তু ফের বলছি এ-বৈরাগ্য অতি শুভ চিহ্ন আর গুরুশক্তি মহাশক্তি—সাদরে বরণীয়।'*

আরো অনেক কথাই তিনি বলেছিলেন কিন্তু সেসব প্রসঙ্গের অবতারণার আর প্রয়োজন নেই। যেটুকু সংক্ষেপে লিখলাম তা থেকে আশা করি, কবিরাজ মহাশয়ের উপদেশের সারবত্তা ও ব্যক্তিরূপের কিছু আভাস দিতে পেরেছি। তাঁকে যে-রিপোর্টটি পাঠিয়েছিলাম, সেটি তিনি তখন প্রকাশ করতে অনুমতি দেননি সম্ভবত এই জন্যেই যে আমি তাঁর গুণগানে অত্যধিক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম। কবিরাজ মহাশয় স্বভাবে পরম বিনয়ী তাই হয়ত তাঁর গুণগানে আমার পঞ্চমুখ হয়ে ওঠায় ঈষৎ বিব্রত হয়ে থাকবেন।

এর পরেই এল আমার জীবনের গভীর সন্ধিলগ্ন। যা ঘটেছিল বলবার ভাষ্য সত্যিই খুঁজে পাওয়া ভার।' তবু আমার সংসার-জীবনপর্বে ছেদ এল কেমন ক'রে ও কী ভাবে তার কিছু আভাস না দিলে এ-স্মৃতিচারণের শেষরক্ষা হবে না। তাই চেষ্টা তো করি আঁকতে এ আশ্চর্য অধ্যায়ের ছবি—দেখি ফল কী দাঁড়ায়।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের উপদেশে আমার হৃদয় শুধু যে পুরোপুরিই

---

*আমার সৌভাগ্যক্রমে গত বৎসর নভেম্বরে আমি কাশীতে কবিরাজ মহাশয়ের গৃহে ভজন করে তাঁকে শোনাই। শুনে তিনি প্রসন্ন হ'য়ে বলেছিলেন: "এইই তো চাই--এখন যা গান করছেন সে তো আর শখের গান নয়—খাঁটি ভজন।" তাঁকে উত্তরে বলতে ইচ্ছা হয়েছিল—এজন্যে তাঁর আশীর্বাদের কাছে আমি কম ঋণী নই।

সাড়া দিল তাই নয়, সে-সাড়ার স্পন্দন থামতে চায় না, আমাকে বলে কেবলই : 'সাধুর কথা শোনাই যথেষ্ট নয়, সেই অনুসারে কাজ করা চাই।' মনে পড়ল খৃষ্টদেবের কথা যা ওলগা প্রায়ই পড়ে শোনাত যে ভগবান ভগবান করে ঘড়ি ঘড়ি উজিয়ে ওঠে সে আমার প্রিয় নয়, আমার প্রিয় সেই যে তাঁর বাণীকে জীবনে ফলিয়ে তুলতে চায়। (Not everyone that sayeth unto me, "Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven) সাতপাঁচ ভেবেচিন্তে শেষে স্থির করলাম—কিছুদিন মেলামেশা ছেড়ে দিয়ে কোনো বিজন দেশে গিয়ে একা কাটাব। নির্জনতা পেতে হ'লে একটু দূরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই ভেবে ঠিক করলাম যে, ত্রিবন্দ্রমে সভাপতিত্ব ক'রে কাছাকাছি সাগরতীরে কোনো একটি কুটির নিয়ে মাসখানেক থাকব একলাটি—কারুর সঙ্গে না মিশে। শ্রীঅরবিন্দের গুরুশক্তি আমার উপর আরো সক্রিয় হোক্—আপত্তি নেই, কিন্তু গুরুশক্তিই যে আমার মনকে হঠাৎ বৈরাগ্যের দিকে ফের রওনা করে দিয়েছে, একথা ভাবতে আমার আদৌ ভালো লাগত না। আমার আশৈশব দীক্ষা যৌবনে য়ুরোপের শিক্ষার স্থূল হস্তাবলেপে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছিল : ফলে আমি যা কিছুই ঘটুক না কেন, তার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাই খাড়া করতে চাইতাম—গুহ্য শক্তিতত্ত্বের তাত্ত্বিক হবার না ছিল আমার তাগিদ, না সময়। তাছাড়া নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্বে খানিকটা ক্লান্ত হয়েই আমি মৌনী হতে চেয়েছিলাম গীতার 'বিবিক্ত দেশসেবিত্বং বিরতির্জনসংসদি' মন্ত্র জপ ক'রে। এ-শ্লোকটির পানেও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন স্বয়ং কবিরাজ মহাশয়। তাঁর কাছ থেকে ফিরে ফের গীতা ও কথামৃত পড়া শুরু করলাম। একেই তো শাস্ত্রে বলে স্বাধ্যায়—সাক্ষাৎ বেদের বিধান : "স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ"—স্বাধ্যায় ছেড়ো না।

কিন্তু কাশীতে আমার সেই বন্ধুটি মাঝে মাঝেই হানা দিয়ে আমাকে এখানে ওখানে টেনে নিয়ে যেতে চাইত গান গাইতে ও শোনাতে। গান যে আমার সত্যিই আর ভালো লাগছিল না, একথা তাকে বার বার বলা সত্বেও সে বিশ্বাস করতে পারেনি। তাকে দোষ দেবই বা কেমন ক'রে, আমার যে এমন দুরবস্থা হতে পারে দুদিন আগে কি আমিই ভাবতে পারতাম ?

ওদিক অতুলদা আমি লক্ষ্ণৌ এসেছি শুনেই একদিন সকালে এসে হাজির শশব্যস্ত হয়ে। তাঁকে আমি লিখেছিলাম লক্ষ্ণৌ যাব না এবার। তিনি নাছোড়বান্দা —আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন। তাঁর গভীর স্নেহে বিশেষ আরাম পেলাম

বৈকি—কিন্তু আরাম আর শান্তি তো সমার্থক নয়। লক্ষ্ণৌয়ে এসে মনের অশান্তি কাটল না—আরো এই জন্যে যে হবি তো হ—১৯২৮-এর নভেম্বর মাসে ঠিক এই সময়েই লক্ষ্ণৌয়ে আমার দুই জ্যেঠতুত ভাই হেমেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা। ওদের দুজনকে আর অম্বিকা মজুমদার বলে একটি মেধাবী গায়ককে আমি মাসে মাসে সব জড়িয়ে দেড়শ টাকা বৃত্তি দিয়ে লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে গান শিখতে পাঠিয়েছিলাম ও দুই বৎসর এই বৃত্তি জুগিয়েছিলাম। এরা তিন জনেই পুরো পাঁচ বৎসর মরিস কলেজে শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের কাছে গান শিখে সঙ্গীতের ডিগ্রি নিয়ে কলকাতা ফেরে। আমার সে-সময়ে ইচ্ছা ছিল ওদের তিনজনের সহযোগে কলকাতায় একটি সঙ্গীত আকাদেমির পত্তন করার। আমার সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করে একটি নিখিল ভারতীয় গীতভবন গ'ড়ে তুলব, যেখানে ভারতের বড় বড় ওস্তাদদেরই একের পর এক অতিথি ক'রে রাখা হবে আর এসবের খরচ তোলা হবে, সেই ভবনেরই নিচের তলার কন্সার্ট হলে—এই ধরনের নানা জল্পনা কল্পনা নিয়ে আলোচনা করতাম পরমানন্দে সুভাষের সঙ্গে, সেও সোৎসাহে সাড়া দিত। যদি আমি আর চার পাঁচ বৎসরও কলকাতায় থাকতাম তবে মহাজাতি সদনের মত অতবড় সদন না হোক একটা ছোটখাট আন্তঃপ্রাদেশিক সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান কলকাতায় গড়ে উঠতই উঠত —সুভাষের সহযোগিতায়। কিন্তু হায় রে, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে!—

লক্ষ্ণৌয়ে এসে আমারই প্রেরিত ভ্রাতৃযুগল ও বন্ধুটির লক্ষ্ণৌয়ে থাকা ও গান শেখার ব্যবস্থা করতে আমাকে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হ'ল: তিনজনেই মেধাবী গায়ক, তার উপরে আমার স্নেহভাজন, ভালো লাগল বৈকি। আর এক শুভ যোগাযোগ ঘটল: বিখ্যাত চিত্রনট পাহাড়ী সান্যালও সে সময়ে মরিস কলেজে রতনজনকরের কাছে গান শিখছিলেন। পাহাড়ী সে সময়ে অতি সুকণ্ঠ ছিল যদিও নট হবার পরে গানের চর্চা রাখতে পারেনি। সে যাই হোক—হেমেন, রবি, অম্বিকা ও পাহাড়ী এই চতুরাননের স্নেহসম্ভাষণে আমার মনের অশান্তি তখনকার মতন চাপা প'ড়ে গেল। তাছাড়া ধূর্জটি, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, রাধাকুমুদ প্রমুখ প্রবীণ বন্ধুদের সংস্পর্শেও কিছু স্বস্তি পেলাম—সর্বোপরি অতুলদার নিত্যনূতন গানের আনন্দে। দশচক্রে ভগবান ভূত হন কিনা জানি না, তবে সবে-জাগা বৈরাগ্য ঘুমিয়ে না পড়লেও একটু যে ঝিমিয়ে পড়ে এ নিশ্চয়। অচ্ছন বাই তখন লক্ষ্ণৌয়ে ছিলেন না বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর আমার অনুরোধে আমাকে সাদরে কয়েকটি অপ্রচলিত রাগ শেখালেন: দেবগান্ধার, দেওগিরি, মেঘরঞ্জনী, দেশী ইত্যাদি।

কিন্তু বিধাতা যখন বাদ সাধেন, তখন হা হতোস্মি বলা ছাড়া উপায় কি? আমার মনে ফের দারুণ ঘা লাগল ঠিক এই সময়েই কৃষ্ণপ্রেমের এক চিঠি পেয়ে। সে লিখেছিল যে, সব ছেড়েছুড়ে ঠাকুরের প্রসাদে পরম শান্তি পেয়েছে।

সে-চিঠি নিয়ে আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে গেলাম, যাঁর নাম ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি করুণ হেসে বললেন, কৃষ্ণপ্রেম যে শান্তি পেয়েছে, এ-খবর তিনি পেয়েছেন অনেক আগেই। সঙ্গে সঙ্গে ফের কে যেন আমার মনকে ধম্‌কে উঠল 'লক্ষ্ণৌয়ে আসতে না আসতে গোপীনাথ কবিরাজ কি বলেছিলেন ভুলে গেলে? ভিড়ের মধ্যে কে কবে মনের মানুষের খবর পেয়েছে?'

অতুলদা ধূর্জটি, পাহাড়ী, হেমেন্দ্র, রবীন্দ্র, অম্বিকা এরা কেউই জানত না আমার দিন কী অসহ অশান্তিতে কাটছে। তবে বাইরে ঠাট বজায় রাখতে হবেই হবে—পণ নিয়েছিলাম আমি। কাজেই আমার ভাবান্তর এক জয়দা ছাড়া আর কারোরই চোখে পড়েনি।

১৪ই নভেম্বর অতুলদা গেলেন ঝাঁসিতে এক মামলায়। আমাকে বললেন, "তুমি, দিলীপ, রাজার হালে থাকো আমার বাড়িতে গদিয়ান হয়ে, আমি দু তিন দিনের মধ্যেই ফিরছি—তখন ফের দু ভায়ে তারস্বরে ফের গানে মেতে ওঠা যাবে। কিন্তু কোথাও পালিও না যেন—না, কথা দাও। তোমাকে নিয়ে আবার হয়েছে আমার জ্বালা"—ব'লেই—ধরে দিলেন—"আঁখির নিমিষে যদি নাহি দেখি, তবে যে পরাণে মরি—হা হা হা!"

আমিও একগাল হেসে পাদপূরণ করলাম: "চণ্ডীদাস বলে অতুলরতন গলায় বাঁধিয়া পরি—হো হো হো।"

মনের ভার কত সময়েই না হাল্কা করেছি এইভাবে অকারণ হেসে। এখনো মনে পড়ে আমার সংসার জীবনের শেষ অধ্যায়ে কী ভাবে অতুলদার ও আর সব বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সমানে হাসি-মস্করায় কাল কাটাতাম মনের দুঃখ চেপে রেখে। কাউকে বুঝতে দিইনি একটিবারও আমার মনে কী-দুঃসহ দ্বন্দ্ব চলেছে—একটা সুর ডাকে সব ছাড়তে, আর-একটা সুর ভয় পেয়ে বলে: 'চুপ চুপ, অমন অলুক্ষণে কথা বলে না—আনন্দের এ-খোলা আলো-হাওয়া ছেড়ে যাবে পণ্ডিচেরির গানহীন হাসিহীন কারাগারে? পাগল না ক্ষ্যাপা!'

অতুলদা এই সময়ে ঝাঁসি চলে যেতে আমার মন আরো যেন খারাপ হয়ে গেল। ১৪ই রাতে জয়দার ওখানে গিয়ে হেসে বললাম: 'আজ তোমার গুণের দ্বারে

অতিথি, সুন্দর!' জয়দার চিত্রাঙ্গদা পড়া ছিল বললেন: 'আর আমি তোমার গানের দ্বারে—যদিও রূপও যে তোমার নেই তা নয়।' এই ধরনের সে কত হাল্কা হাসি ঠাট্টা, কাব্যকথা চলত জয়দার সঙ্গে। বড় স্নিগ্ধ সুন্দর দরদী মানুষ ছিলেন জয়দা।

সন্ধ্যায় জয়দা বললেন: "গান শোনাও ভাই—না না ভিড়ের গান নয়—তোমার পিতৃদেবের ঐ গানটি গাও, ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সঙ্গীত ভেসে আসে!"

যখন সঞ্চারী ধরলাম—

'কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে?
ভূতের বেগার খেটে মরিস মিছে?
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে
ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে আয় চ'লে আয় আমার কাছে'

তখন সম্ভবতঃ এই ধরনের আঁখর জুগিয়েছিল—

মায়ার খেলা—এ-সবই যে ছায়ার মেলা!
আঁধার নিয়ে মাতিস কেন—যায় যে বেলা যায় যে বেলা…'

গাইতে গাইতে চোখে জল এল…মন ভ'রে উঠল বেদনার পরমানন্দে।

* * * *

গান শেষ হতে জয়দা আমাকে আলিঙ্গন করলেন জলভরা চোখে। বললেন, 'সত্যিই বলেছ ভাই—যায় যে বেলা, যায় যে বেলা।'

তারপর তাঁকে বললাম সব খুলে, যা যা বলেছিলাম কবিরাজ মহাশয়কে। শেষে বললাম কবিরাজ মহাশয়ের উপদেশ: কিছুদিন জনসঙ্গ ছেড়ে নিঃসঙ্গ হতে হবে পরমসঙ্গের দিশা পেতে।

জয়দা বললেন অনেক কথা। বললেন: 'জানো তো আমি বাগান কী ভালোবাসি। কত অজানা ফুলের গাছ বসিয়েছি আমার বাগানে। একসময়ে মনে হত ফুল নিয়ে চিরকাল পরমানন্দেই কাটবে। কিন্তু ভাই, কৃষ্ণপ্রেম চলে যাওয়ার পর থেকে আর ফুল যে ফুল তাও ভালো লাগে না—বিশ্বাস কোরো।'

আমি বললাম হেসে, 'তবে যাও না কেন তার কাছে?'

জয়দা হেসে বললেন, 'এখনো মনের মধ্যে যে-জোর পাইনি, তবে পাব যদি—' ব'লেই আচম্কা—'তুমিও যাও ঐ পথে।'

আমি (চম্‌কে): ঐ পথে!

জয়দা (হেসে) "ঐ পথে" বলতে ডরিয়ে উঠলে কেন ? কীই বা এমন পরম শান্তিময় পথে আমরা চলেছি বলো তো ?'

আমি : কিন্তু সেখানে যেতে ভরসা হয় না যে। যদি যোগাশ্রমে শান্তি না পাই ? সেখানে যে কেউ হাসে নারে ভাই !

জয়দা (মৃদু হেসে) : না-ই হাসল—তুমি যাচ্ছ তোমার গুরুর কাছে,গুরুভাইয়ের কথা নিয়ে মাথা বকাও কেন ? শোনো দিলীপ, আমি তোমাকে কালই একটি টিকিট করে দিই—তুমি যাও চলে সোজা তোমার গুরুর কাছে—নেও তাঁর চরণে আশ্রয়—যেমন কৃষ্ণপ্রেম নিয়েছে যশোদা মার চরণে। এছাড়া আর পথ নেই।

আমি ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললাম : 'ওষুধের আগে রোগের নিদান তো পাওয়া চাই।'

জয়দা ডাক্তার তো—বুঝলেন, বললেন : 'নিদানের প্রশ্ন কেন ভাই ?'

আমি এড়িয়ে গিয়ে বিষণ্ণ স্বরে বললাম : 'জানি না ভাই, সব থেকেও কিছুই ভালো লাগে না কেন। জানি শুধু এইটুকু মাত্র যে, আমি অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি—আমার গুরুদেব আমাকে এমন কিছুই দেননি, যাকে 'পাওয়া' বলা চলে। তাঁর সঙ্গে দেখার ফল শুধু এইটুকু হয়েছে যে, সব কিছু বিস্বাদ হয়ে গেছে, এমন কি গান যে গান তাও ভালো লাগে না আর।'

জয়দা আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'কবিরাজ মহাশয় তোমাকে ঠিকই বলেছেন, কৃষ্ণপ্রেম থাকলে সেও বলত এই কথাই যে, এ শুভ লক্ষণ। তাই তো বলছি ভাই, তুমি আর কালবিলম্ব না ক'রে যাও চ'লে পণ্ডিচেরি। গান খুব ভালো জিনিস, ফুলও চমৎকার। কিন্তু দুইই কি খতিয়ে ইন্দ্রিয়বিলাসই দাঁড়ায় না ? বুকে হাত দিয়ে বলো তো ?'

আমি আহত হ'য়ে 'ইন্দ্রিয়বিলাস !' বলতেই জয়দা বললেন, 'আমাকে ভুল বুঝছ কেন—স্থূল নয়—সূক্ষ্ম বিলাস--ঠিকই, তবু কানের মধ্যে দিয়েই ওকে মরমে পশতে হয় না কি ? কৃষ্ণপ্রেম এ সুখের পসারী হয়নি। তাই সে পেয়েছে শান্তি—অতীন্দ্রিয়ের ছোঁওয়া পেয়ে আগুপাছু বিচার ছেড়ে সব ছেড়েছে ব'লে।'

আমি একটু ভেবে বললাম : 'কথাটা ভাববার—মানি। কিন্তু আমার কী হয়েছে শুনবে ? আমি যে ভাই, গুরুর কাছে থেকে পাওয়ার মতন কিছুই পাইনি আজো ! সব ছাড়তে আমিও পারি, কিন্তু কিছু পেলে তবে—তার আগে না।'

মুহূর্তে জয়দার মুখে মেঘ ছেয়ে গেল, একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন : 'দিলীপ, তোমাকে আমি যা ভেবেছিলাম তুমি তা নও। তুমি শেষে কিনা দরদস্তুর শুরু

করলে ঠাকুরের সঙ্গে—কিছু পেলে তবে হাতের পাঁচ ছাড়বে? যারা ঠাকুরের জন্যে সব ছেড়েছে, তারা এভাবে আগুপাছু ভাবেনি। তুমি পারবে না। এসো আমরা অন্য কথা কই।'

শুনেছি লালাবাবু বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন সন্ধ্যাবেলায় একটি কথা শুনে। এক গঙ্গাস্নানার্থী পথে তার সঙ্গীকে বলেছিল: 'বেলা যায় ভাই, চল্ যাই গঙ্গায়'। 'বেলা যায়'—এই সামান্য কথাটি লালাবাবুর মনে বেজে উঠেছিল বাঁশির ডাক হয়ে। তিনি ধনসম্পত্তি ছেড়ে ভেকধারী বৈষ্ণব হন সেই দিনই।

কিন্তু আমার বুকে জয়দার 'দরদস্তুর করার অভিযোগ' বেজেছিল শুধু বাঁশির ডাক হয়ে নয়—দারুণ শেল হয়ে।

সারা রাত আমি ঘুমতে পারিনি। সত্যিই মনের মধ্যে কে যেন চাবুক মারতে থাকে: আমি ঠাকুরের সঙ্গে শুধু দরদস্তুরই করে এসেছি এতদিন!

ভোরে উঠে বসলাম ধ্যানে। গুরুদেবকে ডাকলাম, ঠাকুরকে ডাকলাম চোখের জলে: আমাকে বল দাও, সব ছাড়বার বল দাও, দরদস্তুর করার গ্লানি থেকে বাঁচাও, আমি নিজের চোখে ছোট হয়ে গেছি।'...চোখের জলে বুক ভেসে গেল...অমন কান্না বহুদিন কাঁদিনি।

হঠাৎ বুকের মধ্যে কী যেন খুলে গেল—কী একটা পদ্ম মতন—অত্যন্ত ঝাপসা অনুভূতি, ঠিক কী যে হ'ল, আজো জানি না—কেবল এইটুকু জানি যে, এক মুহূর্তে দৃশ্য বদলে গেল—ঠিক যেমন ঘোরানো রঙ্গমঞ্চে বদলে যায়—যেখানে ছিল মরুভূমি, জেগে উঠল নীল ঝরনা, বিষাদের মরণ আনল এক অসহ আনন্দের নবজন্ম—সেই সঙ্গে শক্তি: 'আমি পারব পারব পারব—আমার যে না পারলেই নয়। বাঁচতে হ'লে যে আমাকে পারতেই হবে—ছাড়তেই হবে এই দিনগতপাপক্ষয়ের অর্থহীন গতানুগতিকতা।'

উঠে টাইম টেবল দেখলাম, মেল ট্রেন এক ঘণ্টা বাদে লক্ষ্ণৌয়ে আসবে। একটি বাক্স ও বিছানা প্যাক ক'রে পনের মিনিটের মধ্যেই রওনা হলাম বম্বে—সেখান থেকে যাব পণ্ডিচেরি। গুরুদেবকে স্টেশন থেকে তার ক'রে দিলাম: 'আমাকে গ্রহণ করতেই হবে—আমি সব ছাড়তে রাজি।' লক্ষ্ণৌ স্টেশনে জয়দাকে একটি পোস্টকার্ড লিখে ডাকে দিলাম: 'দরদস্তুর আর করব না জয়দা—পথ দেখতে পেয়েছি তোমারই কৃপায়। তোমাকে প্রণাম প্রণাম প্রণাম।' ড্রামা ইন রিয়্যাল

লাইফ যাকে বলে—অক্ষরে অক্ষরে। ধূর্জটিকেও লিখে দিলাম আমার বিবাগী হওয়ার কথা।

সারা ট্রেনে বুকের মধ্যে কেবল আলোই ঝলকে উঠতে থাকে, থেকে থেকে অকারণে চোখে ঝরে আনন্দাশ্রু—মনে বিষাদের, আঁধারের, সংশয়ের আর চিহ্নলেশও নেই। ঠাকুর ডাকলে সাড়া দেন না, চাইলে নির্দেশ দেন না, অঘটন এ-যুগে ঘটে না আর—কে বলে?

* * *

এবার উপসংহারের পালা। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে তার করেছিলেন আমার পত্র পেয়েই।

পণ্ডিচেরি পৌঁছে মনে হল বাইবেলের 'প্রডিগাল সন'-এর কথা যে অনেক ঘাটের জল খেয়ে পিতৃগৃহে ফিরে তবে পেয়েছিল শান্তির নোঙর।

এ-শান্তির তবু ব্যাখ্যা হয়। কিন্তু এর পরে আমার যে অপূর্ব অনুভূতির আমি আজ পর্যন্ত কোনো ব্যাখ্যাই খুঁজে পাইনি—ইঙ্গিতে তার একটু আভাস দেওয়ার জন্যেই এ-উপসংহারের অবতারণা। ইঙ্গিত আভাস জাতীয় বিশেষ্যের প্রয়োগ করছি, শুধু জানিয়ে রাখতে যে, সে-উপলব্ধিটি যখন হয়েছিল, তখন তার নিবিড়তা ও দীপ্রতার পাশে আমার দৈনন্দিন সব ইন্দ্রিয়বোধই হয়ে গিয়েছিল তেম্‌নি পাণ্ডুর, যেমন পূর্ণচন্দ্রের কান্তি হয় সূর্যোদয়ের পরে। আমরা আমাদের গভীর অনুভূতির কথা বলতে চাই পঞ্চাননের মতনই পঞ্চমুখে, কিন্তু শতাননের উচ্ছ্বসিত অত্যুক্তিতেও কি প্রকাশ করা যায় এ-জাতীয় আত্মিক অনুভূতি? তবু একটা অনুলিপি থাকুক—তাদের জন্যে যাদের অনুভবের পরিধির মধ্যে এসেছে এ-জাতীয় অতীন্দ্রিয় অনুভব—"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—বচন ও মন যার নাগাল পাবার কাঙাল হয়েও ফিরে ফিরে আসে। আমি জানি, আমি শুধু যোগীই নই, তার উপরে শিল্পী, কবি ও গায়ক—প্রকাশ না ক'রে যার নিস্তার নেই। তাইতো এ-আকুলি-বিকুলি চিরদিনই আমাকে অশান্ত করেছে: কেমন ক'রে বলব যা বলাও যায় না—আবার না ব'লেও নিস্তার নেই?

বেশ মনে আছে সে অবিস্মরণীয় দিনটি। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পাবার পরেই কী যেন হয়ে গেল—অজ্ঞানতিমিরান্ধ নয়নে যেন ফুটে উঠল এক অপরূপ দৃষ্টি যা ছিল দেড়দিন। কী দেখেছিলাম এ-দৃষ্টি দিয়ে? বলতে পারব কিনা জানি না, তবু বলতে চেষ্টা করব—"বুঝ লোক যে জানো সন্ধান" মন্ত্র জপ ক'রে।

মনে সেদিন কেবলই গুনগুনিয়ে উঠেছিল ঋগ্বেদের :

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ

ঝরায় পবন মধুধারা, সিন্ধু হ'তে মধু ক্ষরে,
দিবস রজনী মধু, মধু ঝরে পৃথ্বী ধূলি প'রে।

যেদিকে তাকাই মনে হয় মধু ঝরছে—গাছপালা, ইটকাঠ, পাথর, পার্থিব রজঃ পর্যন্ত—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে! কাক যে কাক তাকেও দেখি অন্য চোখে—মনে হয়, আনন্দে সে ওতপ্রোত—তার কর্কশ কণ্ঠে ঝরছে অবিমিশ্র আনন্দ·····জগতে নিরানন্দ কোথায়? কোথায় কদর্যতা, বন্ধুরতা গরল? সবই তো মনোরম মধুময়—আকাশ বাতাস আনন্দ মধুতে গ'লে পড়ছে পরম স্নেহে, যেন বলছে 'ওরে, ভয় কি? আমি কি নেই? বিষাদ তো মায়া—আনন্দই সত্য। বিষ মায়া—সুধাই সত্য।'

মনে হ'ল—আমার সত্তার কানায় কানায় উপচে পড়ছে বিশ্বব্যাপী মধু, আমার তনুর প্রতি অণু শিউরে উঠছে কার প্রেম-সম্বোধনে। অথচ কাউকেই আমি দেখি নি, কোনো স্বরই শুনি নি—কত সাধকের কত কী দর্শন হয়, আমার কোনো দর্শনই হয় নি—অথচ এ কী অভূতপূর্ব অনুভব।······প্রতি রোমের মধ্যে সঙ্গীত জেগে উঠল! মনের প্রফুল্ল অবস্থায় এ জগতকে কার ভালো না লাগে? কিন্তু আমার সেদিন যে অনুভব হয়েছিল—ও প্রায় দেড়দিন ছিল—সে তো ভালো-লাগার অনুভব নয়—সে যে জগতকে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখার রোমাঞ্চ! অথচ এমন কিছুই তো ঘটে নি যার ফলে চেতনার মধ্যে এ-আলো নামতে পারে! না ছিল আমার জ্ঞানের, ধ্যানের সম্পদ—না সাধনার, ভক্তির ঐশ্বর্য। আমি শুধু শ্রদ্ধা নিয়ে গিয়েছিলাম শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করতে ও দেখেছিলাম তাঁর জ্যোতির্ময় কান্তি, শান্ত সৌম্য আনন—কিন্তু সে তো এর আগেও কয়েকবার দেখেছি (পরেও) কিন্তু এমন সর্বব্যাপী আনন্দের অনুভব তো হয় নি! কোত্থেকে এল অহেতুক আনন্দ—না, শুধু আনন্দই তো নয়, এমন এক দৃষ্টি যার ক্ষণাভাষও আমি এর পূর্বে কোনোদিন পাই নি জীবনে! নানা সাধকের লেখায় পড়েছি এ-আনন্দের বর্ণনা কিন্তু আমার মনে হ'ল, আমার অনুভবের সঙ্গে তাদের কোনো মিল নেই বুঝি। বোধহয় প্রতি অনুভবের মধ্যে কোনো না কোনো অদ্বিতীয় উপাদান আছে ব'লেই আমার এরকম মনে হয়েছিল। আরও কত কী মনে হয়েছিল—সে কত রকমারি চিন্তা শিহরণ জল্পনা কল্পনা মনে

নেই আজ। কেবল একটি মূল অনুভব চিরদিনই আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে—বলি : আমার মনে হয়েছিল—শুধু যে জগতের রূপান্তর হয়েছে তাই নয়, আমাকেও কে যেন ঢেলে সাজিয়েছিল : যে-দিলীপ শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করতে গিয়েছিল তার সঙ্গে সে-দিলীপের কোনো মিলই ছিল না যে তাঁকে দর্শন ক'রে ফিরে এসে সমুদ্রের ধারে বালির উপর একলা ব'সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছিল "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"—শিউরে উঠছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দে বিধৃত দেখে। দু'জন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ—একজন আর একজনকে জানলেও চেনে না। সে-উচ্ছ্বাসের উলুধ্বনি, পুলকের প্লাবন, বিস্ময়ের ব্যাপ্তি কেমন ক'রে ভাষায় প্রকাশ করব ?

অথচ আশ্চর্য—একটি কথা ভুলতে পারি নি আজো : যে আমার মনে প্রশ্ন জাগল—(একেবারেই আকস্মিকভাবে, কেন জানি না)—"যদি কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন কী দেখলে তুমি—কী বুঝলে—কেমন ক'রে বর্ণনা করবে তোমার এ-অনুভূতিকে—তাহ'লে তুমি কী উত্তর দেবে শুনি? প্রশ্নটি জাগতে না জাগতে আমার গহন অন্তর থেকে পরপর দুটি স্বর উঠল, আমি যেন শুনছি সাক্ষী হ'য়ে :

প্রথম স্বর : মানুষ সংসারে সবচেয়ে কী ভালোবাসে ? দ্বিতীয় স্বর : আলো আর হাওয়া।

প্রথম স্বর : তাহ'লে তুমি তোমার বন্ধুকে এ-অনুভবের বর্ণনায় এই জবাব দেবে : 'আমাকে যদি এক অন্ধকূপে বাস করতে হয় তাহ'লেও আমি একবারের জন্যেও আলো কি হাওয়ার অভাব বোধ করব না—এমনি অহেতুক আনন্দেই ভরপুর থাকব শেষ পর্যন্ত।'

এ কী আশ্চর্য প্রশ্ন, আর ততোধিক আশ্চর্য উত্তর! মনস্তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিকেরা হয়তো বিজ্ঞ হেসে বলবেন : এ আর এমন কী—আমাদের বিচিত্র মনেরই নানা সচিত্র জল্পনা কল্পনা—যেমন স্বপ্নে দেখি বা শুনি······ইত্যাদি।

মরুক গে। আমার কোনো মাথাব্যথাই নেই কোন টীকাকার পণ্ডিত কী ব্যাখ্যা দেবেন তা নিয়ে। আমি শুধু জানি যে, আমার জীবনে একবার অন্তত এসেছিল একটি অপরূপ আনন্দের উপলব্ধি যার ছোঁওয়ায় আমি কৃতকৃতার্থ বোধ করেছিলাম—হোক না সে ক্ষণিকের জন্যে, কিন্তু এমন একটি চেতনার উল্লাস আমার অধিগম্য হয়েছিল যার প্রসাদে আমার মনে হয়েছিল, আমি ধন্য হয়েছি।

সে-অনুভব প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা ছিল। যখন চ'লে গেল তখন আবার সে যে কী এক অসহ বিষাদে আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম তারও বর্ণনা প্রায় অসম্ভবের

কাছাকাছি। শুধু ভাগবতের একটি উপমা দেওয়া চলে—যখন কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পরে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বলেছিলেন :

রয়েছে সবই—সেই রথ ধনুর্বাণ অশ্ব গজ ধন—শুধু সে বিনা
ভস্মে আহুতির সম যে সব রতি আজি মনে হয় অর্থহীনা।

হোক। তবু বলব যে, এ-অনুভবের পরে আমার মনে অন্তত একটি বিষয়ে আর সন্দেহ আসে নি কোনোদিনই : যে, এমন এক ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার পরশ আমি সেদিন পেয়েছিলাম যার স্তরে আমার কণ্ঠ গেয়ে উঠেছিল ঝংকৃত কীর্তনে :

তারি চেতনায় চিন্ময় বিগ্রহ
নিরাকারে তারি উদারের সমারোহ,
বন্ধনে সে-ই নিবিড়তা—সে-অতনু,
কল্পনায় সে চঞ্চল জলধনু
জীবনে সে জয়-অভিযান,
মরণে সে বরাভয়,
মেঘ শুধু তার অভিমান,
রবি যার পরিচয়।

(কৈশোর-যৌবন-স্মৃতি সমাপ্ত)

উৎসর্গ

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

যোগিবরেষু,

জ্ঞানের অগাধ সিন্ধুতলে যার চিত্ত মীন সম
সঞ্চরে সহজে নিত্য ; জেনেছে যে প্রাণে প্রিয়তম
শুধু তাঁরে—যাঁর দিব্য আলোয় নিখিল বিশ্ব আলো,
ধন মান প্রতিষ্ঠার নহে যে প্রত্যাশী ; বেসে ভালো
আনন্দময়েরে সদানন্দ যে-বিবেকী ; নিতি চায়
যে সাগ্রহে যোগী যতি ধ্যানী মুনি ঋষির চরণে
হ'তে নত নিরন্তর সরল বিনম্র পিপাসায় ;
পার্থিব বিলাস, অল্প সুখ ছাড়ি ভূমার বরণে
যে-উদাসী অপার্থিব স্পর্শমণি আশে—সঁপি তার
শ্রীকরে স্মৃতিচারণ অন্তরের চির জিজ্ঞাসার।

গুরু পূর্ণিমা

স্নেহাশীষার্থী
দিলীপ



এ-পর্বে লিখেছি যাঁদের কথা :

পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলাল, মেসোমহাশয় গিরিশচন্দ্র, জ্যেঠামহাশয় হরেন্দ্রলাল, পিসেমহাশয় নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ী, তৎপুত্র নির্মলেন্দু—নির্মলদা, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, কবি বিজয়চন্দ্র, স্বামী কুমারনাথ, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ বসু, মেজমামা খগেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাচরণ মিত্র, দেবকুমার রায় চৌধুরী, প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শ্রীমৎ অনির্বাণ, সুভাষ···ইত্যাদি।

ভূমিকা

"স্মৃতিচারণ" প্রথম পর্বের প্রথম অধ্যায় "বাল্যস্মৃতি" নাম দিয়ে ১৩৬৫ সালে "ভারতজ্যোতি" সাপ্তাহিকীতে প্রকাশিত হয় ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে এবং শেষ অধ্যায় ছাপা হয় ২২শে কার্তিকে। তারপর "দেশ" পত্রিকায় "স্মৃতিচারণ" নাম দিয়ে দ্বিতীয় পর্বের প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত হয় ১৪ই চৈত্র, ১৩৬৫ সালে এবং শেষ হয় ২১ শে কার্তিক ১৩৬৬ সালে। এছাড়া জয়শ্রীতে ও সুরছন্দায় লিখেছিলাম। (সমস্ত বইটি আমি লিখে শেষ করেছিলাম প্রায় এক বৎসরে।) এই সব অধ্যায়গুলি আজ তিনপর্বে সংন্যস্ত করা হ'ল যথাসম্ভব পারম্পর্য বজায় রেখে। স্থানে স্থানে এ-পারম্পর্য লঙ্ঘন করতে হয়েছে শুধু এইজন্যেই যে একটি প্রসঙ্গ সুরু করলে তার জের টেনে না চললে রসভঙ্গ হয়।

"স্মৃতিচারণ" লেখা যখন সুরু করি তখন ভেবেছিলাম আমার বাল্যস্মৃতির পরে আপাতত আর কিছু স্মৃতিকথা লিখব না। কিন্তু নদী যেমন চলতে চলতে স্রোত সঞ্চয় করে, আমার লেখার ক্ষেত্রেও তেমনি গতিবেগ দেখতে দেখতে দুর্নিবার হ'য়ে উঠল—বিশেষ ক'রে বহু বন্ধু ও দরদীর উৎসাহে। উপস্থিত দুই পর্বে বইটিকে সাজিয়েছি। তৃতীয়পর্ব—রবীন্দ্র-শরৎ-স্মৃতি—১৯৬১ সালে বই হয়ে বেরুবে। যদি ঠাকুর দিন দেন তো চতুর্থপর্বে লিখব আমার পণ্ডিচেরি আশ্রম-জীবনের নানা চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার কাহিনী তথা আমার বহুভাগ্যলব্ধ শ্রীগুরুদেবের বহুমুখী প্রতিভার কথা।

ভূমিকায় কয়েকটি ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই। কারণ আমার আত্মকথনকে কেউ কেউ ঠিক চোখে দেখতে না পেরে বলেছেন এতে আমি আমার নিজের কথা বড় বেশি বলেছি।

এ-অভিযোগের উত্তরে আমার দুটি সাফাই আছে: এক, আত্মজীবনী-বর্গীয় লেখায় আত্মকথার বাহুল্য শুধু যে অশোভন নয় তাই নয়, এতে আত্মকথা যথেষ্ট না থাকলেই সে স্বধর্মভ্রষ্ট হয়। দুই, আমি যা লিখেছি ঠিক আত্মজীবনীও নয়—সে হ'ল স্মৃতিচারণ যাকে ইংরাজিতে বলে Reminiscences; এ-জাতীয় লেখায় লেখক আত্মজীবনীর চেয়েও বেশি স্বাধীনতা দাবি করতে পারেন ব্যক্তিগত কথা বলবার। শুধু তাই নয়, এ-জাতীয় লেখার প্রধান লক্ষ্য হ'ল চিত্রাঙ্কনে সত্যপরতা—

বিনয়ের অত্যুক্তি নয়। লেখক নিজেকে নানা সময়ে কী চোখে দেখেছেন ও কী ভাবে নিজের নানা দোষগুণ লক্ষ্য করতে করতে ও ঠেকে শিখতে শিখতে পথের পাথেয় সংগ্রহ করেছেন সেই কাহিনীই তাঁর বর্ণনীয়। কাজেই এ-ধরনের লেখা মূলতঃ আত্মকেন্দ্রিক না হ'য়েই পারে না। য়ুরোপ ও আমেরিকার নানা ভাষায় লেখা নানা মনীষীর স্মৃতিচারণ একটু মন দিয়ে পড়লেই আমার এ-সাফাই নিরপেক্ষ বিচারকের কাছে গ্রহণীয় হবে ব'লে মনে হয়। যদি না হয়—আমি নিরুপায়। তবে যদি লেখা নীরস হয় তাহলে বলতেই হবে যে, আমার কলম ধরা ব্যর্থ হয়েছে। পক্ষান্তরে, যাঁদের মনে হয়েছে আমি অহংকার প্রকাশ করতেই অনমুতপ্ত ভাবে "আমি আমি" করেছি—সরল সত্যকথনের তাগিদে নয়—তাঁদের সবিনয়ে বলার অধিকার আমার রইল যে, দৃষ্টিভঙ্গি বদলালে একই বস্তুর রূপ রঙ রসও বদ্‌লে যায়। একথা বলছি শুধু জানাতে যে, আমি স্মৃতিচারণ লিখতে সুরু করেছিলাম সত্যিই নানা মানুষের ছবি ফুটিয়ে তুলতেই—"আমি আমি" করতে নয়। এ-কথার স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, আমি যদি সত্যিই আত্মাভিমানকে খোরাক দিয়ে সস্তা আত্মপ্রসাদ পেতে চাইতাম তাহলে পদে পদে নিজের নানা দোষ ত্রুটি অহংকার ও অনুতাপের কাহিনী লিপিবদ্ধ করবার পণ্ডশ্রম করতাম না। এর বেশি সাফাই গাওয়ার প্রয়োজন নেই। কেবল একটি উদ্ধৃতি হঠাৎ মনে পড়ল এখানে পেশ করি: অনেকদিন আগে এক ইংরাজ ভাবুকের লেখায় প'ড়েছিলাম এই ধরনের একটি কথা: "Nobody should attempt to read the autobiography of another person unless he is really interested in the history of evolution of the author's ego." এখানে আমি শুধু ego (অস্মিতা) শব্দটির বদলে বসাতে চাই—অন্তরাত্মা। কারণ আমি আশা করি যে আমি অন্তত কিছুটা আঁকতে পেরেছি আমার অন্তরাত্মার আধ্যাত্মিক অভীপ্সার বিকাশ—যা আমার প্রধান লক্ষ্য—হাজারো উচ্ছলতার বহিঃকল্লোলের মধ্যেও যার আন্তর দাবি আমি ভুলি নি। যদি ভুলতাম তবে এ-আত্মকাহিনী লেখা নিরর্থক হ'ত ব'লেই আমি মনে করি: আধ্যাত্মিক অভীপ্সা বলতে আমি কী বুঝি এ-স্মৃতিচারণের নানা ছবিতেই ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছি, কাজেই এখানে ফের তার ভাষ্য করতে যাওয়া বাহুল্য হবে।

এ-সূত্রে আর একটি কথা এখানে ব'লে রাখতে চাই। সেটি এই যে, নানা চিন্তা ও সংশয়ের অভিঘাতে আমি শুধু আমার নিজের নয়—আরো অনেকের চরিত্র

ফোটাতে চেয়েছি। এ-চিত্রণের জন্তেও আমাকে নিজেকে দেখতে চেষ্টা করতে হয়েছে খানিকটা নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টিতে, ঠিক যেমন নাট্যকার দেখেন তাঁর সৃষ্ট লবকুশীকে। অর্থাৎ, অপরকে চিত্রিত করবার জন্তেই আমাকে অবতারণা করতে হয়েছে বর্ণনীয় চরিত্রের সঙ্গে আমার কী ভাবে সংঘাত বা লেনদেন ঘটেছিল। এই ভাবে যদি সহৃদয় পাঠক আমার স্মৃতিচারণকে দেখেন তা হ'লে হয়ত আমার ব্যক্তিগত আত্মাভিমানকে তাঁর চোখে দৃষ্টিকটু মনে হবে না। তবে খতিয়ে এ সবই দরদের কথা। কে না জানে যে দরদীর কাছে যা সুস্বাদু বেদরদীর কাছে সেসব অনেক সময়েই বিস্বাদ লাগে?

আমার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগের উত্তরেও কিছু বলতে চাই।

অভিযোগটি এই—লিখেছেন কেউ কেউ—যে আমি ভাগবতী সাধনায় অঘটন (miracle) জাতীয় চমককে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়েছি, যোগের চেয়ে যোগবিভূতিকে বড বড় করে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি। এ-অভিযোগটি আমার কাছে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মনে হয়। কেন—বলি।

সব কিছুর মতন অঘটন বা যোগবিভূতিরও অপপ্রয়োগ আছে। আমার "অঘটন আজো ঘটে" বইটিতেও আমি লিখেছি: যেখানে অলৌকিক শক্তিকে আত্মাভিমানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গণ্য করা হয় সেখানে সাধকের ক্ষতি হয়ই হয়। কিন্তু যেখানে যোগবিভূতি জাতীয় অঘটনকে ভাগবত মহিমার তথা করুণার বাহন হিসেবে দেখা হয় সেখানে তারা ধর্মজীবনের সহায়ই হয়—প্রতিবন্ধক কদাচ নয়। আমি কোনোদিনই পরের মুখে ঝাল খেতে চাই নি, তাই সব আপ্তবাক্যকেই সব সময়ে গ্রহণ করতে পারি নি আমার আত্মবিকাশের অনুকূল ব'লে। যেখানেই কোনো সাধুর বা শাস্ত্রীর প্রভাব আমার কাছে বরণীয় মনে হয়েছে সেখানেই আমি তাঁকে প্রণাম করেছি, কিন্তু যেখানে কোনো আপ্তবাক্য আমার মন নেয় নি—গিয়েছি পাশ কাটিয়ে। অঘটন-বর্গীয় অলৌকিক অভ্যুদয়কে আমি অভিনন্দন ক'রে এসেছি এই জন্যই যে এসব আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে আমি ভাগবতী করুণাকেই প্রত্যক্ষ করেছি পদে পদে। আর এ-করুণা যেখানেই নিজেকে জানান দিয়েছে সেখানেই তার কাছে মাথা নত করা আমি কর্তব্য মনে ক'রে এসেছি। আপ্তবাক্য আমি সাধ্যম'ত সশ্রদ্ধেই বরণ করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু সর্বত্র পারি নি। কেন পারিনি লিখেছি তৃতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথের গুরুবাদশীর্ষক পত্রের মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে। এ জন্তে আমি আজও অনহুতপ্ত।

আমার আত্মকাহিনী সম্বন্ধে একটি কথা মনে ক'রে আমি বিশেষ ভরসা পাই। কথাটি এই যে, আমার স্মৃতিচারণের নানা বিশ্বাস অনুভূতি ও উচ্ছ্বাস যাঁরাই একটু দরদ দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের কাছে তিনটি কথা স্বীকার্য মনে হয়েছে এ এজাহার আমি বহু পাঠকের প্রাইভেট পত্রে পেয়েছি। এ-তিনটি কথা এই :—

এক—লেখক সত্যনিষ্ঠ,

দুই—তিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু ভিতরকার খবর রাখেন,

তিন—তিনি স্বভাবে শুধু যোগীই নন, শিল্পীও বটেন, তাই যা যা সত্য ও প্রামাণ্য ব'লে দেখতে পেয়েছেন সে-সব অনুভব উপলব্ধির কাহিনী সোচ্ছ্বাসে না বললে তাঁর আশ মিটত না কিছুতেই।

এ-তিনটি সত্য যাঁদের কাছে স্বতঃসিদ্ধবৎ মনে না হবে তাঁদের এ-স্মৃতিচারণ ভালো লাগবে না হয়ত। কিন্তু রসগ্রাহীর রসাস্বাদের খবর তিনিই জানেন, আমি জানি শুধু পরিবেশকের কথা। এ-পরিবেশক—কি না দিলীপকুমার, যিনি সাধক তথা শিল্পী—সাধনার ক্ষেত্রে চমকের দেখা পেলে সে-চমকের আনন্দকে চেয়েছেন আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে উপভোগ করতে। এ-চাওয়াটা আমি খানিকটা আমার শিল্পি সত্তার স্বধর্ম ব'লেই মনে ক'রে এসেছি ব'লে নানা অঘটনের চমককে গোপন করতে চাওয়াটা আমার পক্ষে স্বধর্মপালন হ'ত না ব'লেই আমি মনে করি এবং স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ—একথাও সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি।

ভূমিকা বড় হ'য়ে যাচ্ছে। স্মৃতিচারণে নানা স্থানেই যথেষ্ট ব্যাখ্যা তথা আত্মস্ফালনের অবতারণা করা হয়েছে—আর কেন? তাই এখানেই ইতি করি।

পরিশেষে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমার অগুন্তি বন্ধু ও দরদীকে যাঁরা স্মৃতিচারণ প'ড়ে আমাকে উচ্ছ্বসিত পত্র লিখেছেন—"অঘটন আজো ঘটে" বইটি ছাড়া আর আমার আর কোনো বইয়ের ভাগ্যেই এমন ব্যাপক সাড়া লাভ হয় নি। যাঁরা তিরস্কার করেছেন তাঁদের অভিযোগের উত্তর দেওয়া হয়েছে; কিন্তু যাঁরা আমার স্মৃতিচিত্রাঙ্কনে আনন্দ পেয়েছেন তাঁদের সেই আনন্দই যে চিত্রকরের সবচেয়ে বড় পুরস্কার এই কথাটি সকৃতজ্ঞে জানিয়ে রাখতে চাই। এঁদের মধ্যে একজন স্নেহভাজন বন্ধু তথা সহায় শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যাঁর আনুকূল্য বিনা "অঘটন আজো ঘটে", "দেশে দেশে চলি উড়ে" ও "স্মৃতিচারণ" এত শীঘ্র প্রকাশিত হ'ত না। আর একজন দরদী আমার স্নেহভাজন তরুণ বন্ধু শ্রীমান্ নীলকণ্ঠ মৈত্র, পুনার রসায়ন চর্চায় অগ্রণী। তিনি বহুভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন, নানা নির্দেশ দিয়েছেন ও

সর্বোপরি তাঁর শ্রদ্ধালু হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত সাড়া দিয়ে আমাকে পরিতৃপ্ত করেছেন। শ্রীমান্ সলিল মুখোপাধ্যায়, তরুণ রায় ও পার্বতীশংকর মেহেরার কাছেও আমার ঋণ স্বীকার করছি।

উপসংহারে আর একটি কথা না বললেই নয়। স্মৃতিচারণের নানা স্থানে নানা মনীষী তথা যোগীর যে-সব মতামত উদ্ধৃত করেছি সে-সব মতামতের দায়িত্ব তাঁদের—আমার নয়। আমার নিজের মতামত আমি যেখানেই ব্যক্ত করতে চেয়েছি করেছি নিজের জবানিতেই। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা এইটুকু মনে রাখলে অনেক ভুল-বোঝার হাত থেকে আমি নিষ্কৃতি পাব।

ইতি

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

গুরু পূর্ণিমা

১৩৬৭